চলমান ইতিহাস

জীবনের কিছু সময় কিছু কথা
১৯৮৩ - ১৯৯০

মওদুদ আহমদ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল সক্রিয়ভাবে উপস্থিত এক রাজনীতিকের জীবনের কিছুটা কালের পরিচয় তুলে ধরেছে এ বইটি। কখনো নন্দিত, কখনো নিন্দিত, প্রচুর চড়াই-উৎরাই পার হওয়া এই পোড়খাওয়া রাজনীতিকের জীবনকাহিনী রাজনীতিতে সদা কৌতূহলী এদেশের জনগণের কাছে আগ্রহের বিষয় হবে বৈকি। এই বইটির ফোকাস যদিও ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সাল, কারাজীবন থেকে যার শুরু, তবে আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে যা হয়, এখানেও তা-ই হয়েছে। লেখক প্রসঙ্গক্রমে কাহিনীর ডালপালা কখনো অতীতে এবং কখনো সামনে বিস্তৃত করেছেন। রাজনীতিকের রচনায় রাজনীতি তো থাকবেই, কিন্তু ব্যক্তিজীবন, তার ছোট-বড় সুখ-দুঃখ, দেশী-বিদেশী পরমাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, স্বদেশ নিয়ে ভাবনা—এরকম নানা প্রসঙ্গ পাঠকের মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

রাজনীতিকদের আত্মজীবনীর প্রাদুর্ভাবের এই দেশে বইটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হবে বলে আশা করা যায়।

অপর ফ্ল্যাপে দেখুন

টাকা ৪৮০.০০

www.pathagar.com

মওদুদ আহমদ, ব্যারিস্টার, সাংসদ, সাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। এর আগে তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতি পদেও দায়িত্ব পালন করেছেন। একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতিতে তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন দীর্ঘদিন থেকেই। সেই সঙ্গে একজন ব্যতিক্রমী রাজনীতিক হিসেবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে নিয়মিত লেখালেখি করে এসেছেন।

জনাব আহমদ জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৬, ১৯৮০ ও ১৯৯৬), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৩) ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮১ ও ১৯৯৮)সমূহের ফেলো। তিনি দি জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৯৭) ইলিয়ট স্কুলের একজন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবেও অধ্যাপনার কাজ করেছেন।

ইউপিএল থেকে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৮টি।

ISBN 984 70220 1031 7

www.pathagar.com

চলমান ইতিহাস

জীবনের কিছু সময় কিছু কথা
১৯৮৩-১৯৯০

মওদুদ আহমদ

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

www.pathagar.com

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট হাউস
৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
পোস্ট বক্স ২৬১১
ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ
ফ্যাক্স: ৮৮০২ ৯৫৬৫৪৪৩
E-mail: upl@btcl.net.bd, upl@bangla.net
Website: www.uplbooks.com

প্রথম প্রকাশ ২০০৯

স্বত্ব © মওদুদ আহমদ ২০০৯

প্রচ্ছদ
আতিকুর রহমান

ISBN 984 70220 1031 7

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট হাউস, ৬১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০। কম্পিউটার ফরমেটিং: মোঃ নাজমুল হক। এএমএস এন্টারপ্রাইজ-এর তত্ত্বাবধানে একতা অফসেট প্রেস, ১১৯ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

CHALAMAN ITIHAS: JIBANER KICHHU SAMAY KICHHU KATHA 1983-1990 by Moudud Ahmed, published in 2009 by The University Press Limited, Red Crescent House, 61 Motijheel C/A, Dhaka 1000, Bangladesh.

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ix

অধ্যায় ১

দিনাজপুরের পথে ১

অধ্যায় ২

মুজিবের কারাগারে ৯

অধ্যায় ৩

কারাগারের অভ্যন্তরেঃ রাজ্জাক আর শাহ্‌দাত
গ্রামীণ জীবন আর জাতীয় উন্নয়ন ১৩

অধ্যায় ৪

ছোটবেলার কথাঃ বাবার পরিচয়, ছাত্রজীবন, প্রথম কারাবরণ
ও লন্ডনে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলন ২৭

অধ্যায় ৫

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, গণঅভ্যুত্থান এবং
গোলটেবিল বৈঠক ৫৫

অধ্যায় ৬

নির্বাচন, মুক্তিযুদ্ধঃ স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের
শাসন, শেখ মুজিবের মৃত্যু ৬৫

www.pathagar.com

অধ্যায় ৭
মোশতাকের অভ্যুত্থান:
জাসদ ও সেনাবাহিনী, সিপাহী-জনতার বিপ্লব ১০৯

অধ্যায় ৮
প্রেসিডেন্ট জিয়ার সরকারে যোগদান এবং পারিবারিক ট্রাজেডি ১১৭

অধ্যায় ৯
প্রেসিডেন্ট জিয়ার রাজনীতি ১২৩

অধ্যায় ১০
বিএনপির অভ্যন্তরীণ সঙ্কট ও সরকার ত্যাগ ১৫৯

অধ্যায় ১১
আসিফের মৃত্যু আর আমানের প্রতিবন্ধিতা ১৮১

অধ্যায় ১২
শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমান ১৮৯

অধ্যায় ১৩
জিয়াবিরোধীদের সমালোচনা ১৯৩

অধ্যায় ১৪
জিয়াউর রহমানের মৃত্যু, বিচারপতি সাত্তারের নির্বাচন:
বিদ্রোহী গ্রুপের ভূমিকা এবং এরশাদের ক্ষমতাগ্রহণ ২০১

অধ্যায় ১৫
এরশাদ কর্তৃক গ্রেপ্তার: সামরিক শাসনের বৈশিষ্ট্য ও
সামরিক রাজনীতির সীমাবদ্ধতা ২৫১

অধ্যায় ১৬
আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ২৭৩

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৭
হাসপাতাল থেকে কারামুক্তি ৩০১

অধ্যায় ১৮
কারাগারে গ্রন্থ রচনা ৩০৫

অধ্যায় ১৯
বিপদে বন্ধুর পরিচয়: বিদেশী বন্ধুদের ভূমিকা ৩০৯

অধ্যায় ২০
বিশ্ব কমিউনিজমের বিপর্যয় ও চীন দেশের উত্থান ৩৫৫

অধ্যায় ২১
বিরোধী আন্দোলন: আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র
আর এরশাদ সরকারে যোগদান ৩৬৩

অধ্যায় ২২
কন্যা লাভ: আনা কাসফিয়া প্রিয়দর্শিনী ৩৭১

অধ্যায় ২৩
সরকারে আমার ভূমিকা এবং অবদান ৩৭৩

অধ্যায় ২৪
কিছু মৌলিক সংস্কারের কথা ৪১৭

অধ্যায় ২৫
এরশাদের রাজনীতি:
এরশাদবিরোধী আন্দোলন, ক্ষমতা হস্তান্তর
এবং গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণ ৪৫৩

অধ্যায় ২৬
প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং জেনারেল এরশাদ ৪৮৩

www.pathagar.com

অধ্যায় ২৭

সরকার পরিচালনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরন ও প্রক্রিয়া ৪৮৯

অধ্যায় ২৮

প্রধানমন্ত্রী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ৪৯৩

অধ্যায় ২৯

বিবাহ এবং নিজের কিছু পরিচয় ৪৯৯

অধ্যায় ৩০

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ: My Vision of Bangladesh ৫০৩

কতিপয় আলোকচিত্র ৫০৭

নির্ঘণ্ট ৫২৩

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

জীবনের এই চলমান ইতিহাস আপাতত ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এসে শেষ হয়েছে। তাও আবার পুরোপুরিভাবে যে সব বর্ণনা দিতে পেরেছি বা সবকিছুই যে লিখতে পেরেছি তাও নয়। যা মনে এসেছে বা প্রাসঙ্গিক মনে করেছি সেটারই স্মৃতিচারণ করেছি। ১৯৯১ সাল থেকে বাকি সময়ের স্মৃতিকথা পরবর্তী পর্যায়ে লেখার আশা রাখি।

বইটি এই মুহূর্তে প্রকাশ করার ব্যাপারে বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে দ্বিমত ছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন এখন না ছাপাতে। পাণ্ডুলিপিটা রেখে যেতে, মৃত্যুর পর ছাপানোর জন্য। কিন্তু সেটা ভাল হতো না, নানা কারণে অনিশ্চয়তা থেকে যেত। আর মনে হবে নিজের কথা প্রকাশ করতে জীবনকালে আমি সাহস হারিয়ে ফেলেছিলাম। মাওলানা আবুল কালাম আজাদের জীবনী ছাপানোর প্রেক্ষিত ছিল ভিন্ন। তাছাড়া আমি সেরকম বিরাট কোন নেতা নই। একথা সত্য যে রাজনীতিবিদদের আত্মজীবনী লিখতে অনেক অসুবিধা থাকে, অনেক ঝুঁকি থাকে। তাছাড়া থাকে সময়ের অভাব। যাই হোক বাকি অংশটুকু লেখার সুযোগ বা সময় যদি না পাই সেই ভয়ে শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রথম অংশটি এখনই প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। যেহেতু আমি রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে এখনও জড়িত তাই একেবারেই স্পর্শকাতর কিছু কথা বা ব্যক্তি নামের উল্লেখ করা থেকে আপাতত বিরত থাকা শ্রেয় মনে করেছি।

'সংসদে যা বলেছি' ছাড়া আমার আর সব বই ইংরেজিতে লেখা। পরে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু নিজের জীবনকথা আমি বাংলায় লিখেছি কারণ এটা মূলত দেশের মানুষের জন্য লেখা। কিন্তু বাংলা শব্দ চয়নে আমি খুবই দুর্বল হওয়ার কারণে অনেক সময় ইংরেজি শব্দের আশ্রয় নিতে হয়েছে। আর সাহিত্যে আমার পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা, কোনটাই না থাকার কারণে আমাকে একেবারে সাধারণ বাংলাতে সব লিখতে হয়েছে। যা লিখেছি তার কোন কিছুই উদ্দেশ্যমূলক নয়। এই বইতে আমার কোন মতামত বা সমালোচনায় কোন বিদ্বেষ বা malice নাই। আন্তরিকতা আর সততার সাথে নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি। আশা করি সকলে সেইভাবেই বইটিকে গ্রহণ করবেন।

বইটির একটি বৃহৎ অংশ ১৯৮২-৮৩ সালে জেলখানাতেই লেখা। প্রথমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে, তারপর দিনাজপুর জেলা কারাগার আর ঢাকার পিজি হাসপাতালের প্রিজন

www.pathagar.com

সেলে। একই সময়ে ইংরেজিতে যে গ্রন্থটি লিখেছিলাম সেটা ১৯৯৫ সালে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে, নাম *Democracy and the Challenge of Development: A Study of Politics and Military Interventions in Bangladesh*। এর বাংলা অনুবাদ *গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ: প্রেক্ষাপট—বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সামরিক শাসন* প্রকাশিত হয়েছে ২০০০ সালে। এরপর অবশ্য 'কারামুক্ত' অবস্থায় আমার রচিত প্রথম বই *South Asia: Crisis of Development—The Case of Bangladesh* ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটির বাংলা অনুবাদের কাজ এখন চলছে।

এই বইয়ে দিন, তারিখ, প্রেক্ষিত, তথ্য, পরিসংখ্যান, প্রসঙ্গ, প্রাসঙ্গিকতা এবং সমঞ্জসতা সবকিছুই তখনকার সময় এবং কালের প্রেক্ষাপটে বিচার করার জন্য অনুরোধ জানাই। এই বইয়ে যেসব মতামত বা অভিব্যক্তি রয়েছে তা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত। আমার রাজনৈতিক দল বা কোন সরকারের সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই।

মওদুদ আহমদ

www.pathagar.com

অধ্যায় ১

দিনাজপুরের পথে

সেদিন ছিল শনিবার। ১৬ এপ্রিল, ১৯৮৩। সারা জেলখানায় থমথমে ভাব। সকালবেলায় খবর এলো একজন কয়েদি অনশনে মারা গেছে। সকল কয়েদি এবং হাজতি, যাদের সংখ্যা প্রায় চার হাজারের মত, ঠিক করেছে তারা আমরণ অনশনে অংশ নেবে। অনশন শুরু হয়েছে এই ঘটনার দুদিন আগে থেকে। অনেক দিন থেকেই বন্দিরা নানা দাবি তুলে আসছে। কতগুলো দাবি পাকিস্তান আমলের পুরোনো। ১৯৭৮ সালে বন্দিরা ১১ দিন অনশন পালন করে কিছু দাবি আদায় করেছিল এবং প্রেসিডেন্ট জিয়া একটি কারা কমিশন গঠন করেছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুস্তাফিজুর রহমান জেলখানায় গিয়ে অনশনরতদের কিছু দাবি তখনই কার্যকর করার হুকুম দিয়েছিলেন। তার কয়েকটি কার্যকরও হয়েছিল। কিন্তু বছরখানেক থেকে সেগুলোও আবার প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। বর্তমান দাবিনামার মধ্যে সেই প্রত্যাহার করে নেয়া পুরোনো দাবিগুলোই বেশি।

দাবি সবগুলোই মূলত মানবিক ধরনের। বন্দিরা জেলখানায় মানবিক ব্যবহার চায়। প্রথম শ্রেণীর বন্দিরা কিছুটা সুযোগ-সুবিধা এবং ভাল ব্যবহার হয়তো পায়, কিন্তু সাধারণ বন্দিদের দুঃখদুর্দশা অবর্ণনীয়। কয়েদি (convict) হোক, আর হাজতি (under trial) হোক, তাদের জীবনপ্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি একটি অন্য দুনিয়া যা বাইরের লোকেরা কল্পনা করতে পারে না। কারাগারের অভ্যন্তরে সত্যি বলতে কি, মধ্যযুগীয় এক দাসপ্রথা প্রচলিত রয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে কারা কর্তৃপক্ষের মনোভঙ্গি। তারা মনে করে জেলখানায় যারা থাকে তারা কোন রকমের ভাল ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য নয়। তারা সব চোর, ডাকাত, খুনি এবং সমাজের সবচেয়ে খারাপ লোকদেরই জেলে রাখা হয়। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সমাজের সকল শ্রেণী, বিশেষ করে উঁচু শ্রেণীর লোকেরা তাই মনে করে। ক্ষমতায় আরোহণের পর প্রথম বিদেশ ভ্রমণ শেষে জেনারেল এরশাদ বিমানবন্দরে জেলে আটক রাখা বিএনপি নেতাদের উদ্দেশে বলেছিলেন রাজনৈতিক কারণে কেউ জেলে নেই। জেলে সব চোর ডাকাতদের রাখা হয়েছে। এই মানসিকতার নানা কারণ রয়েছে যার বিশ্লেষণ এখানে করার প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বললে চলবে যে, এই মানসিকতা অনেক পুরোনো এবং এর সাথে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তবে

www.pathagar.com

এখন অনেক শক্তিধর রাজনীতিবিদ মন্ত্রী ও সরকারপ্রধানদের চুরি বা দুর্নীতির অভিযোগে জেলে যেতে হয় বলে সত্যিকার চোর ডাকাতদের সম্মান কিছুটা হলেও বেড়েছে।

জেলে যারা বন্দি থাকে তাদের প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ হলো হাজতি, অর্থাৎ যারা এখনো বিচারের অপেক্ষায় আছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগ, ২ থেকে ৪ বছর যাবৎ বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে, আর কারাভোগ করে চলেছে। এমনও বন্দি আছে যারা ১০ বছর যাবৎ বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে। এদের মধ্যে চার পাঁচশ শিশু-কিশোর আছে, যাদের বয়স হবে ৮ থেকে ১৫ বছর। এরাও বছরের পর বছর বিচারের অপেক্ষায় আছে। এসব শিশু-কিশোর অশিক্ষিত, অনাথ, এদের কেউ নেই। হাজতিদের মধ্যে যারা বিনা বিচারে দীর্ঘদিন কারাবন্দি তাদের প্রায় সবাই নিতান্তই গরিব এবং অশিক্ষিত। এদের এমন কোন আত্মীয়স্বজন বা আর্থিক সঙ্গতি নেই যাতে করে এরা আদালতে গিয়ে জামিন চাইতে পারে বা তাদের মামলা তদ্বির করাতে পারে। তাই তারা বছরের পর বছর জেলে থেকে যায়। যারা কয়েদি অর্থাৎ বিচারে সাজাপ্রাপ্ত তাদের সংখ্যা বড়জোর শতকরা ২৫ ভাগ। এদের মধ্যে আবার এমন অনেকে আছে যারা একেবারে নির্দোষ। আমার সমীক্ষায় এমন নির্দোষের সংখ্যা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ। হয় বিচারে তাদের কোন উকিল ছিল না বা আত্মপক্ষ সমর্থন করার আর্থিক ক্ষমতা ছিল না বা তদ্বির করার মত আত্মীয়স্বজন ছিল না। আর বিচার পদ্ধতির দুর্বলতা বা বিচারকের ভুলের জন্য অনেক সময় নির্দোষ ব্যক্তিরা সাজা পায়। বহু বছর জেল খাটার পর জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উচ্চ আদালতের আপিল করে (জেল আপিল) অনেকে খালাস পায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপিলের রায়ের আগেই তাদের জেল খাটা শেষ হয়ে যায়। এদের মধ্যে অনেকে আবার সামরিক আদালতেও সাজাপ্রাপ্ত। এই সাজাপ্রাপ্তদের শতকরা কতজন সত্যিকারের দোষী তা বলা মুশকিল, তার কারণ আপিল করার অধিকার না থাকায় এবং সামরিক আদালতে বিচারের পদ্ধতি, প্রকৃতি এবং আচার-ব্যবহার ভিন্ন হওয়ায় দোষী নির্দোষ নির্ণয় করার বিষয়টি সম্পর্কেই কতগুলো মৌলিক প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়।

অনশনরত বন্দিদের সব দাবি আমার দেখার সুযোগ হয়নি। যেগুলো শুনেছি তার মধ্যে রয়েছে পরিবারের কাছে চিঠি পাঠানোর সুযোগ দেয়া। এদের বেশিরভাগই লেখাপড়া জানে না। দুয়েকজন যারা জানে তারা বাকিদের জন্য লিখে দেয়। কিন্তু পাঠাতে পারে না। প্রতি খাতায় বা ওয়ার্ডে একটি করে খবরের কাগজ এবং রেডিও, সিপাহী জমাদারদের কাছে থেকে ভাল ব্যবহার, হাজতিদের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, একটি করে বালিশ, কারণ ওরা মাথায় ইট দিয়ে ঘুমায়, লকআপের পর লুঙ্গি পরার সুযোগ, ইত্যাদি। বেশিরভাগ দাবি অত্যন্ত মামুলি এবং এর মধ্যে অনেকগুলো যেমন খবরের কাগজ এবং রেডিও এরা এত বছর পেয়ে এসেছে কিন্তু ইদানীং বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জেল কর্তৃপক্ষ বন্দি কমিটির লোকজনের সাথে প্রথমে একবার কথা বলেছে কিন্তু কি কারণে জানি না তারা সমস্যার আর কোন নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়নি। বন্দিরা তখন অনশন করার নোটিশ দেয়। কর্তৃপক্ষ সেই নোটিশে সাড়া দেয়নি। ফলে বন্দিরা অনশন শুরু করে। প্রথম শ্রেণীর বন্দি, যাদেরকে

www.pathagar.com

ডিভিশন বন্দি বলা হয়, তাদের সংখ্যা সারা জেলে শ'দেড়েকের বেশি হবে না। এদের রান্না এবং অন্যান্য কাজের জন্য জেল কর্তৃপক্ষ সাধারণ কয়েদিদের নিয়োগ করে। জেলের নিয়মানুযায়ী অনশনের সময় বন্দিদের নিজেদের সেলে লকআপ করে রাখা হয়। সুতরাং ডিভিশন বন্দিরা ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক এতে জড়িয়ে পড়ে। সাধারণ বন্দিদের অনশনের ফলে দেখা গেল যে, প্রথম দিন ওদের দাবির প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে আমাদের সেলের ১৫ জন ডিভিশন বন্দি এবং অন্যান্য সেলেরও সকল ডিভিশন বন্দি অনশন করেছে। দ্বিতীয় দিন বন্দিরা যখন আমরণ অনশন শুরু করে তখন আমরা আর অনশন করিনি। নিজেরা রান্না করে কোন রকম কাজ চালিয়ে নেয়া হয়।

শনিবার ছিল অনশনের তৃতীয় দিন। অনশনে একজন কয়েদির মৃত্যুর খবর জেলের সর্বত্র খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ২৬ সেলে যারা আমাদের রান্না এবং অন্যান্য কাজ করে দেয় এরা সব অনেক দিনের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি। এদের 'ফালতু' বলা হয়। আমরা এদের নাম ধরেই ডাকি। আলম, বুলেট, সামসু, রাজ্জাক, মাহফুজ ইত্যাদি। অন্যদিনের তুলনায় এদিন এদের সকলের চেহারায় একটি ভিন্ন রকমের কঠিন ভাব দেখা গেল। বিষণ্নতার ছায়া তাদের মুখে। সাথী কয়েদি মারা গেছে, কিন্তু মুখ খুলে কিছু বলতে পারছে না। সিপাহীরা লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েক মিনিট পরপর। এর কিছুক্ষণ পর খবর এলো আরো একজন কয়েদি মারা গেছে। খবর দিল প্রধান স্টোরের একজন পাহারাদার। কোন একটি ছুতা নিয়ে এসেছিল, ফিস ফিস করে বলে গেল। এর অল্পক্ষণ পরেই জেলখানার এই খবর আমাদের 'সাপ্লাই' করার জন্য ফালতু শামসুকে ডেকে নিয়ে জমাদার আটকিয়ে রাখল একটি ঘরের মধ্যে অথচ খবরটি এনেছিল অন্য একজন। বেচারা শামসু এমনিতেই তিন দিন না খেয়ে ছিল।

আমরা ডিআইজিকে খবর পাঠালাম সাক্ষাতের জন্য। উনি এলেন না। পাঠালেন একজন ডেপুটি জেলারকে। উনি মৃত্যুর খবর অস্বীকার করলেন। আমরা তার মাধ্যমে অনুরোধ জানালাম ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করে ফেলতে। আমাদের রান্নার কোন কাজ চলছে না এটাও তাকে জানালাম। ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পরই আমাদের কাজের ছেলেরা বলল, মৃত্যুর সংবাদ জেল কর্তৃপক্ষ নাকি কোনদিন স্বীকার করে না। এটি তাদের নিয়মের বাইরে।

২৬ সেলের ১৫ জনের মধ্যে এগারো জনই ছিল অরাজনৈতিক ব্যক্তি, বেশিরভাগই চাকরিজীবী মানুষ দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা। প্রথম দিনের পর থেকে এরা কেউ অনশনের পক্ষে ছিল না। সুতরাং শনিবার দেরি হলেও আমাদের চৌকায় রান্না ঠিকই হলো এবং কেউ অনশন করেনি। যদি মৃত্যুর সংবাদ সত্য হয়ে থাকে এই আশঙ্কায় সহানুভূতি জানানোর জন্য এস. এ. বারী এবং কর্নেল শওকত দুপুরে আহার করেননি। পরে কর্নেল শওকত বলেছেন মৃত্যুর সংবাদ সত্য ছিল না বলেই তাঁর মনে হয়েছে। যাই হোক, শনিবার আমরা এবং অন্যান্য সেলের ডিভিশন বন্দিরা ছাড়া প্রায় সকল সাধারণ বন্দি অনশনে যোগ দিয়েছিল বলে খবর পেয়েছিলাম। সকালে যখন আমরা ২৬ সেলের সকলে বসেছিলাম ব্যাপারটা আলোচনা করার জন্য, আমার মত ছিল জেলখানায় বেআইনি

www.pathagar.com

কিছু করার বিপক্ষে। জেলখানায় অনেক নিয়মকানুন, অনেক সীমাবদ্ধতা, অনেক নিষ্ঠুরতা, এখানে কোন আন্দোলন সফল করা খুব কঠিন হয়। এতে শুধু সাধারণ বন্দিদের দুর্ভোগ বাড়ে। এতে অংশগ্রহণ না করে এটি কি করে মিটিয়ে ফেলা বা বন্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। জেলের অব্যবস্থা নিয়ে আন্দোলন করতে মন থেকে জোর পাই না আরো একটি কারণে। রাজনীতিবিদদের অনেকেই জেলে ছিলেন বহুবার কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর জেলখানার সমস্যার সমাধান করার সময় কারো হয়নি। আমরাও ক্ষমতায় ছিলাম। তেমন কিছু করিনি, যদিও প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে জেলখানায় কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। আজ তাই নিজেরা জেলে এসেছি বলে বন্দিদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করাটাকে তাই একটু বেমানান মনে হয়েছে। কেমন জানি খাটো মনে হয়েছে নিজেকে।

সন্ধ্যায় লকআপের পর আটটার দিকে হঠাৎ বাতি চলে গেল এবং এর কিছুক্ষণ পর জেলার এসে খবর দিল আমার বদলি হয়েছে। কোন কথা বলার উপায় নেই। বুঝতে বাকি থাকল না যে জেল কর্তৃপক্ষ এবং সরকার সমস্যার সমাধান না করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বন্দিদের এই আন্দোলনের জন্য আমাদেরই দায়ী বলে মনে করেছে। মিথ্যা মামলায় সাজা পাওয়ার পর মন এমনিতেই ভাল ছিল না। যে ক'দিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলাম, নিজেকে বই লেখার কাজে ব্যস্ত রাখতাম। তাস খেলা বা অনর্থক গল্পগুজব, সব ধরনের আড্ডা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতাম। কোন ঝামেলায় জড়াতাম না। অনেকটা চুপচাপ থাকতাম। জেল কর্তৃপক্ষের সকলের সাথে আমার সদ্ভাব ছিল। কারো সাথে কোন বিষয়ে কোনদিন কোন গোলমাল হয়নি। সাধারণত তাদের এড়িয়ে চলেছি। প্রতি বৃহস্পতিবার ডিআইজি রাউন্ডে আসলে দুয়েকদিন আমার ঘরে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করেছে—ঐটুকুই। গেল বৃহস্পতিবার অনশনের প্রথম দিন ছিল। ঐদিন উনি আমাকে বলেছিলেন, জেলখানায় এই ঘটনা তাঁকে হেয় করার জন্য করা হচ্ছে, তাঁকে ডিসক্রেডিট করার জন্য এই ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম, সেটা বোধহয় ঠিক নয়। আমি যখন বললাম যেসব দাবি জেল কর্তৃপক্ষের জন্য মানা সম্ভব সেগুলো মেনে নিয়ে জলদি ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেলতে, উনি প্রশ্ন তুললেন ক্রিমিনালদের সাথে উনি বসবেন কেন? বললেন, আমি ক্রিমিনালদের সাথে বসতে পারি না। আগেই বলেছি কয়েকটা দাবি খুবই মামুলি ছিল। অনশনের কোন দরকার ছিল না। ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তিটা ত্যাগ করলে খুব সহজে ব্যাপারটা মিটে যেতে পারত। বর্তমান সামরিক সরকারের 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার ইচ্ছা বোধহয় ডিআইজি সাহেব পোষণ করেননি। উনাকে 'ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার' পুরোপুরি পক্ষে বলে মনে হলো। যাই হোক তাঁকে উপযাচক হয়ে আরো পরামর্শ দিলাম যেসব দাবি মেটাতে অর্থের প্রয়োজন সেগুলো সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিতে। যাই হোক ভদ্রলোকের হাবভাবে মনে হলো তিনি বোধহয় ভুলেই গেছেন যে, তাঁর চাকরিটাই 'ক্রিমিনালদের' দেখাশুনা করার জন্য। তিনি চান আর নাই চান, রোজই তাঁকে তাদের সাথে কথা বলতে হবে। তাদের ঘিরেই তাঁর জীবন, তাঁর চাকরি এবং চাকরিজীবনের উন্নতি।

www.pathagar.com

যখন সন্ধ্যার পর জেলার হঠাৎ করে বদলির, অর্থাৎ এক জেল থেকে আর এক জেলে স্থানান্তরের খবরটা দিলেন, তাঁকে শুধু বললাম যে, জেলখানায় যা কিছু ঘটছে তার সাথে আমার তো কোন সম্পর্ক ছিল না অথচ আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন। জেলার কোন সদুত্তর দিলেন না। শুধু বললেন, ওপরের নির্দেশ আছে। সাথে সাথে সব গুছিয়ে নিতে হলো। বাতি নেই, শুধু হারিকেনের আলোতেই নিজের জিনিসপত্র বাঁধতে শুরু করলাম। সমস্যা হলো শ'খানেক বই আর ফাইলপত্র নিয়ে। তারপর আরো কত কি। আমানের একটি ছবি ছিল বিদ্যুতের সুইচবোর্ডের ওপরে। ওর আঁকা দুটো ছবি ছিল দেয়ালে। সেগুলো আগে নিলাম, তারপর বইগুলো একটি ছালায় ভরে আধঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হলাম। ততক্ষণে জেলখানার বিভিন্ন অংশ থেকে হাজার কণ্ঠে শ্লোগান শুরু হয়েছে। বুঝলাম কর্নেল শওকত ও আমি ছাড়াও আরো অনেককে বদলি করা হচ্ছে। শ্লোগানের মুহুর্মুহু আওয়াজে যেন জেলখানার উঁচু দেয়ালগুলো ভেঙে দুমড়ে পড়ছিল।

কর্নেল শওকত আমার একটু আগেই বেরিয়ে পড়েছেন সেল থেকে। ২৬ সেল থেকে আপাতত আমাদের দুজনকে বদলি করা হয়েছে। ২৫/৩০ জন সিপাহী এসেছে এক একজনকে নিয়ে যেতে। যদিও তার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমাদের তারা নেতা বানাবেই। অন্ধকারে যখন রওনা হয়েছি, শ্লোগানের আওয়াজ আরো তীব্র হয়েছে। ৯০ সেল, নতুন জেল এলাকা পার হয়ে ৫ খাতার কাছাকাছি যেতে শ্লোগানের আওয়াজ অন্ধকারকে আরো ভয়াবহ করে তোলে। লোহার মোটা মোটা শিকের জানালার ভেতর থেকে তীব্র কণ্ঠে ভেসে এলো কাকে নিয়ে যাচ্ছ তোমরা? প্রায় একইসঙ্গে আরো অনেকে একসাথে ঐ প্রশ্ন তুলল। ওদের উৎকণ্ঠা এবং আবেগপ্রবণতা দেখে মনে হয়েছিল নিজের নামটা একবার বলেই দেই। ওদের প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু পাশের একজন সিপাহী বলল 'কেউ না', 'কেউ না'। তখন আবার প্রশ্ন উঠল, সাদা সার্ট পরা ওটা কে যাচ্ছে। কাকে তোরা নিয়ে যাচ্ছিস? একজন সিপাহী জোরে বলে উঠল "একজন অফিসার যাচ্ছে, অফিসার।" ওরা বিশ্বাস করেনি। আরো জোরে শ্লোগান দেয়া শুরু করল। তখনই দেখলাম একটি স্ট্রেচার নিয়ে ৬/৭ জন সিপাহী খুব তাড়াতাড়ি পাশ দিয়ে উল্টো দিকে যাচ্ছে, বুঝলাম হয় কোন মৃতকে সরাচ্ছে, অথবা অনশনী বন্দিদের মধ্যে যাদের অবস্থা খারাপ তাদের সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। একসময় জেলগেটে পৌঁছালাম। জেলগেটে আলো দেখে বুঝতে পারলাম জেলের ভেতরের আলো ইচ্ছা করেই নিভিয়ে রাখা হয়েছিল। জেলগেটে দেখলাম, আরো অনেককে বদলির জন্য গেটে আনা হয়েছে। সাধারণ বন্দিরাই বেশি। শুনলাম বর্তমান ডিআইজি তার কর্মদক্ষতা প্রমাণ করার জন্য সবসময় এই পন্থা অবলম্বন করেন। কড়াকড়ি দেখিয়ে নিজের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করেন। এবারও সমস্যার সমাধান না করে নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু তাতে তো সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসে না। সমস্যার সমাধান হয় না। দেশে যখন যেমন সরকার থাকে সেই ধরনেরই সমাধান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এটিই বোধহয় নিয়ম। চোখের সামনেই দেখলাম, অতি সহজ ব্যাপারটাকে কত জটিল করে তোলা হলো। বিশৃঙ্খলা, উত্তেজনা এবং সরকারের অর্থ

www.pathagar.com

ব্যয় সবকিছুই হলো এক ব্যক্তির ভুল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। কিন্তু তাঁকে দোষ দিয়ে কি লাভ। তিনি যা করেছেন হয়তো সত্যি সত্যিই উপরওয়ালার নির্দেশেই করেছেন। ঢাকা জেলে এই ঘটনার কথা এবং বিশেষ করে আমাদের বদলি করার খবর অন্যান্য জেলখানায় পৌঁছাতে বেশিদিন সময় লাগেনি। মাসখানেকের মধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলে একই ধরনের দাবি তুলে হাজতি এবং কয়েদিরা অনশন ধর্মঘট করেছে। পটুয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, বাগেরহাট, নোয়াখালী, যশোর, টাঙ্গাইল এবং আরো অন্যান্য জেলে।

জেলগেটেও এক বিরাট কাণ্ড, এক একজন বন্দিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৮/১০ জন করে সিপাহী আর তার সাথে একজন সুবেদার এবং একজন ইন্সপেক্টর যাবে। সব দল তাদের বন্দিদের চিহ্নিত করল। জেলখানার একজন অফিসার ঘোষণা করলেন কোন্ বন্দি কোথায় যাবে। আমি আর ক্যাপ্টেন মুনীর যাব দিনাজপুর, কর্নেল শওকত রংপুর, অন্যদের কেউ ময়মনসিংহ, কেউ কুমিল্লা, কেউ বরিশাল। এর মধ্যে ক্যাপ্টেন মুনীরসহ বেশ কিছু বন্দিকে সন্ধ্যার আগেই বদলির কথা না বলেই জেলগেটে এনে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তাদের মালপত্র ভিতরেই থেকে গেল। তাদের ফেলে আসা জিনিস ভিতর থেকে আনতে সিপাহীরা দ্বিধা করে, ভিতরে যেতে ভয় পায়। এদিকে ইন্সপেক্টর সাহেব তাগাদা দিচ্ছেন ট্রেন ছেড়ে দেবে বলে। তার ওপর নানা রকমের আনুষ্ঠানিকতাও রয়েছে। জেলে ঢোকার সময় যে অর্থ জমা রেখেছিলাম সেটা ফেরত দেয়ার কথা। পেটিক্যাশ ক্লার্ক সাহেবকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। জেলার সাহেব জানালেন পথে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেকের জন্য ১০ টাকা ইন্সপেক্টরের কাছে দেয়া হয়েছে। শওকত সাহেবের জন্য ১৩ টাকা, তফাৎটা কেন সেকথাটা জিজ্ঞেস করার সময় বা পরিবেশ তখন ছিল না। প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগবে দিনাজপুর যেতে, ১০ টাকায় কি করে হবে সেটাও আর জিজ্ঞেস করিনি।

মুনীরের সব মালপত্র জেলগেটে এসে পৌঁছাল না। মুনীর ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্সপেক্টর সাহেব প্রায় জোর করেই মুনীরকে গাড়িতে উঠাল। আর আমাদের সকলের জমা টাকা ফেরত দেয়া হলো না। হাতে কড়া পরাতে এগিয়ে এলো সুবেদার, কর্নেল শওকত একটু মৃদু আপত্তি করলেন, বললেন আমরা তো আর পালিয়ে যাব না। ইন্সপেক্টর বললেন, হুকুম আছে উপায় নেই। গত ১৪ এবং ১৫ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর যে ৪০ জন রাজনৈতিক নেতাকে বন্দি করা হয়েছিল তাঁদের সকলকেই হাতে কড়া লাগানো হয়েছিল জেল বদলির সময়। ড. কামাল হোসেনকেও। বললেন, কর্নেল শওকত। আমি আর ইতস্তত না করে হাত বাড়িয়ে দিলাম কর্নেল শওকত বললেন, ক্যামেরাম্যান থাকলে হতো। হ্যাঁ, সেটা থাকত যদি দেশে গণতন্ত্র থাকত। দেশের মানুষকে দেখানো এবং জানানো যেত, খবরের কাগজে হাতে কড়া লাগানো ছবি বেরুলে মন্দ হতো না। ভালমন্দ দেশের মানুষ বিচার করত। আমার বিশ্বাস যে, আমার নির্বাচনী এলাকার জনগণ এটি দেখার পর নিশ্চয়ই পরবর্তী নির্বাচনে আরো বেশি ভোটে আমাকে জয়ী করতেন। রাজনীতিবিদদের হাতে কড়া লাগানোর সাধারণ প্রতিক্রিয়া সেটাই হয়ে থাকে। ১৯৭৭ সালে সরকার পতনের পর ইন্দিরা গান্ধীকে হাতে কড়া পরানোর ছবি জনমনে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।

www.pathagar.com

তবে এক হাতে কড়া লাগিয়ে দড়িটা কোন সিপাহী ধরে রাখল না। দড়ির পেঁচানো মোড়াটা আমাদের হাতেই দিয়ে দেয়া হলো। অন্য হাত মুক্ত থাকল কোন বাঁধন ছাড়াই। বাইরে দাঁড়ানো ছিল বিরাট ভ্যান। অন্য বন্দিদের সাথে হাত মিলিয়ে বিদায় নিয়ে সেটাতে গিয়ে উঠলাম। আমি, কর্নেল শওকত আর মুনীর। রংপুর পর্যন্ত একসাথে যাব। তারপর কর্নেল শওকত নেমে যাবেন, আমরা যাব দিনাজপুর। ভ্যানে পুলিশ ইন্সপেক্টর অসম্ভব গালাগালি করল জেল কর্তৃপক্ষকে। তাদের অকর্মণ্যতা এবং অদক্ষতার বিবরণ দেয়া শুরু করল। এস্কর্ট পার্টি কবে থেকে এসে বসেছিল অথচ জেল কর্তৃপক্ষ কিছুই ঠিক করে রাখেনি। আমাদের মালপত্র এবং জমা টাকার কথাও বলল। ভ্যানের ভেতর সারাক্ষণ এসব কথা শুনতে শুনতে বেশ তাড়াতাড়ি স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

কমলাপুর রেল স্টেশনের লাগেজ সেকশন দিয়ে আমাদের নামানো হলো। যত কম লোক আমাদের দেখে ততই বোধহয় কর্তৃপক্ষের জন্য ভাল। তবুও সবার হাতে কড়া দেখে ঔৎসুক্য নিয়ে অনেকেই আমাদের তাকিয়ে দেখে। দুয়েকজন চিনেছে, ট্রেনে ওঠার পর বুঝলাম বোধহয় আরো জানাজানি হয়েছে। ফার্স্টক্লাসের জানালার সামনে বেশ ভিড় জমে গেল। অনেকে এসে হাত মিলিয়ে গেল। রেল কর্মচারীদের মধ্যে দুয়েকজন যাঁরা খুবই পরিচিত তাঁরা ছুটে এলেন। কিন্তু সিপাহীরা ওঁদের আমাদের কাছে আসতে দিল না। একজনকে তবুও অনেকটা লুকিয়ে টেলিফোন নম্বরগুলো দিলাম আমাদের নিয়ে যাওয়ার কথা বাড়ির সবাইকে জানিয়ে দেবার জন্য। জেল কর্তৃপক্ষের এই সংবাদ জানিয়ে দেয়া উচিত ছিল। এতে গোপনীয়তা বা নিরাপত্তার কি প্রশ্ন জড়িত থাকতে পারে তা বুঝতে পারি না। তারা সেটা করবে না। যাই হোক এগারোটার দিকে ট্রেন ছেড়ে দিল। কয়েক ঘণ্টার জন্য নিজেদের মুক্ত বলে মনে হলো।

জানালা দিয়ে প্রায় সবকিছু একবারেই দেখে ফেলার প্রয়াস বৃদ্ধি পেল। কতদিন পর, মানুষজন, রাস্তাঘাট, গাড়িঘোড়া আর শহরের বাতি দেখছি। মাঝে মাঝে ভাল মনে হয়েছে, মাঝে মাঝে মন বিষণ্নতায় ভরে উঠেছে। অতীতের অনেক সুন্দর স্মৃতি মনে পড়েছে, আবার ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার দিনগুলোর কথা ভেবে মন ভারি হয়েছে। ঐ তো সেই রাস্তাটা পার হলাম যে রাস্তাটা দিয়ে রোজ বাড়ি থেকে চেম্বার আর চেম্বার থেকে বাড়িতে গিয়েছি। এক ঝলক ছোটকালের কথা মনে পড়ল। আমার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন এই ঢাকাতে কেটেছে। বিলেতের ছয় বছর ছাড়া বাকি পুরো জীবনটাই কেটেছে এই শহরে। আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই শহরও বড় হয়েছে, অনেক বড় হয়েছে এই শহর এখন।

মহাখালী পেরিয়ে বনানীর দিকে ট্রেন যখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে তখন আমান আর হাসনার কথা মনে পড়ল। আর সাথে সাথে চোখের পানিতে সবকিছু ঝাপসা হয়ে এলো। ওরা ততক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছে, জানেও না যে আমাকে ওরা নিয়ে চলেছে অনেক দূরে। ঢাকায় অন্তত সপ্তাহে একবার দেখা হতো, এখন আর কোনদিন সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ, অন্তত যতদিন দিনাজপুরে থাকি। আমান ওর মায়ের বুকে মুখ গুঁজে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু পাশের বিছানায় ও কাউকে ঘুমাতে দেয় না। ঐ বিছানায় বালিশটাও কাউকে

www.pathagar.com

ব্যবহার করতে দেয় না। পাশের বিছানা আর বালিশটা আমার, ওখানে সে আর কাউকে বসতেও দেয় না। জেলখানায় এলে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত আর চারদিকে দেখত। লোহার বড় বড় গেট, চারদিকে পুলিশ, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসে থাকতে হতো গেটের সেই ময়লা ঘরটাতে, অন্য সকলের মত। আমাকে ডাকতে গেছে ভেতর থেকে। তারপর আমি এলে যেন একটু নিশ্চিন্ত হতো। যাওয়ার আগে হাত ধরে হেঁচকা টেনে শুধু বলত "বাসায় চলো।" তারপর যখন বলেছি এখন না আব্বু, তখন হন হন করে মায়ের হাত ধরে জেলখানায় বড় ফটকের কোনের ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। পেছনে আর ফিরে তাকায়নি। হাসনা হয়তো জেগে আছে, ভাবছে আমি কবে মুক্তি পাব। পৃথিবীর সমস্ত দুশ্চিন্তা ওর ওপর চাপিয়ে রেখে আমি চলেছি দিনাজপুর।

www.pathagar.com

অধ্যায় ২

মুজিবের কারাগারে

১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে আমানের মত আর একজন আসত জেলখানায়, ঠিক একইভাবে, একই জায়গায় ওর মায়ের সাথে আমাকে দেখতে আসত। বয়স তখন ওর এক বছর হবে, মাত্র হাঁটা শুরু করেছে। জেলখানায় ঐ ঘরটাতে বলতে গেলে ও হাঁটা শিখেছে, তখন সপ্তাহে দুবার আসতে পারত। হ্যান্ডসাম ফুটফুটে ছেলে, অসম্ভব সুন্দর চোখ, বাপের মত লম্বা লম্বা পলক। আমাদের প্রথম সন্তান আর হাসনার নয়নের মণি। মায়ের প্রথম প্রসূত—আদরের ধন। নামও ছিল আসিফ অর্থাৎ ঝড়। হলি ফ্যামিলিতে ওর জন্ম হওয়ার পর মায়ের কাছে তাকে নেয়ার আগে বাচ্চাদের ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ওর দাদা মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আজান দিয়েছিলেন। আমরা ফাঁক দিয়ে তাঁকে দেখছিলাম। ওর দাদা সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন। আমার ছেলে হয়েছে তাই। তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধর। পশ্চিম জার্মানির রাষ্ট্রদূত এডউইন ইয়াংফ্রাইস বিরাট একটি বাক্স করে নানা জাতীয় শিশুখাদ্য, ফলের রস এনেছিল হাসপাতালে মা এবং ছেলেকে দেখতে। আরো কতজন এলো। হাসপাতালে ভিড় পড়ে গেল। আসিফের জন্য অনেক খেলনা, কাপড়চোপড় কেনা হয়েছিল। তার বয়সের তুলনায় প্রায় সবকিছুই ছিল বেশি বড়। দুবছর পর কি খেলবে, কি পরবে এসবও কেনা হয়ে গিয়েছিল। ১০ নভেম্বর ১৯৭৩ ছিল জন্মদিন, একই রাতে ২৭ বছর আগে ওর মায়েরও জন্ম হয়েছিল। একই রাত, কিন্তু তারিখ ১১ নভেম্বর।

দেখতে দেখতে বছর কেটে গেল প্রায়, ছমাসের সময় আমরা তাকে তার নানির কাছে রেখে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে আমেরিকায় গেলাম। প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরে এলাম। পশ্চিম দিক দিয়ে গিয়ে পূর্ব দিক থেকে ফিরে এলাম। কেনাকাটা বলতে যা বোঝায় সব আসিফের জন্যই করা হলো। ছ'সপ্তাহ ঘুরে জাপান, হংকং হয়ে ফিরে এসে দেখলাম ও আরো একটু বড় হয়েছে। তারপর ওর জন্মদিন এলো কিন্তু ওর দাদা তখন আর বেঁচে নেই। আমরা আমেরিকা থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরই মারা গেছেন। হংকং থেকে ঘিয়া রঙের যে দামি কাপড় এনেছিলাম তা দিয়ে সেরওয়ানি বানিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা গায়ে দিয়ে বাবা খুব খুশি হয়েছিলেন। যেদিন আমাকে সেটা দেখালেন,

www.pathagar.com

সেদিনই রাত্রে হাসপাতালে গেলেন, তিন চার দিন পর ১৯৭৪ সালের ৭ জুলাই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন ৮৬ বছর বয়সে। তিনি ছিলেন দেবতুল্য ব্যক্তি। আমার জীবনের সমস্ত অনুপ্রেরণা এবং আদর্শ ছিলেন তিনি।

আসিফের প্রথম জন্মদিনের মাস দেড়েক পর ২৮ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সরকার জরুরি আইন ঘোষণা করল। আমি তখন ছিলাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক। সেদিন ছিল শনিবার। দুপুরে এই ঘোষণা হওয়ার পর তিনটার দিকে গেলাম *ইত্তেফাক* অফিসে ঘোষণার একটা কপি আনার জন্য। জরুরি অবস্থা ঘোষণার তেমন কোন সামাজিক বা নিরপত্তামূলক কারণ ছিল না। একটি নির্বাচিত সরকার তখন ক্ষমতায়, শেখ মুজিবের মত জনপ্রিয় নেতৃত্বের অধীনে। অথচ পাকিস্তানী কায়দায় সব মৌলিক অধিকার রহিত করে দেয়া হলো কলমের খোঁচায়। তবে জরুরি আইন ঘোষণার মূল কারণ ছিল দেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা, ওটা প্রবর্তনের পথে বাধা বা প্রতিবাদের সুযোগ কমানোর জন্যই জরুরি আইন।

জরুরি আইন ঘোষণাকে আইনগতভাবে চ্যালেঞ্জ করা যায় কিনা সেটা পরীক্ষা করার জন্য বইপত্র নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছি। তখন জরুরি ঘোষণার সমস্ত ধারাগুলো বারবার রেডিওতে ঘোষণা করা হচ্ছে। রাতে এনায়েতুল্লাহ খান আর আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এলো। তাদের সাথেও এ বিষয়ে আলোচনা করলাম। লন্ডনের *ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকার পিটার গিল টেলিফোন করেছিল। তাকেও বললাম যে আমি জরুরি আইন ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছি। জানা ছিল না যে ততক্ষণে আমার বাড়ির চতুর্দিকে পুলিশের পাহারা বসেছে। ভোরবেলায় পুলিশ সুপার জব্বার সাহেব দরজায় বেল টিপলে দরজা খোলার পর আমার স্ত্রীকে জানালেন যে, তাঁরা আমার সাথে দেখা করতে চান। রাতেরবেলায় ঘরে ঢোকেনি, ব্রিটিশ আমল থেকে দেশের আইনে মানা আছে বলে। সন্ধ্যার পর কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না ভোর না হওয়া পর্যন্ত। আজকাল অবশ্য এগুলো আর কেউ মানে না। জব্বার সাহেব বললেন তিনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। এও বলেছিলেন, একেবারে উপরওয়ালার হুকুমে। টেলিফোন করে যোগাযোগ করতে; একটা ফয়সালা করারও পরামর্শ দিলেন এবং তৈরি হওয়ার জন্য সময় দিলেন অনেক।

ড. কামাল হোসেন আর ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলামকে খবরটা দিলাম। তাঁরা শুনে অবাক। তাঁরা প্রথম গেলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী সাহেবের বাসায়। তিনিও কিছু জানেন না। শুধু বিস্মিত হলেন। খুব ভাল মানুষ ছিলেন। আমার কথা শুনে আরো আশ্চর্য হলেন। তারপর ওরা যখন প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গেলেন, শেখ সাহেব জানালেন আমাকে কারাবন্দি করার নির্দেশ তিনি নিজেই দিয়েছেন। টেলিফোনে যখন তাঁরা এই খবরটা দিলেন তখন আর দেরি করিনি। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে পড়লাম জেলখানায় যাওয়ার জন্য।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য বিদেশ থেকে আইনজ্ঞ স্যার টমাস উইলিয়ামসকে আনার ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম। শেখ সাহেবের সাথে আমার তেমন কোন পরিচয় ছিল না। আওয়ামী লীগের সাথেও আমার কোন সম্পর্ক ছিল

www.pathagar.com

না। কিন্তু তাঁর ডিফেন্সের ব্যবস্থার সূচনা আমিই করেছিলাম। অনেক ঝুঁকি নিয়ে টমাস উইলিয়ামসকে এনে মামলার এবং জনমতের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছিল। ১১ মাস তাঁর মামলায় নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে নানা কিছু আয়োজন করেছি। তাঁর অবৈতনিক একান্ত সচিবের কাজ করেছি। গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর সাথে গিয়েছি তাঁকে সাহায্য করার জন্য। ১৯৭১ সালে যুদ্ধে যোগ দিয়েছি এবং যুদ্ধকালীন সরকারের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি। বাংলাদেশের প্রথম পোস্ট মাস্টার জেনারেল হিসেবে কাজ করেছি। বৈদেশিক প্রচারের সব আয়োজন করেছি। স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার থেকে মুজিবের জয়গান গেয়েছি।

শেখ মুজিবের সাথে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত আমার কোন ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। কিন্তু ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর পক্ষ সমর্থনের আয়োজন করার একটি মাত্রই উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালি জাতির প্রতীক হিসেবে তখন যে মানুষ ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন তাঁর জন্য যদি আমরা কিছু না করি, বিনা প্রতিরোধে যদি তাঁর ফাঁসি হয়ে যায়, ভবিষ্যতের বংশধরদের বা ইতিহাসকে কি বলে আমরা জবাব দেব। জাতির কাছে চিরদিনের জন্য অপরাধী থেকে যাব। এই অপরাধ-অনুভবতা থেকেই শেখ মুজিবের জন্য তখন নিজের উদ্যোগে সব আয়োজন করেছিলাম। ইতিাসের কাছে নিজের মনটা পরিষ্কার রাখার জন্য। সবে মাত্র তখন বিলেত থেকে ফিরেছি, আদর্শের অনুভূতি ছিল তখন তাজা এবং গভীর; দেশের প্রতি ছিল তখন এক অসম্ভব ভালবাসা।

কিন্তু সরকার চালাতে গেলে নাকি অনেক অপ্রিয় কাজও করতে হয়। সেখানে অতীতের কোন মূল্য নেই—ভবিষ্যতের কথা ভাবা হয় না, শুধু বর্তমানই সবকিছু। বর্তমানকে নিয়েই সব চিন্তা, দুশ্চিন্তা—আজকের দিনটা বাঁচার জন্যই সব প্রয়াস, প্রচেষ্টা। মাস ছয়েক আগে ১৬ জুলাই ১৯৭৪ শেখ সাহেব আমাকে অনেক কথা বলেছিলেন রাগ করে—এদেশের বুদ্ধিজীবীদের মেরুদণ্ডহীনতার কথা, জিজ্ঞেস করেছিলেন পাবনার কমিউনিস্ট নেতা আব্দুল মতিনের মামলা আমি কেন করি। টিপু বিশ্বাস, ওয়াহিদুর রহমানের জন্য আমার সহানুভূতি কেন থাকবে। শান্তি সেন, অরুণা সেন কে আমার? তাঁর দুর্দান্ত ব্যক্তিত্বের সামনে সাহস করে শুধু বলেছিলাম, পাকিস্তান সরকারের এক নম্বর শত্রু ছিলেন আপনি অথচ আমরা আপনার পক্ষ সমর্থন করে ডিফেন্স টিম তৈরি করেছিলাম, আর এখন স্বাধীন দেশে নিজেদের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য কিছু করতে পারব না? যাই হোক শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবের নির্দেশেই আমাকে গ্রেপ্তার হতে হলো।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের এসপি জব্বার সাহেব গাড়ি করে আমাকে নিয়ে গেলেন প্রথমে আমার চেম্বারে। সমস্ত ফাইলপত্র ঘাঁটলেন। যত রাজনৈতিক কর্মীর মামলা করেছি তাঁদের হদিস নিলেন। লিস্ট তৈরি করলেন। কোন ব্যারিস্টারের চেম্বার এভাবে পরীক্ষা করার নজির আমার জানা নেই। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় টেলিফোনে আড়িপাতা হয়েছিল, গাড়ি করে আমাকে সবসময় অনুসরণ করা হয়েছে, কিন্তু পুলিশ কোনদিন চেম্বারে ঢোকার সাহস করেনি। শেখ মুজিবকে ডিফেন্ড করার জন্য তো তখন আমাকে আটক করেনি?

www.pathagar.com

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এসব নিয়মকানুনের পরিবর্তন হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশ স্বাধীন হলে নাকি এসবই ঘটে। নাগরিকদের স্বাধীনতা কমে যায়। নাগরিক অধিকার লোপ পায়। ঔপনিবেশিক সরকারের চেয়ে জাতীয় সরকারগুলো বেশি নির্মম হয় এবং আইনের শাসনের প্রতি বেশি অবহেলা দেখায়। এসব জাতীয় সরকারের অধীনে আদর্শ এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে খুব দ্রুত। সমাজ হয়ে পড়ে মানদণ্ডহীন। যদিও এসব কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

যাই হোক আসিফ আসত মায়ের সাথে জেলগেটে, বুঝতে পারত না সবকিছু। তারপর সেই আসিফ আমাদের ভালবাসায় বড় হতে শুরু করল, আমরা গুলশান থেকে আমিনাবাদের ফ্ল্যাটে এসে উঠলাম ১৯৭৬ সালে। তারপর গেলাম হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ফেলোশীপে বই লেখার জন্য। ফিরে আসার পর আসিফের তৃতীয় জন্মদিনে যখন সন্ধ্যায় সবাই হৈ চৈ করছে তখন হাসনা হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে। একই জায়গায় প্রায় একই সময়ে একই সন্ধ্যায় আমানের জন্ম হলো তিন বছর পর। আর একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। টেলিফোনে খবর পেয়ে আসিফকে ওর বন্ধুদের সাথে রেখে গেলাম হাসপাতালে। হাসনাকে সবাই অভিনন্দন জানালো। গতবারের মত এবারও হাসনার কোন অসুবিধা হয়নি। একেবারে স্বাভাবিক ভাব, মাতৃত্বের গৌরবে ওকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল। মা এবং দুই পুত্রের জন্ম একই রাতে, আসিফ আর আমান ১০ নভেম্বর আর হাসনা ১১ তারিখে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩

কারাগারের অভ্যন্তরে: রাজ্জাক আর শাহাদাত গ্রামীণ জীবন আর জাতীয় উন্নয়ন

ততদিনে সামরিক আদালতে আমার সাজা হয়ে গেছে। মনে পড়ল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের রাজ্জাকের কথা। ভোর না হতেই চলে আসে আমার সেবা করতে। জেলে ওদের ফালতু বলে। এখনই সব বিছানাপত্র ঝেড়ে ঘর পরিষ্কার করে নাস্তা তৈরি করতে যাবে বড় চৌকায়। বয়স বাইশের মত হবে। সাজা হয়েছে বিশ বছরের, খুনের মামলা। সাজা হওয়ার আগে ৪ বছর জেল খেটেছে, ওটা ধরা হয়নি। সাজার পর বছর দেড়েক হয়েছে, আরো সাড়ে আঠারো বছর খাটতে হবে। খুব বেশি বছর সাজাপ্রাপ্ত ভাল আচার-ব্যবহারকারী কয়েদিদের আমাদের সেলে কাজ করতে দেয়া হয়। রাজ্জাকের জীবনের সাড়ে পাঁচ বছর কেটে গেছে। তার বাবা বৃদ্ধ, ছোট ছয় ভাইবোন। গৃহস্থালি এবং হালচাষ করার লোক ছিল সে একাই। তার জেলজীবন তার পরিবারকে পথে বসিয়েছে। সামান্য কিছু জমি ছিল, বিক্রি করে দেয়া হয়েছে ওর মামলার খরচ চালানোর জন্য। ও যতদিন বাইরে ছিল কোন রকমে সংসার একাই খেটে চালিয়ে নিত। এখন ওর ছোট ভাই একটু বড় হয়েছে কিন্তু নিজেদের আর জমি নেই। অন্যের জমিতে বদলা দেয় এবং বৃদ্ধ বাপ পথের ধারে বসে ছোটখাটো জিনিস বিক্রি করে। দিনে ৪/৫ টাকা আয় হয়।

জমির ফসল কাটা নিয়ে মারামারি। রাজ্জাকের মামাদের সাথে পাশের বাড়ির লোকদের লাঠি আর খন্তির আঘাতে একটি লোক মারা গেছে মাঠের ওপর। আরো অনেক লোক ছিল সেখানে। রাজ্জাক সেদিন গিয়েছিল নানার বাড়ি ১৪ মাইল দূরে। কাছে কিনারেও ছিল না। কিন্তু পরদিন বাড়ি ফেরার পর পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায়। আর সে বাড়ি ফেরেনি। যাদের লোক মারা গেছে তারা বাদীর নালিশে তার নাম দিয়ে দিয়েছিল। গ্রামের এ ধরনের ঘটনা ঘটলে যাদের সাথে শত্রুতা থাকে তাদের সকলের নাম ঢুকিয়ে দেয়া হয়। প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বা বিনিময়ে কিছু অর্থ আদায় করার জন্য। গ্রামের সকলেই জানত সেদিন রাজ্জাক উপস্থিত ছিল না। থানার দারোগা দশ হাজার টাকা চেয়েছিল। জোগাড় করতে পারেনি। তাই রাজ্জাক সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও আজ জেলে।

www.pathagar.com

সাজা হয়ে গেছে। এখন মিথ্যা বলে লাভও নেই। রাজ্জাক সত্যি কথাই বলেছে। রাজ্জাক নির্দোষ কিন্তু সাজা হয়েছে তার বিশ বছরের জন্য।

সেদিন দুপুরে একটি ছেলে আসল অন্য একটি ওয়ার্ড থেকে। সাজাপ্রাপ্ত যুবক, নাম শাহাদাত। নরসিংদী কলেজে ভর্তি হয়েছিল পড়ার জন্য, পাঁচ বছর জেলে থাকার পর, সাত বছরের সাজা হয়েছে মাস দুয়েক আগে। এই পাঁচ বছর গণ্য হবে না, অর্থাৎ আরো প্রায় সাত বছর জেলে থাকতে হবে। হাতে নিয়ে এসেছে লুকিয়ে তার বিচারের রায়। জেল আপিল লিখে দেয়ার জন্য। একটি ডাকাতির মামলায় শাহাদাতের সাজা হয়েছে। অভিযোগ হলো ওর দুজন বন্ধু ডাকাতি করেছে তাদের একজনের আত্মীয়ের বাড়িতে। শাহাদাত ছিল না ওদের সাথে কিন্তু বাদীপক্ষ তিনজনের নামই দিয়েছিল কারণ তারা একসাথে ঘোরাফেরা করত। শাহাদাতের বাপ নেই, গরিব এক চাচা তার কলেজে ভর্তির ফিস দিয়েছিল। জেলে আসার পর তারা আর খোঁজ নেয়নি। মামলায় ওর দুই বন্ধু বাদীপক্ষের সাথে টাকা-পয়সা দিয়ে আপোস করে থানায় দারোগাকে কিছু বকশিশ দিয়ে শুধু জামিনই পায়নি, ফাইনাল রিপোর্ট লিখিয়ে খালাস পেয়ে গেছে। বাদীপক্ষের সাক্ষী একজন শাহাদাতকে রাতের অন্ধকারে ডাকাতদের টর্চের আলোর এক ঝলকে চিনতে পেরেছিল। শাহাদাতের কোন উকিল ছিল না এবং কোর্ট নিজের থেকে কোন উকিল দেয়নি আইনি সাহায্য হিসেবে, তাই শাহাদাত দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।

আমার সাজা হওয়ার পর কর্তৃপক্ষকে বলেছিলাম যে জেলখানার শত শত নিরুপায় এবং গরিব বন্দিদের আইনগত ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য একটা কাজ দিতে। কিন্তু তারা রাজি হয়নি কেন তা জানি না। আমার সশ্রম কারাদণ্ড এইভাবে শ্রমের মাধ্যমে পালন করার সুযোগ হতো। দিনে দুঘণ্টা বসলে আমি অনেককে সাহায্য করতে পারতাম। অন্তত ৮০ ভাগ লোক জেলখানায় আছে কারণ তারা খুবই গরিব, উকিল রাখার সামর্থ্য নেই বা কোন আত্মীয়স্বজন নেই তদবির করার বা জানে না কি তাদের করা দরকার। সঠিক পরামর্শ দেয়ার লোক নেই। যেসব বন্দিদের সাজা হয়েছে অথচ কেউ নেই তদবির করার, উকিল রাখার সামর্থ্য নেই তারা উচ্চ আদালতে জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আপিল করতে পারে। সেটাই হলো জেল আপিল এবং জেলখানার একজন কর্মচারী এটি দেখাশুনা করে, দরকার হলে একটি গদমার্কা দরখাস্ত পাঠিয়ে দেয়। বেশিরভাগ আপিলগুলো হাইকোর্টে যায়। তদবির বা আইনজীবীর অভাবে এই জেল আপিলগুলো শুনানি হয় না বছরের পর বছর, তাই আসামিদের জামিনও হয় না। অনেক সময় জেল খেটে মুক্তি পাওয়ার পর আপিলের শুনানি হয়। এমনও হয় যে জেল খাটার পর আসামিকে নির্দোষ বলে খালাস দেয়া হয়। এর মধ্যে জেলখানায় যেহেতু জানাজানি হয়েছে যে আমি এরকম সাহায্য করতে চাই অনেক কয়েদি-বন্দি লুকিয়ে পুলিশের সাথে একটি বন্দোবস্ত করে আমার সাথে দেখা করতে আসে আইনগত সাহায্যের জন্য। শাহাদাতও এটি শুনেই এসেছে।

রাজ্জাক আর শাহাদাতের মত নিরপরাধ সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের সংখ্যা অনেক। অথচ কত সহজে তারা এই অন্যায়কে মেনে নিয়েছে। তারা রোজ কাজ করে, হাসে, আবার

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে শীতের বিকালে রোদে বসে গানও গায়। ওদের জীবন আর মনমানসিকতা সব পাল্টে গেছে। দুতিন মাস পরপর হয়তো রাজ্জাকের বুড়ো বাপ ময়মনসিংহ থেকে ছেলেকে দেখতে আসে তাও অর্থের অভাবে অনেক সময় পারে না। তারপরও রাজ্জাক তার দুঃখকে ভুলে গেছে বলে মনে হয়। তার মনের বিষাদ বাইরের চেহারায় ধরা পড়ে না। শাহাদাতের সঙ্গে গত পাঁচ বছর কেউ দেখাই করতে আসেনি। ম্যাট্রিক পাস লেখাপড়ায় নিশ্চয়ই ভাল হবে, না হলে এত গরিব হয়েও কলেজে পড়ার সুযোগ পাওয়ার কথা নয়। বৃত্তি পেয়েছে নিয়মিত, অথচ মনে হলো সেও বোধহয় সব ভুলে গেছে। তার মায়ের কথা, ছোট ছোট ভাইবোনদের কথা। তার মা কতটুকু বুড়িয়ে গেছে সে জানে না, তার ভাইবোনদের চেহারা নিশ্চয়ই বদলে গেছে, তাদের কার চেহারা কেমন হয়েছে কে জানে। তার ছোট ভাইটা নিশ্চয়ই এতদিনে বড় হয়েছে। নিশ্চয়ই এতদিনে চুরি করা শিখেছে, তা না হলে ওর মাকে আর ভাইবোনদের বাঁচিয়ে রেখেছে কি করে? শাহাদাতই বলল সেটা। অকপটে।

রাজ্জাক আর শাহাদাত এই সমাজের কাছ থেকে যে বিচার পেয়েছে তার সাথে নিজের অবস্থাটাকে তুলনা করে ওদের সাথে একাকার হয়ে গেলাম। আমার দুঃখটা একটু যেন হাল্কা হয়ে গেল। ওদেরকে নিজের খুব আপন মনে হলো। আমাদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই দেখে মনে কিছুটা আনন্দও বোধ করলাম। ওরাও নিরপরাধ, আমিও নিরপরাধ। আমি যে শুধু একাই নই, কথাটা ভাবতে ভাল লাগল। সমাজে নিরপরাধ লোকদের শাস্তি হয় একথাটা যে আগে জানতাম না তা নয়, কিন্তু আজ যেন এটিকে শুধু জানলাম না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম।

জমাদার এদিকে আসছে শুনে শাহাদাত কাগজপত্র আমার কাছে রেখে তাড়াতাড়ি চলে গেল। এক একটি এলাকার সব ওয়ার্ডার বা সিপাহীদের খবরদারি করে একজন জমাদার, তার ওপরে আছে সুবেদার, তার ওপরে ডেপুটি জেলার, জেলার, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট, সুপারিনটেনডেন্ট আর তার ওপরে ডিআইজি। আর আইজি বাইরে তাঁর নিজের অফিসে বসেন সারা দেশের জেলখানাগুলো তদারক করার জন্য। এরা সকলেই জেলখানায় অত্যন্ত ক্ষমতার অধিকারী।

এক একটি জেলখানা হলো এক একটি সাম্রাজ্য। এরা প্রত্যেকেই যে যার ক্ষেত্রে এবং কার্যপরিধিতে এক একজন সম্রাট। C. P. Snow-র Lord of the Flies। মাছিদের প্রভু অর্থাৎ ওদের দাপট খুব বেশি, কিছু অসহায়, অশিক্ষিত, গরিব মানুষদের ওপর। জেলখানায় সাধারণ বন্দিদের অবস্থা নর্দমার মাছিদের মতই। এটিই সেই প্রভুদের সাধারণ মানসিকতা। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। এদের মধ্যে সহানুভূতিশীল কিছু ভাল মানুষও আছে।

দেশের সামরিক শাসন জেলখানাকে স্পর্শ করতে পারেনি। বরং বাইরের হাওয়ায় ভেতরের শাসন, অনুশাসন, জুলুম, নির্যাতন একটু বাড়ে। আর তার সাথে বাড়ে দুর্নীতি এবং বেচাকেনার রেট। আমদানি ওয়ার্ডে মানুষ বেচাকেনার হিড়িকটা একটু বাড়ে, দামটাও একটু উঁচুতে হাঁকে। রোজ যে দুশ আড়াইশ নতুন বন্দি জেলখানার ফটক পেরিয়ে ভেতরে

www.pathagar.com

প্রবেশ করে, তাদের সংখ্যা সামরিকরা ক্ষমতায় আসার পর কিছুদিনের জন্য বেড়ে গিয়েছিল। এখন আবার আগের গড়প্রতি সংখ্যায় ফিরে গেছে। ফটকের ভেতরে প্রবেশের পর দ্বিতীয় ফটক পার না হওয়া পর্যন্ত তাদের ভাগ্য অপরিবর্তিত থাকে। তারপর গুণতি হওয়ার পর তারা জেলরাজ্যে প্রবেশ করে দ্বিতীয় লোহার ফটক যখন পার হয় তখন প্রায় রাত হয়ে আসে। এদের নিয়ে প্রথম রাতে যে ওয়ার্ডে রাখা হয় তারই নাম হলো আমদানি ওয়ার্ড। এদের মধ্যে নানা ধরনের লোক থাকে—গরিবও যেমন থাকে, আবার একটু অবস্থাপন্ন লোকজনও থাকে—যেমন দোকানদার-আড়তদার ব্যবসায়ী প্রকৃতির লোক। শেষোক্তদের জন্য একটু ভাল খাওয়া বা পরের দিন একটু ভাল জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করা যায়। সেটা ওদের চেহারা দেখে, তাকত বুঝে, রেইট ঠিক করে পাহারারা। অনেকটা নিলামের মত। ৭ দিন থেকে ১৫ দিনের জন্য ২শ' থেকে ৫ শত টাকা পর্যন্ত রেইট হয়—জমাদার সুবেদার তাদের শেয়ারটা বুঝে নেয় পাহারাদের কাছ থেকে।

অনেক বছরের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের মধ্য থেকেই পাহারা নিয়োগ করা হয়। কিন্তু পাহারাদের কোন বিশেষ ওয়ার্ডে কাজ পাওয়ার জন্য অনেক কাঠখড়ি পোড়াতে হয়। কদম আলীর সাজা হয়েছে বিশ বছরের। প্রায় সাত বছর পার হয়ে গেছে তার জেলখানায়। সে যখন পাহারা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করল তার বাহুতে লাগিয়ে দেয়া হলো কালো কাপড়ের একটি ব্যাজ। কিন্তু কদম আলী চালাক ছেলে। বাড়িতে পরিবার এবং ছেলেমেয়ে রয়েছে। সে জানত পাহারাদের নানা কাজে জেল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করে তাদের সাহায্য করার জন্য। বন্দি বা কয়েদির সাথে কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের প্রাথমিক সেতু হলো এই পাহারা সম্প্রদায়। প্রত্যেকটি খাতায়, ওয়ার্ডে, সেলে এবং জেলখানায় বিভিন্ন স্থানে এবং কাজে কয়েকজন পাহারা থাকে। কিন্তু পাহারাদের সব কাজই লোভনীয় নয়, আর সব পাহারাই লোভনীয় কাজের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না প্রাথমিক পুঁজির অভাবে। গুদামের কাজ, কেসটেবিল, গেটের কাজ, আমদানি ওয়ার্ডের কাজ আর সিআইডি অর্থাৎ গোয়েন্দার কাজ করার জন্য নিযুক্তি বেচাকেনা হয়। সুবেদার-জমাদার ঠিক করে কে কোথায় কাজ করবে। যেসব পাহারারা কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে পারে তারা এইসব কাজে নিযুক্তির জন্য গোপন নিলামে অংশ নেয়। এইজন্য পাহারারা দরকার হলে ধার করে, না হয় বউয়ের গয়না বিক্রি করে টাকার ব্যবস্থা করে। উপরোক্ত প্রত্যেকটা কাজে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করা যায়। জেলখানায় দুধরনের গুদাম রয়েছে। একটি হলো চাল-ডাল-তেল ইত্যাদি আর একটি হলো কাপড়, জুতা এবং অন্যান্য যত সরঞ্জাম। দুটো গুদামেই অনেক দুর্নীতি। হাজার হাজার টাকার কারবার হয় সেখানে প্রতিদিন। গুদামে এক মাস কাজ করার জন্য কদম আলী গোপনে পাঁচশ টাকায় তার নিযুক্তি কিনে নিয়েছিল এবং সেখানে সে বিভিন্ন জিনিসের হেরফের করে ১৮শ টাকা কামাই করেছিল। এর মধ্যে আরো তিনশ টাকা হাতছাড়া করতে হয়েছে সুবেদার-জমাদারদের জন্য। মুনাফা হয়েছে মাসে মোট ১ হাজার টাকা। এখন কদম আলী আমদানি ওয়ার্ডে কাজ নিয়েছে ১২শ টাকা খরচ

www.pathagar.com

করে। তার আয় মাসে দুহাজারের বেশি। সে কয় মাস যাবৎ প্রতি মাসে তার পরিবারের কাছে সাংসারিক খরচ বাবদ এক থেকে দেড় হাজার টাকা পাঠিয়েছে। এরকম লোভনীয় নিযুক্তি যারাই বেচাকেনা করতে পেরেছে তারা প্রতি মাসে গড়ে পাঁচ সাতশ টাকা জেলখানায় বসে বাড়িতে পাঠাতে পারে। অথচ এরা বাইরে থাকলে এত টাকা অত সহজে আয় করতে পারত না। এরকম অনেক কাজে এবং ক্ষেত্রে জেলখানায় বড় ছোট সকলের একটা আয়ের ব্যবস্থা আছে। অফিসার থেকে শুরু করে পাহারা, এমনকি কিছু কিছু সাধারণ ভাগ্যবান কয়েদি পর্যন্ত এর ভাগ পায়।

গেটের পাহারাদারদের মাধ্যমে কর্মচারীরা অনেক অর্থ উপার্জন করে। সাধারণ বন্দিদের সাথে পনের দিন বা এক মাস পর তাদের পরিবার-পরিজনদের সাথে সাক্ষাতের তারিখ থাকে। এই দিনে হয় প্রচণ্ড ভিড়, আর দেখা করার জায়গা খুব ছোট অথচ দুতিনশ বন্দির দেখা হয়তো একদিনেই আসছে। কারণ সাক্ষাতের জন্য সপ্তাহে তিনটা নির্দিষ্ট দিন রয়েছে। সেখানে প্রতি দশ মিনিটের জন্য একটা রেইট ধার্য করা আছে। যারা আগে টাকা দেবে তাদের দেখা আগে হবে। এদের মধ্যে যারা একটু অবস্থাপন্ন তাদের প্রধান ফটকেই দেখা করার ব্যবস্থা করা সম্ভব।

কেস টেবিল হলো জেলখানার মূল কেন্দ্র। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের জন্য বন্দি কয়েদিদের এটিই হলো ভূতযজ্ঞ। অভিযোগ, শাস্তি, বদলি, মার্কা এখানেই নির্ধারিত হয়। এখানে একজন বন্দির জীবনকে দুর্বিষহ করে দেয়া যেতে পারে। সাধারণ কয়েদিদের বিভিন্ন কাজের হিসাব নিকাশ হয় এখানে। জলভরি এবং ঝাড়ুর কাজ হলো সবচেয়ে কষ্টকর এবং শাস্তিমূলক। তিনতলার ওপর সারাদিন বালতির পর বালতি পানি ওঠানো আর জেলখানার মলমূত্র পরিষ্কার করা, ঝাড়ু দেয়া খুবই বাজে এবং খাটুনির কাজ।

জেলখানার হাসপাতাল একটি অন্য জগৎ। শুনেছি এখানকার ওষুধ বেশিরভাগ জেলখানার রোগীদের ভাগ্যে জোটে না। আসার আগেই বাইরে বিক্রি হয়ে যায়। কথাটা কতটুকু সত্য জানি না। বন্দিদের মধ্যে একটু টাকা-পয়সা যাদের আছে তারা হাসপাতালে থাকে। কুমিল্লায় প্রতি বেডের রেট ২০০ টাকা, ঢাকায় ৩০০ টাকা আর সাত দিনের কিস্তিতে চার ছটাক মুরগির টুকরার জন্য জনপ্রতি ১৫ থেকে ২০ টাকা। হাসপাতালে না গিয়েও অনেকে হাসপাতাল থেকে খাওয়া আনার ব্যবস্থা করতে পারে। সেটার জন্য বন্দির নিজের টিকিটে ডাক্তার দিয়ে লিখিয়ে নিতে হয়, মাসিক একটি নির্দিষ্ট হারের পরিবর্তে। আইনত বেশিরভাগ কয়েদি এমনিতেই স্বাস্থ্যগত কারণে অতিরিক্ত খাদ্য পাওয়ার অধিকার রাখে। যারা আর একটু বেশি অর্থবান এবং উদ্যোগী তারা বাইরে বড় হাসপাতালে যাওয়ার সুযোগ করে নিতে পারে। কিন্তু রেইটটা একটু হাই।

জেলখানায় প্রায় সবকিছুই বেচাকেনা হয়। গাঁজা, সিদ্ধি, এমনকি মদও। যদি কেউ চায় মহিলা ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা জানি না তবে জেলগেটের অফিসারদের নিষিদ্ধ ঘরে স্ত্রীর সাথে আলাদা দেখার ব্যবস্থা করা যায়। হাসপাতালের বাইরে চিকিৎসার নাম করে বাড়িতে গিয়ে দিন কাটিয়ে আসা যায়। চকবাজারের মোরগপোলাও খাওয়া যায়। পিজি

www.pathagar.com

হাসপাতালে সিটের ব্যবস্থা করা যায়। দিনে বা রাত্রে শহরের যে কোন জায়গায় চিঠিপত্র পাঠানো যায়। বালিশ, মশারি, কম্বল এবং একটু ভালভাবে থাকার ব্যবস্থাও বন্দিরা করে নিতে পারে। মার্কা এবং সাজার রেমিশন অতিরিক্ত পাওয়ার ব্যবস্থা নানাভাবে করা যায়, এমনকি যৌন ক্ষুধা মেটানোর জন্য বাচ্চা ছেলেরও ব্যবস্থা করা যায়। জেলখানায় ওদের সংখ্যা বেশ। কিন্তু সবকিছুরই একটা রেইট আছে। নজরানা দিতে পারলে সহযোগিতার অভাব নেই। এসব ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য হাত সবসময় প্রসারিত থাকে।

কিন্তু জেলখানার ৮০ থেকে ৯০ ভাগ বন্দি একেবারে অসহায়। যে মোটা, ঠাণ্ডা, বড় আটা রুটি দেয়া হয় তা মুখে দেয়া যায় না। দুবেলা রুটি, একবেলা ভাত। আর ডাল হয় ভণ্ড জাতীয় একপদের তরকারি। রাতের খাওয়া বিকালে খেতে হয়। মাথাপিছু একছটাক মাছ বা মাংস যা তাদের পাওয়ার কথা সেটা ওরা চোখে দেখে না প্রায়ই, হিসেবের খাতায় যদিও বড় করে দেখানো হয়। রোগ এবং পুষ্টিহীনতা ব্যাপক। নোংরা এবং দুর্গন্ধময় পরিবেশ। মেঝেতে একটি কম্বল বিছিয়ে ঘুমায়। বালিশ নেই, মশারি নেই। অসুখ হলে ডাক্তার আসে না, ডাক্তার আসলে ওষুধ আসে না। ওদের পরিবার আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিয়ে যায়। কারণ ওদের কেউ নেই। এদের অনেকে তাদের পরিবার এবং বাইরের জগতের সাথে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বন্দিদের অন্য জেলে বদলি করে দিলে ওরা আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ওদের পরিবারকে কেউ আর খবর দেয় না সে কোথায় গেছে। এদের মনের মধ্যে এক বিরাট ভয়, আতঙ্ক এবং আশঙ্কা প্রসার লাভ করে। বেশিদিন জেলে থাকলে বন্দিদের একটি ভিন্ন মানিসকতা জন্মলাভ করে। প্রতিবাদ এবং প্রতিহিংসার ছাপ অনেকের চেহারায় ফুটে ওঠে। অনেকে আবার প্রায় পাগল হওয়ার কিনারায় গিয়ে পৌঁছায়। এদের ভেতরকার মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলোর কথা কেউ একটু সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে না। ওরাও তো মানুষ আর নিঃসন্দেহে বেশিরভাগ বন্দিই হলো নির্দোষ। এরা জেলে আছে তার প্রধান কারণ হলো তারা নিতান্তই গরিব এবং এদের জন্য তদবির করার কেউ নেই। এদের মধ্যে অনেকেই উকিল রেখে মামলা পরিচালনা করার সামর্থ্য রাখে না। বন্দিদের মধ্যে অনেক ভাল লোকও আছে, ওদের মধ্যে সরলতা এবং সহমর্মিতা আমাকে অনেক সময় মুগ্ধ করেছে। আমার বিশ্বাস যে, জেলখানার অবস্থা এত খারাপ হওয়ার কথা নয়। সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করে সেটাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করেও অবস্থার অনেক উন্নতি করা সম্ভব। কিন্তু দুর্নীতির চোরাপথগুলো বন্ধ করবে কে? শাসকদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাবে কে?

জেলখানা রাখার দার্শনিক ভিত্তি হলো মানুষকে সংশোধন করা যাতে তার মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কমে যায়। সে যেন আবার সুবোধ নাগরিক হিসেবে সমাজে ফিরে এসে একটি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। বিষয়টা মানবিক—কারণ সমস্যাটাও মূলত মানবিক। গোলমাল হয়ে গেছে এই জায়গাতেই। শাসনকর্তাদের মানসিকতা হচ্ছে অনেকটা উল্টো। যার ফলে সুফল কুফলে পরিণত হয়েছে। জেলখানাগুলোই আজ সমাজে চোর,

www.pathagar.com

ডাকাত এবং নানা ধরনের অপরাধ সৃষ্টির প্রথম এবং প্রধান কারখানায় পরিণত হয়েছে। এখানে যারা চোর নয় তারা চোর হয়ে বের হয়, যারা ডাকাত তারা ডাকাতদলের সর্দার হয়ে বের হয়। কিশোর ছেলেরা জওয়ান হয়ে বের হয়। অপরাধ করার নতুন প্রশিক্ষণ নিয়ে বছরের পর বছর বিচারাধীন থেকে বা নিরপরাধ হয়েও বন্দিজীবনযাপন করে তাদের দৈহিক এবং মানসিক অবস্থার একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা বা শক্তি তখন তারা অনেকটা হারিয়ে ফেলে। এর জন্য জেল কর্তৃপক্ষকে শুধু দায়ী করা খুব অন্যায় হবে। এটির জন্য গোটা সমাজ দায়ী।

গ্রামীণ জীবন আর জাতীয় উন্নয়ন

তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। পূর্ব দিকের আকাশকে রঙ মাখিয়ে সূর্য বাংলাদেশের আকাশে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখনও যেন একটু কুয়াশার ভাব। কাচের জানালার ফাঁক দিয়ে কাছের জিনিসগুলো খুব দ্রুত পেছনের দিকে চলে যাচ্ছিল আর দূরের দিগন্ত যেন ঘুরে ঘুরে কাছে আসছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের থামগুলো খুব কাছে এসে আবার দ্রুত দূরে চলে যাচ্ছে। বাইরে, দূরে মাঠের পর মাঠ আর ধানক্ষেতের সারি। মনে হয়েছে কেউ যেন খুব সুন্দর একটি সবুজ মখমলের চাদর দিয়ে সারা দেশটাকে ঢেকে রেখেছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। রেলগাড়িটা ধানক্ষেতগুলোর আরো কাছে চলে আসাতে জমির আইলগুলো দেখা গেল। অসংখ্য আইল সুবিস্তীর্ণ ভূমিকে ক্ষতবিক্ষত করে রেখেছে। দুয়েকটি খণ্ড খণ্ড জমিতে এক আধজন কৃষক বা তাদের ছেলেমেয়েরা মাঠে এসে পৌঁছেছে। দুয়েকজন গৃহবধূও স্বামীকে সাহায্য করার জন্য টুকরি হাতে আইল ধরে হেঁটে চলেছে। কিছুক্ষণ পরপরই ডোবা বা পুকুরের দৃশ্য এসে সামনে পড়ছে। এই ডোবা-পুকুরগুলো ময়লা এবং নোংরা। ভোরবেলার স্নিগ্ধতাকে যেন কিছুটা কলুষিত করে দেয়। ঐ ডোবা পুকুরগুলোর এক কোণে নুয়ে পড়া গাছের ঝোপের আড়ালে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা পায়খানা। আর একপাশে বাঁধানো ঘাট, বাড়ির সবাই মিলে, শিশু, বৃদ্ধ ও বধূরা হাতমুখ ধুচ্ছে, কুলি করছে, গোসল করছে। শাড়ি পরা দুটো ছোট্ট মেয়ে আর একপাশে তাদের কলসি দিয়ে প্রথমে পানির ওপরের অংশটাকে নেড়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে কলসিগুলোকে ভরে নিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল। খাওয়ার জন্য পানি নিয়ে গেল ওরা।

ট্রেনটা যে হঠাৎ কখন থেমে গেছে টের পাইনি। বাইরের দৃশ্যগুলো আমার মনটাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অনেক দিন পর ওগুলো আবার দেখছিলাম। কিন্তু ট্রেনটা থেমে আছে কোন স্টেশন ছাড়াই। বেশ কিছুলোক নামছে দেখলাম। কিছু মালপত্রও নামছে। ট্রেনের ছাদের ওপর থেকে অনেক কিছু নিচে ফেলা হচ্ছে। বেশিরভাগ হলো লাকড়ি আর ছালার বস্তা। রেল লাইনের ধারে ঐ পুকুরটার একটু দূরে গ্রামের স্কুলটা দেখা যাচ্ছে। কিছু অংশ পাকা কিন্তু ছাদ এখনো হয়নি। বাইরের দেয়ালে এখনো আস্তর দেয়নি। ওপরের কার্নিশে কিছু গাছ পালা জন্মেছে। বোঝা যায় অনেক দিন যাবৎ কাজটা অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। স্কুলের বাকি অংশটার চারদিকে বেড়া দেয়া আর ওপরে

www.pathagar.com

টিন। ছাদের কিছু অংশের টিন নেই বলে মনে হলো। হয়তো ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। স্কুলের সামনে ছোট্ট একটি মাঠ। মাঠের দুই মাথায় গোলপোস্ট লাগানো আছে। একপাশে দুটো নারিকেল গাছ আর তার পাশেই খুব লম্বা দুটো তাল গাছ। আর একধারে বাঁশের একটি মাচার ঘর রয়েছে। উঁচু করে বাঁধানো, নামাজ পড়ার জন্য। পাশের ঐ পুকুরটাকে নানা কাজে ব্যবহার করা হয় বোঝাই যাচ্ছে। মলমূত্র, স্খালন, হাতমুখ ধোয়া, গোসল করা, খাওয়া এবং নামাজের ওজু করা সবই হচ্ছে। রেল লাইনের এত ধারে, সভ্যতার এত কাছে, কিন্তু তবুও কত দূরে ওরা রয়েছে। এই পুকুরে গোসল করা, এই স্কুলে লেখাপড়া করা ছেলেরাই শহরে যখন যায়, চাকরি নেয় তখন বোধহয় এসব ভুলে যায়। ভুলে যাওয়ারই তো কথা, এই পরিবেশে কে আবার ফিরে আসতে চাইবে। কারো জীবনের কামনাই তো সেটা হতে পারে না। ভাল পরিবেশ থেকে একটি খারাপ পরিবেশে ফিরে যাওয়া? গ্রামের ধানক্ষেতের সোনালী দৃশ্য, মুক্ত আকাশ আর নির্মল বাতাসই তো জীবনের সবকিছু নয়। জীবনের আসল চ্যালেঞ্জ হলো বেঁচে থাকা, জীবনযাত্রার মান বাড়ানো, আজকের চেয়ে আগামীকালকে আরো সুন্দর করে তৈরি করা, আরো বেশি সুযোগ-সুবিধা খুঁজে বের করা, যা নেই তা অর্জন করা। অন্ধকারের চেয়ে আলোকে কে না বেশি পছন্দ করে? হুইসেল বাজিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটা আবার ছেড়ে দিল।

কিন্তু জীবনের এই শাশ্বত কামনার নিম্নতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য বোধহয় আদর্শগ্রামের কথা বলা হয়, মানুষ গ্রামেই যাতে জীবনধারণ করার সুযোগ-সুবিধা পায়। শহরে যেন সবাইকে ছুটে যেতে না হয়। প্রতিটি গ্রামকে আদর্শগ্রামে পরিণত করার সঙ্কল্প এমন কোন সরকার নেই যারা ব্যক্ত করেনি। আইয়ুব খান, শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান আর এখন জেনারেল এরশাদ। কিন্তু বাস্তবে কি ঘটেছে সেটা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে। যদিও অনেক গ্রামেই আগের তুলনায় সুযোগ-সুবিধা বেশ বেড়েছে; কিছু রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, এমনকি বিদ্যুৎ পর্যন্ত গেছে, কিন্তু তবুও গ্রামীণ জীবনের হয়েছে অবর্ণনীয় অবক্ষয়। এমনকি আগেকার দিনের, ২০/২৫ বছর আগেও, গ্রামে যে সুখশান্তি এবং মানবিক আদর্শের ছাপ পাওয়া যেত সেগুলো এখন আর দেখা যায় না, ক্রমশ সেগুলো লোপ পেতে চলেছে। ক্রমেই সেসবের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। এর কয়েকটি মূল কারণ রয়েছে। (১) আগেরকার দিনে গ্রামে অনেক আদর্শবান নিবেদিতপ্রাণ বসবাস করতেন। তারা গ্রামকে আঁকড়ে ধরে রাখতেন। তাঁরাই ছিলেন গ্রামের অনুপ্রেরণা। ওঁদের আদর্শে যুবকরা অনুপ্রাণিত হতো। আদর্শ সৃষ্টি হতো। এর পুরোধারে থাকত স্কুলের মাস্টাররা, পণ্ডিতরা, কিছু সংবেদনশীল জমিদার, সমাজকর্মী আর রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা। আগে শহরে চাকরি করা শিক্ষিত মানুষরা গ্রামের উন্নয়নে অংশ নিত এবং অবসর গ্রহণ করার পর গ্রামে গিয়ে বাকি জীবনযাপন করত। নানা রকম সামাজিক কাজে নিজেদের জড়াতো। এখন সেটাও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। পুরোনো এই সামাজিক অবকাঠামোটা ভেঙে গেছে অর্থনৈতিক সংঘাতের কারণে। গ্রামে এখন আদর্শ ব্যক্তির অভাব ঘটেছে। যাঁরা আছেন তাঁরা পিছিয়ে পড়েছেন বা হারিয়ে গেছেন। জনসংখ্যা এবং বর্ধিত চাহিদার তুলনায় তাঁদের সংখ্যা কমে গেছে। মাস্টাররা

www.pathagar.com

এখন আদর্শ টিকিয়ে রাখার চেয়ে নিজেদের রুটি রুজি জোগাড় করার কাজে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সমাজকর্মীরা টাউটে পরিণত হয়েছে আর রাজনৈতিক কর্মীরা ক্ষমতায় যখন থাকে তখন দেখায় দাপট আর অন্য সময় থাকে নির্জীব। রাজনৈতিক কর্মীরা যে মূলত সমাজকর্মী তা তারা ভুলে যেতে বসেছে। এখনো গ্রামে ভাল লোক যে নেই তা নয় কিন্তু তাদের কদর কমে গেছে এবং এক রকমের বৈরী প্রতিযোগিতায় তাঁরা হেরে যাচ্ছেন। (২) এখন গ্রামদেশে সরকারের সম্পর্ক এবং নিয়ন্ত্রণ বেড়ে যাওয়ায় থানার সিও, ওসি আর আমলাতন্ত্রের লোকজনের গুরুত্ব এবং আকর্ষণ অনেক বেড়ে গেছে। এখন কোন সমস্যা দেখা দিলে তারা আর নিজেরা এটি সমাধান করার চেষ্টা করে না, তারা ছুটে যায় থানা সদরে। থানার সিও আর ওসিরা অনেকটা গ্রামদেশের আদর্শ বা অনুপ্রেরণা হওয়ার পদ গ্রহণ করেছে। কিন্তু কোন সরকারি কর্মচারীর জন্য সেই আদর্শ পুরুষের পদ পূরণ করা সম্ভব নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের কর্মকাণ্ড এবং সীমাবদ্ধতা গ্রামদেশের মানুষের হতাশাই বাড়িয়েছে। সরকারের কাছ থেকে তারা অনেক কিছু পাওয়ার আশা শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না পায় আশানুরূপ সাহায্য, আর না পায় কোন আদর্শগত অনুপ্রেরণা। সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়াতে তাদের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব দেখা দিয়েছে। সরকারের খয়রাতি আদর্শ তাদের আর অনুপ্রাণিত করতে পারে না। (৩) একদিকে যেমন গ্রামদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদার পরিবর্তন ঘটেছে অন্যদিকে সাধারণ মানুষের একটি অংশে দারিদ্র্য অনেক বেড়ে গেছে। ২৫/৩০ বছর আগেও গ্রামে যে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল সেটা এখন নেই। ভূমিহীন এবং বেকার কৃষকের সংখ্যা বেড়েছে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে এবং আগেকার সেই স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কাঠামোটা ভেঙে গেছে। তাই গ্রামদেশের একটা বিরাট অংশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এদেরই চাপে সমাজের ওপর যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগত কারণেই গ্রামীণ অর্থনীতিকে ক্রমেই অসাড় করে তুলেছে।

গ্রামে শিক্ষিত বেকার যুবকের সংখ্যা বেড়ে গেছে অনেক। এরা আর ক্ষেতে খামারে কাজ করতে চায় না, এরা বাড়ি থেকে ধান বিক্রি বা জমি বিক্রি বা চুরি করে টাকা যোগাড় করে শহরে যায় চাকরির সন্ধানে। যতদিন টাকা না ফুরায় শহরে থাকে, তারপর গ্রামে ফিরে আসে নানা রকমের হতাসা, হিংসা, প্রতিহিংসার প্রতিক্রিয়া সাথে নিয়ে। এরা গ্রামেও আর কোন আদর্শ খুঁজে পায় না। এদের বেশিরভাগই তখন হয় বিপথগামী এবং উচ্ছৃঙ্খল। চুরি, লুট এবং অন্যান্য অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়, অনেক সময় রাজনৈতিক ছত্র ছায়ায়। নির্বাচনের সময় ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো এদের আর কোন কর্মসূচি দিতে পারে না। শহর আর গ্রামের নানা রকমের তফাৎটা এরাই গ্রামদেশের মানুষকে অবহিত করে। গ্রামে থাকার আকর্ষণ তাতে আরো কমে যায়। সৃষ্টি করে আরো হতাশা। গ্রামের বেকার যুবকরা যখন ঢাকায় আসে চাকরির খোঁজে তখন তারা দেখে রঙিন টেলিভিশন, ঝকঝকে প্রশস্ত পিচঢালা রাস্তা, বড় বড় অট্টালিকা, সোনারগাঁও হোটেল, জিয়া বিমানবন্দর, ব্যস্তমুখর শহরের লাল-হলুদ গাড়ির বহর, রঙিন বাতি, আরো কত কিছু। তাদের কাছে

www.pathagar.com

নিজেদের গ্রামকে তখন ভিন্ন এক দেশ মনে হয়। এই cultural shock তাদেরকে গ্রামবিমুখ করে তোলে। (৪) শহরের দ্রুত উন্নয়নের তুলনায় গ্রামদেশের উন্নতি হয়েছে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৩ ভাগও গ্রামদেশের মানুষের দুয়ারে গিয়ে পৌঁছায় না বলে ডক্টর আবদুল্লাহ ফারুক তাঁর বইতে (Changes in the Ecomomy of Bangladesh) লিখেছেন। শহর এবং গ্রামের মধ্যে জাতীয় সম্পদের এই অসম বণ্টন আজকের গ্রামদেশে এরকম করুণ অবস্থার জন্য আর একটি অন্যতম কারণ। এই ফারাকের কারণে গ্রামদেশের মানুষের মধ্যে হতাশা আরো বেড়েছে, শহরের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্রামে থাকার আকর্ষণ কমে গেছে। (৫) গ্রামদেশকে সমৃদ্ধ করার নামে দিন দিন নিঃশেষ করা হচ্ছে। গ্রামের সমস্ত উদ্বৃত্ত সম্পদই শহরের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। হাটে, বাজারে, ব্যাংকের অজস্র শাখাগুলোর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা প্রতিদিন শহরের একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর কাজে জমা হচ্ছে। এখানকার উদ্বৃত্ত ফসলও চলে যায় শহরে বা সরকারের কাছে তাদের সংগ্রহ অভিযানের মাধ্যমে। এখানকার মানুষই যায় শহরের কলকারখানায় শ্রম দিতে। যদিও প্রতিটি সরকারই এসে গ্রামের উন্নয়নের কথা বলে এবং অনেক কিছু করার পরিকল্পনাও নেয় কিন্তু আসলে গ্রামের সম্পদ শহরে পাচার হয় নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তার পরিবর্তে গ্রামদেশ যা পায় তা অতি নগণ্য। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে ধনী হয় আরো বিত্তশালী আর গরিব হয় আরো বিত্তহীন এবং এর প্রতিক্রিয়া থেকে গ্রামদেশকে রক্ষা করার কোন সহজ উপায় নজরে পড়ে না। (৬) দেশের জাতীয় পর্যায়ে মূল্যবোধের যে চরম অবক্ষয় ঘটেছে তার প্রতিফলন থেকে গ্রামদেশকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন আর শহর আর গ্রামের মধ্যে উন্নত যোগাযোগের কারণে শহর আর এখন দূরে নয়। জাতীয় নেতারা কিভাবে থাকে, শহরের মানুষরা কোন্ আদর্শ অনুসরণ করে এসবগুলোই গ্রামের লোকেরা সহজে জেনে যায়। ঢাকার বড় বড় রাস্তা, দালান, কারখানা, আর নিওন লাইটের কথা গ্রামের যুবকদের কাছে অপরিচিত নয়। রাজধানীর মানুষের আদর্শহীনতা, মূল্যবোধহীনতা, সুযোগসন্ধানী মনোবৃত্তি এবং দুর্নীতিপরায়ণতা এখন আর গ্রামের মানুষের কাছে অজ্ঞাত নয়। তারা সবই জানে। ভোট দেয়ার চারমাস যেতে না যেতে কিভাবে তাদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, এর আগে নির্বাচিত দুজন রাষ্ট্রনায়ককে কিভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে— এসবও তারা শুনেছে। এই সবকিছু বিবেচনা করলে গ্রামদেশের লোকের মধ্যে আদর্শবান মানুষ খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আদর্শ মানুষ ছাড়া কোন গ্রামই আদর্শগ্রাম হতে পারে না।

যদিও সরকার যখন আদর্শগ্রাম তৈরি করার কথা বলেন তাঁরা মূলত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বলেন। অর্থাৎ গ্রাম হবে স্বনির্ভর। সেখানে খাওয়ার পানি থাকবে, বিদ্যুৎ থাকবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে, কোন মানুষ বেকার থাকবে না, কেউ ভিক্ষা করবে না আর তারা এত ফসল উৎপাদন করবে যে সে গ্রামের আর কোন অভাব থাকবে না।

www.pathagar.com

সেই গ্রামে স্কুল কলেজ ঠিকমত চলবে, মানুষ মানুষের মত বাঁচবে। মানুষের সাথে মানুষের একটি সমষ্টিগত মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কিন্তু কি জন্য কোন সরকারই আদর্শগ্রাম সৃষ্টি করতে পারেনি তার কয়েকটা কারণ ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রধান ভুল সব সরকারই যেটা করেছে সেটা হলো এই ধরনের কোন সমষ্টিগত কাজই (১) সংগঠন এবং নেতৃত্ব ছাড়া অর্জন করা সম্ভব হয় না। (২) দ্বিতীয়ত, আদর্শগ্রাম তৈরি করার কোন পরিকল্পনা একটি জাতীয় পরিকল্পনার সামাজিক-অর্থনৈতিক মূল নীতির অংশ হতে হবে। এটিকে আলাদাভাবে দেখলে চলবে না। এপর্যন্ত সকলে এটিকে একটি শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করেছে সস্তা প্রচার এবং বাহবা পাওয়ার জন্য। অর্থাৎ এটিকে কার্যকরী করার জন্য একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিকদর্শন থাকতে হবে। এর জন্য একটি পদ্ধতি আছে সমাজতান্ত্রিক, আর একটি আছে বাজারজাত অর্থনীতি বা গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী পদ্ধতি। (৩) তৃতীয়ত, গ্রাম এবং শহরকে পৃথকভাবে দেখার মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ জাতীয় মূল্যবোধ শহরে এক রকম হবে আর গ্রামে আর এক রকম হবে সেটা চলবে না। গ্রামের মানুষ আদর্শবান হবে আর শহরের লোকেরা চরিত্রহীন হবে, শহরে দুর্নীতি চলবে কিন্তু গ্রামে চলবে না এই ধারণা পোষণ করলে কাজ হবে না। অর্থাৎ একটি জাতীয় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির দরকার পড়বে দেশের উন্নতি আনতে হলে। অন্তত তাঁদের কাছ থেকে, যাঁরা ক্ষমতা ভোগ করেন—কখনো রাজনীতিবিদরা আর কখনো সামরিক-বেসামরিক আমলারা—যাঁরা সবসময়ই ক্ষমতা ভোগ করেন এই মানবিক মূল্যবোধটা শাসকদের মধ্যে কতটুকু আছে সেটা বিচার করে দেখার দরকার। এই তিনটি শর্তের মধ্যে কোনটাই কোন সরকার পালন অথবা কার্যকরী করতে পারেনি। শেখ মুজিব বোধহয় একবার এগুলো নির্ধারণ করে আগে বাড়তে চেয়েছিলেন কিন্তু তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বাকিরা এ ব্যাপারে কোনদিন সিরিয়াস ছিল না। সস্তা হাততালি পাওয়ার জন্য আদর্শগ্রাম তৈরি করার কথা বলেছেন তাও আবার সব সরকারই যতটুকু প্রয়াস প্রচেষ্টা দেখিয়েছে তা আমলাদের ওপর নির্ভর করেই করেছে। এসব কাজের জন্য সংগঠন এবং নেতৃত্ব বলতে থানা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি আমলাতন্ত্র এবং আমলাদের উদ্যোগ এবং নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করে তারা এগিয়েছে। কিন্তু সমষ্টিগত গণমুখী কোন কর্মসূচিরই নেতৃত্ব আমলারা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার জন্য দিতে পারে না। তারা সাহায্য করতে পারে, এমনকি উদ্যোগও নিতে পারে কিন্তু তার বেশি নয়। তাই এই ধরনের প্রকল্পে তারা ঢাকঢোল পিটিয়ে যে সফলতা আনে তা অতি সীমিত এবং নগণ্য থেকে যায়। গ্রামদেশের উন্নয়নে সংগঠন এবং নেতৃত্বের প্রশ্ন উঠতে তাই বাধ্য—সেটা যে কোন অর্থনৈতিক দিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে হোক না কেন। আর সেখানেই প্রশ্ন এসে যায় মানুষের। আদর্শগ্রাম তৈরি করতে হলে আদর্শ মানুষের প্রয়োজন। তারা কোথায়?

শুধু গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য নয়, জাতীয় উন্নয়নের জন্য উপরোক্ত তিনটি শর্তই প্রযোজ্য; (১) সংগঠন এবং নেতৃত্ব (২) একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক আদর্শগত দিকদর্শন এবং তার

www.pathagar.com

ওপর ভিত্তি করে একটি জাতীয় পরিকল্পনা এবং (৩) একটি জাতীয় মানবিক মূল্যবোধ সর্বক্ষেত্রে পোষণ এবং প্রয়োগ করা। এই শর্তগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না। এর হেরফের করার উপায় নেই, কারণ জাতীয় পর্যায়ের মূল সমস্যাগুলোও একই। একটি বৃহত্তর ক্যানভাসে তাই পুরো বিষয়টিকে দেখতে হবে। এই দেখার গাফিলতি বা দুর্বলতার জন্য বাংলাদেশে যতটুকু উন্নতি হওয়া সম্ভব ছিল তা হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর এই শর্তগুলো পূরণের বা নিরূপণের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছে। যদি আমরা ধরে নিই যে উপরোক্ত এই তিনটি শর্ত (যদিও আরো অনেক শর্ত থাকতে পারে) পূরণ করা গেলে জাতীয় উন্নতি সর্বক্ষেত্রে অর্জন করা সম্ভব, তাহলে এইসব ব্যাপারে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো কতটুকু কি করতে পেরেছে বা পারবে তা বিবেচনা করে দেখা দরকার। আমরা যদি ধনী দেশ হতাম বা আমাদের দারিদ্র্য এত নিদারুণভাবে কঠিন না হতো তাহলে আমাদের এই ধরনের সাদাকালো অর্থে কোন শর্তের কথা হয়তো অতটা চিন্তা করতে হতো না। সেইক্ষেত্রে, হয়তো এই শর্তগুলো দেশের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজে থেকেই পূরণ করা সম্ভব হতো, অথবা একটি স্বাভাবিক প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে সেগুলোর মোকাবেলা করা সম্ভব হতো। কিন্তু আমাদের দেশে যেহেতু নানা কারণে কোন ক্ষেত্রেই কোন বলিষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি, বরং আমাদের কিছু কিছু যাও ছিল সেগুলো আমরা ভেঙে দিতে চাই বা ভেঙে দিতে কুণ্ঠাবোধ করি না এবং যেহেতু আমরা অস্থিরতা এবং দ্রুত পরিবর্তনশীলতার পরিচয় দিয়েছি গত ১২ বছর—তাই আমাদের জন্য সমাজ গঠনের চ্যালেঞ্জটা অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন হয়ে পড়েছে অর্থনীতিতে বা রাজনীতিতে, জাতীয় পরিকল্পনা বা প্রশাসনে, রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায়—কোন ক্ষেত্রেই কোন প্রাতিষ্ঠানিক বিজয় খুব একটা কিছু আমরা অর্জন করেছি সেটা দাবি করতে পারব না। বরং আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছুকে এবং সবকিছু নিয়েই অনেক ওলটপালট করেছি। পৃথক প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি (১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত) তারপর সংসদীয় পদ্ধতি, তারপর আবার একেবারে একদলীয় প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি, তারপর প্রেসিডেন্ট হত্যা, তারপর সামরিক শাসন, তারপর বহুদলীয় প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি, তারপর আবার প্রেসিডেন্ট হত্যা, তারপর নির্বাচন আর তারপর আবার সামরিক শাসন। আবার সামরিক শাসকরাই বলছেন এই শাসন চিরস্থায়ী নয় তার অর্থ হলো এরপর আর এক ধরনের শাসন পদ্ধতি চালু হবে। সেটা কি হবে আমরা জানি না।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা দেখি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। সেটা পুনরুদ্ধার করার আগেই বিনা প্রস্তুতিতে ব্যাপক জাতীয়করণ, তারপর "সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি" গড়ে তোলার জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং প্রথম দুবছরে তার ব্যর্থতা, তারপর সেই নীতিকে সফল করার জন্য রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন, তারপর হত্যা এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন। তারপর একটি মধ্যনীতি গ্রহণ করা হলো, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র নয় কিন্তু পুরো পুঁজিবাদও নয়। জাতীয়করণকৃত বিরাট সেক্টর সরকারি খাতে থাকল এবং তার সাথে সাথে বেসরকারি

www.pathagar.com

খাতকেও উৎসাহ দেয়া হলো। তারপর এলো পুরোপুরি বিজাতীয়করণের পালা। সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী করার একটি চিন্তা, যেটা এখন কার্যকরী করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এতসব লঙ্কাকাণ্ড ঘটার পর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন আর কোথা থেকে হবে এবং এই কারণে হয়ওনি। ১২ বছরের মধ্যে এত ওলটপালটের ভার কোন্ সমাজ বইতে পারে?

এই সবকিছুই হওয়া এবং না হওয়ার পেছনে যে প্রশ্ন জড়িত ছিল সেটা হলো সংগঠন এবং নেতৃত্বের। জাতীয় পর্যায় থেকে গ্রাম পর্যায় একই প্রশ্ন জড়িত ছিল। জাতীয় উন্নতি আর গ্রামীণ উন্নতি যেহেতু একসূত্রে গাঁথা, তাই সমস্যাও এক এবং সমাধানের পথও এক। রাজনীতিবিদরা যখন ক্ষমতায় থাকে তাদের সংগঠন এবং নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করে উন্নয়নের প্রথম শর্ত, আর সামরিকরা যখন ক্ষমতায় আসে তখনই দায়িত্ব পড়ে আমলাদের ওপর। তখন আমলাতান্ত্রিক সংগঠন এবং নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করে দেশের উন্নয়ন। আমলানির্ভর উন্নয়নের কথা পরে আলোচনা করা যাবে। এখন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সংগঠনের কথা পরীক্ষা করা যাক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই দায়িত্ব অর্থাৎ উপরোক্ত তিনটি শর্ত পালনের দায়িত্বই আওয়ামী লীগের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে এক চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, এদেশের মানুষের বেঁচে থাকার স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছে। যুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট একটি নতুন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের সংগঠন এবং নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে ধুলায় লুটিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

ছোটবেলার কথা: বাবার পরিচয়, ছাত্রজীবন, প্রথম কারাবরণ ও লন্ডনে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলন

আমার যখন জন্ম হয় তখন জন্মের সনদ বা Birth Certificate-এর কোন রেওয়াজ ছিল না। স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় অভিভাবক বা পিতা যে তারিখ বলে দিতেন সেটাই হয় জন্মের তারিখ। সেই হিসেবে বয়স গণনা করা হয়। তারপর ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে জন্মের যে তারিখ থাকে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় সঠিক জন্ম তারিখ। সেই হিসেবে পাসপোর্ট এবং অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিকতায় একই জন্ম তারিখ রেকর্ড করা হয়। সাধারণত আমাদের বাবারা কেন জানি ছেলেমেয়েদের বয়সটা স্কুলে ভর্তির সময় কম দেখাতেন। হতে পারে ছেলেমেয়েদের কম বয়সে পাস করার বা চাকরিতে প্রবেশ করার কৃতিত্ব দেয়ার জন্য করতেন। তারপরও বলব কারণটা রহস্যাবৃত। সত্যিকার অর্থে বয়স কেন কম দেখানো হয় সেটা বলা মুশকিল। বিশেষ করে সন্তান বড় হলে কি করবে পিতার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া বয়স বাড়ানো কমানোর সাথে অন্তত হায়াতের কোন সম্পর্ক নেই। যাই হোক মাত্র কয়েক বছর আগে আমি জানতে পারলাম যে আমার দুটি বয়স। এতদিন যাবৎ জেনে এসেছি আমার জন্ম ২৪ মে ১৯৪০ কোলকাতায়, কিন্তু বাড়ি না হাসপাতালে সেটা জানতাম না। বাবার মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর হঠাৎ পেলাম আমার বিয়ের একটি পুরোনো দাওয়াতপত্রের ওপরে তাঁর নিজের হাতে লেখা রয়েছে:

> মওদুদ আহমাদ
> ২৪/৫/১৯৩৭ইং মোতাবেক ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ বাং
> রোজ সোমবার রাত ১০টার সময়
> ৩০/২/১ ডাক্তার লেন কলিকাতায় ভূমিষ্ঠ হয়।

আমার নিজের সম্পর্কে তিনটি নতুন তথ্য পাওয়া গেল। প্রথম, আমার বয়স তিন বছর বেশি অর্থাৎ আমি বৃদ্ধ হয়ে যাব আরো তিন বছর আগে। দ্বিতীয়, আমার নামের দ্বিতীয় অংশ এতদিন ইংরেজিতে লিখেছি Ahmed আর বাংলা আহমদ। এখন দেখছি এটি হওয়া উচিত ছিল ইংরেজি Ahmad আর বাংলা আহমাদ। জানি না কেন কোন্

www.pathagar.com

অবস্থায় বয়স আর নামের এই ভুলগুলো ঘটেছে। তৃতীয়, এখন বোঝা যাচ্ছে আমার মা আমাকে কোলকাতায় আমাদের দেবেন্দ্র ম্যানশনের সেই ফ্ল্যাট বাড়িতেই জন্ম দিয়েছিলেন। বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করাতে জানতে পারলাম যে, আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে থাকতেন লক্ষ্মী নামের এক অভিজ্ঞ ধাত্রী, যাকে আমরা লক্ষ্মীমাসী ডাকতাম, তিনি আমার আরো কয়েকজন ভাইবোনের জন্মের সময় ধাত্রীর কাজ করেছেন। ভাইবোনদের মধ্যে যাদের জন্ম বাড়িতে হয়নি, তাদের জন্ম হয়েছে কোলকাতার ডাফ্রীন হাসপাতালে।

ট্রেনে যাওয়ার পথে ছোটবেলার কথা মাঝে মাঝে স্মৃতির পাতায় ভেসে আসে। দুই চারটি ঘটনা এখনো বিশেষভাবে মনে পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় খিদিরপুর ডকে উড়োজাহাজ থেকে যে বোমা পড়ছিল, সেটা আমাদের বাড়ি থেকে দেখা গিয়েছিল। কোলকাতার গড়ের মাঠে বাবা আমাদের প্রায় নিয়ে যেতেন। এমন একদিন, বাবা যখন নামাজ পড়ছিলেন, বড় বড় গাছ থেকে কতগুলো বানর নেমে এসে আমার হাতের চিনা বাদামগুলো কেড়ে নিয়ে চলে যায়। কোলকাতা থাকাকালীন পশ্চিমবঙ্গের হুগলীর তারকেশ্বরের একজন ভদ্র, সুদর্শন, অমায়িক ও সৎ মানুষ শেখ নূরুল হুদার সঙ্গে আমার বড় বোনের বিয়ে হয়। তিনি আয়কর বিভাগে চাকরি করতেন। আমি তাঁদের দেশের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম, মনে আছে তাঁদের অনেকগুলো পুকুর ছিল। শহীদুল্লাহ কায়সারের পিতা মাওলানা হাবিবউল্লাহ, আমাদের মামা হন। আমাদের সঙ্গে তিনিও গিয়েছিলেন।

এরপর মনে পড়ে দুটি ঘটনা যা আমার মনে দারুণভাবে দাগ কেটেছিল। প্রথমটি হলো একদিন আমি আমাদের বাড়ির এক চাকরকে মেরেছিলাম, বাবা তখন বাইরে ছিলেন। তিনি বাড়ি ফিরে যখন শুনলেন সেকথা, লাঠি দিয়ে আমাকে সেদিন বেদম মেরেছিলেন। আমার বাবা জীবনে একদিনই আমাকে মেরেছিলেন। অনেক দুষ্টুমি করতাম, অনেক কিছু অন্যায় করতাম, ভুল কাজ করতাম, পড়াশুনা করতাম না, কিন্তু কোনদিন বাবা আমার গায়ে হাত দেননি। সেদিনই দিয়েছিলেন, সেটার উপলক্ষ ছিল, কেন আমি বাড়ির চাকরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। আমাকে দেয়া তাঁর এই শাস্তি আমার জীবনে একটি অমূল্য শিক্ষা হিসেবে থেকে গেছে। যারা কাজ করে বাড়িতে, অফিসে, তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা, তাদেরকে সমানভাবে দেখা, তাদেরকে মানুষের মর্যাদা দেয়া, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা, এই শিক্ষা আমার বাবা আমাকে দিয়ে গেছেন। সেই শিক্ষা কোনদিন ভুলে যাওয়ার নয়।

আরেকটি ঘটনা। ঘটনাটি ১৯৪৬ সালের দিকের হবে। কোলকাতাতে তখন হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চলছিল। আমরা থাকতাম ডাক্তার লেনের দেবেন্দ্র ম্যানশনে। আমাদের সামনের বাড়িতে আমাদেরই খুব পরিচিত একটি হিন্দু পরিবার ছিল। সেই দাঙ্গার সময় আমার বাবা একজন সুবিখ্যাত মুসলমান আলেম হয়ে সেই চরম উত্তেজনার মধ্যে সেই পরিবারকে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমার এখনো মনে আছে অনেক দূর থেকে হাতে নানা রকমের লাঠি এবং তলোয়ার নিয়ে এক বিরাট মিছিল তখন আমাদের

www.pathagar.com

বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে আমাদের বাড়ি আক্রমণ করে সেই হিন্দু পরিবারকে হত্যা করতে, কিন্তু আমার বাবার সুখ্যাতি এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সেই মিছিলকারীরা সেদিন বাবার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ফিরে গেছে। সেই হিন্দু পরিবারকে রক্ষা করতে বাবা সক্ষম হয়েছিলেন সেদিন। আমরা সবাই সেদিন খুবই ভীত, সন্ত্রস্ত ছিলাম, পরে গর্ববোধ করেছি এই ভেবে যে প্রতিবেশী পরিচিত পরিবারকে তাদের চরম দুর্যোগময় অবস্থায় আমরা আশ্রয় দিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছি। ধর্মান্ধতার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছি। এইসব ঘটনা আমার জীবনকে প্রভাবিত করেছে, সন্দেহ নেই।

আমার বাবা, মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদ ছিলেন একজন উর্দু, আরবি ও ফারসি ভাষায় পণ্ডিত, বিশিষ্ট আলেম, শিক্ষাবিদ, একজন স্কলার, কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন গোঁড়ামি ছিল না। তিনি একজন সহনশীল উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু একইসঙ্গে গভীরভাবে একজন ধর্মীয় মানুষ ছিলেন। তাঁর তপস্যা, তাঁর রাত জেগে ইবাদত করার কথা আমার এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। কিন্তু তিনি আমাদেরকে কোনদিন কোন কিছু চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেননি। আমরা ৯ ভাই, ৩ বোন। ইসলামী লাইনে লেখাপড়া করার জন্য তিনি আমাদের ওপরে কোন চাপ সৃষ্টি করেননি। আমার ছোট ভাই মঞ্জুর আহমেদ নান্নুকে মাদ্রাসায় ভর্তি করানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নান্নু তাতে রাজি হয়নি। আমাদের সবাইকে ইংরেজি লাইনে লেখাপড়া করানো হয়েছে। তবে বাড়িতে নামাজ, রোজা, কোরআন শরীফ পড়া অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাবা অনেকগুলো মূল্যবান বই লিখে গেছেন। বেশিরভাগই হাদীস শাস্ত্র এবং আরবি সাহিত্যের ওপর উর্দুতে বা আরবিতে লেখা এবং ওয়াকিবহাল মহলে ঐ বইগুলো উঁচু স্তরের বলে খ্যাতি অর্জন করেছে। বইগুলো শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, দুই একটি বই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে reference হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে শুনেছি। কিন্তু আমরা তাঁর ঐ বই সম্পর্কে কিছুই বুঝি না এবং বেশিরভাগই এখন আমাদের আয়ত্তের বাইরে। তবে তিনি দুটো বই বাংলাতে লিখেছিলেন। একটি 'নবী পরিচয়' অপরটি 'কোরআন পরিচয়'। সেইগুলো ১৯৬০-এর দশকে প্রকাশনার পর আর কোন সংস্করণ ছাপানো হয়নি। অনেক খোঁজাখুজির পর নানাজনের কাছ থেকে খুঁজে দুটো কপি আমরা উদ্ধার করতে পারি এবং এই দুটো বই আবার এখন ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাবা ১৩০৭ হিজরী, ইংরেজি ১৮৮৯ সালে, নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানার মানিকপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বীয় গ্রামস্থ সার্কেল স্কুলে লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি তাঁর নিজের শিক্ষা জীবন "নবী পরিচয়" গ্রন্থে এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

> ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে স্বীয় জেলার হেডকোয়ার্টারে যাইয়া উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষায় যোগদান করিয়া পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর মাধ্যমিক বাংলা শ্রেণীর পুস্তক খরিদ করার জন্য আমি যখন আব্বাজানের নিকট টাকা চাহিলাম, তখন আমার আম্মাজান আপত্তি জানাইলেন; "ও যখন আমার গর্ভে স্থান পাইয়াছিল, তখন

www.pathagar.com

আমি আল্লাহ পাকের দরবারে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—আমার এ সন্তান যদি পুত্র হয় তবে আমি তাকে আরবী পড়াইব।" আম্মাজানের কথা শুনিয়া আব্বাজানেরও মতের পরিবর্তন হইয়া গেল। কিন্তু আমার ক্ষোভ ও দুঃখের সীমা রহিল না—আর দুইটি মাত্র বৎসর অধ্যয়ন করিয়া মাধ্যমিক বাংলা পাস করিয়া যাওয়া আমার দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল। তখনকার দিনে মাধ্যমিক বাংলা পাস করিয়া মোক্তারী পরীক্ষাও দেওয়া যাইত। উদাহরণস্বরূপ আমাদের গ্রামের দুইজন মাধ্যমিক বাংলা পাস মোক্তার জেলাময় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এদিকে আমি মাধ্যমিক বাংলা শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জেদ ধরিলাম, অপরদিকে আমার মাতাপিতা আমাকে আরবী অর্থাৎ খাঁটি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইয়া উঠিলেন বদ্ধপরিকর।

আব্বাজান আমাকে লইয়া যথাসময়ে মাদ্রাসার পথে রওয়ানা হইলেন এবং আদেশ করিলেন তাহার এক জোয়ান সহচরকে, এর হাত ধরিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া আস। আমার ছুটিয়া পালাইবার কোন উপায় ছিল না। মনের দুঃখে উপায়হীনের চিরসঙ্গী অশ্রু ঝরাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দীর্ঘ দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মাদ্রাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। মাদ্রাসার হেড মৌলভী সাহেব আব্বাজানের বক্তব্য শুনিয়া আমাকে কয়েকটি উপদেশ দিলেন। অকস্মাৎ নিজের মনেই অনুভব করিলাম হেড মৌলভী সাহেবের উপদেশ শ্রবণ করিয়া যেন মনের দুঃখ লাঘব হইতে চলিয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকটা লাঘব হইয়া গেল। হেড মৌলভী সাহেব হুজুর পরদিন আমাকে ভর্তির ফিস ও কেতাবের টাকা লইয়া মাদ্রাসায় চলিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। পরদিন আমি যথাসময় নাওয়া-খাওয়া শেষ করিয়া যখন আম্মাজনের কাছে গিয়া মাদ্রাসায় ফিস ও কেতাবের টাকা চাহিলাম, তখন আমার পিতামাতা উভয়ের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা আল্লাহর শোকর-গোযারী আদায় করিয়া আমাকে প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা বোঝাইয়া দিয়া মাদ্রাসার উদ্দেশে রওনা করিয়া দিলেন।

এরপর ১৯০৭ সালে কোলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়ায় অধ্যয়ন শুরু করে আলিম, ফাজিল ও ফখরুল-মুহাদ্দিসীন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাস করার পর বাবা ইংরেজি ১৯১৯ সালে উক্ত মাদ্রাসায় সিনিয়র মোদাররেস বা অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন।

এর মধ্যে ১৯১৮ সালে কোলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বাবা কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং ১৯২১ সালে কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অস্থায়ী প্রভাষক পদেও কাজ করেন। তিনি কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় হেড মাওলানা নিযুক্ত হন। পরে তিনি ঢাকায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। ১৯২২ সালে পবিত্র হজ্ব পালন করেন। ১৯৫৩ সালে সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর অধ্যাপনার পর ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগের সুপারনিউমেরারি প্রফেসর হিসেবে তিন বছর দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলা ভাষায় বাবার প্রথম রচিত "নবী পরিচয়" বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এর আগে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি সবই ছিল উর্দু, ফারসি বা আরবি ভাষাভিত্তিক গবেষণামূলক

www.pathagar.com

কাজ। বাংলা ভাষার সাথে তাঁর পরিচয় ছিল খুব কম। বাবা তাঁর বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন:

আমার মাদ্রাসার শিক্ষার প্রারম্ভ ইংরেজি ১৯০৩ সাল হইতে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর আমার সঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার কোন সংস্রব ছিল না, যেহেতু আরবী শিক্ষা লাভ ও আরবী শিক্ষাদান, আরবী গ্রন্থ রচনা ... ইত্যাদি যাবতীয় কাজ উর্দু ভাষার মাধ্যমে হইয়াছিল। পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, চর্চার অভাবে আমার বাংলা শিক্ষা ক্রমশই লোপ পাইতেছিল। এমতাবস্থায় উচ্চ স্তরের বাংলা ভাষার কোন গ্রন্থ রচনা করা আমার পক্ষে সহজ কাজ ছিল না।

তবে আমি পূর্ব পাকিস্তানে প্রচলিত সহজ ও সরল ভাষায় বিশ্বনবী হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র আদর্শ জীবন-চরিত আলোচনার মাধ্যমে তাঁহার কার্যকলাপে যে সমস্ত নিগূঢ় তথ্য নিহিত রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

খোদার ফজলে হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র জন্ম তারিখ হইতে ওফাতের তারিখ পর্যন্ত তাঁহার জীবনের প্রতিটি স্তরের প্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ এমন সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পাঠক অতি সহজে ইহা হইতে হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনীর ঘটনাসমূহ নিজ আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইবেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনী সম্বন্ধে যত রকমের প্রশ্নই জাগুক না কেন, ইহার উত্তর এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। প্রায় সমস্ত ঘটনা কোরআন ও হাদীস এবং আরব জাতির ইতিহাস হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

অতি সহজ সরল ভাষায় এই গবেষণামূলক বইটি এতই সমাদৃত হয় যে প্রকাশনার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ২২শত কপি বিক্রি হয়ে যায়।

এর চার বছর পর বাবার রচিত "কোরআন পরিচয়" বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইটির ভূমিকায় বাবা লিখেছেন:

সেই কোরআনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন:

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ
خَشْيَةِ اللّٰهِ ط

অর্থাৎ যদি আমি এই কোরআনকে পাহাড়ের ওপর নাযিল করিতাম, তাহা হইলে হে নবী! আপনি অবশ্যই পাহাড়কে ভয়ে অবনত ও বিদীর্ণ হইতে দেখিতেন।

এমন মহৎ এবং পবিত্র কোরআন কোথায় ছিল, কিভাবে অবতীর্ণ হইল, কিভাবে ইহাকে গ্রহণ করা হইল, আর কিভাবে ইহা রক্ষিত হইল, কখন ইহাতে যের-যবর ও নোক্‌তা-পেশ্ সংযুক্ত করা হইল ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক।

www.pathagar.com

> তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুর—পাথরে লিখা কিতাব আকারে অবতীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু শেষ ধর্মগ্রন্থ এই কোরআন পাক হযরত রাসূলুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্ তা'আলা মুখে মুখে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহার মূল তত্ত্ব জানিয়া রাখা দরকার।
>
> কোরআন পাকের পরিচয় ও আদি কথা জানা থাকিলে অন্তরে ভক্তি-বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে। ফলে ইবাদত বন্দেগিতে যথেষ্ট পরিমাণ স্বাদ ও রুচি পাওয়া যায় এবং কোরআনের আদেশ পালনের আগ্রহ অন্তরে বৃদ্ধি পায়।

বাংলায় কোরআনের ইতিহাস তখন পর্যন্ত ছিল না বললেই চলে। কোরআনের ইতিহাসের উপর বইটি একটি মৌলিক গ্রন্থ। বইটি দেশব্যাপী সমাদৃত হয়েছিল। বাবা লিখেছেন:

> বাংলা ভাষায় কোরআনের ইতিহাসের অভাব দেখিয়া আমি এই কাজে অগ্রসর হইয়াছি...।

কোরআন হলো আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব। ৩২২৬৭১ অক্ষরবিশিষ্ট এই কিতাবে আছে ৬৬৬৬ আয়াত আর ১১৪টি সুরা। এর মধ্যে মক্কায় নাজেল হয় ৯৩টি আর মদীনায় ২১টি সুরা। আলেমগণ তেলাওয়াত আর মুখস্থ করার সুবিধার্থে কোরআনকে মাসের ৩০ দিনের হিসেবে ৩০ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রত্যেক খণ্ডকে "পারা" বলে আখ্যা দেন। একমাত্র সুরা লাহাব ছাড়া ১১৪টি সুরার মধ্যে ১১৩টি সুরায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ্‌র উল্লেখ রয়েছে। আমরা যে শৃঙ্খলা এবং ধারাবাহিকতায় কোরআন পড়ে থাকি কোরআনের আয়াতগুলো সেইভাবে অবতীর্ণ হয়নি। কারণ কোরআনের যে অংশ সর্বপ্রথম নাজেল হয়েছিল তা ছিল সূরা ইক্‌রার প্রথম পাঁচ আয়াত কিন্তু কোরআনে প্রথম সূরা আমরা যা পড়ি তাহলো সূরা ফাতেহা। এই বিষয়ে বাবা তাঁর 'কোরআন পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন:

> লাওহে মাহ্‌ফুয হইতে কোন এক রমযানের মাসে কদরের রাত্রে সমস্ত কোরআন একসঙ্গে নিম্নতর আসমানে অবতীর্ণ হয়। ইহার পর হইতেই উম্মতের বিভিন্ন অবস্থায় সেই মূল কোরআন হইতে সময় উপযোগী বিভিন্ন হুকুম-আহ্‌কাম অবতীর্ণ হইতে থাকে।
>
> যখন যে অবস্থায় যে হুকুম সময় উপযোগী ছিল, তখন আল্লাহ্‌র আদেশে হযরত জিব্রাঈল উক্ত মূল কোরআন হইতে সেই হুকুম পৌঁছাইয়া যাইতেন ফলে অবতীর্ণ কোরআনের শৃঙ্খলা মূল কোরআনের শৃঙ্খলা হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়ে।
>
> কিন্তু মূল কোরআনের সহিত অবতীর্ণ কোরআনের হুকুম-আহকাম প্রভৃতি সর্ববিষয় অক্ষরে অক্ষরে মিল রহিয়াছে।

কোরআন যখন নাজেল হয় তখন এর আয়াতগুলোতে কোন যের্-যব্‌র-পেশ্-নোক্‌তা বা বিন্দু কিছুই ছিল না। এমনকি পারা বা রুকুর চিহ্নও ছিল না। যতদিন কোরআন পাঠ আরব দেশে সীমাবদ্ধ ছিল এসবের প্রয়োজন পড়েনি কারণ আরবদের মাতৃভাষা আরবি হওয়াতে। যের্-যব্‌র-পেশ্-নোক্‌তা ছাড়াই কোরআন পাঠে তাদের কোন অসুবিধা হতো না। ইসলাম দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করার কারণে যাদের মাতৃভাষা আরবি নয় তাদের সুবিধার জন্য হিজরী ৮৬ সাল মোতাবেক ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সর্বপ্রথম এই সহজ পন্থা প্রবর্তন করেন।

www.pathagar.com

কোরআনের আয়াত বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলেও রাসূলুল্লাহ্ তার সাথে সাথেই লাওহে মাহ্‌ফুজের শৃঙ্খলা ও ধারা মতে অবতীর্ণ সূরা বা আয়াতের স্থান বা অবস্থিতিও বলে দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ অবতীর্ণ সূরা বা আয়াত সেইভাবে মুখস্থ করে নিতেন এবং মুখস্থকারী সাহাবীগণকে সেই শৃঙ্খলা মতে মুখস্থ করে নিতে বলতেন। মুখস্থকারী সাহাবাগণ ছাড়া কোরআন লেখার জন্য যে সাহাবারা নির্দিষ্ট করা ছিলেন তাদেরকেও রাসূলুল্লাহ্ সেই শৃঙ্খলা ও ধারামতে লিখে নিতে বলতেন। তখনকার সময় লেখার কাজটা ছিল খুব কঠিন। শুকনা হাড়, সমতল পাথর, কাঠের তক্তা, চমড়া বা খেজুর গাছের পাতার ওপর সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ বাণী লিখে রাখতেন। বাবা তাঁর 'কোরআন পরিচয়' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

> আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোরআন লিখিয়া লইতাম এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ আমাদিগকে সূরা বা আয়াতের স্থানও বলিয়া দিতেন।
>
> —*বোখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা*

ক্রমাগতভাবে এবং সর্বসময় রাসূলুল্লাহ্ এবং সাহাবিগণ এই প্রক্রিয়ায় লিপ্ত ছিলেন। সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে নামাজ আদায় করতেন এবং তাঁর কেরায়েত শুনতেন যাতে কোন ভুল থাকলে তা সংশোধন করতে পারেন। লওহে মাহফুজের শৃঙ্খলা মতেই রাসূলুল্লাহ্ কোরআন পড়তেন, পড়াতেন, লেখাতেন এবং শোনাতেন এবং সাহাবিগণের কাছ থেকেও শুনতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ্‌র বর্তমানেই সম্পূর্ণ অবতীর্ণ কোরআন লেখায় এবং পড়ায় নিখুঁতভাবে পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলে বিভিন্ন বস্তুর ওপর লিখিত কোরআনকে একসাথে মিলিয়ে কিতাব আকারে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। বাবা তাঁর বইয়ে লিখেছেন:

> তাওরাত, যাবুর বা ইনজিলের মত কোরআন একসঙ্গে কেন অবতীর্ণ হলো না এবং কোরআন অবতীর্ণ হতে সুদীর্ঘ ২৩ বছর কেন লাগল এই নিয়ে বিধর্মীরা নানা প্রশ্ন তুললে আল্লাহ্‌তায়ালা ঘোষণা করেন:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ج كَذٰلِكَ ج لِنُثَبِّتَ بِهٖ
فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا

> অর্থাৎ বিধর্মীগণ বলিল যে, অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় কোরআন তাঁহার (হযরতের) ওপর একসঙ্গে অবতীর্ণ হইল না কেন?
>
> আল্লাহ্ তায়ালা বলিলেন:
>
> (হে নবী)! আপনার অন্তরে কোরআনকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং কোরআন মুখস্থ করার সুবিধার্থেই অল্প অল্প পরিমাণে কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি।
>
> —*সূরা ফোরকান, ১৯ পারা*

www.pathagar.com

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক কোরআনে আরো ঘোষণা করিয়াছেন:

قُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

অর্থাৎ কোরআনকে আমি এ কারণে অল্প অল্প করিয়া অবতীর্ণ করিয়াছি।
(হে নবী)! আপনি লোকজনকে অল্প অল্প পরিমাণে কোরআন শুনাইলে তাহারা ইহাকে অতি সহজে মুখস্থ্ করিয়া লইতে পারিবে এবং ইহার অর্থও হৃদয়ঙ্গম করিতে সুযোগ পাইবে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো কোরআন পৃথিবীর একমাত্র কিতাব যা সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত। এর একটি অক্ষর বা শব্দের পরিবর্তন হয়নি। Most unique phenomenon। আজ ১৪ শত বছর একই রকম, একইভাবে, একই শৃঙ্খলায় আছে। এত বিরাট একটি কিতাব যুগের পর যুগ নিখুঁতভাবে অক্ষুণ্ন রয়েছে। এখানেই কোরআনের সবচেয়ে বড় বিজয়। এই বিষয়ে বাবা লিখেছেন:

কোরআনে আল্লাহতায়ালা নিজেই বলেছেন:

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

অর্থাৎ (হে নবী) আমি কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমি (হইলাম) ইহার রক্ষক।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব যার মাধ্যমে অবতীর্ণ হলো তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে একজন নিরক্ষর ব্যক্তি। তিনি কোনদিন কোন স্কুলে যাননি, বাড়িতে পড়াশুনা করেননি, পড়তে পারতেন না, লিখতে পারতেন না, লেখাপড়ার সাথে যার সম্পর্ক ছিল না, সেই মানুষটি এই মানবসভ্যতার অনন্তকালের জন্য এত বড় কিতাব উপহার দিয়ে গেছেন; এটি কি করে সম্ভব? এটি সকলেরই প্রশ্ন। এর জবাব বাবা তাঁর "কোরআন পরিচয়" গ্রন্থে এইভাবে দিয়েছেন:

কোরআন প্রাপ্তির পূর্বকাল পর্যন্ত হযরতকে নিরক্ষর রাখার কারণও আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন পাকে উল্লেখ করিয়াছেন:

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ ط اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ

অর্থাৎ কোরআন প্রাপ্তির পূর্বে আপনি কোন কিতাব পড়েন নাই এবং কলম হাতে ধরিয়া লেখেন নাই। কোরআন প্রচারের পূর্বে যদি আপনি লেখাপড়া জানিতেন তাহা

www.pathagar.com

হইলে অবিশ্বাসিগণ সন্দেহ করিত যে, লেখাপড়ার গুণেই আপনি এমন কোরআন প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মানবতার পূর্ণ বিকাশের সময়, ঠিক ৪০ বৎসর বয়সে আল্লাহ্তায়ালা হযরত জিব্রাঈলের মাধ্যমে হযরত রাসূলুল্লাহ্কে সর্বপ্রথম কোরআনের সবক দিয়া সূরা ইক্রার প্রথম পাঁচ আয়াত পড়িতে আদেশ করেন।

সত্য নবী হযরত তখন সত্য কথাই প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন: ما انا بقارى

অর্থাৎ আমি তো পড়া জানি না।

তথাপি, বার বার নিরক্ষর নবীর ওপর পড়িয়া যাওয়ার জন্য আদেশ হইতে লাগিল।

কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ্ প্রত্যেকবারই 'আমি তো পড়া জানি না' কেবল এ আপত্তিই করিয়া যাইতে থাকেন।

এ সময় আল্লাহ্ তায়ালার আদেশে তাঁহার প্রেরিত কোরআন-বাহক ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল বারবার হযরত রাসূলুল্লাহ্কে জড়াইয়া আলিঙ্গনের পর আলিঙ্গন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঘামে হযরতের সমস্ত শরীর ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত রাসূলুল্লাহ্র অন্তরে জ্ঞান ও বিদ্যা পূর্ণ মাত্রায় বিস্তার লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্তই তাঁহার সহিত হযরত জিব্রাঈলের আলিঙ্গন চলিতে থাকে।

—*বোখারী শরীফ*

কোলাকুলির ফলে হযরত রাসূলুল্লাহ্র পাক জবান হইতে হঠাৎ পাঁচটি আয়াত বাহির হইয়া পড়ে। আর এই আয়াতগুলো হইল পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ কোরআন পাকের অংশ।

এগুলো হইতেছে হযরত রাসূলুল্লাহ্র সর্বপ্রথম পাঠ্যবস্তু

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ج

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ج

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ

অনেকের মতে, ৬১১ খ্রীস্টাব্দে, জুন মাসে সোমবার দিন এ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

www.pathagar.com

এই ঘটনা ঘটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ ভীত এবং কম্পিত অবস্থায় হেরা পাহাড়ের গুহা হইতে বাহির হইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন এবং হযরত খাদীজাকে ডাকিয়া বলিলেন:

খাদীজা! শীঘ্র আমাকে কম্বল দিয়া জড়াইয়া ধর।

তারপর, কিছুক্ষণ পূর্বের সে অপূর্ব ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিলেন,

খাদীজা, আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার মৃত্যুর আশঙ্কা হইতেছে।

হযরত খাদীজা সর্বপ্রকার সহানুভূতি এবং সান্ত্বনা দিয়া অবশেষে বলিলেন:

আপনি অনাথকে আশ্রয় দেন, গরিব-কাঙালকে দান-খয়রাত করেন, অসমর্থকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় আপনার কোন আনিষ্ট হইতে পারে না; কোন প্রকার ক্ষতির কারণও ইহাতে নাই।

এত করিয়া বোঝাইবার পরেও যখন স্বামীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে দেখিলেন না, তখন হযরত খাদীজা নিজেও যেন কেমন একটি সন্দেহের বশবর্তী হইয়া পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে তিনি হযরতকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার চাচাত ভাই প্রবীণ তাওরাতবিদ ওরাকার নিকট লইয়া গেলেন।

ওরাকা হযরত মোহাম্মদের (ছাঃ) সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন:

এই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ আর কেহ নন, তিনি হইতেছেন হযরত জিব্রাঈল। ইনি হযরত মুছার (আঃ) প্রতিও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তারপর তিনি দুঃখ করিয়া আরো বলিলেন:

হে মোহাম্মদ! আপনি নবী। আপনার জাত-ভাইরা যখন আপনাকে আপনার এই জন্মস্থান—মক্কা হইতে তাড়াইয়া দিবে, তখন যদি আমি বাঁচিয়া থাকি এবং আমি কোমর বাঁধিয়া আপনাকে সাহায্য করিতে পারি, তবে আমি আমার নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করিব।

উপরিউক্ত ঘটনার পর কয়েকদিন সাময়িকভাবে হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র ওপর কোরআন অবতীর্ণ হওয়া স্থগিত থাকে। ক্রমে ক্রমে যখন তাঁহার মন স্থির হইতে লাগিল এবং তাঁহার অন্তরে ওহী বহন করার মত পূর্ণ ক্ষমতা সঞ্চিত হইল, তখন হইতে আবার হযরতের ওপর অনবরত কোরআন নাজিল হইতে লাগিল।

এই কোরআন পাকের অবতরণ দীর্ঘ ২৩ বৎসরে সমাপ্ত হয়।

—বোখারী শরীফ, ১-২ পৃষ্ঠা

১৯৪৭ সালের প্রথমার্ধে যখন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে, আমরা বেশ কয়েক মাস কোলকাতা থেকে নোয়াখালীতে আমাদের গ্রামে ছিলাম। গ্রামে থাকা অবস্থায় পাকিস্তান হলো, ভারত বিভক্ত হলো এবং তারপর ঢাকায় ফিরে এলাম ১৯৪৮ সালে গোড়ার দিকে। ইসলামপুরে বাবাকে একটি সরকারি বাড়ি বরাদ্দ দেয়া হলো। আলিয়া মাদ্রাসার কোলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের পুরো দায়িত্বটা বাবার ওপর ছিল। শিক্ষক হিসেবে তাঁর একটি সুখ্যাতি ছিল। অমায়িক, ভদ্র এবং মেধাবী ছাত্র হিসেবে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম কারাবরণ

আমি প্রথম জেলে যাই ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়ার জন্য। তখন দেশে সংবিধানের ৯২ক অনুচ্ছেদের অধীনে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দিয়ে প্রাদেশিক গভর্নরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন তখন পূর্ব পাকিস্তানে চলছে। আমি তখন ঢাকা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করল। মিছিল, সমাবেশ, সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো, কিন্তু কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রামের সিদ্ধান্ত ছিল যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা তুলতে হবে। তাই ২০ ফেব্রুয়ারি রাত্রে আমি, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং দাউদকান্দির সিরাজ, যাকে আমরা মার্শাল বলতাম তার সুঠাম দেহের জন্য, সেই ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের উল্টাদিকে অবস্থিত কলেজে অবস্থান নিলাম। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন আমার বন্ধু এবং ঢাকা কলেজের নির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারি আর আমি ছিলাম সেই ইউনিয়নের আপ্যায়ন সম্পাদক। রাত দেড়টা-দুটোর দিকে সিরাজ পাইপ বেয়ে উঠে গিয়ে একটি ঝাণ্ডার ওপরে কালো পতাকা উঠিয়ে আবার নিচে নেমে আসল। আমরা তিনজন মিলে গেলাম ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে। সেখানে চা, বিস্কুট খেয়ে আমরা রওনা হলাম নবাবপুর হয়ে কলতাবাজারের দিকে সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে পড়াকালীন এক বন্ধু, আবদুল ওদুদের বাসায় রাতটা কাটাবো এই কথা চিন্তা করে। পথে আমরা দেখলাম যে দুটো লোক আমাদের পিছনে পিছনে একটু দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করছে। একজনের হাতে একটি সাইকেল ছিল। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে এরা গোয়েন্দা বিভাগের টিকটিকি, তাড়াতাড়ি হেঁটে কোন রকমে এগলি-ওগলি দিয়ে কলতাবাজারের সেই বাড়িতে আমরা ঢুকলাম। ঠিক ৫/৭ মিনিট পরেই পুলিশের গাড়ি ও হুইসেলের আওয়াজ শুনলাম এবং বাড়ি ঘেরাও হয়ে গেল। তখন সিরাজ, লম্বা চওড়া, খুব শক্তি গায়ে, ওদের পাকের ঘরের সিলিং এর কাছে আলো বাতাসের জন্য একটি জানালার মত ছিল। সিরাজ ওটার শিকগুলো ভেঙে ফেললো। আমরা প্রায় ৮/১০ ফুট উঁচু থেকে লাফ দিয়ে তিনজনই অন্য একটি বাড়িতে নামলাম। দেখলাম সেটা জগন্নাথ কলেজের একটি হোস্টেল। জগন্নাথ কলেজের হোস্টেলগুলো নানা দিকে তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ছাত্ররা লেখাপড়া করছেন হারিকেন জ্বালিয়ে, বুঝলাম তাদের পরীক্ষা আছে। যখন আমাদের পরিচয় দিলাম তারা খুব সাদরে আমাদেরকে গ্রহণ করল এবং আমাদেরকে ওখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। রাত্রে গ্রেপ্তার থেকে আমরা রক্ষা পেলাম কিন্তু পরদিন আর রক্ষা পাইনি।

পরদিন যখন ফজলুল হক হলে আমরা অবস্থান গ্রহণ করেছি তখন হঠাৎ পুলিশ অফিসার একজন বলল, কালকে রাত্রে পারিনি, এখন তো পেরেছি, বলেই আমার হাতটা ধরে ফেললো। হঠাৎ ঝাঁকি মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দিলাম এক দৌড়। চলে আসলাম সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং পরে সিরাজও চলে এলো সেখান থেকে। পুলিশ কালো পতাকা নামানোর জন্য সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিতরে ঢোকার

www.pathagar.com

প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন। আমরা তখন একেবারে সারিবেঁধে শুয়ে পড়লাম সলিমুল্লাহ হলের প্রবেশ মুখে। আমি তো তখন মাত্র কলেজের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই নেতৃত্ব দিচ্ছিল। তখন ড. ওসমান গনি ছিলেন হলের প্রভোস্ট, একজন জনপ্রিয় শিক্ষক। ছাত্ররা তাকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করত এবং তিনিও ছাত্রদের খুব ভালবাসতেন। তিনি সামনের গেইটে গিয়ে পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কথা বললেন এবং বললেন যে তারা যেন হলের ভিতরে প্রবেশ না করে। তিনি ওদেরকে অনুমতি দিলেন না। শেষ পর্যন্ত পুলিশরা আর সলিমুল্লাহ হলের ভিতরে প্রবেশ করেনি। তারপর আমরা সবাই ছোট ছোট গ্রুপ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই পুরোনো বিল্ডিংয়ের আমতলায় গিয়ে সমবেত হলাম। সেখানে সিদ্ধান্ত হলো যে দশজন করে আমরা মিছিল করে বের হব। এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা যখন বের হতে শুরু করলাম তখন পুলিশ সবাইকে ট্রাকে করে তুলে নিতে শুরু করল এবং অনেক দূর নিয়ে তেজগাঁও পেরিয়ে আবার ছেড়ে দিয়ে আবার ট্রাকগুলো ফিরে আসে আরো ছাত্রদের নেয়ার জন্য, এরপর গ্রেপ্তার শুরু করল। প্রায় ১১০ জনকে লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হলো, তার মধ্যে আমিও ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার সকল নামকরা নেতারা সেখানে ছিলেন। তখন ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আব্দুল আউয়াল, ছাত্র শক্তির প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফরমান উল্লাহ খান, ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এস. এ. বারী এ. টি., ইসলামী ব্রাদারহুডের ইব্রাহিম তাহা, আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং আরো অনেকে। লালবাগ থানা থেকে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। এক মাস পরে আমাদের ছেড়ে দেয়া হলো এবং এই এক মাসে আমার ওজনও বেড়ে গিয়েছিল প্রায় ৪/৫ পাউন্ড। তখনকার জেলখানার ডাল, সবজি আর ভাত ভালই লেগেছিল। সেটাই ছিল আমার প্রথম কারাজীবন।

আমার ছাত্রজীবন ছিল জীবন্ত, এবং কর্মময়। রাজনীতি, প্রেম, সংগঠন, কারাবরণ সবই করেছি। একদিকে খেলাধুলা, নাটক, অন্যদিকে আবার সময়মত পড়াশুনা করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, মোটামুটি সবকিছুর মধ্যেই একটি balance ছিল। সব ঘটনার বর্ণনা হয়তো অবান্তর হবে। তবে ছোট বড় কয়েকটি ঘটনা আমার জীবনকে এখনো দোলা দেয়। সপ্তম শ্রেণীতে থাকতে স্কুল টিমে খেলেছি, হকি খেলেছি, মাঝে মাঝে ফুটবলও খেলেছি। নবকুমার স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর আমি স্কুল ক্যাপ্টেন হয়েছিলাম এবং রীতিমত ফুটবল, ক্রিকেট খেলেছি, অধিনায়কত্ব করেছি অনেক সময়। ব্যাডমিন্টনও খেলেছি। পাড়ার সমস্ত ছেলেদের সংগঠিত করতাম। সমিতি করতাম, চৌকি বিছিয়ে শাড়ি-চাদর টাঙ্গিয়ে মঞ্চ সাজিয়ে নাটক করতাম পাড়ায় পাড়ায়। ফজলুল হক হলের সংলগ্ন মাঠে আমরা রীতিমত খেলতাম। ফুটবলটা অনেকটা নেশার মতই ছিল। ক্রিকেটে এক নম্বর ছিলাম না, তবে ভালই খেলতাম। কিন্তু তারপরে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে গিয়ে সেই ১৯৫৬ সালের পুলিশের আঘাতের পর ক্রিকেট খেলা প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপক পরিসরে গিয়ে তখন খেলাধুলার চেয়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। ফলে জীবনটাও অন্য ধরনের হয়ে

www.pathagar.com

গেল। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন ছিল সাংঘাতিক রকমের বৈচিত্র্যময়। আনন্দ উত্তেজনায় ভরা ছিল সেই চার পাঁচটি বছর।

নাটকে অভিনয় করাটা আমার ভাল লাগতো। স্কুল জীবন থেকে আমরা নাটক মঞ্চস্থ করতাম। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে অভিনয়ে অংশগ্রহণ ছাড়াও ঢাকার অনেক মঞ্চে আমি অভিনয় করেছি। ১৯৫৯-৬০ সালে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের বার্ষিক নাটকে আমি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে সনদ পেয়েছিলাম। এমনকি আমি কিছু কিছু নাটকও লিখেছি। নাজিমুদ্দিন রোডে অবস্থিত রেডিও বাংলাদেশ থেকে শিশুদের জন্য আমার লেখা নাটক "চকলেট" সম্প্রচারিত হয়েছিল। তখন ঢাকা কলেজে পড়ি। তখনকার সময় ২০ টাকা পেয়েছিলাম। ১৯৬১ সালে সলিমুল্লাহ্ হলের ৭ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসবের বার্ষিক নাটক "অন্তরীক্ষ" ছিল আমার নিজের রচিত। আমরা তখন ঢাকায় সাধারণত পশ্চিবঙ্গের লেখকদের নাটক মঞ্চস্থ করতাম। সলিমুল্লাহ হলে সেবার এই প্রথম নিজেদের একজন ছাত্রের লেখা নাটক মঞ্চস্থ হলো। জেলখানায় বসে একবার একটি নাটক লিখেছিলাম কিন্তু সেটা মঞ্চস্থ হয়নি। আলী যাকেরকে পাঠিয়েছিলাম মঞ্চস্থ করা যায় কিনা দেখার জন্য। আমাদের সময় অভিনয়ে সিনিয়রদের মধ্যে নামকরা ছিলেন মুস্কেকুস সালেহীন, শহীদ ভাই, আবিদ হোসেন, ইকবাল আনসারী খান (হেনরী), মুনিমুন্নেসা, জহরত আরা। পরে রশিদুল হাসান বিরু এবং আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ ইমাম অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

তবে গান, চিত্রকলা, যন্ত্রসঙ্গীত আমি খুব পছন্দ করতাম, কিন্তু এসব চর্চা করার জন্য আমার ন্যূনতম কোন দক্ষতা ছিল না, তাই চেষ্টাও করিনি। তবে নিজে অগণিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। পিয়ানো আমার সবচেয়ে প্রিয় instrument (যন্ত্রসঙ্গীত)। পশ্চিমা সঙ্গীতের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো Jazz, আর দেশে আধুনিক গান ছাড়া সবই আমার ভাল লাগে। পুরোনো গান আরো ভাল লাগে, সেগুলো আধুনিক হলেও ক্ষতি নেই। তবলার চেয়ে ঢোল ভাল লাগে, বাঁশির চেয়ে সেতার অনেক বেশি ভাল লাগে।

জনাব আবুল হাসিম ছিলেন অবিভক্ত বাংলার এক প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ। আসাম-বেঙ্গল মুসলিম লীগের সেক্রেটারি জেনারেল। একজন উদার এবং বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ। তাঁর লেখা Creed of Islam আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইসলামী প্রগতিবাদের আদলে গড়া তমদ্দুন মজলিস এবং ছাত্র শক্তির আদর্শগত মিল থাকলেও সংগঠনগুলো ছিল স্বতন্ত্র। এই সংগঠনগুলো গড়ে তোলার পেছনে জনাব আবুল হাসিমের চিন্তাধারার অনেক প্রভাব ছিল। ইসলামের rituals পালন করার পক্ষে থাকলেও তিনি জোর দিয়েছিলেন কোরআনে প্রদত্ত মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারের ওপর, যার দার্শনিক ভিত্তি ছিল "প্রতিপালনবাদ।" একই পাড়ার এবং কলেজের পরম বন্ধু জাকিউদ্দিন আহমদের অনুপ্রেরণায় আমি ছাত্রশক্তির সদস্য হই। এই সংগঠনে জন্মলগ্নের সাথে জড়িত ছিলেন ফরমানুল্লাহ খান, বদরুদ্দিন উমর, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শরীফ

আব্দুল্লাহ হারুন, ড. মকসুদুর রহমান, ড. সাহাদত হোসেন শরীফ এবং আরো অনেকে। অধ্যাপক আবুল কাসেম, প্রফেসর হাসান জামান, অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ড. মাহফুজুল হক, প্রফেসর আব্দুল গফুর, অধ্যক্ষ শাহেদ আলী ছিলেন তমদ্দুন মজলিসে। এদের অনেকের চরিত্র এবং দেশপ্রেম আমার মনকে অনেক প্রভাবিত করেছে। অধ্যাপক আবুল কাসেম ছিলেন মহান ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ।

যদিও ন্যাপপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন এবং আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে একটি সংগঠিত অবস্থানে ছিল, কিন্তু ১৯৫৬ সালে আমাদের ব্যাচের প্রবেশের সাথে সাথে ছাত্রশক্তি বৃহত্তম ছাত্র সংগঠনে পরিণত হয় এবং আমাদের কর্মতৎপরতার কারণে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ছাত্রশক্তির প্রতি সাধারণ সমর্থন বেশি থাকার আর একটি কারণ ছিল, এই সংগঠন কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গদল বা লেজুড়বৃত্তি করত না। ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর সমন্বয়ে এই সংগঠন ডাকসু এবং হল নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ করে। ছাত্রশক্তির বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক এবং স্বতঃস্ফূর্ত। সেই সময় তালুকদার মনিরুজ্জামান, রশীদুল হাসান বিরু, আনিসুজ্জামান খান, মোস্তাফা জামান আব্বাসী, মিজানুর রহমান শেলী, সাহেদ আলী, হেদায়েতুল হক, মহিউদ্দিন হাফিজ, মিয়া নূরুজ্জামান, ওসমান ফারুক, আমিরুল ইসলাম ময়না, আবু হেনা, নাজমুল হুদা রিন্টু, এবিএম নূরুল ইসলাম, মোবায়দুর রহমান, মোজাফফর হোসেন পল্টু, আতাউর রহমান কায়সার, আনোয়ারুল করিম চৌধুরী জয়, ওয়ালিউল ইসলাম, আনসার আলী, শেলী ইউসুফ, চ্যমন আরাসহ তখনকার আরো নামকরা প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রী এই সংগঠনের সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত ছিল। ছাত্রশক্তির সাংস্কৃতিক সংগঠন, "শিল্প ও সংস্কৃতি পরিষদ" ছিল খুবই শক্তিশালী। আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আনোয়ারুদ্দীন খান, সৈয়দ আবদুল হাদী, নজমুল হুদা বাচ্চু, খন্দকার নূরুল আলম, আব্দুল্লাহ ইউসুফ ইমাম, ফেরদৌসী রহমান, আঞ্জুমান আরা বেগম এবং আরো অনেকে এই সংগঠনকে সজীব এবং সমৃদ্ধ করেছিল।

আমি ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বি.এ. অনার্সে ভর্তি হই এবং তিন বছরের অনার্স কোর্স পাস করার পর ১৯৬০ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. পাস করি এবং তারপরে আইন বিভাগে ভর্তি হই। কিন্তু সেই আইন আর পড়া হয়নি। বছরখানেকের মধ্যে বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা করে আমি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে চলে গেলাম ১৯৬১ সালের শেষার্ধে অনেক দিনের লালিত সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করার জন্য।

সে অনেক কাহিনী। তখনকার সময়ে আমাদের সমসাময়িক যারা লেখাপড়ায় ভাল ছিল তাদের সিভিল সার্ভিসে যাওয়াটাই ছিল একটা বিরাট আকর্ষণ। সন্তানের CSP হওয়াটা ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের সবচেয়ে বড় ambition বা সামাজিক status, কিন্তু আমি সেদিকে গেলাম না। আমার এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বাবা ছাড়া আমার পরিবারের আর কারো কাছ থেকে কোন সমর্থন পাইনি। তাঁরা চেয়েছিলেন আমি সিভিল সার্ভিসে

www.pathagar.com

যাই, কিন্তু সেটা হলো না। তখনকার সময়ে বিদেশে যাওয়াটা এখনকার মত কঠিন ছিল না। কিন্তু পাসপোর্ট পাওয়া ছিল দুরূহ, বিশেষ করে যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের জন্য। আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু সুলতানুজ্জামান ছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি। তাঁর সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট পেয়ে গেলাম। কিন্তু টাকা-পয়সার অভাব ছিল আমার। এখনো মনে আছে তখন পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের একটি স্কিম ছিল Fly now pay later। এখন উড়ে যান পরে টাকা দেবেন। আমি ঐ স্কিমে টিকেট করেছিলাম অর্থাৎ বোধহয় তখনকার সময়ে ২০০০ রুপি দিয়ে টিকেট কেনা হয়েছিল, বাকি ১৯০০ টাকা পরে দেয়া হয়েছিল। এ ধরনের একটি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর আমার বাবা তখন ৪০ পাউন্ড সমতুল্য যা হয় সেই টাকা দিয়েছিলেন, আর আমি নিজে যোগাড় করেছিলাম ১৪ পাউন্ড। নগদ ৫৪ পাউন্ড আর বাকিতে টিকেট কিনে লন্ডনে চলে গেলাম। লন্ডন বিমানবন্দরে বন্ধুবর এটিএম মাহবুবুল হক এসেছিলেন আমাকে নিয়ে যেতে। রাতেরবেলায় পৌঁছেছিলাম। দোতলা বাসে করে দুজন শহরের দিকে চলেছি, সবকিছু পরিষ্কার, ছিমছাম। রাত তখন বেশ হয়ে গেছে। তাই লোকজনও খুব কম। পথে একটি বাস স্ট্যান্ডে এক যুবককে প্রকাশ্যে এক যুবতীকে গভীর আলিঙ্গনে চুম্বনরত অবস্থায় দেখে অবাক লাগল।

মাহবুব ভাই ঢাকা এবং পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। সৎ এবং সরল প্রকৃতির মানুষ। তাঁর কথা মনে পড়লে মনটা খারাপ হয়ে যায়। বন্ধুবর সুইডেনের একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল প্রেমটা ছিল একতরফা। এ কারণে তাঁর জীবনে নেমে আসে প্রচণ্ড হতাশা এবং শেষ পর্যন্ত লেখাপড়াও আর শেষ করতে পারেননি। অথচ তিনি যখন সুইডেনে যেতেন মেয়েটার বাড়িতে, তাদের পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। মেয়ের পিতামাতা, ভাইবোন সবাই মাহবুব ভাইকে আদরযত্ন করত। কিন্তু ওদের দেশের আর আমাদের দেশের প্রেমের অনেক তফাৎ। আমাদের সরল মনে যেটা মনে হয় প্রেম, ওদের কিন্তু তা নয়। বন্ধুত্ব আর প্রেম এক জিনিস নয়। মেয়েটা হয়তো ভাল ব্যবহার করেছে, তাকে বাইরে নিয়ে গেছে, তার সঙ্গে সময় কাটিয়েছে, কিন্তু তাতেই আমার বন্ধু মনে করেছিলেন বোধহয় মেয়েটা তাঁর প্রেমে পড়েছে। সে অনেক কাহিনী।

মাহবুব ভাই ফেনী জেলার সোনাগাজীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে এসে গ্রামে বসবাস করা শুরু করেন। আমি লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর তাঁর আর খবর পাইনি। শুনেছি মাহবুব ভাই আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর মত একটি মানুষ হয় না, একেবারে সোনার মানুষ ছিলেন। যাই হোক লন্ডনে প্রথম রাত মাহবুব ভাইয়ের গোল্ডারস গ্রীন ফ্ল্যাটে কাটলো। সপ্তাহখানেক পর ব্যাটারসী পার্কের কাছে ৩১ দেবোরা রোডে গিয়ে উঠলাম। সেখানে ছিল দুজন মেধাবী ছাত্র, মনোয়ার হোসেন আর বেলায়েত হোসেন। আমার এক বছরের সিনিয়র। কমনওয়েলথ স্কলারশীপ নিয়ে লন্ডনে এসেছে। মনোয়ার লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে আর বেলায়েত সোয়াসে, স্কুল

অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে ডক্টরেট করছে। বাড়ির মালিক বাঙালি। ফেরদৌস আর জুনেদ সাহেব। বড় ভাল মানুষ ছিলেন তাঁরা। ১৯৬২ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এ বাড়িতেই ছিলাম। মনোয়ার ডক্টরেট করার পর দেশে ফিরে BIDS-এর চেয়ারম্যান হয়েছিল। বেলায়েত আমেরিকার ওকলাহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নিযুক্ত হওয়ার পর বাকি জীবনটা বিদেশেই কাটায়।

বিলেতে আমার তখন সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল একটি চাকরির, কারণ হাতে টাকা নেই। ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ভর্তির ফিস তখন মোট ১৭০ পাউন্ড ১৮ শিলিং কোথায় পাব? তাই চাকরি খোঁজা আর তাড়াতাড়ি করে ভর্তি হওয়াটা ছিল আমার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। আমি দরখাস্ত করা শুরু করলাম বিভিন্ন স্কুলে। কারণ কায়িক পরিশ্রম আমার সয় না, তাই শিক্ষকতাটাই ছিল সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় আমার জন্য। তখন বর্ণবৈষম্য ছিল বেশ প্রকট, তাই বেশিরভাগ স্কুলই আমাকে নাকচ করে দিল। *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে একটি দরখাস্ত করলাম লন্ডনের উত্তরে ঠিক শহরের বাইরে, ওরা green belt বলে, পটারসবারের Lochinver School-এ। এটি ছিল একটি Independent Preparatory School (IPS)। এটি ছিল প্রাইভেট স্কুল, এখানে আমার চাকরি না হওয়ারই কথা। কারণ পরে বলছি। বিলেতে দুই ধরনের স্কুল আছে, একটি হলো সরকারি স্কুল আর একটি হলো একেবারে প্রাইভেট স্কুল। প্রাইভেট স্কুলগুলোকেই পাবলিক স্কুল বলা হয়। এইসব স্কুলে অবস্থাপন্ন এবং ধনীদের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে। IPS পাবলিক স্কুলেরই একটি অঙ্গ। এ ধরনের স্কুলকে আবার Prep Schoolও বলা হয়। ১৩ বা ১৪ বছর পর্যন্ত এখানে ছেলেমেয়েরা পড়ে। সেখান থেকে তারা পরে যেমন ইটন, হ্যারো, ওয়েলিংটন, ওয়েস্টমিনস্টার, উইনচেস্টার, মারলব্যারো, ইত্যাদি যেসব বড় বড় নামকরা বোর্ডিং স্কুল আছে—সেখানে যায়। ব্রিটেনের এলিট শ্রেণী, খুব নাক উঁচু (snobbish) এবং রক্ষণশীল। তাই এই সমস্ত প্রাইভেট স্কুলে তো বর্ণবৈষম্য আরো অনেক বেশি প্রকট। তখনকার সময়ে, ১৯৬০-এর গোড়ার দিকের কথা বলছি।

তখনও ইংরেজ সমাজ শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা খুবই প্রভাবিত ছিল এবং ওদের নিজেদের জন্য একটি আলাদা শ্রেণী বজায় রাখতো এবং এখনো ভেতরে ভেতরে সেটা বেশ আছে। এখনো “good background” এবং “old boy network” বিলেতের সমাজে খুব কাজ করে। যাক সেকথা। তখনকার সময় এটি আরো বেশি করত। আগে যা বলেছি অর্থাৎ ঐ স্কুলে আমার চাকরি না হওয়ারই সম্ভাবনা একশ ভাগ, অথচ আমি অবাক হলাম যে, ঐ স্কুল থেকে একটি ইন্টারভিউর দাওয়াত এসেছে। স্কুলটি ছিল একটি ছেলেদের জন্য ডে স্কুল। অর্থাৎ এটি বোর্ডিং বা মেয়েদের জন্য ছিল না। প্রথমে ইন্টারভিউটা নিলেন স্কুলের হেডমাস্টার মি. মাইকেল টিম্পসন। তাঁকে খুবই অমায়িক এবং উদার মনের মানুষ বলে মনে হলো, আর সেইজন্যই তিনি হয়তো আমাকে ডেকেছেন। তাঁর মধ্যে বর্ণবৈষম্য ভাব আছে বলে মনে হলো না। এটি একটি সৌভাগ্যের বিষয় ছিল আমার জন্য। সাক্ষাতের পর শুধু বললেন, “মনে হয় তুমি over qualified এম.এ. ডিগ্রি আছে

www.pathagar.com

তোমার, আমরা তোমাকে জানাবো।" স্কুলের একটি Board of Governors আছে, সেখানে নামীদামী লোকেরা সদস্য। আমাকে আর একবার ইন্টারভিউতে ডাকা হলো, যদিও এই ধরনের নিয়োগের জন্য হেডমাস্টার নিজেই ছিলেন যথেষ্ট। কিন্তু বোধহয় তিনি কোন ঝুঁকি নিতে চাননি। একে তো প্রাইভেট স্কুল, তারপর আবার আমি ছিলাম কৃষ্ণাঙ্গ প্রধান শিক্ষকের ভাষায় ওভার কোয়ালিফায়েড। আমি বোর্ডের সামনে ইন্টারভিউতে গেলাম। সেখানেও তাঁরা মোটামুটি হেডমাস্টারের সুপারিশটা গ্রহণ করেছেন বলে মনে হলো, কিন্তু এরপরও বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত অভিভাবককে জানানো হলো যে, এইরকম একজন এশিয়ান "কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রলোক" coloured gentleman কে শিক্ষক নিয়োগে তাঁদের কোন আপত্তি আছে কিনা। এমনকি তখনকার সময়ে পুরো Public School Sector-এ Coloured শিক্ষক বোধহয় আমিই প্রথম নিয়োগ পেতে যাচ্ছিলাম। যাই হোক জানতে পারলাম কোন অভিভাবকই আপত্তি তোলেননি বলে শেষ পর্যন্ত আমার নিয়োগটা চূড়ান্ত হয় এবং আমাকে তা জানানো হয়।

প্রথমে একটি কাণ্ড ঘটে। স্কুলে মাত্র কাজ শুরু করেছি হঠাৎ কোন্ এক পাকিস্তানীর কারণে বিলাতে বসন্ত রোগ small pox-এর প্রবেশ ঘটেছে। চারদিকে এ নিয়ে হৈ চৈ—খবরের কাগজে, টেলিভিশনে আলোচনা, বিতর্ক, ইত্যাদি শুরু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সকলেই উৎকণ্ঠিত। আমার কোন মেডিকেল সার্টিফিকেট আছে কিনা হেডমাস্টার ছুটে আসলেন জানার জন্য। এই ধরনের রোগ নিরামক ইনজেকশন নিয়ে দেশ ত্যাগের আগে ডাক্তারের সার্টিফিকেট লাগতো। এখন লাগে কিনা জানি না। তখনকার সময় দশ টাকা দিলে বিনা পরীক্ষায় ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়া যেত। আমিও সে ধরনের একটি সার্টিফিকেট নিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি হেডমাস্টারের হাতে সেই সার্টিফিকেটটা দিলাম, তিনি আশ্বস্ত হলেন। স্কুল থেকে অভিভাবকদের পরদিন জানিয়ে দেয়া হলো যে আমার জন্য কারো উৎকণ্ঠিত হওয়ার কারণ নেই। এ ব্যাপারে আমার সার্টিফিকেট আছে। আমার চাকরি বহাল থাকল।

স্কুলে যোগদানের কিছুদিন পর জানতে পারলাম যে ধনীদের স্কুলে শিক্ষকতা করলেও মি. টিম্পসন এবং তাঁর স্ত্রী দুজনই উদারপন্থী শ্রমিক দলের সমর্থক। যার কারণে চাকরি দেয়ার ব্যাপারে তাঁদের কোন সঙ্কোচ ছিল না। মি. টিম্পসন একজন অতি ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন, অক্সফোর্ড 'ব্লু', পাকিস্তানের প্রথম ক্রিকেট ক্যাপ্টেন আব্দুল হাফিজ কারদারের সহপাঠী। লেখাপড়া শেষে পিতার বিরাট ব্যবসায় না গিয়ে শিক্ষকতায় চলে আসেন। তাঁর পিতা ড্রাইভারচালিত 'রোলস রয়েস' গাড়ি ব্যবহার করতেন এবং তাঁদের পরিবারে এরকম কয়েকটাই গাড়ি ছিল। কিন্তু মি. টিম্পসন সাধারণ গাড়ি চালাতেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন এবং অনেকটা আমার অভিভাবক হয়ে উঠলেন। আমার জন্য এটি একটি বিরাট স্বস্তির বিষয় ছিল। আমি লন্ডনে গেলাম ৬১ সালের শেষের দিকে এবং জানুয়ারি মাসের মধ্যেই আমার এই চাকরিটা হয়ে গেল। অতি চমৎকার, বেতন খুব ভাল এবং থাকা খাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা। সেই স্কুলে পাঁচজন শিক্ষকের আবাসনের

www.pathagar.com

ব্যবস্থা ছিল এবং আমাকে তারা একটি সুসজ্জিত কামরা দিল এবং সবচেয়ে বড় কথা আমাকে রান্না করতে হলো না। ইংলিশ ফুড, ইংলিশ কুক, লন্ড্রীর জন্য আমাকে কাপড় ধুতে হয়নি, আমাকে কামরা পরিষ্কার করতে হয়নি, যেটা আমাদের দেশের প্রায় সকলকেই করতে হয়। আমার মত অন্যদের প্রায় সকলকেই কায়িক পরিশ্রমের চাকরি নিতে হয়েছে পড়াশুনার খরচ চালানোর জন্য। তাঁদের রান্না করতে হয়, নিজের কাপড়চোপড় নিজে কাচতে হয়, নিজের ঘর নিজে পরিষ্কার করতে হয়, নিজের ময়লা নিজে ফেলে দিয়ে আসতে হয়। আমাকে এইগুলোর কোন কিছুই করতে হয়নি। এটি বিরাট একটি সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। শুধু এই ছিল যে, আমাকে পুরোপুরি ইংলিশ কালচারের মধ্যে ডুবে যেতে হলো। থাকা-খাওয়া, চলাফেরা, কথাবার্তা, রীতিনীতি, রুচি সবকিছুর সঙ্গে আমাকে তখন খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে এবং তাদের একজন হয়ে যেতে হয়েছে। সেখানে আলাদা অনেক সুবিধা ছিল, খেলাধুলার সুবিধা ছাড়াও আমাদের পাঁচজন শিক্ষকের জন্য ছিল টেলিভিশন, ইত্যাদিসহ একটি কমনরুম। আমি ছাড়া বাকিরা সবাই ছিল অনেক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইংরেজ শিক্ষক। সেই অবস্থায় আমার সে ধরনের স্কুলে যাওয়া একটি নতুন অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি ইংরেজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সমাজের যা কিছু শিখেছি সবই কিন্তু এই স্কুল থেকে শেখা। বিশেষ করে স্কুলের ছেলেদের এবং শিক্ষক অভিভাবকদের কাছ থেকে। এভাবে আমি নিজেই ওদের কাছ থেকে ইংরেজি বলার কায়দা এবং ইংরেজি উচ্চারণগুলো শিখেছি। এই স্কুলে আমি প্রায় পাঁচ বছর পড়িয়েছি। এই স্কুলে পড়িয়ে আমি ব্যারিস্টারি পাস করেছি, রাজনীতি করেছি, যা কিছু করেছি তখন এই স্কুলে থেকেই করেছি।

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলন

প্রবাসী জীবনে আমাদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলন, যে আন্দোলনের গোড়াপত্তন ঘটে লন্ডনে। তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেব জীবিত ছিলেন এবং শেখ মুজিব তাঁর নেতৃত্বে তখনও পাকিস্তানের সার্বিক আঙ্গিকে রাজনীতি করছিলেন। তাই আমরাই সর্বপ্রথম, ১৯৬২ সাথে তখনকার প্রবাসী ছাত্ররা এই আন্দোলনের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করি। ড. কবির উদ্দিন আহমেদ, আমরা যাকে কবিরভস্কি ডাকতাম, তার উদ্যোগে কিছু স্কলার মিলে তথ্যভিত্তিক একটি দলিল Unhappy East Pakistan তৈরি করা হয়েছিল যা মূলত পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার অর্থনৈতিক দিকটা ফুটিয়ে তোলে এবং এটিকে কেন্দ্র করেই আমরা তখন স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন শুরু করি। সোহরাওয়ার্দী সাহেব মৃত্যুর আগে একবার লন্ডনে এসেছিলেন, সম্ভবত ৬৩ সাল হবে। আর তার পরপরই শেখ সাহেবও এসেছিলেন। আমি তাঁদের কারো সাথে দেখা করিনি কিন্তু আমাদের অনেকেই গিয়ে দেখা করেছিল। তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেব সাক্ষাৎকারীদের বলেই দিয়েছিলেন তিনি আলাদা করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য কিছু বলতে পারবেন

www.pathagar.com

না। কারণ তিনি পাকিস্তানের আঙ্গিকে তখন রাজনীতি করছিলেন, আর তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন পাকিস্তানের। আর শেখ সাহেব বলেছিলেন যে, যতদিন সোহরাওয়ার্দী সাহেব বেঁচে আছেন ততদিন তাঁর পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আলাদা করে স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভবপর নয়। কথাটা ঠিকই। সোহরাওয়ার্দী সাহেব যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন আওয়ামী লীগের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা বলাটা ছিল অসম্ভব।

যাই হোক আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে গেলাম। কিংসক্রসে সেন্ট প্যাঙ্কারস হলে প্রথম সভায় তখন নাম করা লেবার পার্টির বিশিষ্ট নেতা এবং চিন্তাবিদ ডেভিড এনালস এসেছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে। বিরাট সভা হলো সেখানে। পাকিস্তান দূতাবাসের এক ভদ্রলোক, নাম কোরেশী, আমাদের মিটিং বানচাল করার চেষ্টা করেছিল, হৈ চৈ করে একেবারে সবাই মিলে তাকে হল থেকে বের করে দেয়া হলো। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে সেটাই প্রথম উল্লেখযোগ্য সভা ছিল যাতে বাঙালি প্রবাসী ছাত্রসমাজ এবং সাধারণ মানুষ যথেষ্ট সাড়া দিয়েছিল। এই আন্দোলনে বামপন্থী ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তখনকার সময় বিশ্বব্যাপী বাম মনোভাবাপন্ন আন্দোলনসমূহের এক বিরাট ঢেউ উঠেছিল। তাই সকল প্রবাসী ছাত্রই, দেশে যাই করে থাকুক না কেন, বিলেতে প্রায় সবাই তখন বামপন্থী। ড. কবির ছাড়াও এই আন্দোলনের সাথে জাকারিয়া খান, আব্দুর রশীদ, শফিক রেহমান, মনোয়ার হোসেন, বেলায়েত হোসেন, আলমগীর কবির, আবিদ হোসেন, সৈয়দ আমীর আলী, ফজলে হাসান আবেদ, ফজলে আলী, ফজলে লোহানী, সাখাওয়াত হোসেন, মোহাম্মদ শাহজাহান, মনসুর আহমদ, মেসবাহ উদ্দিন এবং আরো অনেকে জড়িত ছিল। প্রথমে গঠন করা হয়েছিল Committee for the Restoration of Democracy in Pakistan (CRDP)। এটি ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রসমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক নামকরা প্রবাসী এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে হামজা আলভি, সফকাতুল্লাহ কাদেরীসহ আরো অনেকে ছিল যাদের নাম এখন মনে পড়ছে না। এরা বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার মানুষ ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধেও এরা ছিল সক্রিয়ভাবে সোচ্চার এবং সহানুভূতিশীল।

পাকিস্তানের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলনের কথা সর্বপ্রথম বলা হয় সেই সভায়। অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল এবং বেশ বড় হল ছিল, কিন্তু লোকসমাগম এত হয়েছিল যে, জায়গা দেয়ার উপায় ছিল না। আমাদের আন্দোলনের পাশাপাশি ছিল তখন আমেরিকার ভিয়েতনাম আক্রমণবিরোধী নিক্সনের বিরুদ্ধে চরম আন্দোলন। Bartand Russell-এর কমিটি অব হান্ড্রেড (Committee of 100)-এর উদ্যোগে হাইডপার্কে লক্ষ মানুষের জনসমাবেশ এবং বিক্ষোভ মিছিল। সেই অনুষ্ঠানগুলোতে আমরা যোগদান করতাম এবং সেই দিনগুলো ছিল, "প্রেম কর যুদ্ধ নয়" (Make Love No War) ব্যাজ পরে ঘুরে বেড়ানোর দিন। ১৯৬০-এর দশক ছিল শতাব্দীর বিপ্লব ও আন্দোলনের দশক। সারা বিশ্বে যুব সমাজের নবজাগরণের যুগ। ইউরোপ, আমেরিকা, এমনকি জাপানের মত দেশে চলছে তখন ছাত্রদের নানা ধরনের আন্দোলন। লন্ডন স্কুল

www.pathagar.com

অব ইকনমিক্সে (LSE) প্রথম শুরু হয় বিভিন্ন দাবি এবং সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর Sit-in কর্মসূচি। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা Stokey CarMichael-এর নেতৃত্বে সেই দেশে তখন চলছিল কালো মানুষের অধিকার আদায়ের ভয়ঙ্কর এক সংঘাতময় সংগ্রাম। আমেরিকার নাকের ডগায় কিউবাতে চলছে ফিদেল কাস্ত্রোর কমিউনিস্ট বিপ্লব। ঐদিকে Che Guevara তখন ছিল বলিভিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লবে নিয়োজিত, পৃথিবীর নানা জায়গায় সাম্রাজ্যবাদদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার চেষ্টা চলছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় চলছে তখন দেশ মুক্তির জোরদার আন্দোলন। সারা পৃথিবীময় যুব সমাজ তখন চায় একটি আমূল পরিবর্তন, চায় নতুন নেতৃত্ব এবং নতুন একটি লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি। এদেরকে বেশিরভাগই কমিউনিস্ট প্রভাবিত বলে দোষারোপ করা হতো। কিন্তু আসলে তা সঠিক ছিল না। যেমন আমি নিজেও তো কমিউনিস্ট ছিলাম না। উদার মনোভাবাপন্ন যারাই ছিল তখনকার সময়ে, প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদেরকে বামপন্থী বা কমিউনিস্ট বলেই তিরস্কার করত। এখনো মনে পড়ে ট্রাফলগার স্কয়ারে জোন বায়জের সেই গান "We shall over come", Peter O' Tool-এর বক্তৃতা। আমেরিকার ভিয়েতনাম আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এঁরা ছিলেন সোচ্চার। নিক্সনের বিরুদ্ধে "Arrogance is Power" লেখা পোস্টার তখন লন্ডনের সর্বত্র।

যাই হোক স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য লন্ডনের উত্তরে হাই বেরী হিলে একটি বাড়ি কেনা হলো প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের অর্থায়নে এবং বিশেষ করে সিলেট প্রবাসীরা এতে বিরাট একটি ভূমিকা রাখেন। জাকারিয়া খানের তো লেখাপড়াই প্রায় নষ্ট হয়ে গেল এইসব কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করে। ব্যারিস্টার শাহজাহানেরও একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। প্রবাসীদের মধ্যে মিনহাজ উদ্দিন, আব্দুল মান্নান (সানু মিয়া), নেসার আলী, মনফর আলী, গওস খান, আব্দুল মোতালেব, মতিউর রহমান বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেই দিনগুলোর কথা খুবই মনে পড়ে। সেই দিনগুলো ছিল উজ্জ্বল, আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা। স্বপ্নের মত। পূর্ব পাকিস্তানকে আমরা স্বাধীন করব, মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আনব, সাধারণ মানুষের কল্যাণ করব। এক বিরাট আগ্রহ ছিল আমাদের মধ্যে। আব্দুর রশিদ পরে ব্যারিস্টার হয়ে কুষ্টিয়ায় গিয়ে নিজের গ্রাম উন্নয়নের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। কোনদিন আর প্র্যাকটিস করেননি। সৈয়দ আমীর আলী তো লন্ডনেই থেকে গেলেন, আর ফিরে আসেননি। সাখাওয়াত হোসেন ব্যারিস্টার। তিনিও বাংলাদেশে এসেছিলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে, স্বাধীনতার পর চলে গিয়ে আর ফিরে আসেননি, সেখানে প্র্যাকটিস করেন। সাখাওয়াত ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। খুব নাম করা ছাত্রনেতা ছিলেন। ফজলে লোহানী দেশে ফিরে টেলিভিশনে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিল। ফজলে হাসান আবেদ প্রতিষ্ঠা করলেন ব্র্যাক।

জীবনে তখন ছিল এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য। একটি স্পন্দন ছিল। আমরা সকলেই খুব সক্রিয় ছিলাম। প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই অন্তত দুবার তিনবার আমরা বসতাম, সভা করতাম

www.pathagar.com

এবং দেশের সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। আমি তখন তুলনামূলকভাবে বয়সে তরুণ। ইস্ট পাকিস্তান হাউসে হোস্টেল করা হলো। সেখান থেকে আমরা দুটো পত্রিকা বের করতাম, একটি ইংরেজি ও একটি বাংলায়। "এশিয়ান টাইড" আর "পূর্ব বাংলা।" আমরা সাইক্লোস্টাইল মেশিন কিনেছিলাম। ইস্ট পাকিস্তান হাউস থেকে আমরা সেই পত্রিকাগুলো রীতিমত বের করতাম। দেশ স্বাধীন করার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে আমাদের একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁরা তখন প্রচণ্ড সমর্থন দিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে আমি ইস্ট পাকিস্তান হাউসের সেক্রেটারি ছিলাম এবং এই দুটো পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বও আমার ওপর এসে পড়ে। তখন আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। সারাদিন স্কুলে পড়িয়ে নিজস্ব কেনা গাড়িতে চলে আসতাম। প্রায় রাত ১০টা ১১টা পর্যন্ত ইস্ট পাকিস্তান হাউসে থাকতাম এবং প্রথমে এ দুটো সাময়িকী সাপ্তাহিক হিসেবে বের করতাম, পরে আর্থিক কারণে প্রতি সপ্তাহে বের করা সম্ভবপর হয়নি।

লন্ডনে আমাদের জীবনের আর একটি দিক ছিল, আমরা অনেক পার্টি করতাম এবং প্রায় প্রতি শনিবারেই কারো না কারো বাড়িতে পার্টি থাকত এবং আমরা আমাদের প্রবাসী জীবন খুব উপভোগ করেছি। আমাদের অনেকের বান্ধবী ছিল। ইংরেজ বান্ধবীরা আমাদের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করত। তাদের মধ্যে একটি সংবেদনশীলতা ছিল। আমরা সবাই দেশের জন্য কাজ করছি এটি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করত। প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কাজ করেছে আমাদের সঙ্গে। সভা, সমাবেশ, মিছিলে থাকত, সকল কাজে সাহায্য করত। এটি ছিল একটি বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা। আমরা থিয়েটার দেখতে যেতাম। লন্ডন থিয়েটারের জন্য একেবারে বিশ্ববিখ্যাত। পৃথিবীর অন্য কোথাও এত চমৎকার নাট্যশিল্পের ঐতিহ্য নেই।

ছয় বৎসর আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম, এর মধ্যে দেশে ফিরিনি। পড়াশুনা শেষ করে একবারেই দেশে ফিরেছি। ব্যারিস্টারি পাস করার পরও আমাকে প্রায় দেড় বছর ইংল্যান্ডে থেকে যেতে হয় রাজনৈতিক কারণে। আইয়ুব খানের তখন দুর্দান্ত প্রতাপ এবং আমার মামা জনাব আব্দুর রশীদ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম বাঙালি সচিবদের মধ্যে একজন। তিনি তখন পাকিস্তানের যোগাযোগ সচিব। তিনি খবর পাঠালেন যে আমি যাতে এখন দেশে না ফিরি। তার বছরখানেক আগে সরকারপ্রধান হিসেবে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আইয়ুব খান লন্ডনে এসেছিলেন। বাকিংহাম প্রাসাদের কাছে মারলবারা হাউসে কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানদের নৈশভোজ ছিল। আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। যে রাস্তা দিয়ে আইয়ুব খানের গাড়ি যাবে সেই রাস্তার একটি কোনায় আমরা বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত অবস্থান নিলাম। সেখানে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশ। আমাদের বিক্ষোভে কোন প্রকার বাধা দেয়নি। সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনের লোকজন ছিল। যখন আয়ুবের গাড়ি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল আমরা ডিম এবং টমেটো ছুড়ে মেরেছিলাম প্রচণ্ড শ্লোগানের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান দূতাবাস এবং সরকার স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত হয়। আমরা অনেকেই ছিলাম। সে কারণে আমাদের

www.pathagar.com

অনেকেরই দেশে আসা তখন রাজনৈতিক কারণে একটি বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। একে তো স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলন, তার ওপর এই ঘটনা।

এসব কারণে ৬৬ সালে পাস করলেও আমি দেশে ফিরলাম ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে। আমার প্রায় সাড়ে চার বছর লেগেছে ব্যারিস্টারি পাস করতে অথচ কোর্স ছিল তিন বছরের। বেশি লেগেছে, কারণ আমাকে চাকরি করে লেখাপড়া করতে হয়েছে। এছাড়াও ছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। মনোয়ার হোসেন থেকে ১৬৮ পাউন্ড ধার নিয়েছিলাম ভর্তি হওয়ার জন্য, স্কুলে চাকরি পাওয়ার পর সে টাকা প্রথমেই ফেরত দিতে হয়েছে। বাবা যে ৪০ পাউন্ড দিয়েছিলেন তা ছিল অতি সামান্য। জানুয়ারি থেকে স্কুলের চাকরিটা নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর এই মধ্যবর্তী মাসখানেক সময়টা ব্যবহার করার জন্য যে কোন ধরনের একটি সাময়িক কাজ খোঁজার চেষ্টা করলাম। বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে যে কোন কাজই ভাল। অবসর বা ছুটির সময় কোন ছাত্রই বিলেতে বসে থাকে না। যতই অবস্থাপন্ন হোক না কেন। নানা রকমের কাজ করে তারা রোজগার করে, নিজের ইচ্ছামত খরচ করার জন্য। কেউ তা দিয়ে নিজেদের ন্যূনতম খরচ মেটায়, কেউ সে অর্থ দিয়ে ইউরোপ আমেরিকায় যায়, ফুর্তি করে। কেউ জমিয়ে রাখে ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনার জন্য।

এ ধরনের চাকরি আমি নিজেও করেছি দুবার। প্রথমবার স্কুলে যোগদান এবং পড়াশুনার কোর্স শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে আর একবার পড়াশুনা শেষ করার পর দেশে ফেরার আগে। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো যীশুর জন্মদিন। ২৫ ডিসেম্বর Christmas Day। এই দিনটির জন্য সারা বছর তারা বসে থাকে। পয়সা জমায় খরচ করার জন্য। পরিবার পরিজন আত্মীয়স্বজন বন্ধুদের মধ্যে বিনিময়ে করে উপহার, আর তারও বৃহত্তর পরিসরে বিনিময় করে শুভেচ্ছা কার্ড। উপহার না দিলেও হাজার দূরে থাকুক, অন্তত একখানা কার্ড পাঠিয়ে একজন আর একজনকে স্মরণ করে, শুভেচ্ছা পাঠায়।

এই সময় পোস্ট অফিসগুলোতে কাজ অনেক বেড়ে যায়। তাদের অতিরিক্ত লোকবলের প্রয়োজন পড়ে। লন্ডনে প্রধান পোস্ট অফিস হলো সেন্ট পলস্-এ। সেখানে পোস্টম্যানের জন্য টেস্ট পরীক্ষায় প্রথম হলাম। সকলেই নবীন ছাত্র। আমি বোধহয় একাই এম.এ. পাস করা ছাত্র ছিলাম। আমাকে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে চিঠি বা পারসেল বিলি করতে হয়নি, যদিও সেইজন্য মানসিক প্রস্তুতি ছিল। সারা রাত জেগে চিঠিগুলো এলাকাভিত্তিক বাক্সে ভরে রাখার কাজ ছিল আমার। ওরা বলে sorting। বাইরে শীত আর বরফের মধ্যে হেঁটে হেঁটে বিলি করার চেয়ে এটি অনেক আরামের কাজ ছিল। পরীক্ষায় যারা ভাল করেছিল তাদেরকে sorting অর্থাৎ বাছাইয়ের কাজ দিয়েছিল। পারিশ্রমিক ছিল খুব ভাল। তিন সপ্তাহ কাজ করে তখনকার মূল্যে প্রায় ৫০ পাউন্ড পেয়েছিলাম। তখনকার সময় সপ্তাহে আড়াই পাউন্ডে সুসজ্জিত কামরা পাওয়া যেত আর খাওয়াদাওয়ার জন্য আরো আড়াই পাউন্ড হলে যথেষ্ট ছিল। বাকি টাকা জমিয়ে রাখলাম অন্যান্য খরচের জন্য। দেশে ফেরার আগে শেষ Christmas ছুটিতে আর একবার চাকরি করেছি গাড়ির চালক

www.pathagar.com

হিসেবে। অর্থাৎ মিনি ক্যাব ড্রাইভার হিসেবে। আমার একটি গাড়ি ছিল। নিয়ম ছিল সেই গাড়িসহ মিনি ক্যাব কোম্পানির চাকরি চাইলে বড়দিন বা গ্রীষ্মের সময় এ ধরনের সুযোগ পাওয়া যেত। নিজের গাড়ি নিজে ড্রাইভ করা, কিন্তু যাত্রী কোম্পানির, ভাড়াও তাদের। আমার জন্য সাপ্তাহিক বেতন আর যাত্রীদের বকশিশ। আমেরিকান টুরিস্টরা পয়সাও দিত অনেক। বেশ ভাল একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল তিন সপ্তাহের জন্য।

আমি অনেক পরিশ্রম করেছি, খেটেছি অনেক কিন্তু তার সাথে সাথে লাইফকে উপভোগও করেছি এবং সবদিকেই আমাদের খেয়াল ছিল, সবকিছুতেই আগ্রহ ছিল। আমার দুই রকমের জীবন ছিল। একটি ছিল রাজনৈতিক জীবন, আর একটি সামাজিক জীবন। বাংলাদেশী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে রাজনৈতিক জীবনটা কাটিয়েছি আর পাশাপাশি সামাজিক জীবনের অনেকটা কেটেছে ইংরেজদের সঙ্গে। আমার ইংরেজ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একটি সামাজিক বন্ধন গড়ে উঠেছিল এবং ইংলিশ পরিবারের সঙ্গে প্রত্যেকটা ক্রিস্টমাস কাটিয়েছি এবং বিশেষ করে আমাদের হেডমাস্টার মাইকেল টিম্পসন এবং তার স্ত্রী ও পরিবারের সাথে। ক্রিস্টমাস ক্যারলে যেতাম হ্যাম্পস্টেডের সেই প্রসিদ্ধ চার্চে। আমার বন্ধু এবং সহকর্মী শিক্ষক ডেভিড লান্ড, পিটার লান্ড—এরা দুই ভাই, নাটক এবং সঙ্গীত নিয়ে ব্যস্ত থাকত। তারপর ছিল ক্রীস আরনল্ড, ওয়েডিংটন জোনস এবং আরো অনেকে। এদের কথা ভোলার নয়। তবে দুটো জীবনের মধ্যে একটি ভারসাম্য ছিল।

আমাদের সময়কার গ্রুপটা খুবই ভাল ছিল। আমরা প্রায় সকলেই দেশে ফিরে আসি। আলমগীর কবির হয়ে উঠেছিলেন একজন বিরাট চিত্রনাট্যকার এবং প্রযোজক, পরিচালক হিসেবে খুব নাম করেছিল আমাদের দেশে। তিনি একটি দুর্ঘটনায় মারা যান। ব্যারিস্টার আবুল খায়ের *হলিডে* পত্রিকার এখনো প্রকাশক। ব্যারিস্টার রশিদ তো কুষ্টিয়ার গ্রামে একেবারে মিশে গেলেন মানুষের সেবা করার জন্য। ফজলে হাসান আবেদ খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন। আমরা তাকে প্রিন্স অব ক্যামডেন ডাকতাম। সেই ফ্যাশনেবল জীবন ছেড়ে এসে এখানে নিজেকে দেশের ছিন্নমূল মানুষের উন্নয়নে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করলেন। সিলেটের গ্রামে রাতের পর রাত কাটিয়েছিলেন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে। আমাদের প্রত্যেকেই ফিরে এসে একটি সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে নিজেদের জড়িত করেছি। আমরা দেশে ফিরে এসেছিলাম একটি আবেগ নিয়ে। দেশের মানুষের জন্য কাজ করার জন্য, দেশে থাকার জন্য।

যে যত কথাই বলুক, দেশে যতই প্রতিকূল অবস্থা থাকুক না কেন, দেশ তো দেশই এবং এখানে যারা থাকে তারা ভাল থাকুক, মন্দ থাকুক, জীবনে কিছু সফলতা অর্জন করুক আর নাই করুক, এই ঘাত-প্রতিঘাত এবং টেনশন নিয়েও দেশের মাটির টান ভিন্ন। একথা সত্য যে এই সমাজের অনেক দিক আছে যা খুব করুণ এবং এটি একটি unjust এবং unfair society। তারপরেও এই দেশে বেঁচে থাকাটাই তো সবচেয়ে বড় কথা এবং এই দেশেই থাকতে হবে। একজন, সে যে দলই করুক না কেন, যে কোন মতাদর্শী হোক, যা আর একজনের পছন্দ নাও হতে পারে, কিন্তু বাস্তব হলো আমরা

www.pathagar.com

দেশে আছি এবং আমরা এই সমস্ত ভালমন্দ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যে যা পারছি, যার যতটুকু করার আমরা করছি এবং করে চলেছি এবং এটিই তো আমাদের জীবনের সবচেয়ে পরম তৃপ্তি, আনন্দ। জানি এর মধ্যে অনেক ক্ষোভ, অনেক দুঃখ, অনেক করুণ কাহিনী জড়িত। অনেক নালিশ আছে, অনেক তিক্ততা আছে, হতাশা আছে কিন্তু তারপরেও মনে হয় সবকিছুতেই একটি চ্যালেঞ্জ আছে। যারা দেশে ফেরেনি, যারা বিদেশে থেকে গেছে, বিদেশে কাজ করছে তাদের কোন ঝামেলা নেই, কোন বিশৃঙ্খলা নেই, সবকিছু পরিকল্পিত, একটি সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ আর আমাদের এখানকার তুলনায় তারা অনেক ভাল থাকে, কিন্তু দিনের শেষে দেখা যাবে আমরা যারা এখানে আছি, সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমাদের এই অস্তিত্বটাই আসল অস্তিত্ব। যারা বিদেশে থেকে গেছে তাদের জীবন একঘেঁয়ে, বৈচিত্র্যহীন এবং তাদের হতাশা অনেক বেশি। দেশের জন্য, সমাজের জন্য তারা কিছু করতে পারলো না, এই আক্ষেপটা অনেকের মধ্যে থেকে যায়। তাই আমরাই ভাল আছি। আমরা যারা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলন লন্ডনে শুরু করেছিলাম তারা প্রায় সকলেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আমার যে ভূমিকা ছিল সেটা আমি বর্ণনা দিয়েছি এবং আরো অনেকে যারা এইজন্য নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে কাজ করেছে তাদের সকলের কথাই আজও মনে পড়ে।

৬ বছর পরে যখন লন্ডন থেকে দেশে ফিরে আসলাম তখন আইয়ুব খানকে আজীবনের জন্য প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব চলছে। আমি এসে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হলাম না, পেশায় জড়িত হলাম। তার একটি কারণ ছিল। ছাত্রজীবনে আমাদের পিছনে ছোটখাটো এজেন্ট যারা গোয়েন্দাগিরি করত তাদের অনেকে এখন অফিসার হয়েছেন। এদেরই একজন অফিসার আমাকে বাড়িতে এসে বলে গেলেন, আমি রাজনীতি না করে যদি পেশায় নিয়োজিত হয়ে যাই তাহলে সরকার আমাকে আর ডিস্টার্ব করবে না। পেশায় থেকে আমি আর কতটুকুই বা করতে পারব! সেইজন্য আমি যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় নিজেকে নিয়োজিত করে ফেললাম, পেশাগত কাজ হিসেবে, তখন তাদের বলার কিছু থাকল না। এত বড় একটি রাজনৈতিক মামলার মধ্যে আমি এত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছি কিন্তু পাকিস্তান সরকার তখন এই মামলার কারণে আমাকে কোন রকমের অপমান বা হয়রানি করেনি। অথচ ১৯৭৪ সালের জরুরি আইন ঘোষণার পরপরই শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার আমাকে গ্রেপ্তার করে অনেক হয়রানি করেছিল। শান্তিনগরের গোয়েন্দাদের "নির্যাতন ভবনে" সাত দিন রেখে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিল। তখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন বার বার করা হয়, কেন আমি রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে অত মামলা করতে গেলাম। সেই তুলনায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলার সময়, যদিও গোয়েন্দারা সবসময় আমাদের পিছনে লেগে থাকত, কিন্তু নাজেহাল করেনি। শেখ মুজিবের আমলে যেমন পুলিশ আমার চেম্বারে এসে সেই চঞ্চল সেন, অরুণা সেন, শান্তি সেন, ওয়াহিদুর রহমান, টিপু বিশ্বাস এবং আরো অনেকের ফাইলগুলো তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করেছিল, সেরকম কিন্তু পাকিস্তানের

www.pathagar.com

আমলে করেনি। এই কথাগুলো এইজন্য বলছি যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, অত্যাচার, নির্যাতন নিপীড়নের মাত্রা অনুন্নত দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে আরো বেশি যে হতে পারে এটি ছিল তারই প্রমাণ। যাই হোক দেশে ফিরে পেশায় নিয়োজিত হওয়ার পরও শৈশব এবং যৌবনের লালিত সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনাবোধ থেকে উদ্ভূত মনের সেই ব্যাকুলতা, সেই আবেগ, দেশের জন্য সেই টান, সেই ভালবাসা এবং দেশের মানুষের জন্য কাজ করার আকাঙ্ক্ষা আর স্পৃহা থেকেই গেল। সেকারণেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় নিজেকে নিয়োজিত করেছি, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ হওয়ার পর কমিটি ফর সিভিল লিবারটিজ অ্যান্ড লিগ্যাল এইড গঠন করেছি। আওয়ামী লীগের অত্যাচার, নির্যাতন যখন চরম পর্যায়ে তখন প্রেস ক্লাবে আমরা শেষোক্ত কমিটিটি গঠন করেছিলাম। আমাকে সেক্রেটারি করা হয়েছিল এই সংগঠনের।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, গণঅভ্যুত্থান এবং গোলটেবিল বৈঠক

জাতি গঠনের এই আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নকে আওয়ামী লীগই লালন করেছে প্রায় দুই যুগ। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ছিল বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের একটি রাজনৈতিক বাহন। পূর্ব পাকিস্তানে তখন ধনিক শ্রেণী ছিল না বললেই চলে। এখানে জমিদারি প্রথা উঠে যাওয়ার পর সামন্তপুঁজির অবসান হয়। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থাৎ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতির নেতৃত্বের শ্রেণীগত চরিত্র ছিল ধনিক এবং সামন্তপুঁজিপতিদের সমন্বয়ে গড়া একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী। দেশের দুই অংশের দুই ধরনের নেতৃত্বের সংঘাত তখন থেকেই শুরু। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি দেয়ার পর আওয়ামী লীগ সংগঠনে বাঙালি নিম্ন মধ্যবিত্ত, কৃষিভিত্তিক জনসমষ্টি এবং যুবকদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ওপরের নেতৃত্বের শ্রেণীগত চরিত্র মধ্যবিত্ত থাকলেও নিচের দিকে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী শক্তির চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যতই আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে ততই যেন সুবিধাবাদীরা সংগঠনের শীর্ষদেশে স্থান পেয়েছে, অপরদিকে নিচের দিকে সংগ্রামী চেতনার যুবক শ্রেণী রাজনীতির মূল শিখণ্ডিকে তাদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে এনেছে। এর ফলেই আওয়ামী লীগকে তার পুরোনো সাম্প্রদায়িক নীতি বিসর্জন দেয়া থেকে শুরু করে ক্রমশ আরো জাতীয়তাবাদী এবং প্রগতিশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। ফলে দেশ ১৯৬৮-৬৯ সালে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের পর্যায় পৌঁছার সাথে সাথে সংগঠনের প্রায় সম্পূর্ণটাই ছাত্র-যুবকদের কর্তৃত্বের অধীনে চলে যায় এবং জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল শক্তিরা দলের কর্মসূচিতে তাদের চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটাতে শুরু করে। যদিও দলের ওপরের নেতৃত্ব মূলত মধ্যবিত্ত এবং উঠতি পুঁজির প্রতিনিধিত্ব করেছে, কিন্তু নিচের নতুন শক্তির চাপে দলের কর্মসূচিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের অঙ্গীকার দিতে হয়েছে। গরিব এবং কৃষকের, যুবকবাহিনী ও নিম্ন মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে উঠতি পুঁজি সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় রাখার চেষ্টা করতে হয়েছে কেন্দ্রীয় নেতাদের।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আন্দোলনের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয়ার পর শেখ মুজিব যখন বাংলাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং একচ্ছত্র নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সংগ্রামের নেতৃত্ব ছাত্র যুবকদের

www.pathagar.com

হাতে চলে গেছে এবং ওদেরকে সাথে নিয়েই তাঁকে সামনে এগুতে হবে। সেবার তিনি প্রায় তিন বছর একটানা জেলে ছিলেন। বাইরের মানুষের যে এত পরিবর্তন হয়েছে, গণজাগরণের ব্যাপকতা এবং চেতনাবোধ যে এত শক্তি সঞ্চয় করেছে জেলের মধ্যে জনবিচ্ছিন্ন অবস্থায় মুজিবের পক্ষে সেটা প্রথমে অনুমান করা সম্ভব হয়নি। এই কারণেই আইয়ুব খানের আহুত গোলটেবিল বৈঠকে প্রথমে তিনি প্যারোলে যেতে রাজি হয়েছিলেন। এই আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল খুব অল্প সময়ের মধ্যে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হওয়ার প্রায় ছয় মাস যেতে না যেতেই আন্দোলন দুরন্ত গতি লাভ করে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি শুরু করা হয় বেশ পরিকল্পিতভাবে। ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে বিলেত থেকে ফিরে আসার পর ডিসেম্বর মাসেই পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর দু'জন সাবেক সদস্য সুলতানুদ্দিন এবং কামালউদ্দিনের জন্য হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস দরখাস্ত করি আমরা ক'জন। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম এবং মামলা পরিচালনা করেন জনাব হামিদুল হক চৌধুরী। তাঁদের ওপর শারীরিক নির্যাতন এতটাই হয়েছিল যে, তাঁদের জন্য বিচারপতি বাকের কোর্ট থেকে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করার নির্দেশ দিলেন। এই দরখাস্তের তিন সপ্তাহ যেতে না যেতেই ৬ জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা ঘোষণা করে এবং ২৮ জন ব্যক্তিকে এই মামলার আসামি হিসেবে কাগজে তাদের নাম পরিচয় প্রকাশ করে। সুলতানুদ্দিন আর কামালউদ্দিন একজন আর একজনের ভগ্নিপতি। মামলায় সুলতানউদ্দিন ৪নং আসামি ছিলেন আর কামালউদ্দিন ছিল এপ্রুভার। মামালর সময় কামালউদ্দিন উল্টো কথা বলে বিবাদীদের পক্ষে বক্তব্য রেখে অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।

যাই হোক এর ১২ দিন পর ১৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার অস্ত্রের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটিয়ে দেশকে বিভক্ত করার দায়ে শেখ মুজিবকে এই ষড়যন্ত্র মামলায় আসামি করার কথা ঘোষণা করেন। এরপর আরো ছ'জনের নাম যোগ দিয়ে মোট আসামিদের সংখ্যা দাঁড় করানো হয় পঁয়ত্রিশে। তখন আমরা চারজন তরুণ আইনজীবী শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করার জন্য গোপনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই। আমরা কেউ আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলাম না। আওয়ামী লীগের দুয়েকজন ছাড়া প্রায় সব নেতাই তখন জেলে, আর না হয় গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন। সংগঠন বলতে কিছুই ছিল না, বাইরে আর যাঁরা ছিলেন তাদের প্রায় সবাই নিশ্চুপ। ওদের দলীয় অফিসও বন্ধ থাকে। শেখ মুজিবের সাথে আমার তখন পর্যন্ত কোন ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল না। কিন্তু তবুও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে তার পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করব। কারণ ছিল একটিই, বাঙালিদের জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের নেতার ফাঁসি হবে কোন আইনগত প্রতিবাদ ছাড়া, একথাটা যখন আমাদের ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েরা শুনবে তখন কি বলবে? কি বলে ইতিহাসের কাছে আমরা জবাব দেব? তখন মাত্র বিলেত থেকে ফিরেছি। সেখানে আমরা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলন করেছি। মনের মধ্যে তখন অনেক আবেগ-আদর্শ, উত্তরপুরুষদের কাছে নিজেদের বিবেককে পরিষ্কার রাখার জন্যই মুজিবের পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হলো।

www.pathagar.com

আমরা ঠিক করলাম এই মামলায় শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করার জন্য বিদেশ থেকে একজন নামকরা আইনজীবী আনব। ততদিনে মুজিবকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সরিয়ে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউ তা জানত না। তাঁর পরিবারও নয়। এটুকু জানা গেল ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনি আর নেই। জানুয়ারি মাসের শেষের দিক হবে আমরা, ব্যারিস্টার কে. জেড. আলম, ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন, ব্যারিস্টার আবুল খায়ের খান গেলাম ৩২নং ধানমন্ডিতে বেগম মুজিবের সাথে দেখা করতে। টিমটিম করা অল্প পাওয়ারের একটি বাল্ব জ্বলছে। বাড়িতে লোকজন নেই, নিষ্প্রভ, নিষ্প্রাণ ভাব। বৈঠকখানা অগোছাল, খুব বেশি ব্যবহার হয় বলে মনে হলো না। অল্পক্ষণ পর বেগম মুজিব নেমে এলেন। আমাদের কাউকে উনি কোনদিন দেখেননি, আমরাও তাকে কোনদিন দেখিনি। আমাদের পরিচয় দিয়ে তাঁকে আমাদের প্রস্তাবটা জানালাম। তাঁর চেহারায় সন্দেহ এবং হতাশা প্রচুর। আমাদের কথা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। স্বামীর এই অবস্থায় তিনি তো বরাবরই অভ্যস্ত, কিন্তু এবার একেবারে আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তার ধারণা এবার তারা ওকে মেরে ফেলবে। আমাদের বললেন, "আমার বাড়ির ওপর দিয়ে এখন কাক পর্যন্ত ওড়ে না। আত্মীয়স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবরা এই রাস্তা দিয়ে আর যায় না, আমাদের বাড়ি এড়াবার জন্য অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে যায়। বন্ধু-বান্ধবরা যারা তার (মুজিবের) কাছ থেকে উপকার পেয়েছে তারাও আর আসে না, আপনাদেরকে তো আমি চিনি না।" বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এর চেয়ে আর বেশি কিছু বললেন না। আমরা হতাশ হয়ে ফিরে আসলাম।

এরপর আমরা তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) সাহেবের সাথে ব্যাপারটা আলাপ করি। তিনি খুবই উৎসাহ দেখালেন। তাঁকে নিয়ে আমরা বেগম মুজিবের সাথে দেখা করলাম এবং মানিক মিয়া সাহেবের বাসায় আমরা এ নিয়ে কয়েকটা বৈঠক করলাম। তখন বেগম মুজিব আস্তে আস্তে আমাদের বিশ্বাস করা শুরু করলেন এবং তাঁর মধ্যে একটি নতুন আশার ছাপ লক্ষ্য করা গেল। তিনি আমাদের সমর্থন দেয়া শুরু করলেন। এর প্রায় এক মাস পর বেগম মুজিব তাঁর এক আত্মীয়কে নিয়ে আমাদের কায়েতটুলীর বাসায় হঠাৎ একদিন রাত প্রায় ১২টার দিকে এসে শেখ মুজিবের সই করা একটি ওকালতনামা দিয়ে বললেন সব আয়োজন করতে। ঢাকা হাইকোর্টে আইনজীবীদের একটি প্রতিরক্ষা কমিটি করার চেষ্টা প্রথমে ব্যর্থ হয়। সিনিয়র উকিলরা ওকালতনামায় কেউ সই দিলেন না। তখন আইয়ুব খানকে জীবনের জন্য প্রেসিডেন্ট করার কথাবার্তা চলছে এবং একটি সাধারণ ধারণা ছিল যে আইয়ুব আরো অনেক দিন ক্ষমতায় থাকবেন। অনেকে আমাকে উপদেশ দিলেন এই ব্যাপারে না জড়াতে— আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। অনেকের কথা আমার মনে পড়ে যাঁরা শেখ মুজিবের নিকটের লোক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে ক্ষমতাও ভোগ করেছেন কিন্তু তখন এগিয়ে আসেননি। আমাদের এড়িয়ে চলেছেন। ওকালতনামা সই করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

লন্ডনে তখন জাকারিয়া খান এবং আমাদের আরো বন্ধুবান্ধব ছিল যারা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে অনেক সংগ্রাম করেছে। বিলেতে কোন ব্যারিস্টার নিয়োগ করতে হলে একটি সলিসিটর ফার্মের মাধ্যমে করতে হয়। জাকারিয়ার

www.pathagar.com

নেতৃত্বে সেখানকার বাঙালিরা স্যার টমাস উইলিয়ামসের সঙ্গে আলোচনা করে বার্নাড সেরিডনের মাধ্যমে তাঁকে নিয়োগ করল। অত্যন্ত গোপনে আমার এক ইংরেজ বন্ধু ডেভিড লান্ডের ঠিকানায় লন্ডনে চিঠি লেখা হতো। শেষ পর্যন্ত সেই বন্ধুর মাধ্যমে সবকিছু সম্পন্ন করে আমরা ঢাকায় পুরো প্রস্তুতি নিলাম। ততদিনে শেখ সাহেবের সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছে। টম উইলিয়ামস আসার ব্যাপারটা আমরা অনেক দিন গোপন রেখেছিলাম এবং শেষে আমার বন্ধু পিটার হেজেল হার্স্টকে দিয়ে লন্ডন *টাইমস*-এ প্রথম খবরটা ছাপানো হয়। এর পর দেশেও একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। টম উইলিয়ামস আসছেন জেনে এবার অনেক আইনজীবীও উৎসাহ দেখালেন এবং শেষ পর্যন্ত জনাব আব্দুস সালাম খানের নেতৃত্বে আইনজীবীদের একটি প্রতিরক্ষা কমিটি ঢাকায় গঠন করা সম্ভব হয়।

এরপর সে অনেক ঘটনা। ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-বিপত্তি, সরকারের কড়া নজরদারি, সে অনেক কথা। তবে টম উইলিয়ামসের ঢাকা আগমন এবং ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্টে তার মামলা পরিচালনায় চারদিকে একটি নতুন আলোড়ন এবং উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ, হামিদুল হক চৌধুরী, একে ব্রোহী, সবাই এগিয়ে এসেছিলেন সাহায্য করার জন্য। টম উইলিয়ামসের জুনিয়র এবং সচিব হিসেবে আমাকেই সবকিছুর আয়োজন করতে হয়েছিল তখন। পুরোনো হাইকোর্টে টম উইলিয়ামস যেদিন রিট-পিটিশন পেশ করতে গেলেন আদালত লোকে লোকারণ্য। প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকী আবেদনপত্র শুনে যখন রুল জারি করলেন সেদিন সারা দেশে এর একটি দারুণ প্রতিক্রিয়া হলো। আওয়ামী লীগের নেতারা, যারা ভয় পেয়ে লুকিয়ে ছিলেন তাঁরা তখন বাইরে এসে দাঁড়ালেন সামনের কাতারে। তবে মোল্লা জালালউদ্দিন আর সামসুল হক সাহেব প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে জড়িত ছিলেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। আমি গোপনে তাঁদের নিয়ে চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম টম উইলিয়ামসের খরচ বাবদ তাঁর সলিসিটরের কাছে হুন্ডির মাধ্যমে একজন বিশ্বস্ত লোকের মারফত ২০ হাজার টাকা পাঠানোর জন্য। টম উইলিয়ামস একজন নামকরা আন্তর্জাতিক আইনজীবী ছিলেন। রোডেশিয়া এবং পৃথিবীর আরো অন্যান্য দেশে রাজনৈতিক মামলা করেছেন অনেক। লেবার পার্টির একজন এমপি ছিলেন। সমাজে তাঁর অবদানের জন্য ব্রিটেনের রানী তাকে নাইটহুডে ভূষিত করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কার্যক্রম যতই এগুতে থাকল বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাবোধ ততই সুদৃঢ় হতে থাকে। সামগ্রিক রাজনৈতিক হতাশার পর আগরতলা মামলার প্রতিক্রিয়া জনগণের বিক্ষোভকে আরো তীব্রতর করে তোলে। মামলার প্রতিদিনের বিবরণীর ধারাবাহিক প্রচারের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কথা আরো প্রকটভাবে জনগণের মধ্যে রেখাপাত করে এবং এর এমন এক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যা পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনকেও নাড়া দিতে সক্ষম হয়। আইয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এতদিনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু করে। তাই এয়ার মার্শাল আসগার খানের এবং পরে নভেম্বর মাসে জুলফিকার আলী ভুট্টোর ডাকে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি বড় রকমের রাজনৈতিক সাড়া দেখা দিল। ১ এবং ২ ডিসেম্বর

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সভা এবং মিছিলের আয়োজন করে। ৬ ডিসেম্বর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে পল্টনে এক বিরাট জনসভা করেন এবং ঐ জনসভা থেকে ৭ ডিসেম্বর হরতালের ডাক দিলে ঐ হরতাল সম্পূর্ণভাবে সফল হয়। বগুড়ার পাঁচবিবিতে ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় মৌলিক গণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে কোন নির্বাচন হলে সেই নির্বাচনকে তারা বর্জন করবেন বলে ঘোষণা করা হয় এবং সেই নির্বাচন যাতে হতে না পারে তার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়। কিন্তু আইয়ুবের চীনমুখী নীতির জন্য এতদিন তাঁর বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী এবং ন্যাপের ভূমিকা ছিল অতি নরম। তাই মওলানার সভা এবং হরতাল সফল হলেও সেগুলো মূলত ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আইয়ুবের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক আন্দোলনের সূচনার বহিঃপ্রকাশ। মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা থাকলেও ন্যাপের গত কয়েক বছরের বাঙালি জাতীয়তা-বিমুখ ভূমিকার জন্য জনগণ তাদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। তাই ক্রমেই তখন সবকিছুর মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং শেখ মুজিবুর রহমান।

তখন আওয়ামী লীগের অবস্থা সাংগঠনিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল ছিল এবং কোন একটি বড় ধরনের আন্দোলন করার শক্তি তার ছিল না। তাছাড়া আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ নেতাকর্মী তখনও জেলে, আর তাদের মূল নেতা শেখ মুজিব তখন ফাঁসির কাঠগড়ায় বিচারাধীন। কোন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার মত তখন অন্য আর কোন শক্তিশালী নেতা বা সংগঠন ছিল না। এই নেতৃত্বের শূন্যতার মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ আবির্ভূত হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে অনেকটা ধূমকেতুর মত। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের নিয়ন্ত্রণ এবং নেতৃত্ব চলে গেল সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাছে। ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে ১১ দফা কর্মসূচি দেশে এক অভাবনীয় গণজাগরণের সৃষ্টি করে। ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের ছাত্র-যুবক কর্মীরা এই আন্দোলনের সাথে পুরোপুরি মিশে গিয়ে এর গতি আওয়ামী লীগের পক্ষে রাখতে সচেষ্ট হলো। জানুয়ারি মাসের ৭ তারিখে ৮ দফার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগসহ বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক দলগুলো মিলে উভয় প্রদেশে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ, Democratic Action Committee (ডাক) গঠন করে। মওলানা ভাসানী এবং ভুট্টো এই জোটের বাইরে থাকলেন। কিন্তু উপরওয়ালা রাজনীতিবিদদের এই সংগ্রাম পরিষদের ওপর ছাত্রসমাজ আস্থা রাখতে পারেনি। ছাত্র যুবকের জাগরণের সামনে নতুনের সাথে পুরাতনের সংঘাত বাধে এবং তার চরম পরিণতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৪ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের ছাত্ররা দক্ষিণপন্থী নেতাদের ঐ দিনের জনসভার মঞ্চে আর উঠতে দেয়নি, উপরন্তু তারা ঐ বিশাল জনতার কাছে জানতে চাইল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা না গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফা তারা চায়। জনগণ উচ্চস্বরে ১১ দফার পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানালে গোটা আন্দোলনের গুণগত মোড় ঘুরে যায় এবং এই গণজাগরণ প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক যুব শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

www.pathagar.com

এদিকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিকপ্রধান মেজর জেনারেল মোজাফফর হোসেনের সহায়তায় ড. কামাল হোসেন, আমীরুল ইসলাম এবং আমি প্রায় প্রতিদিনই শেখ মুজিবের সাথে ক্যান্টনমেন্টের বন্দিশালায় দেখা করেছি। মুক্তির দুএক মাস আগে এর মধ্যে একদিন শেখ মুজিব আবেগাপ্লুত হয়ে আমার হাত চেপে ধরে আমাকে তাঁর সচিব হিসেবে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতি চান আর আমিও রাজি হয়ে যাই। ওনার সাথে বসে আমরা সব ঘটনার পর্যালোচনা করতাম এবং সব কলাকৌশল ঠিক করতাম। দেশের দুই অংশেরই গণআন্দোলনের চাপে আইয়ুব খান তখন ঐ সঙ্কট নিরসনের জন্য রাজনৈতিক নেতাদেরকে এক গোলটেবিলে মিলিত হওয়ার আহ্বান জানালেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টো আর পূর্ব পাকিস্তানের মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠক বয়কট করলেন। কিন্তু সকলেই জানত শেখ মুজিবকে ছাড়া কোন গোলটেবিল বৈঠক বা রাজনৈতিক সঙ্কটের নিরসন সম্ভব হবে না। কিন্তু শেখ মুজিব তখন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত একজন আসামি এবং তাঁর আবার বিচারও চলছিল। সাক্ষ্য নেয়া প্রায় শেষ পর্যায়।

বাইরের অবস্থা তখনও ততটা সংঘবদ্ধ না হওয়ায় শেখ মুজিব প্রথম পর্যায়ে জামিনে যেতে রাজি হয়েছিলেন। পরে ঠিক করা হলো উনি প্যারোলে মুক্তি পেয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন কিন্তু মামলা চলবে। তাজউদ্দিন আহমদ এবং ড. কামাল হোসেন এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলার জন্য দুবার পশ্চিম পাকিস্তান গেলেন। পাকিস্তান সরকারের খুব ইচ্ছা মুজিবকে গোলটেবিল বৈঠকে হাজির করা এবং তার নেতৃত্বকে সন্দেহপূর্ণ করে তোলা। আর মুজিব বাইরের আন্দোলনের গতি না বুঝে নেতৃত্ব যাতে অন্যের হাতে চলে না যায় এই ভেবে বৈঠকে যেতে রাজি হলেন। বাইরে গুজব রটে গেল যে মুজিবের সাথে আইয়ুবের একটি বোঝাপড়া হয়ে গেছে এবং মুজিব ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আপোস করতে রাজি হয়েছেন। মামলার অন্যান্য আসামিদেরকে পেছনে ফেলে রেখে মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান যাচ্ছেন। আইয়ুব তাঁর তথ্য ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের ঢাকায় পাঠালেন মুজিবের সাথে কথা বলার জন্য। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ক্যান্টনমেন্টে কোর্ট বসানোর আয়োজন হলো মুজিবের প্যারোলের দরখাস্ত মঞ্জুর করার জন্য এবং কথা ছিল সেখান থেকে সোজা তিনি বিমানবন্দরে যাবেন পশ্চিম পাকিস্তান যাওয়ার জন্য। বিমানবন্দরে একখানা উড়োজাহাজ দাঁড় করানো ছিল তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

এদিকে আন্দোলনের চাপে আইয়ুব জরুরি আইন তুলে নিয়েছেন এবং রাজবন্দিদের মুক্তি দিয়েছেন। আন্দোলন তখন মোড় নিয়েছে শুধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দিকে। জনগণের তখন একটিই দাবি "ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করো" আর শ্লোগান একটিই "জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো।" মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান চলে যাবেন শুনে মানুষ অস্থির হয়ে উঠেছে। প্যারোলে যাবেন শুনে তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে ক্যান্টনমেন্টের মুখ পর্যন্ত মানুষের জোয়ার নেমেছে সেদিন এয়ারপোর্ট রোডে। গাড়িঘোড়া সব বন্ধ। লক্ষ জনতার মিছিল আর শ্লোগানে সারা রাজধানী তখন কেঁপে উঠেছে বার বার। আমিও চাইনি যে মুজিব প্যারোলে মুক্তি নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যান,

www.pathagar.com

এইভাবে জনগণকে উপেক্ষা করে, তাদের সাথে দেখা পর্যন্ত না করে, এক একা তখনই পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান। তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) সাহেবেরও একই মত। বেগম মুজিবকে সেদিন সকালে আমরা সেকথা বললাম। ছাত্রনেতারাও সেকথা তাঁকে বলেছে। আরো অনেকে তাঁকে সেকথা বলেছেন।

সেই সন্ধ্যায় আমি আর ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে যাইনি। ভাল লাগেনি আমার কাছে। আমি এয়ারপোর্ট থেকে মানিক মিয়া সাহেবকে টেলিফোন করে বাইরের অবস্থা জানালাম এবং বেগম মুজিবকে সব জানাতে বললাম। এয়ারপোর্টেই আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু শেখ মুজিব জনগণের ভাষা ভাল বুঝতেন। তাঁর রাজনৈতিক অনুভূতিশক্তি ছিল অত্যন্ত সবল। সেদিন সন্ধ্যায় বাইরের লোকদের মধ্যে একমাত্র বেগম মুজিবকেই ক্যান্টনমেন্টে যেতে দেয়া হলো। প্যারোলের দরখাস্ত তৈরি হয়ে গেছে, সবকিছুই ঠিকঠাক। বেগম মুজিব উপস্থিত হয়ে সব যখন বললেন বাইরের ঘটনা শেখ মুজিবের জন্য অবস্থা বুঝতে আর দেরি হলো না। একেবারে শেষ মুহূর্তে দরখাস্ত সই করতে অস্বীকার করলেন, আর বিরাট এক ঝুঁকি নিয়ে বললেন, ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা না হলে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন না। মুজিবকে রাজনৈতিকভাবে শেষ করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। আর মুজিব প্যারোল প্রত্যাখান করেছেন শুনে জনগণের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি আরো বহুগুণ বেড়ে গেল। সারা দেশের মানুষ যেন পর্বতসমান শক্তি নিয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়ালো। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় শত শত মিছিল বেরিয়ে পড়ল।

আইয়ুব বুঝতে পারলেন একমাত্র মুজিবই তখন পারেন দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে। ঘোষণা করলেন যে তিনি পরবর্তী প্রেসিডেন্টের পদের জন্য আর দাঁড়াবেন না। শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন এই সমঝোতায় মামলা প্রত্যাহার করে ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে শেখ মুজিব এবং অন্যান্য সকলকে মুক্তি দেয়া হলো। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। পরদিন ঢাকার রাজপথে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মহান নেতাকে জানালো এক আবেগ ঢালা অভিভাষণ, সোনালী সালাম। এত জনসমাগম সেদিন ছিল যে মুজিবের সান্নিধ্যে পৌঁছাতে আমারই লেগেছিল প্রায় দেড় ঘন্টা। তবে সেদিন সন্ধ্যায় পাকিস্তান টেলিভিশনে শেখ মুজিবের সাথে আমার আলিঙ্গনটাই বেশি করে দেখানো হয়। ২৩ তারিখে মুজিব ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা দিলেন এবং গোলটেবিল বৈঠকে বাংলার মানুষের দাবির ব্যাপারে আপোস করবেন না বলে জানালেন। সেই সভায় আওয়ামী লীগের ছয় দফার সাথে ছাত্রদের ১১ দফা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে নেয়ার কথা শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন। এই সভাতেই বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে জনগণ ছাত্রনেতাদের প্রস্তাবে শেখ মুজিবকে বঙ্গশার্দূল এবং বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে। সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে আজও ভাসে।

২৪ ফেব্রুয়ারি মুজিব ১৭ জন সঙ্গী নিয়ে পিন্ডির উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এর মধ্যে ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম আর আমি আইনজীবী ছিলাম, বাকিরা প্রায় সকলেই আওয়ামী লীগের উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও আরো অনেকে নিজের উদ্যোগে

www.pathagar.com

সেখানে গিয়েছিলেন। আমি মুজিবের অবৈতনিক সচিব হিসেবেও তখন পুরোপুরি কাজে নেমেছি। পিন্ডির পূর্ব পাকিস্তান ভবনে তাঁর পাশের কামরায় আমার থাকার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেছিলেন অন্যদের সরিয়ে দিয়ে। ২৫ তারিখে উদ্বোধনী সভা সেরে ২৬ তারিখেই আমরা ঈদের জন্য ঢাকায় চলে আসি। বৈঠক বসবে আবার ১০ মার্চ।

মুক্তির পর থেকেই মুজিবের ব্যস্ততার কোন শেষ ছিল না। একইসাথে আমারও অবিশ্রান্ত কাজ। সাধারণ মানুষ ছাড়াও প্রতিদিন অগণিত রাজনৈতিক নেতাকর্মীর ভিড়। শতাধিক বিদেশী সাংবাদিক, কূটনীতিক আর পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা সকলেই সময় চায় সাক্ষাতের জন্য। এদের সাক্ষাৎ দেয়ার সময়সূচি নির্ধারণ করার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠক ছিল জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে, তিনি তখন পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা। বিচক্ষণ, articulate এবং charismatic। আইয়ুবের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন শুরু করে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় একচ্ছত্র নেতা হওয়ার পথে। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির দোতলার একটি ঘরে বৈঠকের ব্যবস্থা করা হলো। সেই গুরুত্বপূর্ণ একান্ত বৈঠকে দলের অন্যান্য নেতাদের চলে যেতে বলে শেখ মুজিব শুধু আমাকেই থাকতে বললেন। তখন আমার ওপর তাঁর ছিল অগাধ আস্থা। এটি ছিল আমার জন্য এক বিরাট গৌরবের বিষয় এবং একটি বিরল অভিজ্ঞতা। দুই নেতাই একেবারে বন্ধুর মত। নানা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করলেন। আইয়ুবকে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য করার জন্য একটি সমঝোতায় এলেন দুজনে। তখন কে জানত এই দুই নেতা মাত্র তিন বছরের মধ্যে দুটো পৃথক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হবেন, আর এর মাঝখানে ঘটে যাবে একই দেশে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, পাল্টে যাবে উপমহাদেশের ইতিহাস?

সেবার পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আলোচনা করার জন্য আমরা তিন দিন আগেই লাহোর গেলাম প্রথমে। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রতিদিন গোলটেবিল বৈঠক হলো কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না। আইয়ুব পাকিস্তানে একটি ফেডারেশন করার এবং দেশে সাধারণ নির্বাচন দিতে রাজি হলেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্পর্কে কোন অঙ্গীকার করলেন না। ১৩ মার্চ আইয়ুবের বক্তব্যের পর কিছু নেতা তার পক্ষ সমর্থন করলেন কিন্তু মুজিব সেটা গ্রহণ করতে অস্বীকার জানিয়ে সভা ত্যাগ করে চলে এলেন। গোলটেবিল বৈঠক ভেঙে গেল এবং সেদিনই বেলা তিনটায় আওয়ামী লীগ 'ডাক'-এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করল যার ফলে বলতে গেলে সেদিনই 'ডাক'-এর মৃত্যু ঘটে।

সেই সময়কার দুটো ঘটনায় মুজিবের রাজনৈতিক চরিত্র আর চিন্তাধারার কিছুটা প্রতিফলন পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো, খুব সম্ভব ১১ মার্চ, খুব গোপনে তখনকার পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খান মুজিবের আইনজীবীদের সাথে কথা বলতে চাইলেন। ড. কামাল হোসেনের একজন আত্মীয় ইয়াহিয়ার বন্ধু আমান উল্লাহ খান এই ব্যবস্থা করেছিলেন। রাত্রে আমরা তিনজন তাঁর বাড়িতে গেলাম। শেখ মুজিবকেও আমরা ব্যাপারটা জানাইনি। ইয়াহিয়া খানের ওখানে আমরা প্রায় তিন ঘণ্টা ছিলাম। তাঁর মূল কথা তিনি সহজভাবে

www.pathagar.com

ব্যক্ত করেছেন। প্রস্তাব করলেন যে শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হোক, পাঞ্জাবের মিয়া মমতাজ খান দৌলতানা অর্থমন্ত্রী আর বুড়ো (old man) আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট থাক আনুষ্ঠানিকভাবে। এ প্রস্তাবে রাজি হলে এখনি উনি টেলিফোন করে আইয়ুব খানের সাথে সব ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আর এটাও তিনি বার বার করে আমাদের জানিয়ে দিলেন যে তিনি বা পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পেছনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে না। দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা তাদের কর্তব্য। যদি গোলটেবিল সফল না হয় বা তাঁর প্রস্তাব কার্যকরী না হয় তাহলে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাগ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না। ব্যাপারটা গুরুত্ব বুঝতে আর দেরি হলো না। আমি তখন যেহেতু মুজিবের খুব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলাম আমাকে বলা হলো প্রস্তাবটি তখনই তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে। সেনাপতির বাড়ির একখানা মেরুন রঙের গাড়ি দেয়া হলো আমাকে। পূর্ব পাকিস্তান ভবনে পৌঁছে দেখি শেখ মুজিব, বাকি বালুচসহ অন্যান্য বালুচি নেতৃবৃন্দের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মগ্ন। তাঁকে ডেকে নিয়ে পাশের বাথরুমে ঢুকে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে সবকিছু জানিয়ে প্রস্তাবটা জানালাম। শেখ সাহেব একটু নার্ভাস হলেন, তাঁর ঠোঁটটা বেশ কাঁপলো, তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি করা যায়। এটি খুব একটি কঠিন প্রস্তাব ছিল। সামরিক বাহিনী প্রায় তৈরি হয়ে রয়েছে ক্ষমতা দখল করার জন্য, অথচ পেছনের দরজা দিয়ে একজন জননেতা, যার দিকে সারা দেশ তাকিয়ে আছে, তিনি কি করে ক্ষমতায় যেতে পারেন? খোলাখুলি একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছাড়া ক্ষমতা নেয়ার পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে। এটিকে একটি ষড়যন্ত্র এবং মুজিবকে নয়, শুধু পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অধিকারকে ধ্বংস করার একটি টোপ দেয়ার মত ব্যাপার মনে হলো। বললাম এই প্রস্তাব তিনি এইভাবে মেনে নিতে পারেন না। মুজিব খুব খুশি হলেন। তাঁর ক্ষমতার মন কি বলেছে জানি না, তবে তাঁর রাজনৈতিক মনের সাথে কথাটা মিলে গেছে বলে মনে হলো। তাঁর মনের কথাটাই যেন আমি বলেছি। ঠিক করা হলো ইয়াহিয়া খানকে গিয়ে বলব, শেখ মুজিবকে খুঁজে পাইনি। শহরের কোথাও গেছেন তিনি। আসলে ব্যাপারটা ছিল ভদ্রতা করা মাত্র, কারণ মুখোমুখি এ ধরনের ব্যাপারে 'না' করা যায় না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ইয়াহিয়া খান জেনে গিয়েছিলেন যে মুজিব তখন পূর্ব পাকিস্তান ভবনেই ছিলেন এবং আমার সাথে তাঁর দেখা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুজিব তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই খুব সম্ভব সেই রাতেই পাকিস্তানের সেনাপতিরা ক্ষমতা দখল করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়তো নিয়েছে। এর মাত্র ১৩ দিন পরই সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে।

দ্বিতীয় ঘটনা হলো ১৩ মার্চ যেদিন গোলটেবিল বৈঠক ভেঙে যায় সেদিন রাতে মুজিব আর আইয়ুবের মধ্যে এক বৈঠক হয়। আইয়ুবের বাড়িতে রাতের এই খাওয়ার আয়োজন করেন ইউসুফ হারুন আর মাহমুদ হারুন। এরা সহোদর ছিলেন পাকিস্তানের অন্যতম ২২টি ধনী পরিবারের একটির সদস্য। ইউসুফ হারুন ছিলেন পিআই-এর চেয়ারম্যান আর মাহমুদ হারুন ছিলেন পাঞ্জাবের গভর্নর। এই ভোজসভার বিষয়টি আওয়ামী লীগের

www.pathagar.com

কোন নেতাকে জানানো হয়নি। আমি গাড়ি করে হারুন ভ্রাতৃদ্বয়সহ প্রেসিডেন্ট ভবনের গেট পর্যন্ত শেখ মুজিবকে এগিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। বৈঠকের শেষে গভীর রাতে শেখ মুজিব জানালেন যে ছয় দফার ওপর ভিত্তি করা কোন সংবিধান পাকিস্তানকে যে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে সেটা প্রমাণ করার জন্য আইয়ুব যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে তা তিনি গ্রহণ করেছেন। ঢাকায় ফিরে এসে ড. কামাল হোসেনের বাড়িতে বসে আমরা ১৯৬২ সালের সংবিধানে ১০০টা সংশোধনী এনে একটি নতুন রূপরেখা দাঁড় করালাম। এতে ছয় দফার মূল বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করা হলো, আর তার সাথে সাথে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে রাখার ধারা বলবৎ রাখা হলো। ছয় দফাকে তখন নমনীয় করার যে সুবিধা ছিল তার সুযোগ নিয়ে মোটামুটি সকলের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য সাংবিধানিক কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। ছয় দফার আঙ্গিকে পাকিস্তানের সকল প্রদেশের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করাই ছিল ঐ সংশোধিত সংবিধানের মূল বিষয়। সংবিধানের এই সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মহাসচিব এএইচএম কামরুজ্জামান ২২ মার্চ তারিখে পশ্চিম পাকিস্তান গেলেন। আইয়ুব খানকে সেটা পৌঁছানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে তিনি ক্ষমতা ইয়াহিয়া খানের কাছে হস্তান্তর করেন এই বলে যে, এই সাংবিধানিক সংশোধনী কার্যকর করলে পাকিস্তান ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, অথচ পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সেই সাংবিধানিক প্রস্তাবই ছিল একমাত্র রক্ষাকবচ।

এ দুটো ঘটনায় একটি জিনিস নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, শেখ মুজিব সেই ঐতিহাসিক গণজাগরণের সাথে সঙ্গতি রেখে এক অবিচল চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন। রাজনীতিবিদরা শুধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে এটি ঠিক নয়। এটি তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা ড্রয়িংরুম পলিটিক্স করে, জনগণের সাথে যাদের কোন গভীর যোগসূত্র নেই তাদের বেলায়। কিন্তু যারা গণমানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে তারা তা করতে পারে না। সেদিন ইচ্ছা করলে শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজের ব্যক্তিগত সাধ পূরণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেটা না করে একজন ত্যাগী নেতার পরিচয় ও সেইসঙ্গে অসীম সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন। গণমানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি ধারাবাহিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, সাংবিধানিক সংশোধনী পাঠিয়ে মুজিব আর একটি জিনিস প্রমাণ করেছেন যে, তখন পর্যন্ত পাকিস্তান ভেঙে যাক এটি তিনি চাননি বরং পাকিস্তান এক থাকুক এটিরই প্রতিফলন ঘটেছে সেই সংশোধনীর মাধ্যমে। বলা যেতে পারে যে তখন পর্যন্ত মুজিব চেষ্টা করেছেন পূর্ববাংলার স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রেখে পাকিস্তানকে এক রাখতে। এই দুটো ঘটনাতেই তাঁর রাজনৈতিক চরিত্রের একটি অন্যতম বলিষ্ঠ দিকের পরিচয় মেলে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৬

নির্বাচন, মুক্তিযুদ্ধ: স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের শাসন, শেখ মুজিবের মৃত্যু

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা নেয়ার পর যখন নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিল তখন আওয়ামী লীগ একটি ব্যান্ড ওয়াগনে পরিণত হলো। সকল শ্রেণীর মানুষ আওয়ামী লীগে ভিড় জমালো। শেখ মুজিবের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা তাঁর দলের অনেকের পছন্দ হলো না। বিশেষ করে শেখ ফজলুল হক মণি এবং আরো কিছু তরুণ নেতা আমাকে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবা শুরু করেন। নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য আমি আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে শুরু করলাম। সামরিক ডিক্রির (এলএফও) অধীনে নির্বাচনে অংশ নেয়ার বিরুদ্ধে মত দেয়ায় আমার অবস্থা আরো খারাপ হলো। ড. কামাল হোসেন, আমীরুল ইসলাম তখন আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে ফেলেছেন। শেখ মুজিব মতিঝিলে আমাদের চেম্বারে এসে প্রায় দুই ঘণ্টা আমাকে বোঝালেন আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে নির্বাচনে দাঁড়াতে। আমি রাজি হইনি। যদিও পেছনের দিকে তাকালে আমার মনে হয় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্বাচনে অংশ নেয়াটা একটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই নির্বাচন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি সুফল বয়ে এনেছিল। নির্বাচনে জয়লাভ করার কারণেই পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশ দাবির পক্ষে বিশ্ব জনমত অর্জন করতে সুবিধা হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার চিন্তাধারা অন্য রকম থাকায় আমি শেখ মুজিবের সাথে একমত হতে পারিনি। যাই হোক শেখ মুজিবের আশপাশে তখন অসংখ্য লোকের ভিড় এবং ১৯৭০ সালের মে জুন মাস থেকেই আমি তাঁর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। তার আগে প্রায় বছর দেড়েক তাঁর অবৈতনিক সচিব হিসেবে কাজ করেছি। ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভূমিকা ছিল অভিন্ন, উদারভাবে আমার প্রতি তিনি স্নেহ এবং সম্মান দুটোই দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু আওয়ামী লীগের নতুন এবং পুরোনোদের সংঘাত থেকেই গেল। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী শক্তি তখন প্রচণ্ডভাবে শেখ মুজিবকে ঘিরে রেখেছে। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে এই গ্রুপটি শেখ মুজিবের ওপর ব্যাপক প্রভাব বজায় রাখে।

www.pathagar.com

নির্বাচনে সুবিধাবাদী ও রক্ষণশীলদের খুঁটিও শক্ত হয় কিন্তু জাতীয়তাবাদী উপরোক্ত গ্রুপ নিজেদের স্বপ্ন সাধনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য নিজেদের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যায়। তাদের স্বপ্ন দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন, ৭০ সালের নির্বাচন তাদের কাছে ছিল একটি বাহন বা উপলক্ষ মাত্র। তারা গোপনে বৈঠক করত এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক কাঠামো, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর চরিত্র বিশ্লেষণ করত। তারা বুঝতে পেরেছিল নির্বাচন হলেও পাকিস্তান শাসন করার ক্ষমতা বাঙালিদের হাতে আসবে না, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বিশেষ করে বাঙালিদের ওপর সামরিক বাহিনীর রেশন এবং বাজেট নির্ভর করবে এটি পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কোনদিনই গ্রহণ করতে পারে না।

হলোও তাই। নির্বাচন হলো ঠিকই কিন্তু আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি যা ছিল জাতীয়ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল সেদিন। ছয় দফার পেছনে জাতীয়তাবাদী শক্তি যে এতটা সুদৃঢ় হয়েছে সেটা তারা আন্দাজ করতে পারেনি। পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যর্থতা ধরা পড়ে গেল। ২২ বছরে শুধু সম্পদের শোষণই নয়, রাষ্ট্র পরিচালনায়, নীতিনির্ধারণে, পরিকল্পনায় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাঙালিদের সম্পৃক্ত করার কোন প্রচেষ্টা পাকিস্তানে কোনদিনই করা হয়নি। তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অধিকার আদায়ের সেদিনকার এই জাগরণ। তখন নতুন খেলা শুরু করা ছাড়া আর পথ ছিল না। জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং তার সহযোগীরা, পাঞ্জাবের বুদ্ধিজীবীরা, সামরিক-বেসামরিক আমলারা একই স্বার্থের সুতায় গাঁথা ছিল। ১৯৬৯ সাল থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক আয় পূর্ব পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে যায় এবং তখন থেকে একটি বাজার ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে অন্য আর কোন কাজে তাদের দরকার ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজন তখন তাদের প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে পাকিস্তানের নতুন বাজার সৃষ্টি হলে বাজার হিসাবেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজন অতটা থাকবে না। তখন পূর্ব পাকিস্তান একটি লায়াবিলিটিতে পরিণত হতে পারে। তাদের মতে তাই পূর্ব পাকিস্তানকে যতদিন একটি বাজার হিসেবে রাখা যায় ততদিন ঠিক আছে, আর তা না হলে প্রয়োজন নেই। এই চিন্তাধারায় ইসলাম বা কোন আদর্শের স্থান ছিল না। ১৯৭১ সালের হত্যাযজ্ঞ ছিল সেই বাজার রক্ষার শেষ প্রচেষ্টা। এর সাথে একীভূত পাকিস্তানের শেষের দিকে আর একটি জিনিস যুক্ত হয়েছিল, সেটা ছিল ক্রোধ। ঐ ক্রোধের পেছনে ছিল একটি বর্ণবাদী মনোভাব। শাসন বা জয়লাভ করা যদি একেবারে সম্ভব না হয় তাহলে এই ইতর কালো কালো ছোট ছোট কুৎসিত প্রাণীগুলোকে এমনভাবে আঘাত করো যাতে এদের মধ্যযুগে ফিরিয়ে নেয়া যায়। এরা যাতে চিরদিন গোলামি করে জীবন কাটায়। দরকার হলে ভারতের গোলামি করুক কিন্তু তবুও যেন স্বাধীন জাতি হিসেবে দাঁড়াতে না পারে। এটিই ছিল সাধারণভাবে তখনকার পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মনমানসিকতার ধারা।

পাকিস্তান ভাঙার মূল মনস্তাত্ত্বিক কারণ ছিল পাকিস্তান সেনাবহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তা বিধানে অনিশ্চয়তা। এর কাছে ধর্ম, দেশের একতা বা অখণ্ডতা—

www.pathagar.com

এসবই হয়ে পড়েছিল গৌণ। প্রত্যক্ষভাবে দেশ পরিচালনায় ১৯৫৮ সাল থেকে সেনাবাহিনীর একটি কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি হয় এবং দেশ পরিচালনায় যত বেশি করে তারা জড়িত হয়েছে তত বেশি করে তাদের কায়েমী স্বার্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন সব দেশেই হয়, সেনাপতিরা ক্ষমতায় এলে সেনাবাহিনীকে সবচেয়ে আগে খুশি রাখতে হয়। অর্থাৎ তাদের বেতন, ভাতা, সুযোগ-সুবিধা, নতুন পোশাক, ঘর বাড়ির উন্নতি, আরাম-আয়াস, দেশে-বিদেশে ভ্রমণ এবং বড় বড় চাকরি, নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র, গাড়ি, সাজ-সরঞ্জাম, ক্লাব, স্টেডিয়াম, রিক্রিয়েশনাল সেন্টার, নতুন অফিসার এবং বাহিনী সৃষ্টি ইত্যাদির ফলে জাতীয় বাজেটের একটি সিংহ ভাগ তাদের জন্যই বরাদ্দ করতে হয়। অন্যদিকে ক্ষমতা, ভোগ বিলাস, দ্রুত পদোন্নতি, লোভনীয় সব চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য—এ সমস্ত কারণেও সামরিক অফিসাররা একটি কায়েমী স্বার্থে নিজেদের পরিণত করে। তখন দেশ, জাতি, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় স্বার্থ—এসবকেই তাদের নিজেদের গোষ্ঠীগত কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে এক করে ফেলে। সেই স্বার্থের বশে তারা এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যেখানে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কিছু বলাকে দেশ, জাতি বা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধেই বলা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আয় থেকে সামরিক বাহিনীর মূল বাজেট বরাদ্দ করা হতো এবং এই রাজস্ব আয় কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি কর আদায়ের মাধ্যমে উপার্জন করত। কিন্তু ছয় দফায় প্রস্তাব করা হলো যে কেন্দ্রের সরাসরি কর গ্রহণ করার কোন এখতিয়ার থাকবে না, কর সংগ্রহ করার ক্ষমতা থাকবে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশসমূহের এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন খরচের জন্য তখন প্রদেশসমূহ কেন্দ্রকে আনুপাতিক হারে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে। প্রদেশের করের একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম শতাংশ কেন্দ্রের জন্য রাখার ব্যবস্থা হবে। যদিও ছয় দফা অনুযায়ী সামরিক বিভাগ কেন্দ্রের বিষয় হিসেবে থাকবে কিন্তু কর আদায় এবং বাজেট বরাদ্দের যে শর্ত ছয় দফার প্রস্তাবে ছিল তা নিয়ে সামরিক বাহিনী ভীষণভাবে দুশ্চিন্তায় পড়ে। ছয় দফার ভিত্তিতে দেশে সংবিধানের কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হলে শুধু যে সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরে থাকতে হবে তাই নয়, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা এবং প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারেও অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। এমনিতেই ক্ষমতা, এবং গোষ্ঠীগত কায়েমী স্বার্থ বিসর্জন দেয়াটাই ছিল কঠিন, তার ওপর নিজেদের বাজেট বরাদ্দের জন্য তাকিয়ে থাকতে হবে প্রাদেশিক সরকারগুলোর ওপর—এই চিন্তা পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কিছুতেই বরদাশত করতে পারেনি। তারা ইত্যবসরে এতটাই কায়েমী স্বার্থ গড়ে তুলেছিল যে, তাদের পক্ষে সেটা না পারাটা ছিল স্বাভাবিক।

তার ওপর এই সামরিক বাহিনীর সমস্তটাই ছিল প্রায় পশ্চিম পাকিস্তানের উপকারার্থে। এই বাহিনীতে একবারে শেষ পর্যায়ে এসে বাঙালিদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৬ শতাংশে। তাই প্রতিরক্ষার জন্য যা কিছুই খরচ হতো তার অর্থনৈতিক সুফল পশ্চিম পাকিস্তানই ভোগ করত। পূর্ববাংলার সাথে পশ্চিমের শাসকগোষ্ঠীর সংঘাত প্রকারান্তরে তাই সামরিক বাহিনীর সাথে সংঘাতেই পরিণত হয়। সঙ্কট যখন চরমে ওঠে অর্থাৎ ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল, তখন সামরিক শাসকরা ক্ষমতাসীন ছিল। ঐ সময় সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক

www.pathagar.com

এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুটো স্বার্থই এক হয়ে পড়েছিল। এই মিশ্রিত কায়েমী স্বার্থের পক্ষে তাই ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের এতে করার কিছু ছিল না। যুদ্ধ এবং পাকিস্তানের বিভক্তি তখন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত সেই অনিবার্যতাকে রূপ দেয়ার জন্য একটি ঔপনিবেশিক মনোভাব নিয়ে বাঙালিদের ওপর আক্রমণ শুরু করে তখন আওয়ামী লীগের সংগঠন এবং চরিত্রে আরো গুণগত পরিবর্তন আসে। সুবিধাবাদীরা সরে পড়ে, পুরোনো নেতারা প্রায় সকলেই শেষ পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নেয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের আনুষ্ঠানিক নেতৃত্বের সাথে জড়িত থাকে। মুক্তিযুদ্ধের মূল স্রোতধারা প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী শক্তি অর্থাৎ নবীনদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এরাই হলেন যুদ্ধের ভ্যানগার্ড। নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, আ. স. ম. আব্দুর রব, আব্দুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মণি। আর আনুষ্ঠানিক নেতৃত্বে থাকেন তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাক, কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী আর ওসমানী প্রমুখরা। অনেক নেতা সেখানে রীতিমত ঘর-সংসারও করেছেন। আবদুস সামাদ আজাদ, আব্দুল মালেক উকিল, ইউসুফ আলী, এরকম আরো বিশ তিরিশেক প্রবীণ নেতা, আর কিছু তরুণ পার্লামেন্ট সদস্য যুদ্ধের নানা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বাকিরা শিলং, শিলিগুড়ি, কোলকাতায় ভারতীয়দের আতিথেয়তার সদ্ব্যবহার করেছেন। তাদের একটি অংশের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, আমোদ ফুর্তি কোনটারই অভাব ছিল না। সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর বিভিন্ন ব্যাংক থেকে লুণ্ঠিত কোটি কোটি টাকার কোন হিসাব ছিল না।

নেতৃত্বের শ্রেণীগত ও চরিত্রগত কারণেই আওয়ামী লীগ এই ধরনের সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বেশিরভাগ নেতারই মানসিক অবস্থা ছিল এরকম: নির্বাচনে জিতেছি সুতরাং ক্ষমতা ভোগ করব, যুদ্ধে তাই তাদের মন ছিল না। যুদ্ধের সময় তাদের অনেকের উশৃঙ্খল আচার-আচরণের কথা লিপিবদ্ধ করলে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের শুধু ধিক্কারই দেবে। তাতে যাঁরা যুদ্ধ করেছেন তাদের সম্মানকেও হেয় করা হবে। হাজার হাজার যুবক প্রতিদিন প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং এদের বেশিরভাগই ছিল ছাত্র অথবা কৃষকের সন্তান। আওয়ামী লীগের বাইরের অনেক দল ও গোষ্ঠী দেশের ভেতরে থেকেও যুদ্ধ করেছে। তাদের অনেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের সংগঠিত করেছে এবং নির্ভয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য অকাতরে নিজেদের প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে।

শ্রেণীগত চরিত্রের দিক থেকে আওয়ামী লীগ এবং তৎকালীন ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল অনেক মিল। তাই তাদের সমঝোতা হতেও সময় বেশি লাগেনি। ভারত সরকার এই যুদ্ধের সময় অনেক ঝুঁকি নিয়েছিল এবং স্বভাবতই তাই চায়নি এই যুদ্ধ তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাক। তাই এই যুদ্ধের সাথে সাথে আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্ব যাতে টিকে থাকে সেদিকে ভারত সরকারকে নজর রাখতে হয়েছে। যুদ্ধের পুরো বিষয়টা ভারত তাই কড়া নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। বাছাই, প্রশিক্ষণ, অস্ত্রশস্ত্র, কলাকৌশল ইত্যাদি সবকিছুর ব্যাপারেই ভারত চেষ্টা করেছে তার নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে। প্রশিক্ষণের

www.pathagar.com

জন্য প্রায় সবক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগের সমর্থিত লোক ছাড়া অন্য কাউকে ভর্তি করা হয়নি। এই ধরনের নানা রকমের নিয়ন্ত্রণ এবং খবরদারির বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বিরাট অংশ তখনই প্রতিবাদ করে এবং এসব কারণে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীনই তাদের মধ্যে একটি ভারতবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়।

তবে স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের পরিকল্পনা হিসেবে যারা দেখাতে চায় তারা মূলত পাকিস্তানী দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দেয়। কারণ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীও ঐ একই কথা বরাবর বলেছে। তবে ঐ ধরনের লোকজন সংখ্যায় খুব কম। তারা এটি বলে নিজেদের দোষ এবং দুর্বলতা ঢাকতে চায়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এরা সবসময় পাকিস্তান শাসকচক্রের তাঁবেদার ছিল, এরা নিজেদের স্বার্থের জন্য দালালি করেছে, আর বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। যুদ্ধের সময় তারা স্বাধীনতার বিরোধিতাই করেছে। তাই তাদের জন্য কোন objective বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়নি। আর এই দলে যারা দাবি করে যে আদর্শগত কারণে তারা বাংলাদেশর আন্দোলনকে সমর্থন দিতে পারেনি তাদের ইতিহাসও একই। একটি মুসলমান সামরিক বাহিনী একটি সংখ্যাগুরু নিরস্ত্র মুসলমানদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর তাদের সেই আদর্শগত কারণের খোঁড়া যুক্তি আর কোনভাবে টিকে থাকতে পারে না।

বাংলাদেশের জন্ম এদেশের মানুষের একটি মৌলিক আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনের অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই ঘটেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ভুল এবং স্বার্থপর নীতির জন্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ অত দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ পায় এবং তা অতি দ্রুত একটি রাজনৈতিক সংঘাতে পরিণত হয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব যদি কার্যকর করা হতো তাহলে হয়তো ১ হাজার মাইলের দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও একক দেশ হিসেবে পাকিস্তান টিকে থাকতে পারত। কিন্তু পাকিস্তান জন্মলাভের পর থেকেই দেশটাকে এমনভাবে পরিচালনা করা হয় যে ঐ দেশের অস্তিত্ব বিনষ্ট হওয়াটা একটি ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্যতারূপে দেখা দেয় এবং সেটাকে রোধ করার জন্য কোন উপায় ছিল না। তাই পাকিস্তান আন্দোলনে যে বাঙালিরা সবচেয়ে বেশি সমর্থন দিয়েছিল এবং ত্যাগ স্বীকার করেছিল নিজেদের একটি আত্ম সম্মানসম্পন্ন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকেই শেষ পর্যন্ত অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে। তাই পাকিস্তান আন্দোলনের সময় বাঙালিদের মনে মাতৃভূমি সম্পর্কে যে আকাঙ্ক্ষা ছিল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সেই আকাঙ্ক্ষাই তারা অনেকটা পূরণ করতে চেয়েছে।

কিন্তু উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী সার্বজনীন এবং অসাম্প্রদায়িক জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের জন্মটাই ছিল তখনকার হিন্দুপ্রধান ভারতীয় নেতৃত্বের কাছে অগ্রহণযোগ্য। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে ভারত বিভক্তির পর থেকেই দুই দেশের পারস্পরিক হিংসা এবং শত্রুতা কারো অজানা নয়। তাছাড়া রয়েছে আরো অনেক ঐতিহাসিক কারণ। তাই ভারত কোন কারণে দুর্বল হলে পাকিস্তান সরকার যেমন খুশি হয়েছে, পাকিস্তান দুর্বল হলেও ভারত সরকারের জন্য সেটা খুশির কারণ

www.pathagar.com

হয়েছে। এই এলাকার প্রতিরক্ষা ক্ষমতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে পাকিস্তানই ছিল ভারতের এক নম্বর শত্রু। তাই বাংলাদেশের গণজাগরণ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হওয়াতে ভারত স্বাভাবিকভাবেই খুশি হয়েছে। ১৯৭১ সালে যখন যুদ্ধ শুরু হয় ভারত তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের সাহায্য করেছে (১) তাদের এক নম্বর শত্রু পাকিস্তানকে দুর্বল করা যাবে (২) পাকিস্তান সৃষ্টির সপক্ষের যুক্তি দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তি মিথ্যা এবং ভুল প্রমাণিত হবে যা তারা ভারত বিভক্তির আগে থেকেই দাবি করে এসেছে; আর (৩) এই অঞ্চলে সামরিক ভারসাম্য ভারতের পক্ষে চলে যাবে, যা ভারতকে এই অঞ্চলের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। সুতরাং ভারত যা করেছে তাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্যই করেছে, কোন আদর্শের জন্য নয়। আর বাংলাদেশের মানুষও যা করেছে নিজেদেরে স্বার্থের জন্য করেছে। দেশকে স্বাধীন করার জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল নিরাপদ ভূমি, প্রশিক্ষণ, অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন। বাংলাদেশেও এসবকিছুর জন্য ভারতকে ব্যবহার করেছে। পৃথিবীর সকল মুক্তিযুদ্ধেই এসবের প্রয়োজন পড়ে এবং কোন না কোন দেশ থেকে সাহায্য নিতে হয়। ভারত যেহেতু আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, কৌশলগত কারণে ভারতের কাছ থেকে সাহায্য নেয়াটা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই ভারত আমাদের যে সাহায্য করেছে এবং আমরা ভারত থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তা পারস্পরিক স্বার্থেই করা হয়েছে। পাকিস্তান হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের উভয়েরই সাধারণ শত্রু। ভারত বৃহৎ রাষ্ট্র। যুদ্ধের সময় আমাদের সাহায্য যদি নাও করত, তাহলেও ভারত এই নতুন রাষ্ট্র থেকে সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করত। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ যেমন তাঁবেদারি পছন্দ করে, একটি রাষ্ট্রও তেমন পছন্দ করে। আজ ভুটান বা মালদ্বীপকে আমরা যদি আমাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারতাম বা তাদের ওপর যদি আমাদের প্রভাব বাড়ে বা তাদের দেশে আমাদের তৈরি জিনিস যদি আমাদের সুবিধাজনক শর্তে বাজারজাত করতে পারি, তাহলে আমরা খুশি হব না? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তারা যদি আমাদের স্বার্থরক্ষা করে বা সব ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দেয়, আমরা কি সেটা চাইব না?

যুদ্ধের সময় ভারত নিজ স্বার্থে হলেও আমাদের অনেক সাহায্য করেছে বা ভারতের কাছ থেকে আমরা নিজেদের স্বার্থে অনেক সাহায্য নিয়েছি। এর ফলে তখনকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভারত সরকারের একটি ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। এই বিশেষ সম্পর্কের পরিণতি হিসেবে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল রাষ্ট্রই চায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে। একটি দেশের বৈদেশিক নীতিনির্ধারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সবসময় একটি স্থায়ী উপাদান হিসেবে বিরাজ করে, এটিকে অবহেলা করার উপায় থাকে না। ভারতের সাথে যুদ্ধকালীন সম্পর্ক ছাড়াও আমাদের প্রায় ১৫৬০ মাইলের যৌথ সীমান্ত রয়েছে। সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ভারত একটি স্থায়ী উপাদান হিসেবে বিরাজ করবে। এটিকে কঠিন বাস্তব হিসেবে দেখতে হবে। আমরা শত চেষ্টা করেও এই অবস্থানের পরিবর্তন করতে পারব না। তবে এই সম্পর্ক কিভাবে রাখা হবে, কোন্ পর্যায়ে রাখা হবে এবং কোন্ স্বার্থে রাখা হবে সেটা দেশের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এতে অনেকের চাকরি বা পুনর্বাসন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের চেতনাবোধে সৃষ্ট ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটেনি। তাছাড়া বলতে গেলে সারা জাতিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তাই সারা জাতির মধ্যে সংগ্রামের মাধ্যমে নতুন চেতনাবোধ, মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছিল, আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্মলাভ করেছিল। শুধু তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেই এটি সীমিত ছিল না। সীমিত পর্যায়ে চাকরি বা পুনর্বাসন সেজন্য যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু এসবের আর মূল্যায়ন হলো না এবং আওয়ামী লীগ সে ব্যাপারে আর কিছু করতেও পারলো না।

এর ফলে মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত যুবকদের মধ্যে তিনটি প্রধান ধারা লক্ষ্য করা গেছে। একদল চাকরি এবং পুনর্বাসন গ্রহণ করল ঠিকই কিন্তু মনে মনে হতাশই থেকে যায়, দ্বিতীয় দল তাদের রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে থেকে যায় বা অন্তর্ভুক্ত হয়। আর তৃতীয় দল বিপথগামী হয়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অস্ত্র ব্যবহারে নিজেদের নিয়োজিত করে। লেলিনের মতে, রাজনীতিবিহীন একজন অস্ত্রধারী দস্যু ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এখানেও ব্যাপারটি তাই দাঁড়ালো। দেশের সর্বত্র তখন এই অস্ত্রধারীরা সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের জন্য অন্য এক অন্ধকার জীবন বেছে নেয়। অস্ত্রধারী বিভিন্ন গ্রুপের সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়, কখনো রাতের অন্ধকারে, কখনো দিবালোকে, কখনো একা, কখনো দলবদ্ধভাবে তারা চুরি, ডাকাতি, লুট, রাহাজানি, হাইজ্যাক ইত্যাদি কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। এদেরই একটি অংশের কেউ কেউ আওয়ামী লীগের সদস্য হয়, কেউ কেউ নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে, কেউ কেউ ঐসব নেতার দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করে। আর কেউ কেউ নেতাদের অভ্যন্তরীণ গ্রুপিংয়ে দল ভারি বা শক্তিশালী রাখতে ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত কারণে স্বাধীনতা-উত্তরকালে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে যে নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, আওয়ামী লীগ তার জমানার শেষ দিন পর্যন্ত এইসব দুষ্ট রাহু থেকে দেশটাকে আর মুক্ত করতে পারেনি।

আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বা সরকার অবস্থা আয়ত্তে আনার চেষ্টা বা উদ্যোগ নেয়নি তা কিন্তু নয়। বা একথাও ঠিক নয় যে আওয়ামী লীগে সকলেই নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত থেকেছে। আওয়ামী লীগে শত শত নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও সমর্থক ছিল কিন্তু তারপরও তারা তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় ছিল কম, আর দলের ভেতর নীতিগত বিবাদও ছিল যথেষ্ট। স্বাধীনতা ছিল আওয়ামী লীগের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। দেশটা ছিল কপর্দক শূন্য; শিল্পকারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সবই ছিল ভঙ্গুর এবং বিধ্বস্ত; কেন্দ্রীয় ব্যাংক, জাতীয় পরিকল্পনা, প্রতিরক্ষা ও জাতীয় অর্থনীতি বলতে কিছুই ছিল না। কূটনীতি এবং পররাষ্ট্র বিভাগ জন্ম নিল তখনই মাত্র। অভিজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিকতার অভাবের জন্য দেশটাকে দাঁড় করানো একটি সহজ ব্যাপার ছিল না। তখনকার প্রেক্ষাপটে যে কোন রাজনৈতিক দলের জন্যই সফলতা অর্জন করা একটি দুরূহ ব্যাপার হতো। এর পর ছিল ১৯৭০-৭৪ সালের প্রতি বছরই খরা, সাইক্লোন এবং বন্যায় নজিরবিহীন ক্ষয়ক্ষতি। চার

www.pathagar.com

বছর পরপর ফসলহানির সাথে যোগ ছিল ১৯৭৩ সালের তেলের মূল্য চারগুণ বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি, মন্দা এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট। এই সবকিছুর ধাক্কাই আওয়ামী লীগ সরকারকে মোকাবেলা করতে হয়েছে।

সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো যদিও তারা আইনের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সেখানেও দলের স্বার্থ এবং পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সেইসব আইনের প্রয়োগে বেশি সুফল আনতে পারেনি। আইন প্রয়োগে এবং প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থাকায় সেসব প্রক্রিয়া অহরহ বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং দলীয় বা ব্যক্তিস্বার্থে আইনের অসদ্ব্যবহারও হয়েছে অনেক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইন, (P.O. 16) দালাল আইন, (P.O. 8) সরকারি চাকুরেদের বরখাস্ত আইন (P.O.9) জাতীয়করণ আইন, (P.O.26, 27) বিশেষ অপরাধ আইন, (P.O. 50) রক্ষীবাহিনী আইন, (P.O. 21) ইত্যাদির কথা। এগুলো প্রয়োগের ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। রক্ষীবাহিনী গঠন এবং প্রয়োগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই বেশি চরিতার্থ হয়েছে। এইসবগুলো আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা দারুণভাবে কাজ করেছে। দালাল আইন আর বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে হাজার হাজার মানুষ ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকার হয়ে কারারুদ্ধ হয়েছে। মোটকথা, আইনগুলোর প্রয়োজনীয়তা যদিও ছিল কিন্তু এগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের মাত্রা নির্ধারণ বা কোন নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। আওয়ামী লীগের দলীয় নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সরকার আইন করেছে, কিন্তু দলেরই একটি অংশ বা দলের নামে এক শ্রেণীর লোক সেই আইন কার্যকর করতে দেয়নি। তার ফলে হিতে বিপরীত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ বিপরীত ফল দিয়েছে।

খাদ্য সঙ্কট

ইতিহাসের একটি বিশেষ স্রোতে প্রক্রিয়াগত কারণে আওয়ামী লীগ জাতীয়তাবাদী এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের স্থানে পৌঁছেছিল। অন্য কোন রাজনৈতিক দল বা নেতা এই আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকলে তাদের আন্দোলনের রূপ এবং রঙ হয়তো অন্য রকম হতো। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তারা সেই নেতৃত্বে পৌঁছাতে পারেনি, আর পারলেও সেটা যে আওয়ামী লীগের চেয়ে ভাল হতো সেটাও কারো পক্ষে বলা মুশকিল। তাই সেটা চিন্তা করা আর সময় নষ্ট করা একই ব্যাপার হবে। তবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের কাজে এবং সরকারি কর্মসূচির বাস্তবায়নে কোন পেশাদারি মনোভাব (professionalism) ছিল না এবং প্রশাসনে যে উপলব্ধির চেতনা (sense of comprehension) এবং ঐ রকম পরিস্থিতিতে যে জরুরিভাবে কর্মসম্পাদনের চেতনা (sense of urgency) থাকার দরকার ছিল সেটা ছিল না। সেইসঙ্গে প্রশাসনে নেতৃত্বের অদক্ষতা এবং অনভিজ্ঞতা তো ছিলই। এর ওপর দুর্নীতি, পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাধারণ অব্যবস্থা ছিল চরম পর্যায়ে। এসবের কারণে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শাসনামলেই ১৯৭৪ সালে দেশের হাজার

www.pathagar.com

হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা গেল। পুরোনো অভ্যাসমত আওয়ামী লীগ অবশ্য এই দুর্ভিক্ষের জন্য আমেরিকাকে দায়ী করে, কিন্তু সেটা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যই করে। অন্য কোন কারণে নয়। সরকারের অদক্ষতা, অক্ষমতা, দুর্নীতি, পৃষ্ঠপোষকতা এবং পেশাদারি মনোভাবের অভাবের জন্যই দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তাদের মধ্যে কোন sense of direction ছিল না। আলাদা কোন বিশেষ তাগিদ ছিল না। ১৯৭৪ সালেও এদেশ থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য ভারতে চোরাচালানি হয়েছে এবং দুর্ভিক্ষ যখন একেবারে আসন্ন, এমনকি চলছে, তখনও দেখেছি মন্ত্রীরা দিনেরবেলায় লম্বা ঘুম দিতেন।

এখনকার আধুনিক যুগে একটি দেশে যতই খাদ্যাভাব দেখা দিক না কেন সে দেশে দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব। পৃথিবীর কোন না কোন দেশে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য থাকবেই। নগদ অর্থ না থাকলে বাকিতে বা খয়রাত হিসেবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব। এ ব্যাপারে দুটি জিনিসের অবশ্যই প্রয়োজন হয়। প্রথমত, পূর্বে পাওয়া সতর্কবাণী (prior warning), আর দ্বিতীয়ত, সরকারের দক্ষতা। এই দুটো যদি থাকে পৃথিবীর যে কোন দেশে আজকাল দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব। দেশে যে বিপুল খাদ্যঘাটতি দেখা দেবে তা ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই ড. স্বদেশ বোস তার একটি লিখিত রিপোর্টে তখনকার প্রবাসী সরকারকে জানিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। তারপর ১৯৭৩ সালে দেশের রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন সংস্থা দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার সম্ভাবনার কথা বার বার উল্লেখ করেছে। মওলানা ভাসানী খাদ্যের দাবিতে অনশন পর্যন্ত পালন করেছেন। ভারত সরকারও বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল। তাই খাদ্যাভাব এবং দুর্ভিক্ষ হওয়ার সম্ভাবনার সব কথাই সরকার অনেক আগে থেকেই জানত। আমেরিকা থেকে যে জাহাজ ভর্তি গমের বিলম্বের কথা আওয়ামী লীগ বলে সেই গম আনার ব্যাপারে সরকারের লোকজনরাই সময়মত জাহাজের ব্যবস্থা করতে পারেনি। আর যদি সে জাহাজ সময়মত আসত তাহলেও দেশের দুর্ভিক্ষ তখন আর ঠেকানো যেত না, কারণ দুর্ভিক্ষ হঠাৎ করে হয়নি। অনেক দিন থেকেই চলছিল।

তুলনামূলক দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে ১৯৭৯ সালে এদেশে নজিরবিহীন খরা হয়েছিল এবং গত একশত বছরে এ ধরনের খরা হয়নি। খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রচুর এবং সে বছর ২৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সতর্কবাণী পাওয়ার পর থেকেই জিয়াউর রহমান নিজে খাদ্য কমিটির চেয়ারম্যান হলেন এবং যে দুর্ভিক্ষ একেবারে অবধারিত ছিল, দিন রাত পরিশ্রম করে সেটাকে তিনি এড়াতে পেরেছিলেন। যুদ্ধের সময়কে মোকাবেলা করার জন্য যেরকম জরুরি ব্যবস্থা নেয়া হয় সেরকম ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি কাটছাঁট করে অর্থের জোগান দিয়েছিলেন মানুষকে বাঁচানোর জন্য, কারণ দেশ তো মানুষের জন্যই, মানুষ থাকলেই তো দেশ বাঁচবে, রাজনীতি চলবে। অনেক আগে থেকে সময়ের ব্যবধান ঠিক রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যে যতদূর দিতে পেরেছে সব আনা হয়েছে। এমনকি ভারতের কাছ থেকেও দুলক্ষ টন খাদ্যশস্য নিতে জিয়াউর রহমান কুণ্ঠা বোধ করেননি। বার্মা, থাইল্যান্ড থেকে শুরু করে

www.pathagar.com

ছোট বড় সব দেশের কাছ থেকেই, খাদ্যশস্য চেয়ে আনা হয়েছে। মজুত এবং সময়ের ব্যবধান হাতে রেখে কাজ করা হয়েছে। তাতে কোন জাহাজ বিলম্বে পৌঁছলেও ক্ষতি হয়নি। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্য অভ্যন্তরীণ পরিবহন এবং বিতরণ ব্যবস্থাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রেসিডেন্ট জিয়া এই ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়েছিলেন। প্রথমদিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য দেশ এবং সংস্থা বলেছিল যে আমরা দুর্ভিক্ষ এড়াতে পারব না, তার কারণ খাদ্যশস্য এলেও মাল খালাস করার ক্ষমতা আমাদের বন্দরগুলোর যথেষ্ট ছিল না। আমাদের যে ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, তাতে তাদের মতে, মাসে দুই থেকে আড়াই লক্ষ টনের বেশি খাদ্যশস্য খালাস করা ছিল অসম্ভব। প্রেসিডেন্ট জিয়া এটিকে অনেকটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে জরুরিভিত্তিতে চট্টগ্রাম বন্দরে সেড তৈরি করে খাদ্যশস্য খালাস করার ক্ষমতা চার থেকে সাড়ে চার লক্ষ টনে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দরা আসলে দুর্ভিক্ষের বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। শুধু বক্তৃতা আর মজুতদারিদের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়েছে, কিন্তু জরুরিভিত্তিতে পেশাদারি মনোভাব নিয়ে সমস্যার মোকাবেলা করেনি। তারা অভ্যন্তরীণ পরিবহন এবং বিতরণ ব্যবস্থা যদি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারত তাহলেও অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারত। আর যে আমেরিকার সাথে তাদের সম্পর্ক অত ভাল ছিল না, খাদ্যশস্যের জন্য শুধু তাদের ওপর নির্ভর করাটাও ছিল অক্ষমতারই পরিচয়। আসলে নিজেদের অদক্ষতা ঢাকা দেয়ার জন্য ওটা ছিল একটি রাজনৈতিক প্রচার মাত্র। যাই হোক এই দুর্ভিক্ষের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সংগঠন এবং নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতায় ভীষণ রকম আঘাত আসে, যার প্রতিফলন পরবর্তী পর্যায়ে নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে দেখা যায়।

সামরিক বাহিনী এবং জাতীয় রক্ষীবাহিনী

ইদানীং তৃতীয় বিশ্বে সামরিক ক্ষমতার উৎপত্তি, বিশেষ করে পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা এবং শেষ পর্যন্ত নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সামরিক বাহিনী সম্পর্কে আওয়ামী লীগ একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। তাদের এই চিন্তাধারা তিনটি দিক থেকে একটি সুদৃঢ় রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে রূপ নেয়। প্রথমত, তৃতীয় বিশ্বে সামরিক বাহিনী সবসময় সমাজের গণতান্ত্রিক বিবর্তনের প্রতি হুমকি হিসেবে বিরাজ করে। দ্বিতীয়ত, সামরিক বাহিনীর জন্য বাজেটের একটা বিরাট অংশ ব্যয় করা হয়। তাই আমাদের মত গরিব দেশে এই ব্যয় যত কমানো যায় ততই ভাল। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের জন্য প্রতিরক্ষার প্রয়োজন বিবেচনার বিষয়। যদি দেশের সার্বভৌমত্বেরই প্রশ্ন আসে সেটা একমাত্র ভারত থেকেই আসতে পারে। ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে ভাল, কিন্তু যুদ্ধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষকেই অস্ত্র ধরতে হবে। কোন standing আর্মি ঐ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারবে না। সুতরাং আওয়ামী লীগ কোন রকমের বড় regimental standing army, অর্থাৎ স্থায়ী সেনাবাহিনীকে শ্বেতহস্তী বলেই মনে করেছে। তারা শুধু একটি আনুষ্ঠানিক সেনাবাহিনী (ceremonial army) রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

www.pathagar.com

তাদের মতে এই ব্যবস্থা এই গরিব দেশের শুধু প্রচুর অর্থই বাঁচাবে না, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রাখতেও সহায়ক হবে। পাকিস্তান সামরিকদের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তখনকার সময় আওয়ামী লীগের এই রাজনৈতিক উপলব্ধি অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না।

এই চিন্তাধারার ফলে সামরিক বাহিনীর সংখ্যা, বাজেট বরাদ্দ এবং গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই কমের দিকে থাকে। স্বল্প বাজেট বরাদ্দ এবং রাজনৈতিক অবহেলার জন্য সামরিক বাহিনী বিক্ষুব্ধ হয়। বিশেষ করে তখন বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর সকলেই ছিল মুক্তিযোদ্ধা। একে তো দেশকে রক্ত দিয়ে স্বাধীন করার পর দেশ গড়ার কাজে তাদের কোন ভূমিকা দেয়া হলো না, আর তার ওপর স্বল্প বাজেট বরাদ্দের ফলে তাদের যে নিম্নতম প্রয়োজনগুলো ছিল সেগুলোও মেটানো সম্ভব হলো না। খাওয়া, থাকা, কাপড়চোপড়, প্রশিক্ষণ, অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে মানমাত্রা কমে গেল। তার ওপর আওয়ামী লীগ সরকার গড়ে তোলে নতুন একটি আধাসামরিক বাহিনী, জাতীয় রক্ষীবাহিনী। দেশের আইনশৃঙ্খলার নতুন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য গতানুগতিক পুলিশবাহিনী আর সক্ষম ছিল না মনে করে এই সুসজ্জিত বাহিনী গড়ে তোলা হয়। রাজনৈতিক ব্যবহারের কারণে এই বাহিনীর গুরুত্ব এবং কদর সরকারের কাছে তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। এই শক্তিশালী বাহিনীকে অনেকে সামরিক বাহিনীর প্রতিপক্ষ শক্তি (counter force) হিসেবে দেখলেন। সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা—সব দিক থেকেই সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তাই হতাশায় দিন কাটাতে শুরু করে এবং তাদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করে।

কিন্তু সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক গুরুত্ব কমানোর চিন্তাধারার সাথে সামরিক বাহিনীকে কিভাবে গড়ে তোলা হবে তার কোন কর্মসূচি আওয়ামী লীগ সরকার গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর মূল দীক্ষা এবং দিকদর্শন কি হবে সেটাও তারা স্থির করতে পারল না। সামরিক বাহিনীর সবাই যেহেতু মুক্তিযোদ্ধা ছিল এবং ছিল রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন এবং তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত বা সচেতন—এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তোলার কোন বিশেষ দার্শনিক ভিত্তি উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়ে সরকার শেষ পর্যন্ত এটির গঠন-কার্যক্রমে পুরোনো পদ্ধতিই অবলম্বন করে। সামরিক বাহিনীর সংগঠন, কাঠামো, প্রশিক্ষণ এবং দীক্ষার ব্যাপারে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ঐতিহ্য অনুকরণ করা হলো। ফ্ল্যাগ স্টাফ, ব্যাটমানশীপ আর পাকিস্তানের সামরিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কর্মসূচি সরকার গ্রহণ করে। জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমী তৈরি করা হলো। তিনটি বাহিনীর জন্য তিনটি আলাদা হেডকোয়ার্টার করা হলো। ৭ এপ্রিল ১৯৭২ জেনারেল ওসমানী প্রধান সেনাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলে সেই পদের বিলুপ্তি ঘটে, কিন্তু কর্নেল কে. এম. শফিউল্লাহকে চিফ অব স্টাফ, জিয়াউর রহমানকে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ, খালেদ মোশাররফকে চিফ অব জেনারেল স্টাফ, কমান্ডার নুরুল হককে নৌবাহিনীর প্রধান এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারকে বিমানবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। এভাবে সামরিক বাহিনীর সংগঠন এবং কাঠামো তৈরি করে একটি পেশাভিত্তিক বাহিনী গড়ে তোলার প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে জটিল সঙ্কট দেখা দেয় ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে, যখন পাকিস্তান থেকে আটকাপড়া প্রায় ২৮০০০ সামরিক সদস্যবৃন্দ ঢাকায় ফিরে আসা শুরু করে। এদের মধ্যে প্রায় ৪০০ ছিল অফিসার, বাকিরা সব জওয়ান। আওয়ামী লীগ সরকার একটি বোর্ডের মাধ্যমে এদের সামরিক বাহিনীতে আত্তীকরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বেশ কিছু সিনিয়র অফিসারকে অবসর দান করে অন্যত্র চাকরি দেয়া হয়, আর কিছুকে বিদায় দেয়া হয়। বাকি সবাইকে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা এই সিদ্ধান্ত একেবারে মেনে নিতে পারেনি। এসব প্রত্যাগত অফিসারদের তারা দালাল, কাপুরুষ বলে আখ্যায়িত করা শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রত্যাগত অফিসারদের মধ্যেকার সম্পর্ক তাচ্ছিল্য এবং অবহেলা, বিদ্বেষ এবং দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। এর আগেই মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের দুবছরের আগাম সিনিয়রিটি দেয়ার ফলে অনেক জুনিয়র সিনিয়র এবং অনেক সিনিয়র জুনিয়র হয়ে যায়। অফিসারদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হলো মারাত্মক। একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীতে এ ধরনের অবস্থা শুধু একটি মানসিক অবস্থারই সৃষ্টি করেনি, কাজের পরিবেশকে তিক্ত করে তুলেছিল। খলিলুর রহমান, দস্তগীর, এরশাদ—এঁরা সকলেই শফিউল্লাহ-জিয়ার সিনিয়র ছিলেন কিন্তু তাঁদেরকে তাঁদের অধীনেই চাকরি নিতে হলো। এরকম ঘটনা প্রতিটি স্তরের অফিসারদের বেলায় ঘটল। ফলে সামরিক বাহিনীর ভেতর সন্দেহ, হিংসা, কোন্দল এবং পেশাগত বিবাদ অনেক বেড়ে যায়। বলতে গেলে সেদিন থেকে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর সুদূরপ্রসারী পরিণতিতে পরবর্তীকালে দেশে অজস্র মানুষের রক্ত ঝরেছে, জাতি বিভক্ত হয়েছে, রাজনীতিতে সৃষ্টি হয় অস্থিরতা, আর খুন হয় দেশের দুজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট।

সংবিধান এবং সমাজতন্ত্র

জাতির মূল নীতিমালা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এবং দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর ব্যাপারে আওয়ামী লীগ অতীতের আন্দোলনগুলো এবং তাদের নির্বাচনী ওয়াদার পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটি প্রশংসাযোগ্য ভূমিকাই পালন করেছিল। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে তারা যথেষ্ট সাহস এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তারা এক বছরের মধ্যে ও রকম একটি পরিস্থিতির মধ্যেও দেশকে একটি সংবিধান দিতে পেরেছিল এবং তারপর একটি সাধারণ নির্বাচন ঐ সংবিধানের অধীনে অনুষ্ঠিত করেছিল। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব যখন ঢাকায় এলেন তখন দেশে যুদ্ধ চলাকালীন প্রণীত স্বাধীনতার সনদের ওপর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি শক্ত প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি চলছিল। দেশে প্রত্যাগমনের দুদিন বাদেই নিজের প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব সেই ব্যবস্থাকে পাল্টিয়ে তখন থেকেই একটি সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য Provisional Constitution Order প্রণয়ন করে দিলেন। প্রেসিডেন্টের পদ থেকে নেমে এসে নিজে প্রধানমন্ত্রী হলেন আর প্রেসিডেন্টকে বানালেন একটি মামুলি রাষ্ট্রপ্রধান। দুটি বিষয়ে আওয়ামী লীগের সংবিধান ভারত এবং অন্যান্য অনেক গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায়

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। পাকিস্তানের অধীনে ২৩ বছর গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সাংবিধানিক সঙ্কটের ফল এবং তিক্ততার প্রতিফলন হিসেবে দেশের নতুন সংবিধানে (১) বিনা বিচারে আটক রাখার কোন বিধি বা আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হলো না। অর্থাৎ নাগরিকদের এরকম একটি মৌলিক স্বাধীনতা এর আগে আর কেউ এ অঞ্চলে ভোগ করেনি, (২) প্রেসিডেন্ট, সরকার বা অন্য কাউকে দেশে জরুরি আইন ঘোষণা করার ক্ষমতা দেয়া হলো না অর্থাৎ ঐ ধরনের কোন ধারাই সংবিধানের রাখা হলো না। পাকিস্তান আমলে এ দুটো ব্যাপারেই শাসকরা চরমভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। বিরোধী নেতাকর্মীদের যখন ইচ্ছা তখন কারাবন্দি করে, আর জরুরি আইনের বলে শুধু মৌলিক অধিকারণ রহিত করেনি, পুরো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাই প্রায় অচল করে দেয়। এ দুটো ধারা সংবিধানে সংযোজন করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশে একটি নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রাখার সদিচ্ছাই প্রকাশ করেছিল।

এই সদিচ্ছা দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারেনি। বছরখানেক যেতে না যেতেই আওয়ামী লীগ নেতাদের ধৈর্যচূতি ঘটল। পুরোনো কায়দায় রাষ্ট্র চালানোর কারণে তাদেরকে সংবিধানের এ দুই অনন্য বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধেই কাজ করতে হলো। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী এনে নাগরিকদের বিনা বিচারে যাতে আটক রাখা যায় সেইজন্য মৌলিক অধিকারের ৩৩ অনুচ্ছেদ পুরোটাই পাল্টিয়ে দেয়া হলো, আর ১৪১ক অনুচ্ছেদ হিসেবে একটি সম্পূর্ণ নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে জরুরি আইন ঘোষণা করার সমস্ত ক্ষমতা লিপিবদ্ধ করা হলো। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো যে আওয়ামী লীগ শুধু এগুলোর সংশোধনীই আনলো না, সেগুলো প্রয়োগ করতে বেশি সময় লাগালো না। এই সংশোধনীর পরপরই ৩৩ অনুচ্ছেদের অধীনে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণয়ন করা হলো, আর দুবছর যেতে না যেতেই ২৮ ডিসেম্বর জরুরি আইন ঘোষণা করে সংবিধানে দেয়া সকল মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হলো। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করার জন্য আইয়ুব আমলের কায়দায় প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স জারি করা হলো।

স্বাধীনতার পর ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিরোধী দলগুলোর প্রতি আওয়ামী লীগ সহনশীলতার পরিচয় দিতে পারেনি। তারা রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি কেমন যেন অধৈর্য হয়ে ওঠে। দেশে যে বিরোধী দল থাকবে এবং তাদেরও একটি ভূমিকার প্রয়োজন, তাদের মধ্যে সেই মানসিকতা খুব কম খুঁজে পাওয়া যায়। কখনো আইনের জোরে, কখনো ক্ষমতার জোরে, আর কখনো রীতিমত অস্ত্রের জোরে তারা বিরোধী দলগুলোকে দমন করার চেষ্টা করে। ১৯৭৩ সালে স্বাধীন দেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি আওয়ামী লীগের ব্যবহার আমাদের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। তাদের নেতৃত্বের মধ্যে তখন এই মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়েছিল যে, আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করতে পার্লামেন্টের সকল আসনেই তাদের জিততে হবে। যদি একটি আসনেও আওয়ামী লীগ হারে তাহলে তাদের জনপ্রিয়তা চলে গেছে বলে ধরে নিতে হবে। বিশেষ করে বিরোধী দলের কোন নেতার নির্বাচনে জয়লাভের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

তাদের এই মানসিকতা অত্যন্ত প্রকটভাবে কাজ করেছে। তাই নির্বাচনে তাদের প্রথম কৌশল ছিল সারা দেশময় ভয়ভীতি দেখিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিশেষ করে যেখানে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেখানে থেকে সেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের উচ্ছেদ করা, প্রতিদ্বন্দ্বীবিরোধী প্রার্থী যাতে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে না পারে সেইজন্য তাকে হাইজ্যাক করা বা কোথাও আটকিয়ে রাখা বা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে তাকে নিবৃত্ত করা। আর নেতাদের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় অর্জনের প্রতিযোগিতার পরিণতি হিসেবেও অনেক জায়গায় এসব ঘটনা ঘটেছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়, এটি হয়ে ওঠে প্রার্থীর জনপ্রিয়তার মাপকাঠি এবং ভবিষ্যতে মন্ত্রী হওয়ার একটি সনদের মত। এরপরও কয়েকটি নির্বাচনী এলাকায় বিরোধী দলের সদস্যরা ভোট গণনায় এগিয়ে ছিলেন, কিন্তু হেরে যাওয়ার ভয়ে ঐসব এলাকায় আওয়ামী লীগ ব্যালট বাক্স হাইজ্যাক করে, ভোটকেন্দ্রে আক্রমণ করে, ত্রাস সৃষ্টি করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিরোধীদের আর জয়লাভ করতেই দেয়া হয়নি। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব যাঁরা সেই নির্বাচনে হয়তো জয়লাভ করতে পারতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, ড. আলীম আল রাজী, শাজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, মেজর জলিল, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, মোশতাক আহমদ চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন। পরিতাপের বিষয় হলো যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এমনিতেই জয়লাভ করত এবং বিরোধী দলগুলো বড় জোর ২০ থেকে ৩০টি আসনে জয়লাভ করতে পারত, কিন্তু আওয়ামী লীগের এই এক অদ্ভুত মানসিকতার দোষে, যাকে অনেকে ফ্যাসিস্ট মনোবৃত্তি বলে উল্লেখ করে থাকে, তারা সেটাও গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। পার্লামেন্টের ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ৯টি আসন অর্জন করে বিরোধী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। এঁদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান খান আর জাসদের আব্দুস সাত্তার, আর বাকিরা ছিলেন স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত সদস্য। কিন্তু পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগ এই নয়জনকেও যেন সহ্য করতে পারত না। বিভিন্ন সময় তাদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং অধৈর্য মানসিকতা প্রকাশ করতে তারা সামান্যতম কুণ্ঠা বোধ করেনি।

আওয়ামী লীগ ধর্মমতাবলম্বী রাজনৈতিক দলগুলোকে বাংলাদেশে সংগঠন করতে দেয়নি। রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে, ধর্মভিত্তিক কোন রাজনীতি বা রাজনৈতিক দল করার মৌলিক অধিকার থেকে নাগরিকদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে ধর্মকে আদর্শের ভিত্তি করে রাজনীতি করার মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হবে। এমনকি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও ধর্মভিত্তিক অনেক রাজনৈতিক দল কাজ করে চলেছে। তাই কোন গণতান্ত্রিক দেশে এটি নিষিদ্ধ করার উপায় নেই, সেখানে ও রকম নীতিকে গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলেই ধরে নেয়া হয়। আমার মনে হয় আওয়ামী লীগ হয় এক উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতার বশবর্তী হয়ে এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল, আর না হয় স্বাধীনতাযুদ্ধে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতার কারণে আওয়ামী লীগ নেতারা খুব বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে ঐ ধরনের একটি মৌলিক অধিকার থেকে নাগরিকদের বঞ্চিত করার প্রয়াস পেয়েছিল।

www.pathagar.com

মোটামুটি সব ধরনের বিরোধিতার প্রতিই আওয়ামী লীগ অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে। সংবাদপত্রও এর আওতার বাইরে ছিল না। প্রেস অর্ডিন্যান্স, দালাল আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইন রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে অকপটে ব্যবহার করা হয়েছে। রক্ষীবাহিনীকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করে অনেক বিরোধী দলের সদস্যকে শুধু গ্রেপ্তার আর নির্যাতনই করা হয়নি, তাদের কেউ কেউ হত্যা এবং গুম করার মত ঘটনার শিকার হয়েছে।

স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ দলের অভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় রাখতেও দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। যুদ্ধপূর্ব এবং যুদ্ধ চলাকালে আওয়ামী লীগের যে চারিত্রিক পরিবর্তন এসেছিল সেটা প্রধানত দলে নবীন প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শক্তির যোগদানের ফলেই। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব প্রথম পর্যায়ে এদের দ্বারাই বেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চরিত্রগত মৌলিক কারণেই আওয়ামী লীগের মধ্যে যে দুটি স্রোতের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। মুজিব সমাজতন্ত্রী শক্তির সাথে কিছুদূর পর্যন্ত যেতে পারলেন, তারপর আর পারেননি। জাতীয়করণ পর্যন্তই ছিল মুজিবের সমাজতন্ত্রের অন্তিম মাপকাঠি এবং ঐটুকু পর্যন্ত যাওয়াই তাঁর পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। তাঁর দল যদিও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা বলেছে, কিন্তু সংগঠন ছিল রক্ষণশীল, মধ্যবিত্ত ও উঠতি পুঁজিপতিতে ভরা। এতদিনের পুরোনো এই শক্তিসমূহের প্রভাব থেকে মূল সংগঠনের পক্ষে মুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। আর তাছাড়া চরিত্রগতভাবে মুজিব নিজেই ছিলেন এই শক্তিগুলোর মূল ধারক এবং বাহক। মনের ইচ্ছা আর আবেগের প্রবল উষ্ণতা থাকলেও মুজিবের পক্ষে আর আগে বাড়া সম্ভব হয়নি। নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে দলের জন্য যে একটি সুনির্দিষ্ট দার্শনিক ভিত্তি রচনা করবেন সেটাও তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিল না।

ফলে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে ক্ষমতাসীনদের সাথে জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল শক্তির বিরোধ বাধে। এর প্রথম প্রতিফলন ঘটে ছাত্রসমাজে। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ পৃথক পৃথকভাবে বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে এবং এর একটিতে মুজিব গেলেন আর একটিতে গেলেন না। সেখান থেকেই শুরু হলো আওয়ামী লীগের ভাঙন। তারপর ভাঙলো যুবলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে কর্মী ও সমর্থকদের একটা বিরাট অংশ আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসে। জন্ম হয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের। ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে দেশের জাতীয় পর্যায়ে সর্ববৃহৎ বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেই আত্মপ্রকাশ করল। আওয়ামী লীগের নানা ব্যর্থতার ফলে জাসদের জনপ্রিয়তা খুব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়, আর তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঐ দলের নেতাকর্মীদের ওপরই নেমে আসে সবচেয়ে কঠোর সরকারি নির্যাতন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এরা সকলেই একটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। সারা দেশময় জাসদের হাজার হাজার তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়, এমনও হয় যে রক্ষীবাহিনী অনেককে হত্যা করে বস্তায় বেধে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। জাসদের একটি অংশ তখন থেকেই অস্ত্রের মাধ্যমে দেশে শ্রেণীবিহীন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েম করার পক্ষপাতী ছিল। যেহেতু

www.pathagar.com

এরা আগে একই দল করত, তাই আওয়ামী লীগ বোধহয় মনস্তাত্ত্বিক কারণেই অনেক বেশি হিংসা আর বিদ্বেষ নিয়ে জাসদের ওপর নির্যাতন চালায়। ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ মুজিবের জন্মদিনে জাসদ এক বিরাট মিছিল করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর বাড়ি ঘেরাও করে। রক্ষীবাহিনী গুলি করে ছ'জনকে হত্যা করে এবং জাসদের নেতৃস্থানীয় প্রায় সব নেতা ও শত শত কর্মীকে সেদিন গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনার পর জাসদের কর্মীরা অস্ত্রের রাজনীতির দিকে আরো বেশি ঝুঁকে পড়ে। স্বাধীনতার পর দেশকে গড়ে তোলার জন্য একটি জাতীয় ঐক্য অর্জন এবং বজায় রাখাটা সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল। কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে আর নিজেদের দলের অভ্যন্তরীণ কলহ এবং পরে ভাঙনের ফলে সেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় জাতীয় আকাঙ্ক্ষা আর পূরণ করা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু আওয়ামী লীগ বিরোধী দলগুলোর ওপর নির্যাতন চালিয়ে তাদের সাথে নানা রকম অনৈক্য ও সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

তবে তাই বলে আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের কর্মসূচি ত্যাগ করেনি। ১৯৭৩ সালে তাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য রাখা হলো সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করা। কিন্তু তারা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে সেটা ছিল বুর্জোয়া আর আমলা কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে, জাসদের বৈজ্ঞানিক বা ক্লাসিক্যাল পদ্ধতির মাধ্যমে নয়। সমাজতন্ত্র কায়েম করার নামে আওয়ামী লীগ এগিয়ে গেল বটে কিন্তু তাতে দেখা দিল অনেক স্ববিরোধিতা। এ স্ববিরোধিতার প্রকাশ ঘটে দলগত চরিত্র থেকে শুরু করে সরকারি প্রশাসনের চরিত্র পর্যন্ত—সর্বত্র। এসব চরিত্রগত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতা আওয়ামী লীগের পক্ষে দূর করা কোনদিনই সম্ভব হয়নি। অপরদিকে সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি তৈরি করতে যে ত্যাগী নিবেদিত কর্মীবাহিনীর বা ক্যাডারের প্রয়োজন হয় জাসদের জন্ম হওয়ার ফলে তাদের একটা বিরাট অংশ আওয়ামী লীগ ছেড়ে চলে যায়।

একদলীয় সরকার

এত কিছু ঘটার পর শেখ মুজিব শেষে অন্য এক কর্মসূচি গ্রহণ করলেন। তাঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক' রীতিনীতি পরিত্যাগ করে দেশে একটি শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য একদলীয় সরকার কায়েম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য তথাকথিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে তিনি একটি বিলাসিতা বলে মনে করলেন এবং দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমূল সংস্কারমূলক পরিবর্তন এনে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন আনতে চাইলেন। জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে তাঁর "দ্বিতীয় বিপ্লবের" কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার কথা ঘোষণা করলেন। সমাজে যে 'অরাজকতা, দুর্নীতি আর ফ্রি স্টাইল' চলছিল তা বন্ধ করার একমাত্র উপায় হিসেবে নতুন একটি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন।

এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত করে জরুরি আইন ঘোষণা করা হলো। তার পরপরই ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি কোন

www.pathagar.com

বিতর্ক ছাড়াই এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার দেশে একদলীয় শাসন চালুর লক্ষ্যে পার্লামেন্টে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী বিল পেশ করে এবং পাসও করিয়ে নেয়। তখন থেকে দেশে একটি নতুন শাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়। এখন থেকে দেশে রাজনৈতিক দল থাকবে মাত্র একটি, দৈনিক সংবাদপত্র থাকবে ৪টি এবং সেগুলো সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, এবং বাকি সব সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, দেশের প্রেসিডেন্ট হবেন প্রশাসনে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি পার্লামেন্টের যে কোন বিলে ভেটো দিতে পারবেন। বিচার বিভাগকে প্রশাসনের অধীনস্ত করা হলো, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের বরখাস্ত করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টকে দেয়া হলো, এখন থেকে মন্ত্রীদের আর পার্লামেন্ট সদস্য হওয়ার প্রয়োজন থাকল না এবং পার্লামেন্টের ক্ষমতা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। শেখ মুজিব চতুর্থ সংশোধনীর বলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৎক্ষণাৎ দেশের প্রেসিডেন্ট হলেন। পার্লামেন্ট ভবনেই প্রধান বিচারপতির স্থানে স্পিকারকে দিয়ে তিনি নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ নিলেন। জেনারেল ওসমানী আর ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এই সংশোধনী বিলকে সমর্থন দিলেন না বলে তাঁদেরকে দল ছেড়ে চলে যেতে হলো। আওয়ামী লীগের বাকি সব উপস্থিত পার্লামেন্ট সদস্য এই সংশোধনীর পক্ষে ভোট দিলেন। এরপর শেখ মুজিব নতুন সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী দেশে একটি নয়া জাতীয় রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করলেন এবং তার নাম দিলেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, সংক্ষেপে বাকশাল। সামরিক-বেসামরিক সরকারি কর্মচারী এই দলের সদস্য হতে পারবে বলে বিধান করা হলো। কমিউনিস্ট পার্টির লাইনে এই নতুন দলের কাঠামো তৈরি করা হলো। একটি প্রেসিডিয়াম, সেক্রেটারিয়েট, কেন্দ্রীয় কমিটি, ইত্যাদি। পার্টির প্রেসিডিয়াম গঠিত হলো। সেক্রেটারিয়েটে তিনজন সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেন—শেখ ফজলুল হক মণি, আব্দুর রাজ্জাক আর জিল্লুর রহমান। এদের তিনজনকেই মন্ত্রীর মর্যাদা দেয়া হলো। এসব গঠন করার পর দেখা গেল প্রেসিডিয়ামের সকল সদস্যই আওয়ামী লীগের। এবং অন্য সব কমিটিতে দুয়েকজন মস্কোপন্থী ন্যাপ আর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছাড়া আওয়ামী লীগের সদস্যরাই স্থান পেয়েছেন। অন্য কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর কোন সদস্যকে এই নতুন জাতীয় দলে নেয়া হলো না। অবশ্য হাজী দানেশকে কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য করা হয়েছিল। শেখ মুজিব নতুন দলের চেয়ারম্যান হলেন এবং নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী দল এবং সরকার একীভূত হয়ে গেল, আর এখন থেকে দলই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবে এমন পরিকল্পনা নেয়া হলো।

তখনকার সময় শেখ মুজিব প্রথম যে সংস্কারের কথা ঘোষণা করেছিলেন সেটা ছিল প্রশাসন সংক্রান্ত। জেলা তুলে দিয়ে মহকুমাকে জেলা করা হলো এবং প্রতি জেলা একজন করে গভর্নর দ্বারা পরিচালিত হওয়ার বিধান করা হলো। গভর্নর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হবেন এমন বিধান হলেও প্রথম পর্যায়ে তাদের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করবেন। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে থানাকে একটি ইউনিট করা হলো এবং সেখানেও থানা গভর্নর বা ঐ ধরনের পদবি দিয়ে থানা পরিচালনা করার পরিকল্পনা নেয়া হলো।

www.pathagar.com

এই সংস্কার কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রতি জেলার জন্য একজন করে জেলা গভর্নর নিয়োগ করা হয় এবং শেখ মুজিব এঁদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণকোর্স উদ্বোধন করেন। এই নবনিযুক্ত গভর্নরদের প্রায় সকলেই ছিলেন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। কিছু আমলাকেও গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল। আগস্ট মাসে এই প্রশিক্ষণ শেষ করে ১ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি জেলার শাসনভার নতুন গভর্নরদের ওপর অর্পণের সমস্ত প্রস্তুতি প্রায় যখন শেষ পর্যায়ে, তখন শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয় এবং অতঃপর তাঁর দক্ষিণ হস্ত বলে পরিচিত খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতাসীন হয়ে এই পরিকল্পনা বাতিল করে দেন।

বাকশাল করার পেছনে কোন দার্শনিকতত্ত্ব লিখিত আকারে পাওয়া যায়নি। কোন দার্শনিকতত্ত্ব আদৌ ছিল কিনা সে ব্যাপারে মানুষের মনে তখন অনেক প্রশ্ন জেগেছিল। বাকশাল সৃষ্টি করার আগে এ সম্পর্কিত কোন রাজনৈতিক মতবাদও ছাপানো অবস্থায় পাওয়া যায়নি। এই নতুন কর্মসূচির সারমর্ম বা তাত্ত্বিক ভিত্তির জন্য শেখ মুজিবের কিছু বক্তৃতার ওপর তাই সকলকে নির্ভর করতে হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুজিব ঐ বিষয়ে মোট চারটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতাগুলোকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে ধরে নিতে হবে, কারণ একমাত্র ঐ বক্তৃতাগুলোর মধ্যেই দেশে মুজিবের নতুন সমাজ বা শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার মূল চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়। এই বক্তৃতাগুলোর মূল সারাংশও একই ছিল, তবে বক্তৃতার উপলক্ষ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর চিন্তাধারার বিস্তৃতি ঘটেছে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি, যেদিন ৪র্থ সংশোধনী আইন পাস হয়, সেদিন তিনি পার্লামেন্টে এই বিষয়ে তাঁর প্রথম ভাষণ রাখেন। এই ভাষণের মূল দিকগুলো ছিল: (১) গতানুগতিক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনা সম্ভব নয়। প্রতিটি মানুষের খাওয়া, থাকা, কাপড়, শিক্ষা আর স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করার জন্য একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে এবং সেই শোষণহীন ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। বর্তমান যে ঔপনিবেশিক এবং গতানুগতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার মাধ্যমে ঐ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। (২) দেশের সমস্ত সম্পদের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে এবং সেই সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। একটি সমাজবাদী অর্থনীতির মাধ্যমে মানুষের অথনৈতিক মুক্তি আনতে হবে। (৩) দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে দুর্নীতি, নৈরাজ্য এবং অস্থিরতার অবসানের প্রয়োজন। আইনশৃঙ্খলার অবনতির ফলে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে ভীষণভাবে এবং ঐ অবস্থার অবসান প্রয়োজন। (৪) রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে দেশে একটি 'ফ্রি স্টাইল' চলেছে, বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের অহরহ হত্যা এবং খুন মাত্রাহীন আকার ধারণ করেছে। আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনৈতিক কার্যকলাপ, গুম, গুপ্তহত্যা, বাজার লুট, ব্যাংক লুট প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব বন্ধ করার প্রয়োজন।

www.pathagar.com

মুজিবের সেদিনের আবেগময় বক্তৃতায় উপরোক্ত বিষয়গুলোই উচ্চারিত হয়েছিল বেশি করে। কোন সন্দেহ নেই যে, তখন দেশের সার্বিক পরিবেশ এক চরম অবস্থায় পৌঁছেছিল, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙা তো করা যায়নি—বরং দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছিল। মুজিব জনগণের কাছ থেকে তাদের ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করার জন্য তিন বছর সময় চেয়েছিলেন, কিন্তু সে ওয়াদা তিনি পালন করতে পারেননি। শেখ মুজিব, যিনি বাংলার মাটিতে খাদ্য ঘাটতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে পূর্ববাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী আবুল হোসেন সরকারের পতন ঘটিয়েছিলেন, তাঁরই স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁরই শাসনামলে মানুষ না খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে দুর্ভিক্ষে। দেশের ঐ রকম একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মুজিব আর বসে থাকতে পারেননি। তাঁর বক্তৃতায় একদিকে ছিল আবেগ, অপরদিকে ছিল ক্রোধ আর আক্রোশ, যেমন ছিল হতাশা তেমন ছিল একটি স্বপ্ন। বাংলাদেশের মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করবেন, তাদেরকে দারিদ্র্যমুক্ত করবেন। সমাজের অন্যায় এবং শোষণের কষাঘাত থেকে তাদের বাঁচাবেন চিরদিনের জন্য, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাবেন। সেই বক্তৃতায় সেদিন যেমন ছিল অনেক ক্ষোভ, তেমন ছিল অনেক আশা। যেমন ছিল দুশ্চিন্তা তেমন ছিল দীপ্তি। মুজিবের সেদিনকার সে ভাষণ ছিল একজন দেশপ্রেমিকের হৃদয় নিঙড়ানো এক বিরল অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ।

এরপর মুজিব আরো তিনখানা বক্তৃতা করেছিলেন-একই ধারায়। ২৬ মার্চ একটি জনসভায়, ১৯ জুন বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে এবং ২১ জুলাই নবনিযুক্ত গভর্নরদের উদ্দেশে। এই বক্তৃতাগুলোর মধ্যে তার প্রস্তাবিত কর্মসূচির কিছু আভাস পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে যেগুলো সুনিদিষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল (১) জমির মালিকানার ওপর হস্তক্ষেপ না করে প্রতি গ্রামে বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা; কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ভূমিহীন এবং বেকার কৃষকদের কর্মসংস্থান করে গ্রামের অর্থনীতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা, (২) থানাকে কেন্দ্রবিন্দু করে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করা, (৩) বর্তমান জেলা তুলে দিয়ে মহকুমাকে জেলা করা এবং প্রতি জেলায় একজন গভর্নর নিযুক্ত করে সারা দেশের প্রশাসনকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে আনা, (৪) সামরিক এবং বেসামরিক কর্মচারীদের দলভুক্ত করে প্রশাসনকে আরো ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী করা। এর বেশি তখন পর্যন্ত আর কিছুই জানা যায়নি এবং এগুলোর মধ্যে একমাত্র জেলা গভর্নরদের নিযুক্তি এবং প্রশিক্ষণ ছাড়া আর কোন প্রস্তাবের কোন কার্যকারিতা ঘটেনি। নতুন জাতীয় দল 'বাকশাল' দেশের মানুষের কাছে কোন বিশদ বক্তব্য বা কর্মসূচি উপস্থাপন করেনি। দেশের তখনকার সামগ্রিক সমস্যার তুলনায় এই পদক্ষেপগুলো খুব অপ্রতুল ছিল এবং উপরন্তু কোন সামগ্রিক কর্মসূচি দেয়া হয়নি বলে মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই এ সম্পর্কে একটি সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল। দেশের অর্থনীতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি করে বাকশালের মাধ্যমে সমাজের আমূল পরিবর্তন আনা হবে সে বিষয়ে বাকশালের কোন নেতাই আলোকপাত করতে পারেননি।

www.pathagar.com

নতুন শাসন ব্যবস্থা এবং বাকশালের ওপর মুজিবের উল্লিখিত চারটি বক্তৃতাই ছিল তাঁর মূল দলিল। পরিতাপের বিষয় যে ঐ চারটি বক্তৃতাই তিনি extempore দিয়েছিলেন। কোনটাই লিখিত কোন literature ছিল না। একদিক থেকে এই বক্তৃতাগুলো বাকশাল কর্মসূচিকে মূল্যায়ন করার জন্য মূল্যবান বলে গণ্য হলেও, এগুলোর কোন তাত্ত্বিক বা আদর্শগত গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এত বড় একটি পরিবর্তনের কথা যেখানে বলা হয়েছে, সেখানে সেই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য আরো সুনির্দিষ্ট এবং সুচিন্তিতভাবে লিখে জাতির সামনে উপস্থাপন করাটাই যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা হতে পারত। সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক ব্যাপার ছিল যে, যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এত কিছু করা হলো, বাকশাল সৃষ্টির মাধ্যমে সেই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। নতুন দলের নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগের পুরোনো নেতাদের আরো শক্ত ভিতের ওপর বসানো হলো। সকল কমিটিতে সেই পুরোনো মানুষগুলোকেই জনগণের সামনে উপস্থিত করা হলো। বাস্তবে দেখা গেল যে, আওয়ামী লীগই নতুন নাম বাকশাল ধারণ করে আরো জোরেসোরে ক্ষমতা দখল করে বসল। মাঝখান থেকে সাধারণ মানুষের সব মৌলিক অধিকার হরণ করে নেয়া হলো আর দেশে একটি একদলীয় একনায়কত্ব স্বৈরাচারী সরকার কায়েম করা হলো। মুজিবের হাজার সদিচ্ছা থাকলেও বাকশালের সংগঠন এবং কাঠামো তাঁর সেই সদিচ্ছায় ছেদ টেনে দিয়েছিল। দেশের মানুষের জন্য এটিই ছিল সবচেয়ে হতাশাপূর্ণ ব্যাপার। একটি সহজ প্রশ্ন মানুষের মনে তখন জেগেছে যে আওয়ামী লীগের এই নেতারাই যদি দেশের মঙ্গল সাধন করতে পারতেন, দেশের আমূল পরিবর্তন আনতে পারতেন তাহলে আর বাকশালের প্রয়োজন হলো কেন? মানুষের শ্রেণীগত চরিত্র, দোষগুণ, লোভলালসা, অভ্যাস এবং দুর্বলতার পরিবর্তন কি রাতারাতি ঘটা সম্ভব? শুধু দলের নাম পাল্টালেই কি মানুষ পাল্টে যায়, তার স্বভাব চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে? যদি এই মানুষগুলো দিয়েই মুজিবের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো তাহলে এই পরিবর্তনের কি প্রয়োজন ছিল? আওয়ামী লীগই তো সেজন্য যথেষ্ট ছিল।

স্বাভাবিকভাবে তাই প্রশ্ন ওঠে যে মুজিব এই পথে গেলেন কেন? যে মানুষটি চিরদিন উদারপন্থী গণতন্ত্রী বলে পরিচিত, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বছরের পর বছর কারাবরণ করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, এক কথায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন, সেই মানুষ আজ কেন এই পথ বেছে নিলেন? ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত সবটাই ছিল একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভাতকাপড়ের নিশ্চয়তা না হয় করা যায়নি তাই বলে কথা বলার অধিকারটাও মুজিব কেড়ে নেবেন? স্বাধীনতার সনদ অনুযায়ী দেশের প্রেসিডেন্টকেই করা হয়েছিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঐ যুদ্ধকালীন সনদ অনুযায়ী দেশ চলেছে। মুজিব সেই সনদের অধীনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সমস্ত ক্ষমতার অধিকার নিয়ে দেশ শাসন করতে পারতেন। কেউ কিছু বলত না তখন। কিন্তু দেশে ফেরার পর স্বইচ্ছায় নিজেই উদ্যোগ নিয়ে একটি সংসদীয় সাংবিধানিক

www.pathagar.com

কাঠামো দাঁড় করালেন এবং নিজে প্রধানমন্ত্রী হলেন। তারপর দেশকে একটি সংবিধান দিলেন। দুয়েকটি বিষয় ছাড়া এই সংবিধানে এদেশের মানুষের ২৪ বছরের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হলো। কিন্তু তিন বছর যেতে না যেতেই তাঁর জীবনের সাধনাকে তিনি নিজেই কেন সমাধিস্ত করলেন? যে স্বৈরতন্ত্রকে তিনি ঘৃণা করতেন সেই স্বৈরতন্ত্র নিজের হাতে নিজের দেশে কেন কায়েম করলেন? একদলীয় সরকার তো মুজিবের শ্রেণীগত চরিত্রের পরিপন্থী ছিল। এরপরও কেন এমন হলো?

এ ব্যাপারে দুটো মত আছে। কেউ বলেন মুজিব এই নতুন ব্যবস্থা করেছিলেন শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করে আরো মজবুতভাবে ধরে রাখার জন্য। আর অন্যটি হলো, না, মুজিব সত্যিকারভাবে দেশের সামাজিক পরিবর্তন আনার জন্যই এরকম একটি ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন। এর পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট দর্শনগত আদর্শ ছিল এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্যই একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

প্রথম পক্ষের বিশ্লেষণে বলা হয় যে, একদলীয় সরকার গঠন ছিল মুজিবের সামগ্রিক ব্যর্থতারই প্রতিফলন, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাঁর শেষ প্রচেষ্টা। প্রতিটি ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। দেশের অর্থনীতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সামাজিক মূল্যবোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গিয়েছিল। জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য, দুর্ভিক্ষ, দেশের সর্বত্র জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা, চোরাচালানি, লুট, খুন, হয়রানি, রাহাজানি—প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারের অযোগ্যতা এবং অক্ষমতার পরিচয় বহন করেছে। সমস্ত রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং জাতীয় জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে মুজিবের মনে ক্ষমতা হারানোর ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করা ছাড়া তার উপায় ছিল না। জাতির পিতা হিসেবে পরাজয়বরণ করা বা কোন রাজনৈতিক দল হিসেবে দেশের সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগ যে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল এটি মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন। এই কারণেই মুজিব আগেভাগেই এই সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর পেছনে দেশের উন্নতি বা কোন আদর্শগত কারণ ছিল না। ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে রাখা ছাড়া বাকশাল করার পেছনে আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। জেলা গভর্নরদের মাধ্যমে নিজের সর্বময় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাটা ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্মসূচি বলতে মহকুমাকে জেলা করা ছাড়া আর কিছুই তিনি করেননি এবং সেটাও নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য করা হয়েছিল, এটার সাথে কোন অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক ছিল না। সংস্কারের কথাটা ছিল গৌণ, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত এবং ভোগ করাটাই ছিল মুখ্য।

অন্যরা মনে করেন যে মুজিবের নতুন করে আর কোন ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল না। রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি এমনিতেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।দেশের অবস্থা যাই থাকুক না কেন মুজিবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা তখনও ছিল শীর্ষে। দলে বা দেশে তাঁর কোন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। পার্লামেন্টে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯১ আসনের অধিকারী হয়ে তাঁর বা তাঁর দলের সমর্থন ছিল নিরঙ্কুশ এবং পার্লামেন্টের কার্যপ্রণালীতে তাঁর কর্তৃত্ব

www.pathagar.com

পূর্ণভাবে বজায় ছিল। দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হলে আন্তর্জাতিকভাবে তার ভাবমূর্তি নষ্ট হবে এটাও মুজিব জানতেন। সুতরাং যেখানে সব ক্ষমতাই তাঁর হাতে ছিল—দল, সরকার, পার্লামেন্ট এবং ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা—মুজিবের এর চেয়ে আর বেশি কোন ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া বাকশাল করার পর মুজিবের ক্ষমতা বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে একই ছিল। পার্লামেন্টের আইনে ভেটো দান করার ক্ষমতা যদিও প্রেসিডেন্টকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তার পূর্বেকার অবস্থায় দেশে এমন কোন আইন পাস করার ক্ষমতা কি কারো ছিল যেটা মুজিবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হতে পারত? সুতরাং তখনকার প্রেক্ষাপটে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে সেই ক্ষমতাটাও ছিল একদিক থেকে তাত্ত্বিক (theoretical)। বিচার বিভাগের ক্ষমতা এবং মর্যাদা যদি তিনি কমাতে চাইতেন সেটাও তাঁর পার্লামেন্টে যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এবং দলের ওপর তাঁর যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা করা মোটেও কষ্টসাধ্য ছিল না। মোটকথা নতুন সাংবিধানিক পরিবর্তনের ফলে মুজিবের আইনগত ক্ষমতা বেড়ে থাকলেও তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থান এত সুদৃঢ় ছিল যে আইনের পরিবর্তন না করেও তিনি পরোক্ষভাবে সেসব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং মুজিবের নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য, বা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য বা ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—এটি বলাটা ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত বলে গণ্য করা যায় না।

অনেকের মতে মুজিব ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। তিন বছরে একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে দেশ চালিয়ে তিনি দেখেছেন দেশের মানুষের তেমন কোন উন্নতিসাধন করা সম্ভব হয়নি। পুরোনো কাঠামো দেশে সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং এই বছরগুলোতে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে অত্যন্ত তিক্ত। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তিনি অনুভব করেছেন যে দেশের জন্য নতুন কিছু করতে হলে পুরোনো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা ভুলে যেতে হবে। মুজিবের মধ্যে একটি নতুন উপলব্ধি এসেছিল যে তাঁকে এখন একজন 'জাতি সংগঠক' এবং স্টেটসম্যান হতে হবে, তাঁকে গোটা জাতির পুরো ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে।

এছাড়াও মুজিবকে বোঝানো হয়েছে যে তাঁর ওপরই দেশের কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। ইতিহাসে কোন জাতির জন্য নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ বার বার আসে না। বার বার করে জাতিরজনকের আবির্ভাব হয় না। বার বার করে দেশের বৃহত্তর জনসমষ্ঠিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় না। সকল নেতা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখেন না। দেশে যদি একটি নতুন অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামো তিনি তৈরি করে দিয়ে যেতে পারেন, তাহলে সেটাই হবে জাতির প্রতি তাঁর স্থায়ী অবদান এবং কৃতিত্ব। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদের সাথে তাঁরও একটি স্থান হবে ইতিহাসে। আর সত্যিকারের সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোনদিনই পেটি বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর কোথাও সেটা সম্ভব হয়নি। সমাজে সাধারণ মানুষের শোষণ যদি তিনি সত্যিকার অর্থে বন্ধ করতে চান এবং তাদের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং

www.pathagar.com

মুক্তি আনতে চান তাহলে তাঁকে সে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার যেসব পরীক্ষিত দৃষ্টান্ত রয়েছে সেগুলো অনুসরণ করতে হবে। পূর্ব ইউরোপ এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে যে, কি ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সোভিয়েতপন্থী দলগুলো এবং তাদের নেতারা মুজিবকে উৎসাহ জুগিয়েছেন অনেক। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি। শেখ মণির মাধ্যমেই সোভিয়েতপন্থী সমাজবাদীরা তখন সরকার এবং মুজিবের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে লিপ্ত ছিল। বিভিন্নভাবে তারা মুজিবকে এই পথে চিন্তা করার অনুপ্রেরণা জোগায়। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করার যে নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট তখন তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশে করা হচ্ছিল বাংলাদেশেও সে ধরনের একটি এক্সপেরিমেন্ট করার প্রয়াস ছিল এটি। ক্লাসিক্যাল ধ্যানধারণায় শ্রমিক বা কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে বা সারা দেশের গণমানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে সংঘাতের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন বা কিউবায় যে ধরনের বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে, সেটা গত কয়েক দশক থেকে এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলো আরো গরিব হচ্ছে দিন দিন। রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ এবং একটি সামাজিক বিপ্লবের কারণ উপস্থিত থাকলেও, দারিদ্র্য এবং জীবনমানের স্তর এত নিচে রয়েছে যে সেসব সমাজে গণঅভ্যুত্থান বা গণমানুষের জাগরণের মধ্য দিয়ে সেই বিপ্লব অর্জন সম্ভব নয়। যে সমাজে বেশিরভাগ মানুষ যত বেশি গরিব সেই সমাজে সামাজিক বিপ্লব আনা ততই কঠিন হয়ে পড়েছে। এরা এত গরিব যে তাদের ত্যাগ করার কোন ক্ষমতা থাকে না। একটি আন্দোলন, সংগ্রাম বা বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে সময়, ত্যাগ এবং মনোবলের প্রয়োজন হয় অতিদরিদ্রতার জন্য তাদের পক্ষে সেটা জোগান দেয়া সম্ভব হয় না। এসব সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে নেতৃত্ব আসার কথা। সমাজের গরিবদের জন্য তাদের নৈতিক সমর্থন কিছু থাকলেও তারা নিজেদের স্বার্থকেই বেশি করে দেখে এবং তারা নিজেদের সদ্যপ্রাপ্ত বা অতিকষ্টেপ্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো সহজে হারাতে চায় না। শুধু অর্থ দিয়ে মার্সিনারি কর্মী সৃষ্টি করে কোন দেশে সামাজিক বিপ্লব বা পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়, আদর্শের ওপর ভিত্তি করে ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন এবং ক্যাডার সৃষ্টির মাধ্যমে যেটা সম্ভব। গরিব দেশের দরিদ্রতা যেহেতু দিন দিন বেড়ে চলেছে, ঐভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের খেয়ে-পরে সমাজে বিপ্লব আনার যে বিশাল সংখ্যক নিবেদিতকর্মী প্রয়োজন সেটা পাওয়া এখন আর সম্ভব হচ্ছে না।

তাই কমিউনিস্ট পার্টি বা কোন সক্রিয় সমাজতান্ত্রিক দল গরিব দেশগুলোতে গত দুই যুগে তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি। আমাদের এই এলাকায় বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তানেও একই অবস্থা। দেশের ভেতর প্রচণ্ড শ্রেণী পার্থক্য এবং বিপুল পরিমাণে গরিব মানুষ থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলো কোন বিস্তৃতি বা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। বরং তাদের সংগঠনগুলো

www.pathagar.com

পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের মত এসব দেশেও ব্যর্থ হয়ে গেছে। একটি সমাজে বিপ্লবকে সফল করার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে যে শক্তি, সাহস, দক্ষতা, মনোবল এবং ত্যাগ স্বীকার করার মত নিম্নতম আর্থিক সঙ্গতি থাকার দরকার সেইগুলো তৃতীয় বিশ্বের অনেক মানুষের মধ্যে এখন একেবারেই হারিয়ে যেতে বসেছে। একই কারণে এমনকি সাধারণ জনকল্যাণমূলক সরকারগুলো অনেক দেশে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। বরং এখন যে ধারা সারা পৃথিবীতে লক্ষ্য করা হচ্ছে সেটা হলো, যেসব দেশ ধনী তারা আরো ধনী হচ্ছে, আর গরিব দেশ আরো গরিব হচ্ছে। আবার গরিব দেশগুলোর জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা ধনী, তারা আরো ধনী হচ্ছে, আর গরিব যারা তারা আরো গরিব হচ্ছে। আর এসব কারণেই দেখা যাচ্ছে গরিব দেশগুলোতে যে কোন ধরনের সামাজিক পরিবর্তন আনা দিন দিন কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে। যে কোন সমাজ ব্যবস্থার জন্যই হোক না কেন—সমাজতান্ত্রিক বা জনকল্যাণমূলক বা সংস্কারমূলক—সেই সমাজ ব্যবস্থার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন বা নেতৃত্ব তৈরি করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং এই রাজনৈতিক সংগঠন বা নেতৃত্বের মান একটি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করছে। যে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক সামর্থ্য যত নিচে তাদের দেশে রাজনৈতিক সংগঠন এবং তার মান তত নিচে। আর এই মানের প্রতিফলন এখন সমাজের অন্যান্য সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানেও প্রতিফলিত হয়।

এই আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণেই তৃতীয় বিশ্বের নতুন স্বাধীনতা পাওয়া দেশগুলোতে গণসংগঠন এবং জাগরণের ভিত্তিতে সমাজ বিপ্লবের চিন্তাধারা কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। আর তাই এখন বিশেষ করে সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি বেশ পাল্টে গেছে। এখন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সৃষ্টি করার জন্য রাষ্ট্রীয় যন্ত্র দখল করার যে কোন উপায়ের ওপর বেশি জোর দেয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় যন্ত্রে প্রবেশ করতে না পারলে যে কিছুই করা সম্ভব নয় সেটা সকলেই বোঝে। গণজাগরণ বা গণসংগঠন বা গণবিপ্লব যেহেতু এখন বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এসবের সমাজ দর্শনও আগের তুলনায় অনেক শিথিল হয়েছে। সামরিক বাহিনীর বা বেসামরিক সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করাটাই এখন সহজতর পন্থা হিসেবে ধরে নেয়া হচ্ছে। এইসব কারণেও তৃতীয় বিশ্বে সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব দিন দিন বাড়ছে। ইথিওপিয়া, ঘানা, আফগানিস্তান—এসব দেশে সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে ওপর থেকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ কায়েম করার প্রচেষ্টা চালানোর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

একইভাবে বেসামরিক সরকারের কোন জনপ্রিয় নেতার মাধ্যমেও বিভিন্ন দেশে এটি প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। বাংলাদেশের জন্ম থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন এবং আওয়ামী লীগের জন্য সোভিয়েতপন্থী দলগুলোর শর্তহীন সমর্থনের পেছনে এটিই ছিল উদ্দেশ্য। আওয়ামী লীগ অনুপযোগী সংগঠন হলেও, দেশের মানুষ চাক আর নাই চাক, শেখ মুজিবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সৃষ্টি করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য তারা তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। তাদের নিজস্ব আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গির

www.pathagar.com

দিক থেকেই তারা সেটা করেছিল। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ সোভিয়েত ব্লকে অন্তর্ভুক্ত থাকুক সেটাই ছিল মূল লক্ষ্য।

শেখ মুজিবও হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে এটিই ছিল তাঁর একমাত্র পথ। দেশকে সোভিয়েতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়, জাতি সংগঠক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের তাত্ত্বিক যুক্তিটা মুজিবের ব্যক্তিগত স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষার সাথে কাকতালীয়ভাবে মিলে গিয়েছিল। এই কারণেই সম্ভবত মুজিব একদলীয় সরকারের কথা চিন্তা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে মুজিব আমাকে একদিন বলেছিলেন যে "জেনে রেখো এদেশে যদি কেউ কোনদিন বিপ্লব করে সেটা শেখ মুজিবই করবে।" তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লব না হোক সমাজ সংস্কার বা জাতি গঠনের কাজে মুজিব ছাড়া যে অন্য কারো পক্ষে গণমানুষকে উদ্বুদ্ধ করা বা তাদের সমর্থন আদায় করা সম্ভব ছিল না এটি সত্য এবং ঐ ধরনের কোন পরিকল্পনা একমাত্র মুজিবই গ্রহণ করতে পারতেন।

আমার মনে হয়, শেখ মুজিব ক্ষমতার জন্য নয় বরং জাতি গঠন করার একটি স্বপ্ন বা আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। তবে সেই সিদ্ধান্ত ছিল ভুল, একটি বিপর্যয়কর, অদূরদর্শী ও অপরিণামদর্শী বিবেচনা (error of judgement)। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তিনি বাকশাল সৃষ্টি করেছিলেন কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। দেশে তখন তার কোন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তিনি ছিলেন অনেকটা একচ্ছত্র সম্রাটের মত। শেখ মুজিব কোনদিন ক্ষমতাচ্যুত হবে বা তাকে হত্যা করা হবে এটি কেউ তখন ভাবতে পারেনি। দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী বাকশালকে গ্রহণও করেছিলেন। শত শত সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, আইনজীবীদের বাকশালে যোগদানের কথা কারো ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কেউ তাদের মিছিল করে বাকশালে যোগ দেয়ার জন্য জোর করেনি, তারা স্বেচ্ছায় বৃষ্টিতে ভিজে তাঁর জন্মদিনে মুজিবের গলায় মালা পরিয়েছে। তিন বছর দেরি হয়ে গেলেও তিনি নতুন করে আর একটি যাত্রা শুরু করতে চেয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তাঁর মধ্যে দেশের মানুষের ভাল করার যে সদিচ্ছা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সময়, প্রেক্ষিত এবং প্রস্তুতির কথা বিবেচনা করলে মনে হয় মুজিব তাঁর বুদ্ধিবিবেচনায় মারাত্মক একটি ভুল করেছিলেন। তিনি যে ঠিক কি করতে চেয়েছিলেন সেটা সঠিকভাবে উপস্থাপনও করতে পারেননি।

দ্বিতীয়ত, এই যাত্রায় মুজিব ছিলেন অনেকটা একা এবং একার পক্ষে কোন সমাজকেই যে পরিবর্তন করা সম্ভব নয় সেটা বোধহয় তিনি নিজেও জানতেন। তাঁর দলের লোকেরা, নেতৃবৃন্দ, পার্লামেন্ট সদস্যরা যদিও তাঁকে বাহ্যিক সমর্থন দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন এটির বিরুদ্ধে। তাঁরা সামনে তাঁর গুণকীর্তন করেছেন, আর পেছনে গিয়ে তাঁর সমালোচনা করেছেন। তাঁর সদিচ্ছা, স্বপ্ন বা আদর্শের সাথে বাস্তবের খুব বেশি সম্পর্কও ছিল না। বরং ছিল অনেক সংঘাত এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব। এইসব সংঘাত এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান না করে শুধু ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

পদক্ষেপ নেয়াটা তাঁর উচিত হয়নি। আর সবচেয়ে বড় কথা ছিল তিনি বা তাঁর দল ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না। বৈঠকখানায় সমাজবাদী হওয়া এক কথা, আর বাস্তব কার্যক্ষেত্রে সমাজবাদী হওয়া আর এক কথা। আওয়ামী লীগ সত্যিকার অর্থে কোনদিনই একটি সমাজতান্ত্রিক দল ছিল না, শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতা সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না বা কোন দর্শনভিত্তিক সমাজতন্ত্রের দীক্ষায় দীক্ষিত ছিলেন না। তাঁদের শ্রেণীগত চরিত্র এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারে কোনদিনই সেটা প্রতিফলিত হয়নি। তাই এই কারণেই একদলীয় সরকার গঠন করার পেছনে কোন আদর্শগত কারণ ছিল বলে অনেকে বিশ্বাস করতে চান না। বরং প্রশ্ন তোলেন এই বলে যে, মনে প্রাণে সমাজতান্ত্রিক নয় এমন নেতৃত্ব বা সংগঠন কি করে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারে বা সে ধরনের একটি দেশে ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নিতে পারে?

তারপর তিনি যখন তাঁর এতদিনের আওয়ামী লীগকে বিলুপ্ত করে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন করার উদ্যোগ নেন তখন এটিই প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু আওয়ামী লীগ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং সেই দলের মাধ্যমে জনগণের মুক্তি আর আনা সম্ভব নয়, তাই নতুন শক্তি নিয়ে তিনি আর একটি রাজনৈতিক সংগঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই সংগঠনে নতুন মুখ ও সৎ, চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান নতুন কর্মীর আবির্ভাব হবে—এটিই ছিল সকলের প্রত্যাশা। এ ব্যাপারেও দেশকে একটি নতুন দিক্‌দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে তোলার মুজিবের সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেনি। আওয়ামী লীগের পরিবেশ, আবহ এবং বেস্টনি থেকে মুজিব শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারেননি। শুধু যে নতুন দলের নামের মধ্যে 'আওয়ামী লীগ'—এই দলীয় নামটি সংযুক্ত রেখেছিলেন তাই-ই নয়, যখন তিনি তাঁর নতুন সরকার এবং সংগঠনের কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করলেন সেগুলোতে পুরোনোরাই সব আবার নতুন করে আবির্ভূত হলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত—তাঁর নতুন শাসন ব্যবস্থা, সরকার, দল, কর্মসূচি—সবকিছুর মূল্যকেই জনসমক্ষে তুচ্ছ করে দিয়েছিল। অর্থাৎ কাগজে কলমে মুজিব আওয়ামী লীগকে বিলুপ্ত করলেও আওয়ামী লীগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি।

উপরোক্ত কারণে বলা যায় যে, ১৫ আগস্ট যদি মুজিবের মৃত্যু না হতো তবুও তাঁর একদলীয় শাসন এবং বাকশাল সংগঠন এবং কর্মসূচি সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হতো। নেতৃত্বের শ্রেণী-চরিত্র এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের জন্যই এই ব্যর্থতা ছিল অবশ্যম্ভাবী। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য বৈপ্লবিক বা আদর্শগত কিছু করার উপযোগী সংগঠন বা নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের ছিল না। শেখ মুজিব বা তাঁর দল আওয়ামী লীগের বিচার বিশ্লেষণ তাঁদের কর্মফলের ওপর ভিত্তি করে করতে হবে এবং ধরে নিতে হবে তাঁরা যা করেছেন শুধু সেটুকুই তাঁদের দ্বারা সম্ভব ছিল। তাঁদের পক্ষে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা করাটাই ছিল অবাস্তব ও অস্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট নিয়ে এত সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করা কখনোই সম্ভব ছিল না, উপরন্তু বিভিন্ন আন্দোলন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের কারণে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গিয়েছিল অনেক। তারা মুজিব

www.pathagar.com

আর আওয়ামী লীগের থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আশা করেছিল, যা সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং মুজিবের মনস্তাত্ত্বিক স্ববিরোধিতা ও আওয়ামী লীগের নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং দুর্বলতার জন্য কোনদিনই মেটানো সম্ভব হতো না। যুদ্ধোত্তরকালে দেশে একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থা দেয়ার মত উপযোগী নেতৃত্ব বা সংগঠন আওয়ামী লীগের ছিল না বা বাকশালেরও হয়নি এবং এই সীমাবদ্ধতাটিই ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট ট্রাজেডি।

গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে স্বাধীনতা-উত্তরকালে শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ অনেক ভাল কাজ করেছে বলেও দাবি করতে পারে এবং এই দাবি অস্বীকার করারও উপায় থাকবে না। তারা একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠিত করেছিল। এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন থেকে শুরু করে অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা, প্রশাসন—সবকিছু নিয়ে একটি সরকার চালু করে দিয়েছিল, সরকারের একটি অবকাঠামো দাঁড় করাতে পেরেছিল, এই ব্যাপারে অনেকে দ্বিমতও করে না। কিন্তু আওয়ামী লীগের কতগুলো কাজ অদূরদর্শিতা এবং ভুল সিদ্ধান্তের জন্য এদেশের মানুষ এই দলকে কোন কৃতিত্বের জন্যই মূল্য দিতে চায় না। মনে রাখতে হবে যে, আওয়ামী লীগের কাছ থেকে দেশের মানুষ কোন আর্থ-সামাজিক বিপ্লব বা সোনার হরিণ চায়নি। তারা প্রধানত একটি স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর মুজিব বা আওয়ামী লীগ তাদের সেই স্বাভাবিক জীবনটাই ফিরিয়ে দিতে পারেননি। উপরন্তু তাঁরা এমন কতগুলো ভুল করেছেন যার মাশুল এদেশের মানুষকে কত যুগ যে দিতে হবে, কত প্রজন্মকে যে এজন্য কষ্ট স্বীকার করতে হবে সেটা শুধুমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারে। এইসব ভুল এবং অদূরদর্শিতার মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে মারাত্মক এবং সুদূরপ্রসারী ছিল তা নিম্নরূপঃ

১. স্বাধীনতার আন্দোলন যখন সশস্ত্র জনযুদ্ধে পরিণত হয় তারপরও আওয়ামী লীগ এই যুদ্ধকে ভারতের সাহায্যে নিজেদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছে। এই নীতি অবলম্বনের ফলে খোদ মুক্তিযুদ্ধই বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ যদিও মস্কোপন্থী ন্যাপ আর কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা/পরামর্শ (consultative) কমিটি গঠন করেছিল, কিন্তু ঐ কমিটিতে অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে না নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক অঙ্গনে ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্য বাড়িয়ে দিয়েছিল। মওলানা ভাসানী তখন ভারতে অবস্থান করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ তাঁকেও সাথে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। শুধু তাই নয়, মওলানাকে এক প্রকার অন্তরীণ অবস্থায় দিন কাটাতে হয়েছে ভারতে। ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন রক্ষা করতে গিয়ে দেশের অনেক বামপন্থী শক্তিকে তারা দূরে রাখে আর চীনকে ঠেলে দেয় পাকিস্তানের দিকে। স্বাধীনতাযুদ্ধটাও যেন ছিল আওয়ামী লীগের জন্য ক্ষমতা দখল করার একটি প্রয়াস। এটিকে দলমত নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণে সত্যিকারের মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে তারা দেখতে চায়নি। রাজনীতি এবং নির্বাচন

www.pathagar.com

একাকী করার নীতি আওয়ামী লীগ বহু বছর থেকে অনুসরণ করে এসেছে, কিন্তু যুদ্ধটা তো একটি নির্বাচনী রাজনীতি ছিল না। তাই মুক্তিযুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠীর যে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন ছিল সেটা তাদের সেই ভুল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের তারা কোন রাজনৈতিক আদর্শেও দীক্ষিত করেনি। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন রাজনৈতিক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তার ওপর ছিল আওয়ামী লীগের ভেতরকার কোন্দল, টানাপোড়েন এবং রাজনৈতিক নানান স্রোতের অস্তিত্ব। নবীনরা ছিল প্রবীণদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বের প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকি হিসেবে মুক্তিবাহিনীর বাইরে একটি স্বতন্ত্র, শক্তিশালী "মুজিব বাহিনী" গড়ে তোলা হয়। এইসব ভুল নীতি এবং কর্মকাণ্ডের গভীর প্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালে আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং নেতৃত্বকে ক্ষতবিক্ষত করেছে।

২. মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়নে অবহেলা এবং প্রতিরক্ষাবাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্তে ভুল ছিল। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের কোন দলগত বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ছিল না। যুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসী সরকারকে কোলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা বার বার হুঁশিয়ার করে দেয়া সত্ত্বেও তারা এই বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া তো দূরের কথা, কর্ণপাত করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। একমাত্র তাজউদ্দিন আহমদ ছাড়া এই বিষয়ে কারো মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা যায়নি। মুক্তিযুদ্ধের গভীরতা এবং মানুষের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, এর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে—যুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের ওপর কোন বিশ্লেষণ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ করেননি। তাদের কোন পার্টিগত বা সরকারি কোন আনুষ্ঠানিক বক্তব্য বা literatureও ছিল না। তাদের কাছে যুদ্ধটা যেন ছিল তাদের অর্থাৎ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর লড়াই। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করেছে, সুতরাং আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যই যেন সারা জাতি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

৩. মুক্তিযোদ্ধাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তাদের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। স্বাধীনতা অর্জন করার পর মুক্তিযোদ্ধাদের কি ভূমিকা হবে, তাদেরকে কিভাবে সমাজে গ্রহণ করা হবে বা সমাজ তাদের কিভাবে গ্রহণ করবে, তাদের কোন্ কাজে ব্যবহার করা হবে—এসব কোন ব্যাপারেই আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের বা সরকারের কোন নীলনকশা (blue print) ছিল না। পৃথিবীর বহু দেশই গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে—আলজেরিয়া, কিউবা, এমনকি ইন্দোনেশিয়া এবং বার্মাও তাই করেছে। এদের প্রত্যেকটি দেশে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের নিজেদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

www.pathagar.com

করেছেন, কিন্তু বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা এবং শ্লোগান দিয়েছেন, আবেগ ভরা কণ্ঠে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী আর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা বলেছেন, কিন্তু তাদের জাতি গঠন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করার কোন পরিকল্পনা তাঁরা রচনা করেননি। আওয়ামী লীগের নেতা বা কর্মীরা যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পৌঁছেছিলেন বা প্রবাসী সরকারের সাথে জড়িত ছিলেন তাঁরা নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করেন এবং সরকার এবং নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে দাবি করেন। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যারা সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছে তাদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে, পৃথিবীর সব স্বাধীনতা আন্দোলনে, যেখানেই অস্ত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, সেখানেই অস্ত্রধারীদেরই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং সময়ে দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরের বিভিন্ন মানুষ যুদ্ধে সাহায্য করে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের আশপাশে থেকে অস্ত্রধারণ না করে সমরে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ যেই দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয় যে, এদেশের অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া বাকি সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তাই মুক্তিযোদ্ধা বলতে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদেরই প্রথম গণ্য করতে হবে, তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের যারা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে তাদের। এরপর আসবে কোলকাতা, শিলং, শিলিগুড়িতে বসে যাঁরা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে দাবি করেন তাঁদের কথা। তাই আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বা প্রবাসী সরকার যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বের দাবি করেন তাঁরা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অবহেলা বা অবমূল্যায়ন করে ভুল এবং অন্যায় করেছেন। অবশ্য এই অবমূল্যায়ন বা অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল কারণ ছিল আওয়ামী লীগের বা প্রবাসী সরকারের কোন উচ্চ পর্যায়ের নেতা অস্ত্র হাতে নিয়ে সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁরা প্রায় সকলেই কোলকাতায় ভারত সরকারের দেয়া ফ্ল্যাট বাড়িতে পরিবারবর্গ নিয়ে সকল প্রকার সুবিধাসহ অনেকটা স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছেন।

যাই হোক স্বাধীনতার পর দেশে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি জাতীয় মিলিশিয়া গঠন করার জন্য তাজউদ্দিন আহমদ একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য বা তার কার্যকারিতা সম্পর্কে আর কিছু শোনা যায়নি। পরে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সরকারি এবং আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি দিতে চাইলেন। পুলিশ, বিডিআর, রক্ষীবাহিনী আর সেনাবাহিনীতে তাঁদের চাকরির ব্যবস্থা করলেন। চাকরিজীবী মুক্তিযোদ্ধাদের চাকরিতে দুবছরের সিনিয়রিটি দিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি কল্যাণ ট্রাস্ট করা হলো। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত

www.pathagar.com

মহিলাদের এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য উদ্যোগ নেয়া হলো। এই পদক্ষেপগুলো নিয়েই আওয়ামী লীগ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনেক কিছু করেছে বলে দাবি করে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের মূল সমস্যার প্রতি তারা উপযুক্ত দৃষ্টি দেয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করা বা তাদেরকে দেশের রাজনৈতিক এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার কোন প্রয়োজনীয়তা তারা বোধ করেনি। চাকরি পেলেই তারা খুশি হয়ে যাবে বা কিঞ্চিত আর্থিক সাহায্য করলে তাদের অভাব দূর হবে, এরকম একটি ধারণা নিয়েই মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অবহেলার ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যে নৈরাজ্য এবং হতাশার জন্ম হয়েছিল তারই প্রতিফলন এবং প্রতিক্রিয়া আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের শাসনামলে এবং পরবর্তীকালে আমাদের প্রতিরক্ষাবাহিনীর সংগঠন এবং নেতৃত্বে, মুজিব এবং জিয়ার হত্যাকাণ্ডের ঘটনায়।

৪. একইভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিরক্ষাবাহিনী কিভাবে গড়ে তোলা হবে সে ব্যাপারে আওয়ামী লীগের কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। প্রত্যেক সামরিক বাহিনীর একটি লক্ষ্য থাকে, সেটাও তারা স্থির করতে পারেনি। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বা তার সংগঠন বা তার সেনাবাহিনীর আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা, থাকলে কতটুকু আছে এবং তাদের ভূরাজনৈতিক দিকনির্দেশনা (Geo-political orientation) কি হবে—এগুলোর কোন কিছুই দেশের তৎকালীন নেতারা নির্ধারণ করতে পারেননি। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রবাসী সরকারকে এই বাপারে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল আমার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সার্কাস এভিনিউতে অবস্থিত রিসার্চ সেলের পক্ষ থেকে, কিন্তু সে ব্যাপারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ ব্যাপারে একটি দীর্ঘ পজিসন পেপার তৈরি করে দেয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার পর জাতীয় মিলিশিয়ার কথা বলে যদিও পরে আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হলো না, তবে ইত্যবসরে এটুকু বোঝা গেল যে, আওয়ামী লীগ সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী হতে দেবে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তিক্ত অভিজ্ঞতা আওয়ামী লীগের ছিল এবং তৃতীয় বিশ্বে সামরিক বাহিনী যে সুযোগ পেলেই ক্ষমতা দখল করে এটাও তাদের জানা ছিল। তাই সামরিক বাহিনীকে ছোট রাখার চেষ্টা করা হলো, বাজেট দেয়া হলো কম, আর স্বাভাবিকভাবেই নতুন দেশে সামরিক বাহিনীর কোন রাজনৈতিক ভূমিকা থাকল না। অথচ এই সংগঠনটিকে দাঁড় করানো হলো একেবারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কায়দায়, যা আগেই আলোচনা করেছি। একটি জিনিস আওয়ামী লীগ ভুলে গিয়েছিল যে, তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল সদস্যই ছিল মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনীতি সচেতন নাগরিক। একটি মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের নবজন্ম ঘটেছিল, কোন পেশাগত regimental

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নয়। যাঁরা আগে থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার জন্য তাঁরা সেনাবাহিনী ত্যাগ করার মত একটি রাজনৈতিক ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

৫. সামরিক বাহিনীর প্রতি এই অবহেলার সাথে আর একটি নতুন এবং মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করা হলো। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অফিসারদের সেনাবাহিনীতে পুনঃনিয়োগের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা আগেই আলোচনা করেছি। ফলে আওয়ামী লীগ শুধু অবহেলিত নয়, একটি দ্বিধাবিভক্ত সেনাবাহিনীর জন্ম দেয়। বিভিন্ন কারণে এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া, অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলহ এখন আর চাপা থাকল না। যদি একটি পেশাগত regimental army-ই গঠন করার সিদ্ধান্ত তখনকার আওয়ামী লীগ সরকার নিয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার এ ব্যাপারে কোন প্রতিষ্ঠিত ফর্মুলা অনুসরণ করেনি। কোন চিন্তাভাবনা না করেই পাকিস্তানী কাঠামো অনুকরণ করে একটি বাহিনী দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে—এর চরিত্রগত বা গুণগত দিকটা কি হবে তা পরীক্ষা করার ন্যূনতম প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। পেশাগত কারণেই প্রতিরক্ষাবাহিনী গঠন করার ব্যাপারে কতগুলো নীতিমালা অনুসরণ করা হয়, আর তার মধ্যে অন্যতম হলো শৃঙ্খলা। অন্যান্য সেনাবাহিনী গড়ার অভিজ্ঞতা থেকে অনেকে এটি মনে করেন যে, (ক) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে যেসব অফিসার discipline ভঙ্গ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন তাঁদের আবার নিয়োগ করা উচিত হয়নি। তাঁরা যদিও চরম সাহসিকতা এবং দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা chain of command ভঙ্গ করেছিলেন, পাকিস্তানের প্রতি পেশাগত allegiance ভঙ্গ করেছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন deserters। এঁদের আর একটি পেশাগত discipline force-এ নেয়া উচিত হয়নি। যদি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা থাকত এবং এসব বীর যোদ্ধাদের রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে দেয়া হতো তাহলে অবশ্য অন্য কথা। (খ) একই কারণে পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অফিসারদেরও সেনাবাহিনীতে আর পুনঃনিয়োগ করা ঠিক হয়নি। যদিও স্বাধীনতাযুদ্ধে এঁদের অংশগ্রহণ করতে না পারাটা নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করেনি, কিন্তু তাঁরা যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি তার একটি সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া ১৯৭১ সাল থেকেই তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে নেয়া হয়েছিল এবং তাঁদের পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁদের প্রতি আর বিশ্বাস করতে পারেনি। বাঙালি অফিসারদের পাকিস্তানের প্রতি আর allegianceও থাকল না। তাই ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এরা পাকিস্তানে আটক ছিলেন। এঁদেরকেও অনেকটা যুদ্ধবন্দি (POW) হিসেবে রাখা হয়েছিল। এদের মতিগতি, শৃঙ্খলা, প্রশিক্ষণ, চিন্তাধারা এবং

www.pathagar.com

> orientation এবং মানসিক অবস্থার ব্যাঘাত ঘটেছিল অনেক এবং এত বছর বসে থাকা লোকদের সেনাবাহিনীতে পুনঃনিয়োগ না করার সাধারণ নিয়মও রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের যে নব্বই হাজারের মত সেনাবাহিনী সদস্য এদিকে আটকা পড়েছিল পাকিস্তানে ফেরত যাওয়ার পর এদের কাউকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ফেরত না নিয়ে সকলকেই অবসর দিয়ে দেয়া হয়।

তাই আজ মনে হয় যে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি পেশাগত সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার চিন্তাটাই ছিল ভুল। আর তাঁদেরকে নিয়ে যখন তা করা হলো তখন পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসারদের অন্তত সেনাবাহিনীতে নেয়াটা উচিত হয়নি। তাঁদের অবসর দিয়ে অন্যত্র ব্যবহার বা নিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। সবচেয়ে ভাল হতো যদি মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ গঠনের কাজের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা হতো বা সেটার সুযোগ করে দেয়া হতো। বিশেষ করে, অফিসারদের অবসর করিয়ে রাজনৈতিক ভূমিকা দিয়ে রাজনৈতিক সংগঠনে সম্পৃক্ত করতে পারলে হয়তো ভাল হতো। আরো ভাল হতো জাতীয় মিলিশিয়া গঠন করে তাঁদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারলে। আবার এটাও অনেকে মনে করেন যে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের দিয়ে সামরিক বাহিনী গঠন করার পর তাঁদের কোন ante-dated প্রমোশন দেয়া উচিত হয়নি। তাঁদের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ জায়গাজমি বা অর্থ পুরস্কার দেয়া উচিত ছিল। এটি করলে পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসারদের নিযুক্তির কারণে seniority এবং discipline নিয়ে সামরিক বাহিনীতে এত গোলমাল সৃষ্টি হতো না। কিন্তু ঐ ধরনের ব্যবস্থা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হতো এবং বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধারা এটি কিভাবে গ্রহণ করতেন তা বলা মুশকিল। আবার অনেকে এটাও মনে করেন যে, সেনাবাহিনী যদি তৈরি করতেই হতো তাহলে মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রত্যাগত দুদলকেই বাদ দিয়ে নতুন করে বাহিনী গঠন করা উচিত ছিল। মেজর এবং তদুর্ধের সকল অফিসারকেই অবসর করিয়ে দিয়ে খুব জুনিয়র অফিসার এবং জওয়ানদের দিয়ে বাহিনী শুরু করা উচিত ছিল। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের অফিসারদের অবশ্য রাখা যেতে পারত।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় আওয়ামী লীগের এককেন্দ্রীক কোলকাতাভিত্তিক আনুষ্ঠানিক ভূমিকার জন্য তখন এবং তৎপরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা বা সেনাবাহিনীর অফিসারদের সাথে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একটি দূরত্ব থেকে যায়। তাই স্বাধীনতার পর তাঁদের প্রতি বিমাতাসূলভ ব্যবহারের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার সেনাবাহিনীর কাছ থেকে যতটুকু আনুগত্য লাভ করা উচিত ছিল তার কিছুই পায়নি। কয়েক মাসের মধ্যেই সামরিক অফিসাররা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমালোচনা শুরু করে দেন। বলাবাহুল্য যে, যেসব দেশে সামরিক বাহিনী ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য রাখে না সেই রাজনৈতিক সরকারের ক্ষমতায় টিকে থাকা, অন্তত তৃতীয় বিশ্বে, খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধকে যেহেতু আওয়ামী লীগ ধরে নিয়েছিল তাকে ক্ষমতায় বহাল করার একটি বাহন হিসেবে, তাই স্বাধীনতার পর তার দলীয় নীতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সকল ব্যাপারে একদলীয় মনোভাবই পোষণ করেন। একটি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করার কোন প্রচেষ্টা তাঁরা করেননি। উপরন্তু বিরোধীদের প্রতি সবসময়ের জন্য একটি যুদ্ধংদেহি মনোভাব গ্রহণ করলেন। দেশের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অথচ সঙ্কটময় মুহূর্তে একটি নতুন দেশ গড়ে তোলার জন্য যে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন ছিল তার পরিবর্তে আওয়ামী লীগের কতিপয় ব্যাপারে একগুঁয়েমি, সিদ্ধান্ত হীনতা এবং ভুল নীতির জন্য জাতি প্রাথমিক অবস্থাতেই বিভক্ত হয়ে পড়ে। এখানেও আওয়ামী লীগের নেতারা জাতীয় মুক্তি অর্জন এবং স্বাধীনতাকে তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার মনে করে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেন। সমস্ত জাতীয় অর্জন এবং মূল্যবোধকে একান্ত ভাবে নিজেদের সাফল্য মনে করে অন্য কাউকে সেসবের অংশীদার করতে অস্বীকার করেন। আওয়ামী লীগের অত বিপুল সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা নিজেদের এবং জাতীয় ঐক্যকে একাকার করে ফেলেন, নিজেদের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, আওয়ামী লীগই হচ্ছে জাতীয় ঐক্য—এরূপ ভাবতে শুরু করেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রারম্ভিক অবস্থায় এই দৃষ্টিভঙ্গি যে কতবড় একটি ভুল ছিল সেটির বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতিকে স্বাধীনতা লাভের প্রায় সাথে সাথেই বিভক্ত করে দেয়া হলো আরো কিছু কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে, যেমন:

১. প্রথমে যুদ্ধের সময় যারা সীমান্তের ওপারে গিয়েছিল তাদেরকেই স্বাধীনতার পক্ষের লোক ধরে নেয়া হলো এবং বাকিদের বিবেচনা করা হলো স্বাধীনতার বিপক্ষের লোক হিসেবে। সমাজ জীবনে এই মনোভাব প্রয়োগের ফলে দেশের অভ্যন্তরের কোটি কোটি মানুষকে জোর করে স্বাধীনতার বিপক্ষের ক্যাম্পেই ঠেলে দেয়া হয় এবং তাতে স্বাধীনতার পক্ষের লোকের সংখ্যা দারুণভাবে সংখ্যালঘু হয়ে যায়। ১ কোটি মানুষ যারা ভারতে গিয়েছিল তারা মূলত ছিল শরণার্থী। স্বাভাবিক কারণেই তাদের শতকরা ২ জনও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি অথচ তারা সবাই ঢালাওভাবে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে বসে, আর বাকি সাড়ে ছয় কোটি মানুষকে স্বাধীনতার শত্রু বানিয়ে দেয়া হয়। অথচ ঘটনাটা ছিল প্রায় বিপরীত। দেশের অভ্যন্তরে যারা ছিল তারা অবর্ননীয় কষ্ট, নির্যাতন এবং মৃত্যুকে বরণ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সকল অত্যাচার সহ্য করেছে। পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর দোসর কয়েক হাজার লোক ছাড়া সে সময় সারা দেশের মানুষ ছিল স্বাধীনতার পক্ষে। তারা হয় মুক্তিযুদ্ধ করেছে, আর না হয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য বা সমর্থন করেছে।

২. দালাল আইন করা হলো ঠিকই, কিন্তু এর প্রয়োগের বেলায় ব্যক্তিগত হিংসা, বিদ্বেষ, এলাকার শত্রুতা ইত্যাদি যারপরনাই কাজে লাগানো হলো। এর ফলে

www.pathagar.com

দেশের বহু নিরপরাধ ও গোবেচারা ব্যক্তিকে জেল খাটতে হয়, নির্যাতন পোহাতে হয়। পাশাপাশি কোন নাম করা দালালের দৃষ্টান্তমূলকভাবে সাজা বা সাজা দেবার উদ্যোগ দেখা গেল না। কোন সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই অনেক দালালকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। এই ব্যাপারে আওয়ামী লীগ পরস্পরবিরোধী দুটো নীতি পালন করে। কিছু গরিব মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেয়, আর টাকা নিয়ে কিছু বড় লোককে ছেড়ে দেয়। কাউকে শাস্তি দেয়, কাউকে ক্ষমা করে। অনেক নির্দোষ ব্যক্তি কষ্টভোগ করে। আর অনেকে দোষী হলেও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সার্টিফিকেট পায়। পৃথিবীর সব যুদ্ধের পর দালালদের বিচার হয়, শাস্তি হয়। উন্নত দেশেও এটি হয়ে থাকে। সুতরাং দালাল আইন করে সেই আইনানুযায়ী বিচারের ব্যবস্থা করার মধ্যে কোন ভুল ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের দুমুখো নীতি এবং আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব ও সিদ্ধান্তহীনতা মানুষের মধ্যে তিক্ততা এবং বিভক্তি এনে দেয়। এই আইনের অধীনে নামকরা প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে ব্যাপারটি সেখানেই বন্ধ না করে দিয়ে নিজেদের দলীয় রাজনীতির স্বার্থে দরকারমত ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে আইনটিকে জিইয়ে রাখা হয়।

৩. সংবিধান রচনার পরও ধর্মীয় বা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে না দেয়ায় ফল হয়েছিল বিপরীত। এতে শুধু গণতন্ত্রের নীতিমালাই ভঙ্গ করা হয়নি বা এই নীতি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে শুধু অন্তরায়ই হয়নি—এর ফলে দেশের জনগণের একটা বিরাট অংশ—যারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করে না, অথচ ধর্মভীরু—তাদের মধ্যেও একটি গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। পরিণতিতে এটি জাতীয় অনৈক্যের সৃষ্টি করেছিল। ইসলামপন্থী সকলেই পাকিস্তানের পক্ষে ছিল—এই ধারণাটিও ছিল একটি মারাত্মক ধরনের ভুল।

৪. বেসামরিক প্রশাসনেও এই একই চিত্র দেখা যায়। লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারী যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ ত্যাগ করেনি, তাদের সকলকেই প্রথমে স্বাধীনতার বিপক্ষের লোক হিসেবে ধরে নেয়া হলো। যেহেতু এই ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা ছিল না, তাই ব্যক্তির মর্জিমাফিক হয়রানি, নির্যাতন, বরখাস্ত, হুমকি এবং ভীতি সঞ্চার করে দেশের প্রশাসনকেও বিভক্ত করে ফেলা হয়েছিল। প্রণীত হয়েছিল পিও ৯ নামে নতুন আইন। ঐ আইনে শেষ পর্যন্ত কিছু সিনিয়র অফিসারকে বরখাস্ত করার পর সরকার সেই আইন আবার বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অফিসারদের মধ্যে সেই ক্ষোভ থেকে যায়। পিও ৯-এর অপব্যবহার হয়েছে—এই যুক্তি দেখিয়ে প্রশাসনে চরম ক্ষোভ এবং নৈরাজ্য বিরাজ করে।

www.pathagar.com

এইভাবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরে এবং পর্যায়ে আওয়ামী লীগ মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা, দালাল-দেশপ্রেমিক, ধর্মনিরপেক্ষতা-ইসলাম, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ, এগুলো নিয়েই অনেক সময় ও শক্তি ক্ষয় করেছে। একটি দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পর এই ধরনের ইস্যু ওঠা মোটেও অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু আওয়ামী লীগের উচিত ছিল এই ইস্যুগুলোর দ্রুত নিস্পত্তি করে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করা এবং দেশ গঠন করার কাজে মনোযোগ দেয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে রাজনৈতিক ইস্যুগুলোর সমাধান তো করেইনি, উপরন্তু এগুলোকে জিইয়ে রেখে ইস্যুগুলোকে আরো তীক্ষ্ণ করতে সহায়তা করেছে। এই বিভেদাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির মাশুল এই জাতি এখনো দিয়ে চলেছে এবং আরো কত যুগ দেবে সেটা একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারে।

দুই যুগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রণী শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। কেন করেছিলেন তার একটি বিশ্লেষণ যদিও আমি দেয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারপরও বিষয়টি আমাদের উত্তরসূরীদের কাছে অনেকটা রহস্য হিসেবেই থেকে যাবে। যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এটি করা হয়ে থাক না কেন, এটি ছিল শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত। আগেই বলেছি শেখ মুজিব যদি বেঁচেও থাকতেন, একদলীয় শাসন এবং বাকশাল কায়েম করাকে যদি ধরে নেই একটি সমাজতান্ত্রিক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, এই উদ্যোগ যে ব্যর্থ হতো সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকার কারণ দেখি না। সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে, এই ধরনের কোন কর্মসূচি বাস্ত বায়ন করার কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা সংগঠন আওয়ামী লীগ বা বাকশালের ছিল না। এই ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তাদের সৃষ্টি হয়নি। দুই যুগ ধরে তারা জনসাধারণকে যা বুঝিয়ে এসেছিল, বিশ্বাস করিয়ে এসেছিল, তাই-ই তাদের করা উচিত ছিল। যত যুক্তি আর আদর্শের কথাই বলা হোক না কেন, দেশে একদলীয় স্বৈরতন্ত্র সৃষ্টি করার জন্য আওয়ামী লীগের শুধু আইনগতভাবেই নয়, নৈতিক দিক থেকেও কোন অধিকার ছিল না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একদলীয় শাসন ও সেজন্য বাকশাল সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এদেশের মৌলিক সমস্যাগুলো যেমন স্বাধীনতার ৩ বছর পর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, এখনো সেগুলো রয়ে গেছে। বরং বলা যায় যে, এই সমস্যাগুলোর ব্যাপকতা আরো দিন দিন বৃদ্ধি পাবে এবং কোন সরকারই এককভাবে এসব সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে না। আমাদের দারিদ্র্য যত গভীর, আমাদের সমস্যাও তত গভীর। মূলত দারিদ্র্য থেকে উদ্ভূত এইসব সমস্যা নিরসন করার চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু সমাধান তত সহজ নয়। এজন্য যে সংগঠন এবং নেতৃত্বের প্রয়োজন কোন অদূর ভবিষ্যতে তার আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনাও দেখি না। আওয়ামী লীগ একটি সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। আর এখন আমরা পরনির্ভর অর্থনীতির

www.pathagar.com

যে পর্যায়ে পৌঁছেছি তাতে আমাদের দেশের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধানের পথ আরো দুরূহ হয়ে পড়েছে। এই অর্থনীতির ফলে ভূমিহীনতা বা বেকারত্ব দেশে হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে।

যাক আবার আওয়ামী লীগের কথায় যাওয়া যাক। তাদের রাজনৈতিক ঐতিহ্য আর সংগঠনের শ্রেণী-চরিত্র বিচার করলে এটুকু বলা যায় যে তারা আর কিছু না হোক—দেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে না পারলে,—দেশে একটি গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশন দাঁড় করিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন। আর এটুকু করে গেলেই আওয়ামী লীগ ইতিহাসে অমর হয়ে থাকত। আগেই বলেছি, আওয়ামী লীগ দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করবে সেটা কোন সচেতন বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোনদিন আশা করেনি, তারা তার কাছে দেশে ন্যায়বিচার আর একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা আশা করেছিল মাত্র।

কোন একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য আওয়ামী লীগ যেমন প্রস্তুত ছিল না, তেমনি দলটি তার উপযুক্তও ছিল না। এটি অনেকটা ছিল তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার মত ঘটনা। আর এখান থেকেই শুরু হয়েছে যুদ্ধকালের এবং যুদ্ধোত্তরকালের আওয়ামী লীগের সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং এইসব অন্তর্দ্বন্দ্বই শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগকে পরস্পরবিরোধী স্রোতে প্রবাহিত করেছে এবং দলের পতন ডেকে এনেছে, দলের ভেতরে প্রবীণ আর নবীনদের লড়াই সৃষ্টি করেছে। রক্ষণশীলদের সাথে প্রগতিশীলদের দ্বন্দ্ব, new order আর old order প্রতিষ্ঠা করার সংঘাত, বিপ্লবের রাজনীতি আর পুনর্বহালের রাজনীতির কর্মসূচি—এসবকিছুই ছিল ঐসব contradiction-এর প্রতিফলন। আর এই contradiction গুলো সমাধান করার মত যুৎসই নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের ছিল না। এই ব্যাপারে একা শেখ মুজিবকে দায়ী করা অন্যায় হবে।

এইসব দ্বন্দ্ব আরো ধারালো হওয়ার অপর একটি কারণ ছিল মুক্তিযুদ্ধে মুজিবের অনুপস্থিতি। যুদ্ধে মুজিবের এই অনুপস্থিতির পরিণতি হয়েছিল মারাত্মক। যুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের চিন্তাধারার স্রোতে এবং রাজনীতির অঙ্গনে যে নতুন dimension সৃষ্টি করেছিল মুজিব সেটা আর উপলব্ধি করতে পারেননি। মুজিবের পক্ষে দেশে ফিরে এসে যুদ্ধের dynamics-এর সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কথা শুনে মুজিবকে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়ন করতে হয়েছে। তাই তাঁকে একবার গণতন্ত্র আর একবার একদলীয় সরকার; একদিকে সমাজতন্ত্র অন্যদিকে হেনরী কিসিঞ্জারকে খুশি করার প্রচেষ্টা ও aid club-এ গিয়ে আত্মসমর্পণ করা, একদিকে সমাজ গঠন এবং বিপ্লবের কথা বলা, অন্যদিকে আমলাতন্ত্র এবং প্রতিরক্ষাবাহিনীকে পুরোনো কায়দায় বহাল করা—এই সবকিছুই তাঁকে করতে হয়েছে। ১৯৬৮ সাল থেকেই স্বাধীনতার আন্দোলন খোলাখুলিভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং আওয়ামী লীগের অনেকেই দাবি করেন যে শেখ মুজিব ১৯৪৭ সালের পর থেকেই জানতেন পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা ছাড়া উপায় থাকবে না। কিন্তু স্বাধীন হওয়ার পর দেখা গেল দেশকে কিভাবে পরিচালনা করা হবে তার কোন পরিকল্পনা আওয়ামী লীগের কাছে ছিল না।

www.pathagar.com

মুজিবের ব্যক্তিশাসন মনোবৃত্তিও দেশে প্রতিষ্ঠান তৈরি করার পরিপন্থী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এত জনপ্রিয়তা, এত উঁচু স্থান পাওয়ার পর, তিনি ছিলেন জাতির জনক, সরকারপ্রধান, দলপ্রধান, বঙ্গবন্ধু—সবকিছুই। এরকম অবস্থান থেকে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা অন্য যে কারো চেয়ে বেশি হবে এটিই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু সংগঠন এবং দলীয় নেতৃত্বের অন্যান্য দুর্বলতার জন্য তিনি হয়ে উঠেছিলেন একবারে Omnipotent, যার ফলে সবকিছুর মধ্যে একজন ব্যক্তির অস্তিত্ব সন্নিবেশিত হয়েছিল। তাঁর আবেগপ্রবণতার জন্যও তাঁর কাজকর্মে একটি সামন্তবাদী মনোভাবের পরিচয় ফুটে ওঠে। কিন্তু এইজন্য একা মুজিবকে দোষারোপ করে যাঁরা নিজেদের সব ব্যর্থতা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চান তাঁরা অন্যায় করবেন। যাই হোক তাঁর দল নিজেদের স্বার্থ এবং আত্মরক্ষার্থে শেষ পর্যন্ত মুজিবকেই সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করাল এবং তাঁকে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিল। “এক নেতা এক দেশ শেখ মুজিবের বাংলাদেশ” শ্লোগানে দেশকে মুখরিত করা হলো। তাই মুজিবও শেষ পর্যন্ত কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করার জন্য তোয়াক্কা করেননি। বাংলাদেশ হয়ে উঠল তাঁর ‘ব্যক্তিগত’ দেশ, আর সেই কারণে অতীতের সমস্ত ওয়াদা, আন্দোলন, ঐতিহ্যকে ভুলে একাই দেশে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করলেন। কিন্তু তবুও কথা থেকে যায়, যাঁরা তখন তাঁর চারপাশে ছিলেন তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন কিনা, তাঁরা নিজেদের বিবেকের কাছে পরিষ্কার ছিলেন কিনা। রাজনীতিতে conviction এবং মৌলনীতি বলে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে। সেটা ক্ষণে ক্ষণে বদলানো যায় না। মানুষের বিশ্বাস তাতে নষ্ট হয়। মানুষকে নিয়ে রাজনীতি। যাই হোক আওয়ামী লীগ এত বড় সুযোগ পেয়ে শেষ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারল না, যাকে অবলম্বন করে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এগিয়ে যেতে পারে।

শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের এই সমস্ত ভুল শুধু যে তাদের ব্যর্থতা বা পতন ডেকে এনেছে তা নয়, এর পরিণতি সারা জাতির জন্য হয়েছে অত্যন্ত ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী। আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের দিকে তাকালে যেসব সমস্যাকে সবচেয়ে প্রকট বলে মনে হয় এবং যেসব সমস্যা দেশকে এবং জাতিকে ক্ষতবিক্ষত করছে, সেসব সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করলে স্বাধীনতার উত্তরকালের বছরগুলোতে ফিরে যেতে হয়। এগুলো আমাদেরকে আওয়ামী লীগ সরকারের ভ্রান্ত নীতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। আমরা সেখানেই এগুলোর উৎস (roots) পাই। সামরিক বাহিনীর উৎপত্তি, সংগঠন এবং কাঠামো; সাংবিধানিক সঙ্কট, মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ইসলাম, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতি—এই সঙ্কটগুলোর উৎস মূলত স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রথম কয়েক বছরের প্রশাসনেই খুঁজে পাওয়া যায়।

এদের মধ্যে সবচেয়ে জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যা সেটা হলো একদিকে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা এবং অন্যদিকে দেশে সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক একটি শাসন ব্যবস্থা কায়েম

www.pathagar.com

করা। এই দুটো সমস্যাই সৃষ্টি করে গেছে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের নেতা-মন্ত্রীরা একদিকে যেমন দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছেন, ত্যাগ, নির্যাতন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন, অপরদিকে ঠিক তেমনি স্বাধীনতার পর দেশকে অবহেলা করেছেন। তারা দেশকে স্বাধীন করার জন্য যেমন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, ঠিক তেমনি স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মূল্যবোধের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে গণতন্ত্রকে নিঃশেষও করে দিয়ে গেছেন।

এসব কথা বলার প্রয়োজন হতো না যদি জানতাম যে এই জাতি এসব ভুল সহজে উৎরে যেতে পারবে। কোন জাতির জীবনে সুযোগ বার বার আসে না। একজন ব্যক্তির জীবনে যত না আসে একটি জাতির জীবনে তার চেয়ে অনেক কম আসে। কত হাজার বছর লেগেছে বাঙালি জাতিকে ১৯৭১ সালের পর্যায়ে পৌঁছাতে বা আনতে? সেই উৎসাহ, সেই উদ্দীপনা, সেই ঐক্য, সেই নেতৃত্ব, আর সেই শেখ মুজিব তো একটি জাতির জীবনে বার বার জন্ম নেবে না, ঐ ধরনের ঘটনা ঘটে বিরল—সেইরকম মুক্তার মত একটি মুহূর্ত যখন আসে তখনই সেই জাতির মোড় ঘোরানোর সময় আসে—কারণ তখন সারা দেশের মানুষ নেতাদের অনুসরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে তারা কুণ্ঠা বোধ করে না। তারা যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকে। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে থাকে সমাজকে পরিবর্তন করার এক নতুন জাগরণ, ইচ্ছা এবং শক্তি। কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং এই জাতি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। আবার কোন্ দিন সেই সুযোগ আসবে কে জানে? কোন ব্যক্তি বা দল একটি জাতির জন্য হয়তো সবকিছু দিয়ে যেতে পারে না। নিজস্ব কর্মক্ষমতা অনুযায়ী যার যা সম্ভব তাই করে দিয়ে যায়। আওয়ামী লীগ অনেক কিছু করতে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্থায়ী কিছুই শেষ পর্যন্ত দিয়ে যেতে পারেনি। অন্তত তারা যদি একটি গতানুগতিক বুর্জোয়া, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও চালু রেখে যেতে পারত, ভারতের নেহরুজির মত, তাহলেও জাতির জনক হিসেবে শেখ মুজিবকে নিয়ে এত টানাহেঁচড়া এখন আর হতো না। আওয়ামী লীগকে ভেঙে বাকশাল করে আবার আওয়ামী লীগ করতে হতো না। যাই হোক শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব কিংবা তাঁর নতুন পদ্ধতি কোনটাই টিকে থাকতে পারেনি। এই সময় যদিও অর্থনৈতিক গতিপ্রবাহে উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তবু শেখ মুজিব শেষ রক্ষা করতে পারেননি।

শেখ মুজিবের মৃত্যু

দেশে একদলীয় শাসন প্রবর্তনের ফলে একটি চরম রাজনৈতিক শূন্যতা বহাল থাকাকালেও মুজিব ছিলেন নিঃসন্দেহে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং কর্তৃত্বপরায়ণ অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু দেশ ও জাতি গঠন প্রক্রিয়ার সুকঠিন রণযাত্রায় তিনি ছিলেন একক সৈনিক। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনী এক অপ্রচলিত কায়দায় সেই শূন্যতা পূরণের

www.pathagar.com

জন্য অভ্যুত্থান ঘটায়। সেনাবাহিনীর প্রধান সে সময় অবস্থান করছিলেন পর্দার অন্তরালে এবং একটি প্রতিষ্ঠান হিসবে সেনাবাহিনী ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিয়ে সেই সময় এগিয়েও আসেননি। শেখ মুজিবকে তাঁর সুদৃঢ় আসন থেকে অপসারণের জন্য যাঁরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাঝারি সারির গুটিকয়েক অফিসার এবং তাদের সহকর্মী হিসেবে কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

ঘটনার প্রায় ছয় মাস আগে থেকেই ইস্ট বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাংক ইউনিট এবং আর্মির সেকেণ্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট প্রতি মাসে দুবার বৃহস্পতিবার রাতে যৌথ সামরিক মহড়ায় অংশ নিয়ে আসছিল। ১৯৭৫ সালের ১৩ আগস্ট শেখ মুজিবকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অভিনন্দন জানানোর এক পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির দুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়, যার ফলে শেখ মুজিবের চারদিকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাতে ঐ দুটি ইউনিটের মহড়ার দিন ছিল নির্ধারিত। জানা যায় যে, মুজিব নিজে অফিসারদের গোলাবারুদবিহীন ট্যাংকগুলো ক্যান্টনমেন্টের বাইরে এনে পরদিন সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা মহড়া প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছিলেন। সেনা ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসার আগে লে. কর্নেল ফারুক রহমান এবং লে. কর্নেল আব্দুর রশিদ উপরোক্ত ইউনিট দুটোর কমান্ডার হিসেবে নিজ নিজ সৈনিকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং প্রতিটি কলামে ভিন্ন ভিন্ন অফিসারদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে গোটা ইউনিট দুটোকে তিনটি কলামে বিভক্ত করেন। অফিসার এবং সেনা সদস্যরা শূন্য ট্যাংক এবং অন্যান্য ভারি যানবাহন নিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে রওয়ানা হন। মাঝরাতের ঠিক পরপর কারওয়ান বাজারের কাছে তিনটি ট্যাংক দেখা যায়। সেগুলো এগুচ্ছিল বাংলাদেশ রেডিওর দিকে। অন্য একটি ট্যাংক এগিয়ে যাচ্ছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের অপর পাশে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের দিকে।

১৫ আগস্ট প্রথম প্রহরে এই গ্রুপগুলো একইসঙ্গে তিনটি বাড়িতে হামলা চালায় এবং শেখ মুজিবকে নির্মমভাবে হত্যা করে। নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সতর্ক পরিকল্পনার মাধ্যমেই এই হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করা হয়। সকালের মধ্যে অফিসাররা রেডিও স্টেশন দখল করে শেখ মুজিবের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেন এবং "দুর্নীতি, অবিচার এবং একনায়কত্বের" অবসানকল্পে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের কথা ঘোষণা করেন।

এটি ছিল একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড। শেখ মুজিবের ৮ বছরের শিশুসন্তান, দুই পুত্র এবং তাদের নবপরিণীতা বধূদ্বয় এবং শেখ মুজিবের স্ত্রীসহ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত মোট ৪৬ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়। সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার শেখ মুজিবের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার জন্য শেখ মুজিবকে হত্যা করেন। প্রশ্ন জাগে, কেন এবং কার স্বার্থে তাঁরা শেখ মুজিবকে হত্যা করেছিলেন? তাঁরা কি কেবলমাত্র স্বৈরাচারের হাত থেকে জনগণকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই এ পদক্ষেপ নিয়েছেন? নভেম্বর মাসে কারাগারে ৪ জন শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের হত্যাকাণ্ডও কি এই পরিকল্পনারই অংশ ছিল, নাকি কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের নিশ্চিহ্ন করাই এর

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য ছিল? এ সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, কিন্তু এগুলোর জবাব পাওয়ার কাজটি সহজ নয়।

আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে সমস্ত অফিসার এই অভিযানে অংশ নিয়ে জাতির পিতার প্রাণ সংহার করেন, তাঁদের সকলেই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। এদের মধ্যে ডালিম, নূর এবং শাহরিয়ার ছিলেন সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত। বোনের বিয়েতে আওয়ামী লীগের কতিপয় গুণ্ডার সঙ্গে এক অপ্রিয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ডালিমকে অনাড়ম্বরভাবে সেনাবাহিনী থেকে বের করে দেয়া হয়। মেজর নূর এবং শাহরিয়ারের অবসরগ্রহণও স্বেচ্ছামূলক ছিল না। ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবের আহ্বানে সেনাবাহিনী চোরাচালানি দমন ও বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে এগিয়ে এলে এই দুইজন অফিসারের নেতৃত্বে কয়েকজন প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতাকে উক্ত ধরনের অপরাধে আটক করা হয়। ফলে আওয়ামী লীগ নেতারা ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁদেরই প্রভাবে উক্ত অফিসার দুজনকে তলব করে অবসর দেয়া হয়।

শেখ মুজিব হত্যার প্রেক্ষাপট নিয়ে কয়েক ধরনের ব্যাখ্যা ও বিতর্কের সন্ধান পাওয়া যায়। এ নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনায় যাওয়া অর্থহীন, কারণ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলো প্রায়ই রহস্যাবৃত থেকে যায়। তবে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, সুনির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে একটি নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে লুকায়িত প্রকৃত সত্য হয়তো কোনদিনই প্রকাশ পাবে না।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৭

মোশতাকের অভ্যুত্থান: জাসদ ও সেনাবাহিনী, সিপাহী-জনতার বিপ্লব

শেখ মুজিবকে হত্যার পর তাঁরই সিনিয়র সহকর্মী খন্দকার মোশতাক ক্ষমতাসীন হন। সাথে সাথে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আসে আমূল পরিবর্তন। শেখ মুজিবের আবেগ আর কর্মসূচি যে তাঁর দলেরই একটা বিরাট অংশ চায়নি তার প্রমাণ দিলেন খন্দকার মোশতাক। তিনি নতুন সরকার করলেন আওয়ামী লীগের সকল পুরোনো মন্ত্রীদের নিয়ে। বাকশাল বা একদলীয় শাসন আর থাকল না। আওয়ামী লীগের প্রায় সকল নেতা এবং পার্লামেন্ট সদস্যবৃন্দ মোশতাক আর তাঁর চিন্তাধারার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। নেতার মৃত্যুতে অল্প কয়েকজন ছাড়া বাকি কারো কোন ক্ষতি হয়নি বরং লাভই হয়েছে। মোশতাক ক্ষমতাসীন হওয়ার পর অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করলে তখনকার পরিস্থিতিতে আরো হয়তো জনপ্রিয় হতেন কিন্তু সরকারের ধারাবাহিকতা এবং আওয়ামী লীগের প্রতি আনুগত্য দেখানোর জন্য বা আওয়ামী লীগের সংগঠনকে ব্যবহার করার জন্য তিনি তা করলেন না। তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা চালু রাখার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তিনি বাকশাল প্রথা বিলুপ্ত করে একটি সংসদীয় ব্যবস্থা কায়েম করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং একটি সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছিলেন। যদিও খন্দকার মোশতাকও বাকশাল প্রেসিডিয়ামের সদস্য ছিলেন এবং ক্ষমতাগ্রহণ করার পর তাঁকে মার্শাল ল' জারি করতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দেননি, সংবিধানও স্থগিত করেননি বা বিচার বিভাগেও হস্তক্ষেপ করেননি। এমনকি নিজে প্রধান সামরিক শাসকও হননি। সংবিধানকে চালু রেখে তার অধীনে নিজের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সামরিক বাহিনীর মূল নেতৃত্বের সাথে ভারসাম্য ঠিক করতে না পারায় খন্দকার মোশতাক শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরই কেবল মোশতাক আওয়ামী লীগের শত্রুতে পরিণত হন। মুজিবের হত্যার জন্য তাঁরা খন্দকার মোশতাককে দায়ী করেন, তাঁরা বলেন এই হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে মোশতাক

www.pathagar.com

জড়িত ছিলেন। যতদিন মোশতাক ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা তাঁর সাথে ক্ষমতা ভোগ করেছেন, কেউ মন্ত্রী হয়েছেন, কেউ বিশেষ দূত হিসেবে মস্কো গেছেন। তাঁরা অবশ্য যুক্তি দেখান যে তারা তখন প্রাণের ভয়ে মোশতাকের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের একটি অংশ তাঁর সাথে থেকে যায়, আর বাকিরা ফিরে গিয়ে নিজেদের সংশোধন করা শুরু করেন।

মুজিবকে হত্যা করেছিলেন কয়েকজন সামরিক অফিসার ও জওয়ান, যাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। মুজিবের হত্যার সাথে সাথে তাই সামরিক বাহিনী রাজনীতির দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় এবং দেশের রাজনীতি সামরিক বাহিনীর ব্যারাকে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে মুজিবকে অপসারণ করে প্রাথমিক অবস্থায় মোশতাককে রাষ্ট্রপ্রধান করায় এবং মোশতাক একটি সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠাকল্পে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করায়, মোটামুটিভাবে তখন পর্যন্ত রাজনীতিকদের হাতেই ক্ষমতা ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু মোশতাক ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুরোপুরি সামরিক বাহিনীর হাতে চলে যায় এবং ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিকদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনায় যবনিকা নেমে আসে। যদিও মাঝখানে বিচারপতি সাত্তার নির্বাচিত হওয়ার পর মাস চারেক দেশ চালিয়েছেন, কিন্তু সেটাকে পুরোপুরি রাজনীতিকদের সাফল্য বলে ধরে নেয়াটা উচিত হবে না। কারণ জিয়ার মৃত্যুর পরই যদিও সামরিক বাহিনী সংবিধানের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল কিন্তু বাস্তব নিরিখে তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে কখনো দূরে সরে ছিলেন না।

খালেদ মোশাররফের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর একটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জিয়াউর রমানের রাজনৈতিক আবির্ভাব ঘটে। গতানুগতিক সামরিক অভ্যুত্থানের চেয়ে জিয়াউর রহমানের উত্থান ছিল একটু ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা পরম্পরার ফল। খন্দকার মোশতাককে ক্ষমতাসীন করেছিলেন কিছু তরুণ সামরিক অফিসার যাঁরা সামরিক বাহিনীর Chain of Command-এর বাইরে থেকে এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন। কৃতকার্য হওয়ার পর স্বভাবতই তাঁরা ক্ষমতাশালী হন এবং বঙ্গভবনে রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে সামরিক বাহিনীতে ক্ষমতার দ্বৈতভিত্তি (dual power base) সৃষ্টি হয়। একটি ছিল প্রতিষ্ঠিত সামরিক আধিপত্য পরম্পরা (hierarchy) যার সাথে ছিল পুরো সামরিক বাহিনী আর একটি ছিল ছয়জন মেজরের নেতৃত্বে দুই ব্যাটেলিয়ান গোলন্দাজ আর সাঁজোয়া বাহিনীর প্রায় আটশত সৈনিক। সফল এই বিদ্রোহীদের সাথে স্বাভাবিকভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক সামরিক বাহিনীর দ্বন্দ্ব বাধে। প্রাতিষ্ঠানিক সামরিক কর্মকর্তাগণ বিদ্রোহীদের ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁদের command-এ আসার জন্য চাপ দিতে থাকেন, যা বিদ্রোহীরা মানতে রাজি ছিলেন না। ফলে ব্যাপারটা একটি ঠাণ্ডা লড়াইয়ে পরিণত হয়। কোন দেশের সামরিক বাহিনীতে স্বাভাবিকভাবেই এই অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না।

মোশতাকের অবস্থা এইদিক থেকে ছিল সবচেয়ে কঠিন। দেশের সরকারপ্রধান হয়ে সামরিক বাহিনীর Chain of Command বজায় রাখার দায়িত্ব ছিল তাঁর, অন্যদিকে

www.pathagar.com

তরুণ বিদ্রোহী অফিসার যাঁদের তিনি "বাংলাদেশের সূর্য সন্তান" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং যাঁরা তাঁর নিজস্ব power base হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, তাঁদেরও তিনি দূরে সরিয়ে দিতে পারেননি। যদিও মোশতাক পুরো সামরিক বাহিনীকেই তাঁর দিকে আনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এই সঙ্কটের কারণে শেষ পর্যন্ত তা করতে পারেননি। সামরিক বাহিনীকে নিজের পক্ষে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি জেনারেল শফিউল্লাহকে অবসর করিয়ে জেনারেল জিয়াকে চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত করেন, বিমানবাহিনীর এ. আর. খন্দকারকে অবসর করিয়ে ভাইস মার্শাল তোয়াবকে তাঁর জায়গায় নিয়োগ দেন। মেজর জেনারেল দস্তগীরকে বিডিআর-এর প্রধান নিযুক্ত করেন, আর খলিলুর রহমানকে চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ করেন। একইসঙ্গে তিনি সকলের সম্মানিত জেনারেল ওসমানীকে তাঁর সামরিক উপদেষ্টা নিযুক্ত করে মোটামুটিভাবে সামরিক বাহিনীকে হাতে রাখার চেষ্টা করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত বিবাদমান মূল দুই পক্ষের মধ্যে কোন বোঝাপড়ার ব্যবস্থা আর করে উঠতে পারেননি।

মোশতাক ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বিদ্রোহীদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যতই দিন অতিবাহিত হয়েছে ততই সামরিক ঘাটিতে সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে অস্থিরতা বেড়ে যায়। চিফ অব স্টাফ জিয়া আর চিফ অব জেনারেল স্টাফ খালেদ মোশাররফ—দুজনই ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সেনাবাহিনীতে দুজনই ছিলেন জনপ্রিয়, কিন্তু পেশাগত কারণে দুজনের মধ্যে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। খন্দকার মোশতাক যখন এই সঙ্কটের নিরসন করতে পারেননি, আর যেহেতু মোশতাককে তাঁর ক্ষমতার উৎস, বিদ্রোহীদের ছাড়তে রাজি বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল না, তাই বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা সেনা নেতৃত্বকেই চিন্তা করতে হয়। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যে কোন সামরিক ব্যবস্থার অর্থ ছিল মোশতাকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া। অর্থাৎ তখনই পূর্ণ ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন চলে আসে।

জিয়া ছিলেন ধীর স্থির। বিদ্রোহীদের পরামর্শ নিয়েই মোশতাক তাঁকে চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত করেছিলেন। মোশতাক তাঁকে একমনা এবং বিশ্বাসী মনে করেই সেনাপ্রধান করেছিলেন। তাই বিদ্রোহীদের বা মোশতাকের বিরুদ্ধে ও রকম একটি ব্যবস্থা নেয়ার আগে জিয়াকে চিন্তা করতে হয়েছে। খালেদ মোশাররফের সেরকম কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল না। খালেদ ছিলেন খোশমেজাজী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ধরনের ব্যক্তিত্ব। তাই শেষ পর্যন্ত খালেদ মোশাররফই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ব্যাপারটাকে বেশ সহজভাবেই গ্রহণ করেন। অত আয়োজন বা প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাঁর হৃদয়ও ছিল কোমল—কোন ধরনের রক্তপাত ছাড়াই সবকিছুর সমাধান করতে চাইলেন। জওয়ানদের অতটা না জড়িয়ে অফিসারদের ওপর বেশি নির্ভর করে কাজ হাতে নিলেন। ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার সাফাত জামিলের ওপর অপারেশনের ভার দিলেন। জিয়াউর রহমান পেশাগতভাবে এক নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অনত্র নিয়ে গেলেন না, বা হত্যা করলেন না। ব্যারাকে তাঁর নিজের

www.pathagar.com

বাড়িতেই তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখলেন। যে রাতে খালেদ মোশারফ ক্ষমতা দখল করার জন্য সিদ্ধান্ত নেন সে রাতেই বিদ্রোহীদের একটি অংশ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে আওয়ামী লীগের চারজন নেতা—তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে হত্যা করে। খালেদের দল দুদিন ধরে বঙ্গভবনে খন্দকার মোশতাকের সাথে দরকষাকষি করে। বিদ্রোহী অফিসারদের নিরাপদে দেশত্যাগ করতে দেয়ার শর্তে মোশতাক শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা ছেড়ে দেন এবং প্রধান বিচারপতি সায়েমকে প্রেসিডেন্ট করে খালেদ মোশাররফ ক্ষমতাসীন হন।

কিন্তু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে খালেদ মোশাররফের এই অভ্যুত্থানকে ভারতীয় আধিপত্যবাদের একটি ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়। ভারতীয় এই চক্রান্তের গুজব ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মানুষের মনে দুশ্চিন্তা এবং সন্দেহ দেখা দেয়। ভারতীয় সংবাদপত্র এবং রেডিও খালেদ মোশাররফের ক্ষমতাগ্রহণকে যেভাবে স্বাগত জানায় এবং তাদের উৎফুল্লতা প্রকাশ করে তাতে দেশের মানুষের সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। তার ওপর আওয়ামী লীগ এবং মস্কোপন্থী সংগঠনগুলো এই অভ্যুত্থানকে একটি জাতীয় বিজয় হিসেবে স্বাগত জানাতে রাস্তায় নেমে পড়ে। তারা শেখ মুজিবের বাড়ি অভিমুখে একটি মিছিলের ব্যবস্থা করে এবং সেই মিছিলে তাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ছিলেন খালেদ মোশাররফের মা এবং ভাই রাশেদ মোশাররফ-যিনি আওয়ামী লীগের একজন নেতা ছিলেন। এই মিছিলের পর এসব গুজব এবং সন্দেহ আরো পাকাপোক্তভাবে মানুষের মনে স্থান পায়। সেনাবাহিনীর ভেতর এবং রাজনৈতিক অঙ্গনেও এর প্রতিক্রিয়া তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়।

জিয়াউর রহমানও বসে ছিলেন না। তাঁর পুরোনো বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবু তাহেরের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাঁকে এই অবস্থার একটি বিহিত করতে অনুরোধ করেন। কর্নেল তাহের ছিলেন অসম সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে একটি পা হারিয়ে আর্টিফিশিয়াল পা লাগিয়ে চলতেন। চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর কর্নেল তাহের তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শকে কার্যকর করার জন্য নিজের ক্যাডার তৈরি করেছিলেন এবং জাসদের একটি অঙ্গ সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সেনাবাহিনীর ভিতর ছিল তাঁর সেই সংগঠনের মূল শক্তি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে দেশে একটি শ্রেণীবিহীন সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা করতে হবে যারা দেশে একটি বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার নেতৃত্ব দেবে। তিনি তাঁর সংগঠনের মাধ্যমে দেশের মুক্তির জন্য এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

খালেদ মোশাররফের "ভারতীয় আধিপত্যবাদপুষ্ট" অভ্যুত্থানকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য তাহের ইতোমধ্যেই জওয়ানদের মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমানের সাথে যোগাযোগ হওয়ার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে তাঁর কাজটাকে সংগঠিত এবং ত্বরান্বিত করতে হয়। "শ্রেণীবিহীন" সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১২ দফা কর্মসূচি তৈরি করে সারা দেশের সেনা ছাউনিগুলোতে ছড়িয়ে দেয়া হয়। সেনাবাহিনীর

www.pathagar.com

বিভিন্ন স্তরে এবং পর্যায়ে বৈপ্লবিক কমিটি তৈরি করা এবং দেশকে একটি বৈপ্লবিক কাউন্সিল দ্বারা পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। বাইরে জনসাধারণকে সংগঠিত করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় জাসদের ওপর। ৬ নভেম্বর মধ্যরাতে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী জওয়ানরা তাদের অভ্যুত্থান শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করা হয়। অন্যদিকে অবস্থা বেগতিক দেখে খালেদ মোশররফ বঙ্গভবন ত্যাগ করেন। পরে তাঁকে আটক অবস্থায় শেরে বাংলা নগরে ১০ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অস্থায়ী শিবিরে রাখা হয়। ভোর হওয়ার আগে সেখানেই খালেদ মোশাররফ এবং তাঁর সহযোগী কর্নেল হুদা এবং কর্নেল হায়দারকে হত্যা করা হয়। এইভাবে খালেদের তিন দিনের সরকারের পতন ঘটে।

৭ নভেম্বর দেশের বিভিন্ন ছাউনি থেকেও জওয়ানরা ঢাকায় এসে পৌঁছায় এবং জওয়ানদের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজার হাজার জনতা যোগ দেয়। সেদিনের সেই উল্লাসময় দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেদিন রাজধানীতে সিপাহী-জনতার বিপ্লব ঘটে এবং ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ভারত এবং আওয়ামীবিরোধী মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা দেয়। ক্যান্টনমেন্টে আবু তাহেরের নেতৃত্ব তখনও বজায় থাকলেও বাইরে সিপাহী-জনতার মিছিল এবং বিক্ষোভ সকাল দশটার আগেই জাসদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সিপাহী-জনতা জিয়া এবং মোশতাকের নামে শ্লোগান দিয়ে ঢাকা শহরকে কাঁপিয়ে তোলে। এই অভ্যুত্থানের ফলে খন্দকার মোশতাক আবার ক্ষমতার দৃশ্যপটে ফিরে আসেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহের সেটি হতে দেননি। সকালে খন্দকার মোশতাক রেডিওকেন্দ্রে গেলেও প্রথমে তাকে কিছু বলতে দেয়া হলো না, কিন্তু জিয়া দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেন। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি সায়েমই প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থেকে গেলেন, খন্দকার মোশতাক বাদ পড়ে গেলেন, কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি সায়েমের কাছ থেকে নির্বাচনের একটি নির্দিষ্ট তারিখ আদায় করলেন আর জিয়া এবং সায়েমের প্রতি সমর্থন জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে একটি শেষ ভাষণ দেয়ার সুযোগ পেলেন।

ক্ষমতার বণ্টন ব্যবস্থা হলো ঠিকই কিন্তু জওয়ানদের 'বিপ্লব' সেখানে থেমে যায়নি। তখন তাঁরা "শ্রেণীবিহীন" সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার কাজে 'লিপ্ত' হলেন। জওয়ানরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলেন। অনেক অফিসারকে হত্যা করা হলো এবং সেনা ছাউনিগুলোতে একটি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হলো। জিয়াউর রহমান যদিও জওয়ানদের ১২ দফা দাবিতে স্বাক্ষর করেছিলেন ৭ নভেম্বর ভোরবেলায়, কিন্তু ছাউনিতে অফিসারদের হত্যার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে ছাউনিতে এবং জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। জওয়ানদের মধ্যে জিয়াউর রহমান জনপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু অফিসারদের হত্যা বন্ধ করতে না পারলে তাঁর নিজের জন্যই ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব হতো না। যদিও ব্যাপারটা কারো নিয়ন্ত্রণে ছিল না, এমনকি তাহেরও এই ঘটনার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনসমক্ষে সমস্ত দোষ কর্নেল তাহের আর জাসদের ওপর

www.pathagar.com

গিয়ে পড়ে। জিয়া যখন আর ৭ নভেম্বরের বৈপ্লবিক কাউন্সিল করার পথে এগিয়ে এলেন না, তখন কর্নেল তাহের এবং জাসদ নেতৃবৃন্দ নিরাশ হলেন। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই তাহেরের টেলিফোন জিয়া আর গ্রহণ করেননি এবং বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই কর্নেল তাহের এবং জাসদের সদ্যমুক্ত নেতাদের আবার গ্রেপ্তার করে কারাবন্দি করা হয়।

৭ নভেম্বর জওয়ানদের এই অভ্যুত্থান এবং পরবর্তীকালে অফিসারদের হত্যা করার ব্যাপারটি এখনো অনেকখানি রহস্য হিসেবে রয়ে গেছে। এর বিস্তারিত বিবরণ এবং বিশ্লেষণ এখনো হয়নি। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা বোঝার জন্য জাসদের রাজনীতির একটি বিশ্লেষণ খুব প্রয়োজন। তবে কর্নেল তাহের বা জাসদের ৭ নভেম্বর ক্ষমতা দখল করা বা 'শ্রেণীবিহীন' সামরিক বাহিনী গঠন করার প্রচেষ্টা যে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেকে মনে করেন, এটি একটি হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই ব্যর্থতার কারণগুলো নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারেঃ

১. দেশের অবস্থানরত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে জওয়ানদের মাধ্যমে শ্রেণীবিহীন সামরিক বাহিনী গঠন করে দেশে একটি সাম্যবাদী বিপ্লব সাধন করার তাত্ত্বিক একটি দিক ছিল। যেহেতু গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বা শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজবিপ্লব সাধন করা আজকাল অতি-দরিদ্রতার কারণে তৃতীয় বিশ্বে খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই ওপর থেকে ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার কথা এখন অনেকেই ভেবে থাকেন। এই কাজে সবচেয়ে কার্যকর শক্তি (effective force) হলো গরিব দেশের সামরিক বাহিনীর নিচের দিকের অফিসার এবং জওয়ানরা। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে যদি উপরোক্ত রাজনৈতিক দর্শনে দীক্ষা দেয়া যায় তাহলে ওপর থেকে ক্ষমতা দখল করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কার্যকর করা সম্ভব। এই সমস্ত গরিব দেশে সিনিয়র অফিসাররা ক্ষমতা দখল করলে নিজেদের শ্রেণীগত চরিত্রের কারণে তারা কায়েমী স্বার্থরক্ষা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু নিচের দিকের অফিসার এবং জওয়ানদেরকে সমাজ পরিবর্তনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা হলে তাদের কায়েমী স্বার্থবোধ কম থাকে এবং তাই তাদের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্য অর্জন করা সহজ। কিন্তু তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা দাবির কর্মসূচিতে শুধু ছিল আবেগময় বক্তব্য। এতে নির্দিষ্ট দার্শনিকভিত্তির অভাব ছিল এবং বিপ্লবের সত্যিকারের কোন পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনাও এতে ছিল না। এর বৈজ্ঞানিক কোন বিশ্লেষণ ছিল না বললেই চলে। জওয়ানদের কতগুলো অর্থনৈতিক দাবি এবং পেশাগত ক্ষুদ্ধতাকেই কেন্দ্র করে সংগঠনটিকে গড়ে তোলা হয়েছিল। আদর্শের চেয়ে সেই দাবি এবং ক্ষোভের ওপর বেশি জোর দেয়া হয়েছিল। যার ফলে ৭ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ কে ক্ষমতাচ্যুত এবং জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার প্রাথমিক সাফল্যের পর জওয়ানরা

www.pathagar.com

বিপথগামী হয়ে অফিসারদের হত্যা করার কাজে লিপ্ত হয়। কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা আদর্শের বালাই তখন আর ছিল না। কর্নেল তাহের ও জাসদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাই সেদিন ব্যর্থ হয়েছে। অনেক নিরপরাধ সামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে। জওয়ানরা দারুণভাবে বিভ্রান্ত হয়, আর পুরো জিনিসটাই বিপরীত ফলদায়ক (counter productive) হয়ে দাঁড়ায়।

২. এসব কাজে গণসংগঠন খুব জোরদার থাকতে হয়, কিন্তু ছাউনির বাইরে জাসদ জনগণকে সংগঠিত করতে পারেনি। তাদের রাজনৈতিক প্রস্তুতি ছিল খুব দুর্বল। তারা শুধু ঢাকাভিত্তিক নিজস্ব সংগঠনের ওপর নির্ভর করে কাজ করেছে। তাই জওয়ানদের অভ্যুত্থানের সাথে সাথেই দক্ষিণপন্থী এবং ভারতবিরোধী শক্তিগুলো রাস্তায় নেমে আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এতখানি স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া আসবে জাসদ সেটা হিসাব করতে ব্যর্থ হয়েছে। ৭ নভেম্বরের ঘটনাকে জাসদের রাজনীতির অপরিচ্ছন্নতার আরো একটি বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। মাঝখানে এসব কর্মকাণ্ডে সংগঠন হিসেবে জাসদের এবং তার নেতৃত্বের শক্তি ও ভাবমূর্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. সাধারণ মানুষের মধ্যে জাসদ সম্পর্কে প্রথম থেকেই একটি ধারণা ছিল যে এটি ভারতের মদদপ্রাপ্ত আর একটি সংগঠন। এই ধারণার জন্য মানুষ জাসদের ভূমিকাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। এই ঘটনার পর সেই সন্দেহ আরো পাকাপোক্ত হয়। জাসদের অভ্যুত্থান, কর্নেল তাহেরের বৈপ্লবিক ভূমিকা এবং পরবর্তী সময়ে কর্নেল তাহেরের বিচার এবং ফাঁসির ওপর বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে ১৯৭৯ সালে লন্ডনে প্রকাশিত Lawrence Liftschultz রচিত *Bangladesh: The Unfinished Revolution* গ্রন্থটিতে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ৮

প্রেসিডেন্ট জিয়ার সরকারে যোগদান এবং পারিবারিক ট্রাজেডি

১৯৭৭ সালের অক্টোবরে আমান আর আসিফকে নিয়ে নিউইয়র্কে আসে হাসনা। আমি তখন সরকারের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অবস্থান করছি। আমানের বয়স তখন প্রায় এক বছর আর আসিফ চার বছরের। রাষ্ট্রদূত খাজা কায়সারের বাড়িতে কত আনন্দ করে ওরা দিন কাটায়। আসিফ নিউইয়র্কের একটি স্কুলেও কয়েকদিন যায় কিন্তু ভাষার অসুবিধার জন্য অত অল্পদিনে আর বেশি এগুতে পারেনি। জাতিসংঘের অধিবেশন শেষ হওয়ার আগেই দেশে ফেরার জন্য ঢাকা থেকে খবর গেল। জাতিসংঘে যাওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে বলেছিলাম যদি তিনি সরাসরি রাজনীতিতে আসেন, সামরিক আইন তুলে দেশে সাংবিধানিক সরকার কায়েম করতে চান, তাহলে তাঁর সরকারে যোগদান করব। আর তা না হলে নয়।

নিউইয়র্ক থেকে প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিনের মধ্যেই ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়া আমাকে একজন উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করলেন। তারপর দিনগুলো ঠিক কিভাবে গেছে তার হিসেব করিনি। দেশে গণউন্নয়ন ও গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াকে সার্থক করার জন্য আমাদের তিন-চারজনের ওপরই দায়িত্ব এসে পড়ে। রাত দুটো, তিনটে, চারটার আগে বাড়ি কোনদিন ফিরেছি বলে মনে পড়ে না। পারিবারিক স্বাভাবিক জীবন প্রায় নষ্ট হয়ে পড়ে। পুরোনো বন্ধুরা সব দূরে সরে যায়। নিজের বাচ্চাদের সাথেও দূরত্ব গেল বেড়ে। আসিফ হয়ে গেল রাজনীতিবিদ। বাড়ির ড্রাইভার, মালী আর পুলিশ হলো তার সার্বক্ষণিক সহচর। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আসা শত শত মানুষ হলো তার নিত্যদিনের বন্ধু। জাগদল জিন্দাবাদ, বিচারপতি সাত্তার জিন্দাবাদ, জিয়া তুমি এগিয়ে চলো—তার মুখে মুখে। সাইকেল চালিয়ে রাস্তার ওপারে চলে যেত পুরোনো গণভবনে সাত্তার সাহেবের বাড়িতে। আমরা তখন সুগন্ধার ঠিক উল্টো দিকের ৩২ নম্বর বেইলী রোডে অবস্থিত সরকারি বাড়িতে থাকতাম। একদিন দুই ভাইয়ের জন্মদিনে সাত্তার সাহেব আমার বাসায় এলেন। আসিফ তাঁকে দেখে তার উৎসব ফেলে শ্লোগান দিতে শুরু করল। ওর চঞ্চলতা,

www.pathagar.com

হৈ চৈ বাড়িটাকে সবসময় উৎসবমুখর করে রাখতো। আমি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতাম, মফস্বলে ঘন ঘন যেতাম, সেই সুযোগে সে বাড়ির একজন মাতব্বর হয়ে বসল।

১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রীয় সফরে চীনে গেলাম। অপূর্ব দেশ। হাসনারও নিমন্ত্রণ ছিল। চীনের নতুন নেতা দেঙ জিয়াও পিঙয়ের সাথে বৈঠক হলো। অসম্ভব বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব। পুরো আলোচনাটাই ছিল রাজনৈতিক। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, কিউবার অনুষ্ঠিতব্য জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন (১৯৭৯), ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া—সবই আলাপ হলো। তিনি ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক উন্নয়ন করার ওপরও জোর দিলেন। হাসনা চীনের মহিলাদের ওপর বই লিখবে জেনে খুব খুশি হলেন, ওকে বললেন ওদের দেশে আরো অনেক দিন থাকতে। তাঁদের আতিথেয়তা ভোলার মত নয়। আগের সফরসূচি অনুযায়ী হাসনা দুসপ্তাহের জন্য থেকে গেল। আমি সাত দিন সফর করে সংসদীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে দেশে ফিরে এলাম। এরপর আমরা ছয়টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করি—বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি।

আসিফ তখনও জাগদলের নামেই জিন্দাবাদ দেয়। চীন থেকে আসার পথে ওর জন্য যে সাইকেলখানা এনেছিলাম তাতে চড়ে দিনরাত তাই করত, জাগদল ভেঙে দেয়া হয়েছে এটি যেন আসিফ গ্রহণ করতে পারেনি। যতই বলতাম এখন আর জাগদল নেই, ততই যেন আরো উচ্চস্বরে সেই দলেরই শ্লোগান দিত। এর কিছুদিন পর মাঝে মাঝে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠার আগে আসিফ কোলে চড়তে চাইতো। হয়তো আহ্লাদ করে বাপের কোলে উঠতে চাইতো। ধমক দিতাম, এত বড় ছেলে হয়েছে নিজে নিজে উঠতে পারে না। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, অন্য সময়ও সে আমাদের আড়ালে ড্রাইভার বা বাড়ির অন্য লোকদের কোলে চড়ে দোতলায় ওঠে। সেটাও মনে করেছি বোধহয় আহ্লাদ করে যায়। হাসনা দুয়েকদিন বলেছে, আসিফের নাকি বুকে ব্যথা করে। গ্রাহ্য করিনি, অত সময় কোথায় তখন? মায়ের মন মানেনি, আসিফ মাঝে মাঝে এসে তাকে বুকে হাত লাগিয়ে দেখিয়েছে কোথায় ব্যথা হয়। ব্রিগেডিয়ার মালিক আর প্রফেসর নূরুল ইসলামকে দেখানো হলো। কেউ খারাপ কিছু লক্ষ্য করেননি। ইসিজি করানো হলো, তাতেও অস্বাভাবিক কিছুই পাওয়া গেল না, সবাই বললেন বাচ্চাদের ও রকম হয়ই, নিজে থেকেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমরা তখন দেশে নতুন করে সাংবিধানিক সরকার গঠন করার উত্তেজনায় মগ্ন, সংসদীয় নির্বাচনের পর সামরিক শাসন তুলে নেয়া হবে, নতুন পার্লামেন্ট বসবে, দেশের সংবিধান পুরোপুরিভাবে চালু হবে, বাক্‌স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গ্যারান্টি আবার পুনর্বহাল হবে। যদিও এতে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ক্ষমতা আরো সুদৃঢ় হবে, কিন্তু এসবের ফলে দেশ অবশ্যই গণতন্ত্রায়নের দিকে এগিয়ে যাবে। ব্যক্তিকে নিয়েই তো সমষ্টি, নেতা তো একজন হবেনই, আর তাতে তাঁর ক্ষমতা যদি সুদৃঢ় হয় তাতে ক্ষতি কি? এখানে বৃহত্তর স্বার্থটাকেই বড় করে দেখার প্রয়োজন। দেশের সামগ্রিক স্বার্থটাকে

www.pathagar.com

বিবেচনায় নিতে হবে। সামরিক শাসন তুলে নিলে, গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে এলে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে মানুষ। ব্যক্তির ক্ষমতার বদলে গণতন্ত্রের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করা যাবে। এই প্রক্রিয়ায় এবং স্বপ্নে তখন মগ্ন ছিলাম। আসিফের বুকের ব্যথাটা তাই অতি সামান্য ব্যাপার হয়ে উপেক্ষিত থাকল।

পার্লামেন্টের নির্বাচনে আমাদের বিরাট বিজয় হলো। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার একজন স্থপতি যাদু ভাই হঠাৎ মারা গেলেন। ১৯৭৬ সালে যখন জেলে ছিলাম তখনই তার সাথে প্রথম ব্যক্তিগত পরিচয়। ঐ রকম হৃদয়বান ব্যক্তি এখনকার রাজনীতিতে আর তেমন দেখি না, ও রকম রাজনীতিক এখন নেই বললেই চলে। যে অসাধারণ প্রাণোচ্ছলতা, সৃজনশীলতা ও সংবেদনশীলতা একজন মানুষকে সত্যিকারের রাজনীতিবিদের আসনে পৌঁছাতে পারে, তার সবকিছুরই মিলন ঘটেছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে। এরকম ব্যক্তিত্ব এখন আর খুব বেশি দেখা যায় না। রাজনীতি এখন যেন নেশার চেয়ে পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে বেশি করে। রাজনীতি থেকে আদর্শ, মূল্যবোধ, নীতি, সহনশীলতা, আবেগ এবং ভালবাসা যেন আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। যে দেশ যত গরিব হয় সে দেশে ক্ষমতা বোধহয় তত বেশি লোভনীয় হয়। যে দেশ যত গরিব হয় সে দেশেই বুঝি আদর্শহীনতা, শঠতা, বঞ্চনা, লালসা, হিংসা, অবিশ্বাস বড় বেশি প্রকট হয়ে দেখা দেয়। গুটিকয়েক লোকের হিংস্রতা আর বর্বরতা জাতীয় জীবনকে গ্রাস করে নেয়। জাতীয় সম্পদের বেচাকেনা হয় নিজেদের গোষ্ঠীর ধন আর যশ বাড়ানোর জন্য। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিব এঁরা তো শুধু দিয়েই গেছেন। নিয়ে যেতে পারেননি কিছু। রেখে গেছেন মানুষের জন্য অসীম ভালবাসা। যাদু ভাইও তাই। যা কিছু ছিল উজাড় করে দিয়ে গেছেন। মার্সিডিস গাড়ি বিক্রি করে রিক্সায় চড়ে রাজনীতি করেছেন। সেই যাদু ভাই হঠাৎ মারা গেলেন, অথচ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল তাঁরই। আসিফকে ভীষণ স্নেহ করতেন। যখনই বাসায় এসেছেন আসিফের জন্য সবসময় কিছু না কিছু হাতে করে নিয়ে আসতেন। আসিফকে সাথে করে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইতেন। নির্বাচন হলো ১৮ ফেব্রুয়ারি কিন্তু কি কারণে জানি না প্রেসিডেন্ট জিয়া নতুন সরকার তৈরি করলেন না অনেক দিন। অন্যান্য দেশে নির্বাচনের ফলাফল আসার সাথে সাথেই নতুন সরকার গঠন করা হয়। বাংলাদেশেও যদি তাই করা হতো তাহলে যাদু ভাই প্রধানমন্ত্রী হতেন এবং তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অতটা রহস্য থাকত না। নির্বাচনের পর বেশ কয়েকটি রেল দুর্ঘটনা ঘটে, যা অনেকে সাবটাজ বলে মনে করেছিল। এইসব দুর্ঘটনা যাদু ভাইকে বিচলিত করে তুলেছিল এবং তিনি এটিকে তাঁর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র বলে মনে করতেন। ১৪ মার্চ অর্থাৎ নির্বাচনের প্রায় এক মাস পর যাদু ভাই পৃথিবী থেকেই চলে গেলেন। তারও প্রায় দুসপ্তাহ পর নতুন সরকার গঠন করা হলো। পার্লামেন্ট বসল ৬ এপ্রিল ১৯৭৯।

প্রেসিডেন্ট জিয়া উপপ্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন আমাকে, আর এই সুবাদে আমি পার্লামেন্টারি পার্টির উপনেতা নির্বাচিত হলাম। তারপর ভার দিলেন একটি জটিল এবং

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের—বিদ্যুৎ এবং পানিসম্পদের। কাজের চাপে পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিকতা থেকে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। আসিফের কাছ থেকেও চলে গেলাম আরো দূরে। মায়ের সাথে ওর সম্পর্ক আরো গাঢ় হলো, যদিও আমিই ছিলাম তার প্রধান আকর্ষণ। ও জানত আমি ওকে খুব ভালবাসি। হাসনা মা, তাই তার মনও আলাদা। একই সন্তানের জন্য পিতামাতার হৃদয় হয় ভিন্ন, সন্তানের জন্য প্রতিক্রিয়া হয় আলাদা। হাসনার কাছে ব্যাপারটা ভাল ঠেকেনি। সে ওর ব্যাপারে প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সাথে সলাপরামর্শ করেছে। আমানেরও সমস্যা রয়েছে, ২ বছর পার হয়ে গেছে। পুরোপুরি হাঁটছে না, কথা বলছে না। সলিড কিছু খায় না, শুধু দুধ খায়। তাও বোতলে করে। টন্সিল আর এডোনয়েড খুব বড়। ড. চৌধুরী পরামর্শ দিলেন দুজনেরই একটি চেকআপ করিয়ে নিয়ে আসতে। উনি বললেন দিল্লিতে নিয়ে যেতে। ওনার পরিচিত বড় ডাক্তার আছেন সেখানে। ড. চৌধুরীর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস, একজন ব্রিলিয়ান্ট ডাক্তার হিসেবে।

প্রেসিডেন্ট জিয়া শুনে ভাল করে চেকআপ করাতে বললেন। পরামর্শ দিলেন দিল্লির বদলে লন্ডনে নিয়ে যেতে, এসব ব্যাপারে রিসক্ নেয়া ভাল হবে না বলে মন্তব্য করলেন। সন্তানের জন্য বাপ-মা সাধ্যানুযায়ী সবকিছুই করবে, বাপ-মা গরিব হোক কিংবা স্বচ্ছলই হোক—এটিই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু অনেক টাকার দরকার, অত টাকা হাতে ছিল না। মন্ত্রী হলেও সরকার এসবের খরচ বহন করবে না। গুলশানের নিজস্ব বাড়ি ভাড়ার অগ্রিম টাকা এরই মধ্যে খরচ হয়ে গেছে। আমি সাথে যেতে পারব না বলে আমার শাশুড়ি কবি জসীমউদ্‌দীনের পত্নী নিজ খরচে টিকেট করে যাবেন বলে ঠিক করলেন। বাকি তিনজনের জন্য টিকিটসহ লাগবে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এছাড়াও ছিল চিকিৎসা এবং অন্যান্য খরচ যা অবশ্য বিদেশে অবস্থানরত আত্মীয়স্বজনরা বহন করবেন বলে জানালেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া টিকিটের অর্ধেক খরচের ব্যবস্থা করতে আগ্রহ দেখালেন। এই বিপদের সময়ে তাঁকে সাহায্য করতে রাজি হতে দেখে খুশি হলাম। দুদিন পর ঢাকার মেয়র হাসনাত এসে বাড়িতে ৬০ হাজার টাকা দিয়ে গেল। নিজেদের ব্যক্তিগত গাড়িটি বিক্রি করে ৭০ হাজার টাকা পেলাম।

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আসিফ আর আমানকে নিয়ে হাসনা লন্ডন চলে গেল। আরো আগেই যেতে চেয়েছিল আমার জন্য পারেনি। একে তো নিজের হাতে সময় ছিল না, তার ওপর সকল আনুষ্ঠানিকতা অর্থাৎ মেডিকেল বোর্ড ইত্যাদি রীতিনীতি অনুসরণ না করে আসিফকে বিদেশে যেতে দেয়ার পক্ষপাতী ছিলাম না আমি। সব করতে, সেইসঙ্গে টাকা যোগাড়, গাড়ি বিক্রি ইত্যাদি সারতে চার পাঁচ মাস সময় লেগে যায়। ভেবেছি বাচ্চাদের এমন সব তো হয়ই। চেকআপই তো করবে, এ এমন আর কি। মাসখানেক পর হাসনা টেলিফোন করে যখন বলল, আসিফ, আমান ওদের দুজনের রক্তে গ্লাইসিন পাওয়া গেছে। আমি বিষয়টি ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারলাম না। লন্ডনে বাচ্চাদের সবচেয়ে নামকরা হাসপাতাল গ্রেট অরমন্ড স্ট্রীটে ওদের পরীক্ষা চলছে সেকথাও সে আমাকে জানাল। এর কিছুদিন পর আবার জানলাম আসিফকে কিছুদিনের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে এবং

www.pathagar.com

আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। বললাম, এখন আসা সম্ভব নয়। আমাদের হাইকমিশনার মিনু দোহা, বোধহয় প্রেসিডেন্ট জিয়াকে খবর দিয়েছেন যে ব্যাপারটা গুরুতর। কিছুদিন পর প্রেসিডেন্ট জিয়া ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, আমার লন্ডনে যাওয়া উচিত। অক্টোবর মাসে সরকারি কাজে আমার চেকসলভাকিয়া যাওয়ার কথা, তখন লন্ডনে যাব ঠিক করলাম।

চেকসলভাকিয়া থেকে যখন লন্ডনে এলাম, আসিফ তখন হাসপাতালে। ওর কাথেডেরাইজেশন করা হয়েছে। কাথেডেরাইজেশন হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করার সেই সময়কার সর্বাধুনিক ও সবচেয়ে নিপুণ পন্থা। অপারেশন থিয়েটারে পায়ের রানের গোড়া থেকে গ্রয়েন দিয়ে মিহি তার হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ইলেকট্রনিক উপায়ে টেলিভিশনের মত বড় পর্দায় এর গতিবিধি নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করা হয়। ইতোপূর্বেই অনেক পরীক্ষা চলেছে ওর ওপর দিয়ে। বহুবার রক্ত নেয়া হয়েছে ওর। এক্সরে করে, ইকোকার্ডিয়োগ্রাম করে কিছুদিন পরপরই ওর ভেতরের সবকিছুই ডাক্তাররা জানার চেষ্টা করেছে। এই অসম্ভব কষ্টের মধ্যেও আসিফের সাবলীল, হাসি খুশি চঞ্চল ভাবটা প্রায় আগের মত রয়ে গেছে।

হাসপাতালে দুজন প্রধান ডাক্তার আমার ও হাসনার সাথে কথা বলতে চাইলেন। ওরা জানালেন দুছেলেরই রক্তে গ্লাইসিন নামে এক ধরনের সূক্ষ্ম পদার্থ পাওয়া গেছে, যেজন্য এদের কারোরই বেঁচে থাকার কথা নয়। কিন্তু যেহেতু ঐ গ্লাইসিন অত্যন্ত ক্ষীণ আকারে রয়েছে সেইজন্যই এরা বেঁচে আছে। এই নন-কিকটিক হাইপার গ্লাইসিনিমিয়া পিতামাতা দুজনার রক্ত থেকেই হয়। প্রতি মানুষের রক্তে পজেটিভ এবং নেগেটিভ ধারা রয়েছে। আমার এবং হাসনার নেগেটিভ ধারা এক হওয়াতে একই পদার্থের ওভারডোজের ফলে বাচ্চাদের রক্তের ভারসাম্যে এই অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ আসিফ আর আমানের গ্লাইসিনের সমস্যাটা জেনেটিক। এটি অত্যন্ত বিরল ঘটনা, তাদের জানা মতে পৃথিবীর মাত্র অল্প কিছু শিশুর এইরকম গ্লাইসিনিমিয়া পাওয়া গেছে। এরকম ঘটলে জন্মের সাত দিন থেকে এক বছরের মধ্যে শিশুর মৃত্যু ঘটে, সাধারণত ৩০ দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। মস্তিষ্কে এর প্রতিক্রিয়া ঘটে। আসিফ, আমান দুজনই যে এ পর্যন্ত বেঁচে আছে, তাতে ওরা অবাক হয়েছে। পৃথিবীর কোথাও গ্লাইসিনের চিকিৎসা বলতে কিছু নেই। সুইজারল্যান্ডে এরকম ১২টি শিশুর চিকিৎসা চলছে। ইংল্যান্ডে এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই। খুব বিরল রোগ বলে এই খাতে অর্থ বরাদ্দ হয় না—তবে গবেষণা চলছে বিশেষ করে আমেরিকায়, সন্তান জন্মলাভের আগে এটি নির্ণয় করা এখনো সম্ভব নয় বলে তাই এর কোন প্রতিকারও এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। আমার এবং হাসনার প্রতি চারটি সন্তানের মধ্যে একজনের এরকম হবে। অর্থাৎ কোন সন্তানের নাও হতে পারে আবার সকলেরও হতে পারে। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় বলে চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে দম্পতির আর কোন সন্তান নেয়া একেবারে নিষেধ। তবে ডাক্তার সাহেবরা আমাদের আশ্বস্ত করে বললেন যে, আমাদের এখনো অনেক বয়স রয়েছে। এই সমস্যার বৈজ্ঞানিক সুরাহা একটি হয়ে যেতেও পারে, আর তখন আমরা আবার সন্তানের জন্য চেষ্টা করতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের দুজনের শরীর ভাল, রক্ত ভাল অর্থাৎ আমাদের দুজনার মধ্যে

www.pathagar.com

যদি বিয়ে না হতো তাহলে কোনজনেরই কোন সমস্যাই ছিল না। হাসনা সুস্থ সন্তানের মা হতে পারত, আমিও সুস্থ সন্তানের বাবা হতে পারতাম। আরো অবাক করা ব্যাপার হলো যে, আমাদের কারো রক্তে আলাদা করে এই জীবাণু পাওয়া যাবে না। তাই বিয়ের আগে যদি আমরা আমাদের রক্ত পরীক্ষা করাতাম তাতে কোন লাভ হতো না। শুধু সন্তান জন্মলাভ করার পরই এই সমস্যাটি জানা সম্ভব। এ ধরনের ঘটনা নাকি কোটিতেও একটি ঘটে না। বিলেত আমরিকা হলে এমন দম্পতি স্বেচ্ছায় বিয়ে ভেঙে দুজনই আবার বিয়ে করত। আমাদেরও হয়তো তাই করা যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু মানবিক এবং সামাজিক কারণে এটি সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে আসিফ ও আমানের কথা চিন্তা করে। ডিভোর্স বা আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা যে ভাবিনি তা নয়। কিন্তু হাসনার একার হাতে এই দুই প্রতিবন্ধী সন্তানের ভার তুলে দেয়া ভীষণ অন্যায় ও অনৈতিক কাজ হতো। হাসনা এবং সন্তানদের প্রতি আমার ভালবাসার অবমাননা হতো।

গ্লাইসিন ছাড়াও আসিফের আর একটি অত্যন্ত মারাত্মক রোগ দেখা দিল। এটাও বাচ্চা ছেলেদের জন্য বিরল ঘটনা। এরও কোন ওষুধ নেই, প্রতিকার নেই, এই রোগের কারণও এ পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানে জানা যায়নি। এই রোগটি হলো প্রাইমারি পালমুনারি হাইপারটেনশন। রোগটি জন্মগত নয়, গ্লাইসিনের সাথে এই রোগের কোন সম্পর্ক নেই। এই রোগটি হলো ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালনে এক ধরনের অনিয়ম—বড়দের হৃদরোগ হলে এটি ঘটে, কিন্তু বাচ্চাদের কেন হয় কেউ জানে না। ডাক্তাররা জানালেন আসিফ বাঁচবে না, তার রোগ খুবই এডভান্সড় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আসিফ বছরখানেকের মধ্যে মারা যাবে। এই রোগে আক্রান্ত হলে রোগীর অবস্থার খুব দ্রুত অবনতি ঘটে।

হতবাক এবং বিহ্বলতার মধ্য দিয়ে কথাগুলো সব শুনে গেলাম। নানা প্রশ্ন করলাম, ডাক্তাররা প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিলেন। দুঃখপ্রকাশ করলেন যে তাদের কিছু করার সাধ্য নেই। ডাক্তারদের কথাগুলো বিশ্বাস করতে চাইনি। কিন্তু আসিফ মারা যাবে বাবা-মা হিসেবে এটি তো আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস, আমেরিকায় নিশ্চয়ই এর একটি বিধান আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমেরিকা অনেক এগিয়ে আছে। আসিফকে বাঁচানোর প্রশ্নটাই আমাদের কাছে মুখ্য হয়ে উঠল। যেমন করে হোক ওকে বাঁচাতে হবে। ওর ফুসফুসের রক্ত সঞ্চালন ঠিক করতে হবে যাতে ওর হৃৎযন্ত্র ঠিক থাকে। ওর ঠোঁট গাঢ় নীল হয়ে আসবে, তার জীবনের স্পন্দন নিঃশেষ হয়ে যাবে, এটি ভাবতেই অস্বীকার করলাম। হাসনা দুছেলেকে নিয়ে আমেরিকা চলে গেল। আমি দেশে ফিরে এলাম এক শঙ্কিত পিতার মন নিয়ে। চলে আসার দিন আসিফ যা চাইল সব কিনে দিলাম, ওকে বাকিংহাম প্রাসাদের সামনে সেন্ট জেমস পার্কে নিয়ে গেলাম খেলতে। আদর করে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম। এতদিন পর বুঝতে পারলাম আসিফ কেন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে চাইতো না।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৯

প্রেসিডেন্ট জিয়ার রাজনীতি

৭ নভেম্বরের পর যদিও একজন বেসামরিক ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে কাজ চালিয়েছেন কিন্তু দেশে চলেছে সামরিক শাসন এবং সকল বাস্তব দিক থেকে সেনাবাহিনী রাষ্ট্র ক্ষমতার সকল নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হন। সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে জিয়াউর রহমান তখন থেকেই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করেন বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। তিনি যদিও উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে কাজ করেছেন, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিনির্ধারণের চাবিকাঠি তাঁর হাতেই ছিল। জিয়া এ সময় ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করেন। নিজেকে low-key তে রাখার চেষ্টা করেন এবং তিনি যে তখন সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি সেটা জাহির করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। এমনিতেও তিনি ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ ছিলেন, আর কথা বলতেন খুবই কম, যা কিনা বাঙালি স্বভাব-বিরুদ্ধ।

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য সামরিক নেতার তুলনায় জিয়ার আবির্ভাব ঘটেছিল এক অসাধারণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। সুহার্তোর আবির্ভাব যদিও এরকম ঘটনাচক্রেই হয়েছিল, কিন্তু জিয়ার উত্তরণে চরিত্রগতভাবে একটি পৃথক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুহার্তোর আবির্ভাবে তাঁর দেশের সাধারণ মানুষ জড়িত ছিল না। সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের মধ্য দিয়ে সুহার্তো বেরিয়ে আসেন, কিন্তু জিয়ার বেলায় ঘটেছে সিপাহী-জনতার একটি স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব। এক ধরনের রাজনীতির মধ্য দিয়েই জিয়ার উত্থান ঘটে। এবং সেটি কোন সাধারণ ক্ষমতা দখলের ব্যাপার ছিল না। সাধারণত একটি দেশের সেনানায়ক শান্তিপূর্ণভাবে রক্তপাতহীন অবস্থায় ক্ষমতা দখল করে নেন। জিয়ার ক্ষমতাগ্রহণকালে পরিস্থিতি অনুরূপ ছিল না।

তাই ক্ষমতার কেন্দ্রে আবির্ভাবের শুরুতেই এক বিরাট স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন জিয়ার পক্ষে ছিল। যে কোন সামরিক শাসকের জন্য এই জনসমর্থনকে একটি সম্পদ বলে ধরে নিতে হয়। শুধু তাই নয়, এর সাথে সাথে সেনাবাহিনীতে, বিশেষ করে জওয়ানদের মধ্যেও, তাঁর যে একটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এরকম আরো কিছু শুভদিক জিয়ার পক্ষে কাজ করেছে। জিয়া শুধু বীর মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি

www.pathagar.com

স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে সারা দেশের মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে স্বচক্ষে অনেকে না দেখলেও তিনি স্বনামে সকল দেশবাসীর নিকট পরিচিত ছিলেন। ২৭ মার্চ ১৯৭১ সালে সারা জাতি যখন দিশেহারা, তখন চট্টগ্রাম রেডিও থেকে মেজর জিয়ার সেই ঘোষণার কথা সকলের মনেই গাঁথা ছিল। তারপর জিয়া সহজেই দাবি করতে পেরেছেন যে ১৫ আগস্ট থেকে ৬ নভেম্বর দেশে যা কিছু ঘটেছে, অর্থাৎ শেখ মুজিবের হত্যা থেকে তাজউদ্দিন আহমদের হত্যা পর্যন্ত; সেসবের সঙ্গে তিনি জড়িত নন। তিনি দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তন করেননি; পার্লামেন্টও তিনি ভেঙে দেননি। শেখ মুজিবের মৃত্যুর ব্যাপারে আওয়ামী লীগ অবশ্য জিয়াকে জড়িয়ে অনেক অভিযোগ তোলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সেসব অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হয়নি। এই সমস্ত কারণে জিয়ার আবির্ভাব ঘটেছে অনেক শুভদিক নিয়ে। সবকিছু মিলিয়ে জিয়া একজন পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি (cleans man) হিসেবে মানুষের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর জন্য শুরু থেকেই মানুষের একটি বিশ্বাস আর সদিচ্ছা ছিল।

অন্যান্য সেনানায়কদের তুলনায় জিয়ার রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা থাকা অস্বাভাবিক ছিল না বরং তা ছিল অনেক বেশি স্বাভাবিক। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানের পর রাজনীতি এমনিতেই তাঁর দেহমনে উপস্থিত ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান করা হলে জিয়া যে মনক্ষুণ্ন হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এই ঘটনার ফলে জিয়া মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের উপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি বলে তিনি মনে করেছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ করেননি। এর পর যখন ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতা তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন দিয়ে ক্ষমতায় বসায় তখন জিয়া তাঁর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সুযোগ গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের চার নেতার মৃত্যুর পর দেশে যে বিরাট এক রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সেটাও একটি সুযোগ হিসেবে জিয়ার সামনে উপস্থিত হয়।

তবে এই রাজনৈতিক দিক বাদ দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, জিয়া মূলত ছিলেন একজন আপাদমস্তক সামরিক অফিসার এবং তাঁর আচার-ব্যবহারকে মূলত সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিচার করা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর খন্দকার মোশতাক একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু রাখার চেষ্টা করেছিলেন বটে, প্রকৃতপক্ষে সকল বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে ঐ হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই দেশের রাজনীতি জনগণের হাত থেকে সরে ক্ষমতার রাজনীতিতে পরিণত হয়। বাংলাদেশ এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করে, যার সঙ্গে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দেশে যত আন্দোলন হয়েছে সেসবের কোন মিল ছিল না, বরং যে প্রক্রিয়া এবং শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে এতদিন সংগ্রাম করা হয়েছে, অগণিত মানুষ তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে, এই যাত্রা হলো ঠিক তার বিপরীত দিকে। ক্ষমতানির্ভর রাজনীতির যেই শাসনযন্ত্র থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করে দেশ ভেঙে স্বাধীনতা আনতে হয়েছিল, বাংলাদেশ সেই শাসনযন্ত্রেই আবার ফিরে গেল। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই এই ধরনের সামরিক শাসনযন্ত্র চালু রয়েছে— এদের রূপ, চরিত্র, বৈশিষ্ট্য কি হয় সেটা কারো অজানা নয়। আমাদের দেশের মানুষের

www.pathagar.com

জন্য বিদেশে খুব দূরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না, স্বাধীনতার আগের পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালেই সেটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার ব্যক্তিগত চরিত্র, জনপ্রিয়তা, সাহস এবং দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁর শাসন পদ্ধতির সঙ্গে পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস বা দক্ষিণ কোরিয়ার সেনানায়কদের অনেক ব্যতিক্রম এবং পার্থক্য হয়তো পাওয়া যাবে কিন্তু গুণগতভাবে সামাজিক কাঠামো নির্মাণের ব্যাপারে প্রায় একই ধরনের ধ্যানধারণা দেখতে পাওয়া যায়। যেমনঃ

১. সামরিক বাহিনীর বাজেট বেড়েছে। শেখ মুজিবের আমলে সেটা যেখানে ছিল জাতীয় বাজেটের শতকরা ১৩% সেটি জিয়ার আমলে (১৯৭৫-৭৬) বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয় বাজেটের শতকরা ৩২% গিয়ে দাঁড়ায়। যে কোন সামরিক নেতাকে ক্ষমতায় এসেই এই কাজটা প্রথমে করতে হয়। সামরিক বাহিনীর জন্য বাজেট একলাফে প্রায় আড়াইগুণ বৃদ্ধি পায়। জেনারেল এরশাদকেও ক্ষমতা নেয়ার পর সামরিক বাহিনীর জন্য বাজেট এরকম বাড়াতে হয়েছে, কারণ সামরিক বাহিনীর মানমর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি করাটা তাঁদের জন্য অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সামরিক বাহিনীকে তখন আরো শক্তিশালী করা হয়। রাজনীতিবিদদের নির্বাচনী এলাকার মত ছাউনিগুলো তখন হয় সামরিক শাসকদের সমর্থন-এলাকা অর্থাৎ constituency। তাই তাঁদের বাহিনীকে খুশি রাখা প্রথম দায়িত্ব হয়ে ওঠে।

২. দ্বিতীয়ত, আমলাতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বেসামরিক আমলাদের সহযোগিতা ছাড়া সামরিক শাসকরা দেশ চালাতে পারে না। পারস্পরিক স্বার্থে তাদের মধ্যে আঁতাত সৃষ্টি হয়। জিয়াউর রহমানও আমলাতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। আওয়ামী লীগের আমলে আমলাদের রাজনীতিকদের অধীনস্ত হিসেবে কাজ করতে হয়েছে কিন্তু এখন তাঁরা হলেন শাসনযন্ত্রের পার্টনার। আওয়ামী লীগ যেসব অফিসারদের অবসর দিয়েছিলেন প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করার জন্য জিয়া তাঁদের সামনে নিয়ে এলেন। অনেক পুরোনো আমলাকে মন্ত্রী বানালেন। ২৪টি মন্ত্রণালয় এবং ৩৯টি ডিভিশন তৈরি করে সেক্রেটারিয়েটকে শক্তিশালী করলেন। সারা দেশের অফিসারদের মানমর্যাদার নিশ্চয়তা ফিরিয়ে আনলেন। রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে পুলিশবাহিনীকে তাদের পুরোনো ভূমিকা এবং মর্যাদা ফিরিয়ে দেন। পুলিশের বাজেট বাড়িয়ে দেন। তাদের জন্য প্রশিক্ষণের এবং শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, তাদের কাজের সুযোগ-সুবিধা, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করেন। এতে পুলিশের গুরুত্ব এবং সম্মান আওয়ামী লীগের যুগের তুলনায় বহুলভাবে বৃদ্ধি পায়।

৩. তৃতীয়ত, গরিব দেশের সামরিক কর্তাদের শেষ পর্যন্ত আমলা, সামরিক বাহিনী ছাড়াও নিজেদেরে ক্ষমতায় রাখার জন্য আরো একটি vested interest class

www.pathagar.com

সৃষ্টি করতে হয়। এটি তারা উঠতি পুঁজি এবং উঠতি মধ্যবিত্তকে খুশি করার মাধ্যমে অর্জন করে। বাংলাদেশেও ঐ লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সাধারণভাবে জনসমর্থন লাভ করে, সাধারণ শ্রমিকরাও গৃহীত এসব পদক্ষেপকে সমর্থন করেছিল। আওয়ামী যুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে হতাশা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল জনগণ সেই শাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মুক্তি চাইছিল। অন্তত তখনকার পরিস্থিতিতে সেটাই মনে হয়েছে। তাই জিয়াউর রহমান আওয়ামী লীগের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব কমিয়ে ব্যক্তি পুঁজির প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করেন এবং এর ফলে দেশের উঠতি পুঁজিপতি এবং মধ্যবিত্তরা খুশি হলেন। অনেক মিলকারখানা তিনি ব্যক্তিমালিকানায় ফিরিয়ে দেন। বিশ্বব্যাংক, আইডিএ, আইএমএফ এবং অন্যান্য দাতাদেশ এবং সংস্থাগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নতির ফলে বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। আমলা এবং মধ্যবিত্ত—সকলেই এতে খুশি হয়।

মোটকথা জিয়াউর রহমান আবার পুরোনো ব্যবস্থায় (old order) ফিরে গেলেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যেই ভারসাম্য ছিল সেটা পুনর্বহাল করলেন। পুরোনো ব্যবস্থার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের যে দ্বন্দ্বটা ছিল জিয়ার সেরকম কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। আওয়ামী লীগও পুরোনো ব্যবস্থা (old order) পুনর্বহাল করতে চেয়েছিল এবং তাদের প্রায় সব পদক্ষেপ তারই ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু তাদের একটি নতুন ব্যবস্থা (new order) চালু করার জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ছিল। তাই তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে হয়। ঠিক কি চান স্থির করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত কোনটাই ঠিকমত করতে পারেননি। জিয়াউর রহমানের কোন অতীত রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ছিল না। জনকল্যাণ ছাড়া জনগণের কাছে দেয়া তাঁর আর কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। তাই তার জন্য সহজ পন্থা ছিল পুরোনো ব্যবস্থার পথ ধরে এগুনো। চোরাচালানি, ব্যাংক লুট, গুপ্ত হত্যা যেন প্রায় রাতারাতি বন্ধ হয়ে গেল, যা আওয়ামী যুগে ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আইনশৃঙ্খলা অবস্থার এই উন্নতি সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি এবং নিরাপত্তার মনোভাব ফিরিয়ে আনে। আওয়ামী যুগের হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে সাধারণ মানুষ জিয়ার নীতিগুলোকে স্বাগত জানালো বেশি করে। মানুষ পুরোনো ব্যবস্থাকেই সানন্দে গ্রহণ করে নিল। এই মানসিক অবস্থার জন্য আওয়ামী লীগ শাসন আমলের ব্যর্থতাই দায়ী ছিল।

পানি সমস্যা আর সীমান্ত হামলা

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ প্রায় তিনদিক থেকে ভারতের দ্বারা বেষ্টিত। ভারতের সঙ্গে আমাদের অভিন্ন সীমান্ত প্রায় ১৫৬০ মাইল। নানা কারণে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক সবসময় এক ধরনের স্পর্শকাতর পর্যায়ে থাকে। সম্পর্ক ভাল রাখতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত নানা সমস্যা এসে দুদেশের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও কতগুলো জাতীয় প্রশ্ন এই সম্পর্ককে একটি ভাল-খারাপ পর্যায়ের উর্ধ্বে নিয়ে

www.pathagar.com

যেতে পারেনি। ভারতের সাথে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো পানি নিয়ে। বাংলাদেশের সবক'টি বড় বড় নদী ভারতের সীমানা থেকে এদেশে প্রবেশ করেছে। ছোট বড় মিলে এরকমের নদীর সংখ্যা ৫৪টি হবে। ভারতও দরিদ্র দেশ এবং কৃষির অগ্রগতি সাধনে তারাও চেষ্টা করছে। তাদের সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে তাদেরও নিয়মিত পানির দরকার। তাদের সেচ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য গঙ্গা এবং তিস্তা ছাড়াও প্রায় সবক'টি বড় বড় নদী থেকে তারা পানি নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। এজন্য তারা গোমতি, সুরমা, কুশিয়ারা, করতোয়া, আত্রাই—এ ধরনের ১২টি নদীর ওপর ইতোমধ্যেই বাঁধ তৈরি করে নদীর পানি তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে এই নদীগুলোর ওপর গোটা বাংলাদেশের মানুষের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। শুধু গঙ্গার পানির ওপরই এদেশের আড়াই কোটি মানুষ নির্ভরশীল। দেশের এক-তৃতীয়াংশ থেকে বেশি এলাকা, যার পরিমাণ প্রায় ২০০০০ বর্গমাইল, কৃষির জন্য এই নদীর পানি ব্যবহার করে। এরপর রয়েছে সমুদ্রে আমাদের এলাকা নির্ধারণ। এ ব্যাপারে ভারতের সাথে আমাদের দ্বিমত রয়েছে। শুধু মাছ ধরা বা তেল উত্তোলনই নয় বা তালপট্টি অঙ্গোরপোতাও নয়—এর সাথে জড়িত রয়েছে আমাদের সার্বভৌমত্বের মত জাতীয় স্বার্থ। তারপর রয়েছে ভূমি-সীমানা নির্ধারণ। এটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে সংবিধান পরিবর্তন করে চুক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়েছে, কিন্তু ভারত ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত সেটা করেনি। বিদ্যমান এসব জরুরি সমস্যা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক কারণে ভারতের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক অপরিহার্য, যা পারস্পরিক স্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন।

১৯৭৫-৭৬ সালে ভারত গঙ্গার উজানে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার শুরু করলে বাংলাদেশে দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। ফারাক্কার বাঁধ বাংলাদেশের মানুষ কোনদিন গ্রহণ করতে পারেনি এবং একে সবসময় একটি অর্থনৈতিক অভিশাপ হিসেবে দেখেছে। একে একটি জীবনমরণ সমস্যা মনে করেছে। ভারতের এহেন অন্যায় আচরণ দেশবাসীর মনে অত্যন্ত ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এমনিতেই শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি হয়, বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন ঘটে। মুজিব হত্যার পরই কেবল বাংলাদেশের সঙ্গে চীন, সৌদি আরব এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সম্পর্কের উন্নতি হয়। আন্তর্জাতিক এবং বিদেশ নীতির ব্যাপারে বাংলাদেশের ভূমিকায় পরিবর্তন ঘটে। এছাড়া মুজিব হত্যার পরপরই ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সরাসরি একটি বৈরীনীতি গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের একটি অংশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের আশ্রয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেশের ওপর আক্রমণ শুরু করে। তারা সেখানে নতুন করে প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু করে। সীমান্তের বিভিন্ন স্থান থেকে হামলা চালায়। এই হামলায় অনেক জীবন এবং সম্পত্তি বিনষ্ট হয় এবং এক বছরেরও বেশি সময় ক্রমাগতভাবে এই ধরনের আক্রমণ অব্যাহত থাকে। সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় মোরারজি দেশাই না আসা পর্যন্ত এই অবস্থার পুরোপুরি অবসান ঘটেনি।

www.pathagar.com

সীমান্তে এই হামলা আর ফারাক্কার পানির হিস্যার ব্যাপারে ভারতের আচরণের জন্য বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে এবং দেশে ভারতবিরোধী মনোভাব আরো তীব্র আকার ধারণ করে। এমনিতেই দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলো, বিশেষ করে যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, তারা আওয়ামী যুগ থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রচারাভিযান অব্যাহত রেখেছিল এবং আওয়ামী লীগের অব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট সকল দুরবস্থার জন্য ভারতকে দায়ী করার প্রবণতা থেকে নিজেদের নিরস্ত রাখেনি। জনগণও এসব অভিযোগ যে বিশ্বাস করেনি তা-ও নয়। যুদ্ধের পর বাংলাদেশ থেকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য মূল্যবান মালপত্র ভারতের সেনাবাহিনী কর্তৃক অপহরণ এবং আওয়ামী লীগের পুরো শাসনামলে সীমান্তে ব্যাপক চোরাচালানি—বিশেষ করে এ দুটো কারণে দেশের মানুষ ভারত সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। এই সবকিছু মিলেই স্বাধীনতা লাভের অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষের মনে একটি সন্দেহ এবং অনমনীয় ভাব দেখা দেয়। তার ওপর ছিল এক শ্রেণীর মানুষের স্বার্থান্বেষী প্রচারাভিযান। তাই মুজিব হত্যার পর যখন ভারত সীমান্ত হামলায় সাহায্য এবং একতরফা ফারাক্কার পানি প্রত্যাহার শুরু করে তখন দেশে ভারত বিরোধিতা ও ভারতের প্রতি বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করে। যেহেতু আওয়ামী লীগকে বেশিরভাগ লোক ভারত ঘেঁষা রাজনৈতিক দল হিসেবে মনে করে, এই কারণে তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগবিরোধী মনোভাব এবং তাদের রাজনীতির প্রতি অনাস্থা প্রচণ্ড শক্তি লাভ করে। শেষ পর্যন্ত জিয়ার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ফলে গঙ্গার পানির হিস্যার বিষয়টি বাংলাদেশ জাতিসংঘে উত্থাপন করে এবং ভারতকে পানির হিস্যার ব্যাপারে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়।

রাজনৈতিক অঙ্গনে জিয়াউর রহমান এসব পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ তখনও সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর যদিও তারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তাদের কার্যকলাপে সাধারণ জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়েছিল, তবুও দেশে আর কোন সংগঠিত বড় দল ছিল না বলে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের গুরুত্ব তখনো প্রায় অটুট ছিল। অপরদিকে ভারতের সঙ্গে তাদের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক আবহের কারণে জনপ্রিয়তা হারালেও তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব থেকে যায়। জিয়া সাধারণত ভারতের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোনদিনই কিছু বলতেন না। কিন্তু জনগণ তাঁকে ভারতবিরোধী বলেই জানত। ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানের পর তাই রাজনীতি স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামীবিরোধী ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং জিয়াও তাঁর রাজনৈতিক মঞ্চকে সেইভাবে সাজানোর কাজে মনোনিবেশ করেন।

অন্য সব সামরিক নেতা যেভাবে তাঁদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেছেন, প্রথম স্তরে জিয়া তাঁর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা সেভাবেই চরিতার্থ করেছেন। সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং উঠতি পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্তের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর সাথে সাথে জিয়া তাঁর সরকারের বেসামরিকীকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। তিনি সরকার গঠন

www.pathagar.com

করলেন মোটামুটি আমলা আর টেকনোক্রেটদের নিয়ে। বিমান আর নৌবাহিনীর প্রধানদ্বয় ব্যতীত আর কোন চাকরিরত সামরিক অফিসারকে মন্ত্রিসভায় নিলেন না। নিজের জনপ্রিয়তার বিস্তার ঘটাতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, কখনো জীপে, কখনো হেঁটে। সাধারণ মানুষের সমস্যা জানলেন আবার নিজেকেও পরিচিত করলেন। আইয়ুব খানের মত প্রথম নজর দিলেন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের ওপর। জনগণের কাছে পৌঁছানোর তাগিদের পাশাপাশি নিজের জন্য একটি সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করার জন্য। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর ভর করে জেলাভিত্তিক সভা শুরু করলেন। যদিও ৭ নভেম্বরের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচনের বিধান রাখা হয়েছিল, জিয়া সেটা করতে আর রাজি ছিলেন না। আগে ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচন করে নিজের আস্থা সুদৃঢ় করে তারপর সাধারণ নির্বাচনের কথা ভাবলেন। জিয়ার অভ্যুত্থানের মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক শক্তির পথ নির্দেশ নিহিত ছিল, তবে তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। মুজিবের মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে যে নতুন দৃশ্যপটের উদ্ভব হয় তাতে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন মেরুকরণের ক্ষেত্র তৈরি হয়, আর সেই দিক থেকে খন্দকার মোশতাককে এই নতুন মেরুকরণের স্থপতি বলা চলে। ৭ নভেম্বর কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা তাঁদের অভ্যুত্থানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার পর জিয়া একটি নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণের সুযোগকে আরো বিস্তৃত করেন। অর্থাৎ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে মুজিবের মৃত্যুর পর যে রাজনীতির সূচনা ঘটে জিয়াউর রহমান সেই রাজনীতিকেই নতুনভাবে রূপ দিলেন। দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নীতিমালাকেও একই দিকে ধাবিত করেন। মোশতাক যে আইন তৈরি করে মুজিব হত্যার ফৌজদারি অপরাধ থেকে বিদ্রোহী মেজর এবং সৈনিকদের দায়মুক্ত করেছিলেন, জিয়া সে আইন বলবৎ রাখেন এবং বিদ্রোহীদের কয়েকজনকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরির ব্যবস্থা করে ঐ মেরুকরণে নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করে দেন।

এই নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণে জিয়া দেশের একটা বিরাট অংশের সমর্থন পান। আওয়ামী লীগের অপশাসন এবং মুজিবের হত্যা এমনিতেই নতুন করে আওয়ামী লীগবিরোধী রাজনীতির জন্ম দেয়, অন্যদিকে ৭ নভেম্বর জাসদের ব্যর্থতা এবং পরবর্তীকালে তাদের জনসমর্থনবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত এডভেঞ্চার—দুটো ভিন্ন ভিন্ন কারণে আওয়ামী লীগ এবং জাসদ জনসমর্থন হারায়। এই দুটো রাজনৈতিক দল ছাড়া বাকি সব দলমতের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা জিয়া করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসে দক্ষিণপন্থী ধর্মভিত্তিক সংগঠন আর বামপন্থী চীন সমর্থক কমিউনিস্ট সংগঠনগুলো। বলাবাহুল্য যে, দক্ষিণপন্থী যেসব সংগঠন জিয়ার সমর্থনে এগিয়ে এল, তারা প্রায় সকলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী ভূমিকা পালন করেছিল। জিয়াকে এই সমর্থন দেয়ার মাধ্যমে তারা যেমন নিজেদের রাজনৈতিক পুনর্বহালের প্রক্রিয়া জোরদার করতে চেয়েছিল ঠিক তেমনি, জিয়াও তার নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য তাদের সমর্থনকে কাজে লাগিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় এবং সাংবিধানিক

www.pathagar.com

বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে জিয়া এইসব শক্তিকে শুধু পুনর্বহালই করেননি, তিনি তাদের রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ বলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল করার পথ আওয়ামী সরকার বন্ধ রেখেছিল, জিয়া ঐ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে তাদের রাজনীতি করার পথ উন্মুক্ত করে দেন। এই কারণে পরবর্তী পর্যায়ে দেশের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শক্তিগুলো আবার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করার সুযোগ পায়। দেশের জনগণের একটি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছাড়াও জিয়া দক্ষিণপন্থী প্রায় সকল দলের সমর্থন পান এবং বামপন্থীরা জিয়াকে জোরালো সমর্থন দিলেও রাজনৈতিকভাবে দক্ষিণপন্থীদের ওপরই জিয়ার নির্ভরতা অনেক বেড়ে যায়। এই দুটো শক্তির ওপর ভিত্তি করে জিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলেন যেখানে বামের চেয়ে ডানের প্রাধান্য ছিল অনেক বেশি। সর্বোপরি এই যে মেরুকরণ তার মূলে ছিল জিয়ার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং জাতিকে যতটা সম্ভব ঐক্যবদ্ধ করার একটি সচেতন প্রয়াস।

দক্ষিণপন্থীদের সমর্থনকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য জিয়া দালাল আইন তুলে দেন এবং জেলখানায় ঐ আইনের অধীনে আটক অনেক বন্দিদের ছেড়ে দেন। সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদকে সংশোধন করে নাগরিকদের 'বাঙালি' বলার পরিবর্তে "বাংলাদেশী" বলার বিষয়টি সংযোজন করেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর আস্থা সৃষ্টি করার জন্য সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম সংযোজন করেন। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই সকল কার্যাবলির ভিত্তি বলে সংবিধান সংশোধন করেন। মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব এবং সৌহার্দ্যের সম্পর্ক জোরদার করার নতুন ধারাও সংবিধানে সন্নিবেশ করেন।

তবে এর সাথে সাথে জিয়া ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসেই একটি জাতীয় দল অর্থাৎ একদলীয় ব্যবস্থার পুরো অনুচ্ছেদ (১১৭ক) সংবিধান থেকে বাদ দিয়েছেন। হাইকোর্টের মৌলিক অধিকার কার্যকরী করার ক্ষমতা এবং রিট এখতিয়ার পুনর্বহাল করেন। চতুর্থ সংশোধনীর অধীনে বিচার বিভাগের মর্যাদা এবং ক্ষমতা যা বিলুপ্ত করা হয়েছিল তার প্রায় পুরোটাই পুনর্বহাল করেন। সুপ্রিমকোর্টের জজদের চাকরির নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বিনা ক্ষতিপূরণে জাতীয়করণ করার যে ক্ষমতা সংবিধানে ছিল সেটা তুলে দিয়ে তার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ ছাড়া কোন সম্পত্তি জাতীয়করণ করা যাবে না বলে উল্লেখ করেন।

এইভাবে জিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে একদিকে যেমন ব্যাপক জনসমর্থন পান, অন্যদিকে উভয় ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান ক্রমশ আরো সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন। জিয়া একদিকে যেমন সামরিক বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে তাঁকে সমর্থনকারী রাজনৈতিক দলগুলোর শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টাও করেছেন। তিনি অসম্ভব ধৈর্যশীল ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনে অত্যন্ত কঠোর হতে পারতেন। ছাউনির বাইরে এবং ভেতরে তিনি পূর্বাপর তাঁর চরিত্রের এই ধারাটি বজায় রাখেন। ৭ নভেম্বর জওয়ানদের অভ্যুত্থান এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার আন্দোলনের ফলে সেনাবাহিনীর

www.pathagar.com

শৃঙ্খলা বলতে আর কিছুই ছিল না। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্ত ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। জিয়া জওয়ানদের মূল কতগুলো দাবি মেনে নিয়ে এই সেনাবাহিনীর সংগঠন, শৃঙ্খলা এবং chain of command প্রতিষ্ঠা করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এটি তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, কেননা তাঁর ক্ষমতার প্রধান উৎসই ছিল সামরিক বাহিনী। সামরিক বাহিনীই ছিল তাঁর ক্ষমতার প্রাথমিক খুঁটি। জিয়া এই কাজে দিনরাত পরিশ্রম করেছেন, জওয়ানদের ছাউনিতে গিয়ে তাদের সাথে রাত কাটিয়েছেন। যেখানে যেখানে বিশৃঙ্খলা হতো বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত, সেখানে তিনি নিজেই চলে যেতেন। বস্তুত ঐ সময় তিনি ছাড়া এইসব গোলমাল মেটানোর জন্য অন্য কোন ব্যক্তি সামরিক বাহিনীতে তখন ছিল না। তাই তাঁকেই এসব ঘটনাস্থলে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হতো। ছাউনিগুলোতে পুরোপুরি একটি স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে প্রায় বছরখানেক সময় লাগে। সর্বত্রই জিয়ার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি এবং জওয়ানদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তাই বেশি কাজ করে। এই প্রক্রিয়ায় জিয়ার সমর্থনের ওপর সামরিক অফিসারদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় এবং তিনি জওয়ান এবং অফিসার—দুপক্ষেরই আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনের এই প্রক্রিয়ায় দেশের তখনকার রাজনৈতিক গতিধারার প্রতিফলন হিসেবে পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অফিসারদের জিয়া গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন এবং গোষ্ঠীগতভাবে তাদের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পায়। যদিও জিয়া মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রত্যাগত অফিসারদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অনেক মুক্তিযোদ্ধা অফিসার এই ব্যাপারে তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন।

সামরিক বাহিনী সাংগঠনিকভাবে তুলনামূলক কিছুটা মজবুত হয়ে আসলে, জিয়া ধীরে ধীরে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক ভূমিকারও সম্প্রসারণ ঘটান। তাঁর এই রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের ব্যাপারে তাঁকে সর্বাধিক সাহায্য করেন ব্রিগেডিয়ার আবুল মঞ্জুর এবং ব্রিগেডিয়ার নূরুল ইসলাম শিশু। এঁরা দুজনই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। মঞ্জুর দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে সামরিক এটাচি ছিলেন, আর নূরুল ইসলাম ছিলেন ঐ একই পদে বার্মায় কর্মরত। জিয়া মঞ্জুরকে চিফ অব জেনারেল স্টাফ এবং নূরুল ইসলামকে এডজুটেন্ট জেনারেল নিযুক্ত করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তুষ্ট রাখতে একদিকে যেমন এদের রেখেছিলেন অন্যদিকে রেখেছিলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ হিসেবে, প্রত্যাগত অফিসারদের সমর্থন ও আনুগত্য লাভের জন্য। যাই হোক এদের সাথে সলাপরামর্শ করে জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিলেন। বিচারপতি সায়েমের কাছে প্রেসিডেন্টের আনুষ্ঠানিক পদবি ছাড়া তখন আর কোন ক্ষমতা থাকল না। এটি যে তিনি মোটেও পছন্দ করেননি তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর অন্য কোন উপায়ও ছিল না। পরে তখনকার প্রেক্ষাপটের বর্ণনা দিয়ে বিচারপতি সায়েম একটি বই লিখেছিলেন। প্রধান প্রশাসকের দায়িত্ব নেয়ার পর জিয়া রাজনৈতিকভাবে আরো সক্রিয় হন এবং নিজের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনা তখন থেকেই কার্যকর করা শুরু করেন।

www.pathagar.com

নতুন বছরে, ১৯৭৭, ব্রিগেডিয়ার আবুল মঞ্জুর এবং নূরুল ইসলামের সাহায্যে জিয়া নিজের ভবিষ্যতের রাজনীতির জন্য একটি কর্মসূচি তৈরি করার কাজে হাত দেন। জিয়া ছিলেন অনেকটা সুহার্তোর মত। সবকিছু ধীরগতিতে করা ভালবাসতেন। দেশে তাঁর যে জনপ্রিয়তা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অনেক আগেই প্রধান প্রশাসকের দায়িত্ব নিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে প্রায় বছরখানেক অপেক্ষা করেছেন। তারপর একটি কর্মসূচি, যেটা ১৯ দফা কর্মসূচি হিসেবে পরিচিত, সেটাও তৈরি করতে অনেক সময় নেন। অনেকের সাথে আলাপ করেছেন দিনের পর দিন। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ২০ এপ্রিল বিচারপতি সায়েম "স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ" করলে জিয়া প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হন। ইন্দোনেশিয়াতেও সুহার্তো অনেক আগেই কার্যকরভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, কিন্তু ১৮ মাস অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত সুকর্নোকে পদচ্যুত করে দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। জিয়াকেও দেশের প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হতে প্রায় ১৭ মাস সময় লাগে। প্রেসিডেন্ট হওয়ার দশ দিন পরই ৩০ এপ্রিল জিয়া তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচি জনগণের কাছে উপস্থাপন করেন এবং একটি রেফারেন্ডামের মাধ্যমে এই কর্মসূচির ভিত্তিতে জনগণের সমর্থন চাইলেন। এই ধরনের হাঁ-না ভোটে তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশেই ক্ষমতাসীন ব্যক্তি জয়লাভ করেন। বাংলাদেশেও তাই হলো। ৩০ মে ঐ ভোট অনুষ্ঠিত হয়। এমনিতেই জিয়ার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল, তবু নিচের সারির আমলাদের অতি উৎসাহের কারণে রেফারেন্ডামে ৮৮ ভাগ ভোটার ভোট দিয়েছে দেখানো হলো এবং জিয়ার পক্ষে ভোট পড়েছে দেখানো হলো প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৯৮ ভাগ। এই রেফারেন্ডামের ফলে জিয়ার দেশ শাসনের বৈধতা কিছুটা হলেও প্রতিষ্ঠিত হলো সত্য, কিন্তু এই ধরনের ফলাফলের কারণে এই রেফারেন্ডামের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

ইতোমধ্যে জিয়া তাঁর রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা আরো জোরদার করেন। ধরতে গেলে ৭ নভেম্বরের পর থেকেই জিয়া রাজনীতি এবং রাজনৈতিক আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন। পরে তাঁর বিশেষ সহকারী বিচারপতি সাত্তারের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে, আর নিজে ব্যক্তিগতভাবে, প্রায় সকল দলের রাজনীতিবিদদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকেন। সামরিক শাসকরা ক্ষমতায় এসেই প্রথমে আঘাত হানে রাজনীতিবিদদের ওপর। কিন্তু জিয়াকে সেরকম কিছু করতে হয়নি। তিনি রাজনীতিবিদদের ঢালাওভাবে নিন্দা করেননি, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেননি এবং রাজনৈতিক আলোচনার ওপর সামরিক বিধি প্রয়োগ করেননি। প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ এবং জাসদ ছাড়া প্রায় সব দলের সাথেই তাঁর যোগাযোগ ছিল। পরে আওয়ামী লীগ এবং জাসদের ব্যাপারেও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করেছেন। ক্রমাগত দেশের সকল রাজনৈতিক দলকেই তিনি কাজ করতে দিয়েছেন। অন্যান্য সামরিক নেতার তুলনায় তিনি এ ব্যাপারে অনেক উদারনীতি অনুসরণ করেন। ৭ নভেম্বরের পর অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই প্রথমে ঘরোয়াভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য রাজনৈতিক দলবিধি প্রণয়ন করেন। পরে পূর্ণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু হলে ঐ রাজনৈতিক দলবিধি তুলে নেয়া হয়। সামরিক

www.pathagar.com

নেতারা ক্ষমতায় এলে সাধারণত আইনের শাসন লোপ পায়, স্বেচ্ছাচারিতা বাড়ে, ক্ষমতার অপব্যবহার হয়। জেলায় জেলায় সামরিক আদালত বসানো এবং মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা ব্যাহত করা হয়। জিয়ার আমলে কোন কোন ক্ষেত্রে যে এগুলো ঘটেনি, তা নয় তবে অন্য যে কোন সামরিক শাসনের তুলনায় অত্যন্ত কম হয়। জিয়ার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ অনুকূলে ছিল বলে সামরিক আইন প্রয়োগে তেমন কড়াকড়ি করা হয়নি, আর মানুষের হয়রানিও কম হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, কোন পর্যায়ে সংবিধানকে রহিত বা স্থগিত করা হয়নি, আর সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা পুনর্বহাল করে নাগরিক জীবনের স্বাভাবিকতা বজায় রাখা হয়েছিল প্রথম থেকেই। এইদিক থেকে অন্যান্য সামরিক শাসনের তুলনায় জিয়ার শাসন ছিল ব্যতিক্রমধর্মী।

কিন্তু জিয়ার রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করা বা তার রাজনীতিকরণ এবং গণতন্ত্রায়নের কর্মসূচি সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে বিভক্তি সৃষ্টি করেছিল। ছাউনির ভেতরে অনেকে এসব পছন্দ করেননি। প্রথম দিকে যখন জিয়া সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠন এবং এর মর্যাদা এবং শৃঙ্খলা, বিশেষ করে অফিসারদের chain of command প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করেছিলেন তখন সামরিক অফিসাররা তাঁকে সমর্থন দিয়েছিলেন। দেশ শাসনে তাঁদের গুরুত্ব যতদিন ছিল ততদিন তেমন কোন অসুবিধা হয়নি, কিন্তু যখন জিয়া ক্রমশ রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন তখন তাঁদের অনেকে আর খুশি থাকতে পারেননি। জাসদে কর্নেল তাহেরের অনুসারীরা বা কর্নেল ফারুক এবং রশীদ, যারা সরকারের চাকরি নেয়নি এবং মোশতাকের অপসারণ পছন্দ করেনি, তারা বা তাদের সমর্থকরা জিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করছিল। তাদের ভেতরকার ক্ষোভ এবং এডভেঞ্চারিজম অত সহজে চলে যাওয়ার ব্যাপার ছিল না। এছাড়াও সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠিত করার সাথে সাথেই ছাউনির অভ্যন্তরে তাঁর বিরুদ্ধে আরো গভীর প্রকৃতির বিরোধিতা দানা বাধে। সামরিক অফিসারদের একটি অংশ দেশ শাসনে আরো বেশি করে তাদের অংশগ্রহণ চেয়েছিল, কিন্তু জিয়ার রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য দেশ শাসনে তাদের ভূমিকা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দেশকে গণতন্ত্রায়নের কর্মসূচি স্বাভাবিকভাবেই তাদের ক্ষমতাকে সীমিত করে দিচ্ছিল।

ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে জিয়ার বিরোধীরা যতই গোলমাল ও চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে, জিয়া ততই জনগণের দিকে এগিয়ে গেছেন বা জিয়া যতই গণতন্ত্রায়নের পথে এগিয়েছেন ততই তাঁর ওপর তাদের আক্রমণ এবং চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি যেন একটি ঠাণ্ডা যুদ্ধের মত ব্যাপার ছিল। জিয়ার রাজনৈতিক দল গঠন করা, নির্বাচন করা, পার্লামেন্ট চালু হওয়া—এসবই ছিল সামরিক বাহিনীর গোষ্ঠীস্বার্থবিরোধী—এসবের অর্থই ছিল ছাউনির নিয়ন্ত্রণ থেকে জিয়ার ক্রমাগত দূরে চলে যাওয়া। জিয়া যদি শুধু সামরিক শাসন দিয়ে পুরোদমে দেশ চালাতে চাইতেন বা দেশ শাসনে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সুবিন্যস্ত করতেন, তাহলে এত সমস্যা হতো না। বার বার জিয়াকে হত্যা বা অপসারণ করার জন্য ক্যু হতো না। জিয়ার জীবনকালে অন্তত ১৭টা ক্যুয়ের কথা অনেকেই শুনেছে। অবশ্য এগুলোর সবই যে একই কারণে ঘটেছে তাও সত্য নয়। সবগুলো আবার

www.pathagar.com

ঠিক ক্য ছিল না। নানা সময়ে নানা কারণে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। তবুও তাঁর বিরোধীরা যে সদা তৎপর ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং তাদের তৎপরতার মূল কারণ যে ক্ষমতা দখল বা ক্ষমতায় অংশ নেয়া, তাতেও কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। মুজিবের মৃত্যু, জিয়ার মৃত্যু, জিয়ার মৃত্যুর পর সামরিক বাহিনীর দাবি এবং শেষ পর্যন্ত ৮২ সালে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল, এসবগুলো ঘটনার সাথে জিয়ার জীবনকালের ছাউনির অস্থিরতার একটি সম্পর্ক যে ছিল সেটা গভীরভাবে পরীক্ষা করলে হয়তো পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের রাজনীতির অতীতকে এবং সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থানকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে না পারলে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ধারা এবং দিক্‌নির্দেশনা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করি না।

কিন্তু জিয়া কেন একটি ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিলেন তার সঠিক জবাব পাওয়া কঠিন। তবে তাঁর কার্যপ্রণালী থেকে এটি বোঝা যায়, যে কোন কারণেই হোক, জিয়া সামরিক বাহিনীকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতার অংশীদার করতে চাননি। সামরিক বাহিনী দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করুক এটাও তিনি চাননি। একজন সামরিক অফিসার হয়েও ইচ্ছা করেই সামরিক বাহিনীকে প্রশাসন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। শেষের দিকে নিজেকেও সামরিক বাহিনী থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে জনগণের ভোট, পার্লামেন্ট আর সংবিধানের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছিলেন। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যে, জিয়া জনগণ আর সামরিক বাহিনীর মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেটা ঠিক দেশের প্রশাসন চালানোর জন্য তিনি করেননি। নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে সুসংহত রাখার জন্য করেছিলেন। নিজের প্রয়োজনে সেটা তাঁকে করতে হয়েছে, তাদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার জন্য নয়। দেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু কাজে সিনিয়র সামরিক অফিসারদের সাথে সলাপরামর্শ হয়তো করতেন, কিন্তু সেটাও নিজের অবস্থান ঠিক রাখার জন্য, ক্ষমতায় তাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক অংশ দেয়ার জন্য নয়। একজন বেসামরিক রাষ্ট্রপ্রধানও যদি এ ধরনের একটি সম্পর্ক সামরিক বাহিনীর সাথে রাখেন, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশে, একে বাস্তবতার নিরিখে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে না। তবে জিয়া যে সামরিক বাহিনীকে অনেক সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত এবং সম্প্রসারিত করে গেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজকের সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক শ্রীবৃদ্ধি জিয়াউর রহমানেরই অবদান, কিন্তু সামরিক বাহিনী সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ুক এটি তিনি চাননি। শাসনকার্যে সামরিক বাহিনীকে জড়িত করলে দেশের অমঙ্গল হবে, একথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।

যাই হোক রাজনীতিতে জিয়া নিজস্ব গতিধারায় এগিয়ে গেছেন। একদিকে সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠিত করেছেন, অন্যদিকে নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করেছেন। ১৯৭৬ সালের পুরো বছরটাই তাঁর কেটে গেছে সামরিক বাহিনীকে ঠিক করতে। কর্নেল তাহেরের ফাঁসি এবং জাসদ নেতাদের সাজা দেয়ার পর সেনাবাহিনীতে তাঁদের সমর্থকরা আর খুব বেশি মাথা চাড়া দিতে পারেনি। মোটামুটিভাবে তাঁদের অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণে

www.pathagar.com

নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু এছাড়াও আরো দুয়েকটি গ্রুপ তখনও তৎপর ছিল, বিশেষ করে, ১৫ আগস্টের ঘটনার সাথে জড়িত মোশতাকের সমর্থনকারী অনুসারীরা। যদিও জিয়া ঐ ঘটনায় জড়িত অনেক অফিসারকেই চাকরি দিয়েছিলেন, কিন্তু কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশীদ চাকরি নেয়নি, এরা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার চেষ্টায় ছিল। জিয়া এদের অন্যবিধ সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু এরা ক্ষমতায় আসুক, এটি কিছুতেই চাননি। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল-মে-তে কর্নেল ফারুক গোপনে একবার দেশে আসে এবং বগুড়ায় গিয়ে তার পুরোনো সাঁজোয়া বাহিনীকে নিয়ে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু জিয়া নানা উপায় অবলম্বন করে তাকে আত্মসমর্পণ করান এবং তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে বিমানে উঠিয়ে লন্ডন পাঠিয়ে দেন। এই ঘটনার পর এদের শক্তিকে নষ্ট করে দেয়ার জন্য জিয়া পুরো সাঁজোয়া বাহিনীকেই তুলে দেন এবং ঐ রেজিমেন্টের প্রায় ৫০০ সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

পরবর্তী পর্যায়ে কর্নেল ফারুক ১৯৭৭ সালের ৩ জুন আবার ছদ্মবেশে ব্যাংকক থেকে ঢাকায় আসে, সাথে ছিল বন্দুক, কিছু লিফলেট আর মিথ্যা পরিচয়পত্র। কিন্তু বিমানবন্দরেই তাকে বন্দি করা হয় এবং এবার একটি বিশেষ সামরিক আদালতে তাকে ৫ বছর সাজা দেয়া হয়। এই সাজা দেয়া সম্ভব হয়েছিল এবং দেশের জেলে তাকে রাখাটা আর বিপজ্জনক ছিল না এই কারণে যে ততদিনে জিয়া ছাউনির ভেতরে এবং বাইরে তাদের শক্তিকে কাবু করে ফেলেছিলেন। উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার ভাইস মার্শাল এমএজি তোয়াবকে খন্দকার মোশতাক বিমানপ্রধান বানিয়েছিলেন এবং তোয়াবের সাথে বিদ্রোহী অফিসারদের এবং মোশতাকের সম্পর্ক ছিল এটি জিয়া জানতেন। কর্নেল ফারুকের বগুড়ার ঐ ঘটনার পর তোয়াবকে জিয়াউর রহমান সরিয়ে দিতে সক্ষম হন। বাকি ছিল খন্দকার মোশতাক। সেদিনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মোশতাকই ছিলেন জিয়ার একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। মোশতাক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আবার ক্ষমতায় যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু ছাউনির অভ্যন্তরেও তাঁর একটি সমর্থন ছিল। বিশেষ করে কর্নেল ফারুক-রশীদ এবং ১৫ আগস্টে যারা অংশগ্রহণ করেছিল সেই অফিসার এবং জওয়ানদের মধ্যে। সামরিক বাহিনীর সাথে মোশতাকের এই সম্পর্ক জিয়ার জন্য ছিল একটি হুমকি। যেদিন জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হলেন সেদিনই ২৯ নভেম্বর ১৯৭৬ খন্দকার মোশতাককে গ্রেপ্তার করা হয়। একটি বিশেষ সামরিক আদালত দুর্নীতি এবং ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে দুটো মামলায় খন্দকার মোশতাককে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেন। যদিও পরে সুপ্রিমকোর্ট এই মামলাকে দুরভিসন্ধিমূলক বলে মোশতাকের পক্ষে খারিজ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ইতোমধ্যে কয়েক বছরের জন্য তাঁকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়।

কিন্তু এরপরও সেনাবাহিনীর মধ্যে অস্থিরতা একেবারে দূর হয়ে যায়নি। জিয়া যখন ১৯৭৭ সালের এপ্রিলে প্রেসিডেন্ট হন এবং মে মাসে গণভোটের মাধ্যমে নিজের অবস্থানকে আরো শক্ত করেন, কয়েক মাস পরেই তাঁর বিরোধীরা আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং

www.pathagar.com

বিভিন্ন ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। প্রায় বছরখানেক অবস্থা শান্ত থাকার পর জিয়া যখন রাজনীতিকরণের প্রক্রিয়ায় আরো সক্রিয়তার উদ্যোগ নেন তখন বগুড়ায়, ১৯৭৭ সালের ২৯ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, জওয়ানদের একটি অংশ এবং কিছু জুনিয়র অফিসার বিদ্রোহ করে। জওয়ানরা হাতে রাইফেল নিয়ে উত্তেজনাকর শ্লোগান দেয়, শহর দখল করে, রাস্তায় মিছিল করে, জেলখানায় কয়েদিদের ছেড়ে দেয়, কিছু দোকান লুট করে এবং সরকারবিরোধী বক্তব্য রাখে। কিন্তু এরা সংখ্যায় ছিল মাত্র শ পাঁচেকের মত এবং এরা কোন জনসমর্থন পায়নি। সারা দেশে তখন জনসাধারণের একটি ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, যারাই জিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে তারাই ভারত-সোভিয়েতের মদদপুষ্ট শক্তি, তা না হলে জিয়াকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চাইবে কেন? এই কারণে বগুড়ার ঐ জওয়ানদের জনসাধারণই প্রতিহত করে। পুলিশ আর জনতা মিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের বিদ্রোহ বানচাল করে দেয়। এই ঘটনায় একজন সেনা অফিসার মারা যায় এবং বেশ কিছু লোক আহত হন।

এর প্রায় সাথে সাথে দুদিন পরই ঢাকায় এক ভয়াবহ বিদ্রোহ ঘটে। রাজধানী তখন অন্য একটি সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। জাপানের বিপ্লবী রেড আর্মির একটি দল জাপান এয়ারলাইন্সের একটি জেট বিমান হাইজ্যাক করে ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ঐ বিপ্লবীরা তখন বাংলাদেশের মাধ্যমে জাপানি সরকারের সাথে যাত্রী এবং বিমান নিয়ে দরকষাকষি করছিল। ২ অক্টোবর ঢাকার এই অভ্যুত্থানে বিমানবাহিনীর সদস্যরা ছিল অগ্রণী ভূমিকায়। পরে সেনাবাহিনীর একটি অংশও তাদের সাথে যোগ দেয়। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরে ১২ দফা কর্মসূচির মধ্যে যে দাবিগুলো ছিল মোটামুটি সেই ধরনের দাবি এবারও উচ্চারিত হয়। এরা নিজেদের People's Army বলে প্রচার করে এবং ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক তাদের সাথে আছে বলে দাবি করে। তারা কিছুক্ষণের জন্য রেডিওকেন্দ্র দখল করে। তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং জিয়া এবং সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। বিপ্লবী সেনাবাহিনী গঠন, সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সামরিক অফিসারদের আক্রমণ করাও ছিল এই অভ্যুত্থানের অংশ। তারা জিয়ার বাসভবন আক্রমণ করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছিল। কিন্তু জনসমর্থনের অভাবে শেষ পর্যন্ত এই অভ্যুত্থানও ব্যর্থ হয়। জিয়া সমর্থক সৈনিকরা সকাল ৯টার মধ্যেই রেডিওকেন্দ্র পুনর্দখল করে এবং অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনে। এই অভ্যুত্থান এবং সংঘর্ষে প্রায় ২০০ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। বিমানবাহিনীর ১১জন অফিসার এবং ১৭ জন বেসামরিক ব্যক্তি নিহতদের মধ্যে ছিলেন। এই অভ্যুত্থান বাংলাদেশ বিমানবাহিনীকে প্রায় পঙ্গু করে দেয়। অনেকেই সন্দেহ করে যে, এই ঘটনার সাথে বগুড়ার ঘটনা যুক্ত ছিল। এবারও জনসাধারণ এটিকে ভারতের মদদপুষ্ট ব্যাপার বলে মনে করে এবং তাই স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, তারা মিছিল করেছে, সভা করেছে, বিবৃতি দিয়েছে, ঘটনাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে এবং জিয়ার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশের প্রায় সবক'টি রাজনৈতিক দলই এই ঘটনার নিন্দা করেছে এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করেছে। তারা পরোক্ষভাবে জাসদ এবং আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করেছে। সরকারি কাগজ এবং প্রচারযন্ত্র পুরো ব্যাপারটিকে দেশের স্বাধীনতা এবং

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করে। জিয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণে এটিকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ববিরোধী শক্তিদের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন এবং তাদের অনুপ্রেরণায় কিছু হতাশাগ্রস্ত এবং বিশৃঙ্খল সৈনিক এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে বলে দাবি করেন। এটি বলা কঠিন যে, কে বা কারা এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে কিন্তু এতে সেনা ছাউনির লোকেরাই যে জড়িত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঢাকায় তখন নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর অনেক সিনিয়র অফিসারও এই ঘটনার পেছনে মদদ জুগিয়েছে বলেও কানাঘুষা চলতে থাকে। সরকারের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে ঢাকার সেনানিবাসে, পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে কিছু রাজনৈতিক দলের অনুপ্রবেশকে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী আখ্যায়িত করে রাজনৈতিক দলগুলোকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয় এবং ১৪ অক্টোবর জাসদ, মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এবং মোশতাকের ডেমোক্রেটিক লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। উক্ত তিনটি দল রাজনৈতিক আদর্শের দিক দিয়ে ছিল পরস্পরবিরোধী। তাই কথা উঠেছিল, এই তিনটি দল কি করে একসাথে এমন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে? কিন্তু জিয়া কোন ঝুঁকি নিতে চাননি। তিনি সরকারিভাবে এ ধরনের একটি পদক্ষেপ না নিয়ে পারেননি।

ঘটনাটি প্রধানত অভ্যন্তরীণ ব্যাপারই ছিল বলে মনে হয়। এই ঘটনার পরিণতি ছিল অত্যন্ত গুরুতর এবং সুদূরপ্রসারী, দেশের রাজনীতি এবং সেনাবাহিনী—উভয়ের জন্যই। এই ঘটনার পর সেনাবাহিনী এবং দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে দ্রুত পরিবর্তন আসে। এই ঘটনার পরই জিয়া রাজনীতির দিকে পুরোপুরি চলে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। সামরিক বাহিনীর জন্য এত কিছু করার পরও তিনি তাদের একটি অংশকে খুশি করতে পারেননি। তারা বার বার শুধু তার ওপর নয়, দেশের অস্তিত্বের ওপর আঘাত এনেছে। তবুও সেনাবাহিনীর সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার কথা চিন্তা না করে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এসব অভ্যুত্থানের পেছনে মূল বিষয়টা ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সামরিক বাহিনীর কাছে রাখা এবং সেটা যেন ছাউনির বাইরে চলে না যায় তা নিশ্চিত করা। কিন্তু জিয়া করলেন ঠিক তার উল্টোটা। সেনাবাহিনীতে তাঁর বিরোধীদের মোকাবেলা বা ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য তিনি জনগণের কাছে যাওয়াটাকেই উপযুক্ত মনে করেছেন। একদিকে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে অস্থিরতা, জওয়ানদের কিছু কিছু দাবি এবং বিভিন্ন বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এবং অন্যদিকে ক্ষমতা দখল ও নিয়ন্ত্রণ এবং সামরিক ছাউনিতে ক্ষমতা সংরক্ষণ—এই বিদ্যমান পরিস্থিতির সম্যক উপলব্ধি জিয়াউর রহমান কতটা করতে পেরেছিলেন এবং ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদানের কতটুকু সংযোগ ছিল—এই সম্পর্কে অনেকে নানা রকম প্রশ্ন করে থাকেন। অনেকে এমনও মনে করেন যে, জিয়া শুধু সেনাবাহিনীকে ক্ষমতার ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে ভরসা পাননি।

যাই হোক, এই ঘটনার পর জিয়া খুব শক্ত হাতে সেনাবাহিনীকে পুনর্বিন্যাস করেন এবং বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতিতে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক আপোস করেছেন কিন্তু সেনাবাহিনীর ব্যাপারে কোন আপোস করেননি। সামরিক আইনের অধীনে

www.pathagar.com

বগুড়া এবং ঢাকার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতির মাধ্যমে অনেককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, প্রায় হাজারখানেককে চাকরিচ্যুত করা হয় এবং পাঁচ থেকে সাতশ সেনা সদস্য তাদের র‍্যাঙ্ক ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়েও তিনি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন। বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কয়েকজন অফিসারকে তিনি হয় বিদায় দিলেন, না হয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন। চিফ অব জেনারেল স্টাফ আবুল মঞ্জুরকে চট্টগ্রামে এবং নবম পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল শওকতকে যশোরে পাঠিয়ে দিলেন। ফিল্ড ইন্টেলিজেন্সের এয়ার ভাইস মার্শাল কে. এম. ইসলামকে অবসর দেন, আর বিডিআরপ্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীরকে অবসর দিয়ে কূটনৈতিক পদে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেন। অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে জানিয়ে দেন যে, তিনি দেশে একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট তৈরি করবেন। এর পরপর উপদেষ্টা পরিষদে কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং সরকার থেকে সেনাবাহিনীকে আরো বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। বিমান এবং নৌবাহিনীর প্রধানদের নিজেদের পেশাগত পদ না ছাড়লে মন্ত্রিসভায় রাখা যাবে না বলে জানিয়ে দেন। তিনি ডেপুটি মার্শাল'ল এডমিনিস্ট্রেটর বা ডিসিএমএলএ পদ উঠিয়ে দিলেন এবং বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রধানদের আর মন্ত্রিসভায় সদস্য রাখা হলো না। এ. জি. মাহমুদ বিমানবাহিনীর প্রধান হিসেবে পদত্যাগ করলে তাঁকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ জিয়া ছাড়া আর কোন কর্মরত সামরিক অফিসার তখন আর সরকারের সাথে জড়িত থাকলেন না।

১৯৭৭ সালের প্রথমার্ধে প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর বন্ধু জেনারেল নূরুল ইসলামের সাথে দেশের নানা সমস্যা নিয়ে আমার কয়েকবার আলাপ হয়। সামরিক শাসন তুলে নিয়ে দেশে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত জিয়া যেদিন নেবেন সেদিন তাঁকে রাজনৈতিকভাবে সাহায্য করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ডিসেম্বরে যখন তিনি দেশের গণতন্ত্রায়ন এবং রাজনৈতিক ফ্রন্ট তৈরি করার কথা ঘোষণা করেন আমি তখন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিউইয়র্কে ছিলাম। দেশ থেকে টেলিফোন করা হলো আমাদের রাষ্ট্রদূত কায়সার সাহেবকে আমাকে যেন শিগগির ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাত দুটোর সময় রাষ্ট্রদূত টেলিফোনে যখন খবর দিলেন, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কেন আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। অবশ্যই দ্বিধা এবং সংশয়ের মধ্যে ছিলাম। শেষ পর্যন্ত দশ-বার দিন দেরি করে দেশে ফিরে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসেবে জিয়াউর রহমানের সরকারে যোগদান করি।

যোগদানের পরপরই দেশে গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাংবিধানিক বৈধতার রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করার কাজে মনোনিবেশ করলাম। কয়েক সপ্তাহ রাতের পর রাত জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাসভবনে বসে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কাঠামো তৈরি করা হয়। প্রথমে দল, তারপর ফ্রন্ট এবং সংসদীয় নির্বাচনের আগে একটি স্থায়ী পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল করা হবে। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সোনারগাঁও

www.pathagar.com

হোটেলের অদূরে বাংলা মোটরের মার্কেটের দোতলায় বিচারপতি সাত্তারের সভাপতিত্বে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। এই সংগঠনে জিয়াকে সরাসরি আনা হলো না। তার কারণ জাগদলের তখন বৃহত্তর ঐক্যের জন্য একটি ফ্রন্ট তৈরির প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল মাত্র। নিজের দল ছাড়া অন্য কোন দলের সঙ্গে একত্রিত হওয়া বা ফ্রন্ট করা যায় না, তাই রাজনৈতিক সুবিধা এবং শক্তি সঞ্চয় করার জন্য জাগদলের সৃষ্টি করা হয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তারকে তাই প্রথমে চেয়ারম্যান করা হয় এবং সেই দল অচিরেই একটি বিশাল সংগঠনে পরিণত হয়। এর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে ছিল (১) জিয়ার ভাবমূর্তি; (২) সরাকারি দলের পার্টি; ও (৩) ভারত-রুশ এবং আওয়ামী লীগ-ন্যাপবিরোধী রাজনীতি। ডান এবং বাম দুপক্ষের লোক এতে যোগ দিলেন, তবে ডানের সংখ্যা হলো কয়েকগুণ বেশি। এই সুযোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী বহু লোক এ দলে প্রবেশ করে। রাজাকার, আলবদর, আলশামসের অনেক ভূতপূর্ব সদস্য ছাড়াও সুযোগসন্ধানী সকল প্রকার লোক এদলে প্রবেশে করেছে। অনেকে আবার যোগ দিয়েছেন রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য, তবে সুবিধাবাদীদের সংখ্যা ছিল বেশি।

এই ধরনের লোকদের খোলাখুলিভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সাথে সাথে নানা দলের অনেক রাজবন্দিকে ছেড়ে দেয়া হয়, রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য এর দরকার ছিল। জাসদ এবং আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মীকেও ছেড়ে দেয়া হয়। যে তিনটি রাজনৈতিক দলকে ২ অক্টোবরের অভ্যুত্থানের পর নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল, কয়েক মাসের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।

এখানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করতে হয়। প্রথমটি ছিল জিয়ার রাজনৈতিক মেরুকরণের গুণগত চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য, আর দ্বিতীয়টি ছিল দেশের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক রূপরেখা। প্রথমটির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণের পর স্থির করা হয়েছিল যে, এদেশে যে কোন সরকারের জন্য সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করা এবং এটি একমাত্র দেশের মানুষের রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। তাই আমরা ঐক্যের রাজনীতির কথা বলেছি। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান এবং ভারত ও আওয়ামী লীগের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় উন্নয়নকে অগ্রগণ্য বিষয় বলে ধার্য করা হলো। এই ভিত্তিকে কার্যকর করার জন্য সকল দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল শক্তির ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ বা আধিপত্যবাদ থেকে বাঁচানোর জন্য যারাই এগিয়ে আসবে তাদেরই গণ্য করা হবে "দেশপ্রেমিক হিসেবে।" দেশের নতুন পরিস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধার কথা উঠলে জাতি আবার বিভক্ত হয়ে যাবে, তাই মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা, বাম, ডান, স্বধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ—সকলকে নিয়ে জাতীয় ঐক্যের মেরুকরণ সৃষ্টি করার প্রয়োজন বোধ করা হয়। জিয়া ছিলেন নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধাদের

www.pathagar.com

এবং স্বাধীনতার পক্ষের বিরাট একটি গণতান্ত্রিক শক্তি ও যাঁরা ভারত-তোষণনীতি এবং আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরাও জিয়ার দলে যোগ দিতে এগিয়ে আসেন এবং প্রথম পর্যায়ে জিয়া এই শক্তিকেই তাঁর নিজস্ব শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এঁদের ওপর নির্ভর করেই রাজনীতিতে এগিয়ে যান। আর একটু বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, সামরিক বাহিনী ছিল জিয়ার ক্ষমতার প্রাথমিক ভিত্তি (power base)। রক্ষণশীল এবং চীন সমর্থক বামপন্থী শক্তিরা ছিল তাঁর সমর্থনের ভিত্তি (support base), আর স্বাধীনতার পক্ষের গণতান্ত্রিক শক্তিরা ছিল তার মূল রাজনৈতিক ভিত্তি (political base)। তখন একটি ব্যাপারে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে, স্বাধীনতার বিপক্ষে যারা খুব সোচ্চার বা পরিচিত ব্যক্তিত্ব, তাদের সরকার বা দলে কোন মুখ্য ভূমিকা থাকবে না। তাদের রাজনৈতিক পুনর্বাসন হতে পারে, কিন্তু রাজনীতির মূল স্রোতধারায় পুনর্বহাল করা হবে না। কারণ দেশের মানুষ সেটা গ্রহণ করবে না। রাজনীতি করার অধিকার তাদের দিতে হবে, কিন্তু জিয়ার দলে তাদের ভূমিকা এবং অবস্থান হবে গৌণ। কিন্তু নানা কারণে এবং হয়তো কিছুটা রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা, কিছুটা expediencyর কারণে শেষ পর্যন্ত দলের অভ্যন্তরে চীনপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের সমর্থন দেয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই নীতি জিয়া অনুসরণ করতে পারেননি। তাঁর শাসনামলের শেষের দিকে জিয়া তাঁর মূল চিন্তাধারায় ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাকে বাস্তব রূপ দেয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। জাতীয় স্তরে জিয়ার ঐক্যের রাজনীতি রাজনৈতিক এবং মানবিক আবেদন প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল এবং তাঁর এই আবেদন ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সামাজিক পর্যায়ে পুরোনো ঘটনার রেশ টেনে সৃষ্ট ভেদাভেদ এবং হানাহানি অনেক হ্রাস পেয়েছিল। দেশের মানুষও তাই চাইছিল। তারা চাইছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে শান্তি এবং ভারসাম্য। তারা অতীতমুখি না থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছিল।

দ্বিতীয়ত, দেশের সাংবিধানিক কাঠামো কি হওয়া উচিত তা অতি জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জিয়া প্রায় দুবছর এ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে আলোচনা করেছেন। ৭ নভেম্বর ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বলতে গেলে, তিনি এ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। এই সমস্যার নিরসন না হওয়ায় পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেছে। সামরিক শাসকরা রাজনীতিবিদদের যথেচ্ছ নিন্দামন্দ করেছে, শক্ত হাতে দেশ শাসন করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশটা টেকাতে পারেনি। দেশকে শক্তিশালী করার নাম করে ক্ষমতা দখল করা হয়, কিন্তু শক্তিশালী করা দূরে থাকুক দেশটাকে ভেঙে দুটুকরো করে ছেড়েছে তারা। দেশটাকে দুভাগে ভাগ হওয়ার একটি অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, পাকিস্তানে কোনদিন একটি সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য সাংবিধানিক কাঠামো দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি এবং সেটা প্রধানত সামরিক বাহিনীর জন্যই সম্ভব হয়নি। ইস্কান্দার মীর্জা-আইয়ুব-ইয়াহিয়ার ভূমিকার কথা পুনর্ব্যক্ত করা নিষ্প্রয়োজন। ২৩ বছরে পাকিস্তানে কোন সাধারণ নির্বাচন হয়নি এবং শেষে যাও বা হলো তার ফলাফল শুধু দেশকে দ্বিখণ্ডিতই করেনি, উপরন্তু তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি দ্বিজাতিতত্ত্বকে অসার এবং মিথ্যা প্রমাণ করে দেয়।

www.pathagar.com

একথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে এদেশের মানুষ একটি উদার গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য সংগ্রামের পর সংগ্রাম করেছে। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সকল সংগ্রামই ছিল মূলত দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করারই সংগ্রাম। দেশের প্রায় সবক'টি বিরোধী দলই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে একটি সংসদীয় পদ্ধতির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেই বুঝিয়েছে। তাদের দাবি এবং ঘোষণাপত্রে ঐ বিষয়ই বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রণী সংগঠন আওয়ামী লীগও বরাবরই সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে। পৃথিবীতে যে ক'টি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে সংসদীয় ব্যবস্থাকেই তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে উত্তম এবং গণতান্ত্রিক বলে ধরে নেয়া হয়। আর আমরা যেহেতু ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিলাম, ঐতিহ্যগতভাবে আমরা তাদের সংসদীয় পদ্ধতির দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই বেশি প্রভাবিত। তাই উপরোক্ত দুটি প্রেক্ষাপটের কারণে সংসদীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামো আমাদের দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দেশের মানুষকে ১৯৩৫ সালের পর থেকেই এই পদ্ধতিতে দীক্ষিত করা হয়। পাকিস্তানের, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সৃষ্টিও হয়েছে ভোটের মাধ্যমে। তাই যদিও পাকিস্তান সৃষ্টির পর এদেশের মানুষ সংসদীয় গণতন্ত্রের সত্যিকারের রূপ বা প্রয়োগ খুব একটি দেখেনি, কিন্তু সেটা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের অনেক ত্যাগ, জেল ও নির্যাতন সহ্য করেছে এবং অনেক রক্ত দিতে হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ যে সংবিধান রচনা করে তাতে এদেশের মানুষের দুই যুগের সংগ্রাম-লালিত গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছিল। তারা একটি সংসদীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করে। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল করার বিধিনিষেধ প্রয়োগ করে এক দল লোকের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিলেও মোটামুটিভাবে ঐ সংবিধানের মাধ্যমে তারা তাদের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিগুলো রক্ষা করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও সেই সংবিধান মাত্র দুবছর টিকে থাকতে সমর্থ হয়েছিল এবং তারপর চতুর্থ সংশোধনী বিলের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ত দিয়ে অর্জিত সেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মৃত্যু ঘটায়। সংবিধানের শুধু রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাই নয়, সমস্ত গণতান্ত্রিক ধারা রদ করে দেশে একটি একদলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। গণতান্ত্রিক কোন বিধি ব্যবস্থাই আর রাখা হলো না।

জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর উত্তরাধিকারসূত্রে এই সংবিধানই পান। মোশতাক বা জিয়া ঐ সংবিধান স্থগিত করেননি। অনেক চাপ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সংবিধানকে রহিতও করেননি। পরিবর্তিত সর্বশেষ সংবিধান অগণতান্ত্রিক এবং অগ্রহণযোগ্য ছিল বলে তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল। সামরিক আইন জারি হওয়ার পর সাধারণত সংবিধানকে একেবারেই রদ করে দেয়া হয়। ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানের ক্ষেত্রে তাই-ই হয়েছিল। কিন্তু মোশতাক বা জিয়া সেটা না করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। কারণ বিদ্যমান অবস্থায় সংবিধান সম্পূর্ণ বাতিল করলে জাতি নতুন করে আরো একটি মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতো। তাই জিয়া যখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করেন তখন তাঁকে সর্বপ্রথম

www.pathagar.com

দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর কথাই ভাবতে হয়। কতগুলো বিষয়ে তখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হলো, যেমনঃ (১) জিয়া সামরিক আইন তুলে নেবেন এবং দেশে একটি সাংবিধানিক সরকার কায়েম করবেন; (২) জিয়া দেশে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন এবং জনগণের সম্মতি নিয়ে দেশ পরিচালনা করবেন; (৩) এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যাতে করে গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দুটোই সমান গুরুত্বসহকারে অর্জিত হয়।

এখানে জিয়ার গণতন্ত্রায়নের প্রতিশ্রুতিই ছিল বড় কথা। মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে, সুপ্রিমকোর্টের সব ক্ষমতা এবং মর্যাদা পুনর্বহাল করে দেশের সবক'টি রাজনৈতিক দলকে মুক্তভাবে কাজ করতে দেয়ার জন্য তাঁর অটুট মনোবল এবং আগ্রহের মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নিহিত ছিল। জিয়া আগে কোনদিন রাজনীতি করেননি। তিনি দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনদিন সংগ্রামও করেননি। জনগণের কাছে তিনি কোন প্রতিশ্রুতিও দেননি। তিনি ছিলেন সামরিক বাহিনীর জেনারেল। অন্যান্য সামরিক নেতারা ক্ষমতা দখল করে যেভাবে নানা রকম ফন্দিফিকির করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে, পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় জিয়াকে সেরকম কিছুই করতে হয়নি। তবে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তিনি নিশ্চয়ই উদগ্রীব ছিলেন না। এটাও ভাবা ঠিক নয় যে জিয়া একজন সামরিক অফিসার হয়ে সরাসরি এমন কোন ব্যবস্থা কায়েম করবেন যাতে দেশ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা এবং অবস্থান ক্ষুণ্ন বা দুর্বল হয়। সুতরাং আমরা যারা তখন জিয়ার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম—মশিউর রহমান (যাদু মিয়া), জেনারেল নূরুল ইসলাম এবং আমি—আমাদের এই বাস্তবতা এবং মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা মনে রেখে কাজ করতে হয়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে জিয়াউর রহমান যতখানি এগিয়ে আসতে রাজি হয়েছিলেন, আমাদের মতে সেটাই যথেষ্ট ছিল। আওয়ামী লীগ-জাসদসহ সকল রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা, বিরোধী দল ও সংবাদপত্রকে সরকার এবং তাঁর সমালোচনা করার পূর্ণ অধিকার দান করার বিষয়গুলোই ছিল দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার প্রধান শর্ত। ঐসব ব্যাপারে তাঁর উদার সম্মতি ছিল। আর তাই সাংবিধানিক রূপরেখা তৈরি করতে আমাদের তেমন কোন অসুবিধা হয়নি।

স্বাভাবিকভাবেই জিয়া প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সামরিক বাহিনীর কোন ভূমিকা রাজনীতিতে থাকবে না এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল। শেষোক্ত সিদ্ধান্তের কারণে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে তেমন কোন বড় বাধা আর থাকল না। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন প্রেসিডেন্ট এবং একটি পার্লামেন্টের মাধ্যমে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং গণতন্ত্র দুটোই বজায় রাখা সম্ভব বলে মনে হয়েছে। এজন্য যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং শ্রীলংকার সংবিধান গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট জিয়া আমার মতামতের ওপরই বেশি নির্ভর করেছেন। নতুন রাজনৈতিক পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্টের মধ্যে ভারসাম্য এবং ক্ষমতা

www.pathagar.com

বন্টনের মাধ্যমে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। পার্লামেন্টে যাই হোক না কেন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের অফিসের মাধ্যমে এই গরিব দেশের উন্নয়ন কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়। একটি প্রেসিডেন্ট শাসিত গণতান্ত্রিক এমন একটি শাসন পদ্ধতির কথা ভাবা হয়েছিল অর্থাৎ ফ্রান্স ও আমেরিকার মত একটি গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ফ্রান্সের পদ্ধতিকে বেশি বিবেচনায় রাখা হয়েছিল। তবে সংসদীয় পদ্ধতির গুণগত মান এবং লক্ষ্যকে তাই বলে অনুপযোগী মনে করে একেবারে উপেক্ষা করা হয়নি। তখনও দেশে কার্যকরভাবে কোন পার্টি পদ্ধতির (party system) বিকাশ ঘটেনি। ইতোপূর্বে আওয়ামী লীগ দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য অভূতপূর্ব সুযোগও পেয়েছিল। চরমভাবে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্য হিসেবে সংসদীয় ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বর্জন করা সমীচীন মনে হয়নি। লক্ষ্য ছিল পার্লামেন্টকে ধীরে ধীরে আরো শক্তিশালী করে এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্টকে পার্লামেন্টের অধীনে বা পার্লামেন্টের কাছে প্রত্যক্ষভাবে জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসা। এই ধরনের আদর্শিক চিন্তাভাবনার আলোকেই দেশ পরিচালনার জন্য একটি গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সাংবিধানিক কাঠামো তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এইভাবে জিয়া ক্রমশ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রাজনৈতিক কৌশল ঠিক করেন। (১) শাসনকার্য পরিচালনা থেকে সামরিক বাহিনীকে দূরে রাখলেন; (২) দেশে ভারতবিরোধী শক্তিদের উৎসাহ দিলেন এবং দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থীদের সমন্বয়ে রুশ-ভারতবিরোধী মেরুকরণ সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ ডান-বাম, মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ সকলকে নিয়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্লাটফর্ম তৈরি করলেন; (৩) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদিও ব্যক্তিপুঁজি এবং ব্যক্তিমালিকানার গুরুত্ব বৃদ্ধি করলেন এবং পুঁজিবাদ বিকাশে সহায়তা করতে চাইলেন, কিন্তু জাতীয়করণকৃত বিরাট সেক্টরটিও রেখে দিলেন; (৪) রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে check and balance সৃষ্টির জন্য প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্ট দুটোই রাখলেন। গণতন্ত্রের ওপর যেমন জোর দিলেন, তেমনি স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যবস্থাও করলেন; (৫) সকল বিষয়ে তিনি ভারসাম্য বজায় রাখার একটি নীতি গ্রহণ করেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সেই নীতি অনুসরণ করেছেন। রাজনৈতি, অর্থনৈতিক, সামাজিক কোন ক্ষেত্রেই তিনি কোন চরমপন্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। সর্বক্ষেত্রে মধ্যমপন্থার একটি নীতি অনুসরণ করেন। সামরিক বাহিনীকে রাজনীতিতে জড়ালেন না, কিন্তু তাদের প্রয়োজন এবং স্বার্থের ব্যাপারে সজাগ ছিলেন এবং সেদিকে ভাল নজর রাখতেন। মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা, ডান-বাম বা স্বাধীনতার পক্ষে-বিপক্ষে কোন দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েননি। দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং গণতন্ত্র দুটোকেই অর্জন করার জন্য একদিকে যেমন অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে এককক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট রাখলেন, অন্যদিকে প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী করলেন। আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখেন, কোন চরমপন্থা গ্রহণ করেননি। মোটকথায় রাজনৈতিক টার্মিনলজিতে তিনি ছিলেন একজন মধ্যপন্থী বা Centrist—জিয়ার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডে তারই প্রতিফলন

www.pathagar.com

ঘটেছে। জিয়ার উত্থান-পতন, ভালমন্দ, সফলতা আর ব্যর্থতা সবকিছুই তাঁর মধ্যপন্থা এবং ভারসাম্যের রাজনীতির ওপর গড়ে ওঠে।

মোটামুটি এইভাবে কতগুলো নীতিনির্ধারণী দিক্‌নির্দেশনা স্থির করে জিয়া এগিয়েছেন। জাগদল করার পরই জাতির কাছে তাঁর প্রতিশ্রুত ফ্রন্ট করার জন্য আমরা আরো বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়াস হই এবং দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা এবং দলের সাথে এজন্য দীর্ঘদিন ধরে বৈঠক করি। শেষ পর্যন্ত ছয়টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট তৈরি হয়। এরা হলো জাগদল, মশিউর রহমানের (যাদু মিয়া) নেতৃত্বাধীন ন্যাপ, কাজী জাফরের নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, শাহ আজিজের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ, মাওলানা মতিনের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লেবার পার্টি এবং রশরাজ মণ্ডলের সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন। যদিও এককভাবে জিয়ার শক্তি তখন যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তবুও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কারণে জিয়া একটি ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন তৈরি করতে চেয়েছিলেন। ন্যাপ মোটামুটি শক্তিশালী সংগঠন ছিল। ইউপিপি ছোট হলেও সারা দেশে তাদের সংগঠন ছিল, আর এরা ছিল রুশ-ভারতবিরোধী চীনপন্থী বাম গণতান্ত্রিক সংগঠন, তাই এদের সঙ্গে নেয়ায় জিয়ার রাজনৈতিক শক্তি যে অনেক বৃদ্ধি পায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শাহ আজিজকে নেয়া হয়েছিল শুধু মুসলিম লীগের নামটা জড়ানোর জন্য। জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশুর পরামর্শে শাহ আজিজকে দিয়ে তাই মুসলিম লীগ আবার ভাঙা হলো, কিন্তু মুসলিম লীগের হাতেগোনা দুচারজন লোক ছাড়া সবুর সাহেবকে ছেড়ে শাহ আজিজের সাথে আর কেউ এলো না। তবুও জিয়ার ঐক্য আর ভারসাম্যের রাজনীতির জন্য মুসলিম লীগের দরকার ছিল, বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে মসুলিম লীগ একটি পুরোনো পরিচিত নাম বলে। একই দৃষ্টিভঙ্গিতে সংখ্যালঘুদের সম্পৃক্ত করার জন্য মশিউর রহমান (যাদু মিয়া) রশরাজ মণ্ডলকে নিয়ে আসলেন। রাজনৈতিকভাবে লেবার পার্টির কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু দলের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য মাওলানা মতিনকে জড়িত করা হলো।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর dynamics-এর কারণেই হোক, আর তাদের maturity-র অভাবের জন্যই হোক—এর একটি দিক হলো যে এদেশের ঐক্যের রাজনীতি অনেক অনৈক্যও সৃষ্টি করে। ক্ষমতার রাজনীতিতে আবার ক্ষমতার বাইরের রাজনীতি—উভয় ক্ষেত্রেই কথাটি প্রয়োজ্য। জিয়ার এই ঐক্যের প্রক্রিয়ায় ন্যাপ, ইউপিপি, মুসলিম লীগ এবং লেবার পার্টি অর্থাৎ ছোট বড় সব দলই নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফ্রন্ট করার আলোচনাকালেই কাজী জাফরের অনেক পুরোনো সাথী রাশেদ খান মেনন আর হায়দার আকবর খান রনো নীতিগত পার্থক্যের জন্য জিয়ার সাথে ফ্রন্টে যোগ দিতে রাজি হলেন না। তাঁরা ইউপিপি ছেড়ে চলে গেলেন। শাহ আজিজ মুসলিম লীগ ভেঙে এসে ফ্রন্টে যোগ দিলেন। মশিউর রহমানের (যাদু মিয়া) সাথে দ্বিমত পোষণ করে আনোয়ার জাহিদ, নূরুর রহমানরা বেরিয়ে গিয়ে আর একটি ন্যাপ তৈরি করলেন, লেবার পার্টিও পরে ভেঙে গেল আব্দুর রউফের নেতৃত্বে।

www.pathagar.com

আমাদের সাংবিধানিক কাঠামো অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে একটি পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু তার আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দিল। যদিও জিয়া মাত্র কয়েক মাস আগে গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, কিন্তু তিনি জানতেন তাঁর সেই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তাই দেশে এবং বিদেশে তাঁর অবস্থানকে বৈধ করতে হলে তাঁকে উন্মুক্ত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিরোধী দলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হতে হবে। এজন্য ১৯৭৮ সালের ৩ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং ডিসেম্বরে পার্লামেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। জেনারেল এমএজি ওসমানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ১৯টি রাজনৈতিক দল ঐক্যজোট নামে মোর্চা তৈরি করে জিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। ওসমানীর কর্মসূচির মধ্যে একটি মুখ্য বিষয় ছিল যে নির্বাচিত হলে তিনি দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন। ঐক্যজোট নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ায় জিয়ার জন্য ভাল হলো। বিশেষ করে দেশের বৃহত্তম বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন বলে পরিচিত আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য দল নির্বাচনে অংশ না নিলে জিয়ার সাংবিধানিক কাঠামোই শুধু নয়, পুরো নির্বাচনই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থহীন হয়ে পড়তো। সেই গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নটা আবার এসে যেত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিপর্যয় নেমে আসে। মূলত দলকে আবার পুনরুজ্জীবিত করার জন্যই আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফ্রন্ট এবং জোটের মধ্যেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং জিয়া বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। ওসমানী আরো কয়েক লক্ষ ভোট বেশি পেতেন, কিন্তু আওয়ামী লীগের কর্মীরা শেষের দিকে তাঁর জন্য তেমনভাবে আর কাজ করেনি।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ আরো খোলামেলা হয়ে ওঠে। আমরা ছয়টি দলকে একত্র করে একটি নতুন রাজনৈতিক দল করার উদ্যোগ নেই, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় ইউপিপি আবারো দ্বিখণ্ডিত হয়। নির্বাচনে ফ্রন্ট যেভাবে ছিল সেইভাবে রেখে কাজী জাফর আসন্ন পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাঁর দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে রাজি ছিলেন না। এদিকে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতাম যে, ফ্রন্টের উদ্যোগে নির্বাচন করার পর জোটভুক্ত দলগুলো নিজেদের শক্তি এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে, ফলে ফ্রন্ট এবং নির্বাচনী ঐক্য ভেঙে যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি নির্বাচনে কোন দলের সঙ্গে আঁতাত করার বিরুদ্ধে ছিলাম। দলীয় শৃঙ্খলা এবং ক্ষমতা স্থিতিশীল রাখার জন্য আমরা দলভিত্তিক সংসদীয় নির্বাচন করার পক্ষে ছিলাম। জিয়া যদি কোন ব্যাপারে একবার মনস্থির করতেন সেটা তিনি অবিকলভাবে কার্যকর করতেন। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতির উদ্দেশে ভাষণদানকালে ফ্রন্ট করার কথা বলেছিলেন বলে অনেক অসুবিধা এবং বাধা থাকা সত্ত্বেও জাগদল ভেঙে সেই ফ্রন্ট তৈরির ব্যাপারে তিনি অটল থাকেন। ফ্রন্ট তৈরির সময় সব শরিক দলকে নিয়ে যে মূল রাজনৈতিক দলকে দাঁড় করানো হবে সেটা আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। শুরুতেই আমরা সব দল নিয়ে মূল দল গড়তে পারতাম, কিন্তু যেহেতু তিনি ফ্রন্টের কথা

www.pathagar.com

আগে বলে ফেলেছিলেন, তাই আমাদেরকে একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে সব কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। যাই হোক কাজী জাফর কিছুতেই নিজ দলকে বিলুপ্ত করতে রাজি হলেন না। তিনি নিজ দলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নীতিগত কারণেই মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর দলের চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম এবং অন্য একজন সহচর কর্নেল আকবর হোসেন তা না করে জিয়ার সাথে থেকে গেলেন। কাজী জাফর ফ্রন্ট করার আগে মেননদের হারালেন, আর এখন নতুন করে আরো কিছু সহকর্মী হারাতে হলো, কিন্তু তারপরও কাজী জাফর তাঁর নীতিতে অটল থাকলেন।

যাদু মিয়া ছিলেন একজন নির্ভীক ব্যক্তিত্ব। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক পরিষ্কার। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জিয়ার দেয়া সুযোগ পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যদিও এই প্রশ্নে দুচারজন কর্মী তাঁর দল ছেড়ে যান, তারপরও তিনি মওলানা ভাসানীর রেখে যাওয়া সর্ববৃহৎ সংগঠনকে মুলতবি ঘোষণা করে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করেন। দেশের নতুন সাংবিধানিক কাঠামো তৈরির ব্যাপারে যদিও তিনি পুরোপুরি খুশি ছিলেন না, কিন্তু তিনি দেশের বৃহত্তর আঙ্গিকে সমস্যাগুলোকে দেখতেন। দেশ থেকে সামরিক শাসন তুলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করাই ছিল তখন প্রধান লক্ষ্য। তিনি ঐ লক্ষ্যে শামিল ছিলেন এবং দেশের গণতন্ত্রায়নে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই নতুন রাজনীতির মাধ্যমে তিনি তাঁর দলীয় নেতা এবং কর্মীদের জন্য নতুন করে প্রাসঙ্গিকতা, মর্যাদা এবং জাতীয় ভূমিকা এনে দিয়েছিলেন। এতে করে দুই যুগ ধরে নির্যাতিত তাঁর দলের হাজার হাজার কর্মীর মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে। তাঁর লক্ষ্য ছিল দেশের বৃহত্তর এবং ব্যাপকতর জাতীয় রাজনীতিতে প্রগতিশীল শক্তির রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করা। যদি মশিউর রহমানের অকাল মৃত্যু না ঘটত তাহলে তিনি শুধু যে প্রধানমন্ত্রী হতেন তা নয়, যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি জিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে ছিলেন সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ারই অনেক বেশি সম্ভাবনা ছিল। মশিউর রহমান (যাদু মিয়া) social dynamicsটা অনেক ভাল বুঝতেন।

যাই হোক ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে জিয়ার নেতৃত্বে আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠা করি। দলের ঘোষণাপত্রে একটি মধ্যপন্থী কিন্তু প্রগতিশীল নীতির প্রতিফলন ঘটানো হয়। এই দলের ঘোষণাপত্র এবং গঠনতন্ত্রের প্রথম খসড়া তৈরি করার দায়িত্ব আমার ওপর ছিল। ঠিক এ সময়টাতে আওয়ামী লীগসহ বেশ কিছু দল সাধারণ নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেয়। তারা নানা দাবি তোলে, এসব দাবির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে সামরিক শাসন তুলে নিতে হবে আর রাজবন্দিদের ছেড়ে দিতে হবে। ডান-বাম সব রাজনৈতিক দলেরই কিছু না কিছু দাবি ছিল। অনেকে নির্বাচন পেছানোর দাবিও তোলেন। তবে আওয়ামী লীগসহ বেশিরভাগ দল জিয়ার প্রণীত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করে এবং সাংবিধানিক কাঠামোর পরিবর্তন চায়। অনেকে সংসদীয় রাজনীতির কথা বলে, আবার

www.pathagar.com

কেউ কেউ প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিকেই আরো গণতান্ত্রিক করার অর্থাৎ পার্লামেন্টের ক্ষমতা আরো বাড়ানোর জন্য মত প্রকাশ করে। যাই হোক নির্বাচনের আগেই সামরিক শাসন তুলে নেয়ার ব্যাপারটি ছিল এখানে মূল কথা। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর সমস্ত দুর্বলতাও এ সময় ধরা পড়ে। সকলেই নির্বাচনের তারিখ পেছানোর জন্য দাবি তোলায় এটি প্রমাণ হলো যে, নির্বাচনের জন্য তারা প্রস্তুত হতে পারেনি। এ অভিজ্ঞতা এখানে নতুন নয়। সারা বছর নির্বাচন আর গণতন্ত্রের জন্য বিভিন্ন দলের মিছিল, সভা, বিবৃতির অন্ত থাকে না, কিন্তু যখনই নির্বাচন দেয়া হয় তখনই বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল পিছু হটে যায়। তার প্রধান কারণ হলো দুয়েকটি দল ছাড়া বাকি দলগুলোর জনসমর্থনের অভাব। নির্বাচন হলেই তো তাদের শক্তি ধরা পড়ে যায়, তাদের গুরুত্ব কমে যায়। জনসমক্ষে তাদের আর কোন দাম থাকে না।

সামরিক শাসন যদিও দেশে ছিল কিন্তু তার কোন প্রয়োগ তখন আর ছিল না। বিষয়টি সকল রাজনৈতিক দলই জানত। সামরিক আইন তখন একটি আইনি আচ্ছাদন বা (legal cover) ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তবুও সামরিক শাসন তুলে দেয়ার দাবিটা মোটেও অসঙ্গত ছিল না। এর একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক ছিল, যাকে অবহেলা করা যায় না। মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ মানুষের মনে আস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সামরিক আইন অবশ্যই একটি অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে, এবং বিরুদ্ধবাদীরা ব্যাপারটিকে মাথার ওপর তরবারি ঝুলিয়ে রাখার অবস্থার মত বর্ণনা করে। যাই হোক, আইনগত জটিলতার কারণে, সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ এবং জিয়ার নিজস্ব অবস্থানগত দৃষ্টিকোণ থেকে সামরিক আইন তুলে নেয়ার ব্যাপারে আমরা রাজি হইনি। পার্লামেন্ট নির্বাচনের আগে সামরিক আইন তুলে নিলে সাংবিধানিক শূন্যতা দেখা দিতে পারে এই যুক্তিটা একেবারে ফেলে দেয়ার মত ছিল না। যেহেতু আইন করার সমস্ত ক্ষমতা পার্লামেন্টের ওপর ন্যস্ত ছিল এবং যেহেতু সংবিধানকে সংশোধন করে নির্বাচন হচ্ছিল, সেইজন্য পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আইনই ছিল সকল আইন তৈরির ক্ষমতার উৎস। সুতরাং আইন করার ক্ষমতার অন্য একটি উৎস সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ নির্বাচিত পার্লামেন্ট ব্যতিরেকে বিদ্যমান আইন তুলে নেয়া টেকনিক্যাল কারণে সম্ভব ছিল না। কোন কারণে পার্লামেন্ট নির্বাচন স্থগিত বা বাতিল হয়ে গেলে দেশে সাংবিধানিক শূন্যতা আরো প্রকটভাবে দেখা দিত এবং ঐ শূন্যতাপূরণে আবারো সামরিক আইন জারি করতে হতো।

আলোচনার এক পর্যায়ে নতুন পার্লামেন্ট না হওয়া পর্যন্ত একটি আইনি আচ্ছাদন হিসেবে সামরিক আইন বহাল রাখার যুক্তি বিরোধী দলগুলো গ্রহণ করতে রাজি হয়, তবে তারা সামরিক আইন তুলে নেয়ার একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ দাবি করতে থাকে এবং অল্পদিনের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য পল্টনে একটি জনসভায় ঐ তারিখ ঘোষণা দিতে বলে। প্রেসিডেন্ট জিয়া এ ধরনের কোন তারিখ দিতে রাজি ছিলেন না। আমি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দেনদরবার করতে থাকি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হই, তিনি সভা অনুষ্ঠানের দিনে এ বিষয়ে ঘোষণা দিতে রাজি হলেন।

www.pathagar.com

ফলে পল্টন ময়দানের এক বিরাট জনসভায় জিয়া পার্লামেন্ট বসার ৭ দিনের মধ্যে সামরিক আইন তুলে নেয়ার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পর আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি প্রায় সব দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে সম্মত হয়। এই ঘোষণা আদায়ের ব্যাপারে জাসদ নেতৃবৃন্দ মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

আমাদের রাজনৈতিক কৌশল ছিল সকল রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানো, বিশেষ করে প্রধান রাজনৈতিক দল এবং নেতাদের। কারণ তা না হলে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা যে থাকে না সেটা জিয়াও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়ায় তাঁকে অসম্ভব ধৈর্য এবং অনেক ক্ষেত্রে ছাড় দিতে হয়েছে এবং কোথাও কোথাও আপোস করতে হয়েছে। আ. স. ম. আব্দুর রব এবং আর অন্য দুচারজন ছাড়া জাসদের প্রায় সকল নেতাকর্মীকে মুক্তি দেয়া হয়। রবকে চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠানো এবং নির্বাচনের পর ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর চাপে নির্বাচনের তারিখ দুবার পেছানো হয় এবং সাংবিধানিক কাঠামোতে প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টারি নেতাও হবেন এ ধরনের অনেক ছোট বড় দাবি মেনে নিতে হয়। যখন একে একে প্রায় সব দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা ঘোষণা করল তখন আওয়ামী লীগের নির্বাচন বয়কট করার আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। ততদিনে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচনের প্রতীক বিতরণের তারিখ ঘনিয়ে আসে। বিভিন্ন দরকষাকষি এবং বোঝাপড়া শেষ করার পর প্রতীক সংগ্রহ করার জন্য আর মাত্র তিন দিন বাকি ছিল। দেশের সর্ববৃহৎ বিরোধী দল আওয়ামী লীগ তখনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে রাজি হয়নি। অথচ আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচনে যোগদান না করে তাহলে ঐ নির্বাচন তেমন অর্থপূর্ণ হবে না, সেটা আমরা জানতাম।

কিন্তু অনুন্নত দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের মত গরিব দেশে নির্বাচন সবসময় একটি জনপ্রিয় বিষয় বলে পরিগণিত হয়েছে। নির্বাচন বর্জন করার কোন আন্দোলন এদেশে কোনদিন সফল হয়নি। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচন থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে—যে কোন ধরনের নির্বাচন, এমনকি মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে নির্বাচনও এদেশে অনেক উৎসাহ উত্তেজনার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের মানুষের ঐতিহ্য, অভ্যাস এবং সচেতনতা ছাড়াও আরো দুয়েকটি বিশেষ কারণ আছে যেগুলো খুব অপ্রাসঙ্গিক নয়: (১) নির্বাচন এলে দেশে বিশেষ করে গ্রামের অবহেলিত মানুষের একটু গুরুত্ব বাড়ে। তাদের কাছে সবাইকে ছুটতে হয়, তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে কথা বলতে হয়, টাকা-পয়সার কিছু ছড়াছড়ি হয়। একটি লুঙ্গি, গেঞ্জি বা এক কাপ চা বা মিষ্টি কয়েকদিনের জন্য হলেও তাদের জীবনে আসে। তাদের একঘেয়ে জীবনে নির্বাচন আনে বৈচিত্র্য এবং নতুন স্পন্দন; (২) দেশের বিরাট যুব সমাজ—যার প্রায় সবটাই বেকার—অল্প কিছুদিনের জন্য হলেও এদের একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। কয়েক মাস অন্তত তাদের আহারের একটি ব্যবস্থা হয়, অনেকে রাজনৈতিক কাতারেও স্থান করে নিতে পারে। এদের অনেকে হয় নির্বাচনে অংশ নেয় বা কাউকে সমর্থন করে, এই উপলক্ষে অনেকের টাকা-পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা হয়। সংগঠনের নামে এবং রাজনীতির সুবাদে চাঁদা সংগ্রহ করে অনেক

www.pathagar.com

ছোট ছোট রাজনৈতিক দলের কিছু অর্থ উপার্জনও হয়। এই সামাজিক দিকগুলো অবহেলা করার কোন উপায় নেই। এগুলো সমাজের বাস্তবতা, যে দেশে প্রায় দুকোটি কর্মক্ষম ব্যক্তি বেকার সেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে তারা যদি তাদের জীবন বা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাতে দোষের কি থাকতে পারে; (৩) এছাড়াও আর একটি প্রধান কারণ হলো, শত বঞ্চনা এবং অতীতের বিশ্বাসঘাতকতার শিকারে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন এলে তাদের মনে আশার সঞ্চার হয়। তারা আবার স্বপ্ন দেখার সুযোগ পায়—তারা স্বপ্ন দেখে নির্বাচনের পর তাদের জীবনে দারিদ্র্যের গ্লানি ঘুঁচবে, তাদের ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা হবে, ইত্যাদি। নির্বাচনে বিজয়ীরা তাদের জন্য এবার হয়তো কিছু একটি করবে—তাদের মনে এই আশাটা জাগা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ সব রাজনৈতিক দল এবং দলের নেতারা গরিব মানুষের ভাগ্যের উন্নতির কথাই তো বলে। এইসব কারণে নির্বাচন একটি জনপ্রিয় ঘটনা বাংলাদেশের মানুষের জীবনে, তাই নির্বাচন বর্জনের আন্দোলন সাধারণত সফল হয় না। একদল না করলে আরো দশটা দল থাকবে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য। বর্জনের জন্য এ ধরনের পুরোপুরি জাতীয় ঐক্য এবং নেতৃত্ব আমরা এখনো দেখিনি। তবে ১৯৭০ সালে শেখ মুজিব যদি বয়কটের ডাক দিতেন কি হতো বলা মুশকিল। আমার ধারণা সেটাও ভুল হতো এবং সফল হতো না। অন্যান্য দল বর্জন করত না। ন্যাপ, মুসলিম লীগ ময়দানে থেকেই যেত। এরপরও কথা থেকে যায় যে কোন জাতীয় নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল যদি অংশগ্রহণ না করে, বয়কট সফল হোক আর না হোক, সেই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাবে।

যাই হোক ১৯৭৯ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে বাকি সব দল যখন অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ তখন বেকায়দায় পড়ে। এমনকি তাদের পুরোনো সাথী সংগঠন মস্কোপন্থী ন্যাপ এবং কমিউনিস্ট পার্টিও অনেক আগেই নির্বাচনে অংশ নেয়ার কথা ঘোষণা করে। জনগণ যেমন নির্বাচন পছন্দ করে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যও নির্বাচনে অংশ নেয়ার কতগুলো নিজস্ব কারণ থাকে, যেমন (১) নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের কর্মী এবং সংগঠনকে কর্মব্যস্ত রাখা যায়—এটি একটি রাজনৈতিক দলের জন্য খুবই প্রয়োজন। তা না হলে কর্মীরা হতাশ হয়, হারিয়ে যায়, সংগঠন তাজা রাখা যায় না। নির্বাচনকে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে ধরে নেয়া হয়; (২) নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের কাছে বিভিন্ন প্রচারাভিযানের মাধ্যমে সহজে পরিচিত হওয়া যায়। ছোট বড় সব রাজনৈতিক দলের কথাই খবরের কাগজে লেখা হয়, গ্রামে গ্রামে রীতিমত প্রতিযোগিতা করে নিজেদের সংগঠনের প্রচার চলে, সভা সমিতি হয়। জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য নির্বাচন একটি বিরাট instrument হিসেবে কাজ করে; (৩) আরো বড় কথা হলো, নির্বাচনে অংশ না নিলে দল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক স্রোত, জাগরণ এবং দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যাওয়ার অনেক ঝুঁকি থাকে। তাই কোন বড় দলকে যদি নির্বাচন বর্জন করতে হয় তাহলে তাদের বসে থাকলে চলবে না। তাদের কর্মী এবং সংগঠনকে কর্মব্যস্ত

www.pathagar.com

রাখার জন্য এবং জনগণকে তাদের বর্জন করার পক্ষে রাখার জন্য তখন নতুন কর্মসূচি দিতে হয়। এই ধরনের কর্মসূচি তখন উগ্র এবং চরম আকার ধারণ করতে পারে, ভায়োলেন্স বা সংঘাতের দিকে যেতে পারে। সেরকম অবস্থার পরিণতি নিয়ন্ত্রণ বা ঐ অবস্থা ধরে রাখার ক্ষমতা সে দলের আছে কিনা সেটাও বিবেচনা করে দেখতে হয়। জনগণ তাদের সেই বর্জনে কতটুকু সাড়া দেবে, সংঘাতের প্রতিক্রিয়া সমাজ এবং জনগণের কাছে কি আকার ধারণ করবে সেটাও তাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়। অর্থাৎ নির্বাচন বর্জন যদি সফল করা না যায় তাহলে বর্জন যে কোন বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের জন্য হিতে বিপরীত বা counter-productive হতে পারে। এ ব্যাপারে যে কোন হঠকারী সিদ্ধান্ত দলকে রাজনৈতিকভাবে অনেক পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

শ্রেণীগত চরিত্রের কারণে আওয়ামী লীগ একটি নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল। তাই আওয়ামী লীগ বোধহয় এসব চিন্তা করেই নির্বাচনের প্রতীক বিতরণের দুই দিন আগে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা ভাবে। তাদের প্রস্তুতি ছিল, তারা জানত তাদের বয়কট কিছুতেই সফল হবে না। একটি জনপ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে ভোট বর্জন সফল করা আরো কঠিন। তাছাড়া বাকি সমস্ত দলই ততদিনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আওয়ামী লীগ সভাপতি মালেক উকিল সাহেব প্রেসিডেন্ট জিয়াকে টেলিফোন করে অনুযোগের সাথে বলেছেন যে সরকার তাহলে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়েই নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে? জিয়াউর রহমান কেন জানি আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে আর উৎসাহ দেখাতে চাননি। তিনি ভেবেছেন সব দলই যখন নির্বাচন করবে তখন আওয়ামী লীগ না করলে ভালই হবে। ওরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে—আর ওরা যদি নির্বাচন বর্জন করে সংঘাতে যায় তাহলে আরো ধিকৃত হবে। সে সময় জনগণের মুড ছিল অন্য রকম, কোনমতেই তা আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিল না। কোন রকমের সংঘাত বা বিশৃঙ্খলা আওয়ামী লীগকে অনেক পেছনে নিয়ে যেতে বাধ্য। এতে তাদের জনপ্রিয়তা আরো নিচে নেমে যাবে। জিয়াউর রহমান মালেক উকিল সাহেবকে আমার সাথে যোগাযোগ করার কথা বলে নিজে আর ওনার সাথে কথা বাড়াননি।

এর পরপরই মালেক উকিল সাহেব এবং আরো দুজন নেতা আমার সরকারি বাসায় এলেন। তাঁরা দাবি করলেন নির্বাচনের আগেই সামরিক আইন তুলে নেয়া হোক, নির্বাচনের তারিখ আর এক দফা পেছানো হোক, আর সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের নেতাদের মুক্তি দেয়া হোক। এই ছিল তাঁদের মূল দাবি। দীর্ঘ আলোচনা হলো। প্রেসিডেন্ট জিয়া সেদিন টাঙ্গাইল গেছেন জনসভা করতে। টেলিফোনে কথা বললাম, জিয়া তখনো আওয়ামী লীগের সাথে আপোস করতে একদম নারাজ। তাই তাঁকে আবারও নতুন করে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের যোগদানের আবশ্যকতা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতে হলো। তিনি বুঝতে নারাজ। তাঁর স্ট্রাটেজি ছিল আওয়ামী লীগকে জব্দ করা—দেশের রাজনীতির মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা। তাঁকে আবার নতুন করে বোঝাতে হলো, যদিও অন্য সব দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার প্রতিক্রিয়া হবে অন্য রকম। দেশে এবং বিদেশে সকলেই জানে, আওয়ামী লীগই দেশের বৃহত্তম বিরোধী দল; সরকারি দলকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা একমাত্র এ দলেরই রয়েছে; অন্য সব দল মিলেও তার সমকক্ষ হয় না। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ না নিলে তাদের প্রভূত ক্ষতি হবে ঠিকই, কিন্তু সরকারেরও তাতে কোন লাভ হবে না। নির্বাচনে অংশ নিলে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতো এই দাবিটা প্রোপাগান্ডা হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। মানুষের মনেও ও রকম একটি ধারণা থেকে যেতে পারে। তাছাড়া নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নটা তো থেকেই যাবে।

টাঙ্গাইল থেকে ফিরে আলোচনার এক পর্যায়ে জিয়া পুরোনো গণভবনে এলেন। মাঝে মাঝে নেতাদের বসিয়ে রেখে টেলিফোনে বা ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে জিয়ার সাথে আলোচনার অগ্রগতি নিয়ে কথা বলেছি। যাই হোক তিনি শেষ পর্যন্ত যুক্তিগুলো গ্রহণ করলেন। অন্যদিকে অনেক কষ্ট করে যুক্তি দিয়ে তর্ক করে আওয়ামী লীগ নেতাদের বোঝালাম যে, সামরিক আইন তুলে নেয়া সম্ভব নয়, তবে নির্বাচনের কোন ব্যাপারে এর কোন প্রয়োগ হবে না এতে তাঁরা নিশ্চিত থাকতে পারেন। ছাউনির কারণেই সাংবিধানিক শূন্যতার এত বড় ঝুঁকি প্রেসিডেন্ট জিয়ার পক্ষে নেয়া সম্ভব নয়। নির্বাচনের তারিখের ব্যাপারে বললাম যে, এর মধ্যে দুবার নির্বাচনের তারিখ পেছানো হয়েছে। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারিতে আনা হয়েছে। আরো একবার নির্বাচনের তারিখ পেছালে সরকারের কোন ইজ্জত থাকে না। সরকারের ওপর মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হবে। নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য যতটা সম্ভব অনুরোধ করে তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি, নির্বাচনে অংশ না নিলে তাদের কি কি ক্ষতি হবে। রাজবন্দিদের ব্যাপারে মালেক সাহেব একটি কাগজে ১১টা নাম দিলেন— আগে থেকে তৈরি করাই ছিল। সব নাম এখন মনে নেই। এগারোজনের মধ্যে আব্দুস সামাজ আজাদ এবং শেখ আজিজ ছিলেন। প্রেসিডেন্ট আমাকে তিনজনকে মুক্তি দেয়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু মালেক উকিল আমাকে আমাদের শোয়ার ঘরে নিয়ে অন্তত পাঁচজনকে মুক্তি না দিলে তাঁর ইজ্জত এবং নেতৃত্ব থাকবে না বলে জানালে আমি রাজি হয়ে গেলাম। আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর পরিবর্তে এই ছাড় কিছুই না। অতি সামান্য। জিয়াউর রহমানের সাথে আলোচনা না করেই আমি রাজি হয়েছিলাম। এই পাঁচজনের মধ্যে সামাদ সাহেব ছিলেন অসুস্থ। কিছুদিন আগে আমি হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে দেখেও এসেছি। কিন্তু পাঁচজনের ব্যাপারে আমি কথা দিয়ে ফেলেছি জেনে প্রেসিডেন্ট আর আপত্তি করেননি। ঠিক হলো সকালবেলা সূর্য ওঠার আগেই তাঁরা ছাড়া পাবেন এবং এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাথে কোন দরকষাকষি হয়েছে সেটাও আমরা বলব না। আওয়ামী লীগ নিজস্ব শর্তে এই নির্বাচনে অংশ নেবে।

সেদিন ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৯ রাতে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য আওয়ামী লীগ সাংবাদিক সম্মেলন ডাকে। এর পরদিন ছিল প্রতীক বরাদ্দের জন্য নির্ধারিত তারিখ। মালেক সাহেব অনুরোধ করলেন প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁদের একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে, এবং সেটা করতে হবে সাংবাদিক সম্মেলনে যাওয়ার আগেই, যাতে তাঁরা বলতে

www.pathagar.com

পারেন যে তাঁদের দাবিদাওয়া তাঁরা প্রেসিডেন্টের কাছে আবারও উপস্থাপন করেছেন। খুব সময়ও তখন হাতে ছিল না। প্রেসিডেন্টের অন্য কর্মসূচি ছিল। তাঁকে অনেক বলে-কয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি করালাম। সেজন্য অন্য কর্মসূচিটি পিছিয়ে দেয়া হলো। নির্দিষ্ট সময়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বঙ্গভবনে এলেন, আমিও উপস্থিত ছিলাম। কথাবার্তা হলো, চা-নাস্তা খাওয়া হলো, বিদায়ের আগে মালেক সাহেব প্রেসিডেন্ট জিয়াকে বললেন, মওদুদ তো এমনিতেই নির্বাচিত হতে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। প্রেসিডেন্ট ব্যাপারটাকে হেসে হাল্কা করে দিলেন। পরদিন মনোনয়নপত্র দাখিল করার জন্য আমি যখন নোয়াখালী যাওয়ার পথে ফেরীতে, তখন একদল লোক *ইত্তেফাক* এনে দেখালো যে, মালেক সাহেব নিজেই আমার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ঠিক করেছেন। অবাক হয়ে গেলাম। যে ব্যক্তির জন্য এতকিছু করলাম তিনি মনে মনে আমাকে পরাজিত করার এরকম বাসনা পোষণ করছিলেন তা গত ২৪ ঘণ্টা এত কাছে থেকেও বুঝতে পারিনি। একেই বলে রাজনীতি।

মালেক সাহেব দুটো নির্বাচনী এলাকা থেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এজন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে মাশুল দিতে হয়েছিল। আমার নির্বাচনী এলাকায় তিনি প্রার্থী হয়েছিলেন এজন্য যে, তাঁর দলের উদ্দেশ্য ছিল, আমার mobility কমিয়ে দেয়া, যেন আমি দেশের অন্যত্র নির্বাচনী অভিযানে নামতে না পারি। সেদিক থেকে কিছুটা সফল তারা হয়েছিলেন। কিন্তু মালেক সাহেব দুটো নির্বাচনী এলাকাতেই পরাজিত হন। নিজের বাড়ির এলাকাতে যেখানে তাঁর হারার কথা নয় সেখানেও তিনি আমাদের একজন দুর্বল প্রার্থীর কাছে হেরে গেলেন। অথচ উনি যদি শুধু তাঁর নিজস্ব এলাকা থেকে দাঁড়াতেন তাহলে নির্ঘাত জিতে যেতেন। আমি ওনার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য ওনার নির্বাচনী এলাকায় যাব না ঠিক করেছিলাম, কিন্তু পরে আমাকে যেতেই হয়েছে। তিনি আমার এলাকায় প্রায় ৪০ হাজার ভোটে হেরে যান, আর নিজের এলাকায় যদি দুহাজার ভোট তাঁর পক্ষে পড়তো তিনি জিতে যেতেন। নির্বাচনে অন্য সব রাজনৈতিক দলের নেতারা জিতেছেন, এমনকি একেবারে ছোট ছোট দলগুলোর নেতারা পর্যন্ত। যারা আগে কোনদিন বিজয় লাভ করেনি তাঁরাও বিজয়ী হয়েছেন অথচ দেশের বৃহত্তম বিরোধী দলের সভাপতি হয়ে মালেক উকিল সাহেব পার্লামেন্টে আসতে পারলেন না। এইজন্য আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বেশ দুঃখ পেয়েছিলাম। শুধু নোয়াখালীর নয় তিনি তখন একজন দেশবরেণ্য নেতার ভূমিকা পালন করছিলেন। আওয়ামী লীগের একটি কঠিন সময়ে তাঁর দলের সভাপতি হিসেবে একটি বলিষ্ঠ অবদান রেখেছিলেন। নির্বাচনে জিতলে পার্লামেন্টে তিনিই বিরোধী দলের নেতা হতেন।

আওয়ামী লীগকে এইভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ করানোর জন্য দলের অভ্যন্তরে আমি কড়া সমালোচনার সম্মুখীন হই, বিশেষ করে, দক্ষিণপন্থীদের কাছ থেকে। তাঁরা নির্বাচনে জয়লাভ করাকেই বড় বলে মনে করেছিলেন এবং পার্লামেন্টে শুধু ক্ষমতাসীন দলের লোকজনরাই থাকবে এটিই ছিল তাঁদের ইচ্ছা। তাঁরা সকলই নির্বাচনে ওয়াক ওভার

www.pathagar.com

চেয়েছিলেন। তাঁদের কাছে দেশ, জাতি, সরকারের গুরুত্ব ছিল কম। তাই বিরোধী দলগুলোর ভূমিকার মূল্য তাঁরা দিতে রাজি ছিলেন না। জাসদের নেতৃবৃন্দের সাথেও আমি সব দেনদরবার করি মাসের পর মাস। অন্যান্য দল নিয়ে তেমন সমস্যা না থাকলেও আওয়ামী লীগ ও জাসদ এই দুটো দলকে নিয়ে সমস্যা ছিল সবচেয়ে বেশি।

নির্বাচনে সরকার কোন কারচুপির আশ্রয় নেয়নি। অনুন্নত দেশে নির্বাচনের দিন গোলমাল ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, আর এলাকার কোন বিশেষ পক্ষের প্রভাবে কিছু কিছু জাল ভোট দেয়ার চেষ্টা চলে—এটি সব নির্বাচনেই হয়েছে, ১৯৫৪ সালেও হয়েছে। ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগ যে নেক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছিল সেটা নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অনায়াসে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতত কিন্তু তারপরও তারা বিরোধী দলের প্রতি সহনশীলতার পরিচয় দেয়নি। ১৯৭৯ সালে এর ঠিক উল্টো নীতি অনুসরণ করা হয়। পার্লামেন্টে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের আবির্ভাব হোক এটিই ছিল আমাদের কাম্য। বিরোধী দলের সকল নেতাদের প্রতি সম্মান দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রায় সব নেতাই নির্বাচনে জেতেন। দুয়েকজনের ব্যাপারে, যেমন মোহাম্মদ তোয়াহা, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের ব্যাপারে—নিজেদের প্রার্থী হেরে গেলে ক্ষতি নেই—এই মনোভাবও পোষণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ নিজেদের প্রার্থীদের পক্ষে সরকার কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করে নাই। নির্বাচনে সরকারবিরোধী ৯০ জন প্রার্থী সদস্য নির্বাচিত হন। পরে দশজন সরকারি দলে যোগ দিলে বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা ৮০তে দাঁড়ায়, ১৯৩৫ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানে কোন নির্বাচনে এত বড় বিরোধী দল গঠিত হয়নি। আমাদের দেশে সাধারণত নির্বাচনের ফলাফল সবসময় একটি বিশেষ দলের দিকে ঝুঁকে যায় এবং তারাই বিপুল সংখ্যায় জিতে যায়। যাই হোক নির্বাচনের পর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনের ৭ দিনের মধ্যেই ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ দেশ থেকে সামরিক আইন তুলে নেয়া হয় এবং পূর্ণ সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করাতে প্রায় সাড়ে তিন বছর লেগে যায়।

এইভাবে জিয়া একদিকে যেমন দেশে একটি গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনেন, অন্যদিকে নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করেন। একদিকে যেমন সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠন করে মজবুত করেছেন, অন্যদিকে তাদেরকে ক্ষমতার বাইরে রেখেছেন। একদিকে যেমন জিয়া জনগণের সমর্থন আদায় করলেন, অন্যদিকে সামরিক বাহিনী থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসলেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে নিজেকে একটি ঈর্ষান্বিত অবস্থায় নিয়ে যান, যা তৃতীয় বিশ্বের আর কোন সেনানায়ক করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। আফ্রিকা, ল্যাটিন অমেরিকা এবং দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার কোন সামরিক নেতা জিয়ার গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার সমকক্ষ কিছু অর্জন করতে পারেননি। ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো এ ধরনের গণতন্ত্রের ধারে কাছে যাননি, আইয়ুব খান যা করেছিলেন তার প্রতিক্রিয়া ১৯৬৯ সালেই পাওয়া গেছে। মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের

www.pathagar.com

স্বাধীনতা, দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে অবাধে কাজ করার সুযোগ, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্ট, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামরিক বাহিনীকে রাজনীতি এবং ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা—এতকিছু একসাথে কোন সেনানায়ক তার দেশে প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেনি। জিয়া যে populist রাজনীতি করেছেন সেটাও অন্য কোন সামরিক নেতা কোথাও করেনি। যদিও বাংলার জনগণের সাথে শেখ মুজিবের যে গভীর সম্পর্ক ছিল তাঁর সাথে অন্য কাউকে তুলনা করা উচিত হবে না, তারপরও একথা সত্য যে, দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে জিয়া বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে যতটা যাতায়াত করেছেন, মানুষের সাথে যতটা মিশেছেন, শেখ মুজিব ক্ষমতায় আসার পর আর ততটুকু করেননি। ক্ষমতায় থেকে জিয়ার গণসংযোগ সামরিক জগতে নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন ছিল। দেশের মানুষও তাঁকে নিজের করে নিয়েছিল এবং গ্রামদেশে জিয়ার জনপ্রিয়তা এর ফলে আগের তুলনায় আরো সুগভীর হয়।

আগেই বলেছি জিয়ার এই গণতন্ত্রায়ন, এই populist রাজনীতির ব্যাপারে সেনাবাহিনীতে বিরোধ ছিল। যারা জিয়ার বিরোধী ছিল তারা বার বার তাঁর ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করেছে। জিয়া যতই গণতন্ত্রায়নের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, সামরিক বাহিনীর একটি অংশ তাঁর ওপর ততই অসন্তুষ্ট হয়েছে। তারপর ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবরের ঘটনার পর জিয়া যখন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন থেকেই সামরিক এবং বেসামরিক আমলাদের একটি অংশ জিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং চক্রান্ত শুরু করে। রাজনৈতিকভাবে জিয়া যতই তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ততই গভীর হয়েছে। এরা বিভিন্নভাবে জিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। প্রথমত, সামরিক বাহিনীর সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত চাপ অব্যাহত থাকে। বেতন, ভাতা, ছুটি, থাকা-খাওয়ার মান উন্নয়ন, পোশাক পরিচ্ছদের উন্নতি, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন, যোগাযোগ-যন্ত্রপাতি, আনন্দ, বিনোদন ও খেলাধুলার সুবিধা, সেনাবাহিনীর আরো সম্প্রসারণ—এগুলোর চাহিদা বাড়াটা স্বাভাবিক এবং জিয়া এসব ব্যাপারে অনেক কিছুই করেছেন এবং সবসময় সজাগ নজর রেখেছেন। তারপরও এই চাপ অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয়ত, তার ওপর চাপ সৃষ্টি হয় বেসামরিক আর সামরিক অফিসারদের warrant of precedence নিয়ে। জেনারেলদেরকে সেক্রেটারির সমান মর্যাদা দেয়া থেকে শুরু করে তদনুযায়ী অন্য অফিসারদের মর্যাদার মান বাড়ানো—এটি নিয়ে অনেক লেখালেখি, তর্ক-বিতর্ক চলে। চিফ অব স্টাফকে মন্ত্রীর মর্যাদা না হোক ক্যাবিনেট সেক্রেটারির ওপরে স্থান দেয়ার দাবিও ওঠানো হয়। এগুলো নিয়ে আবার বেসামরিক আমলারা কিছুতেই আপোস করতে রাজি হয়নি। এ ব্যাপারে জিয়াও আপোস করেননি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে ভারতে যেরকম আছে সেরকম, একটি ফর্মুলা মেনে চলার চেষ্টা করেছেন। বেসামরিক আমলাদেরকেও অসন্তুষ্ট করার উপায় ছিল না তাঁর। তৃতীয়ত, যেটা নিয়ে বেশ মনকষাকষি হয়েছে সেটা হলো জাতীয় বেতন কাঠামো নিয়ে। সামরিক বাহিনী জাতীয় বেতন কাঠামোর স্তর বিন্যাসে মোটেও খুশি ছিল

www.pathagar.com

না, তাদের অফিসারদের বেতনের তখনকার পর্যায়ের ওপরের ধাপে তোলা এবং তাদের ভাতা ও মানমর্যাদার কাঠামোর পরিবর্তন করার জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে কিন্তু জিয়া এ ব্যাপারে তাদের আলাদা শ্রেণী বা গোষ্ঠী বা আলাদা privileged গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করতে রাজি হননি। সামরিক এবং বেসামরিকদের মধ্যে তাই জাতীয় বেতনের কাঠামো মোটামুটি একই ছিল। চতুর্থত, এরপর আসে বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক অফিসারদের আরো সক্রিয় ভূমিকার প্রশ্ন। বিরোধী দলগুলো জিয়াকে সামরিক ডিক্টেটর হিসেবে আখ্যায়িত করত, তাঁর গণতন্ত্রকে মার্শাল ডেমোক্রেসি বলে তিরস্কার করেছে, জিয়া সুহার্তোর মত দেশটাকে সামরিকীকরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, প্রশাসনে মিলিটারির লোক বসিয়ে সামরিক বাহিনীর হাতেই ক্ষমতা রাখার চেষ্টা করেছেন—এ ধরনের অনেক অভিযোগ তখন করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জিয়া সামরিকীকরণ করেননি বলেই তো তাঁকে এইসব বিরোধিতা মোকাবেলা করতে হয়। প্রথম থেকেই জিয়া কর্মরত জেনারেলদের মন্ত্রী করেননি। কিছু অবসরপ্রাপ্ত অফিসার নিয়ে তিনি ভারসাম্য করার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তাতে যারা অবসর করেননি তারা খুশি ছিলেন না। একবার অবসর করে ফেললে সেই অফিসারের বাহিনীতে আর তেমন গুরুত্ব থাকে না, এটি সবার মত তাঁর বিরোধীরাও জানত। কিন্তু তবুও জিয়া সেইভাবেই ভারসাম্য করার চেষ্টা করেছেন। তিনি কর্মরত জেনারেলদের মন্ত্রিসভায় নেয়ার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। সবচেয়ে বড় যে দ্বন্দ্ব বাধে সেটা হলো চাকরিরত সামরিক অফিসারদের বেসামরিক প্রশাসনে তাদের র‍্যাঙ্ক এবং সামরিক সুবিধাদি বজায় রেখে আত্তীকরণ করা নিয়ে। অর্থাৎ বেসামরিক পদের ক্ষমতা ও সুবিধাদি ছাড়াও সামরিক সুবিধাদি যেমন রেশন বা বাড়ি ভাড়ার উচ্চ সুবিধা এসব তাঁরা পেতে থাকেন। তারপর তাঁদের পদোন্নতির ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর নিয়ম অব্যাহত থাকে এবং সামরিক বাহিনীর চাকরিতে যখন খুশি ফিরে যাওয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে। থাইল্যান্ডে অনেক দিন যাবৎ এই ব্যবস্থা ছিল এবং ইন্দোনেশিয়ায় এটি তখনো চলছে। জিয়া অনেক চাপ থাকা সত্ত্বেও সামরিকীকরণের এই মৌলিক mechanismটা গ্রহণ করেননি। জিয়া কিছু কিছু চাকরিরত সামরিক অফিসারকে বেসামরিক কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু তা সংখ্যায় ছিল অত্যন্ত কম। তাঁর নীতি ছিল যে, যদি কোন সামরিক অফিসার বেসামরিক পদে কাজ করতে চায় তাহলে তাকে প্রথমে চাকরি থেকে অবসর নিতে হবে এবং যেই বেসামরিক পদে সে যাবে সেই পদের জন্য তার যোগ্যতা থাকতে হবে, অর্থাৎ তাকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে অন্যান্যদের মত চাকরিতে প্রবেশ করার নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। এই নিয়মানুযায়ী মাত্র ১৬ জন প্রাক্তন সামরিক অফিসার সিনিয়র সার্ভিস পুলে আত্তীকৃত হয়েছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু কিছু অবসরপ্রাপ্ত অফিসারকে তিনি চাকরি দিয়েছেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাঁর আমলে মাত্র একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলকে সচিবের পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সেই জেনারেলসহ দুজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলকে রাষ্ট্রদূত করা হয়েছিল। তিনি ১৯ জন অবসরপ্রাপ্ত মেজরকে পুলিশ বিভাগে সুপারের পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এর বেশি আর তেমন কিছু হয়নি।

www.pathagar.com

বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক অফিসারদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে এই ধরনের চাপ জিয়াকে সবসময়ে সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি আপোস করেননি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয় ছিল যে, সামরিক বাহিনী দেশকে তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দিতে চায়নি। সামরিক সংগঠন যখনই একটু শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন তারা ক্ষমতা শেয়ার করার কথা ভাবে, প্রয়োজন হলে ক্ষমতা দখল করার কথাও চিন্তা করে। বিএনপি প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে সামরিক অফিসারদের মধ্যে একটি সুপরিকল্পিত প্রচারাভিযান শুরু হয়। দুর্নীতি, অদক্ষতা এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা শুরু হয়, এমনকি জিয়াকে নিয়েও প্রত্যক্ষ সমালোচনা হতো। তাদের কাছে মনে হতো এসব গণতন্ত্র আর রাজনৈতিক দল করতে গিয়ে জিয়া ভুল করছেন। জিয়াকে সরিয়ে হাইকমান্ডের ক্ষমতা দখলের কথা সবাই ভেবেছে। মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা-প্রত্যাগত অফিসার সকলেই। কেউ প্রকাশ্যে বলেছে, কেউ নীরব ছিল; কেউ ছিল ভীতু, কেউ ছিল সাহসী, কেউ ছিল একটু বেশি আর কেউ ছিল একটু কম ভাবপ্রবণ। এসব কারণেই ক্যু করার অনেক প্রচেষ্টার কথা মানুষের কানে এসেছে। কর্নেল দিদারুল আলমের নেতৃত্বে ১৯৮০ সালের অভ্যুত্থানের চেষ্টা এমন একটি উদাহরণ। যারা চালাক, তারা ছিল নীরব। হিসাব করেছে, দিন গুণেছে। ভয়ও ছিল প্রচুর, ধরা পড়লে রক্ষা নেই—জিয়া এসব ব্যাপারে সজাগ ছিলেন। কিন্তু উচ্চাসনে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সামরিক বাহিনী দিয়ে সরকার পরিচালনার ব্যাপারে একমত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে একটি জটিল এবং গভীর সমস্যা ছিল। শেখ মুজিব সামরিক বাহিনীতে—মুক্তিযোদ্ধা ও প্রত্যাগত অফিসার দুই স্রোতধারা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রত্যাগত অফিসারদের বিভেদ এবং কোন্দলের নিরসন কোনদিন হয়নি। জিয়া যদিও তাদের মধ্যে একটি ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করেন কিন্তু তাতে পরোক্ষভাবে প্রত্যাগতরাই বেশি সুবিধা পেয়েছে, কেননা সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই ছিল বেশি।

জিয়ার এই ভারসাম্যের নীতির কারণে কিছু উচ্চাভিলাষী মুক্তিযোদ্ধা অফিসার নিজেদের অবহেলিত এবং মাঝে মাঝে অপমানিত বোধ করে। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিদের নিয়ে জিয়ার সরকার পরিচালনার ব্যাপারটাও অনেক মুক্তিযোদ্ধা অফিসার পছন্দ করেননি। জেনারেল এরশাদকে লেফটেনেন্ট জেনারেল করে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ করাতে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উপেক্ষিত হওয়ার এই অনুভূতি আরো তীব্র হয়। জেনারেল শওকত অতটা না হলেও জেনারেল মঞ্জুর এতে আশাহত এবং বিক্ষুব্ধ হন। এই দুই গ্রুপের মধ্যে চলে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ঠাণ্ডা লড়াই। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সাথে জিয়ার ভুল বোঝাবুঝি বাড়ানোর জন্য নানা রকম মিথ্যা রিপোর্ট লিখে এবং অন্যান্য উপায়ে যেমন ষড়যন্ত্র করা হতো, তেমনি প্রত্যাগতদের দুর্নীতি এবং অন্যান্য দুর্বলতার কথা ফলাও করে বাহিনীর বিভিন্ন স্তরে প্রচার করা হতো। শেষে প্রশ্ন দাঁড়িয়েছিল কারা সামরিক বাহিনীতে নেতৃত্ব দেবে এবং কারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে,

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধা না প্রত্যাগতরা। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের তরফ থেকে জিয়ার ওপর চাপ ছিল দেশে সামরিক আইন জারি করে একটি বিপ্লবী পরিষদের মাধ্যমে দেশকে পরিচালনা করার। তাঁদের মতে প্রশাসনকে দক্ষ, যোগ্য এবং দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য একমাত্র উপায় ছিল সামরিক বাহিনী দিয়ে দেশ পরিচালনা করা এবং দেশে একটি "শোষণহীন" সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। এ ধরনের বক্তব্য জেনারেল মঞ্জুর প্রকাশ্যেই বলতেন। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর এই দুই গ্রুপের অফিসারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কোন্দল, প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ৩০ মে ১৯৮১ সালে জিয়ার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। গণতন্ত্রের পথে না গিয়ে জিয়া যদি সামরিক অফিসারদের নিয়ে দেশ চালাতেন তাহলে হয়তো বা তাঁর এমন মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু ঘটত না এবং তাঁর মৃত্যুর ঘটনা এত রহস্যাবৃত থাকত না। যাদের ওপর তিনি বেশি নির্ভর করেছিলেন তাঁরা যদি তাঁদের আনুগত্য বজায় রাখতেন তাহলে জিয়ার মৃত্যু অন্তত চট্টগ্রামে এত নৃশংস এবং উপায়হীনতার মধ্যে ঘটত না। দুই পক্ষই তাঁর অবসান চেয়েছে। এক পক্ষ কাজটা করেছে, অন্য পক্ষ মুনাফা পেয়েছে। দাবার চালে এক দল জয়ী হয়েছে, আর এক দল পরাজিত হয়েছে।

তবে জিয়ার মৃত্যু তাঁর জীবনের এবং দেশের রাজনীতির কোন্ পর্যায়ে ঘটেছে সেটা বিবেচনা করা দরকার। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জিয়া ছিলেন তখন তাঁর ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কোন হুমকি ছিল না। তিনি ততদিনে সকল বিরোধী দলকে একটি রাজনৈতিক গণ্ডির মধ্যে এনে সংযত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নির্বাচন দিলে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে তিনি আবার জয়লাভ করতেন বিপুল ভোটে। আন্তর্জাতিকভাবে নিজের এবং দেশের একটি ভাল ভাবমূর্তি তৈরি করেছিলেন। ইরান-ইরাক যুদ্ধে মধ্যস্ততার ভূমিকায় বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং মুসলিম বিশ্বে নিজের একটি অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮০ সালে ৩ জানুয়ারি জয়যুক্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর ভারসাম্যের রাজনীতিতে আরো কিছুটা গুণগত পরিবর্তন আসে। ভারতের প্রতি তিনি একটি সমঝোতাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করেন। ভারতের নির্বাচনের পরপরই ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ২০ জানুয়ারি দেখা করে একটি সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। ঢাকায় প্রথমবারের মত ভারতীয় শিল্প-যন্ত্রপাতির প্রদর্শনীর অনুমতি দেন। এই এলাকার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দক্ষিণ এশীয় ফোরাম, পরবর্তীতে সার্ক গঠন করার প্রস্তাব দেন। এই নতুন সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টার প্রতিফলন ঘটে সরকার এবং দলে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির প্রভাব কমানো ও দেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাবকে একটু কমিয়ে দেয়ার মধ্যে। তখন তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বেশ কয়েকটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ধর্মের নামে রাজনীতি করা চলবে না একথাও বলেছিলেন। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে পরাজিত হলেও এবং দলের নানা বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁকে টেকনোক্র্যাটদের কোটায় মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী শুধু স্বাধীনতার পক্ষেরই লোক ছিলেন না, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সনদের স্বাক্ষরকারী ছিলেন। এছাড়াও জিয়া শাহ আজিজকে পরিবর্তন করে অধ্যাপক বদরুদ্দোজাকে প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

করার ব্যাপারটা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিলেন। ওদিকে গোলাম আজমকে দেশ থেকে বের করার জন্য এবং সৌদি রাষ্ট্রদূত আল খতীবকে এদেশ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এসবের ফলে তাঁর রাজনীতির মৌলিক কোন পরিবর্তন হতো না, তবে পরিস্থিতি বুঝে এসব সমন্বয়ের কথা তাঁকে ভাবতে হয়েছে, কারণ জিয়া ছিলেন একজন বাস্তবমুখী দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ।

বিএনপির অভ্যন্তরে কলহ, দ্বন্দ্ব, কোন্দল এবং নানা রকম ষড়যন্ত্রের ফলে সরকার এবং দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার পথে ছিল। সামরিক এবং বেসামরিক আমলা এবং সরকারের দুটো গোয়েন্দা বিভাগ ডিএফআই এবং এনএসআই এই ব্যাপারে ছিল খুব তৎপর। জিয়া কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন এবং কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়ারও কথা তখন ভাবছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত বিদেশ ভ্রমণের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যাচ্ছিল। ঢাকার রাজপথে শ্রমিক নেতা রহমান এবং সাংবাদিক দুলালের হত্যার ব্যাপারটা জিয়াকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তাঁর আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছিল, ঝাঁকুনি পড়েছিল। বিষয়টি উপলব্ধি করে তিনি বিদেশ ভ্রমণ কমানোর চেষ্টাও করলেন। বিএনপির অনেক মন্ত্রী যে দুর্নীতিবাজ সেটা তিনি নিজেও বিশ্বাস করা শুরু করেছিলেন। দেশে যদিও গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল তাঁর হাতে। সুতরাং এরকম অবস্থায় পৃথিবীর দেশে দেশে যুগে যুগে যা হয় সেই দিকে রাজনীতির ভবিষ্যৎ এগুতে থাকে। একজনকে খতম করতে পারলেই তার শাসন ব্যবস্থা ও দল নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায়। ক্ষমতা দখল করা যায় অতি সহজে। তাই ষড়যন্ত্র যারা করেছে তাদের জন্যও জিয়াই ছিলেন একমাত্র টার্গেট। আর সেই টার্গেটকেই আঘাত করে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করা হয়েছে। জিয়াকে হত্যা করার প্রকৃত রহস্য হয়তো কোনদিনই উদঘাটন করা সম্ভব হবে না, এ ধরনের মৃত্যুতে আন্তর্জাতিক ভূমিকা থাকাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমনিতেই গরিব হা-ভাতের দেশে কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা জাতীয়তাবাদী নেতা বেশিদিন টিকে থাকুক বা তারা খুব নাম করুক এটি অনেক পরাশক্তির কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। ছোট বড় সকল আন্তর্জাতিক মুরুব্বির মানসিকতাও এ ব্যাপারে এক।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১০

বিএনপির অভ্যন্তরীণ সঙ্কট ও সরকার ত্যাগ

দেশে তখন নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বিশেষ করে সরকার এবং বিএনপির ভেতর। প্রেসিডেন্ট জিয়ার ক্ষমতা যতই সুদৃঢ় হতে থাকে, কিছু লোকের মধ্যে ততই তাঁকে খুশি করার মনোবৃত্তি বেড়ে যায়। কি বললে এবং কি করলে তিনি খুশি হবেন সেটাই হয়ে ওঠে মন্ত্রিসভার লোকজনের প্রধান কাজ। নিজের অবস্থান ঠিক রাখা হয়ে ওঠে মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশ, জাতি, দল বা সরকারের উদ্দেশ্য লক্ষ্য গৌণ হয়ে পড়ে। আজকের জন্য বাঁচতে হবে—আগামীকালের কথা চিন্তা করে কি লাভ? এটিই তাদের মনোবৃত্তি হয়ে ওঠে। বিশেষ করে গরিব এবং অনুন্নত দেশে ক্ষমতা এমন এক জিনিস যে, ক্ষমতায় একবার কেউ গেলে তার মনে হয় না যে সেখান থেকে কোনদিন চলে যেতে হতে পারে। ক্ষমতাকে তখন কেমন যেন চিরস্থায়ী বলে মনে হয়। মুখে বা মনে ক্ষমতার ক্ষণস্থায়ী রূপটির উপলব্ধি হলেও কাজের বেলায় একেবারে ভুলে যাওয়া হয়। ভবিষ্যৎ বলে যে একটি জিনিস আছে তা উপলব্ধির বাইরে থেকে যায়। বর্তমানই তখন ভবিষ্যতের রূপ নেয়। এই ধরনের অদূরদর্শিতার জন্য যুগ যুগ ধরে শুধু সরকারই নয় বড় বড় সভ্যতার পতন ঘটেছে। আর আমাদের মত দেশে তো এ ধরনের অদূরদর্শিতা শুধু দুঃখদুর্দশা এবং রক্তের বন্যা বয়ে আনে। এক একবার সরকার পরিবর্তন হয়, আর তাতে শুধু রক্তই ঝরে না, সমাজ এবং রাজনৈতিক জীবনের পুরো অঙ্গনই ওলটপালট হয়ে যায়। দেশ এক মেরুকরণ থেকে অন্য মেরুকরণে চলে যায়।

প্রেসিডেন্ট জিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। আর তার একজন অন্যতম নিকটব্যক্তি হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল তাকে সেদিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। নিজের বিবেক এবং বুদ্ধিবিবেচনায় যেটা তাঁর এবং দেশ উভয়ের জন্য ভাল হবে সেটাই করার চেষ্টা করেছি। নিজের অবস্থানের কথা চিন্তা করিনি। তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ছিল এবং তিনিও আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। রাজনৈতিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার জন্য—দুইজন সহকর্মীর মধ্যে বা একজন নেতা এবং তাঁর সহকর্মীর মধ্যে সৌহার্দ্য থাকা একেবারে অপরিহার্য।

বিএনপির সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই দলের জন্ম কোন স্বাভাবিক সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে হয়নি। একটি বিশেষ রাজনৈতিক শূন্যতার প্রেক্ষাপটে একটি

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এই দলের জন্ম। এই দলের অভ্যুদ্বয়ের একদিকে ছিল একটি আদর্শিক রাজনীতি, অন্যদিকে ছিল ক্ষমতার মোহ। এই কারণে এর মধ্যে ঘটেছিল আদর্শ ও লোভের এক অবিশ্বাস্য সংমিশ্রণ। একদিকে ছিল সুযোগসন্ধানী, সুবিধাবাদী, গণবিরোধী, স্বার্থপর এবং রাজনৈতিকভাবে সমাজে ধিকৃত ব্যক্তিরা। তাদের সাথে ভিড় করেছিল কিছু শিক্ষিত অরাজনৈতিক ব্যক্তি। তবে অন্যদিকে মূল স্রোতধারায় ছিল রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিরা যারা রাজনৈতিক কারণে এবং রাজনীতি করার উদ্দেশ্যে বিএনপিতে আসে। শেষোক্তরা জিয়ার অভ্যুদ্বয়কে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করেছে এবং আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার পর জিয়াকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ করার কথা ভেবেছে। তাই দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি বৃহত্তর স্বার্থে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা বিএনপিতে যোগ দিয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষে যাঁরা লড়াই করেছিল তাঁরা, গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল গোষ্ঠী—যেমন ন্যাপের মূল ধারার নেতাকর্মীরা, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী এবং গ্রামবাংলার লক্ষ লক্ষ হতাশাগ্রস্ত ও নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক কর্মীবাহিনী, যাঁরা অন্ধভাবে চেয়েছেন দেশ বা দশের জন্য একটা কিছু করতে।

বিএনপি জন্ম হয়েছিল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে এটি অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। আমাদের ইতিহাসের একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ অবস্থায় একটি রাজনৈতিক কারণেই এর উৎপত্তি ঘটে, এতে কোন সন্দেহ নেই। একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে সুসংহত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত বিএনপির যেমন সমস্যা ছিল, তেমন সুবিধাও ছিল অনেক। বিএনপির যেমন দায় (লায়াবিলিটি) ছিল, তেমনি সম্পদও (এসেট) ছিল অনেক। এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করেছে এই সম্পদের ব্যবহারের ওপর। সেই ব্যবহারের রূপ, রঙ, গুণ এবং ব্যাপ্তি নির্ভর করেছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর, ভবিষ্যতের রাজনীতি সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকার ওপর, একটি আদর্শগত রাজনীতির সম্ভাবনা এবং আকর্ষণের ওপর।

একমাত্র কমিউনিস্ট বা রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশে একটি রাজনৈতিক দলের চিরদিন ক্ষমতায় থাকার প্রশ্ন ওঠে না। গণতান্ত্রিক দেশের নিয়মই হলো রাজনৈতিক দলের উত্থান-পতন ঘটবে। কোন সরকারই শেষ সরকার নয়। বিএনপি যেহেতু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আর তাই ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনাও সবসময় বিরাজ করবে। এমন কোন কারণ ছিল না ভাবার যে বিএনপি চিরদিন ক্ষমতায় থাকবে। জিয়া সামরিক অফিসার হলেও তিনি একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সামরিক ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসতে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং তাঁর পেশাগত অতীতের কারণে ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে নিজের পক্ষে রাখার তাঁর যে প্রয়াস তাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিল না। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশেও এ ধরনের প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ভারতে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর এবং ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের

www.pathagar.com

নিজের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াস সকলের মনে আছে। তাই জিয়া যে পন্থায় সাংবিধানিক সরকার চালু করেছিলেন সেটাকে বাস্তবতার নিরিখে বিচার করতে হবে। এক দিনে বা এক বছরে বা এমনকি এক দশকেও একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। জিয়া মাত্র প্রক্রিয়াটা শুরু করেছিলেন। জিয়া যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে, জনগণের আকাঙ্ক্ষার আলোকে, দলকে এবং সরকারকে টিকিয়ে রাখতে ক্রমান্বয়ে তাঁর নিকট কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা শিথিল করতেন এবং একদিন হয়তো তিনি নিজেই এই দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করতেন। সত্যি বলতে কি, একসময় এ ধরনের একটি আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি নিজেই আমাকেও বলেছিলেন।

যাই হোক ক্ষমতায় থাকার সাথে সাথে বিএনপিকে একটি সত্যিকারের রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করার জন্য, রাজনৈতিক দল হিসেবে একে স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন ছিল দলকে একটি গণতান্ত্রিক সংগঠনে পরিণত করা; দলের বিভিন্ন স্তরে এবং পর্যায়ে কর্মী এবং নেতৃবৃন্দের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করে তোলা; সঠিক নেতৃত্বের উন্মেষ ঘটানোর সুযোগ সৃষ্টি করা। এককথায় দলের ভেতর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করা। দলের গঠনতন্ত্র তৈরির ব্যাপারে আমার একটি মুখ্য ভূমিকা ছিল, কিন্তু আমরা তখন দলের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ইচ্ছা করেই জেলা পর্যায় পর্যন্ত সীমিত রেখেছিলাম। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ দলের চেয়ারম্যানের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। কোন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা ইচ্ছা করেই রাখা হয়নি। দেশে তখনও সামরিক শাসন চালু ছিল এবং জিয়া ছিলেন প্রধান সামরিক প্রশাসক। ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের কাতারে দাঁড়াতে চেয়েছেন তিনি। সামরিক শাসন তুলে নেয়ার পর তাঁর রাজনৈতিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ঐ সময় দলের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁকে দেয়া হয়েছিল। একটি দল করার প্রথম পর্যায়ে, এমনকি স্বাভাবিক নিয়মেও, দলের চেয়ারম্যানকে অনেক রাজনৈতিক দলই এ ধরনের ক্ষমতা দিয়ে থাকে। তাই এটি অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। রাজনৈতিক সংগঠনে এবং ক্রিয়াকলাপে ক্ষমতার চেয়ে ক্ষমতার ব্যবহারই বড় কথা, আর সেই ব্যবহার নির্ভর করে সেই ক্ষমতাধর ব্যক্তি অর্থাৎ নেতার মনমানসিকতার ওপর। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেই ক্ষমতাকে ব্যবহার না করে একটি গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে তোলা যায়। প্রেসিডেন্ট জিয়া সেই উদ্যোগই নিয়েছিলেন। তিনি সাধারণত দলের সিনিয়রদের সাথে আলাপ-আলোচনা না করে একা কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না।

আমরা ততদিনে সংগঠন করার প্রাথমিক পর্যায় পেরিয়েছি। পার্লামেন্ট নির্বাচনও হয়ে গেছে এবং দেশের সর্বত্র দলের আহ্বায়ক কমিটিগুলো গঠিত হয়েছে। ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় ড্যাফোডিল হোটেলে যুবদলের এক সম্মেলনে বিএনপিকে একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার ওপর বক্তব্য দিলাম। বললাম, এখন আমরা দল গড়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছি। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার আগে দলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরদিন সব খবরের কাগজে এই বক্তব্য ছাপা হলে আমার ঐ বক্তব্যের বিরাট প্রতিক্রিয়া হলো সারা দেশে। বিশেষ করে বিএনপির সর্বস্তরে

www.pathagar.com

কর্মীদের মধ্যে ঐ বক্তব্য এক বিরাট সাড়া এবং চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। তারা যেন নতুন এক দিক্‌দর্শন খুঁজে পায় এই বক্তব্যে। সকলেই বেশ উৎসাহিত হয়। দলের নেতৃস্থানীয় অনেক মন্ত্রী এবং পার্লামেন্ট সদস্যদের কাছেও আমি এই গণতন্ত্রায়নের গুরুত্বের কথা বলি। আমি তখনো প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিশ্বস্ত সহকর্মী। তাঁকেও বললাম দলের ভবিষ্যৎ রূপায়নের কথা। *দৈনিক সংবাদের* সম্পাদকীয় পাতায় প্রখ্যাত সাংবাদিক জহুর আহম্মদ চৌধুরী লিখলেন "মওদুদ সাহেব লাখ কথার এক কথা বলেছেন।"

কিন্তু মন্ত্রিসভার আমারই দুয়েকজন সহকর্মী এটিকে অন্যভাবে দেখা শুরু করলেন। তাঁরা কখনো নিজেরা, কখনো অন্যদের মাধ্যমে, আর বিশেষ করে ডিএফআই, এনএসআই, এসব সরকারি সংস্থার মাধ্যমে, আমার বিরুদ্ধে নানা রকমের মিথ্যা এবং কাল্পনিক রিপোর্ট প্রেসিডেন্ট জিয়ার কাছে দেয়া শুরু করে। একটি রাজনৈতিক কাঠামোতে নেতৃত্বের রেশারেশি বা দ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ডিএফআই বা এনএসআই বা এই জাতীয় কোন সরকারি সংস্থাকে একেবারে ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করার কথা আমার কল্পনায় কোনদিন আসেনি, দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ওদের ব্যবহার করা দূরে থাকুক। যাই হোক প্রেসিডেন্ট জিয়াকে বলা হলো, আমার বক্তব্যগুলো তাঁর নেতৃত্বের প্রতি এক ধরনের অনাস্থার প্রকাশ, দলের স্বার্থেরও পরিপন্থী। অথচ প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রতি আমার আনুগত্যে কোন খাদ ছিল না। অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে আলমাস সিনেমা হলে চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং অন্যান্য সকলের সামনে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ঐ একই বক্তব্য তুলে ধরলাম এবং আমাদের নেতা এবং সংগঠনের বিরুদ্ধে দলের অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্র চলছে এটাও উল্লেখ করে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য আহ্বান জানালাম।

জিয়া কিছু বললেন না, কিন্তু বুঝতে পারলাম দূরত্ব বাড়ছে। আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলছে। এমনও মিথ্যা এবং উদ্ভট কথা শুনলাম যে, কোন একটি সরকারি সংস্থা রিপোর্ট করেছে যে, আমি আর নূরুল ইসলাম (শিশু) মিলে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে উৎখাত করার পরিকল্পনা নিয়েছি। এরপর তো আর কিছু বলার থাকে না। শাহ আজিজ এসব করিয়েছেন। কারণ তখনও আমি আর শিশুই ছিলাম জিয়ার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। তাই আমরাই হয়ে উঠেছিলাম প্রধানমন্ত্রীর প্রধান টার্গেট। প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে আমাদের ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করানোই ছিল তিনি এবং তাঁর অনুসারীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। শাহ আজিজ একজন প্রতিভাবান রাজনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সনাতন রাজনীতি, স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকার প্রেক্ষাপটে তিনি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং তখন প্রাসাদভিত্তিক ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি ছাড়া তাঁর বা তাঁর সমগোত্রীয়দের রাজনীতিতে টিকে থাকার অন্য কোন উপায় ছিল না।

শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী করে প্রেসিডেন্ট জিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিনা তা এদেশের ইতিহাস অবশ্যই মূল্যায়ন করে দেখবে। যাই হোক প্রেসিডেন্ট জিয়াকে যা বলা হয়েছে, তিনি তাই বিশ্বাস করেছেন। এ ধরনের অবস্থায় মোসাহেব আর খোশামোদকারীরাই

www.pathagar.com

জয়লাভ করে। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবের জন্যই ক্ষণিকের আনন্দ, ক্ষমতা এবং প্রতাপকেই আমার প্রতিপক্ষরা বড় করে দেখেছেন, দলের বা সরকারের ভবিষ্যতকে নয়।

কিউবায় জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন থেকে ফিরে এসে ঐ দিন রাতে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের এক সভায় দেশে বিপ্লব আনবেন বলে ঘোষণা করলেন জিয়া। ১৯৭৩ সালে আলজিরিয়াতে শীর্ষ সম্মেলন শেষ করে শেখ মুজিবও দেশে ফিরে এসেছিলেন বিপ্লব করার স্বপ্ন নিয়ে। শেখ মুজিবের মত জিয়াও সেদিন ফিদেল কাস্ত্রোর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। কি করে কাস্ত্রো রাত দুটার সময় এসে তাঁর সাথে দেখা করেছেন তা বিশদভাবে আমাদের জানালেন। তিনি বললেন, এভাবে দেশ আর চলতে পারে না, তাই দেশে বিপ্লব করতে হবে। কি বিপ্লব, কিসের বিপ্লব, কিভাবে এই বিপ্লব সাধন করা হবে কিছুই বললেন না। জিয়া ছিলেন একজন conformist, প্রথানুযায়ী বলতে গেলে রক্ষণশীল মানুষ, তিনি আজ বিপ্লবের কথা বলছেন। পরের দিন বিরাট করে খবরের কাগজে সব ছাপা হলো। মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা এবং শঙ্কা বৃদ্ধি পেল। মাসখানেক এর আর কোন ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ দেয়া হলো না।

যে দেশ যত গরিব, যে দেশে যত বেশি সমস্যা, সে দেশের রাজনীতিকরা তত বেশি জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেয়। যা করা সম্ভব নয় সেটাও বলে সম্ভব হবে। যে দেশে মানুষের কিছুই নেই সেখানে তাদেরকে সবকিছুই একসাথে দেয়ার ওয়াদা দিতে হয়। আর মানুষও চায় তার যখন কিছুই নেই সবকিছুই একসাথে পেতে। বঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা সেখানে এত প্রকট যে তারা আর ধৈর্য ধরতে বা অপেক্ষা করতে নারাজ। অতীতে তারা দেখেছে অপেক্ষা শুধু তাদের দুঃখ বাড়িয়েছে, কমায়নি এতটুকুও। তাই শাসক, রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে অপেক্ষা করতে বলার সাহস খুঁজে পায় না। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিকতার অভাবে তারাও জানে ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কম আর গেলেও হয়তো একবারই যেতে পারবে। আর যদি একবার ক্ষমতার সিংহদ্বারে প্রবেশ করতে পারে তাহলে তারা সেখানেই থাকবে আর বের হবে না। এইসব চিন্তা করেই তারা রাতারাতি জনগণের সমস্ত দুঃখদুর্দশা দূর করে দেয়ার কথা বলে। একবারেই সমস্ত সমস্যার সমাধানের কথা বলে। চরম দাবি, চরম শ্লোগান এবং চরম সব প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়। অনেক সময় হতাশা থেকেও এ ধরনের চরম বক্তব্য বেরিয়ে আসে। যখন আর কিছুই হচ্ছে না বা কিছুই দিতে পারছে না তখন চরম শ্লোগানের আশ্রয় নেয়া হয়। শোষণের সমস্ত পথ উন্মুক্ত রেখে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার কথা বলা হয়। ৬৮ হাজার গ্রামকে আদর্শগ্রামে পরিণত করার কথা বলা হয়। দুর্নীতিকে সমূলে উৎখাত করার কথা বলা হয়। কৌশল হিসেবে ওমুক সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা বাসস্থান ইত্যাদির কথা বলা হয়। যা কিনা আজকে নয়, সবই আগামী দিনে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ তাদের পক্ষে কথায়, কাজে এবং বিশ্বাসে মিল রাখা সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত জীবনের সাথে রাজনৈতিক জীবনের অনেক তফাৎ দেখা দেয়। পরিষ্কার হয়ে ওঠে প্রাইভেট মোরালিটি এবং পাবলিক লাইফের দ্বন্দ্ব।

www.pathagar.com

তাই হঠাৎ করে প্রেসিডেন্ট জিয়ার কাছ থেকে বিপ্লবের ডাক শুনে উচ্চ মধ্যবিত্তরা একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো, আর সাধারণ মানুষের মনে কিছু পাওয়ার নতুন আসা জাগল। মাঠে-ময়দানে জিয়া বিপ্লবের পক্ষে যখন শ্লোগান দিলেন, তখন দিনমজুর, কৃষক সমাজ, কারখানার শ্রমিকরা, দেশের বেকার এবং ভূমিহীনরা ভাবল এবার বুঝি তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। জিয়ার বিপ্লব সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন আনবে এই আশা করাটাই তো স্বাভাবিক ছিল। মুজিবও বলেছিলেন শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করবেন, কিন্তু পারেননি। জিয়াও ছিলেন একজন অসাধারণ জনপ্রিয় নেতা, সাধারণ মানুষ তাঁকে পছন্দ করত, বিশ্বাস করত। জিয়াও যখন তাই বিপ্লবের কথা বললেন, তখন অনেকেই ভাবল, তিনি নিশ্চয়ই গরিব মানুষদের জন্য একটা কিছু করবেন। অবশ্য মুজিবের মত তাঁর ইচ্ছাটাও যে তাই ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা যদিও অতি সহজে বিপ্লব বা এই ধরনের আরো অনেক শব্দ ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু এই শব্দগুলোর প্রতিটির একটি আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়াগত গুরুতর অর্থ রয়েছে। বিপ্লব শব্দের একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক গূঢ়ার্থ (কনোটেশন) রয়েছে। এর একটি ঐতিহাসিক ব্যাপকতা রয়েছে। দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ওটা অর্জন করা সম্ভব কিনা বা কতটুকু সম্ভব তা সচরাচর বিচার করে দেখা হয় না। এই ধরনের উক্তির বা প্রতিশ্রুতির অন্তর্দ্বন্দ্ব বা ব্যর্থতার ফলে শেষ পর্যন্ত এগুলোর সত্যিকারের কার্যকারিতা বা অর্থ অনুধাবনের প্রশ্ন যখন জাগে তখন মানুষ আগেকার হঠকারিতা বা ব্যর্থতার কথা চিন্তা করে মূল বিষয় থেকে বিমুখ হয়ে দাঁড়ায়। নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাস ওঠে যায়। যাঁরা সত্যিকারের বিপ্লবী বা বিপ্লব সাধন করার রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে থাকেন তাঁদেরও মানুষ আর বিশ্বাস করতে চায় না। কোন রাজনৈতিক কর্মসূচিই তখন আর সফল বা গতিশীল হতে পারে না, যদি না সেই কর্মসূচিতে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা না যায়। মুজিবের সমাজতান্ত্রিক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার প্রক্রিয়ায় এদেশের মানুষ যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার ফলে সমাজতন্ত্রের কথা বলে কৃষক শ্রমিক বা জনগণকে এখন আর উদ্বেলিত করা সম্ভব নয়। যতদিন মানুষ সেই দিনগুলোর কথা মনে রাখবে ততদিন তারা আর সমাজতন্ত্রের দিকে পা বাড়াতে চাইবে না। এইভাবেই মানুষের অনেক ভুল, হঠকারী আন্দোলনও পিছিয়ে গেছে বার বার। সময়, অভিজ্ঞতা, প্রস্তুতি ছাড়া যখনই শুধু আবেগের ভারে চরম শ্লোগান এবং অবাস্তব কর্মসূচি দেয়া হয়েছে তখনই সেটা ব্যর্থ হয়েছে।

জিয়াউর রহমানেরও বিপ্লবের কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেউ তাঁর কাছ থেকে সেটা চায়নি, প্রত্যাশাও করেনি। তাঁর সরকার, দল এবং সমাজের শ্রেণীগত চরিত্রের কারণে ওটা একটি বাস্তবভিত্তিক কর্মপন্থাও ছিল না। শব্দের খাতিরে শব্দ ব্যবহার করা বা একটি বিশেষ অবস্থা বা ক্রিয়ার জন্য বিপ্লব শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করা যায়, কিন্তু আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যখন একজন রাষ্ট্রপ্রধান সমাজে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য বিপ্লবের ডাক দেন, তার প্রতিক্রিয়া, আশা-নিরাশার

www.pathagar.com

রূপ ভিন্ন হতে বাধ্য। উন্নত দেশে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি বা চরম শ্লোগান শোনা যায় না। ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল ১৯৬৪ সালে "Never had it so good" "আগে কোনদিন এর চেয়ে ভাল ছিলাম না" শ্লোগান তুলে ভোট চেয়েছিল আবার ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। জন কেনেডিও "নিউ ফ্রন্টিয়ার"-এর কথা বলেছিলেন মাত্র, এর বেশি নয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়াকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম। যেটা আমরা করতে পারব না বা যেটার পূর্ণ অর্থ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বেমানান হবে সেটা বলা উচিত হবে না। ফল হবে বিপরীত। বিপ্লব একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শব্দ। শুধু শ্লোগান হিসেবে এটিকে ব্যবহার করা ভাল হবে না। শুধু কথার কথা হলে ঠিক ছিল, কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়ার মনোভাব দেখে মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবীরা এটি নিয়ে কটাক্ষ করা শুরু করে। তারা এটিকে হঠকারিতা বলতে শুরু করে। শেখ মুজিবের শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার প্রথম বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত বাকশাল কায়েম করে তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের পরিণতি কি হয়েছিল, তা সকলেরই জানা। দেশের গণমানুষের মনে জিয়ার যে ভাবমূর্তি ছিল তা যে কোন মূল্যে অটুট রাখার প্রয়োজন ছিল। একই সরকারের সদস্য হিসেবে ভেতরে যাই বলি না কেন বাইরে জাতির ভবিষ্যতের জন্য এর একটি বিশ্লেষণ দেয়ার চেষ্টা করলাম। বিপ্লব বলতে জিয়া কি ভাবেন বা বলতে চেয়েছেন তার একটি রূপরেখা নিজের উদ্যোগেই দেয়ার চেষ্টা করলাম। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম যে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এই বিপ্লব আনা হবে। এটি হবে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব। প্রথম পর্যায়ে সারা দেশে স্বেচ্ছাশ্রমে খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে বিপ্লব সাধন করা হবে। জিয়া বেতারে ভাষণ দিলেন। জাতি নিশ্চিন্ত হলো।

কিন্তু আমার ব্যাপারে ফল হলো উল্টো। জিয়ার কাছে রিপোর্ট করা হলো আমি তাঁর বিপ্লবের বিরোধী, তিনি নিজেই একদিন কথাটা তুললেন। এ নিয়ে তাঁর সাথে অনেক কথা বলেছি। চেষ্টা করেছি তাঁকে আবারো বোঝাতে যে, বিরোধী দলের নেতারা তাদের সমর্থন বৃদ্ধি করার জন্য এ ধরনের কথা বলতে পারেন, কিন্তু একজন সরকারপ্রধান ঐ ধরনের কথা বললে তার অর্থ এবং প্রতিক্রিয়া অন্য রকম হতে বাধ্য। সাপ্তাহিক *রোববার*-এ আমার একটি সাক্ষাৎকারে বিপ্লব বলতে প্রেসিডেন্ট জিয়া কি বুঝিয়েছেন সেটাও আমি ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম। বলেছিলাম, বিপ্লব বলতে কোন ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্তমান কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দিয়ে সংঘাতের মাধ্যমে নতুন কাঠামো সৃষ্টির কথা জিয়া বলেননি। তিনি কিছু মৌলিক সংস্কারের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বর্তমান কাঠামোর পরিবর্তন আনাটাকেই বিপ্লব বলেছেন। যাই হোক এই ভুল বোঝাবুঝি আর দূর হলো না। কারণ শাহ আজিজসহ আমার দুয়েকজন সহকর্মী এই ভুল বোঝাবুঝি নানাভাবে, নানা কৌশলে শুধু বাড়িয়ে তোলারই চেষ্টা করলেন যাতে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে আমার দূরত্ব আরো বেড়ে যায়।

আমার রাজনৈতিক জীবনে যে তখন নতুন সঙ্কট দেখা দিয়েছে বুঝতে পারিনি। মিথ্যা যে সত্যকে অত সহজে পরাভূত করতে পারবে ভাবিনি। ষড়যন্ত্রকারীরা আমার

www.pathagar.com

অজান্তে, আড়ালে, অগোচরে, এতখানি এগিয়ে গেছে বুঝতেও পারিনি। চট্টগ্রামের আলমাস সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় সম্মেলনে আমার প্রতি কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন আমার বিরুদ্ধেই কাজ করেছিল। সেদিনই বক্তৃতার পর আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী মহিলা পার্লামেন্ট সদস্য আমাকে বেশ উৎকণ্ঠা নিয়েই বলেছিলেন যে, আমি বুঝি আর বেশিদিন সরকারে টিকে থাকতে পারব না। কেন, তা আর সেদিন জিজ্ঞেস করিনি। আমার রাজনৈতিক জীবনের বোধহয় সবচেয়ে ভাল বক্তৃতা দিয়েছিলাম সেদিন। অনেকে উপদেশ দিল ভুল বোঝাবুঝি কাটিয়ে ফেলতে। কিন্তু কিসের ভুল বোঝাবুঝি। কার সাথে ভুল বোঝাবুঝি, এটির উত্তর কেউ দিতে পারে না। প্রেসিডেন্ট জিয়া তো কিছু বলেন না। তিনি তো কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। আমি তাঁর একজন সহকর্মী, তাঁরই নিয়োগপ্রাপ্ত উপপ্রধানমন্ত্রী। যদি মন্দ বা সন্দেহজনক কিছু শুনে থাকেন তিনি তো নিজেই ডেকে কৈফিয়ত তলব করতে পারেন। এত কাজ করছি তাঁর জন্য, এত বিশ্বাস করেছি তাঁকে, একসময় তো এমন কোন কাজ ছিল না যেটা আমার সাথে পরামর্শ না করে তিনি করেছেন। তিনিই আমাকে উপপ্রধানমন্ত্রী করেছেন, আমি তো তাঁকে কোন অনুরোধ করিনি। বেশ কিছুদিন আগে একদিন বলেছিলেন যে, আমার বাসায় দলের নেতা বা পার্লামেন্ট সদস্য যারা যায় তারাই আবার তাঁর কাছে গিয়ে উল্টো রিপোর্ট করে। রঙ মাখিয়ে সব তাঁকে গিয়ে বলে। বললাম, সেটা যখন আপনি জানেনই তাহলে আর সে প্রশ্ন ওঠে কেন। একই দল করি, সরকার চালাচ্ছি, পার্লামেন্টের উপনেতা—আমাদের কাছে তো লোকজন আসবেই। সবাই তো আর প্রেসিডেন্টের কাছে যেতে পারে না। এতে সন্দেহ করার কি আছে?

প্রেসিডেন্ট জিয়া মন্ত্রীদের আচরণবিধি তৈরি করলেন, অফিসে কখন আসবে-যাবে ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। তখন কিছু বলিনি। কিন্তু তাঁকে কারা জানি উপদেশ দিল যে, মন্ত্রীদের একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সিনিয়র আমলারা তাঁর কাছে নালিশ করে যে, অনেক মন্ত্রী নাকি ফাইলে কোথায় সই করতে হয় সেটাই জানে না, নোট কিভাবে লিখতে হয় সেটাও জানে না। সুতরাং তাদের প্রশিক্ষণ দরকার। যুগ্মসচিব-সচিবরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পুরোনো গণভবনে ক্লাস নেবে, আর মন্ত্রীদের সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। কি আশ্চর্য কথা? মন্ত্রী কোথায় সই করবে ফাইলে, সেটা দেখানো বা নোট তৈরি করা ইত্যাদির জন্যই তো আমলারা রয়েছে। মন্ত্রী তো নীতিনির্ধারণ করবে, সিদ্ধান্ত দেবে। মন্ত্রী তো একটি রাজনৈতিক পদ। পৃথিবীর সর্বত্র একই প্রথা। রাজনীতিবিদদের যোগ্যতা জনসাধারণ নির্ণয় করে। এতে কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। সেটা আইন দ্বারা নির্ধারিত হয় না। আর একেবারেই যদি যোগ্য না হয় তাকে মন্ত্রী নিয়োগ না করলেই তো হয়। প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে এতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াকে বললাম, এটি মন্ত্রীদের জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা ছাড়া আর কিছু নয়। উত্তরে তিনি বললেন, তিনি নিজেই ঐ ক্লাসে যোগ দেবেন। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি বিষয়টি নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছিলেন; কয়েকদিনের মধ্যে

www.pathagar.com

ওটা বন্ধ হলো। কিন্তু দলের মধ্যে আমার বিরোধীরা আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করল একজন অসহযোগী ব্যক্তি হিসেবে।

ইতোমধ্যে দলের স্থায়ী কমিটি গঠিত হলো। কমিটিতে জিয়াউর রহমান যাঁদের মনোনীত করলেন তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন রাজনৈতিকভাবে অপরিচিত এবং অনভিজ্ঞ। দলের কার্যকরী কমিটিতে যেসব কর্মকর্তা তিনি নিয়োগ করলেন, একমাত্র বদরুদ্দোজা চৌধুরী ছাড়া বাকিদের বেলায় একই কথা প্রযোজ্য, আর দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি হলো যথেষ্ট ঢিলেঢালা, যেখানে নানা ধরনের লোকদের মনোনীত করা হলো। প্রেসিডেন্ট জিয়া এসব করেছিলেন তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা থেকে। সর্বত্রই তিনি একটি ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক দল গঠন ও তার জন্য কমিটি করা এসবই তাঁর জন্য ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা। নানা কারণে তাই তাঁকে এভাবেই এগোতে হয়েছে। তাঁকে সৎ উপদেশ এবং পরামর্শ দেয়াটাই ছিল সকলের কর্তব্য। তাঁর নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিত্ব এত গতিময় ছিল যে, দলকে শক্তিশালী করলে তাঁর হাতকেই আরো শক্তিশালী করা হতো। যাই হোক, এসব কমিটি গঠনে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে নানা প্রশ্ন এবং হতাশা দেখা দেয়। এছাড়া দেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষ তাদের অবস্থার আরো উন্নতি আশা করছিল। এ ব্যাপারে পার্লামেন্ট সদস্যদের একটি মুখ্য ভূমিকা ছিল। তারা সেই ভূমিকা পালন করতে না পেরে দিন দিন হতাশ হয়ে ওঠে। বস্তুত উন্নয়নের কাজে তাদের কোন ভূমিকাই ছিল না। দল গঠনের অনেক দিন পর ১০, ১১ এবং ১২ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে সংসদীয় দলের সভা ডাকা হয়। প্রায় ছ'মাস পর এই প্রথম সভা হলো। প্রেসিডেন্ট জিয়া এই সভার উদ্বোধন করলেন। পার্লামেন্ট সদস্যরা সভায় দেশের নানাবিধ সমস্যা তুলে ধরলেন। দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর বিশদ আলোচনা হলো। উদ্বোধন করার পর প্রেসিডেন্ট জিয়া সামরিক বাহিনীর এক মহড়া দেখার জন্য চট্টগ্রাম চলে গেলেন এবং রাতে সেখানেই থাকলেন। পরদিন ১১ ডিসেম্বর সংসদীয় দলের সভায় দল, সরকার এবং দেশের নানা বিষয়ের ওপর ১৪টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাস করা হলো। পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে এত ভাবাবেগ ছিল যে, কেউ আর প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেনি। শাহ আজিজ, বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সকল মন্ত্রী এই প্রস্তাবগুলো সমর্থন করলেন। তিনটি প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটি ছিল দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রায়নের বিষয়, দ্বিতীয়টি ছিল দেশের সংবিধানের গণতন্ত্রায়নের বিষয়, আর তৃতীয়টি ছিল দেশের উন্নয়ন কাজে জনপ্রতিনিধিদের অর্থাৎ পার্লামেন্ট সদস্যদের ভূমিকা নির্ণয় করা। এ ব্যাপারে একটি জেলা উন্নয়ন কমিটি করার সুপারিশ করা হলো। *ইত্তেফাকে* প্রস্তাবগুলো ছাপা হয়।

পরদিনও সভা চলছিল। বিকালে যখন প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম থেকে ফিরেছেন, ঢাকায় নামার সাথে সাথেই প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ প্রেসিডেন্টকে জানালেন, দেশের সর্বনাশ হয়ে গেছে, একটি পার্লামেন্টারি ক্যু হয়ে গেছে। মওদুদ সাহেব ক্যু করে ফেলেছেন। পার্লামেন্টারি পার্টি ১৪টা প্রস্তাব পাস করে ফেলেছেন, ইত্যাদি। জিয়াউর রহমান ব্যাপারটা কতটুকু বুঝতে পেরেছিলেন বা কি বুঝেছিলেন জানি না, তিনি পার্লামেন্ট ভবনে পার্লামেন্টারি

www.pathagar.com

পার্টির সভায় চলে আসলেন। মঞ্চের ওপর আমরা সবাই অর্থাৎ ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তার, দুই উপনেতা এবং চিফ হুইপ বসা। প্রেসিডেন্ট সভাকক্ষে বসা মাত্রই *ইত্তেফাকের* কপিটা উঁচু করে তুলে ধরলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া খুব ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ ছিলেন, সাধারণত কোন আবেগ দেখাতেন না। সেদিন তিনি তাঁর ভেতরের উত্তেজনা চেপে রাখতে পারলেন না।

প্রায় ২৫০ জন পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাক হয়ে বসে রইল। সম্ভবত তিনি ভেবেছেন সংসদীয় দলের প্রস্তাব মানেই দেশের আইন হয়ে যাওয়া। আসলে তো সেটা নয়। দলের বিভিন্ন কমিটি বিভিন্ন সময় নানা প্রস্তাব পাস করবে, এটি তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নিয়ম। এতে রেগে যাওয়ার কি আছে? কিন্তু সেই যুক্তির কথা বোঝানোর পরিবেশ তখন ছিল না। তিনি বক্তব্যদান শুরু করলেন, আর সেই বক্তব্যদানের মধ্যে তিন চার বার দলের গঠনতন্ত্র হাতে তুলে ধরে উত্তেজিতভাবে বললেন, দলের এই গঠনতন্ত্র মওদুদ সাহেবই তো তৈরি করেছেন। আজ আবার এসব প্রস্তাব কেন? কত সহজ জিনিসটাকে কত জটিল করা হলো। ঐ একই চক্র সমস্ত ব্যাপারটা আমার ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়ার সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করল। জিয়াউর রহমানের সাথে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করার আর একটি সুযোগ তারা খুঁজে পেল।

ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখে আমি সরকারি সফরে নেপাল গেলাম। উদ্দেশ্য হলো গঙ্গার পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রস্তাবে নেপালকে আরো আগ্রহী করা এবং ঐ আগ্রহকে পাকাপোক্ত করা। তাদের সাথে একটি সুনির্দিষ্ট পরস্পর সহায়ক বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়া। এর আগে এপ্রিলে যৌথ নদী কমিশনের কো-চেয়ারম্যান হিসেবে দিল্লির বৈঠকে যখন যাই, তখন প্রায় দুই বছর অচলাবস্থা চলার পর মোরারজি দেশাই গঙ্গার পানির ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে নেপালকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে রাজি হন। নেপালকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সেটা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি টার্মস অব রেফারেন্স তৈরি করার জন্য একটি যৌথ কমিটি গঠন করার ব্যাপারে ভারত রাজি হয়। এই অগ্রগতি সামান্য হলেও আমাদের জন্য ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। নেপালে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল প্রেসিডেন্ট জিয়ারই পরামর্শে।

নেপালে তাঁরা আমাকে এক দারুণ অভ্যর্থনা জানায়। আমার সফরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সফর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এতে ঝুঁকিও ছিল অনেক। আমি অতিথি ভবনে পৌঁছানোর পরপরই আমার কাউন্টারপার্ট নেপালের সেচমন্ত্রী, যখন অনুষ্ঠানিকভাবে দেখা করতে আসলেন, তখন বললেন, আমার এই সফরে ভারত সরকার মোটেও খুশি নয়। আমার সফর বাতিল করে দিতে তারা নেপালকে পরামর্শ দিয়েছিল। ভারতের নির্বাচনের পর ওদের সেচমন্ত্রীর ভ্রমণের পরই যেন আমার সফর অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু রাজা ঐ প্রস্তাবে রাজি হননি। ভারত চায় না যে, নেপালের সাথে একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে আমাদের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠুক। অথচ নেপাল এবং বাংলাদেশ সরকার চায় দুদেশের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের দুজনের সম্পর্ক আরো গভীর এবং উন্নত

www.pathagar.com

হোক। সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ঘনিষ্ঠতা কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে ভেবে ভারত এই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে।

গঙ্গার পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির জন্য ভারতের সংযোগ খালের প্রস্তাব নানা কারণে বাংলাদেশের জন্য গ্রহণযোগ্য ছিল না। বাংলাদেশের প্রস্তাব হলো নেপালে জলাশয় তৈরি করে পানি জমিয়ে রেখে শুষ্ক মৌসুমে তিন দেশের জন্য ব্যবহার করা। এর ফলে বিদ্যুৎ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ—তিন কাজেই তিনটি দেশ বিপুলভাবে উপকৃত হতে পারবে। আমাদের মতে গঙ্গা একটি আন্তর্জাতিক নদী, সুতরাং যে তিনটি দেশ গঙ্গার প্রবাহের সাথে সংযুক্ত সে তিনটি দেশের সমন্বয় এবং সহযোগিতায় এই বিশাল পানিসম্পদের ব্যবহার নির্ণয় করা উচিত। ভারত অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করে। এই ব্যাপারে তারা তাদের বহু দিনের প্রচলিত দ্বিপাক্ষিকতার নীতি অনুসরণ করে। অর্থাৎ আমাদের সাথে আলাদা এবং নেপালের সাথে আলাদা ভিন্ন ভিন্নভাবে, বাইল্যাটেরালিজমের নীতি অনুসরণ করে ওরা কাজ করতে চায়। এর পেছনেও তাদের অনেক কারণ আছে। তারা তাদের জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখেই তাদের এই নীতি অনুসরণ করে।

যদিও ভৌগোলিকভাবে গঙ্গার উৎপত্তি ভারতে, কিন্তু এর পানিপ্রবাহ বেশিরভাগই আসে নেপালের তিনটি প্রধান নদী গণ্ডক, কোশী এবং কার্নালী থেকে। এই নদীগুলোর মধ্যে গণ্ডক এবং কোশী নদীর ওপরে বাঁধ নির্মাণ করে পানি নিয়ন্ত্রণের এবং ব্যবহারের জন্য ভারতের সাথে নেপালের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রয়েছে। বাকি থাকে কার্নালী নদী। এটিই সর্ববৃহৎ নদী এবং গঙ্গার প্রায় ৪০ ভাগ পানিই এই নদী নেপাল থেকে বয়ে নিয়ে আসে। এই নদীর পানি নিজেদের কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ভারত নেপালের সাথে একটি চুক্তি করার জন্য বহু বছর ধরে চাপ দিয়ে আসছে। কিন্তু নানা কারণে নেপাল তাতে রাজি হয়নি। তার বিশেষ কারণ হলো বাকি দুটো নদীর ব্যাপারে ভারতের সাথে চুক্তি করে নেপালের কোন লাভ হয়নি বরং ক্ষতি হয়েছে। কার্নালী নদীর ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে কোন চুক্তি হলে সেটা ভারতের পক্ষেই যাবে। নেপালের নিজস্ব পানি সমৃদ্ধির যে পরিকল্পনা রয়েছে তা আর বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে না।

পানিসম্পদ ব্যবহারের জন্য ভারতের যে মহাপরিকল্পনা রয়েছে তা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। ভারত সেচ ব্যবস্থায় বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। চাষের প্রায় শতকরা ২৮ ভাগ জমি তারা সেচের আওতায় এনেছে এবং এত জনবহুল দেশ হয়েও ভারত যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে সেচ ব্যবস্থার বিস্তার তার একটি অন্যতম কারণ। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গঙ্গার সমস্ত পানিই তাদের প্রয়োজন। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের ওপরের কিছু অংশ ছাড়া বাকি অংশের জন্যও গঙ্গার পানি তারা দিতে পারবে না। তারা গঙ্গার পানিকে নিজেদের কাটা খাল দিয়ে রাজস্থান পর্যন্ত নিয়ে যেতে চায়। ফারাক্কা বাঁধ ভারতের জন্য একটি অস্থায়ী প্রকল্প মাত্র—এখানে গঙ্গার পানি পৌঁছানোর আগেই প্রায় পুরো পানিই ভারতের উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ব্যবহারের জন্য প্রবাহিত করার ব্যবস্থা তারা করেছে। এখন আমরা যে হিসেবে কথা বলি সেটা নেহাতই একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। হুগলী নদী এবং পশ্চিমবঙ্গের

www.pathagar.com

অন্যান্য অংশের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারলেই ফারাক্কার নিচে গঙ্গার আর কোন পানি প্রয়োজন হবে না। যতদিন তারা সেটা করতে না পারবে, ততদিনই এবং যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু পানিই, ফারাক্কা পর্যন্ত পৌঁছাবে। উত্তরাঞ্চলের প্রয়োজন যতই বাড়বে ফারাক্কায় পানি ততই কম আসবে এবং আমাদের হিস্যার পরিমাণও ক্রমশ কমতে থাকবে। এমনকি নিম্নতম যে পরিমাণ পানি পাওয়ার ব্যবস্থা এখন আছে সেটাও স্থির থাকার কোন সম্ভাবনা নেই।

এই কারণেই ভারত সংযোগ খাল চায়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জন্য। যে পানিটা গঙ্গা থেকে আসে সেটা আর আসবে না বলে ব্রহ্মপুত্র থেকে পানি এনে হুগলি নদী, কোলকাতা এবং পশ্চিবঙ্গের বাকি অংশের পানির চাহিদা মেটাতে চায়। আর তার সাথে সাথে বাংলাদেশের যে জেলাগুলো গঙ্গার পানি ব্যবহার করে, সেই পানির চাহিদা ব্রহ্মপুত্রের পানি দিয়ে মেটানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চায়। ব্রহ্মপুত্র হলো পানিসম্পদে এই উপমহাদেশের সবচেয়ে সম্পদশালী নদী। এই নদীতে এখন ১ লক্ষ কিউসেক পানি উদ্বৃত্ত রয়েছে। এই পানি একটি ১০০ মাইলের অধিক দীর্ঘ সংযোগ খালের মাধ্যমে ফারাক্কার মুখে এনে দিলে সেই পানি তখন পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের গঙ্গা-নির্ভর জেলাগুলোর পানির পুরো চাহিদা মেটাতে পারবে। অর্থাৎ গঙ্গার যে পানি আমরা শত শত বছর ধরে জীবনধারণের জন্য ব্যবহার করেছি সেটা থেকে আমরা বঞ্চিত হব, আর আমাদেরই আর একটি নদীর পানি শত মাইল দূর থেকে টেনে এনে সেই বঞ্চনাকে লাঘব করা হবে।

পানি সমস্যা যেমন জটিল, তেমনি সম্পদ হিসেবে পানি একটি বিশাল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। এটি যে কি বিরাট একটি সম্পদ সাধারণভাবে উপলব্ধি করা কঠিন। সত্যি কথা বলতে কি, এই এলাকায় অর্থাৎ উপমহাদেশের এই উত্তর-পূর্ব অংশে পানিসম্পদের যে সমারোহ এবং এই সম্পদ থেকে যে সম্ভাবনা আছে তা এই এলাকাকে একটি ধনী এলাকায় পরিণত করতে পারে। বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব এলাকায় যত পানি আছে পৃথিবীতে এর সমান আয়তনের অন্য কোন অঞ্চলে এত পানিসম্পদ আর নেই। নদীগুলোর উৎপত্তি, গতিপথ, প্রবাহ এবং ভৌগোলিক নিয়মের কারণে এখানে নদী থেকে প্রাপ্ত পানির যৌথভাবে ব্যবহার অপরিহার্য এবং আর তা যদি করা যায় তাহলে এই এলাকাকে একটি উন্নত এলাকায় পরিণত করা সম্ভব। রাজনৈতিক এবং মানবিক—উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সঙ্কীর্ণতা দূর করে দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে মুক্তচিন্তা ও খোলা মন নিয়ে যদি কাজ করা যায় তাহলে এই এলাকার সব দেশই উপকৃত হতে পারে। ভারত যেহেতু বড় এবং উজানের দেশ হিসেবে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে, তাকে প্রতিবেশীদের সমস্যাগুলো বুঝতে হবে এবং একটি উদার মনোভাব নিয়ে এর সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। আর যদি ভারত অনমনীয় মনোভাব পোষণ করে এবং শুধু নিজের স্বার্থই দেখে, তাহলে এই পানি সমস্যাই ভারত এবং তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে চিরদিনের জন্য শত্রুতা জিইয়ে রাখবে।

অন্যান্য বিষয় ছাড়া নেপালে যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কার্নালী নদীর ব্যাপারে নেপাল যেন ভারতের সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ না হয় সেটা নিশ্চিত করা। সেটা হলে গঙ্গার

www.pathagar.com

প্রবাহ বৃদ্ধির ব্যাপারে বাংলাদেশের যে প্রস্তাব আছে তা মূল্যহীন হয়ে পড়বে এবং ভারতের সংযোগ খালের প্রস্তাব ছাড়া আর কোন প্রস্তাব তখন হাতে থাকবে না। মন্ত্রীর সাথে আলোচনার পর রাজার সাথে আলোচনা করলাম। রাজা বীরেন্দ্র বললেন, তাঁর মূল কথা, বাকি দুটো নদীর ওপরে ভারতের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তাতে নেপালের কোন উপকার হয়নি। "They (India) get the water and we get the flood" "ভারত তাতে পায় পানি, আর আমরা পাই বন্যা।" কার্নালী নদীর ওপর দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য ভারত বহু বছর চাপ দিয়ে আসছে, কিন্তু তাঁর পিতা যেমন সেটাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, তিনিও সেটাকে ঠেকিয়ে রেখেছেন। নেপাল চায় বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। বাংলাদেশ সাথে থাকলে ভারতের সঙ্গে নেপালের স্বার্থরক্ষায় সুবিধা হয়। নেপালে প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ ভারতীয় এবং সে দেশের ওপর ভারত ভীষণ প্রভাব খাটায়। তাদের মুদ্রাও এক। কিন্তু রাজা একজন জাতীয়তাবাদী নেতা, তিনি ভারতের এই প্রভাব থেকে যতটা সম্ভব মুক্ত হয়ে তাঁর দেশকে বাঁচাতে চান। সব দেশপ্রেমিকই তা চাইবে। কোন রাষ্ট্রই তো অন্য কারো লেজুড় হয়ে থাকতে চায় না। আমাদের প্রস্তাবে তাই তাঁদের যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে এবং তাঁরা চান আমাদের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হোক। রাজা বললেন "তোমরা যদি শক্ত থাকো, তাহলে কার্নালী নদীর ব্যাপারে আমরা ভারতের সাথে কোন চুক্তি করব না।" একটি সমঝোতা হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে।

লিখিত যুক্ত ইশতেহারেও নেপাল এবার আমাদের মনোবল দেখে পানিসম্পদ বৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতার ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে এল। একটি লিখিত ইশতেহার আর একটি গভীর সমঝোতা নিয়ে মহাউৎসাহে দেশে ফিরলাম। বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সফলতা বহন করে এনেছিল। এয়ারপোর্টে সাংবাদিকদের গতানুগতিক যা বলা যায় তাই বলি। ইশতেহারের লাইনে দুচারটি কথা, আর বললাম, সফর সফল হয়েছে। কার্নালী নদী এবং অন্যান্য ব্যাপারে যে সমঝোতা হয়েছে সেটা একেবারে গোপন রাখা হলো। রাত আটটায় প্রেসিডেন্ট জিয়া খেতে ডাকলেন বঙ্গভবনে, মনে মনে ভাবলাম নেপাল সফরের সফলতা শুনে আজ প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন। খাওয়ার টেবিলে আমরা দুজনই মাত্র ছিলাম। যতই সফরের বৃত্তান্ত দিচ্ছিলাম প্রেসিডেন্ট জিয়াকে ততই চিন্তামগ্ন মনে হচ্ছিল। হাজার ক্লান্তি বা দুশ্চিন্তায় প্রেসিডেন্ট জিয়ার চেহারার কোন পরিবর্তন হতো না। কিন্তু সেদিন সে চেহারার কেন জানি পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমার ভ্রমণের ব্যাপারে ভারতীয় সরকারের মনোভাব এবং ভারতীয় কাগজের মন্তব্য, রাজার সাথে আলোচনা সবই যেন জিয়াউর রহমানকে আরো দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি অনেকটা না খাওয়ার মতই উঠে পড়লেন। আমাকে বাইরে দাঁড়াতে বলে উনি একটি শোয়ার ঘরে গেলেন। অল্পক্ষণ পর বেরিয়ে এসে আমাকে নিয়ে ধানমন্ডিতে দলের অফিসে এলেন।

বাড়িতে ফিরেছি রাত ১১টার দিকে। শুনলাম বিএসএস, *দৈনিক অবজারভার* এবং আরো সব পত্রিকা অফিস থেকে সাংবাদিকরা বারকয়েক টেলিফোন করেছে আমার সাথে

www.pathagar.com

কথা বলার জন্য। ব্যাপারটা খুব জরুরি। বিএসএসকে টেলিফোন করাতে ওরা জানালো আমার নেপাল সফরের খবর পরিবেশনের ওপর সরকারি এমবার্গো অর্থাৎ বাধা এসেছে, ব্যাপারটা আমি জানি কিনা। আমাকে আরো বলা হলো, আজকে সন্ধ্যায় বিমানবন্দরে অমি যা বলেছি, তার কোন কিছুই কাগজে যাবে না। আমি তো হতবাক, এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সফরের কথা কাগজে বের হবে না, মানুষ কি ভাববে? নানা জায়গায় টেলিফোন করে জানার চেষ্টা করলাম, এটি কি করে সম্ভব হলো। শেষ পর্যন্ত প্রধান তথ্য অফিসার এনামুল হক সাহেব বললেন, প্রেসিডেন্ট নিজে তথ্যসচিবকে টেলিফোন করে এই খবর সংবাদপত্রে ছাপানো বন্ধ করেছেন। এমনকি তথ্যমন্ত্রীকেও বলা হয়নি। শুধু আশ্চর্যই হইনি, রীতিমত অপমানিত বোধ করলাম। সারা রাত ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলাম। কিছুদিন আগে জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে তাঁর মনে হয় জানুয়ারি নির্বাচনে ভারতে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতায় আসবেন। তাহলে ২০ জানুয়ারি দিল্লিতে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে ইন্দিরা গান্ধীর দেখা হবে। আঙ্কটাডের একটি সভায় অনেকটা নিজের থেকেই জিয়া দিল্লি যাবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন, যদিও এটি ঠিক সরকারপ্রধানদের সভা ছিল না, অর্থাৎ তিনি না গেলেও পারতেন। মিসেস গান্ধীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সমঝোতার প্রয়োজন ছিল। কারণ জিয়ার আমলেই ইন্দিরা সরকারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের সবচেয়ে বেশি অবনতি ঘটে। মুজিবের মৃত্যু এবং তারপর এক বছরের ওপর ভারতীয়দের সাহায্যেই পুরো ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের ওপর তখন হামলা চালানো হয়েছিল। ভারত সে সময় আবার কিছু লোককে প্রশিক্ষণ এবং গোলাবারুদও দিয়েছে, যার ফলে, পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, কাদের সিদ্দিকী এবং তার দলবল বার বার ওপার থেকে দেশের সীমান্তে হামলা করেছে। ফারাক্কার পানি ভারত এককভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করলে প্রেসিডেন্ট জিয়ার উদ্যোগে ব্যাপারটা আন্তর্জাতিকীকরণ করা হয় এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে ভারতকে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করতে অনেকটা বাধ্য করা হয়।

জিয়াউর রহমান মিসেস গান্ধীকে তাঁর একজন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে মনে করতেন এবং তাই এবার জিয়া সেই পুরোনো তিক্ত সম্পর্ক মুছে ফেলে নতুন সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হলেন। মিসেস গান্ধী ক্ষমতায় থাকতে একবার গুজব উঠেছিল যে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' জিয়াকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়েছিল। মিসেস গান্ধী ক্ষমতায় এলে সেই পরিকল্পনা যদি আবার হাতে নেয়া হয়, এই ভয়ও হয়তো তাঁর ছিল। যাই হোক মিসেস গান্ধীর সাথে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সমঝোতায় আসার এই উদ্যোগ একটি ভাল এবং পরিপক্ক কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল। গঙ্গার পানিপ্রবাহের ব্যাপারে ইন্দিরা সরকারের মনোভাব অত্যন্ত কড়া এবং পরিষ্কার। ভারত নেপালকে কোনভাবেই ভারত-বাংলাদেশের এই দ্বিপাক্ষিক ব্যাপারে জড়াতে রাজি নয়। এ ব্যাপারে যদিও দেশাই সরকারকে দিয়ে আমরা একটু এগিয়েছিলাম, কিন্তু ইন্দিরা সরকার ক্ষমতায় এলে সেটা আর অনুসরণ করা হবে না। ভারত আবার তার পুরোনো দ্বিপাক্ষিক bilateralism নীতিতে ফিরে যাবে। হয়তো তাই

www.pathagar.com

আমার এই নেপাল সফরের সফলতাকে প্রেসিডেন্ট জিয়া অন্যভাবে দেখেছেন। ইন্দিরা সরকার নেপালের ব্যাপারে বরাবরই খুব সেনসিটিভ। নেপালের সাথে আমাদের এই সমঝোতা, ইন্দিরার সাথে জিয়ার নতুন সম্পর্ক সৃষ্টির ব্যাপারে পথের কাঁটা হয়ে দেখা দিতে পারে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন অবশ্য *ইত্তেফাক* এবং আরো দুয়েকটি বেসরকারি কাগজে আমার নেপাল সফরের কথা বেরুলো কারণ দেশে আইনত কোন সেন্সরশীপ ছিল না। তাই সরকারি অনুরোধ এই কাগজগুলো আর রাখেনি।

নেপাল সফর নিয়ে যা ঘটল তা আমাকে আরো বিচলিত করে। যাই হোক এই সকল অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য অনেকটা নিজের উদ্যোগেই প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে কথাটা উঠালাম। ডিসেম্বরে শেষের দিকে অন্তত পাঁচ রাত সেনাভবনে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা করেছি। একেবারে খোলাখুলি আলোচনা। ওনার যা কিছু বলার ছিল উনি বলেছিলেন, আমারও যা কিছু বলার ছিল সব বলেছি। দেশের, দলের এবং সরকারে সকল সমস্যাই আমরা আলোচনা করেছি। এই একটানা আলোচনার ফলে ভুল বোঝাবুঝি সব দূর হয়েছে বলে মনে হলো। ২৮ ডিসেম্বর আমি নোয়াখালী গিয়েছি সফরে, পরদিন জেলা প্রশাসক খবর দিলেন ঢাকায় ফিরে যেতে। প্রেসিডেন্ট এবং বেগম জিয়া আমাদের বাসায় আসবেন সন্ধ্যায়। প্রেসিডেন্ট জিয়া কোনদিন কোন মন্ত্রীর বাসায় যেতেন না। অবাক হয়ে গেলাম। তাও আবার সস্ত্রীক। একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার। ঢাকায় ফিরলাম বিকালের দিকে, হাসনাকেও জানানো হয়েছে। আশপাশে আরো মন্ত্রীদের বাড়িতেও তাঁরা যাবেন, কিন্তু মনে হলো মূল উদ্দেশ্য আমাদের বাড়িতে আসা। সবাই ভাবল, সব জল্পনা-কল্পনা, ভুল বোঝাবুঝির অবসান বোধহয় হয়েছে। আমাদের সম্পর্ক আগেকার দিনের মত পুনরায় গভীর হয়েছে। তাঁর এই সস্ত্রীক আমার বাড়িতে আসা পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের বহিঃপ্রকাশই মাত্র। আমরাও খুশি হলাম।

সময়মত প্রেসিডেন্ট এলেন বেগম জিয়াকে নিয়ে। খুবই স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার দেখালেন। সাংসারিক কথাবার্তা হলো। চা-খেলেন। ঘুরে ফিরে বাড়ি দেখলেন। সময় হলো চলে যাওয়ার। পরের দিন আমার যে বইটা পশ্চিম জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ছাপিয়েছিল তার বাংলাদেশে প্রকাশনা অনুষ্ঠান ছিল। সেই বই "বাংলাদেশ: কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি"-এর একটি কপি দিলাম। বইটা টেবিলের ওপর রেখে চলে যাচ্ছিলেন, আমিই মনে করিয়ে হাতে তুলে দিলাম। ওরা চলে গেলেন। পরদিন ৩০ ডিসেম্বর আমার বইয়ের পরিচিতি অনুষ্ঠান ভালভাবেই হলো। ভাইস প্রেসিডেন্ট সাত্তারের সভাপতিত্বে এটমিক এনার্জি কমিশনের মিলনায়তনে। পরের দিন পত্রপত্রিকায় ভালই প্রচার হলো।

প্রেসিডেন্টের প্রেস কনসালটেন্ট দাউদ খান মজলিশ এর মধ্যে কয়েকবার বাসায় এসেছিলেন, প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে নানা বিষয়ে আমার মতামত জানার জন্য। তাঁর মাধ্যমেও নানা ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটেছে। ৩১ ডিসেম্বর দাউদ খান বলে বসলেন প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে, আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চাই না এটি লিখে দিতে। আমি তো হতবাক হয়ে গেলাম। এই কথাটা হঠাৎ কেন উঠল, এর তো কোন প্রাসঙ্গিকতা ছিল

www.pathagar.com

না। এতদিনের আলাপ-আলোচনার বা ভুল বোঝাবুঝিতে এ ধরনের কোন কথা তো হয়নি। এই প্রশ্নটা কোনদিন ওঠেনি। এ ধরনের লেখার কি অর্থ থাকতে পারে। আর আমার তো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। উপপ্রধানমন্ত্রী হয়েছি সেটাই তো বেশি এবং সেইজন্য আমি তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য আরো দশ বছরও অপেক্ষা করতে পারি। একবার মনে হলো লিখেই দেই, তবুও তাঁর মনের সমস্ত সন্দেহ দূর হোক। পর মুহূর্তে ব্যাপারটাকে অহেতুক মনে হলো। প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম। আমি বলা না বলার ওপর কিছু নির্ভর করে নাকি? প্রেসিডেন্ট নিয়োগ না করলে কারো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার উপায় আছে নাকি? তাছাড়া প্রেসিডেন্ট জিয়ার অজ্ঞাতে এটি একটি ষড়যন্ত্র হতে পারে। আমাকে বিপদে ফেলা বা রাজনৈতিকভাবে বিব্রত করার জন্যই হয়তো এই প্রস্তাব। এসব কথা দাউদ খানকে বুঝিয়ে বললাম।

পরের দিন ১ জানুয়ারি বঙ্গভবনে রাত ন'টায় প্রেসিডেন্ট জিয়া আমাকে ডাকলেন। দাউদ খানও ছিলেন। গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টা হলো। প্রেসিডেন্ট বললেন, তাঁর মনে এখন আর কোন দ্বিধা নেই। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আমরা জোরে হাত মিলালাম, একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। হাসি এবং উষ্ণ একটি সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বিদায় নিলাম।

পরের দিন ২ জানুয়ারি। আসিফ আর আমান আমাকে যথারীতি অফিসে নামিয়ে দিয়ে গেল। বলতে গেলে গাড়িতে চলার ঐ সময়টুকুই ওদের এত কাছে পাওয়ার সুযোগ, কিছু কথা বলতে পারি। গতকাল রাতে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে কথা বলার পর মনটা হাল্কা মনে হচ্ছিল। কিছুক্ষণ কাজ করার পর নারায়ণগঞ্জে ড্রেজার সংস্থা দেখতে গেলাম, সরকারের কোটি কোটি টাকা কিভাবে নষ্ট হচ্ছে সেটা দেখার জন্য। ১২টার দিকে ফিরে শুনলাম প্রেসিডেন্ট খোঁজ করেছেন। টেলিফোন করাতে উনি বললেন দেখা করতে। বঙ্গভবনে গেলাম। প্রেসিডেন্ট একাই। কয়েক মিনিট এটা সেটা আলাপ করার পর অত্যন্ত শান্ত এবং স্থির কণ্ঠে বললেন, আমার সাথে ওনার অনেক মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। আবার সেই পুরোনো কথা, কিন্তু এবার গলার স্বর ছিল একটু ভিন্ন। দলের গণতন্ত্রায়নের ব্যাপারে আমার সাথে উনি একমত নন। অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। আমি উনার বিপ্লব সমর্থন করি না, ইত্যাদি। উনি পাশে টেবিলের ড্রয়ার থেকে নিজের হাতে ইংরেজিতে লাল কালি দিয়ে লেখা একটি কাগজ আমার সামনে দিলেন। লেখা আছে জাতীয় স্বার্থে আমার সার্ভিস আর দরকার নেই। নোটটা পড়ে বললাম, "আমি এটিকে গ্রহণ করে নিচ্ছি। আপনার সফলতা কামনা করি।" এর একটি উত্তর বিকালে পাঠিয়ে দেব বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। এর মধ্যে রেডিওতে খবরটা প্রচারিত হওয়ায় অফিসে লোকের ভিড় হতে লাগল। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সব সাক্ষাৎ করার জন্য এলো। হাত মিলিয়ে তাদের বিদায় দিলাম। কয়েকজনকে দেখলাম অশ্রুসিক্ত। নিজের ব্যক্তিগত দুচারটি জিনিস গুছিয়ে নিয়ে বিকালে সাংবাদিক সম্মেলন করার কথা বলে নিচে নেমে গেলাম। বাড়িতে কিছু বন্ধুবান্ধব, পার্লামেন্ট সদস্য, দলীয় নেতাকর্মী এসেছেন। সরকারের একজন কর্মকর্তা আবুল মাল আবদুল মুহিত ভাইও এলেন। এরই ফাঁকে আমার উত্তর তৈরি করে প্রেসিডেন্ট জিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

www.pathagar.com

সাংবাদিক সম্মেলন যেন না করি তার জন্য অনেক চাপ সৃষ্টি করা হলো। ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে দাউদ খান এলেন বাড়িতে। ভাইস প্রেসিডেন্ট সাত্তার টেলিফোন করলেন, বারণ করলেন সাংবাদিকদের কিছু বলতে। তাঁকে বললাম, আমি একজন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, দেশের প্রতি এটি আমার কর্তব্য, কি ঘটেছে মানুষকে সেটা বলার প্রয়োজন আছে। আমি চাকরিজীবী ছিলাম না। প্রেসিডেন্ট জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশুকে বললেন আমাকে বারণ করার জন্য। আমি কারো কথা শুনিনি। প্রেসিডেন্ট জিয়া ভেবেছিলেন আমি বোধহয় তাঁর খুব সমালোচনা করব। সরকারের ভেতরের কথা সব বলে দেব। নেপালের প্রসঙ্গ টেনে আনব। আমি বোধহয় রাগ করে, আবেগপ্রবণ হয়ে সরকারের তীব্র সমালোচনা করব। তাঁকে বেকায়দায় ফেলব, দল ভেঙে দেব। দেশের অনেক রাজনৈতিক সংগঠন এবং সাংবাদিকরা সেটাই ভেবেছিলেন। কিন্তু আমি ওসব কিছুই চিন্তা করিনি।

আমি শুধু সেদিনকার ঘটনা, প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে মতবিরোধের কথা, আর দলের গণতন্ত্রায়নের জন্য আমার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে বিএনপিকে একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন শেষ করলাম। যারা গোলমাল আশা করেছিল তারা হতাশ হলো। রাজনৈতিক দলগুলো ভাবল আমি একজন জাতীয় নেতা হওয়ার একটি সুবর্ণ সুযোগ হারিয়েছি। কিন্তু সেটা ঠিক হতো না। আমাদের তৃতীয় বিশ্বের নিয়ম হলো মতের অমিল হলে, গদিচ্যুত হলে মন্দ কথা বলা, গালিগালাজ করা। তখন সব খারাপ হয়ে যায়, আর ক্ষমতায় থাকলেই সব ভাল। এরপরও আমার সাংবাদিক সম্মেলনে জিয়াউর রহমান অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আর এদিকে আমি যে গঠনমূলক কথা বলেছিলাম সেটাও মানুষজন খুব বেশি ভালভাবে গ্রহণ করেছে বলে মনে হলো না। এসব ব্যাপারে আমাদের দেশের মানুষ বোধহয় উত্তেজনা এবং চরম কিছুই প্রত্যাশা করে। প্রেসিডেন্ট জিয়া অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন অন্য আর একটি কারণে। সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে সাংবাদিকরা খুব চাপ সৃষ্টি করলেন প্রেসিডেন্ট জিয়া আমাকে যে চিঠি দিয়েছেন তা জানতে এবং দেখতে। কোন পত্রিকায় ছাপানো হবে না এই শর্তে আমি চিঠিখানা পড়ে শোনালাম। কোন কপি কাউকে দিলাম না। আমি এই চিঠি পড়ে শোনানোর সময় চিঠিতে ভাষাগত সামান্য ভুলের কথা উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু আমার শর্তানুযায়ী অন্য কোন কাগজে ছাপানো না হলেও *ইত্তেফাক* চিঠির কথা সেইসঙ্গে আমার আনুষঙ্গিক মন্তব্য ছাপিয়ে দেয়। প্রেসিডেন্ট জিয়া রাগ করেছিলেন চিঠিতে ভুল আছে বলার কারণে। আমার উদ্দেশ্য ছিল একথা বলার যে, আমি কোন সার্ভিসের কর্মচারী ছিলাম না। আমি ছিলাম তাঁর একজন উপপ্রধানমন্ত্রী এবং একজন নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য। অথচ তিনি জানালেন আমার সার্ভিসের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু মনে হলো প্রেসিডেন্ট জিয়া সেইভাবে বিষয়টি বিবেচনা করেননি।

পরের দিন ৩ জানুয়ারি। ভারতের সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকারে ফিরে এলেন। তার ১৫ দিন পর প্রেসিডেন্ট জিয়া গেলেন ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে।

www.pathagar.com

আমার সরকার ত্যাগের খবর নেপালের খবরের কাগজগুলো বেশ গুরুত্বের সাথে ছাপিয়েছিল। বোধহয় ফেব্রুয়ারি মাসেই রাজা বীরেন্দ্র দিল্লি যাওয়ার পথে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় সফরে এলেন। তাঁর দেশ থেকেই আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছিল যে, তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। কিন্তু আমাদের সরকার তার কোন জবাব দেননি এবং আমার সাথেও কেউ যোগাযোগ করেনি। আমি সরকারে নেই অথচ রাজা দেখা করতে চান এটি তাঁদের কাছে সম্ভবত ভাল লাগেনি। আবার রাষ্ট্রীয় কোন অতিথির অনুরোধ না রাখাটা কূটনৈতিকভাবে ভাল দেখায় না। আমাদের দেশে ক্ষমতাচ্যুত হলে মানুষের আর কোন দাম থাকে না। সকলেই দূরে সরে যায়। শঙ্কিত হয়, ভয় পায়, কোন্ দুর্বলতা থেকে সেরকম মনোভাবের সৃষ্টি হয় জানি না, তবে এটিই আমাদের দেশের নিয়ম। ক্ষমতায় বা ক্ষমতার কাছাকাছি বা ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকলেই বন্ধুদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। ঘরে সবসময় ভিড় থাকে। আর তা না হলে নয়। যাই হোক এখানে ব্যাপারটা ছিল সরকারি এবং উঁচু মহলের। রাজা এলেন। যেদিন চলে যাবেন তার আগের দিন দুপুরে নেপালি দূতাবাসের একজন অফিসার টেলিফোন করে জানতে চাইলেন সেদিন সন্ধ্যা ছ'টায় রাজার সাথে আমার সাক্ষাতের সময় যে ঠিক করা আছে, আমি যাচ্ছি কিনা। সেই অফিসারই বললেন, চার পাঁচ দিন আগেই রাজার ইচ্ছা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। আমি যে কিছুই জানি না, তা শুনে ঐ অফিসার খুবই আশ্চর্য হলেন। রাজা দেখা করতে চাওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই আমাদের দেশের স্বার্থ যে জড়িত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেন জানি পানিসম্পদমন্ত্রীরা যারাই দেশের স্বার্থ দেখতে চেয়েছে তাদের ঐ মন্ত্রণালয় থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। নেপালকেও এ ব্যাপারটা চিন্তিত করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। নেপালি অফিসারকে বললাম, আমি খবর নিয়ে তাঁকে জানাবো। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামসুল হক সাহেবকে টেলিফোন করলাম। ভেতরে কি ব্যাপার ছিল জানি না। তাঁকে শুধু বললাম, আমি যদি না যাই সেটা তো আরো খারাপ দেখাবে। যাই হোক তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলে আমাকে কিছুক্ষণ পর টেলিফোন করলেন এবং আমাকে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

রাজা বীরেন্দ্র ছিলেন খুব বুদ্ধিমান এবং অমায়িক। উচ্চশিক্ষিত এবং সেইসঙ্গে বিচক্ষণও। নিজের দেশের স্বার্থরক্ষা করতে চান। এখান থেকে যাচ্ছেন দিল্লিতে। তাই আমাদের অবস্থাটা বুঝে নিতে চান। ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের প্রতি আমাদের মনোভাবটা জানতে চান। আমাকে সাদরে অর্ভ্যর্থনা জানালেন বঙ্গভবনের পেছনের দিকের দোতলায়। আমার লেখা বইটা তাঁকে উপহার দিলাম। জানতে চাইলেন কি হয়েছিল, কেমন আছি। প্রথম প্রশ্ন অনেকটা এড়িয়ে গেলাম। নিজেদের কথা বাইরে বলাটা ঠিক দেখায় না। আবার কথাটা উঠাতে বললাম, দলীয় কিছু অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। এখন বেশ ভাল আছি। ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করার সময় পাচ্ছি। ফারাক্কা বা গঙ্গার কোন কথা তাঁকে বললাম না। নেপাল থেকে ফিরে আসার পর কি

www.pathagar.com

ঘটেছে তা রাজা জানতে চাইলেও কিছু বলিনি। তবুও রাজা বোধহয় সবকিছু বুঝতে পারলেন। বাংলাদেশ আর শক্ত অবস্থান নিতে পারছে না, মন্ত্রিসভা থেকে আমার বিদায় সম্ভবত তারই ইঙ্গিত। তারপর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি নিয়ে কথা বলে চা খেয়ে চলে এলাম। ঐ সন্ধ্যায় রাজা পানি বিশেষজ্ঞ জনাব আব্বাসের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন।

যাই হোক রাজার সেইবারের দিল্লি ভ্রমণেই আমার যে ভয়টা ছিল সেটা ঘটল। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একটি ইকোয়েশন করতে গিয়ে আমরা গঙ্গার পানিপ্রবাহের প্রস্তাবে নেপালের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে শক্ত থাকতে পারিনি। নেপালের অবস্থা তো আরো নাজুক। কিছুদিন পর খবরের কাগজের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, কার্নালী নদীর পানিসম্পদ ব্যবহারের জন্য ভারতের সাথে নেপালের একটি চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তি প্রাথমিক হলেও এটি বাংলাদেশের প্রস্তাবিত অবস্থাকে অনেক পিছিয়ে নিয়ে গেল। এ ব্যাপারে ভারত যদি আরো এক ধাপ এগোয় তখন নেপালে জলাধার নির্মাণ করে গঙ্গার পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির বাংলাদেশের প্রস্তাব অর্থহীন হয়ে যাবে। আমি নেপালে গিয়ে যে সমঝোতা করে এসেছিলাম, তাঁর মৃত্যু এত তাড়াতাড়ি হবে ভাবতে পারিনি।

এদিকে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করার পরের দিনই সরকারি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। মালপত্র নিয়ে যেতে আরো দুয়েকদিন সময় লাগে। আইনত সরকারি বাসায় আরো অন্তত এক মাস পর্যন্ত থাকা যেত। গাড়ি নেই, ব্যাংকে যে টাকা ছিল প্রায় সব শেষ। মন্ত্রী হিসেবে সরকার দুহাজার টাকা বেতন দিয়েছে মাসে, আর পনের শ' টাকা আপ্যায়ন ভাতা। অথচ মাসে লেগেছে দশ-বার হাজার টাকা। বাকিটা বাড়ি ভাড়া আর ব্যাংকে গচ্ছিত যা ছিল সে টাকা দিয়ে হাসনা চালিয়েছে। শ্বশুর বাড়িতে বিয়ের পর কোনদিন থাকিনি। এবার সেখানে গিয়েই উঠলাম একটি কামরায়। তবুও সরকারি বাড়িতে আর থাকতে ইচ্ছা করল না। প্রেসিডেন্ট জিয়ার ওপর ভীষণ অভিমান হলো। এত নিকটের ছিলাম, এত বিশ্বাসের সাথে কাজ করেছি। আর তিনি কিনা শাহ আজিজদের কথার ওপর নির্ভর করে আমাকে ভুল বুঝলেন! বুঝতে পারলাম, আমি একটি গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি। এখন সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা হলো আসিফের পাশে থাকতে পারব, তাকে সঙ্গ দিতে পারব। এসব ঘটনায় তার মনে 'কি' প্রভাব পড়েছিল জানি না তবে বাচ্চারা যে কিছুই বোঝে না তা নয়। তার মনেও নিশ্চয়ই এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে। হয়তো আমাদের চেয়ে আরো বেশি।

আমাদের দেশে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন হয়নি বলে, কোন ব্যক্তির সরকারে যাওয়া বা মন্ত্রী হওয়াকে একটা বিরাট কিছু মনে করা হয়। তাই সরকার থেকে মতবিরোধ বা যে কোন কারণেই কারো বের হওয়া বা বের করে দেয়ার পর বিরোধী দলগুলো হাতে তালি দেয়, বুদ্ধিজীবীরা মুচকি হাসে, মধ্যবিত্তরা আনন্দ পায়, বন্ধু-বান্ধবরাও অনেকে খুশি হয়। মোসাহেবরা সরকারপ্রধানকে অভিনন্দন জানায়, আর ফেলে দেয়া ব্যক্তিকে ধিক্কার দেয়। সংবাদপত্রগুলো সে ব্যক্তির আর খবর নেয় না। এ সমাজে কারো পতনেই যেন সকলের আনন্দ, এতে যেন সকলেই অমৃতের

www.pathagar.com

এক সুধা পায়। উল্লাসের কারণ খুঁজে পায়। এই মানসিকতা কোন রোগ কিনা জানি না, তবে এটি যে বাস্তব তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই মনোভাব অত্যন্ত প্রকট। গ্রামের মানুষের কথা আলাদা। তারা সবকিছু সহজ সরলভাবে দেখে।

এই সময় কিছু লোক খুব তৎপর হয়ে ওঠে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে ভালবাসে। দুর্বলকে আরো ঘায়েল করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। বিশেষ করে সরকারি গোয়েন্দা বিভাগগুলো এবং তোষামোদকারী কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং আমলা যাঁরা কর্তার আশপাশে থাকেন। যে ব্যক্তি গতকালই ছিল পুণ্যজন, যার সাহস এবং বুদ্ধির জয়গান গেয়েছে সবাই, আজ তার সমস্ত মন্দ জিনিস খুঁজে এবং তুলে ধরতে তারাই হয়ে ওঠে ব্যগ্র। কর্তা যে কত ভাল কাজ করেছেন সেটাই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়, তারপর বিতাড়িত ব্যক্তিকে আরো কিভাবে ঘায়েল করা যায় তার ফন্দিফিকির বের করে। আর এর মোক্ষম অস্ত্র হলো দুর্নীতি বের করা। এটি এমন এক জিনিস যেটা কাউকে অপমান করার জন্য সর্বজনীন এবং সহজতম উপায়। ক্ষমতায় থাকলে দুর্নীতিবাজরাও সবাই ফেরেস্তা আর কোন কারণে ক্ষমতাচ্যুত হলেই সেই ব্যক্তি আর ভাল না, সে অবশ্যই দুর্নীতিবাজ। আর সবচেয়ে মজা হলো আমাদের দেশে এই অস্ত্র ব্যবহার করা হয় রাজনীতিবিদ বা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বা রাজনৈতিক মতামত সম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যাপারে। অথচ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ১২ বছরের বেশিরভাগ সময়ে সামরিক-বেসামরিক আমলারাই দেশ চালিয়েছে। গত ৮ বছরে যত মানুষ মন্ত্রী হয়েছে তাদের ৭০ ভাগই ছিল সামরিক বেসামরিক আমলা। ওরা কিন্তু সব সৎ, কেউ দুর্নীতিবাজ নয়! ওদের আসা-যাওয়া উল্লাস সৃষ্টি করে না। রাজনৈতিক দল বা সংবাদপত্র ওদের সম্পর্কে কিছু বলে না। দুর্নীতির অভিযোগে ওদের একজনেরও বিচার হয় না। ওদের ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের মুখে শ্লেষের হাসি ফুটে ওঠে না। মধ্যবিত্ত আনন্দ বোধ করে না। ওদের কোন শত্রু নেই, ওরা সকলেরই চিরকালের বন্ধু!

আমি যেসব মন্ত্রণালয়ে কাজ করেছি সেসব মন্ত্রণালয়ের সমস্ত ফাইল গোয়েন্দা বিভাগগুলো তন্নতন্ন করে দেখেছে। আজ এই ফাইল, কাল ঐ ফাইল, গ্রামদেশের বাড়ির ভিটায় কোন প্রাসাদ তৈরি করেছি কিনা, সবকিছু। অফিসের কর্মচারীরাই এসে খবর দিয়ে যায়। অনেককে চিনিও না, তারাই এসে সব বলে যায়। কিন্তু কি বের করবে? আমি তো অন্যায় কিছু করিনি। নিজের জন্য বা আত্মীয়স্বজনদের জন্য কিছুই করিনি। পারলে অন্যদের উপকার করার চেষ্টা করেছি, যারা আমার রক্ত সম্পর্কের কেউ না। আমার ভাইবোন আত্মীয়স্বজনরা আমার কাছে ঘেঁষেনি। ওদের মধ্যে কেউ ব্যবসাও করে না। আর দলের জন্য আমি তো কোন চাঁদাও তুলিনি, আর তাই অন্যায়ভাবে কোন কাজও আমাকে কারো জন্য করতে হয়নি। যেটা দেশের জন্য, দশের জন্য ভাল সেটাই করেছি। তাই অনেক চেষ্টা করেও আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাঁড় করাতে পারলো না। এই চাঁদা নিয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে আমার ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। মাসে তিন

www.pathagar.com

লাখ টাকা করে দশজন মন্ত্রীকে দলের জন্য চাঁদা দিতে বলা হয়েছিল। আমার নামও দেয়া হয়েছিল তাতে। কিন্তু আমি এভাবে চাঁদা দেয়ার পদ্ধতির বিরোধিতা করেছিলাম। প্রেসিডেন্ট জিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, তর্ক করেছি। রাজনীতিতে অর্থের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তাই নিজের ফর্মুলাও দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা গৃহীত হয়নি। যাক আমি আর শেষ পর্যন্ত চাঁদা দেইনি। জাহাজমন্ত্রী নূরুল হকও চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন। এই অবাধ্যতা প্রেসিডেন্ট জিয়ার পছন্দ হয়নি।

একদিকে এসব চলছে, অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট জিয়া আমার খবরও নিয়েছেন। সরকার ত্যাগ করার চার পাঁচ দিন পর বিচারপতি সাত্তার বাসায় এলেন খোঁজখবর নিতে। আসিফকে দেখতে। আমার জন্য দুঃখ করলেন। বললেন, জিয়াকে তিনি বলেছেন যে, এটি তিনি ভুল করেছেন, যা হওয়ার হয়ে গেছে, উনি বললেন এসব সহজে মেনে নিতে। আমারও যেসব অভিযোগ ছিল বললাম। সমস্ত ঘটনাও তাঁকে বললাম। পার্টির কাউন্সিল সভায় আমাকে যেতে অনুরোধ করে তিনি বিদায় নিলেন। এর কিছুদিন পর রাত ১১টার দিকে আসলেন উপপ্রধানমন্ত্রী জামালউদ্দিন আহমেদ। সেই একই কথা, যা হওয়ার হয়ে গেছে। একসাথে কাজ করতে হবে। আমি জানতাম এদের মনে ভয় ছিল আমার প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নিয়ে। জিয়ার জীবদ্দশায় আর একটি বিএনপি হলে প্রেসিডেন্টের ইমেজ খুবই নষ্ট হতো। আমি তাঁর খুব কাছের মানুষ ছিলাম, তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। একটি বিব্রতকর পরিস্থিতি হতো। আমি কিন্তু সেরকম কোন কিছু চিন্তাই করিনি। নিজের গুরুত্ব বাড়ানো বা স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যাঙের ছাতার মত রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করার সম্পূর্ণ বিপক্ষে আমি। আর তাছাড়া রাজনীতি আমার পেশা বা জীবিকাও নয়। আর মতবিরোধ হলেই, সরকার থেকে বের করে দিলেই আর একটি রাজনৈতিক দল করতে হবে, দল ভাঙতে হবে নিজের ইগোকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, এসব চিন্তাধারা আমাকে কোনদিনই প্রভাবিত করেনি, আমার মনের মধ্যে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করেনি।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীদের ধর্মঘট ১৬ দিন পার হয়ে যাওয়ার পর একদিন মন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী এলেন আমাকে প্রায় জোর করে প্রেসিডেন্ট জিয়ার কাছে নিয়ে যেতে। প্রেসিডেন্টের হুকুম। গাড়িতে উঠে ফার্মগেট গিয়ে বুঝতে পারলাম পার্টি অফিসে যাচ্ছি, আমি রাজি হলাম না। ফিরে এলাম। পরের দিন আবার এলেন, বঙ্গভবনে গেলাম। ঐ ধর্মঘট চলার প্রধান কারণ ছিল কর্মচারীদের সাথে সরকারের না বসার সিদ্ধান্ত। ধর্মঘট বেআইনি, কর্মচারীদের দাবি অমূলক এবং সরকার ধর্মঘটীদের কোন স্বীকৃতি দিতে চায় না। অথচ এই ধর্মঘটের ফলে পুরো সরকারই তখন প্রায় অচল হতে চলেছে। ওদিকে বিরোধী দলগুলো পার্লামেন্ট বর্জন করে চলেছে। আমাকে আলাদা ঘরে নিয়ে প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, কি করা যায়। বললাম ফুটবল খেলার জন্য মাঠে নেমে ক্রিকেট খেলার নিয়ম প্রয়োগ করলে চলবে না। গণতন্ত্রের একটি মূল প্রক্রিয়া হলো সরকারি দলের সাথে বিরোধী দল বা গোষ্ঠীর সাথে আলোচনার পথ উন্মুক্ত রাখা, যোগাযোগের একটি সূত্র খোলা রাখা। ওটা বন্ধ হয়ে গেলে গণতন্ত্র

www.pathagar.com

আর চলে না, গণতন্ত্র অকেজো হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট জিয়া বললেন, তাঁর মন্ত্রিসভায় শিক্ষিত এবং কর্মক্ষম অনেক ব্যক্তি তো রয়েছেন এবং তাঁরা সবাই চেষ্টা করছেন। বললাম কথাটা ঠিক, কিন্তু ফুটবল খেলায় ক্রিকেটের খেলোয়াড় নামালে তো চলবে না। যাই হোক তাঁকে বললাম, গণতন্ত্রের খেলায় কারো সাথে বসবো না এটি নিয়মবহির্ভূত দৃষ্টিভঙ্গি, এই খেলার নিয়ম হলো সকলের সাথে বসতে হবে। আলোচনার পথ খোলা রাখতে হবে। আইনের চুলচেরা বাণী অনুসরণ করে ক্যান্টনমেন্ট বা সামরিক শাসন চালানো যায়, কিন্তু গণতন্ত্রের খেলায় তা চলে না। সরকারি কর্মচারী হোক আর যারাই হোক, সমস্যা নিরসনের জন্য তাদের সাথেও বসতে হবে। এতদিন ধর্মঘট করার পর তাদেরও তো পেটচলার প্রশ্ন আছে। এটি একটি জনপ্রিয় সরকার, তাই সাধারণ মানুষ সরকারের পক্ষেই রয়েছে। ওদের ডেকে ভাল করে কথা বলে, দাবি বিবেচনা করা হবে বললে কাজ হতে পারে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে যে কমিটি আছে সেটা ভেঙে বিচারপতি সাত্তারকে দিয়ে কমিটি করে কর্মচারীদের সাথে কথা বলার পরামর্শ দিলাম। সেই রাতেই বিচারপতি সাত্তারকে দিয়ে নতুন কমিটি করা হলো, আর তার একদিন পরই ধর্মঘট শেষ হয়ে গেল।

পার্লামেন্টের ব্যাপারটা ছিল আরো জটিল। শাহ্ আজিজ ভাল বক্তা, সংসদীয় অভিজ্ঞতাও অনেক, কিন্তু পার্লামেন্ট নেতা হিসেবে তাঁর অনেকগুলো ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক সমস্যা ছিল। তাঁর সঙ্কীর্ণ ও অনেক সময় উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁর প্রতিশ্রুতি বা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন ছিল। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বিরোধিতা করায় রাজাকার বলেই তাঁর পরিচিতি। শাহ্ আজিজের এই ভূমিকার জন্য আওয়ামী লীগ-জাসদসহ স্বাধীনতার পক্ষের দলগুলো তাঁকে শুধু অবিশ্বাসই নয়, হেয় চোখে দেখত, অথচ এরাই ছিল মূল বিরোধী দল। তাই পার্লামেন্ট নেতা এবং বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একটি দূরত্ব সবময়ই উপস্থিত ছিল। ওরা কোন জটিল ব্যাপারে শাহ্ আজিজের সাথে বসতে চাইতো না, এবং এই কারণেই প্রায় সময় পার্লামেন্টে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। যাই হোক সেক্রেটারিয়েটের ধর্মঘট শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে আমার প্রচেষ্টায় একইভাবে পার্লামেন্টের তখনকার সঙ্কটও কেটে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১১

আসিফের মৃত্যু আর আমানের প্রতিবন্ধিতা

এর মধ্যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশু হাসপাতাল বস্টন চিলড্রেন হসপিটালে আসিফের চিকিৎসা হলো আরো দুমাস। পৃথিবীর যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে সবই করা হয়েছে, হাসনা টেলিফোন করে মাঝে মাঝে ভাল, আবার মাঝে মাঝে আশঙ্কাজনক খবর দিত। এই রোগের কোন কারণ ওরাও খুঁজে বের করতে পারলো না। তাই সব চিকিৎসাই হলো পরীক্ষামূলকভাবে। অক্সিজেন টেন্টে থাকলে আসিফ ফুসফুসে আরাম পায় এবং এর ফলে ও হয়তো বেঁচে যেতে পারে, শেষ পর্যন্ত এই ধরনের একটি আশা নিয়ে হাসনা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ঢাকায় ফিরে আসল। এর আগে টেলিফোনে আসিফ বার বার বলেছে সে ঢাকায় ফিরে আসতে চায়, আমাকে দেখতে চায়। এয়ারপোর্টে ওকে আনতে গেলাম। আসিফ নীল রঙের বাচ্চাদের স্যুট পরেছে, আমাকে দেখে বেজায় খুশি। পদ্মের মত ওর কোমল মুখটায় হাসির ছটা লেগেছিল। কোলে নিতে চাইলাম কিন্তু উঠল না। বার বার ওর স্যুটটা দেখালো এবং আরো কত কি এনেছে সেইসব বলল।

ওর জন্য ডাক্তারদের পরামর্শমত হাসনা একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অক্সিজেন টেন্ট অর্ডার দিয়ে এসেছে। সঙ্গে পয়সা ছিল না, তাই ঠিক হলো হাইকমিশনার মিনু দোহা ওটা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবস্থা করে পাঠাবেন বাকিতে, পরে টাকা পাঠিয়ে দেয়া হবে। সাথে করে এনেছে একটি পোর্টেবল ব্যবস্থা, শুধু মুখ ঢেকে নাক দিয়ে অক্সিজেন নেয়ার ব্যবস্থা। টেন্টটা আসতে প্রায় মাসখানেক সময় লাগবে, এর মধ্যে ঐ মুখে ঢাকা যন্ত্রটা দিয়ে কাজ চালাতে হবে। বড় অস্বস্তিকর একটি ব্যবস্থা, কিন্তু দেখলাম আসিফ ওটা ব্যবহার করতে আপত্তি করে না। হয়তো আরাম পায় বলে। অক্সিজেন কোম্পানি থেকে সিলিন্ডার আনতে হয় রোজ দুটো বড় সাইজের। রাতে ঘুমানোর সময় ওটা মুখে লাগিয়ে অক্সিজেন ছেড়ে মাথা সিধা রেখে আসিফকে ঘুমাতে হয়। আমার তো বাড়িতে যাওয়া-আসার সময় ঠিক নেই। পিতার মনের দহন পুত্রকে বুঝতে দিতাম না। মুখে ও নাকে অক্সিজেনের মুখবন্ধনটা লাগানো থাকলে আসিফকে ঘুমের সময় খুব শুভ্র ও সুন্দর মনে হতো। কোন স্বপ্নপুরির রাজকুমারের মত। পূর্ণিমা চাঁদের আলোর মত মসৃণ মনে হতো ওর মুখের অবয়বকে। এখন আর আসিফ সাইকেল চালায় না, ওর শরীরে আর কুলায় না। ওর ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ড ওকে আর

www.pathagar.com

সাইকেলে চড়তে দেয় না। ওর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল সাইকেল চালানো। এখন সে তার ট্রাই সাইকেল, বাই সাইকেলগুলোকে, নতুন-পুরোনো, সবগুলোকে এক জায়গায় লাইন করে রাখে। একটি একটি করে এগুলোতে সে চড়ে, কিন্তু চালায় না। বাড়ির কোন লোক বা ড্রাইভারকে বলে ঠেলতে, জোরে জোরে ঠেলতে। আমি নিজও অনেক সময় ঠেলেছি। তারপর সাইকেলগুলোকে পরিষ্কার করে, পানি দিয়ে ধোয়। তারপর আবার লাইন করে রাখে।

সরকারি গাড়ির ড্রাইভার নির্মল হয়ে উঠল আসিফের নিত্যসঙ্গী। রোজ সে নির্মলের সঙ্গে যায় তার জীবনযুদ্ধের একমাত্র সাথী অক্সিজেন আনতে। দুটো খালি সিলিন্ডার ফেরত দিয়ে দুটো ভরা সিলিন্ডার আনতো বাংলাদেশ অক্সিজেন কোম্পানি থেকে। এক চমৎকার অনুভূতিশীল মানুষ ছিলেন অক্সিজেনের কর্মকর্তা সাবেক গভর্নর জাকির হোসেনের পুত্র আদিল হোসেন। এ ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। অক্সিজেনের জন্য গাড়ি করে যাওয়া-আসা আসিফ খুব উপভোগ করত। মাঝে মাঝে সাথে করে আমানকেও নিয়ে যেত। নির্মলই ওকে কোলে করে উঠাত-নামাত, মাঠে নিয়ে যেত, বসে বসে ওর সাথে খেলত। আসিফ ওর সাথে হুকুমদারি করত। নির্মল কিছু বলত না, সস্নেহে আসিফের সব কথা শুনত।

সরকারি বাড়ি ছেড়ে কমলাপুরে কবি জসীমউদ্‌দীনের বাড়িতে ওঠার কিছুদিনের মধ্যে বিলেত থেকে আসিফের অক্সিজেন টেন্ট চলে এলো। বাংলাদেশ অক্সিজেনের আদিল হোসেন এবার নিজে লোকজন এনে যন্ত্রটা খুব যত্ন করে লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন শুধু রাতেরবেলাতেই নয় দিনেরবেলাতেও আসিফ দুয়েকঘণ্টা তাঁবুর ভেতর থাকে এবং থাকলে ওর ভাল লাগে। আসিফই হয়ে গেল আমাদের জীবনের সবকিছু। তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের জীবনটা যেন নতুন করে শুরু হলো। তাঁবু আসার পর ওর শরীরটা একটু ভাল হতে লাগল, মনে হলো ও যেন একটু ভাল রয়েছে। আসিফ যেদিন ভাল থাকত, আমরাও সেদিন ভাল থাকতাম। ও হাসলে আমাদের মুখেও হাসি ফুটত, সবসময় মনে হয়েছে ও যেন ভাল হয়ে যাচ্ছে। গান গাইতো, সিল্কের মত তার চুল নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে। হাসতো, খেলত, লেখাপড়াও শুরু করেছিল আবার। শারীরিক কারণে সানবীম স্কুলে আর আসিফের যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তাই শেষের দিকে বাড়িতেই লেখাপড়া করেছে।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আমরা ইস্পাহানী কলোনিতে একতলায় দুটো লাগানো ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতে এলাম। আসিফ গাড়ি খুব পছন্দ করত। আর ম্যাচবক্স গাড়ি ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়। এক বাক্স ভর্তি ঐ গাড়ি নিয়ে খেলত। রোজ আসিফের জন্য বড় বড় সিলিন্ডার করে অক্সিজেন আনতে হতো। এখন দিনেরবেলাতেও অক্সিজেন ব্যবহার করে বলে আরো বড় বড় দুটো সিলিন্ডার লাগে। আসিফ আর বাইরে খুব বেশি যায় না। বাড়িতেই বসে বসে ছবি আঁকে, খেলে। ফ্ল্যাটের বাইরেই ছিল বাচ্চাদের সুন্দর মাঠ। ওখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সকাল বিকাল খেলে। প্রথম প্রথম আসিফ যেত খেলতে, কিন্তু আস্তে আস্তে বন্ধ করা শুরু করল। যে ছেলে এত দৌড়াদৌড়ি করত সে আর এখন একেবারেই দৌড়ায় না। ভুলে কোন কারণে দৌড় দিলে আবার থেমে যেত। ওর হৃৎপিণ্ড তখন ওর সঞ্চালন শক্তিকে দারুণভাবে বাধা দেয়া শুরু করেছিল।

www.pathagar.com

রোজগারের জন্য আমাকে চেম্বারে যাওয়া শুরু করতে হলো। সুপ্রিমকোর্টে মামলা নিতে শুরু করলাম। কিন্তু বিকালে তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফিরে যেতাম। আসিফ ঐ সময় সেজেগুজে বসে থাকত। সরকার ছাড়ার পর আমাদের ব্যবহারের জন্য ১০/১২ বছরের একটি পুরোনো গাড়ি বন্ধু আজিজের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম। দুই ভাইকে নিয়ে ঐ গাড়ি করে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতাম। অমি গাড়ি চালালে আসিফ খুব খুশি হতো। এত বড় একটি জিনিসকে চালিয়ে নিচ্ছি বলে কেন জানি গর্ববোধ করত। মন্ত্রিসভা ত্যাগ করার ফলেই আসিফকে এই সঙ্গ দেয়াটা সম্ভব হয়েছে। তাও প্রতিদিন কাজের চাপ বাড়তে থাকায় যতটা ইচ্ছা ছিল ততটা সঙ্গ দিতে পারিনি। দিন দিন যেন অক্সিজেনের তাঁবুটাই হয়ে ওঠে আসিফের জীবনসঙ্গি। আরো বেশি করে তাঁবুতে থাকা শুরু করল এবং তাঁবুর ভেতরে বসেই ওর সময় কাটতো বেশি। জানালার পাশেই ছিল ওর বিছানা। সেখানেই খেলত, মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করত বা মায়ের গাওয়া কোন গানের কলি আওড়াত। ওর খাওয়াও অনেক সময় তাঁবুতে বসে খেত। জানালা দিয়ে আসিফ মাঝে মাঝে নির্লিপ্তভাবে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকত খেলার মাঠের দিকে। দেখত ওরই বয়সের ছেলেমেয়েরা কত দৌড়াদৌড়ি করে, হৈ চৈ করে খেলছে। আসিফেরও নিশ্চয়ই ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু পারেনি সে ছুটে যেতে। তার ফুসফুস তার শরীরের চলনশক্তিকে তখন একেবারেই দুর্বল করে দিয়েছিল। সাড়ে ছয় বছরের ছেলে, উদ্যত তরঙ্গের উঠানামায় যার দেহমন বিকশিত হওয়ার কথা, যার প্রাণচাঞ্চল্য আমাদের জীবনে নতুন স্পন্দন এনেছিল, সেই আসিফ দিন দিন কেমন যেন কঠিন এবং নিশ্চল হয়ে পড়ছে।

মার্চের শেষে দুদিনের জন্য দেশের বাড়িতে গেলাম। ফিরেছি ২৯ তারিখ রাত আটটার দিকে। আসিফ বাইরে দাঁড়িয়েছিল বোবার মত। আমান পাশ দিয়ে এসে আমার হাত থেকে কুমিল্লার মাতৃভাণ্ডারের মিষ্টির বাক্সটা কেড়ে নিয়ে দৌড়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল। আসিফের সেই শক্তি ছিল না। আমাকে দেখে ও খুব খুশি। আমারই অপেক্ষায় যেন সে তখন ছিল। সেদিন রাতে আসিফ আর কিছু খেল না। হাসনা অনেক চেষ্টা করেছে, আমিও অনেকটা বকাও দিলাম। কিন্তু কিছুতেই খেল না। জেগেও থাকল অনেকক্ষণ। তারপর তাঁবুতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। রাতেরবেলায় আসিফ মাঝে মাঝে ডাক দিত। অক্সিজেন শেষ হয়ে গেলে সিলিন্ডার বদলাতে হতো তৎক্ষণাৎ। ভোর চারটার দিকে হাসনা ডেকে বলল, আসিফ ডাকছে। ওকে কোলে তুলে নিলাম, বারান্দায় হাঁটলাম। বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছিল তখন আসিফ। আমি তখনও ভাবছিলাম, ও ইচ্ছা করে ওটা করছে। কাল রাতে খাওয়ার জন্য বকেছি বলে অভিমান করেছে। কিন্তু না, ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। আমি আর হাসনা দুজনে মিলে ওকে আবার তাঁবুর ভেতর শুইয়ে দিলাম। সিলিন্ডারের গ্যাসও প্রায় শেষ হওয়ার পথে, বেগ ছিল না তেমন। ওর ঠোঁট দুটো নীল হয়ে গেল, আসিফ মারা গেল। শেষ রাতে আসিফের সেই মলিন মুখটার কথা ভাবলে আমার দেহ মন এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়। এখনো বিশ্বাস হয় না যে আসিফ মারা গেছে। আমার প্রাণের একটি অংশ আমাকে ছেড়ে চলে গেল ৩০ মার্চ ১৯৮০।

www.pathagar.com

ঢাকা থেকে দিনাজপুর যাওয়ার পথে রাত তখন প্রায় দুটো। ময়মনসিংহ স্টেশনে ট্রেন থামে। আসিফের কথা ভাবতে ভাবতে চোখের পানিতে সবকিছুই ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। কিছুই প্রায় দেখতে পারছিলাম না। সোজা হয়ে বসার পর সম্বিত ফিরে পেলাম। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ দুটো মুছে নিলাম। পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেবও ওপরের একটি বাঙ্কারে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছেন ক্লান্তিতে। বাইরে ভীষণ হৈ চৈ। কেউ নামছে আর কেউ উঠছে। ট্রেন থামার প্রথম হৈহুল্লোড়টা থেমে যেতেই চোখে পড়ল অজস্র মানুষ, নারী, পুরুষ, শিশু, সারি সারি শুয়ে আছে স্টেশনের মেঝেতে। কারো গায়ে হয়তো একখণ্ড ছেঁড়া কাপড়, আর কারো গায়ে কিছুই নেই। এটিই ওদের জীবন! সংখ্যায় তারা অনেক বলে মনে হলো। স্টেশনের দুধারই তারা দখল করে আছে। এরা কোন যাত্রী নয়। ওদের রাত ওরা এখানে এভাবেই কাটায়। একটি বাচ্চা ছেলে কাত হয়ে শুয়ে আছে। তার মা-ও কাত হয়ে শুয়ে আছে ছেলের মুখটা বুকের কাছে টেনে। ছেলেটার ডান হাত ওর মায়ের গলার ওপর দিয়ে পিঠের কাছে চলে গেছে। এত বড় রেলগাড়িখানা এলো, ওদের ঘুম ভাঙেনি। ওরা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। কয়েক মিনিটের মধ্যে দুতিনজন পুলিশ এলো, সাথে আর দুজন লুঙ্গি পরা লোক। ওরা ঐ ছেলের মা জওয়ান মেয়েটাকে জাগিয়ে ওঠাল। ছেলেটা তার মা'র শাড়ি ধরে রেখেছিল। এদের একদল ঝটকা মেরে ছেলেটার হাত সরিয়ে দিল। জোর করে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ছেলেটা অসহায়ের মত কাঁদতে লাগল। একা একা। ওর জীবনে আর কেউ রইল না।

আমরা কত চেষ্টা করেছি আসিফকে বাঁচাতে কিন্তু পারিনি। আর এই ছেলেটা বেঁচে আছে। কিন্তু ওর মা আর কোনদিন ওর কাছে ফিরে আসবে কিনা, কিংবা কখন আসবে কে জানে! ওকে এখন একা থাকতে হবে। বয়স পাঁচ কি ছয়, বা আরো কম। মা যদি আর না ফিরে আসে তখন ঐ শিশু শহরের গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াবে, নর্দমার আশপাশে উচ্ছিষ্ট খাবারের তালাশ করবে রোজ রোজ, আর রাত হলে ফিরে আসবে স্টেশনে। প্রথম কয়েক মাস মাকে খুঁজে বেড়াবে, তাকিয়ে দেখবে চারদিকে বিহ্বল চাতকের মত। তারপর একা একাই ঘুমিয়ে পড়তে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। মা সঙ্গে ছিল বলে কিছু ভিক্ষাটিক্ষা পেয়েছে। এখন একা ভিক্ষা চাইতে গেলে লোকে তাকে তাড়িয়ে দেবে। গালিগালাজ করবে। কিন্তু জীবন সেখানে থেমে থাকবে না, ও আস্তে আস্তে বড় হবে, চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করবে, না পেলে চুরি-ডাকাতি করা শুরু করবে। তাকে তো বাঁচতে হবে, বা ঢাকা জেলের ১০ বছর বয়সের গোপালের ভাগ্য যদি তার জুটে যায় তাও মন্দ হবে না। কোন ছুতায় পুলিশ যদি একবার তাকে ধরে নিয়ে যায় তাহলে "সন্দেহের" অপরাধে বেশ কয়েক বছর জেলে থাকতে পারবে। জেলখানার নর্দমা সাফ করবে, ময়লা কাচাবে, সেটাও তো একটি কাজ। দুবেলা কিছু খাওয়া তো যাবে! আর মার্বেল খেলার জন্য সেখানে আরো অনেক বাচ্চা থাকবে। তাই বন্ধুও জুটে যাবে। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর তখন একসাথে আবার চুরি-ডাকাতি করতে পারবে। তবুও সে বেঁচে থাকবে।

আসিফের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অনেকে দেখতে এসেছিল। বিচারপতি সাত্তার এলেন, খাজা কায়সার এলেন, এরকম আরো অনেকে, যাঁরা আসিফকে আদর করতেন। আর যাদু ভাই

www.pathagar.com

বেঁচে থাকলে তিনিও ছুটে আসতেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া টেলিফোন করেননি, কিন্তু একজন এডিসি পাঠিয়েছিলেন। আসিফকে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল। সাদা চাদর দিয়ে তাকে তখন ঢেকে রাখা হয়েছে। মুখটা শুধু দেখা যায়। বাড়িতে তখন কান্নার রোল। আমি প্রায় পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম। পরিবাগে ওর জানাজা হলো। ডিজি, এনএসআই আর ডিজি, এফআই— এরাও এলেন। শাহ্ আজিজের যোগসাজশে আমার বিরুদ্ধে এরা কত রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু আজ এরা আসাতে ভাল লেগেছে। ওদের মধ্যেও তাহলে কিছুটা মানবতাবোধ আছে! কিন্তু জানাজার পর হাসনার ভাই বাসুর স্টেশন ওয়াগন গাড়ির পেছনে আসিফকে শুইয়ে রেখে রওনা হয়েছি, তখন এক দৃশ্য দেখে রীতিমত হতবাক হলাম। মসজিদের বাইরে অন্য একটি বাড়ির গেটের আড়ালে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে ডিজি, এনএসআই হাকিম সাহেব কি যেন টুকে নিচ্ছেন। গাড়িগুলোর নম্বর, না কারা এসেছে তাদের নাম লিখছেন, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু কিসের জন্য, কি উদ্দেশ্যে তার জবাবটা বোধহয় কোনদিনই জানতে পারব না। গোয়েন্দা সংস্থার কর্তারা তাই সহানুভূতির ভান দেখিয়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করার জন্যই এসেছিলেন। মানুষ সত্যিই এক আশ্চর্য ধরনের জীব। যাই হোক সেদিনই আসিফকে ফরিদপুরের অম্বিকাপুরে তার নানা কবি জসীমউদ্‌দীনের পাশেই কবর দেয়া হলো। নিজের হাতের মাটি দিয়ে নিজেরই প্রাণপ্রিয় পুত্রের সমাধি তৈরি করলাম। চিরদিনের জন্য আসিফ বিদায় নিয়ে চলে গেল।

যার দুঃখ তার। আনন্দ কিছুটা হলেও ভাগাভাগি করা যায় কিন্তু দুঃখ কারো সাথে ভাগাভাগি করা যায় না। একজন মানুষের দুঃখ আর একজন মানুষের বোঝার উপায় নেই। এটি একটি নিজস্ব ব্যাপার, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মত, ধর্মের প্রতি অনুভূতির মত, এটির অংশ ভাগ করা বড় কঠিন। যদিও একজনের দুঃখে আর একজন সহানুভূতি দেখায়, দুঃখপ্রকাশ করে, কিন্তু যার দুঃখ সে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সেই দুঃখকে অনুভব করা সম্ভব নয়। একই সন্তানের মৃত্যুতে পিতা এবং মাতার দুঃখের অনুভূতি এবং গভীরতা ভিন্ন রকম হয়। অনেকে দুঃখকে হাল্কা করে উড়িয়ে দিতে পারে আবার অনেকে পারে না। এমনকি সন্তানদের ব্যাপারে পিতামাতার অনুভূতি সন্তানরা বোঝে না। দুঃখ জিনিসটা হলো যার যার, তার তার। একজনের অনুভূতি আর একজনের গায়ে লাগে না।

আমানের কথা

এখন আমানকে নিয়ে আমাদের সংগ্রাম। ওর বয়স বাড়ছে কিন্তু সবকিছুতেই পিছিয়ে আছে অনেক। আসিফকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ওর প্রতি আর নজর দেয়া হয়নি। ওর যে ক্ষীণ গ্লাইসিনের সমস্যা রয়েছে সেটাও জটিল। মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে সে ফিরে এসেছে। আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আগের চেয়ে এখন অনেক ভাল, প্রথম চার বছর দুধ ছাড়া আর কিছু খায়নি। সব দাঁত পচে গিয়েছিল, টন্সিল এডনয়েড বড় ছিল। তার না খেতে পারার বা কথা কম বলতে পারার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। শরীর ছিল দুর্বল এবং শারীরিক বৃদ্ধির গতি ছিল খুব ধীর। আসিফ মারা যাওয়ার তিন মাস পর হাইডেলবার্গ

www.pathagar.com

এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম দুটো পৃথক ফেলোশীপে। পড়াশুনা ছাড়া প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমানের চিকিৎসা। জার্মানির এক নম্বর ডাক্তার প্রফেসর বিকেল বললেন, আমানের গ্লাইসিন খুবই কম, যার কারণে সে বেঁচে আছে। আমেরিকা যাওয়ার পর আমি ওর ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ডটাও পরীক্ষা করতে বললাম। বস্টনের একই হাসপাতাল। সকলেই আমাদের চেনে। এ ব্যাপারে অনেক যত্ন নিয়েছিল পৃথিবীর নামকরা ডাক্তার প্রফেসর ফাইলার। আসিফের কথা ভেবে মনে ভয় ঢুকে গেছে। আসিফেরও তো গ্লাইসিন ছিল। যদিও ওর ফুসফুসের অসুখের সাথে গ্লাইসিনের কোন সম্পর্ক ছিল না বলেই ডাক্তাররা বলে এসেছে। আমানের শত ধরনের পরীক্ষা শুরু হলো। হাসপাতালে ভর্তি হলো। ওর ক্যাথেটারাইজেশন করা হলো এবং ওর ফুসফুসে একই রকম অবস্থা ধরা পড়ল, আর সেটা হওয়া মানে মৃত্যু অবধারিত। হাসনা ও তার ছোট বোন আসমা সেদিন সারাদিন হাসপাতালে ছিল। সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে যখন জিজ্ঞেস করলাম আমানের কথা, হাসনা কান্নায় ভেঙে পড়ল। বলল, আসিফের যা হয়েছিল আমানেরও তাই হয়েছে, পালমুনারি হাইপারটেনশন। আমি আমানকে কোলে তুলে জড়িয়ে ধরলাম এক গভীর দুঃখ ও বেদনা নিয়ে। শেষ পর্যন্ত আমানও আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। পুরো হাসপাতাল বিচলিত হলো। এরকম পৃথিবীর কোথাও ঘটেনি। নানা জায়গায় নানা দেশে তারা যোগাযোগ করল। শুরু হলো পরীক্ষা, নিরীক্ষা, গবেষণা। এমনিতেই আমানের গায়ে ছিল না রক্ত। তার ওপর তাকে যে কত রক্ত দিতে হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য, সে বলার মত নয়।

শেষে ঠিক করা হলো আমানের সব দাঁত তুলে নেয়া হবে। আর টন্সিল এবং এডনয়েড দুটোই ফেলে দেয়া হবে। যদিও ওসব ফেলে দেয়া ডাক্তারি বিদ্যায় মানা। তবুও এটি তার জীবনমরণ সমস্যা। আমি রাজি হলাম। তাকে এনেস্থেসিয়া দিয়ে একসাথে সবকটা কাজ করা হবে। বেশ কিছুদিন লাগল সব ব্যবস্থা করতে। তার শরীর এনেস্থেসিয়া বা এত বড় ঝুঁকি নিতে পারবে কিনা সেটাও একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। সমস্ত ধরনের সাবধানতা এবং সকল ধরনের জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুতি নেয়া হলো। অত বিরাট হাসপাতালের এটিই ছিল সেদিনকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দশ-বারজন ডাক্তার, অসংখ্য নার্স, আরো কত কি। চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগল। আমরা সবাই উপস্থিত। হাসনার ছোট বোন আসমা, ওর স্বামী তৌফিক হার্ভার্ডে ডক্টরেট করছে, ওদের মেয়ে দুলি, আমানের বন্ধু। প্রফেসর ফাইলার মাঝখানে একবার এসে বলে গেলেন সব ঠিক আছে। আমান নাকি অসম্ভব শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। তারপর অজ্ঞান অবস্থায় আমানকে নিয়ে এনে ওর ঘরে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হলো। ইলেকট্রনিক মেশিন সব বসানো হলো। রাত দুটোর দিকে আমান চোখ খুলল। আমাদের দেখে একটু হাসি দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে উঠল, দুতিন দিন পরই বাড়িতে চলে এলো।

হাসপাতাল থেকে আসার পর আমানের খাওয়ার ক্ষমতা বাড়লো। দাঁতের সার্জন বলেছিল ও নতুন জীবন ফিরে পাবে। তাই হলো। ওর জীবনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। আগে ঘুম গভীর ছিল না, রাত্রে কয়েকবারই উঠতো, হয়তো দাঁতের জন্য বা নিঃশ্বাসের

www.pathagar.com

জন্য, কি কারণে তা আমরা জানতাম না। এখন সে খুব ভাল ঘুমায়, একেবারে ওঠে না। কিন্তু ওর ফুসফুসের অবস্থা কি সেটাই হলো মূল কথা। এক মাস পর তাকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। অপারেশন থিয়েটারে ওর ক্যাথেটারাইজেশন করা হলো আবার। দুমাসের মধ্যে দুবার ক্যাথেটারাইজেশন আরো ঝুঁকিপূর্ণ। আসিফের মত আমানেরও যদি এবারও পালমুনারি হাইপারটেনশন দেখা যায় তাহলে সেও আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে শিগগির। এর কোন ওষুধ নেই, চিকিৎসা নেই। বৈজ্ঞানিকরা চাঁদে লোক পাঠাতে পেরেছে, কিন্তু এই রোগের কোন ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেনি। পাইওনিয়ার-১০ দশ লক্ষ বছর অতি দ্রুত বেগে সৌরজগৎ পেরিয়ে আরো দূরে শুধু যেতেই থাকবে, কিন্তু এখনো অনেক মানব রোগ আছে যার কোন দাওয়াই বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করতে পারেনি। আমানের ব্যাপারটা তাই ডাক্তারদের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালো। সবকিছুতেই তারা অসম্ভব যত্ন নিল। অপারেশন থিয়েটার থেকে ডক্টর ফাইলার ছুটে এসে জানালেন যে আমানের সবকিছু স্বাভাবিক। গতবারের ক্যাথেটারাইজেশনে হাইপারটেনশনের যে ভাব ধরা পড়েছিল সেটা এখন আর নেই। একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। গ্লাইসিনের সঙ্গে ওটার সম্পর্ক ছিল না, সেটাও প্রমাণিত হলো। দাঁত, টন্সিল এবং এডনয়েডের জন্যই আমানের খাওয়া, নিঃশ্বাস এবং ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছিল। এগুলো ফেলে দেয়ার ফলেই ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ডের ওপর যে চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল সেটা দূর হয়ে গেল। হাইপারটেনশন আর দেখা গেল না। আমরা আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে গেল যে আসিফেরও টন্সিল আর এডনয়েড কি বড় ছিল? সেগুলো ফেলে দিলে আসিফ কি বেঁচে যেত? কিন্তু ডাক্তাররা বললেন যে, আসিফের সে ধরনের কোন সমস্যা ছিল না। হাসপাতালের নার্সারিতে আমান কতগুলো খুব সুন্দর ছবি এঁকে ছিল। সেগুলো আয়না দিয়ে বাঁধিয়ে আমাদের ঢাকার বাড়ির ড্রয়িংরুমে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়িতে কেউ এলে আমান এগুলো দেখাতে গর্ববোধ করে।

পরের বছরও ১৯৮২, আমানকে আবার সেই বস্টনের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চেকআপ করানো হলো। এবার আর ক্যাথেটারাইজেশন করতে হলো না। কার্ডিওগ্রাম করার পরই সবকিছু স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। ওর গ্লাইসিনিমিয়া আগের মতই রয়েছে। তবে এটির কোন ওষুধ নেই। ঢাকায় এখন আমানকে দুতিন মাস পরপর কার্ডিয়াক ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা করিয়ে কাগজপত্র আমেরিকায় পাঠানো হয়। ডক্টর মালিক, ডক্টর জাফর এবং ডক্টর জালাল খুব যত্ন নিয়ে তার দেখাশুনা করেন। সেখানকার জাপানি ডাক্তারও সাথে থাকেন। এই কার্ডিয়াক হাসপাতাল অত্যন্ত ভাল। সব আধুনিক যন্ত্রই এদের কাছে আছে। ঢাকায় এখন ওপেন হার্ট সার্জারিও শুরু হয়েছে। জাপানিদের অনুদান সব। আমান খুব ধীরে ধীরে উন্নতি করছে। খুবই ধীরে ধীরে। তবে খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলা স্বাভাবিকভাবেই চলছে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। পাঁচটায় ওঠে। দিনেরবেলায় ঘুমাতে চায় না। সাঁতার কাটার চেষ্টা করে, বালু আর গাড়ি নিয়ে খেলে। ইংরেজি অক্ষরগুলো চেনে কিন্তু এখনো অক্ষর দিয়ে শব্দ তৈরি করতে পারে না। বাংলাতেও তাই। ছবি আঁকতে

www.pathagar.com

পছন্দ করে। বয়সের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। প্রায় তিন থেকে চার বছরের মত। আমার জীবনের এসব ওঠানামায় সবচেয়ে ক্ষতি বেশি আমানের হয়েছে। হাসনাও সময় পায় না, অথচ প্রতিদিন কয়েক মিনিটের জন্য ওকে নিয়ে বসতে পারলে আরো অনেক কিছু শিখতে পারত। ওর তো কোন দোষ নেই। ছোটকালে আমরা ওর যত্ন নেইনি। তারপর আসিফের অসুখের পর আমানের দিকে আর কেউ তাকায়নি। গুলশানের একটি ভাল নার্সারিতে যেত। এক বছরে উন্নতি করতে না পারায় বয়সের কারণে আর ওরা নেয়নি। বয়সের কারণেই আমেরিকান স্কুলের নার্সারিতে ওকে ভর্তি করা যায়নি। হাসনা খুব চেষ্টা করেছে। এখন মোহাম্মদপুরে মিসেস গ্রিনোর পরিচালিত একটি স্পেশাল স্কুলে যায়। বিশেষ যত্ন নিয়ে এখন ওখানে তাকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বোঝালে আমান সবকিছুই বোঝে। বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। সব ব্যাপারেই সজাগ। মা-পাগলা ছেলে। তবে একবার মাকে ছাড়া দুদিন ছিল। একেবারে স্বাভাবিক বড় ছেলেদের মত ব্যবহার করেছে। তারপর আমি ওকে নিয়ে দিল্লিতে গেলাম। কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেনি। অন্যান্য ছেলেদের মত অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। হাসনা কোলকাতা হয়ে দিল্লিতে আমাদের সাথে যোগ দিল। দুদিন পর মাকে দেখে আমান খুব খুশি হয়েছিল। আমরা সেবার আমানকে নিয়ে আজমীর শরীফ গিয়েছিলাম। সেখান থেকে কাশ্মীরে। কাশ্মীরে আমান ঘোড়ায় চড়া খুব পছন্দ করেছে। কিন্তু উঁচু জায়গা আমানের জন্য ভাল নয়। কোন পাহাড়ি দেশে আমানের বেশিদিন থাকা মানা। খুব বেশি ঘোরাফেরা আমান পছন্দ করে না। ওর শরীরের ওপর চাপ পড়ে। ঢাকাই ওর জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা, এবং এখানে বেশিদিন থাকাতেই ওর উন্নতি হয়েছে অনেক।

১৯৭৫ সালে আসিফ দেড়বছর বয়সে যেমন জেলগেটে এসে বুঝতে পারত না কিছু, আমানের বেলায় ঠিক তা নয়। পুলিশ দেখিয়ে আমানকে আমরা এতদিন ভয় দেখিয়েছি। কোন কথা না শুনলে বলতাম পুলিশ আসছে জীপে করে। কথাটা শুনে আমান অনেক সময় বাধ্য হয়েছে। কথা শুনেছে, ভয় পেয়েছে। তাই আমান জেলগেটে পুলিশ দেখে অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছে যে আমাকে পুলিশ এখানে ধরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এটুকুই—এর চেয়ে বেশি সে আর কিছু বোঝে না। ভালই হয়েছে আমান আর কিছু বোঝে না। বুঝলে বরং মনে আরো দুঃখ পেতো। ওর সুন্দর নিষ্পাপ মনটা এই সমাজের অন্যায়ের চাপে ক্ষতবিক্ষত হতো। এখন যেভাবে নিশ্চিন্ত মনে মায়ের বুকে মাথা গুঁজে ঘুমাচ্ছে সেটা না করে রাত জেগে মায়ের মত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতো। সমাজের নিষ্ঠুরতার কষাঘাতে উপায়হীনের মত জর্জরিত হতো। এই দেশ এবং এই সমাজকে ঘৃণা করা শুরু করত। ভায়োলেন্স এবং রক্তপাতের কথা ভাবত, অন্যায়কে রুখে দাঁড়ানোর জন্য খুন করার কথা ভাবত হয়তো, ভালই হয়েছে আমান কিছু বোঝে না। আমান যে একজন প্রতিবন্ধী।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১২

শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমান

ইতিহাসের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব ঘটে। মুজিবের আবির্ভাব ঘটেছে একটি সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, ত্যাগ এবং তিতিক্ষার মাধ্যমে আর জিয়ার আবির্ভাব ঘটেছে সেই সংগ্রামের পরিণতি হিসেবে পরিগণিত একটি স্বাধীনতাযুদ্ধের মাধ্যমে। যুদ্ধের একেবারে শুরুতেই শেখ মুজিবের গ্রেপ্তার হওয়ার কারণে যে রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দেয়, জিয়া একজন দেশপ্রেমিক তরুণ সেনা অফিসার হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সেই শূন্যতা পূরণ করেন। প্রথমজনের সংগ্রামের ধারাবাহিকতা দ্বিতীয়জন সততার সাথে রক্ষা করেছেন। একজন সংগ্রামে গোটা মানুষের নেতৃত্ব দিয়েছেন, অপরজন গোটা যুদ্ধের সময় দেশের মুক্তির জন্য হাতিয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুজিব আর জিয়ার ভূমিকার মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই, বরং একজন আর একজনের সম্পূরক শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সৃষ্টি হলো একটি সুনির্দিষ্ট রাজনীতির ফসল, যুদ্ধটা ছিল সেই রাজনীতির একটি শেষ চূড়ান্ত বাহন। কোনটির গুরুত্ব কম নয়। তবে রাজনীতি ছাড়া যুদ্ধ ঘটত না। যুদ্ধটা ছিল রাজনীতির একটি পরিণতি। তাই শেখ মুজিব আর জিয়াউর রহমানের ভূমিকার মূল্যায়নে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। একজন একটি রাজনৈতিক নেতৃতের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্থপতির আসন অর্জন করেছেন আর একজন স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে মানুষের নন্দিত এক জাতীয় নেতার আসনে আসীন হয়েছেন।

শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের সাথে জিয়া বা জিয়ার দলের অনেক ক্ষেত্রেই কোন তুলনা করা উচিত হবে না। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা অর্জনের অনেক আগে, ১৯৪৯ সালে, আর জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭৮ সালে, মাঝে ২৯ বছরের ব্যবধান। আওয়ামী লীগের সংগ্রাম এবং ত্যাগের ইতিহাস, অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সাথে তুলনাতে আসে না। দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাদের ভূমিকা যে শীর্ষস্থানে ছিল সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। শত সমালোচনা সত্ত্বেও শেখ মুজিবের সাহস এবং

www.pathagar.com

নেতৃত্ব ছাড়া বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত না। বাংলাদেশ যে একটি স্বাধীন দেশ এবং এদেশের মানুষ যে এখন একটি স্বাধীন জাতি এর জন্য ব্যক্তি হিসেবে মুজিবের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। আজ যে এদেশ পরিচালনার দায়িত্ব এখন আমাদের সকলের—এসবকিছুর পেছনে একজন বীর বছরের পর বছর জেল খেটেছেন, ফাঁসির মঞ্চে উঠেছেন; বাঙালি জাতীয়তাবাদের লড়াইয়ে আপোস করেননি, তাঁর কথা এদেশের মানুষ কি করে ভুলতে পারে? এ জাতির কাছে তাঁর স্থান চিরস্থায়ী—সেই আসনের জন্য "দাবি" ওঠানোর প্রয়োজন পড়ে না। জোর করে, আইন করে সেই আসন স্থাপন করার চেষ্টা যারা করে তারা শুধু মুজিবকে অবমূল্যায়নই করেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে প্রতিটি পর্যায়ে আওয়ামী লীগের কিছু নিচু মানসিকতাসম্পন্ন নেতা ও বুদ্ধিজীবী শেখ মুজিবের ভাবমূর্তিকে শুধু বিতর্কিত এবং দ্বিখণ্ডিত করেছে।

জিয়া রাজনীতিবিদ ছিলেন না। ১৯৭১ সালের আগে জিয়ার কোন রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল না ঠিকই কিন্তু সাথে সাথে একথা সত্য যে ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে জাতিকে একটি ভীষণ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, তখনই মেজর জিয়া সেই নেতৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করে এক মহান দেশ নেতার দায়িত্ব পালন করেছেন। সেদিন যদি জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা না দিতেন তাহলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ভবিষ্যৎ কি হতো সেটা বলা কঠিন। দেশের স্বাধীনতা অর্জন হয়ে পড়তো অনিশ্চিত। আর স্বাধীনতার পর দেশ পরিচালনার ব্যাপারে কে কি করেছেন তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ অবশ্যই করতে হবে। এ ব্যাপারে তুলনার উর্ধ্বে ওঠার কারো উপায় নেই। আন্দোলন, সংগ্রাম, ত্যাগ এবং যুদ্ধ এক ইতিহাস, আর স্বাধীনতার পর সেই আন্দোলন, সংগ্রাম, ত্যাগ আর যুদ্ধের মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে দেশকে গড়ে তোলা আর এক ইতিহাস। জাতির রাজনৈতিক মুক্তি আর জাতি গঠন দুটো ভিন্ন প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ। দুটো একই ইতিহাসের অংশ হতে পারত, কিন্তু বাংলাদেশে এ দুটো ভিন্ন ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে। জাতিকে মুক্ত করা বা স্বাধীন করার সফলতাকে আলাদা করে রাখাই ভাল, আর তা না হলে জাতি গঠন ক্ষেত্রের ব্যর্থতা আগের সফলতাকে ম্লান করে দিতে পারে। কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। কোন সফলতা যেমন কোন ব্যর্থতাকে যুক্তিযুক্ত করতে পারে না, ঠিক তেমনি কোন ব্যর্থতা কোন সফলতাকে গ্রাস করতে পারে না। কোন সফলতাকে কেউ কারো কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের মূল্যায়ন এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই করতে হবে। যদি শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন না হতেন বা শেখ মুজিব যদি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতা থেকে দূরে সরে থাকতেন তাহলে আবার এই মূল্যায়ন অন্য রকম হতে বাধ্য হতো।

এসব বিষয়ে আমি আগেই আলোচনা করেছি, তাই পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালের সমস্যা সমাধানে এবং জাতি গঠন কাজে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ চরমভাবে মানুষকে হতাশ করেছেন এবং তাঁদের

www.pathagar.com

ব্যর্থতার পরিণতি হিসেবে এদেশের মানুষকে হয়তো যুগ যুগ ধরে কষ্টভোগ করতে হবে এবং খেসারত দিয়ে যেতে হবে। আওয়ামী লীগের কাছ থেকে যে ন্যূনতম জিনিস মানুষ আশা করেছিল তা ছিল দেশে একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করবে, ভাত কাপড় পাবে, আর তাদের স্বাধীন দেশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে, যেখানে মানুষের কথা বলার অধিকার থাকবে, জীবনের নিরাপত্তা থাকবে। আওয়ামী লীগ গণমানুষের সেই সামান্য আশা পূরণ করতে তো পারেইনি, বরং বিভিন্ন কার্যব্যবস্থায় স্বাধীনতার অর্জিত মূল্যবোধকে প্রায় নির্মূল করে দিয়েছিল। আগেই বলেছি একটি জাতির ইতিহাসে ১৯৭১-৭২ সালের মত মুহূর্ত ঘন ঘন আসে না, তর্কের ঊর্ধ্বে জাতীয় নেতা বা জাতীয় ঐক্য বার বার জন্ম নেয় না। আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু সে সুযোগ শুধু শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগই হারায়নি, সেই সুযোগ এই জাতিও হারিয়েছে।

অনুন্নত দেশে শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের মত জনপ্রিয় নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। "ভিক্ষা করে দেশ চালায় আবার বড় বড় কথা বলবে! বিশ্ব মঞ্চে ভূমিকা রাখতে চাইবে", এ ধরনের নেতাদের প্রতি এমন attribution খুবই সাধারণ ঘটনা। তার ওপর এইসব নেতা স্বাধীনভাবে চলতে থাকলে, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মুরুব্বিদের কথা অগ্রাহ্য করলে তারা সাধারণত তাদের পছন্দ করে না। আবার আমাদের নেতারাও ভুলে যান যে তাঁরা একটি অতি গরিব দেশের নেতা, একটু জনপ্রিয় হলেই তাঁদের মনে আন্তর্জাতিক নেতা হওয়ার স্বপ্ন জাগা বাঞ্ছনীয় নয়। মাও সে তুঙ, ফিদেল কাস্ত্রোর সাথে প্রতিযোগিতায় নামা তাঁদের সাজে না। স্বগোত্রী তৃতীয় বিশ্বের অন্য নেতারাও এই ধরনের প্রচেষ্টাকে পছন্দ করেন না। এমনিতেই আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের গরিব সমাজের অভ্যন্তরেও এই মনোভাব খুব প্রকট। এসব সমাজে হিংসা ও বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রকট। এক মুষ্টি ধানের জন্য এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে খুন করতে পারে। শহরে মধ্যবিত্তরাও সাধারণত এই একই মনোভাবেরই অধিকারী। কেউ কারো ভাল চায় না। কেউ জীবনে একটু ভাল করলে তার শত্রু বেড়ে যায়। একজনের দুঃখে আর একজন আনন্দ পায়। মুখে বলে দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু মনে মনে খুশি হয়। রাজনৈতিক অঙ্গনেও তাই। ক্ষমতায় কাউকে সুস্থির থাকতে দেবে না। ভাল কাজ করলেও গালমন্দ করবে। কেউ কাউকে সম্মান করে না। আর তাই কেউ কাউকে সম্মান দেয়ও না। জিয়ার মৃত্যু সেই সামাজিক পরিস্থিতির প্রতিফলনও হতে পারে। জিয়া দেশ ভাল চালাচ্ছিলেন, তাঁর ভাবমূর্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তিনি রাজনীতিবিদ হিসেবে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছিলেন। কিছু কিছু সেনা অফিসার হয়তো ভেবেছেন, জিয়ার অত নাম হবে কেন? আমরা কোন্‌দিক থেকে তার চেয়ে কম? আমরা ক্ষমতায় গেলে তার চেয়ে অনেক ভাল দেশ চালাতে পারি। আমরা ছিলাম একসাথে, এখন সে কিনা বাড়ি-গাড়ি হাঁকাচ্ছে, টাই-স্যুট পরছে, একে-ওকে মন্ত্রী বানাচ্ছে। আমার মতে, এই ঈর্ষাকাতর মানসিকতা জিয়াকে ক্ষমতা থেকে হঠানোর ষড়যন্ত্রে মদদ জুগিয়েছে। একটি আর একটির সম্পূরক হিসেবে কাজ করেছে।

www.pathagar.com

তবে যতটা বলা হয়, জিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে ব্যক্তিগত আক্রোশ ততটা কাজ করেছে বলে অনেকেই মনে করেন না। ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল থেকে দু'শ মাইল দূরে জিয়াকে হত্যা করে দেশ পরিচালনার সুযোগ পাওয়া যাবে এরকম অপরিণত চিন্তার মানুষ জেনারেল মঞ্জুর ছিলেন না। যাঁরা মঞ্জুরকে চিনতেন তাঁরা তাঁকে একজন বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত ব্যক্তি বলে জানেন। সামরিক বাহিনীতে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল সুবিদিত। তাঁরা বলেন এটি ছিল এক ঢিলে তিন পাখি মারার ষড়যন্ত্র। উদ্দেশ্য একটিই, জিয়াকে নিঃশেষ করা। এদের মতে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল যে এ হত্যা চট্টগ্রামেই সম্ভব ছিল। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারীদের একটি প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী চালু রয়েছে। জিয়া হত্যার পরের দিনই তাঁর হত্যাকারী লে. কর্নেল মতিউর রহমানের মৃত্যু ঘটে। বিচারের আগেই যিনি এই হত্যাকাণ্ডে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী আর একজন লে. কর্নেল মাহবুবুর রহমানের মৃত্যু ঘটে। বিদ্রোহীদের নেতা জেনারেল মঞ্জুর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েও বেঁচে থাকতে পারেননি। সামরিক ছাউনিতে এনে তাঁকে হত্যা করা হয়। জিয়া হত্যাকাণ্ডে যে তিনজনের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে মুখ্য, যারা বেঁচে থাকলে এ জাতি অনেক কিছু জানতে পারত, তাদের সবাইকে বিচারের আগেই হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া জিয়া হত্যা ষড়যন্ত্র উদঘাটন করার জন্য সরকার সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি রুহুল ইসলামের নেতৃত্বে যে কমিশন নিযুক্ত করেছিলেন পরবর্তী সময়ে অজ্ঞাত কারণে ঐ কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্স থেকে ষড়যন্ত্র অনুসন্ধান করার এখতিয়ার প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। মুজিবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ আগেই দিয়েছি। তাই মুজিব হত্যার মত জিয়া হত্যার আসল কারণগুলোও হয়তো শেষ পর্যন্ত রহস্যাবৃতই থেকে যাবে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৩

জিয়াবিরোধীদের সমালোচনা

কিন্তু জিয়াও সমালোচনার উর্ধ্বে ছিলেন না। বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ, সংবাদপত্র এবং বিশেষ করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে যাঁরা জিয়াবিরোধী ছিলেন তাঁরা জিয়াকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতেন। তাঁদের মূল সমালোচনা ছিল যে, (১) জিয়াউর রহমান এক ধরনের সুবিধামুখী (total expediency) রাজনীতি করেছেন, এবং সেজন্য পুরোনো ব্যবস্থায় (old order) দেশটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছেন। কোন দল, গোষ্ঠী বা শ্রেণীকেই তিনি ঘাঁটাননি। সামরিক বাহিনী, আমলা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, জোতদার, জজ-উকিল, বিচার বিভাগ, পুলিশ, বিডিআর—কোন শ্রেণীর ও কোন পেশাদার গোষ্ঠীর স্বার্থে আঘাত করেননি। তিনি সবাইকে খুশি রাখতে চেষ্টা করেন। আর তাই তিনি কোন সামাজিক বা অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে যাননি। এটিকেই সমালোচকরা বলেছেন সুবিধামুখী রাজনীতি। তাঁরা আরো বলেন, (২) ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় ইসলাম আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের জায়গায় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করে স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল ভিত্তি থেকে তিনি দূরে সরে যান। এই ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে শুধু পুনর্বহাল বা পুনঃপ্রতিষ্ঠাই করেননি, জাতীয় রাজনীতির প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ানোর সুযোগ উন্মুক্ত করে দেন। তাঁদের মতে, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি এই কাজটি না করলেও পারতেন। এতে তাঁর জনপ্রিয়তা কমত না, বরং আরো বাড়তো। বাংলাদেশের ৯০ ভাগ মানুষ কেউ ইসলামবিরোধী নয়, বরং সকলেই ধর্মপ্রাণ, কিন্তু রাজনৈতিক concept হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে হাজার হাজার বছরের পুরোনো জাতীয় ঐতিহ্যকে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ভিত্তিকে এভাবে পরিবর্তন করা জিয়ার উচিত হয়নি। এগুলো হাজার বছরের সংগ্রামের অর্জিত মূলধন। বাঙালি হওয়ার সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই। কোনদিন ছিলও না। কিন্তু তাঁদের মতে এই দুটো ইস্যুতে জিয়া জাতীয় জীবনে নতুন করে এমন এক বির্তকের সূচনা করেছেন যার পরিণাম কোন এককালে রক্তক্ষয়ী হয়ে উঠতে পারে।

(৩) সরকারের দুটো গোয়েন্দা বিভাগকে জিয়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত রেখেছিলেন এবং তাদের রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করেছেন। এর পরিণতি হলো দুটি; (১) সরকারি

www.pathagar.com

গোয়েন্দা বিভাগকে দেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ফেলা ও তার স্বাভাবিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করা; আর (২) রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং অবক্ষয়কে সামরিক বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেয়া। সমালোচকদের মতে, (৪) সামরিক বাহিনীই ছিল জিয়ার ক্ষমতার আসল ভিত্তি। তাঁর জনপ্রিয়তা তিনি ব্যবহার করেছেন সেনাবাহিনীর চাপকে প্রতিহত করার একটি হাতিয়ার বা counter weight হিসেবে, রাষ্ট্র পরিচালনায় এটিই ছিল তাঁর মূল রণকৌশল বা strategy। যদিও তিনি একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেশে কায়েম করেছিলেন, কিন্তু দেশ পরিচালনায় সামরিক-বেসামরিক আমলারাই মূল ভূমিকা পালন করেছে। সমালোচকদের মতে, (৫) জিয়া জাতীয় অগ্রাধিকার উপেক্ষা করে সেনাবাহিনীর বাজেট এবং শক্তি বৃদ্ধি করেন। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেনাবাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে তিনি জাতীয় বাজেটের একটা বিরাট অংশ সামরিক বাহিনীর পেছনে ব্যয় করার ফলে সামরিক বাহিনী একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। জাতীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেনাবাহিনী রাখা এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা সমাজের অন্যান্য শ্রেণী বা গোষ্ঠীর তুলনায় বেশি হওয়ায় তারা নিজেদের একটি আলাদা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁদের মতে, (৬) জিয়া সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসারদের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁরই নিজের হাতে গড়া সেই পুনর্গঠিত বা সম্প্রসারিত সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের হাতে নিহত হন।

জিয়ার বিরুদ্ধে এসব সমালোচনা হওয়া স্বাভাবিক। কারণ রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ করে রাষ্ট্রনায়কদের কেউই নিখুঁত বা perfect হতে পারেন না। নিরাবেগ ও নিস্পৃহ থেকে জিয়াকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর সমালোচকদের বক্তব্যকেও বিবেচনায় নিতে হবে। কিন্তু সেই একই কারণে জিয়ার রাজনীতি বা তাঁর কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা বা সমালোচনার উপযুক্ত বিশ্লেষণ করতে হবে অন্য যে কোন নেতার মত তাঁর দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে। তাঁকে বিচার করতে হবে রাজনীতিতে তাঁর আবির্ভাব এবং তাঁর শাসনকালে দেশের পরিবেশ এবং পরিস্থিতির আলোকে। আগেই বলেছি জিয়া রাজনীতিবিদ ছিলেন না। ক্ষমতায় আসীন হওয়ার আগে তাঁর কোন রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল না। ছাত্রাবস্থায় তাঁর ছাত্র রাজনীতি করার সুযোগ ছিল না। বাল্য ও কৈশোর কোলকাতা ও করাচিতে অতিবাহিত হওয়ার জন্য বাঙালি পারিবারিক জীবন ও সামাজিক সম্পর্কের নানান দিক তাঁর নিকট অজ্ঞাত থাকার কথা। রাজনৈতিক সংগঠন করে বছরের পর বছর গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে, সভা-সমিতি করে তিনি জনগণকে কোন আশার বাণী শোনাননি, তিনি তাদের কোন প্রতিশ্রুতি দেননি, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেননি, কোন দর্শন বা আদর্শ প্রচার করেননি, দেশে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বা পার্লামেন্টারি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করার কথাও বলেননি। গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য তিনি কোন সংগ্রামও করেননি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন তাঁর দেশের মানুষের ওপর আক্রমণ

www.pathagar.com

শুরু করে এবং সারা দেশের মানুষ যখন রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু নেতৃত্বহীনতার কারণে ছিল দিগ্বিদিক শূন্য, তখন একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনে একজন দেশপ্রেমিক সৈনিক হিসেবে জিয়া দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং দেশকে স্বাধীন করার যুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করেন। জিয়ার যাত্রা তখন থেকেই শুরু। এটি নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে সেই মুহূর্ত থেকে স্বাধীনতার লক্ষ্য, আদর্শ এবং উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর একটি গভীর commitment সৃষ্টি হয়, তার আগে তাঁর মনে দেশ সম্পর্কে কি স্বপ্ন দোলা দিত বা আদৌ দিত কিনা, সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। তবে মনে রাখতে হবে তিনি একটি সামরিক বাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি তার পুরোনো ভূমিকায় ফিরে গিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জিয়া নিজে কোন ক্যু বা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসেননি। ৩ নভেম্বর তাঁর মৃত্যুও হতে পারত। খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান সফল হলে জিয়ার ভাগ্যে কি ঘটত কে জানে। একটি বিশেষ ঘটনার পরিস্থিতিতে ও সিপাহী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে জিয়া ক্ষমতায় আসেন। একজন সামরিক অফিসার ক্ষমতায় এলে কিভাবে দেশ চালান, তাঁর কাছ থেকে মানুষ বা দেশ কি আশা করতে পারে বা তিনি দেশকে কি দিতে পারেন, রাজনীতিবিদদের প্রতি তাঁর আচার-আচরণ কি ধরনের হয়, তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণা কোথায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং তার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি হয়—এসবই পর্যালোচনার প্রয়োজন। জিয়া যা ছিলেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁকে বিচার করতে হবে। তবেই আমরা তাঁকে অন্যান্য সামরিক বা রাজনৈতিক নেতাদের সাথে তুলনা করতে পারব এবং তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হব। ঢালাওভাবে তাঁর সমালোচনা করা বা সেই সমালোচনা গ্রহণ করা উচিত হবে না।

তৃতীয় বিশ্বের দুচারটি দেশ ছাড়া বাকি সব দেশেই হয় রাজতন্ত্র কায়েম আছে আর নয় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গেছে। এইসব দেশেই বলতে গেলে একনায়কত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। এদের মধ্যে কিছু কিছু দেশ সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে, তবে বেশিরভাগই পুঁজি, আধাপুঁজি, পর-নির্ভরশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধিকারী এবং এরা প্রায় পশ্চিমা ধনী দেশগুলোর সাহায্য-সহানুভূতির ওপর নির্ভরশীল। সমাজতান্ত্রিক হোক আর পুঁজিবাদী হোক, সামরিক শাসকদের দেশ পরিচালনার রীতিনীতি এবং নিজেদের শ্রেণীস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যাপারে কোন হেরফের হয় না এবং কোন সমাজেই নাগরিকদের মৌলিক অধিকার থাকে না—দুপক্ষই সমানে সমানে চলে, কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামোগত ব্যাপারে শ্রেণীবিন্যাস এবং স্বার্থবিন্যাসে বেশ পার্থক্য থেকে যায়। আফ্রিকা বা ল্যাটিন আমেরিকায় না গিয়ে আমাদের এই এলাকার সামরিক শাসকরা কিভাবে দেশ চালায় সেটা দেখলেই বাংলাদেশের জিয়াউর রহমানের শাসনামলকে পর্যালোচনা করতে সুবিধা হবে। ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া আর ওদিকে পাকিস্তান। এদের ব্যাপারে সবাই মোটামুটি জানে এবং আমি কিছুটা আলোচনাও করেছি। তাই পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বললেই চলে যে, এই অঞ্চলের বা অন্য কোন অঞ্চলের কোন সামরিক নেতাই সামরিক বাহিনীকে দূরে সরিয়ে রেখে, মৌলিক অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

দিয়ে, বহুদলীয় এবং অবাধ রাজনীতির মধ্য দিয়ে সার্বজনীন ভোটের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করেননি। অন্যান্য সামরিক নেতাদের তুলনায় বা সামরিক শাসনের তুলনায় জিয়া এবং জিয়ার দেশ শাসনের এটিই ছিল মূল তফাৎ, আর এখানেই জিয়ার অসামান্য কৃতিত্ব এবং সফলতা নিহিত রয়েছে। তাঁর ব্যর্থতা বা সফলতাকে সেই আলোকেই দেখতে হবে। সেইসঙ্গে স্বাধীনতাযুদ্ধে জিয়ার অনন্য ভূমিকা এবং পরবর্তীতে রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা আর স্বাধীনতার পূর্বে এবং অব্যবহিত পরে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের ভূমিকা—এ দুটোর প্রেক্ষাপট যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল সেকথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

জিয়ার শাসনামলে প্রশাসন ভাল চলেছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেড়েছে, চোরাচালানি কমে গিয়েছিল, গুপ্ত হত্যা এবং অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ হয়েছিল, বাজার লুট, ব্যাংক লুট আর হয়নি বললেই চলে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা কমে গিয়েছিল, মানুষের মনে শান্তি এবং নিরাপত্তাবোধ ফিরে এসেছিল, এসব অস্বীকার করার উপায় নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা, জিয়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। একজন সামরিক অফিসার হয়ে জিয়া এদেশের মানুষের জন্য যে রাজনৈতিক অবদান রেখে গেছেন, সেটা আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা-উত্তরকালে রাখতে পারেনি। আওয়ামী লীগের একদলীয় শাসন কায়েম করা তাদের অতীতের সমস্ত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে মুছে দেয়। এটি তাদের একটি অমার্জনীয় পদক্ষেপ হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে। তাই জিয়াকে যে কোন বিষয়ে সমালোচনা করার আগে অন্তত আওয়ামী লীগ নেতাদের, ৭২ থেকে ৭৫ তারা কি করেছেন আর কি করতে পারতেন সেটা তাদের একটু ভেবেচিন্তে দেখতে হবে। শুধু জিয়া কেন, পরবর্তী সব সরকারের বেলায়ও আওয়ামী লীগকে তাই করতে হবে।

যদি বলা হয় যে জিয়া কতগুলো নিষ্পত্তি হওয়া (settled) জাতীয় ইস্যুকে পুনরায় বিতর্কিত (re-open) করে দিয়ে গেছেন, জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছেন, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিদের রাজনৈতিক অঙ্গনে পুনর্বহাল করে গেছেন। তার উত্তরে বলা যায় যে স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের উগ্রনীতির ফলেই যুদ্ধের সময় সীমান্তের ওপারে যাওয়া-না-যাওয়ার ওপর ভিত্তি করে তারা সব ক্ষেত্রে দেশটাকে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। দালাল আইনের অপব্যবহার করে নিরীহ লোককে কারাবন্দি করেছেন, আর আওয়ামী লীগের নেতারাই দালালদের প্রটেকশন দিয়েছেন। তাঁদের খাতিরের লোকেরা কোন অসুবিধায় পড়েনি, কে দালাল আর কে দালাল নয় সেটা নির্ভর করেছে তাঁদের রাজনৈতিক মর্জির ওপর। কোন বড় দালালের কোন বিচার বা সাজা হয়নি—গরিবের ওপর অনর্থক অত্যাচার হয়েছে। যে শাহ্ আজিজকে কটাক্ষ করে তাঁরা জিয়াকে সমালোচনা করেন, সেই শাহ্ আজিজের দুবছরেও কোন বিচার হয়নি কেন বা ক্ষমা প্রদর্শন করে কেন তাঁরা তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং প্রগতির গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন? জহিরুদ্দিনকে শুধু প্রাণে বাঁচানো হয়নি, রাষ্ট্রদূতের চাকরি দেয়া হয়েছিল। স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বলে যাদের চিহ্নিত করা

www.pathagar.com

হয় তাদের কোন বিচার করা হয়নি। মোদ্দা কথাটা এই যে, এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের কোন নীতি ছিল না। কিন্তু মাঝখান থেকে এই ইস্যুটিকে ব্যবহার করে সমাজটাকে ক্ষতবিক্ষত করে নিজেদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিরা যদি পরবর্তীকালে রাজনৈতিক প্রাধান্য পেয়ে থাকে তার সূত্রপাত আওয়ামী লীগ আমলেই। আওয়ামী লীগ না এদিক না ওদিক, কোন দিকেই কোন নীতি নিয়মনিষ্ঠভাবে পালন করেনি। তারপরও স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রকাশ্য রাজনীতি করার অনুমতি জিয়া দিয়ে ভুল করে থাকলেও তার জন্য একা জিয়াকে দোষালে চলবে না, কেবল তাঁকেই ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে না, কেননা আওয়ামী লীগ স্বয়ং এ ব্যাপারে মোটেও কলুষমুক্ত নয়। তাই তাদের পক্ষ থেকে জিয়াকে একা দোষারোপ করা উচিত নয়।

জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি সংবিধানকে সংশোধন করে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ যে ঐ দুটি ইস্যুর চেয়ে নিষ্পত্তিকৃত বড় ইস্যু—গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, সেটাই আধা ঘণ্টার মধ্যে পাল্টিয়ে ফেলেছিলেন? অবশ্য এজন্য পার্লামেন্টের ফ্লোরকে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় এই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল সেই পরিবর্তন করার সঙ্গে বঙ্গভবনে সংবিধান পরিবর্তন করার পার্থক্যটা কম। ক্ষমতায় থাকতে বা নিজেদের সুবিধা বাড়াতে দেশের সংবিধানের পরিবর্তন করার রেওয়াজ আওয়ামী লীগই চালু করে গেছে। তাঁদের সাংবিধানিক পরিবর্তনটা জিয়ার সংশোধনীর চেয়ে আরো অনেক বেশি মৌলিক ছিল। জিয়া বরং সংশোধনী এনে জনগণের ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছিলেন। রাজনৈতিকভাবে সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ দেশে একদলীয় সরকার কায়েম করেছিল। নিজেরা যেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী না করে বা না গড়ে তুলে বরং যা ছিল তাকে ভেঙেছেন, সেখানে জিয়াকে এই বিষয়ে দোষারোপ করার মানে হয় না। জিয়ার তো এই ব্যাপারে দুই যুগের পুরোনো কোন public commitment ছিল না, অথচ সেই জিয়াই আবার দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ও ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

তাঁদের মতে জিয়া আসলে একজন ডিক্টেটর ছিলেন। সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। নির্বাহীদের ওপর পার্লামেন্টের কোন ক্ষমতা ছিল না। তাঁর সাংবিধানিক ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্টেই ছিল সব ক্ষমতার অধিকারী। চতুর্থ সংশোধনী করার আগে যদিও প্রধানমন্ত্রীর অস্তিত্ব নির্ভর করেছে পার্লামেন্টের আস্থার ওপর, কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে দেখা যাবে যে শেখ মুজিব ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং সেই ক্ষমতা তিনি সর্বদা ব্যবহার করেছেন। চতুর্থ সংশোধনীর পর তো আর অন্য কথাই ওঠে না। এমনকি পার্লামেন্টের বিল পাস করার অধিকারও নিয়ে নেয়া হয়েছিল। দেশের প্রেসিডেন্টের যে কোন বিলে ভেটো দেয়ার অধিকার ছিল। চতুর্থ সংশোধনীতে ক্ষমতা যতটা কেন্দ্রীভূত ছিল সেই তুলনায় জিয়ার পদ্ধতিতে ক্ষমতা বেশি বিকেন্দ্রীকৃত (distributive) ছিল। দেশে অন্তত ৫০টি রাজনৈতিক দলের তাঁর বিরোধিতা করার অধিকার ছিল, একটি বহুদলীয় নির্বাচনের ভিত্তিতে পার্লামেন্ট ছিল এবং পার্লামেন্টের কোন বিলেই তাঁর ভেটো

www.pathagar.com

দেয়ার অধিকার ছিল না। মন্ত্রীদের প্রায় সকলেই পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্য থেকে নেয়া আর সবচেয়ে বড় কথা হলো বহুদলীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত হতে হয়েছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আর মৌলিক অধিকার ছিল তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অন্তরায়। এইদিক থেকে শেখ মুজিব যে আরো অনেক বড় ডিক্টেটর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

বিরোধীরা আরো বলেন, জিয়া জাতীয় অগ্রাধিকারকে উপেক্ষা করে সামরিক বাহিনীর বাজেট এবং শক্তি বৃদ্ধি করে গেছেন যার পরিণতিতে শুধু তাঁর নিজেরই মৃত্যু ঘটেনি—তিনি দেশের ভবিষ্যতকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। দেশের রাজনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে চিরদিনের জন্য একটি অনিশ্চয়তা এবং হুমকির মধ্যে রেখে গেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করার আগে আওয়ামী লীগ সরকার কি করেছিলেন সেটা দেখা দরকার। একথা ঠিক যে আওয়ামী লীগ সেনাবাহিনীকে কোন রাজনৈতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব দিতে চায়নি, তাঁরা সেনাবাহিনীকে ছোট রাখতে চেয়েছিলেন এবং জাতীয় বাজেটের একটি সামান্য অংশ সামরিক বাহিনীর জন্য বরাদ্দ করতেন। কিন্তু তাঁরা বিপুল অর্থ বরাদ্দ দিয়ে সেনাবাহিনীর counter vailing force হিসেবে রক্ষীবাহিনীকে দাঁড় করিয়েছিলেন। আর আওয়ামী লীগ মুক্তিযোদ্ধাদের কোন সঠিক ভূমিকা নির্ধারণ না করে তাঁদের নিয়ে সেনাবাহিনী তৈরি করতে প্রয়াস পায়। একদিকে পাকিস্তানের কায়দায় বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাঁড় করানো এবং অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন রাজনৈতিক ভূমিকা দিতে না পারায় সেনাবাহিনী সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক—দুইভাবেই অবহেলিত হয়েছে। একদিকে স্বল্প বাজেট, অন্যদিকে উদ্দেশ্যহীনতা তাদের সরকারবিরোধী করে তোলে। পেশাদার সেনাবাহিনী রাখতে হলে সে যত ছোটই হোক তাদের প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা যে মেটাতেই হবে এই সত্য বাক্যটিকে আওয়ামী লীগ সরকার উপেক্ষা করেছেন। পাকিস্তান বাহিনীর কাঠামো বাংলাদেশে চালু করা হলো, এটি আদৌ উচিত হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে তার আনুষঙ্গিকতা পূর্ণ করা উচিত ছিল—এটি তখনকার সরকার অত তলিয়ে দেখেনি। তারপর যখন পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সৈনিক এবং অফিসারবৃন্দকে শেখ মুজিব সামরিক বাহিনীতে ঢুকিয়ে দিলেন, তখন আরো জটিলতার সৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনী বিভক্ত হয়। এই অবহেলা, উদ্দেশ্যহীনতা, কলহ, দ্বন্দ্ব এবং কোন্দলেরই পরিণতি হিসেবে আমরা ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ থেকে ৩০ মে ১৯৮১ এবং ২৪ মার্চ ১৯৮২ সালের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেছি। এ নিয়ে এর আগে আলোচনাও করেছি। অন্যদিকে ৭ নভেম্বরের পর এবং আওয়ামী লীগের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যর্থতা, সামরিক বাহিনীর প্রতি তাদের অবহেলা এবং ভারতমুখী নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন বাড়ে। তাছাড়া ভারতমুখী নীতির জন্য আওয়ামী লীগ ইচ্ছা করেই বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীকে দুর্বল রাখার চেষ্টা করেছে এরকম একটি ধারণা সাধারণ মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়। সামরিক বাহিনীকে ছোট রাখার বা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে রাখার যৌক্তিকতা মানুষ তখন বিচার

www.pathagar.com

করেনি। স্বাভাবিকভাবেই তাই ক্ষমতায় আসার পর জিয়াকে সেনানায়ক হিসেবে সামরিক বাহিনীর এতদিনের প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা দূর করে সময়ের দাবির প্রেক্ষাপটে একে একটি মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে উন্নীত করতে হয়েছে। রাজনীতিবিদরা যেমন নাকি দলীয় স্বার্থ দেখেন, একজন সেনানায়ক তাঁর গোষ্ঠীস্বার্থ আগে দেখবেন এটি তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর এটি তখন শুধু গোষ্ঠীস্বার্থ ছিল না, এর সাথে জড়িত ছিল এক গভীর জাতীয় স্বার্থ।

তখনকার প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপট ছাড়াও সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার পক্ষে মানুষের সমর্থন বাড়ে আরো দুতিনটি কারণে। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার সাথে সব দেশেই সামরিক বাহিনী চিহ্নিত (identified) থাকে। তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবং পরিবর্তনশীল অবস্থায় ভারতের প্রতি আওয়ামী নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশে সেই চিহ্নিতকরণের (indentification) প্রশ্ন আরো জোরদার হয়। স্বাভাবিকভাবেই দেশে একটি ভাল সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার পক্ষে জনমত তখন অনুকূলে ছিল। এরপর ১৫ আগস্ট এবং ৭ নভেম্বরের পর ভারতের দুটি আচরণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেনাবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করার যুক্তি জোরদার হয় এবং দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক (symbol) হিসেবে সামরিক বাহিনীর শক্তি এবং সংগঠনকে উপযোগী করে গড়ে তোলার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। এ দুটির প্রথমটি হলো বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতীয়দের সাহায্যপুষ্ট হামলা। আওয়ামী লীগের কিছু লোক ভারত সরকারের মদদ নিয়ে প্রায় বছরখানেক আমাদের সীমান্তে আক্রমণ চালায়। এটিকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর ভারতের আঘাত হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিল। আর দ্বিতীয় কারণ ছিল গঙ্গার উজান থেকে ভারত সরকারের একতরফাভাবে পানি নিয়ে যাওয়া, যার জন্য পরে বিষয়টি জাতিসংঘে উপস্থাপনের মাধ্যমে একটি মীমাংসা করার চেষ্টা করা হয়। ঐ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী কত বড় হবে বা কি রকম হবে বা এর আদৌ দরকার আছে কিনা এসব নিয়ে কোন আলোচনার তখন আর সুযোগ ছিল না, উপরন্তু ঐ সময় এই পুরো ব্যাপারটিকে একটি রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং জিয়া তখন পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্পদ সাপেক্ষে সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠিত করেছেন—যার মৌলিক কাঠামো এবং ভেতরকার দ্বন্দ্ব এবং কোন্দল—সবকিছুরই সূত্রপাত হয় আওয়ামী লীগ আমলেই।

আমার এইসব কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, কোন একটি ভুলকে আর একটি ভুল দিয়ে ন্যায্য (justify) বলে প্রমাণ করা বা কাউকে বড় করে দেখানোর প্রয়াসে অন্যকে খাটো করা। এটাও আমার বলার উদ্দেশ্য নয় যে, বাংলাদেশে যা ঘটেছে বা এখনো যা ঘটছে তার সবকিছুর জন্য আওয়ামী লীগই দায়ী। সকল দায়িত্বের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে বাকি সকল কর্মকাণ্ডকে নিরাপদ এবং বিশ্বাসযোগ্য করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং যা বলতে চেয়েছি তা হলো, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে গত ১২ বছর যা ঘটেছে সেগুলো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং প্রতিটি ঘটনাই আমাদের শুধু রাজনৈতিক জীবনেই নয়, আমাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনকে দারুণভাবে ব্যাহত করেছে। এসবের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় এই দেশ এখন মুমূর্ষূ প্রায়, এইসব উপাদানগুলো নানাভাবে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক

www.pathagar.com

ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে আক্রান্ত করে দুর্বল করে দিচ্ছে। যার ফলে আমাদের মধ্যে নতুন করে এমন প্রশ্ন জাগছে যে, আমরা বাংলাদেশকে কেন স্বাধীন করেছিলাম? আমাদের সংগ্রামের সবকিছুই কি ছিল কেবল কোন আবেগতাড়িত বিষয়, ক্ষণিকের প্রত্যাশা, মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন? এর পেছনে কি কোনই সৎ আদর্শ, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল না? পাকিস্তানের সময় যেমন মনে হয়েছিল যে, দেশটির শেষ পর্যন্ত গুটিকয়েক পরিবার বা একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য জন্ম হয়েছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতাও কি সেই একই উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে?

এইসব কারণেই ঘটনাগুলোর যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। আওয়ামী লীগের শাসন, শেখ মুজিবের হত্যা, খন্দকার মোশতাকের ক্ষমতাগ্রহণ, খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান, জেলখানায় চারজন আওয়ামী লীগ নেতার হত্যা, ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান, জিয়ার ক্ষমতাগ্রহণ, কর্নেল আবু তাহেরের ফাঁসি, সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা, ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবরের অভ্যুত্থান এবং কয়েকশত সিপাহীর মৃত্যুদণ্ড, জিয়ার শাসন, জিয়া হত্যা, বিচারপতি সাত্তারের ক্ষমতাগ্রহণ, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং ২৪ মার্চ সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাগ্রহণ—এগুলোর কোনটি অপর কোন ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এইসব ঘটনারই একটি সূত্র রয়েছে—আর সেই সূত্র বের করার জন্য আমাদের অতীতে ফিরে যেতে হয়। এ জাতির গোড়াপত্তন ঘটে দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রথম কয়েক বছরে এবং এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল আওয়ামী লীগ। এটি একটি শিশুকে বড় করার মত, একটি বিরাট দালান বা প্রাসাদ তৈরি করার মত। এর ভিত্তির ওপর নির্ভর করবে এর রূপকাঠামো আর শক্তি। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের আজকের সবকিছুর সাথেই এই জাতির প্রথম কয়েক বছরের অনেক সম্পর্ক রয়ে গেছে। তখনকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব কি দিয়ে গেছে বা রেখে গেছে, সেসবের বিশ্লেষণ করার প্রশ্ন এভাবেই চলে আসে। বাংলাদেশের স্থপতিরা কোন্ প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ, আদর্শ, কোন্ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, দেশটাকে সামনের দিকে আগিয়ে নেয়ার জন্য এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেসবকে অনুসরণ করে চলবে, অনুপুঙ্খভাবে ঐসব বিষয় পরীক্ষা করার দরকার। কারণ সেসবের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারলেই কেবল, আমাদের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে বা কোন্ ধারা অনুসরণ করতে পারে তা নির্ণয় করা সম্ভব। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি নিরসন করা সম্ভব হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রয়োজন হয় তুলনা করার। তাই দেশের বর্তমান অবস্থার সঠিক পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করতে গেলে অনিবার্যভাবে অতীতকে টেনে আনতে হয়। আর জিয়া যেহেতু আওয়ামী লীগের প্রায় পরপরই দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং পাঁচ বছরেরও বেশি সময় দেশ পরিচালনা করেছেন, তাই এই দুই শাসনামলের কথা আমাদের বর্তমান বিচার-বিশ্লেষণে বেশি প্রাধান্য পায় এবং একইসঙ্গে পরের সরকারগুলোর মূল্যায়নের জন্যও ঐ দুই শাসনামলকে বার বার সামনে টেনে আনতে হয় ভবিষ্যতের কর্মকাণ্ডের সূত্র হিসেবে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৪

জিয়াউর রহমানের মৃত্যু, বিচারপতি সাত্তারের নির্বাচন: বিদ্রোহী গ্রুপের ভূমিকা এবং এরশাদের ক্ষমতাগ্রহণ

জেলখানায় জিয়া হত্যাকে কেন্দ্র করে দুটি মূল্যবান দলিল আমার হাতে এসে পৌঁছায়। প্রথমটি ছিল শৃঙ্খলাজনিত সেনাঅভ্যুত্থানের ওপর প্রকাশিত শ্বেতপত্র আর দ্বিতীয়টি ছিল বিচারপতি রুহুল ইসলাম কর্তৃক বিচার বিভাগীয় তদন্তের অপ্রকাশিত গোপনীয় রিপোর্ট।

৮১ সালের ২৯ মে জিয়ার রাজশাহী জেলায় যাওয়ার কথা ছিল আগে থেকেই। কিন্তু ২৫ মে তিনি তাঁর সফরসূচি পরিবর্তন করেন এবং ঠিক করেন সেই দিনে তিনি রাজশাহী না গিয়ে চট্টগ্রামে যাবেন। উপপ্রধানমন্ত্রী জামালউদ্দিন আর পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার সুলতান আহমদের সেই জেলার নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দলটা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে দলের ভেতর তিনি যে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছিলেন, তারই একটি পদক্ষেপ হিসেবে সেখানে একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তাঁর নিজের যাওয়ার দরকার হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে মে মাসের শেষ সপ্তাহে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল এরশাদ গিয়েছিলেন চট্টগ্রামে সরকারি সফরে। তাঁর দিন সাতেক থাকার কথা ছিল সেখানে, কিন্তু নানা কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর যে কর্মসূচি ছিল সেটা আর কার্যকর হয়নি এবং বোধহয় চট্টগ্রাম যাওয়ার একদিন পরই সেখান থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন। যেহেতু প্রেসিডেন্ট জিয়া রাজনৈতিক কারণে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলেন তিনি তাঁর মিলিটারি সেক্রেটারিকে সাথে নেবেন না বলেছিলেন। এর মধ্যে জেনারেল মঞ্জুরকে ঢাকায় স্টাফ কলেজে কমান্ডান্টের পদে বদলির নির্দেশ ২৭ মে চূড়ান্ত হয়। প্রেসিডেন্টের সফরসূচি চট্টগ্রামে জিওসি'র অফিসে পৌঁছানোর পর প্রেসিডেন্টের সফরের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ২৮ মে সন্ধ্যায় যখন ঢাকায় টেলিফোন করা হয়, তখন জানানো হয় যে, যেহেতু রাজনৈতিক কাজের জন্য এই সফর, তাই প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জিওসি'র বিমানবন্দরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তখনো মঞ্জুরের বদলির নির্দেশ তাঁর হাতে পৌঁছায়নি। ২৯ মে সকালে প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম পৌঁছেন এবং সেই দিনই সকালে জেনারেল মঞ্জুরের বদলির নির্দেশ তাঁর অফিসে পৌঁছায়।

www.pathagar.com

সেদিন রাতে ছিল চট্টগ্রাম ছাউনির "রাতের প্রশিক্ষণের" দিন। অর্থাৎ রাতে ছাউনির ভেতরে এবং বাইরে প্রশিক্ষণের জন্য সৈনিক ও যানবাহন আসা-যাওয়াটা একটি স্বাভাবিক ঘটনা ছিল, কারো নজরে পড়ার কথা নয়, সন্দেহ সৃষ্টি তো দূরের কথা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকায় যা হয়েছিল সেইদিনও নাইট ট্রেনিংয়ের দিন ছিল চট্টগ্রাম ছাউনিতে। মধ্যরাত পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট জিয়া সার্কিট হাউসে তাঁর দলীয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। খাওয়াদাওয়া করে শোয়ার ঘরে যেতে যেতে রাত তিনটা বেজে যায়। তখন চট্টগ্রামে ভীষণ বৃষ্টি নামে। ছাউনির বাইরে ৫/৬ মাইল দূরে কালুরঘাটে তখন একদল বিদ্রোহী অফিসার সমবেত হয় যানবাহন এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। কার কি দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে তারা রওনা হয় সার্কিট হাউসের দিকে। উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হলো, তাদের দাবি মানার জন্য প্রেসিডেন্টকে ধরে ছাউনিতে নিয়ে আসতে হবে। তাদের দাবি ছিল মূলত তিনটি; (১) সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের অবহেলা করা চলবে না। উল্লেখ্য যে, প্রায় ৬০ জন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের পদোন্নতি হলে তারা লে. কর্নেল হয়ে কমান্ডিং অফিসারের পদে যেতে পারত এবং সেনাবাহিনী মোটামুটিভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে আসতে পারত। কিন্তু প্রায় বছরখানেক যাবৎ তাদের পদোন্নতি আটকে (withhold) রাখা হয়েছিল প্রত্যাগত অফিসারদের চাপে; (২) সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতিবাজ অফিসার এবং সরকারের দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং (৩) দেশে সামরিক বাহিনীর অধীনে বিপ্লবী সরকার গঠন করতে হবে। প্রেসিডেন্টকে ছাউনিতে এনে এই দাবিগুলো মানতে বাধ্য করতে হবে। রাত সাড়ে তিনটার দিকে তারা সার্কিট হাউসের কাছে পৌঁছায়। জওয়ানদের মধ্যে জিয়ার জনপ্রিয়তার কারণেই হোক আর নিরাপত্তার জন্যই হোক কোন জওয়ানকে এই অভিযানে তারা সাথে নেয়নি। তারা ছিল ১৬ জন অফিসার। লে. কর্নেল মতিউর রহমান এবং লে. কর্নেল মাহবুবুর রহমান এদের নেতৃত্ব দেয়। জেনারেল মঞ্জুর কালুরঘাটের বৈঠকে বা এই আক্রমণের সময় এদের সাথে ছিলেন না।

পরিকল্পনা অনুযায়ী এই তিনটি গ্রুপের ভেতর মাহবুবের নেতৃত্বের দলটি সার্কিট হাউসের ওপর তলায় যাবে, মতিউর রহমানের নেতৃত্বে দ্বিতীয় দলটি নিচে অপেক্ষা করবে যাতে কেউ প্রথম দলের কাজে বাধা না দিতে পারে, আর মেজর গিয়াসউদ্দিনের নেতৃত্বে তৃতীয় দলটি বাইরে আলমাস সিনেমা হলের সামনে সংযোগ বিচ্ছিন্নকারী (cut-off) পার্টি হিসেবে পাহারা দেবে। আক্রমণ চালানো হয় কমান্ডো স্টাইলে। সার্কিট হাউসে ঢোকার সময় থেকেই তারা গোলাবর্ষণ শুরু করে, রকেট লান্সার আর গ্রেনেড ব্যবহার করে। তারা তাদের কাজে তেমন বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং ভঙ্গুর। এদের আক্রমণে এবং মেশিনগানের আওয়াজে প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর শোয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামনে লে. মোসলেহউদ্দিন নামে এক জুনিয়র অফিসারকে দেখে জিজ্ঞাসা করেন কি হচ্ছে? মোসলেহউদ্দিন ইতস্তত করে কম্পিত কণ্ঠে বলে, স্যার, আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। একথার কোন জবাব

www.pathagar.com

জিয়া আর দিতে পারেননি। লে. কর্নেল মতিউর রহমান, যার দায়িত্ব ছিল নিচে পাহারা দেয়ার, সে কোথা থেকে এসে তার হাতের সাবমেশিনগানের পুরো একটি ম্যাগাজিন মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ করে জিয়ার মাথা, মুখ এবং বুক ঝাঁঝরা করে দেয়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জিয়ার মৃতদেহ।

জিয়ার সাথে জেনারেল মঞ্জুরের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না—এটা সেনাবাহিনী এবং সরকারের বিভিন্ন মহল জানতেন। মঞ্জুর যে জিয়ার ওপর নানা ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন—সেটাও সকলের জানা ছিল। সৎ, যোগ্য এবং কর্মক্ষম অফিসার হিসেবে মঞ্জুরের খ্যাতি ছিল। তিনি সামরিক বাহিনীর অধীনে বিপ্লবী সরকার গঠন করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর যেমন রাজনৈতিক অভিলাষ ছিল, তেমনই শত্রুর সংখ্যাও ছিল বেশি। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শত্রুরা সবসময় ব্যস্ত থাকত তাঁর এবং জিয়ার মধ্যে যতটা সম্ভব ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে। মঞ্জুরের "উচ্চাভিলাষের" কথা জিয়াকে অনেকবার বলা হয়েছে। এই সফরে আসার আগে ২২ বা ২৩ মে জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। তিনি বিমানে করে চট্টগ্রামে পৌঁছান। সেখানে জেনারেল মঞ্জুর তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। দুজনের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সবাই লক্ষ্য করে। জিয়া মঞ্জুরের কাঁধে হাত দিয়ে প্রকারান্তরে অতীতের ঘনিষ্ঠতার কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন। এরপর জিয়া হেলিকপ্টারে চড়ে টেকনাফ যান জনসভা করার জন্য, আর মঞ্জুর চলে যান তবলছড়ি। কর্মসূচি অনুযায়ী জিয়া বিকালে সেখানে জনসভা করে রাতে সেখানেই রাত্রিযাপন করবেন। কিন্তু তবলছড়িতে জিয়া যখন পৌঁছালেন হেলিকপ্টার থেকে নেমে মঞ্জুরের সাথে একটি কথাও না বলে সোজা সভামঞ্চে চলে গেলেন। মাইক হাতে নিয়ে বললেন, তিনি খুব দুঃখিত, জরুরি কাজে তাঁকে ঢাকায় যেতে হবে। দুমিনিট কথা বলে, সভা না করে, রাতে না থেকে, হেলিকপ্টারে চড়ে ঢাকায় ফিরে যান। এতে সকলেই হতবাক হয়, সকালে দুজনের এত ভাল সম্পর্ক ছিল অথচ বিকালে মঞ্জুরের সাথে কথাই বললেন না, ব্যাপার কি? জানা যায় যে, জিয়াকে নাকি ততক্ষণে জানানো হয়েছে তবলছড়িতে জিয়ার যাওয়া বা থাকা নিরাপদ নয়। টেকনাফ যাওয়ার পর তাঁকে এক অনুমান নির্ভর ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়, যাতে মূল ষড়যন্ত্রকারী করা হয়েছিল মঞ্জুরকে। এটি শুনে মঞ্জুরের ওপর জিয়া সকল আস্থা হারিয়ে ফেলেন। দুজনের মধ্যে সন্দেহ এবং ভুল বোঝাবুঝি আরো বেড়ে গেল।

জিয়া-মঞ্জুরের সম্পর্কের কথা গোয়েন্দা বিভাগের জানা ছিল। ডিএফআই, এনএসআই প্রেসিডেন্ট জিয়াকে নাকি অনেকবার সতর্কও করেছে। জিয়ার মিলিটারি সেক্রেটারিও বিষয়টি জানতেন। মঞ্জুরকে শেষ পর্যন্ত একটি নিম্নমানের নন-কমান্ডিং পদে বদলি করে ঢাকায় আনার কথা যখন হচ্ছিল এবং ঐ বদলির প্রতি মঞ্জুরের বিরূপ প্রতিক্রিয়া, এইসব ঘটনা সংশ্লিষ্ট সকলেই জানতেন। মঞ্জুরের উচ্চাভিলাষ, ব্যক্তিত্ব, পেশাগত রেষারেষি, বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক মতামত ছাড়াও তবলছড়ির ঘটনা আর বদলির নির্দেশের পরও জিয়া যখন ২৯ তারিখে চট্টগ্রাম গেলেন তখন তাঁর জন্য আলাদা কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা

www.pathagar.com

তো দূরের কথা, দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর যে সাধারণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল সেটাও করা হয়নি। সাধারণ নিরাপত্তার তুলনায় মাত্র অর্ধেকের মত শক্তি সেদিন নিয়োজিত ছিল। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি রুহুল ইসলামের নেতৃত্বে যে কমিশন তৈরি করা হয়েছিল তাঁর রিপোর্ট পড়ে বোঝা যায় যে, সরকারের গোয়েন্দা বিভাগগুলো এ সময় কি অমার্জনীয় অদক্ষতা এবং অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়েছে এবং দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সেদিন কি রকম নিরাপত্তাবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এই কমিশনকে ডিএফআই-এর মহাপরিচালক, এনএসআই-এর মহাপরিচালক, প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব এবং আরো অনেকে মঞ্জুরের দুরভিসন্ধিমূলক আচরণের কথা বলেছেন। জিয়াকে উৎখাত করে মঞ্জুর ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন, একথাও কমিশনকে বলা হয়েছিল, কিন্তু এরপরও, মে মাসের শেষ সপ্তাহে তবলছড়ির ঘটনা এবং বদলির আদেশে মঞ্জুরের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি জানা সত্ত্বেও জিয়া যখন চট্টগ্রাম গেলেন মনে হয়েছে সেজন্য কারো কোন চিন্তা বা উদ্বেগ বা দায়িত্ব ছিল না। ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে আর ঐ কমিশনের রিপোর্ট পড়লে কেন জানি মনে হয়, জিয়ার আশপাশের প্রায় সকলেই বোধহয় তখন তাঁর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তা না হলে এত অবহেলা, এত বন্ধুহীন, এত উপায়হীনের মত তাঁর মৃত্যু ঘটবে কেন? এই কমিশনের কাছে গোয়েন্দাপ্রধানরা স্বীকার করেছেন তাঁদের ব্যর্থতার কথা, কিন্তু জিয়ার মৃত্যুর পর এদের বা অন্য কারো, যারা তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন তাদের চাকরি যায়নি, বিচার হয়নি। বরং পরবর্তী পর্যায়ে এদের অনেকেরই লক্ষণীয় পদোন্নতি হয়েছে। ডিএফআই প্রধান মহব্বতজান চৌধুরী হয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর এনএসআই প্রধান আব্দুল হাকিম হয়েছিলেন রাষ্ট্রদূত। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এটি সম্ভব হতো বলে মনে হয় না।

১৯৮১ সালের ৬ জুনের আদেশে যখন এই কমিশন সৃষ্টি করা হয় তখন এই হত্যার ষড়যন্ত্র উদঘাটন করার দায়িত্বও এই কমিশনকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোন কারণ না দেখিয়ে সরকার ১৩ জুন আর একটি আদেশবলে ষড়যন্ত্র উদঘাটন করার দায়িত্ব থেকে কমিশনকে অব্যাহতি দেয় এবং কেবল প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দিকটি তখন অনুসন্ধান করার দায়িত্ব কমিশনের ওপর অর্পিত হয়। যদিও এই নিরাপত্তার ওপর অনুসন্ধানের রিপোর্টও সরকার জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি, তবুও এই রিপোর্ট পাঠ করলে মঞ্জুরকে হত্যা করার বিষয়টিসহ গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা বিষয়ক অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।

জিয়া কোন একদলীয় সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন না। এরকম একটি গরিব দেশে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি অনুপযুক্ত—এটিই ছিল জিয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক মহলের প্রধান নালিশ, যদিও এই প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি আওয়ামী লীগই চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তন করে গিয়েছিল। গণতন্ত্রের অন্য কোন দিক থেকে—যেমন মৌলিক অধিকার বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—এ ধরনের বিষয়ে সাধারণ মানুষের তেমন কোন অভিযোগ আর ছিল না। জিয়া জনগণের নিকট ঘৃণিত বা ধিকৃত বা জনপ্রিয়তাহীন কোন

www.pathagar.com

সরকারপ্রধান ছিলেন না। তাঁর সরকার দেশে-বিদেশে মোটামুটিভাবে একটি গ্রহণযোগ্য সরকার হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বাংলাদেশের মত সমস্যা জর্জরিত দেশের জন্য এটিই যথেষ্ট ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ করার মত তেমন কোন সিরিয়াস ইস্যু ছিল না। রাজনৈতিক অঙ্গনে জিয়াবিরোধী শক্তি ছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁরা তাঁকে চরম শত্রু বলে মনে করত না, জিয়ার ভারসাম্যপূর্ণ নীতির জন্য তাঁর শত্রু সংখ্যা ছিল কম। এর অন্যতম কারণ রাজনৈতিক বিরোধীদের তিনি রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার পথ উন্মুক্ত রেখেছিলেন। জিয়া যে একজন জননন্দিত নেতা ছিলেন তাঁর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুই তাঁর জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তাঁর জানাজায় জনসমাগম একটি জনসমুদ্র রচনা করেছিল। কিন্তু এত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও জিয়ার মৃত্যু ঘটেছে। তাঁকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। দেশের মানুষ তাঁর জীবন ছিনিয়ে নেয়নি। সামরিক বাহিনীরই একটি অংশ জিয়াকে হত্যা করেছে। শেষ পর্যন্ত জিয়া হত্যার beneficiary সাধারণ মানুষ হয়নি। জিয়াবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিরাও হয়নি। হয়েছেন সামরিক বাহিনীর কিছু অফিসার, যাঁরা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন।

জিয়ার মৃত্যুর পর ঢাকায় অবস্থিত সেনাপ্রধান এবং সেনাবাহিনীতে নেতৃস্থানীয় তাঁর সহকর্মীরা রাজনৈতিক ক্ষমতার বলয়ে প্রথম কাতারে চলে আসেন। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভীষণ অসুস্থ ৭৮ বছর বয়স্ক বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে সংবিধান অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বানালেন, জিয়ার হত্যাকে তাঁরা নিন্দা এবং প্রত্যাখ্যান করলেন, আর মঞ্জুরের সাথে কোন আপোস না করে দেশের সংবিধান এবং সাংবিধানিক সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করলেন। ঢাকার সেনাবাহিনীর এই মনোভাব দেশের মানুষকে উৎসাহিত করে। তাদের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং সিদ্ধান্তের প্রতি সকল রাজনৈতিক মহল এবং সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে সাড়া দেয় এবং তাঁরা দেশে গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক সরকার চালু রাখতে এই উদ্যোগের প্রতি সার্বিক সমর্থন জানিয়ে বিচারপতি সাত্তার সরকারকে আরো শক্তিশালী করে তোলেন। জিয়ার মৃত্যুর পর বাংলাদেশ যে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থাকে গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক পথে ধরে রাখতে পেরেছে—এই ঘটনা দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যদিও বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়, কিন্তু জওয়ান এবং জনগণের সমর্থনের অভাবে দুদিনের মধ্যেই চট্টগ্রামের বিদ্রোহী অফিসারদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ঢাকা এবং অন্যান্য ছাউনি থেকে মঞ্জুর যে সমর্থন আশা করেছিলেন সেটা তো পাননি, এমনকি চট্টগ্রামের জওয়ান এবং অফিসাররাই জিয়ার মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় সরকারি পক্ষে যোগ দেয়া শুরু করে।

কিন্তু সাংবিধানিক সরকার চালু রাখলেও দেশের রাজনীতিতে ক্ষমতার সমীকরণে (power equation) পরিবর্তন ঘটে। বিচারপতি সাত্তার অসুস্থতার কারণে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন না বলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ঘোষণা করার পরদিন আমি যখন তাঁর সাথে দেখা করতে যাই তখনও তিনি একই কথা আমাকে জানান। অথচ এর

www.pathagar.com

দুদিন পর তাঁর সাথে কথা বলে আমার মনে হলো তিনি নিজেই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে চান। তখনও তাঁর শরীর বেশ নাজুক। এই অসুস্থতার কারণে তাঁর চোখে দ্বিদৃষ্টি রোগও হয়েছিল। যার ফলে চোখে একটি বস্তুর দুটি ইমেজ দেখেন। তাঁর বাঁ দিকের চোখটা একটু বেঁকে ট্যারা হয়ে গিয়েছে বলে মনে হলো। তবে শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল। তিনি বললেন, সকলেই চান তিনি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হোন, তাই তিনি নির্বাচন করার কথাই ভাবছেন। খুব তাড়াহুড়া করে দলের কোন প্রক্রিয়া ছাড়াই এবং অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও জিয়ার মৃত্যুর ৪০ দিন পার হওয়ার আগেই অনেকটা ঘুরপথে বঙ্গভবনের পাহারাবেষ্টিত অবস্থায় বিচারপতি সাত্তারের মনোনয়নও চূড়ান্ত হয়ে যায়। একদিন হঠাৎ নির্বাচনের তারিখও ঘোষণা করা হয়, সবই হলো দ্রুতগতিতে। সত্যি বলতে কি এজন্য এত তাড়াহুড়ার প্রয়োজন ছিল না, সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের জন্য ১৮০ দিন সময় ছিল।

জিয়ার মৃত্যুর পর সামরিক বাহিনী তখনই ক্ষমতা দখল করতে পারত, কিন্তু পরিবেশ এবং পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করেছিল যে, সেটা সেই মুহূর্তে আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অনেকগুলো কারণের মধ্যে তিনটি কারণ ছিল সুস্পষ্ট। প্রথমটি হলো জিয়ার হত্যাকাণ্ডের কোন দায়িত্ব সেনাবাহিনীর মূল সংগঠন নিতে চায়নি। জিয়ার মৃত্যুতে জনগণের মধ্যে এত তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে সেটা খুব কম লোকই ধারণা করতে পেরেছিল। সারা দেশে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, এমনকি গ্রামের অশিক্ষিত মানুষেরা পর্যন্ত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। পরপর দুজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সেনাবাহিনীর সদস্যরাই খুন করেছে। জনসাধারণের পয়সায় প্রতিপালিত সেনাবাহিনীর লোকেরা জনগণের জনপ্রিয় নেতাদের খুন করেছে। এমনও প্রশ্ন মানুষ করেছে যে, এদেশে সেনাবাহিনীর কোন প্রয়োজন নেই। তাদের dissolve করে দিলেই ভাল, এসব ছিল তখন মানুষের সাধারণ মানসিক অবস্থা। এই প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপে। তখন দেশের রাজনৈতিক দল এবং নেতারা এক নজিরবিহীন দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সকলেই জিয়া হত্যার নিন্দা করেছেন কঠোর ভাষায় এবং ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করার দাবি জানিয়েছেন। সকলেই গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক সরকার চালু রাখার পক্ষে ছিলেন। তাঁরা সেই সময়কার সকল মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে বিচারপতি সাত্তারের পাশে দাঁড়ান। দেশ সেদিন এক অতুলনীয় জাতীয় ঐক্যের ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। ওদিকে আবার প্রচুর গুজব ছড়ানো হয় যে, জিয়া হত্যা ষড়যন্ত্রে ঢাকা সেনানিবাসের আরো অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা জড়িত ছিলেন, কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে তারা পিছুটান দিয়েছেন। মঞ্জুরের সাথে তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যে জওয়ানদের মধ্যে জিয়ার জনপ্রিয়তার কারণে তাঁর হত্যা তাদের মধ্যে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। যারা জিয়াকে হত্যা করেছে তাদের বিরুদ্ধে জওয়ানরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং সেই অবস্থায় যদি সামরিক নেতারা ক্ষমতা দখল করতেন তাহলে (১) মানুষের

www.pathagar.com

মনে বদ্ধমূল ধারণা হতো যে ঢাকা সেনানিবাসের প্রধানরাও জিয়া হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল; (২) সামরিক বাহিনীকে মানুষ আরো ঘৃণার চোখে দেখত; আর (৩) সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশে একটি জাতীয় রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং বিরোধিতা সৃষ্টি হতো এবং (৪) জওয়ানদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিত।

দ্বিতীয়ত, এত বড় একটি ঘটনার পর সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে স্বভাবতই একটি নড়বড়ে অবস্থার সৃষ্টি হয়। চারদিকে অস্থিরতা দেখা দেয়। জিয়া হত্যার ব্যাপারে যেহেতু মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ জড়িত ছিল তাই মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বিরুদ্ধে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে দেখা দেয় এবং এর পাশাপাশি মহল বিশেষে ব্যাপারটিকে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র বলেও মনে করা হয়। আবার যেহেতু এই হত্যাকাণ্ডে শুধু অফিসাররাই জড়িত ছিল-জওয়ানরা জড়িত ছিল না, জিয়া হত্যার অপরাধের জন্য অফিসারদের কি শাস্তি বিধান করা হয় জওয়ানরাও সেটা দেখতে চাইল। অতীতে যখনই কিছু ঘটেছে জওয়ানদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, জেল-জরিমানা, ফাঁসি দেয়া হয়েছে। সুতরাং এবার তারা দেখতে চাইল অফিসারদের ক্ষেত্রে কি করা হয়। জিয়া হত্যার প্রতিক্রিয়া জওয়ানদের এতটাই আলোড়িত করে যে, ঢাকার সামরিক নেতাদের ক্ষমতা দখল করার উপায় ছিল না। তাদের সময়ের প্রয়োজন ছিল। সামরিক বাহিনীকে পরিচ্ছন্ন করা, অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বিদায় দেয়া এবং সুসংবদ্ধ করার বিষয়টি সে সময় হয়ে পড়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঘর ঠিক না করে ক্ষমতা দখল করাটা হতো নেহাত বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তৃতীয়ত, ঢাকায় সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব ছিল দুর্বল ধরনের। একে তো তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, তার ওপর তাঁদের মধ্যে নেতৃত্ব দেয়ার মত কোন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিল না। একজন ভাল যোদ্ধা বা একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি—এমন ভাবমূর্তিসম্পন্ন কোন নেতা তাদের ছিল না যাঁর এক কথায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা বা জওয়ানরা ওঠে দাঁড়াবে বা জনগণ তাঁকে সম্মান দেখাবে বা সমর্থন দেবে।

উপরোক্ত এই তিনটি কারণে সেনাবাহিনীর পক্ষে তখন আর ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হয়নি। প্রয়োজন ছিল সময়ের এবং সাথে সাথে ক্ষমতা দখল করার বিকল্প (option) তাদেরকে খোলা (open) রাখতে হয়ে। তাই বিচারপতি সাত্তারকে হাসপাতাল থেকে তুলে এনে প্রেসিডেন্টের ভার দেয়া, তাঁকে মনোনয়ন দেয়া এবং নির্বাচিত করার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ঐ সামরিক নেতাদের। তাঁরা ভেবে নিয়েছিলেন বিচারপতি সাত্তার, যাঁর কোন রাজনৈতিক খুঁটি ছিল না, যিনি ছিলেন অসুস্থ এবং যার পক্ষে বাংলাদেশের মত একটি সমস্যা বহুল দেশ পরিচালনা করা সম্ভব হবে না—তাঁকে সামনে রাখলে সরকার তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবে না এবং কতকটা বাধ্যবাধকতা ও কতকটা নিজস্ব সীমাবদ্ধতার কারণে বিচারপতিকেও সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করেই থাকতে হবে। তাঁকে পরিচালনা করাও সেনা অফিসারদের পক্ষে সুবিধা হবে। সময় যখন আসে বা যদি সেরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাঁর মাধ্যমে বা তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করে

www.pathagar.com

বা তাঁকে ব্যবহার করে সরাসরিভাবে ক্ষমতাও দখল করতে পারবেন। একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে সেনাবাহিনী যদি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে বা ক্ষমতায় আসে তখন দেশে-বিদেশে তার প্রতিক্রিয়া অত বিরূপ হবে না। আর শেষ পর্যন্ত কিছু না হয় বা সাত্তার যদি রাজি না হন বা বেঁকে বসেন তাহলে তাঁকে সরিয়েও ক্ষমতা দখল করা যাবে। তাঁকে এবং তাঁর সরকারকে অদক্ষ প্রমাণ (discredit) করতে খুব অসুবিধা হবে না। জিয়ার মৃত্যুর পর বিএনপির অবস্থা কি হতে পারে সেটা তাদের আঁচ করতে অসুবিধা হয়নি।

সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছাড়া আরো একজনকে দেয়া যেত। যেমন ভাইস প্রেসিডেন্ট অসুস্থ বা অক্ষম থাকলে পার্লামেন্টের স্পিকার প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু মীর্জা গোলাম হাফিজকে তাঁদের অতটা নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়নি। তাই বিচারপতি সাত্তারকেই সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। বিচারপতি সাত্তারকে প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড় করানোর জন্য সেনাপ্রধানই চাপ দিয়েছিলেন এবং রাজি করিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এই ব্যাপারে যাতে কোন গোলমাল বা ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেইজন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দায়-দায়িত্ব তারাই গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় জেনারেল এরশাদ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন সামরিক বাহিনী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকবে যদিও অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তারকে নির্বাচনে প্রার্থী হতে তিনিই রাজি করান। তিনি বলেন, "এটি করেছি আমি একটি কারণেই, সেটা হচ্ছে, আমি চেয়েছিলাম দেশের এমনি একটি সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যেন বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে, টুকরো টুকরো না হয়ে যায়।" জেনারেল এরশাদ আরো বলেন, "অবশ্য আমাদের সেনাবাহিনী এখন দেশের ঘটনাবলির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। জড়িয়ে না থেকে উপায় নেই, কেননা আমাদের ঘাড়ে এখন অনেক দায়। দেশের ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দায়-দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে।"

তাই জিয়ার মৃত্যুর পর দেশের নতুন সঙ্কট এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার শক্তি বিএনপির থাকা সত্ত্বেও সেটা নানা কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। দলের গঠনতন্ত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল বলে এবং সেই ব্যক্তির অন্তর্ধানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেটা পূরণ করাই ছিল তখনকার জন্য একটি বড় রাজনৈতিক কর্তব্য। তখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল দলের কাউন্সিল সভা ডেকে নেতৃত্বের কাঠামো নতুন করে তৈরি করা বা নতুন আস্থার সৃষ্টি করা—এটিই হলো নিয়ম। পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই রাজনৈতিক দল কোন প্রতিষ্ঠান (institution) হিসেবে পরিচালিত হয়, সেখানে সর্বপ্রথম এটিই করতে হয়। এক্ষেত্রে এটি করা হলে দেশবাসী এবং দলের কর্মীদের মধ্যে নতুন করে আস্থা এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি হতো। তাই বিএনপির একাংশ যখন গণতন্ত্রায়নের দাবি তোলে, তখন অন্য অংশ, যাঁরা তখন ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁরা সেটাকে নিজেদের ওপর কার্যত অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখলেন। একটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে তাঁরা তাঁদের কৌশল এবং কার্যপদ্ধতি

www.pathagar.com

ঠিক করলেন। সামরিক বাহিনীর সমর্থনকে বড় করে দেখে দলকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে চাইলেন না। প্রত্যেক দলের ভেতর মতবিরোধ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক, পৃথিবীতে এমন কোন দল নেই যে দলের অভ্যন্তরে মতবিরোধ নেই, মতবিরোধ না থাকলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোও যায় না। কিন্তু এই মতবিরোধ মেটানোর জন্য একটি দলীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যপদ্ধতি (mechanism) অনুযায়ী একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য নিরন্তর কাজ করে যেতে হয়, পৃথিবীর সর্বত্র ছোট বড় সকল গণতান্ত্রিক সংগঠনই এইভাবেই চলে। কিন্তু বিএনপিতে সেটা হলো না। আমার নেতৃত্বে দলের ৭০ জন পার্লামেন্ট সদস্য এবং বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী শেষ পর্যন্ত বিচারপতি সাত্তারের কাছে এক স্মারকলিপির মাধ্যমে দলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দিলাম। কিন্তু বিএনপিতে আলোচনা, পর্যালোচনার কোন ফোরাম ছিল না। বিচারপতি সাত্তার বা তাঁর সহকর্মীরা উপস্থিত পরিস্থিতিতে সেই ফোরাম সৃষ্টি করারও চেষ্টা করলেন না। বরং সবকিছুকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হলো। ১৯৩০ সালে যে ধরনের প্রাসাদ রাজনীতি চালু ছিল সেরকম স্টাইলে সমস্যাগুলোকে নিজেদের স্বার্থের প্রেক্ষাপটে বিচার করলেন। দলের বা দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলেন শুধু নিজেদের অবস্থানগত দৃষ্টিকোণ থেকে। দলের গণতন্ত্রায়ন বা জিয়ার অনুসৃত ভারসাম্যপূর্ণ নীতির কথা বলা হলে তাঁরা ভয় পেতেন, আর সেই ভয়কে ঢেকে রাখতে একটি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে উপস্থাপিত দাবিগুলোর দিকে নজর দিতেন। গণতন্ত্রায়ন বা ভারসাম্যের কথা বললে তাঁরা ক্ষমতার ভাগাভাগি ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না। ১৯৩০, ৪০, ৫০ সালের বা প্রাসাদ রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ওসব চিন্তা করতেন। তাঁরা ষড়যন্ত্রের মানসিকতা নিয়ে একটি স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছু দেখতে থাকেন। ক্ষমতা পাওয়ার জন্যই যে সবসময় মানুষ দাবি তোলে—এই চিন্তাধারার ঊর্ধ্বে তারা উঠতে পারেননি।

বিচারপতি সাত্তার যখন ঠিক করলেন নির্বাচনে দাঁড়াবেন, তখন তাঁর বিরোধিতা করার কোন ইচ্ছা কারো ছিল না, কিন্তু ব্যাপারটিকে একটি দলীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হোক—এই পরামর্শটিও তিনি গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। বিচারপতিকে সাহায্য করার জন্য এবং ভবিষ্যতে এরকম সাংবিধানিক সঙ্কট এড়ানোর জন্য একজন নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট করার ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া এবং সমর্থন ছিল দলে কিন্তু সেটাও গ্রহণযোগ্য হলো না। ২১ জুন ১৯৮১ পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক করা হলো যে, একটি দলীয় গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট মনোনয়নের ব্যাপারটি স্থির করা হবে এবং বঙ্গভবনে তার পরের দিন যে সভা ডাকা হয়েছিল, সে সভায় মনোনয়ন কি পদ্ধতিতে দেয়া হবে শুধু সেটাই নির্ধারণ করা হবে। বিচারপতি সাত্তার আমাকে সভা শুরু হওয়ার দশ মিনিট আগেও বলেন যে, এই সভায় পদ্ধতিটাই শুধু আলোচনা হবে, কাউকে কোন মনোনয়ন দেয়া হবে না। কিন্তু সভা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে শাহ আজিজের প্রকাশ্য ইঙ্গিতে মন্ত্রী আবুল কাসেম বিচারপতির নাম প্রস্তাব করেন আর এস. এ. বারী তা সমর্থন করেন। এ ঘটনায়

www.pathagar.com

তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। উপায়ান্তর না দেখে আমরা ক'জন তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেগম জিয়ার সম্মতি না নিয়েই তাঁর নাম প্রস্তাব করলাম। ঘরটা ছিল সশস্ত্র পাহারাবেষ্টিত। দুয়েকজন মন্ত্রীও আপত্তি তুললেন। ক্ষমতাসীনরা দাপট দেখিয়ে বাইরের লোকজনকে ঘরে ঢুকিয়ে একতরফাভাবে বিচারপতি সাত্তারের মনোনয়ন ঘোষণা করেন। সংসদীয় দলের সিদ্ধান্তের কোন মূল্য থাকল না। জিয়ার মৃত্যুর চল্লিশ দিনও তখন পার হয়নি। সাত্তারের প্রতি সেনাবাহিনীর সমর্থনের কারণে তাদের পক্ষে ঐ একগুঁয়ে মানসিকতা ও শক্তি প্রদর্শন করা সম্ভব হয়।

এরপর যখন দেখা গেল সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়ানোর যোগ্যতা বিচারপতি সাত্তারের নেই তখন একজন ব্যক্তির সুবিধার্থে সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী উত্থাপন করা হয়। এই অবস্থায় ৭০ জন পার্লামেন্ট সদস্যের ৭ দফা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে দলের গঠনতন্ত্রের গুরুত্ব এবং প্রেসিডেন্টের সাথে ভাইস প্রেসিডেন্টের একসাথে running mate হিসেবে নির্বাচনের বিষয়টি আবার তোলা হয়। বিল উপস্থাপনের দিন আমার নেতৃত্বে ৯০ জন দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য অধিবেশন বর্জন করেন, ফলে বিল আর উপস্থাপন করা হলো না। বিলকে ব্লক করে দেয়া হলো, কারণ সংবিধান সংশোধন করার বিল পাস করতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট লাগে। পরের দিনও তাই হলো। সংবাদপত্রে আমাদের "বিদ্রোহী" বলে আখ্যায়িত করা হলো। সেই পর্যায়ে জেনারেল এরশাদ আমার সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর সাথে দেখা করতে অনুরোধ করেন। সাক্ষাতের সময় আমাদের বক্তব্য তিনি কাগজে লিখে নিয়ে বলেন যে, আমাদের দাবিগুলো অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। পরের দিন রাতে বঙ্গভবনে তিনি একটি আলোচনার ব্যবস্থা করলেন। নিজেই ফোন করে জানালেন রাত এগারোটায় সেখানে যেতে। বিচারপতি সাত্তার, শাহ্ আজিজ, জেনারেল এরশাদ আর আমি। আমি আমাদের ৭ দফা দাবির পুনরুল্লেখ করলাম। নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্টসহ দেশের সংবিধানকে আরো গণতন্ত্রায়নের জন্য আগেই যে সংসদীয় উপকমিটি করা হয়েছিল সেই অনুযায়ী পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালেই আরো সংশোধনী আনার প্রয়োজনীয়তার কথা জানালাম। ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনয়নের ব্যাপারে প্রস্তাব করলাম প্রেসিডেন্ট তাঁর রানিংমেট নিজেই ঠিক করবেন, তবে কাউন্সিল সভা ডেকে দুটো মনোনয়নের অনুমোদন নিতে হবে। এই সংসদীয় উপকমিটি আগেই করা হয়েছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এতদিন কোন সভা ডাকেননি। পরের দিন এই কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হলো যে, ভাইস প্রেসিডেন্ট একটি নির্বাচিত পদ হবে, তবে কি করে নির্বাচিত হবেন সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে। ষষ্ঠ সংশোধনী পাস করা হবে, কিন্তু নতুন আর একটি সংশোধনী আনার জন্য পার্লামেন্ট দশ দিনের জন্য মুলতবি হবে। এই শর্তে সেদিন ষষ্ঠ সংশোধনী আমাদের সমর্থনে পাস হলো, পার্লামেন্ট মুলতবি না করে আমাদের হতবাক করে দিয়ে স্থগিত (prorogue) করে দেয়া হলো। বিচারপতি সাত্তারের নির্বাচন নিশ্চিত হলো। ক্ষমতাসীন চক্র জয়লাভ করলেন। আসলে যে সেটা একটি নির্বুদ্ধিতার জয়লাভ ছিল সেটা তারা বুঝতে পারেননি। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রেখে জিয়া যেভাবে দেশ

www.pathagar.com

শাসন করে গেছেন বিচারপতি সাত্তারও সেইভাবে দেশ, জাতি এবং সরকারকে পরিচালনা করবেন আগামী পাঁচ বছর এইরকম একটি অবাস্তব ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে তারা এগিয়ে চলেন। বঙ্গভবনে আমাদের সেই আলোচনা এবং সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্তের কোন মূল্য আর দেয়া হলো না।

এই সবের সাথে সাথে জেনারেল এরশাদ বার বার গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক সরকারের প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্য ঘোষণা করতে থাকেন। বিভিন্ন সমাবেশে এবং ছাউনিতে তাঁর বক্তব্যের এটিই ছিল মূল বিষয়। দেশে গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক সরকার থাকবে এবং তিনি যতদিন সেনাবাহিনীতে আছেন বাংলাদেশে আর সামরিক অভ্যুত্থান বা ক্যু হবেনা সেটাও ঘোষণা করেন। নির্বাচনে সাত্তারের জয় সুনিশ্চিত করার জন্য জেনারেল এরশাদ এবং তাঁর সহকর্মীরা উদ্বিগ্ন ছিলেন। এই ব্যাপারে কোন রকমের গোলমাল বা বাধা বা বা জটিলতা সৃষ্টি হোক তাঁরা সেটা চাননি। কোন রকম ঝুঁকি নিতে তাঁরা রাজি ছিলেন না। বিএনপি থেকে সাত্তার ছাড়া অন্য কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হোন এটি তাঁরা চাননি এবং এ ব্যাপারে সব প্রতিবন্ধকতা তাঁরা দূর করার চেষ্টা করেছেন। এইসব কারণেই বিচারপতি সাত্তারের মনোনয়ন ঐ ধরনের একটি পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। এমনকি মনোনয়ন চূড়ান্ত করার পরও যখন বলা হলো দলের একটি আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখার জন্য কাউন্সিল সভা ডেকে মনোনয়নটা অন্তত অনুমোদন (endorse) করিয়ে নেয়া হোক—তাতেও তাঁরা রাজি হননি।

সামরিক এবং শাসকচক্রের জন্য সবচেয়ে ভয় ছিল বেগম জিয়াকে নিয়ে। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য তিনিই সে সময় সবচেয়ে শক্তিশালী (potential) ব্যক্তি হতে পারতেন। মুসলমান ঘরের স্বামীহারা স্ত্রী। স্বামীর এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে খালেদা জিয়া তখন শোকাভিভূত। ৪০ দিন পর্যন্ত তাঁর জন্য ছিল ধর্মীয় এক কঠিন বন্ধন। জিয়ার চেহলামের আগে খালেদা জিয়ার পক্ষে কোন ধরনের সামাজিক বা রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। ঐ কারণেই এত বিরোধিতা, এত প্রতিবাদ এবং সংসদীয় দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই জিয়ার চেহলামের আগেই সাত্তারের মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়। যদিও হাতে অনেক সময় ছিল মনোনয়ন ঠিক করার, কিন্তু এই ঝুঁকি ক্ষমতাসীনরা নিতে পারেননি। বেগম জিয়া যদি প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাইতেন, তাহলে অন্য কারো প্রার্থী হওয়ার তখন আর প্রশ্ন উঠতো না। কিন্তু ৪০ দিন পার হওয়ার আগে সেটা যাচাই করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু জিয়ার হত্যার পর ক্ষমতাসীনদের একটি চক্র এবং দুটো গোয়েন্দা বিভাগ বেগম জিয়া ছাড়া অন্য আর একজন যিনি প্রার্থী হতে পারতেন, প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী, তাঁকে জিয়া হত্যার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার চেষ্টা করে এবং তাঁর চরিত্রহননের নানা চেষ্টা চালায়। বদরুদ্দোজা চৌধুরী তখন সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্য ক্ষমতাসীনদের সরাসরি বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর কাছ থেকে তেমন কোন হুমকি তখন আর ছিল না।

www.pathagar.com

আমার কথা যদিও অনেকে তুলেছে কিন্তু আমি আরো অপেক্ষা করতে চাই জেনে সেকথা আর ওঠানো হয়নি। আর বাকি ছিল জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশু। জিয়ার রাজনীতিকরণ এবং দেশের গণতন্ত্রায়নে তাঁর অমূল্য অবদান ছিল তাই তখনকার অবস্থায় একটি সক্রিয় ভূমিকা নেয়ার জন্য তাঁর ওপর অসম্ভব চাপের সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট না হলেও একজন ভাইস প্রেসিডেন্টের জন্য তিনি একজন শক্তিশালী প্রার্থী (potential candidate) হতে পারতেন। দলের কাউন্সিল সভা ডাকলে বেগম জিয়া যদি প্রার্থী না হতেন অনেকে হয়তো হয় বদরুদ্দোজা না হয় নূরুল ইসলামের কথা তুলতো। যাই হোক নির্বাচনের মনোনয়নের ব্যাপারে নূরুল ইসলাম কোন পদপ্রার্থী না হলেও তাঁর একটি ভূমিকা থাকত এতে কোন সন্দেহ নেই। বিচারপতি সাত্তারের মনোনয়ন প্রায় তখন চূড়ান্ত এবং বিচারপতির বিরোধিতা করার কোন ক্ষমতা বা সাহস নূরুল ইসলামের ছিল না। তবে সেই পর্যায়ে নূরুল ইসলাম দলের সদস্য পদ গ্রহণ করার সাথে সাথেই ক্ষমতাসীনদের মনে একটি ভয় এবং অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। যেদিন সকালে নূরুল ইসলাম বিএনপির সদস্য হলেন সেদিন রাতেই নূরুল ইসলাম এবং তাঁর সমর্থক আর একজন মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল আকবরের মন্ত্রিত্ব চলে যায়। শাহ্ আজিজ বরাবরই জানতেন যে, সাত্তার ছিলেন সামরিক বাহিনীর মনোনীত প্রার্থী, তাই নিজের আকাঙ্ক্ষা কোনদিন প্রকাশ করেননি। সেনাপ্রধান এবং বিশেষ করে সাত্তার, ব্যক্তিগতভাবে শাহ্ আজিজকে খুব অপছন্দ করতেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের অবস্থানকে ধরে রাখার জন্য শাহ্ আজিজ সেদিন সাত্তারের পক্ষে দাঁড়ান এবং সাত্তার ও সামরিকপ্রধান তাতে খুশি হন। যেদিন নূরুল ইসলাম সদস্য হন সেদিনই প্রধানমন্ত্রী সাত্তার এবং এরশাদকে বুঝিয়েছেন যে, বিচারপতি সাত্তারের মনোনয়ন হুমকির সম্মুখীন হয়ে গেছে। মন্ত্রিসভা থেকে ওদের দুজনকে বের করে দেয়ার পরামর্শটা শাহ্ আজিজই দিয়েছিলেন এরশাদকে। পরে জেনারেল এরশাদ এবং মিনু দোহা দুজন একসাথে বঙ্গভবনে গিয়ে নূরুল ইসলাম আর কর্নেল আকবর হোসেনকে মন্ত্রিসভা থেকে বের করে দিতে বলেন। আকবরের ওপর সাত্তার আগেই চটা ছিলেন, কারণ আকবর প্রকাশ্যে তাঁর নির্বাচনে বিরোধিতা করেছিলেন। সাত্তার সেদিন রাতেই তাঁদের অপসারণ করেন। কোন রকমের শালীনতা বা লৌকিকতার তোয়াক্কা করেননি। পিয়ন মারফত তাঁদের বাড়িতে চিঠি পাঠিয়ে রাত এগারোটায় জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তাদের আর মন্ত্রী থাকার দরকার নেই।

তাই সাত্তারের মনোনয়নের ব্যাপারে কোন ধরনের ঝুঁকি জেনারেল এরশাদ নিতে চাননি। এ ব্যাপারে তিনি তখনকার মন্ত্রিসভার সকল গুরুত্বপূর্ণ সদস্যেরই সহযোগিতা পেয়েছিলেন। শাহ্ আজিজ, জামালউদ্দিন আহমেদ, এস. এ. বারী এ. টি., আবুল হাসনাত, মইদুল ইসলাম, আবুল কাসেম, শামসুল হুদা চৌধুরী, ডা. এমএ মতিন এবং অন্যান্য সকলেরই। নূরুল ইসলাম আর আকবরকে বের করে দেয়ায় এঁরা সবাই খুশি হয়েছিলেন। এরা দুজনই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা এবং জিয়ার ঘনিষ্ঠ সহচর। জেনারেল এরশাদ এদের এইভাবে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন প্রধানত তিনটি কারণে; (১) সাত্তারের মনোনয়ন নিশ্চিত

করা, মন্ত্রীর পদে থেকে অনেক রকম প্রভাব বিস্তার করা যায়। পদচ্যুত হলে সেই ক্ষমতা আর প্রভাব ব্যবহার করা যায় না। নূরুল ইসলামকে দুর্বল করে দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য যাতে তাঁর যদি কোন আকাঙ্ক্ষা থেকেও থাকে, সেটা যেন তিনি অত সহজে অর্জন করতে না পারেন; (২) মন্ত্রিসভায় এঁরা দুজনই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধাদের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার যে প্রস্তুতি তখন চলছিল এটিকেও তারই একটি অংশ হিসেবে নেয়া হয়েছিল; (৩) বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলটাকে আরো সজীব করে তোলা। এরশাদ একদিকে যেমন সাত্তারের মনোনয়ন এবং নির্বাচন নিশ্চিত করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে বিএনপির ভেতরকার দ্বন্দ্ব এবং কলহ যেন চলতে থাকে সেটাও চেয়েছেন। একদিকে যেমন নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত বিএনপির মধ্যে কোন রকম বড় ভাঙন দেখতে চাননি, অন্যদিকে বিএনপি পূর্বাপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাক, সেটাও চাননি। বিএনপির দুটো মূল গ্রুপকেই তিনি বেশ একটি মজার অবস্থানে রেখেছিলেন। দুদলকেই খুশিতে রেখেছিলেন, যখন যে দল তাঁর কাছে যেত, তিনি সেই দলেরই অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন। অনুপস্থিত দল সম্পর্কে খারাপ কথা বলে উপস্থিত দলকে খুশি রাখতেন। নূরুল ইসলাম আর আকবরকে বের করে দেয়ার পর এই অভ্যন্তরীণ বিরোধ আরো ধারালো হয়।

বিচারপতি সাত্তারের নির্বাচন সুনিশ্চিত করার জন্য জেনারেল এরশাদ যা কিছু সম্ভব সবই করেছেন। দেশে কোন রাজনৈতিক সঙ্কট নেই বলে তিনি সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার দেন এবং সেনাবাহিনীর প্রধান হয়ে সরাসরিভাবে বিচারপতি সাত্তারকে সমর্থন দান করেন। ১৯৮১ সালের ১৮ অক্টোবর সাপ্তাহিক *হলিডে* পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল এরশাদ আওয়ামী লীগ এবং জেনারেল ওসমানীকে নাকচ করে দেন এবং বলেন যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিএনপির কোন বিকল্প নেই এবং বিএনপি যদি জিততে না পারে তাহলে আওয়ামী লীগ এসে দেশকে আবার নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যাবে। জিয়া যেরকম সেনাবাহিনীর স্বার্থের দিকে নজর রাখতেন বিচারপতি সাত্তারের সেনাবাহিনী সম্পর্কে তেমন কোন ধ্যানধারণা ছিল না। যাই হোক নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত বিচারপতি সাত্তার প্রায় ৯৬ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড. কামাল হোসেনকে পরাজিত করে জয়যুক্ত হন। তাঁর এই জয়ের মূল কারণ ছিল; (১) জিয়ার জনপ্রিয়তা এবং ভাবমূর্তির জন্য জনসাধারণের একটা বিরাট অংশের ইতিবাচক সমর্থন; (২) আওয়ামী লীগ এবং ভারতবিরোধী মনোভাবের জন্য একটি অংশের নেতিবাচক ভোট; এবং (৩) ক্ষমতাসীন থাকার সুযোগ-সুবিধা এবং সুফল। তখন এমন এক অবস্থা ছিল যে বিএনপির যে কোন মনোনীত প্রার্থী নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জয়যুক্ত হতেন। কারণ জনগণ প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণের চেয়ে উপরোক্ত কারণেই ভোট দিয়েছে বেশি। দেশে একটি গণতান্ত্রিক অবস্থা চালু থাকবে আর জিয়ার অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক নীতি অনুসরণ করা হবে—এটিই ছিল জনগণের প্রত্যাশা।

নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার আগেই সেনাবাহিনীকে মোটামুটি সুসংহত করে আনা হয়। জেনারেল এরশাদ প্রায় প্রতিটি ছাউনিতে গিয়ে সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খল এবং ঐক্যবদ্ধ

www.pathagar.com

করার চেষ্টা করেন। সামরিক বিধানের অধীনে সেনাবানিহীতে বিদ্রোহ করার অভিযোগে ৩১ জন সামরিক সদস্যের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে ফিল্ডকোর্ট মার্শালে বিচার শুরু হয়। এদের মধ্যে একজন ছিল সুবেদার, বাকিরা সবাই অফিসার। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কেউ প্রত্যাগত সদস্য ছিল না। তারা প্রায় সকলেই ছিল হয় মুক্তিযোদ্ধা না হয় স্বাধীনতা-উত্তরকালের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার। ১০ জুলাই বিচার শুরু হয় এবং ২৮ জুলাই সে বিচার সমাপ্ত হয়। বাইরের কোন উকিলের প্রবেশ ছিল নিষেধ এবং বিচার হয়েছে ক্যামেরায়। বিচারে ১২ জনের ফাঁসি হয়, ১০ জনের বিভিন্ন মেয়াদের সাজা হয় এবং সুবেদারসহ বাকি ৯ জন মুক্তি পায়। ফাঁসিপ্রাপ্ত ১২ জনের মধ্যে ১০ জন ছিল প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা আর অন্য দুজন বাংলাদেশে কমিশনপ্রাপ্ত জুনিয়র অফিসার। অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনুরোধ এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও ২৪ আগস্ট ১১ জন অফিসারের ফাঁসি হয়ে যায়। যদিও সামরিক বাহিনীর ভেতর বিদ্রোহ করার অভিযোগের সাথে জিয়ার হত্যা সম্পৃক্ত ছিল, কিন্তু বিচারটা বিদ্রোহের অভিযোগেই করা হয়। জিয়া হত্যার বিচার বা সেই হত্যার পেছনে আর কোন ষড়যন্ত্র ছিল কিনা সেটার আর কোন সুরাহা হয়নি। ষড়যন্ত্র ছিল কিনা বা ষড়যন্ত্রের সাথে কারা জড়িত ছিল, সেই বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের কমিশনকে দেয়া এখতিয়ার পরে তুলে নেয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। তাই এইদিক থেকে জিয়া হত্যার বা এর পেছনের কোন ষড়যন্ত্রের রহস্য আর উদঘাটন করা হয়নি।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। অতীতে, বিশেষ করে জিয়ার আমলে, সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য অনেক সৈনিককে প্রাণ দিতে হয়েছে। অনেককে সাজা পেতে হয়েছে, চাকরিচ্যুত হতে হয়েছে, অনেক সময় কোর্ট মার্শাল করে তাদের কাউকে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। তাই অফিসারদের ওপর জওয়ানদের একটি ক্ষোভ ছিল, অফিসাররা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জওয়ানদের ব্যবহার করে, অথচ অফিসাররা প্রায় সময় বেঁচে যায় বা তাদের ধরাধরি করার লোক থাকে বলে তাদের সাজা হয় না, হলেও কম হয় এ ধরনের একটি অনুভূতি তাদের মধ্যে কাজ করছিল। ৭৭ সালের ২ অক্টোবরের পর যা ঘটেছে সেটাকে তারা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতো। যখন জিয়া হত্যার ব্যাপারে শুধু অফিসারদেরই জড়িত দেখা যায়, তখন জওয়ানদের মধ্যে এ ব্যাপারে দুরকমের প্রতিক্রিয়া হয়; (১) জনপ্রিয় জিয়াকে হত্যা করায় ক্ষোভ; আর (২) তাঁকে শুধু অফিসাররা হত্যা করায় অফিসারদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির দাবি। এরশাদ জওয়ানদের এই মনোভাব ব্যবহার করেন এবং তিনি নিজে প্রতিটি সেনা ছাউনিতে গিয়ে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে অফিসারদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন এবং দোষী অফিসারদের ফাঁসি দেয়া হবে বলে ঘোষণা করেন। অভিযুক্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জওয়ানদের মধ্যে জোরালো অভিমত সৃষ্টি হয়, তাই ১২ জন অফিসারের বিরুদ্ধে ফাঁসি কার্যকরী করতে অসুবিধা হয়নি। সুপ্রিমকোর্ট যদি ঐ ফাঁসি রহিত করত, তাহলে জেনারেল এরশাদকে হয়তো ক্ষমতা দখল করে হলেও সামরিক আইনের অধীনে সেটা কার্যকরী করতে হতো। অফিসারদের ফাঁসি দেয়ার ব্যাপারে *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে এরশাদ

www.pathagar.com

বলেছেন—এটি অফিসার বনাম অন্য র‍্যাঙ্কের কর্মচারীদের দ্বন্দ্ব, যারা শাস্তি পেয়েছে তারা সকলেই অফিসার। এইসব অফিসারদের ধারণা ছিল যে, অফিসার বলে তাদের ক্ষমা করা হবে। কিন্তু সেটা করা হয়নি। আমি সেনাবাহিনীর মধ্যে একথাটাই প্রচার করেছি।"

যাই হোক এর সাথে সাথে শুধু চট্টগ্রামে নয়, সারা সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য একটি ঝাড়াই-বাছাই প্রক্রিয়া (process of screening) শুরু হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রধানত সেইসব মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদেরই চিহ্নিত করা হয়, যারা মেজর বা লে. কর্নেলের পদে বা তারও ওপরের পদে ছিলেন। এদের বেশিরভাগই হয় কোন commanding পজিশনে ছিলেন বা সেই পজিশনে যাওয়ার যোগ্য অবস্থায় ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রত্যাগত অফিসারদের পারস্পরিক কোন্দল এবং রেষারেষি অনেক পুরোনো, তার কারণ ও প্রেক্ষাপট ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখন যেহেতু সেনাবাহিনীর সেনানায়ক থেকে শুরু করে ওপরের স্তরের সকল অফিসারই পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অফিসার এবং অমুক্তিযোদ্ধা হওয়ায় সেনাবাহিনী তাঁদেরই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বিশেষ করে জিয়া হত্যায় জড়িত প্রায় সকল অফিসারই মুক্তিযোদ্ধা হওয়ায় এবং তাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণ এবং জওয়ান—দুই ফ্রন্টেই গণবিক্ষোভ গড়ে ওঠায় তৎকালীন সেনাকর্তৃপক্ষ এক কথায় প্রত্যাগত সামরিক অফিসাররা এই সুযোগ আর নষ্ট করতে চাননি। তাঁরা সেনাবাহিনী থেকে অবাঞ্ছিত লোকদের বিতাড়নের (clean up) ব্যাপারে মনোনিয়োগ করেন। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় সকল মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত মেজর র‍্যাঙ্কের ওপর অনেক মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকেই নানা কারণ দেখিয়ে সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করা হয়। এই অফিসারদের বেশিরভাগই জিয়া হত্যার সাথে জড়িত না থাকলেও সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এদের বিদায় দেয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার কারণে মেজর এবং তার ওপরের র‍্যাঙ্কের শতকরা দশজন অফিসারও আর মুক্তিযোদ্ধা থাকলেন না। যাঁরা থাকলেন তাঁদেরও গুরুত্বহীন পদে পোস্টিং দেয়া হলো। একেবারে সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে জেনারেল শওকত আর জেনারেল মইন চৌধুরীকে কূটনৈতিক চাকরি দিয়ে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাই দোষী হোক আর না হোক, মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বিরুদ্ধে এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে সেনাবাহিনীকে 'অবাঞ্ছিত' লোকমুক্ত (clean up) করার চেষ্টা করা হয়। জিয়া হত্যার ব্যাপারে যাদের ফাঁসি বা সাজা দেয়া হয়েছে তাদের অনেকে নিরপরাধ ছিল বলেও অনেকে মনে করেন, কিন্তু পরিবেশ এমন ছিল যে, সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ কারো ছিল না এবং সেনাবাহিনী অনেকটা নির্বিঘ্নেই তাদের এই কাজ সমাধা করে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলার শুরু থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতর নানা দর্শন, নানা দল, নানা মত কাজ করেছে এবং ফলে মুক্তিযোদ্ধারা কখনো নিজেদের একটি সুসংগঠিত ফোর্স হিসেবে গড়ে তুলতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগের কোন দার্শনিক বা আদর্শিক ভিত্তি ছিল না বলে দেশকে পাকিস্তান থেকে মুক্ত করে ক্ষমতায় যাওয়া ছাড়া আর অন্য কোন দিক নির্দেশনা বা কর্মসূচি তারা মুক্তিযোদ্ধাদের দিতে পারেনি। এছাড়া তাদের নিজেদের মধ্যে ছিল নানা কোন্দল, অন্তর্দ্বন্দ্ব। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব ছিল দ্বিধাবিভক্ত। মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল প্রবাসী সরকারের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য। এছাড়া আওয়ামী লীগ মোটামুটি সবকিছুই তাদের এবং ভারতের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাওয়ায় মস্কোপন্থী দুটো সংগঠন ছাড়া দেশের বাকি সব রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীকে মুক্তিযুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল অথচ তাদের সকলেই প্রায় নিজস্ব উপায়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত নানা ধরনের মুক্তিযোদ্ধার দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাধীনতার পর এদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার কোন পরিকল্পনা সরকার নেয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোন রাজনৈতিক আদর্শ উপস্থাপন করা হয়নি, বা তাদের জন্য কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়নি। সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য জায়গায় চাকরি বা ভাতা দেয়া ছাড়া তাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বা চেতনার কোন মূল্যায়ন হয়নি। এই সবকিছু নিয়ে সমাজের বিভিন্ন অবস্থার প্রতিফলন গিয়ে পড়ে সেনাবাহিনীতে। আদর্শগতভাবে উদ্বুদ্ধকরণের (motivation) অভাব এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত রাখার কারণে শেখ মুজিব থেকে শুরু করে জিয়াউর রহমানের হত্যা পর্যন্ত দেশে বা সেনাবাহিনীতে যেসব অভ্যুত্থান ঘটেছে, এগুলো সবই প্রধানত মুক্তিযোদ্ধা অফিসার বা সৈনিকরাই করেছে। হতাশাই হোক, দেশপ্রেমই হোক, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষই হোক, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণেই হোক, এসব ঘটনায় উদ্যোগ এবং নেতৃত্বের ভূমিকায় এই মুক্তিযোদ্ধা অফিসার বা সৈনিকদেরই দেখা যায়। তারা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক সাহসী, আত্মবিশ্বাস এবং দেশের জন্য তাদের ভালবাসা, আবেগ এবং উদ্যম অন্যদের চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি ছিল। তাই যখনই কোন অন্যায় দেখেছে কোথাও, সেটা সেনাবাহিনীর ভেতরই হোক আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক, তাতে তারাই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। সে ব্যাপারে কিছু একটি করতে এগিয়ে গেছে। বুঝে হোক আর না বুঝে হোক, নিজের দ্বারা হোক বা অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে হোক—তারা চেয়েছে বিদ্যমান অসামঞ্জস্যের প্রতিকার করতে। তাদের ব্যবহার করাটাও তাই ছিল বেশ সহজ। ষড়যন্ত্রকারীরাও তাদের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিল তাদের মিত্র। এইসবের পরিণতিতে এক এক করে দেশের প্রায় সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে জাতি হারিয়ে বসে। এই সমস্ত কারণে দুর্ভাগ্যবশত সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলার দোষ ও দায়-দায়িত্ব মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর এসে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে এবং অজুহাতে ঢালাওভাবে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের ওপর এবার আসে আঘাত এবং তাদের সকলকেই বিশৃঙ্খলাকারী বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে বা শৃঙ্খলার হুমকি হিসেবে ধরে নেয়া হয় এবং তাদের সরিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনীকে একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠন করার প্রয়াস নেয়া হয়। ১২ জন অফিসারের ফাঁসির পর এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সেনাবাহিনী থেকে অপসারণের শেষে মোটামুটিভাবে জেনারেল এরশাদ

www.pathagar.com

সামরিক বাহিনীকে সুসংহত করে একটি চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ১৮ অক্টোবর ১৯৮১ তারিখে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *হলিডে* পত্রিকায় জেনারেল এরশাদ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "We have got rid of those who tried to engineer splits in this vital institution of the country. We are united". জেনারেল মঞ্জুরের পূর্বেকার দাবি অনুযায়ী জিয়া কিছু সিনিয়র সামরিক অফিসারকে দুর্নীতি এবং অন্যান্য কারণে অপসারণের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। জেনারেল এরশাদ ঐ নির্দেশের কিছু অংশ কার্যকর করেন। উপরোক্ত সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে জেনারেল এরশাদ সেনাবাহিনীর কমান্ডে একটি নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনেন।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুসংহত করার সাথে সাথে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরের অফিসার এবং জওয়ানদের ক্রমশ আরো ক্ষমতার আহরণের ব্যাপারে প্ররোচনা দেয়া শুরু হয়। বিষয়টি সেনাবাহিনীতে জন্ম থেকেই ছিল, সেটা আগেও বলেছি এবং জিয়ার হত্যার পরপরই কেন কার্যকরী হয়নি সেটাও আগে আলোচনা করেছি। এখন যখন অবস্থা আয়ত্তে আসে এবং নির্বাচনের নামে দেশে একটি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে, তখন সেই পুরোনো লালসাই হোক আর আকাঙ্ক্ষাই হোক, ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাই এবারের প্ররোচনা ছিল অন্য এক আঙ্গিকে। যেহেতু সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ছিল দুর্বল, একক কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না যিনি সেনাদের এবং জনসাধারণের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র, তাই কোন সেনানায়কের পরিবর্তে পুরো সেনাবাহিনীর জন্যই একটি রাজনৈতিক ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার কথা অফিসার এবং সৈনিকদের মধ্যে প্রচার করা হলো। মান, মর্যাদা, ক্ষমতা ভোগের ভাগ কে না পেতে চায়? এটি ছিল অনেকটা শিল্পকারখানা জাতীয়করণের মত। শ্রমিকদের বলা হয়েছিল শিল্প জাতীয়করণের মানে তারা হবে শিল্পকারখানার মালিক। তারাই হয়ে যাবে শিল্পকারখানার শেয়ার হোল্ডার, তারাই সব ভোগ করবে। পরে দেখা গেল কিছু আমলা আর কিছু রাজনৈতিক টাউট শিল্পকারখানা জাতীয়করণের পুরো ফায়দা নিয়েছে। কিছু শ্রমিক নেতাও অবশ্য ভাগ পেয়েছেন, সম্পদের দাপট দেখিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ কর্মচারী বা শ্রমিকরা কিছুই পায়নি। এখানেও ব্যাপারটা তাই। সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা মানে কিছু অফিসার তাদের পেশাগত পোশাক এবং পদ বহাল রেখেই দেশ চালনার দায়িত্ব নিতে চান। মন্ত্রী-চেয়ারম্যান হতে চান, রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করতে চান। কিন্তু প্রস্তাবটা স্বাভাবিকভাবেই অফিসার ও জওয়ান নির্বিশেষে সকলের জন্য আকর্ষণীয় ছিল। শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের মত সবাই ভেবেছে ক্ষমতা সবাই ভোগ করবে, সকলেই শেয়ার পাবে। পুস্তিকা ছাপিয়ে বিলি করা হলো সৈনিকদের মধ্যে যে রাজনীতিবিদরা দেশ চালাতে অক্ষম, তারা অযোগ্য এবং দুর্নীতিবাজ। ছাউনিতে ছাউনিতে নতুন করে "bloody civilian" আর "dirty civilian" চর্চা শুরু হয়। দেশ পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর ভূমিকার ওপর সামান্য কিছু লিটারেচার বিলি করা হলো। পরে আরো অফিসারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিলি করা হলো। তাদের বক্তব্য: "যে সামরিক বাহিনী দেশ স্বাধীন করেছে সেই সামরিক বাহিনীকে দূরে সরিয়ে

www.pathagar.com

রাখা যাবে না দেশ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে। দেশের প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকতে হবে। ঔপনিবেশিক কায়দা বা পদ্ধতিতে যেখানে সেনাবাহিনীকে শুধু একটি পেশাগত সুশৃঙ্খল শক্তি হিসেবে রাখা হয় সেটা স্বাধীন দেশের জন্য আর প্রযোজ্য নয়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই সেনাবাহিনীর জন্ম, সুতরাং দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাদের দায়িত্ব। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সেনাবাহিনী রাজনীতির অংশ হয়ে গেছে, তাই দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাদের একটি ভূমিকা থাকতে হবে।" যদিও সেনাবাহিনীর leadership-এ যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, তবুও জেনারেল এরশাদ ক্রমশ এসব বক্তব্য জনসমক্ষে হাজির করার চেষ্টা করেন।

৮১ সালের অক্টোবর মাস যখন আসে তখন একদিকে জেনারেল এরশাদ যেমন "দেশে কোন রাজনৈতিক সঙ্কট নেই" বলে ঘোষণা দেন, অন্যদিকে প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করতে থাকেন। এর আগে এতদিন ধরে তিনি কেবল গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক সরকারের প্রতি সামরিক বাহিনীর আনুগত্যের কথা বলছিলেন, অক্টোবর মাস থেকে তাতে শেষোক্ত বক্তব্য যুক্ত হলো। এখন থেকে তিনি একদিকে নির্বাচনে সাত্তারকে সমর্থনদানের কথা বললেন, অন্যদিকে প্রশাসনে সেনাবাহিনীর একটি সাংবিধানিক ভূমিকার কথা বললেন। একদিকে বলেন, তিনি একটি সাংবিধানিক সরকার চান, অন্যদিকে বলেন যে, সংবিধানে সেনাবাহিনীর জন্য একটি রাজনৈতিক ভূমিকা তিনি দেখতে চান। একদিকে তিনি বলেন, যদি সেনাবাহিনীকে প্রশাসনের সর্বময় কর্তা হতে হয় তবে তা নিঃসন্দেহে সেনাবাহিনীকে ভেঙে চুরমার করে দেবে, অন্যদিকে আবার বলেন, সামরিক বাহিনীকে দেশের প্রশাসনে জড়িত রাখতে হবে। ১১ অক্টোবর লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় জেনারেল এরশাদের এসব বক্তব্য প্রথম ছাপানো হয়, তারপর ১৮ অক্টোবর *হলিডে* পত্রিকায় আলাদা সাক্ষাৎকার ছাড়াও *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় তাঁর উক্ত বক্তব্যের কিছু অংশ ছাপা হয়। বিচারপতি সাত্তার তখন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট, নির্বাচনের বাকি ছিল মাসখানেক। এসব বক্তব্য তাঁর নজরে এসেছে কিনা বা আসার পর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, সেটা কোনদিন প্রকাশিত হয়নি। *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে জেনারেল এরশাদ বলেন, "দেশে ভবিষ্যতে আর যাতে কোন অভ্যুত্থান ঘটতে না পারে সেজন্য সামরিক বাহিনীকে সরাসরি দেশের প্রশাসনে জড়িত রাখতে হবে। এটি করলে সেনাবাহিনীর লোকদের মনে দেশের স্থায়িত্ব রক্ষার দায় চাপবে। প্রশাসনের সাথে নিজেরা জড়িত আছে বলে দেশের ভাল মন্দের দায়-দায়িত্ব তারা এড়াতে পারবে না। এতে অন্তত ক্ষমতা দখলের জন্য অভ্যুত্থান ঘটানোর নতুন কোন প্রয়াস দেখা যাবে না। ভবিষ্যতে দেশে অভ্যুত্থান অর্থাৎ ক্যুদেতা বন্ধ করার জন্য যদি সেনাবাহিনীকে দেশের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তবে সেনাবাহিনীর লোকরাও ভাববে তারাও দেশের দায়িত্বশীল পদে রয়েছেন, সেই দায়িত্ব তাদের পালন করা উচিত।" এই ধরনের একটি মনোভাব জন্ম নিলে সেনাবহিনীর মধ্যে কোন হতাশা

www.pathagar.com

থাকবে না। অভ্যুত্থান সৃষ্টির প্রবণতা বন্ধ হয়ে যাবে।" সেনাবাহিনীর এই ভূমিকার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করার প্রস্তাব দেন তিনি এবং বলেন যে "নির্বাচনের পর বেসামরিক সরকারই এই সংবিধান পরিবর্তনের প্রস্তাব কার্যকরী করার দায়িত্ব নেবেন।" অর্থাৎ সাত্তার নির্বাচিত হলে এরকম ব্যবস্থা করবেন এটিই ছিল তাঁর কথা। কিন্তু বিচারপতি সাত্তার এটি জানতেন কি না বা তাঁর সাথে এটি নিয়ে কোন আলোচনা হয়েছে কি না, জেনারেল এরশাদ তাঁর সাক্ষাৎকারে সে ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেননি।

কিন্তু নির্বাচনের পর বিচারপতি সাত্তার তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেই জেনারেল এরশাদের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তিনি বলেন যে সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব হবে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। তারা ব্যারাকেই থাকবে। কিন্তু ২০ নভেম্বর ১৯৮১ বিচারপতি সাত্তার যেদিন শপথ গ্রহণ করেন, সেদিনই জেনারেল এরশাদ বিবিসির কাছে এক সাক্ষাৎকারে আবারও সেনাবাহিনীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তবে তাঁর ঐ সাক্ষাৎকারের বিষয়টি অনেকের অগোচরেই থেকে যায়। ২৭ নভেম্বর নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে। এই মন্ত্রিসভায় পুরোনো প্রায় সকল মন্ত্রীকেই রাখা হয়। যাঁরা বাদ পড়েন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শুধু এস. এ. বারী, আর ওবায়দুর রহমান। বাকিরা অর্থাৎ শাহ আজিজ থেকে শুরু করে জামালউদ্দিন, হাসনাত, মইদুল সকলেই অন্তর্ভুক্ত হলেন। এরা সকলেই জিয়ার আমল থেকেই মন্ত্রিসভার সদস্য। হাসনাত মন্ত্রী না হলেও চিফ হুইপ হিসেবে মন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেছেন। সাত্তার সাহেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মন্ত্রিসভা ছোট এবং কর্মদক্ষ হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা ধরনের রাজনৈতিক চাপে মন্ত্রিসভার আয়তন প্রায় আগের মতই থাকে, আর পুরোনোদের নিয়েই তিনি যাত্রা শুরু করেন। তার আরো একটি কারণ এই যে, জিয়ার মৃত্যুর পর থেকে এরাই এতদিন তাঁর সাথেই ছিলেন। তাঁর মনোনয়ন থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে সমর্থন জুগিয়েছেন। যদিও দেশের মানুষ এই মন্ত্রিসভা দেখে কিছুটা হতাশ হয়েছিল, কিন্তু বিচারপতি যা ভাল মনে করেছেন তাই করেছেন। সামরিক নেতারাও এই মন্ত্রীদের সমর্থন নিয়ে তাদের নিজস্ব এজেন্ডা এবং নির্বাচনে সাত্তারকে জয় করার স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়ন করেছেন।

মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের পরদিন ২৮ নভেম্বর ১৯৮১ শনিবার জেনারেল এরশাদ ঢাকার কিছু সংবাদপত্র সম্পাদকদের তাঁর অফিসে আমন্ত্রণ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে সেনাপ্রধান একটি দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে *গার্ডিয়ান* পত্রিকার কাছে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলোই আরো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর বক্তব্য লিখিত আকারে সাইক্লোস্টাইল কপি করে সকলের মধ্যে বিলি করা হয়। "Role of the military in Bangladesh" শিরোনামে এই বক্তব্যে দেশ পরিচালনায় সেনাবাহিনীর একটি সাংবিধানিক ভূমিকা থাকতে হবে—এই কথাই ছিল তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়। এ বক্তব্যের সারাংশ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি

www.pathagar.com

অনুধাবন করার জন্য জেনারেল এরশাদের মূল কথাটার সামান্য পুনরাবৃত্তি হলেও দোষ নেই। তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন তা হলো "সামরিক বাহিনী দেশ রক্ষার কাজও করবে এবং দেশ পরিচালনাও করবে। সার্বভৌমত্ব শুধু সীমান্ত রক্ষার ওপরই নির্ভর করে না—এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপরও নির্ভর করে। সুতরাং এই দুই কাজেই সেনাবাহিনীকে জড়িত থাকতে হবে। একদিকে তারা যেমন তাদের পেশাগত দিকটা দেখবে, অন্যদিকে দেশের শাসন কাজেও দায়িত্ব পালন করবে। বাংলাদেশে বার বার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে—দুজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সেনাবাহিনীর লোকেরাই হত্যা করেছে। কিন্তু প্রশাসনের দায়িত্ব যদি সেনাবাহিনীর হাতে থাকে তাহলে আর এসব অভ্যুত্থান হবে না। বাংলাদেশে তাই ভবিষ্যতে সামরিক অভ্যুত্থান বন্ধ করার জন্যই সামরিক বাহিনীর দেশ পরিচালনায় একটি স্থায়ী ভূমিকা থাকতে হবে এবং এই স্থায়ী ভূমিকার নিশ্চয়তার জন্যই সংবিধানকে সংশোধন করতে হবে। যে সামরিক বাহিনী মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে তাদের ঔপনিবেশিক কায়দায় শুধু একটি পেশাগত শক্তি হিসেবে আলাদা রাখা সম্ভব নয়, তাদেরকে দেশের উন্নয়নে এবং প্রশাসনে অংশ নেয়ার সুযোগ দিতে হবে।" কথাটা ছিল খুব পরিষ্কার। সেনাবাহিনী রাজনৈতিক শেয়ার চায় এবং সেটা স্থায়ী এবং সাংবিধানিক করে পাকাপোক্ত করতে চায়।

সেনাপ্রধান একজন সরকারি চাকুরে। একজন অফিসার মাত্র। আরো হাজার হাজার অফিসারদের মধ্যে একজন। কিন্তু তিনি একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীরও প্রধান। সমাজের যে কোন দল, গ্রুপ বা শ্রেণী অথবা গোষ্ঠীর তুলনায় তাদের শক্তি অনেক বেশি। সংখ্যায় কম হলেও তাদের হাতে হাতিয়ার আছে। ইচ্ছা করলে সবকিছুকেই তারা স্তব্ধ করে দিতে পারে। এরকম একটি জাতীয় নির্বাচনের ২ সপ্তাহ যেতে না যেতেই সেনাপ্রধানের কাছ থেকে এ ধরনের একটি বক্তব্য পৃথিবীর অন্য কোন দেশের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে বোধহয় আর সম্মুখীন হতে হয়নি। যে সেনাপ্রধান বিচারপতিকে এত সমর্থন জুগিয়েছেন, নির্বাচন করিয়েছেন বলতে হয়, গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করে এসেছেন, তাঁর এই ধরনের একটি ভূমিকা সকলকে বিচলিত করারই কথা। তিনি সরকারি কর্মচারীদের কোন আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন কিনা, তার থেকেও তাঁর দেয়া হুমকি তখন মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। তাঁর এই ঘোষণা বা ভূমিকা অতিদ্রুত একটি সাংবিধানিক সরকারের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে দাঁড় করিয়েছিল। তিনি যদি একজন বেসামরিক অফিসার হতেন, তাহলেও না হয় একটি কথা ছিল, সমস্যার সমাধান করতে সরকারের তেমন অসুবিধা হতো না। কিন্তু তিনি সেনাবাহিনীর প্রধান। তাঁর বক্তব্য শুধু প্রশাসনিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে জটিলতাই সৃষ্টি করেনি, দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে একটি অতীব নাজুক অবস্থায় নিপতিত করে। সাত্তার সাহেবের রাজনৈতিক খুঁটি বা ব্যক্তিত্ব থাক আর না থাক, তৃতীয় বিশ্বের যে কোন দেশের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন সরকারপ্রধানের জন্য এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করা অত সহজ ছিল না। সামরিক ব্যক্তিদের অস্ত্রের মুখে নিরস্ত্র বেসামরিক ব্যক্তিরা সবসময় নিরুপায়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ব্যাপারে দুটো গ্রুপই সক্রিয় ছিল। ভয় একটি ছিল, দল ঐক্যবদ্ধ হলে বা বিদ্রোহী গ্রুপের সাথে সাত্তারের সমঝোতা হলে, তাদের গুরুত্ব কমে যাবে, ক্ষমতার ভাগ কমে যেতে পারে। সামরিক বাহিনীও এটি চায়নি। এই দ্বন্দ্ব, কলহ চলুক, এটি যেন সকলেই চেয়েছে—কেউ জেনে চেয়েছে, কেউ না জেনে চেয়েছে।

একবার জামালউদ্দিন খুব জরুরিভিত্তিতে দেখা করতে চাইলেন আমার সাথে। বিচারপতি সাত্তার আমাদের সঙ্গে একটি বোঝাপড়া করতে চান। আমাকে এবং আরো দুয়েকজনকে খুব তাড়াতাড়ি সরকারে যোগ দিতে হবে। বললাম, আমি তো এখন আর একা নই। আমরা আলোচনা করে জানাব। বিকালে বাড়ি ফেরার পর এরশাদ টেলিফোন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, শুনলাম আপনাদের সাথে প্রেসিডেন্টের সমঝোতা হয়ে গেছে? বললাম, না তো কথাবার্তা চলছে, কিছুই ঠিক হয়নি। উনি কথা বলতে চাইলেন, আমিও তাঁর মনের অবস্থা জানতে চাইলাম। সেটা সম্ভবত জানুয়ারি মাস হবে। জেনারেল এরশাদ ব্যক্তিগতভাবে একজন অমায়িক এবং ভদ্র ব্যক্তি। তিনি আমাকে খুব সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন যে, এই সরকারে আমার যাওয়া উচিত হবে না। বললেন, বিএনপিতে একমাত্র আপনারই ইমেজ আছে, আপনি এরকম একটি সরকারের সাথে নিজেকে জড়াবেন কেন? সেদিনের আলোচনায় বুঝতে বাকি রইল না যে, সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এরশাদের সাথে নির্বাচনের আগে আমার কয়েকবারই সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু এবার তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত বলে মনে হলো।

যাই হোক, বিদ্রোহী গ্রুপের যেহেতু একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতিগত বিষয়ে তাদের কতগুলো বক্তব্য ছিল এবং গ্রুপের একটি আলাদা গুণগত বৈশিষ্ট্য ছিল—তাঁরা মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সাথে নিজেদের যুক্ত করেনি, তাদের কাছে বিবদমান দুটি গ্রুপই ছিল একই রকম। যদিও মন্ত্রীরা "বিদ্রোহী গ্রুপ ক্ষমতার জন্যই ওসব করছে" বলে কুৎসা রটাতেন তবু ব্যাপারটি ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক। বিদ্রোহী গ্রুপের বক্তব্যের মধ্যেই সারা দেশে বিএনপির সত্যিকার ভাবমূর্তি নিহিত ছিল। আজ পেছনের দিকে তাকালে দেখা যাবে বিদ্রোহী গ্রুপের সেই রাজনীতিই ছিল সন্দেহাতীতভাবে বিএনপির মূল ভিত্তি। বেগম জিয়াকে দলের চেয়ারম্যান করার ব্যাপারেও একই কর্মকাণ্ড এবং ব্যবহার লক্ষ্য করা গেল। বেগম জিয়া দলের চেয়ারম্যান হোন এটি সামরিক নেতারা, দুই গোয়েন্দা বিভাগ, মন্ত্রিসভার দুই গ্রুপ—কেউ চায়নি। প্রভুদের এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ অনেকটা জোর করেই বিচারপতি সাত্তারকে দিয়ে মনোনয়নপত্রে সই করান। অপর গ্রুপের জামালউদ্দিন দেখলেন শাহ আজিজ কেন একা কৃতিত্ব নেবে। তাই তিনিও হলেন মনোনয়নপত্রে তাঁর সমর্থক। বেগম জিয়াকে দলের চেয়ারম্যান এবং দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট করার পরিকল্পনা ছিল বিদ্রোহী গ্রুপসহ দলের অনেক নেতাকর্মীর। এক পর্যায়ে বিচারপতি সাত্তারই দলের চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য বেগম জিয়াকে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে বলেছিলেন। পরে

www.pathagar.com

মন্ত্রীদের চাপে পড়ে নিজেই দাঁড়িয়ে গেলেন। ফলে দলে অন্তর্দ্বন্দ্ব আরো বৃদ্ধি পেল যখন থেকে বেগম জিয়াকে বিদ্রোহী গ্রুপের সমর্থক হিসেবে গণ্য করা শুরু করা হয়। পরবর্তীকালে সাত্তার যখন বেগম জিয়াকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান, তখন তিনি ঐ প্রস্তাব আর গ্রহণ করেননি। ততদিনে তিনিও আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, এই সরকারের আয়ু আর বেশিদিন নেই।

যাই হোক সাত্তারের মন্ত্রিসভার দুটি গ্রুপের অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে শুরু করে। জামালউদ্দিন আর হাসনাতকে টার্গেট করা হলো—দেশের মধ্যে যেন শুধু তারাই দুর্নীতিবাজ। একই চক্রান্তের ফলে আবুল কাসেমের বাড়ি থেকে খুনের আসামি ইমদাদুল হক ইমদুকে পাওয়া গেল। সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করাই হলো মূল লক্ষ্য। একজন পলাতক আসামিকে ধরার জন্য এক মন্ত্রীর বাড়িতে একই মন্ত্রিসভার আর একজন মন্ত্রী ঢাকঢোল পিটিয়ে পুলিশ পাঠান। সে এক অসম্ভব কাণ্ড। যুবমন্ত্রী কাসেম বাড়িতে ছিলেন না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মতিনের সাথে কাসেমের মনোমালিন্য ছিল, তাই তার প্রতিশোধ নেয়া হলো এইভাবে। দেশের বা দলের বা সরকারের স্বার্থটা একবারও ভেবে দেখা হলো না। লোকশ্রুতি অনুযায়ী মতিন ছিলেন শাহ্ আজিজের গ্রুপের সদস্য, আর কাসেম ছিলেন জামালউদ্দিন-হাসনাত গ্রুপের।

ইমদুর ঘটনা পত্রপত্রিকায় ফলাও করে ছাপানো হয়। রঙ চড়িয়ে একে একটি রীতিমত চাঞ্চল্যকর ঘটনা হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। সরকারবিরোধী এবং সামরিক বাহিনীর সমর্থক শক্তিগুলো এই ঘটনাকে আরো নাটকীয় করার চেষ্টা করে। ঘটনাটি সরকারের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং অক্ষমতাকে আরো প্রকটভাবে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করে। যে কোন কারণের জন্য হোক বা যে ষড়যন্ত্রের জন্যই হোক, ব্যাপারটিকে ফলাও করে প্রচার করার ফলে জনসমক্ষে সরকার হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং সুনামহানি ঘটে। এই ঘটনায় সরকারের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হয়। শুধু খুনের আসামিকেই মন্ত্রীর বাড়িতে সহযোগী হিসেবে পাওয়া যায়নি, এই ঘটনা সরকারের মধ্যে আর একটি সরকারের দুরভিসন্ধিমূলক অবস্থানকে মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়। অথচ আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে বিষয়টি ছিল খুবই মামুলি। সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন অফিসাররা যেন এরকমই একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এই ঘটনায় দেশ পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ ভূমিকার প্রয়োজনটা যেন আরো প্রকট আকার ধারণ করল। চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে একজন "লোমহর্ষক খুনি আসামি ইমদাদুল হক ইমদুকে" গ্রেপ্তার করার জন্য যুবমন্ত্রীর বাড়ি পুলিশ অযথা ছয় ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখে।

এই তরুণ ইমদু প্রথমে আওয়ামী লীগ তারপর জাসদ এবং শেষে বিএনপির যুবদলে যোগ দিয়েছিল। ঢাকায় কালীগঞ্জ থানায় অনেক বছর থেকে তার বিরুদ্ধে পাঁচটি এবং রূপগঞ্জে একটি মামলা ছিল। সকল সরকারের মন্ত্রীদের সাথেই সে ভাল সম্পর্ক বজায় রেখেছে। মন্ত্রীর চেয়ে আরো ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের সাথেও তাকে অনেক সময়

www.pathagar.com

ঘনিষ্ঠভাবে দেখা গেছে। অন্তত তিনটি সরকার তাঁকে নানা কাজে ব্যবহারও করেছে। নিজের প্রটেকশনের জন্য ইমদুও তাদের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে ভয় করেনি। ১৯৮১ সালের ৪ এবং ১১ এপ্রিলে নাখালপাড়া এবং কালিগঞ্জে দুটো হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং এগুলোর সাথে ইমদু জড়িত থাকার খবর প্রচারিত হলে সমাজে তার বদনাম আরো বাড়ে এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার নির্দেশে শেষ পর্যন্ত ইমদুকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়। এরপরও ইমদু প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। আবার বিএনপিতে প্রবেশ করার জন্য দরখাস্ত করেছে। পুলিশ অফিসারদের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রেখেছে, সে সুযোগ-সুবিধা মত মন্ত্রী আমলাদের কাছেও আসা-যাওয়া করত। ইমদু কোথায় থাকত, কি করত পুলিশের কাছে এসব জানা ছিল। তাকে ধরতে চাইলে অনেক আগেই ধরা যেত। একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের মন্ত্রীর বাড়িতে হাজার ধরনের মানুষ যায়। কাসেম যুবদলের সভাপতি ছিল, তাই তার বাড়িতেও অগণিত যুবক ভিড় করত। সুতরাং আমাদের মত দেশে একজন মন্ত্রীর বা এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বাড়িতে নানা কাজের অজুহাতে নানা ধরনের আসামিও প্রবেশ করতে পারে। আর ইমদুর সাথে তো কাসেমের পরিচয় অনেক দিনের, কারণ সে একসময় তার যুবদলের সদস্য ছিল। কোন আসামিকে ধরার দায়িত্ব পুলিশের, মন্ত্রীর নয়। মন্ত্রীর বাড়ির সামনেও পুলিশ পাহারা দেয় যাতে অবাঞ্ছিত কোন ব্যক্তি মন্ত্রীর বাড়িতে প্রবেশ না করে। ইমদুকে সেখানেও বাধা দেয়া যেত। সে বাড়িতে ঢোকার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করা যেত। যাই হোক, ইমদুর ব্যাপারে ন্যূনতম এটুকু বলা যেতে পারে যে, সে ছিল বেশ পরিচিত এবং তাকে ইচ্ছা করলে পুলিশ অনেক আগেই গ্রেপ্তার করতে পারত। এই সমস্ত কারণে এবং যেরকম নাটকীয়ভাবে তার গ্রেপ্তার সম্পন্ন করা হয় এবং যেভাবে সেই ঘটনা প্রচার করা হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ঘটনা সম্পর্কে মানুষের মনে বেশ সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি একটি রহস্যে ঢাকা থাকে। অনেকের মতে ইমদুকে কাসেমের বাড়িতে একটি বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগের পরামর্শে প্লান্ট করা হয়েছিল এবং পুরো ব্যাপারটি ছিল একটি ষড়যন্ত্রমূলক সাজানো ঘটনা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না বুঝে শুধু কাসেমের ওপর তার ক্ষোভ মেটানোর জন্য ও ধরনের একটি কাজে জড়ায়নি।

তবে এটি ঠিক যে যুবদলের অনেক কর্মকাণ্ড তখন সাধারণ মানুষ সুনজরে দেখত না। বাংলাদেশের কোন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলেরই যুব সংগঠন শেষ পর্যন্ত তাদের ভাবমূর্তি ধরে রাখতে পারেনি। তার প্রধান কারণ এদের মধ্যে বেশিরভাগই থাকে বেকার এবং সুবিধাবাদী লোকজন। এদের একটি অংশ সকল সরকারের যুব সংগঠনের সাথে জড়িত থাকে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এক সরকারের পতন হলে এরা পরবর্তী সরকারের জন্য কাজ করে। সামাজিক এবং আর্থিক কারণে এদের মধ্যে চরিত্র বা আদর্শ গড়ে উঠতে পারে না। সকল রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে ক্ষমতাসীনরা, এদের ব্যবহার করে। বাংলাদেশে তরুণদের প্রাধান্য সর্বত্র। তাই এই শক্তিকে কারো অবহেলা করার সাধ্য নেই। সভা-সমিতি আয়োজন করা, মাঠে-ময়দানে শ্লোগান দেয়ার জন্য এদের প্রয়োজন

www.pathagar.com

খুব বেশি, এরাই হয় দলের কর্মীবাহিনী। কিন্তু নানা কর্মকাণ্ডের ফলে এবং আদর্শ ও শৃঙ্খলাহীনতার কারণে কাসেমের যুবদলও নিজেদের জন্য তেমন কোন ভাল একটি ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারেনি। তাই ইমদুর ঘটনা কাসেম এবং তাঁর সংগঠন যুবদলকে জনসমক্ষে আরো হেয় করে দেয় এবং তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়। রাজনৈতিকভাবে সচেতন ব্যক্তিরা ছাড়া বাকি সবাই কাসেমের বাড়িতে ইমদুর আশ্রয় নেয়াকে একটি গর্হিত কাজ বলে মনে করেছে। খুনি আসামিদের আশ্রয় দেয়ার জন্য মন্ত্রীর নিন্দা করেছে।

কাসেমের উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করা, বা বিচারপতি সাত্তারের উচিত ছিল কাসেমকে পদত্যাগ করতে বলা, বা কাসেম এবং মতিন—দুজনকেই মন্ত্রিসভা থেকে বের করে দেয়া। তাঁর উচিত ছিল এরকম ঘটনা কেন ঘটেছে বা এর পেছনে কোন ষড়যন্ত্র ছিল কিনা সেটা খুঁজে বের করা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট কোনটাই করেননি, উল্টো তিনি কাসেমকে প্রটেকশন দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কারো বিরুদ্ধে কোন একশন নেননি, এরকম একটি ঘটনায় একজন সরকারপ্রধানের যে ধরনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল সেই প্রতিক্রিয়াও তাঁর মধ্যে হয়নি।

বিচারপতি সাত্তার একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ, সৎ, বিনয়ী ব্যক্তি ছিলেন। উকিল হিসেবে তাঁর তেমন কোন যশ না থাকলেও বিচারক হিসেবে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। তবে তিনি বিচারপতি মুর্শেদ বা কায়ানির মত কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না। তেমন কোন ঐতিহাসিক রায়ও তিনি কোনদিন দেননি। প্রায় পঁচিশ বছর আগে এ. কে. ফজলুল হকের সমর্থনে তিনি একবার মন্ত্রী হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর বিচারকের চাকরি নিয়ে বাকি জীবন সরকারি চাকরি করেছেন। ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের সময় শেখ মুজিবের সুপারিশে বাঙালি কোটায় তিনি পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে যোগদান করেন এবং যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও পাকিস্তানের উপনির্বাচনগুলো তিনি পরিচালনা করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পাকিস্তানের নতুন প্রশাসক জুলফিকার আলী ভুট্টোর অধীনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে শপথ নিয়ে সেই দেশেই কাজ চালিয়ে যান। ১৯৭৩ সালে তিনি দেশে ফিরলে শেখ মুজিব তাঁকে জীবনবীমা কর্পোরেশনে চাকরি দেন। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রধান বিচারপতি সায়েম প্রেসিডেন্ট হয়ে সাত্তারকে তাঁর বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ করেন। বিচারপতি সায়েম বয়সে সাত্তারের কনিষ্ঠ হলেও শেরে বাংলার জুনিয়র হিসেবে একসময় একসাথে কাজ করেছেন। জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর বিচারপতি সাত্তারকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করেন এবং সেই পদেই তিনি জিয়ার মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন।

বয়স হলেও বিচারপতি সাত্তার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেশ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। নানা কাজে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সাহায্য করেছেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জিয়া যে কাজ তাঁকে দিতেন সেটাই তিনি করতেন। একজন বিশ্বাসী অনুগত সহকর্মী হিসেবে কাজ করে গেছেন। অনেকটা

www.pathagar.com

সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মত। তাঁর পরামর্শকে জিয়া গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু সাত্তার শুধু বয়সের জন্যই নয় তাঁর প্রকৃতিগত স্বভাবের কারণে কোন ঝামেলায় যেতে চাইতেন না। নিজের উদ্যোগে তিনি কোনদিন কিছু সৃষ্টি করেননি। রাজনৈতিক সংগঠন বা নেতৃত্ব দূরে থাক যদিও ভাল সহকর্মী হওয়ার যোগ্যতা তাঁর ছিল, কিন্তু কোন বড়সড় রাজনৈতিক নেতা হওয়ার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। আমার বিশ্বাস, সবাই নেতা হতে পারে না। নেতা হওয়ার গুণ এবং রক্ত আল্লাহ সকলের মধ্যে দেন না।

জিয়া যখন মারা যান সাত্তারের বয়স তখন আশির কাছাকাছি। তিনি বোধহয় ভাবতেও পারেননি যে অসুস্থ থাকা অবস্থায় হাসপাতাল থেকে তুলে এনে তাঁকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট করা হবে এবং পৃথিবীর একটি অতি দরিদ্র এবং অতি জটিল সমাজের নেতৃত্বের আসনে তাঁকে বসতে হবে। তিনি এমন এক পর্যায় এবং পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন যে, তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা সেখানে আর কাজ করেনি। সকলে তাঁকে একজন বৃদ্ধ, দুর্বল মানুষ হিসেবেই দেখেছেন। একটি দুর্যোগের কারণে তাঁকে সেরকম একটি ভূমিকায় বসানো হয়েছিল। বিচারপতির সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো তখন আর কাজ করছিল না, সেটি তাঁর আশপাশের সকলেই জানতেন। নিজের এই অপারগতার কথা উপলব্ধি করেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, নির্বাচনে তিনি দাঁড়াবেন না। কিন্তু তারপরও তাঁকে মনোনয়ন দেয়া হয় এবং তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ক্ষমতার এই স্বাদ পেয়ে তাঁর কর্মক্ষমতা কতটুকু অবশিষ্ট আছে বা তিনি এরকম একটি গুরু দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন কিনা, সেটি তিনি নৈর্ব্যক্তিকভাবে (dispassionately) চিন্তা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

কিন্তু পর্দার অন্তরাল থেকে যাঁরা তাঁর মনোনয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা কিন্তু সবদিক চিন্তা করেই সাত্তারকে দেশের প্রেসিডেন্ট বানিয়ে ছিলেন। সাত্তারের শারীরিক অবস্থা এবং অক্ষমতা সম্পর্কে তাঁদের স্বচ্ছ ধারণা ছিল। তাঁদের স্কিমের জন্য সাত্তারই ছিলেন সবচেয়ে উপযোগী ব্যক্তি। সাত্তার সরকারের এক গ্রুপের মন্ত্রীরা, যাঁরা এই ষড়যন্ত্রে পর্দার অন্তরালের নায়কের সহচর হিসেবে কাজ করেছিলেন, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত প্রতারিত হয়েছেন। তাঁদেরকে ক্ষমতার শেয়ার দেয়া হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের একজনকেও মন্ত্রিসভায় নেয়া হয়নি। অথচ জিয়া হত্যার পর দেশের মানুষকে কি বলা হয়েছিল? বার বার করে গণতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রতি সামরিক বাহিনীর আনুগত্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল।

সাত্তারের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ ছিল বলেই সেনাপ্রধান অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায়, ১৮ অক্টোবরের সাপ্তাহিক *হলিডে*, নির্বাচনের পাঁচ দিন পর ২০ নভেম্বর বিবিসি সাক্ষাৎকারে এবং ২৮ নভেম্বর ঢাকার পত্রিকা সম্পাদকদের কাছে প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর স্থায়ী ভূমিকার কথা অত নির্জলা ভাষায় ব্যক্ত করতে পেরেছেন। ঐ একই কারণে ২৮ নভেম্বর বিবৃতির পরদিন সাত্তারের কাছে জেনারেল এরশাদ যখন অঙ্গীকার করেছিলেন যে তিনি যতদিন আছেন সামরিক

www.pathagar.com

বাহিনীকে ক্যু করতে দেবেন না এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের বক্তব্য তিনি আর রাখবেন না, সাত্তারও তাতে বিশ্বাস করে ছিলেন।

তাই বিচারপতি সাত্তার দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারেননি। কারণ আগেই বলেছি নেতা সকলেই হতে পারে না। কারো প্রেসিডেন্ট হওয়া এবং দেশকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়া—দুটো আলাদা জিনিস। তাঁর দল বা সরকার কখনই তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। তাঁর মন্ত্রীরাই তাঁকে মেনে চলেননি, অনেকে তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছেন, অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত ছিলেন। তাঁরই সেনাপ্রধান যখন তাঁরই সাংবিধানিক ক্ষমতা এবং অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে বসেন তখনও তাঁর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়ার মত শক্তি বা মনোবল তাঁর ছিল না। জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের এই অপারগতা ছিল জাতির জন্য একটি চরম ট্রাজেডি। প্রেসিডেন্ট সাত্তার যে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে একটি বোঝাপড়া করার চেষ্টা করেননি তা নয়। জেনারেল এরশাদের প্রস্তাব অনুযায়ী সামরিক বাহিনীকে প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত রাখার জন্য তিনি একটি জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করেন। প্রথমে তিনি এই কাউন্সিল অর্থমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীসহ দশ সদস্য নিয়ে গঠন করেছিলেন। কিন্তু সেনাপ্রধান তাতে রাজি হননি। তাঁরা এই আনুষ্ঠানিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব দাবি করে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ছয়জনের একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী আর তিন বাহিনীর তিনজন প্রধান। ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বিরোধী দলের সদস্যরা জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের ওপর অনেকগুলো মুলতবি প্রস্তাব পেশ করেন, কিন্তু স্পিকার কোন প্রস্তাবই আলোচনা করার সুযোগ দেননি। শুধু তাই নয়, পার্লামেন্ট সদস্য রাশেদ খান মেনন ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর বক্তৃতায় জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা এবং কার্যপ্রণালী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন স্পিকার সেটা পার্লামেন্টের বিবরণী থেকে এক্সপাঞ্জ করে দেন। এ নিয়ে মুসলিম লীগ ছাড়া সকল বিরোধী দল পাঁচ মিনিটের জন্য পার্লামেন্ট বর্জন করে।

জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করার সাথে সাথে দেশের প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ এবং ভূমিকা প্রায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়। সকলে একে একটি Supra Cabinet বলে ধরে নিল। কিন্তু সামরিক অফিসাররা এতেও খুশি ছিলেন না। এর মধ্যে ইমদু এবং কাসেমের ঘটনার পর ১১ ফেব্রুয়ারি কিছু সিনিয়র সেনা অফিসার দুপুর দুটোর দিকে বঙ্গভবনে যান। তাঁরা প্রেসিডেন্টের কাছে অনেক অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং প্রেসিডেন্ট যাতে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেন সেজন্য চাপ সৃষ্টি করেন। ক্ষমতা দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা সেদিন বঙ্গভবনে গিয়েছিলেন এবং যতটুকু চাপ সৃষ্টি করার দরকার তা করেছিলেন। তাঁরা প্রেসিডেন্টকে প্রথমে অনুরোধ এবং পরে বেশ রূঢ় ভাষায় ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত সাত্তার তাঁর "অদক্ষ এবং দুর্নীতিপরায়ণ" মন্ত্রিসভা বাতিল করতে রাজি হলেও ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি হননি। সামরিক অফিসাররা একটি মিশ্র মনোভাব নিয়ে ব্যারাকে ফিরে যান।

www.pathagar.com

তবে ক্ষমতা গ্রহণে ব্যর্থ হলেও জনসমক্ষে সাত্তার সরকারের ভাবমূর্তি ধূলিসাৎ করতে সক্ষম হওয়ায় তাঁদের মধ্যে একটি তৃপ্তিবোধও পরিলক্ষিত হয়।

বিচারপতি সাত্তার মাত্র ৭৫ দিন আগে গঠিত তার নির্বাচনোত্তরকালের প্রথম মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দিলেন। জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে মন্ত্রিপরিষদের অদক্ষতা, অক্ষমতা এবং দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেন। প্রশাসনকে "দুর্নীতি ও স্থবিরতা" হতে মুক্ত করার জন্য মন্ত্রিসভাকে বাতিল করাকে তাঁর ঐ লক্ষ্য অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁর মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, "সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুদায়িত্বে যাহারা নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহাদের অনেকের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ও অবহেলা, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা, দেশের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে নির্লিপ্ততা ও দুর্নীতিপরায়ণতার ফলে দেশের সামগ্রিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে।" সুতরাং এমন কোন অভিযোগ নেই যা সাত্তার তাঁর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে করেননি এবং এই ভাষণের মাধ্যমে নিজের, সরকারের এবং দলের ভাবমূর্তিকে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করে দেন। সেদিন বঙ্গভবনে সঠিক কি হয়েছিল সেটা যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাই ভাল জানেন। বিচারপতি সাত্তার হয়তো তাঁর আত্মজীবনীতে এসব লিখে রেখে যাবেন। হয়তো তিনি বলবেন যে, তাঁকে সবকিছু করতে বাধ্য করা হয়েছিল। গণতন্ত্রকে শেষ রক্ষা করার জন্য তাঁর ঐ পথ বেছে নেয়া ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না।

এই ঘটনার পরদিন ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয় এবং সামরিকপ্রধানরা সরকারের উচ্চতম পর্যায়ে তাঁদের অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো যে এরপর সাত্তার যে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন তাতে পুরোনোদের মধ্য থেকেই সবাইকে নিলেন। তবে প্রধানমন্ত্রীসহ মুখ্য সকল ব্যক্তিই তাঁর মন্ত্রিসভার একটি বিশেষ গ্রুপের লোক বলে চিহ্নিত হয়। গ্রুপের বাইরের যাঁরা তাঁরা বাদ পড়ে যান। প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী তানভীর আহমদ সিদ্দিকীর ভাষায় (*ইত্তেফাক* ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৮২), সাত্তারের মন্ত্রিসভায় আটজন কুচক্রী ছিলেন। চারজন করে দুই গ্রুপে বিভক্ত। ৮ জন কুচক্রীর ৪ জন বাদ পড়ে যান এবং বাকি ৪ জন বহাল থাকেন। শাহ-মইদুল-মতিন-শামসুল হুদা চৌধুরী থেকে যান, আর জামালউদ্দিন-হাসনাত-আলীম-কাসেম বাদ যান। সামরিকদের হস্তক্ষেপের ফলেই সাত্তার মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। তাই এই নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে তাঁদের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা মনে করা অযৌক্তিক হবে না। এর ফলে মন্ত্রিসভার একটি গ্রুপের সাথে সামরিক নেতাদের সুসম্পর্কের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। এই নতুন মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে সাত্তার আবার তাঁর যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু দেশের মানুষের এটি বুঝতে বাকি থাকল না যে, সাত্তার প্রেসিডেন্ট হলেও আসল ক্ষমতা ব্যারাকে চলে গেছে। ব্যাপারটি অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায় এবং দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বিরাট অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

বিদ্রোহী গ্রুপের ভূমিকা

বিএনপির সংসদীয় দলের একটা বিরাট অংশ আসন্ন পার্লামেন্ট অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট সাত্তারের উদ্বোধনী ভাষণ বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুর পর বিএনপি সরকার এবং নেতৃত্ব একটি কোটারী রাজনীতিতে পরিণত হয়। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিরা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ এরশাদ-সাত্তার-শাহ্ আজিজের হাতে চলে যায়। এদের একজন অমুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার, যিনি স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে ছিলেন, আর একজন ৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও পাকিস্তান সরকারের চাকরি করে গেছেন তাদের সংবিধানের অধীনে শপথ নিয়ে, আর তৃতীয়জন ৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে জাতিসংঘে গিয়েছিলেন। অপরদিকে বিএনপিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা চলে যায় সাত্তার, শাহ্ আজিজ, শামসুল হুদা চৌধুরীর হাতে। আগে বলেছি যে জিয়ার জাতীয় ঐক্যের রাজনীতিতে একটি দার্শনিক ভিত্তি ছিল। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার এক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চেয়েছিলেন দেশের বিভিন্ন শক্তিগুলোর, অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা, বাম-ডান, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ সকল শক্তির সমন্বয়ে একটি নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি করা। তিনি নিজে ছিলেন একজন খ্যাতনামা মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসামান্য। তাঁর এই ঐক্যের রাজনীতিতে স্বাভাবিক কারণেই বরাবরই একটি ভারসাম্য ছিল। জিয়ার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার শুরুতেই এটি ঠিক করা ছিল যে, স্বাধীনতাবিরোধীদের দলে বা দেশে পুনর্বাসনের সুযোগ দেয়া হবে, কিন্তু সরকার বা দলের পুরোভাগে তাদের স্থান দেয়া হবে না। একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য এবং দেশাত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এবং তাদের জনগণের কাতারে আসতে হবে। বিএনপিতে গণতন্ত্রায়ন করার দাবি তোলার পেছনে এটাও একটি উদ্দেশ্য ছিল। বিএনপির গণতন্ত্রায়ন করা হলে এই দলে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিরা দেশের রাজনৈতিক স্রোতধারার ঐতিহাসিক কারণে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে কোনদিন পৌঁছাতে পারত না। যাই হোক, জিয়ার মৃত্যুর পর ঘটনাচক্রে দল এবং দেশের নেতৃত্ব স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিদের হাতে চলে যায়। এটি কোন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়নি। একই কারণে জিয়ার মৃত্যুর পর হাজার দাবি থাকা সত্ত্বেও এই গোষ্ঠী দলের কাউন্সিল সভা ডাকার সাহস করেননি। নিজেদের ওপর তাদের কোন আস্থা ছিল না, তাই তাঁরা সেটা করতে পারেননি।

দলকে গণতন্ত্রায়নের প্রয়োজন এবং গুরুত্ব জিয়ার মৃত্যুর পর তাই আরো শতগুণে বেড়ে যায়। আমার নেতৃত্বে বিদ্রোহী গ্রুপের উদ্যোগে দলের সকল শ্রেণীর নেতাকর্মীরা এই গণতন্ত্রায়নের দাবি তোলে। সাত্তারের মনোনয়নের সময় সেটি চরম আকার ধারণ করে। তখন দলকে রক্ষা করার জন্য দুটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে, সাংগঠনিকভাবে দলে গণতন্ত্রায়ন প্রতিষ্ঠা করা এবং দলে ভারসাম্য রক্ষা করা। এই দুটি গুণগত এবং মৌলিক সমস্যা

www.pathagar.com

সমাধান করার জন্য বিদ্রোহী গ্রুপ প্রথম আওয়াজ তোলে। এই দাবি রক্ষা করা হলে তা ক্ষমতাসীনদের জন্যও অনেক ভাল হতো, কিন্তু তাঁরা তখন সেটি বোঝেননি। রাজনীতির মৌলিক নীতি থেকে তাঁরা নিজেদের ঘটনাচক্রে লব্ধ স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য আরো প্রাসাদমুখী হয়ে গেলেন। সঙ্কীর্ণতা এবং অদূরদর্শিতার কারণে তাঁরা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁরা অমুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারদের সাথে স্বাভাবিক কারণেই একটি মানসিক একাত্মতা খুঁজে পায়। তার ওপর যখন তাঁরা সেনাপ্রধানের প্রকাশ্য সমর্থন পান তখন তাঁরা অন্য আর কিছুরই প্রয়োজন বোধ করেননি। ক্ষমতার রাজনীতি তাঁরা ভাল বুঝতেন—তাই তখন থেকে দল, নীতি এবং দেশ একেবারেই গৌণ হয়ে পড়ে। ক্ষমতাই তাঁদের কাছে হয়ে দাঁড়ায় এক এবং একমাত্র বিষয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দলের অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম চলতে থাকে এবং দলের গণতন্ত্রায়নের মূল দাবি প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রেসিডেন্টের উদ্বোধনী ভাষণ বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এটি ছিল একটি মৌলনীতিকেন্দ্রিক সংগ্রাম। কিন্তু বিদ্রোহী গ্রুপকে খুব সাবধানে তাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। অনুন্নত দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো দলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব (factionalism within the party)। অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং আত্মকলহের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো অতি সহজে ক্ষতবিক্ষত হয় এবং তার একটি ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া জাতীয় রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়। শুধু দলীয় কর্মীরাই নয় জনগণও এসব কর্মকাণ্ডে হতাশ হয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। তাই বিএনপির অভ্যন্তরীণ এই সংগ্রামের ফলে জনমনে নানা প্রশ্ন জাগে এবং এটিকে নানা পত্রিকা নানাভাবে বিশ্লেষণ করে। ক্ষমতার আকর্ষণ, লোভ, লালসা, ভীতি এবং দাপটের জন্য ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরে কোন সংগ্রাম পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিরোধী দলের সমালোচনা বা কর্মকাণ্ড ক্ষমতাসীনরা সহ্য করলেও নিজেদের দলের ভেতরকার ভিন্নমতাবলম্বীদের (dissenters) অনুন্নত দেশে অত্যন্ত কঠোর হস্তে দমন করা হয়। যারা বিদ্রোহ করে বা ভিন্নমত পোষণ করে তাদের বিরোধী দলের চেয়েও অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে হয়। তাদেরকে ঘরের ভেতরের শত্রু মনে করা হয় এবং তাই ক্ষমতাসীন কোটারী সবার আগে তাদেরকেই নির্মূল করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। ক্ষমতাসীন দলে থাকার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে তাদের শুধু বঞ্চিতই হতে হয় না, তাদের নানা ভয়ভীতি দেখানো হয় এবং অনেক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে তাদের দিনযাপন করতে হয়। একমাত্র গভীর দেশপ্রেম এবং নৈতিক শক্তির জন্য এবং নীতির প্রতি অটল থাকার মনোবলের কারণে তারা অবিচল থাকার সাহস খুঁজে পায়। বিদ্রোহী গ্রুপের শক্তি সংখ্যা পার্লামেন্টে ৪২ থেকে ১২০ পর্যন্ত উঠেছিল—এটি সময় সময় নির্ভর করেছে ইস্যুর ওপর। তবে মুখ্য ভূমিকা পালনকারীদের সংখ্যা ছিল ৩০ থেকে ৩২ জনের মত। এরা ছিল hard core। তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একটি ক্ষমতাসীন দলে এই সংখ্যাটি কোন সামান্য ব্যাপার ছিল না। এদের সকলেই ছিল রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন—একটি অংশ ছিল অবস্থাপন্ন, সামাজিকভাবে আত্মবিশ্বাসী আর একটি

www.pathagar.com

অংশ ছিল অবস্থাপন্নহীন কিন্তু রাজনৈতিকভাবে খুবই নীতিবান এবং নিবেদিতপ্রাণ। তাই এই দুই ধরনের পার্লামেন্ট সদস্যরাই ক্ষমতার লোভ, লালসা বা ক্ষমতাসীনদের ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করার সাহস শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছেন।

যদিও স্বাভাবিকভাবেই দলের এই অভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে বিরোধী দল, সংবাদপত্র এবং সামরিক অফিসাররা সরকারকে অপদার্থ প্রতিপন্ন (discredit) করার জন্য নানাভাবে ব্যবহার করেছে, কিন্তু বিদ্রোহী গ্রুপ তাদের এই সংগ্রামকে কোন জাতীয় সঙ্কটে পরিণত হতে দেননি। অনেক প্ররোচনা, লোভ, লালসা এবং প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের ভূমিকাকে একটি গঠনমূলক পর্যায়ে রেখেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, সাত্তারের মনোনয়নের বিরোধিতা করা এবং সেই কারণে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহী গ্রুপের সদস্যরা সকলেই নির্বাচনের সময় সাত্তারের জন্য অনেক মন্ত্রীদের চেয়ে বেশি কাজ করেছেন। দুটো বিশেষ ইস্যুতে তাঁরা প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে দেশ মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। যদিও নিজেদের রাজনৈতিক সুনাম তাঁদেরকে বিসর্জন দিয়ে পিছু হটে যেতে হয়েছিল, কিন্তু তবুও তাঁরা কোন হঠকারী পথ অবলম্বন না করে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাচানোর চেষ্টা করেছেন। প্রথমটি ঘটে ষষ্ঠ সংশোধনী পাস করার সময়। বিল উপস্থাপনের প্রথম দিন ৯০ জন পার্লামেন্ট সদস্য অধিবেশন বর্জন করেন এবং বিদ্রোহী গ্রুপ বিলকে ব্লক করে দেয়। কিন্তু জেনারেল এরশাদ যখন হস্তক্ষেপ করেন এবং আমাকে বলেন, "যদিও আমরা চাই না, আমরা প্রস্তুত নই, তবুও এই বিল পাস না হলে আমাদের ক্ষমতা দখল করতে বাধ্য করা হবে," সেদিনই বুঝে ফেলেছিলাম সাত্তার-শাহ আজিজের আসল শক্তিটা কোথায়। বঙ্গভবনে এরশাদ আয়োজিত শীর্ষ বৈঠকের এবং সংসদীয় দলের সাংবিধানিক কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও বিদ্রোহী গ্রুপের সদস্যরা আসন্ন সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্ট অধিবেশনে যোগ দিয়ে বিলের পক্ষে ভোট দান করে।

অন্য ইস্যুটি ছিল প্রেসিডেন্টের পার্লামেন্ট অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণ বর্জন করা। প্রায় ৯০ জন পার্লামেন্ট সদস্য প্রেসিডেন্টের ভাষণ বর্জন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এটি একটি অচিন্তনীয় ঘটনা হতে পারত। ক্ষমতাসীন দলেরই একটি অংশ রাষ্ট্র এবং সরকারপ্রধানের দেয়া পার্লামেন্টে উদ্বোধনী ভাষণ বর্জন করা একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত হতে পারত। কিন্তু দুটি বিশেষ কারণে এই সিদ্ধান্ত শেষ মুহূর্তে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। প্রথমত, ১১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর বিচারপতি সাত্তারের আর সেই গুরুত্ব ছিল না। সেদিন প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে সাত্তারের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রায় লোপ পায় এবং সেনা ছাউনি যখন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে পড়ে তখন সেখানে সাত্তারের উদ্বোধনী ভাষণ বর্জন করা প্রায় অর্থহীন হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, ১১ ফেব্রুয়ারি সামরিক বাহিনী সরাসরি ক্ষমতা দখল করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা আর একটি সুযোগ এবং পরিস্থিতির অপেক্ষায় ছিল। আমাদের কাছে নিশ্চিত খবর ছিল যে,

www.pathagar.com

সেদিন আমরা পার্লামেন্ট বর্জন করলে এই পার্লামেন্ট বর্জনকে কঠিন সঙ্কট হিসেবে দেখিয়ে সামরিক অফিসাররা সরাসরি ক্ষমতা দখল করে নিত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে তখন তাদের এই হস্তক্ষেপকে অযৌক্তিক বলে আর মনে হতো না। ক্ষমতাসীন দলকে দায়িত্বহীন বলে চরম অপবাদ দিয়ে ক্ষমতা দখল করা যেত এবং তাদের আর বেশি কিছু অজুহাত খোঁজার প্রয়োজন হতো না। তাই, শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী গ্রুপের সকলেই প্রেসিডেন্টের উদ্বোধনী ভাষণে যোগদান করে।

এছাড়া আরো অন্তত আধাডজন সময়ে নানা চাপ এবং প্ররোচনায় বিএনপি ভেঙে যেত। একটা বিরাট কর্মীবাহিনীর ইচ্ছা ছিল বিএনপিকে প্রথম থেকেই আদর্শিক লাইনে শুদ্ধ করে নেয়া। নতুন বিএনপি তৈরি করা। কিন্তু এত প্ররোচনা এবং অনেক সময় প্রতিবাদ করার যুক্তিযুক্ত কারণ থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহী গ্রুপ সবসময় একটি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়েছে। তাই বিদ্রোহী গ্রুপ এক পর্যায়ে জাতীয়ভাবে প্রায় প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করলেও দলের সাংগঠনিক অস্তিত্ব যাতে ভেঙে না যায় সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। প্রতিটি পদক্ষেপে একদিকে যেমন নিজেদের মৌলিক দাবিগুলো প্রতিষ্ঠা করতে ক্ষমতাসীনদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে দল এবং বিশেষ করে, দেশ এবং জাতির স্বার্থকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছে। দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যাতে ব্যর্থ না হয়ে যায় সেটাই ছিল মূল লক্ষ্য। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, বিএনপির অভ্যন্তরীণ এই কোন্দলের প্রতিক্রিয়া জাতীয় পর্যায়ে বেশ জটিল আকার ধারণ করেছিল। ক্ষমতাসীনদের একটি চক্র এই কোন্দলকে সমাধান না করে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহার করেছে এবং এই কোন্দলকে আরো তীব্রতর করে তুলতে সাহায্য করেছে। সামরিকরাও তাদের ক্ষমতা দখল করার সময় এই কোন্দলকে একটি শক্তিশালী যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে। যে কোন রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও মতাদর্শিক লড়াই একটি সাধারণ প্রক্রিয়া, কিন্তু অনুন্নত এবং দুর্বল দেশে কায়েমী স্বার্থবাদীরা একে প্রচারযন্ত্রের অপব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের কাজে ব্যবহার করে এবং রাজনৈতিক দলগুলোও এরকম অবস্থায় খুব সহজে তাদের শিকারে পরিণত হয়।

অনেকে সাত্তারের ব্যর্থতার জন্য বিএনপির বিদ্রোহী গ্রুপকে দোষারোপ করেন, আবার অনেকে মনে করেন যে, সবকিছু জেনেশুনে সাত্তার-শাহ আজিজ বা ক্ষমতাসীন দলের সাথে বিদ্রোহী গ্রুপের আর থাকা আদৌ উচিত হয়নি, তাঁদের রাজনীতি নিয়ে নিজস্ব সংগঠন দাঁড় করানো উচিত ছিল। এটি করলে তখনই দেশের জাতীয় রাজনীতির মোড় ঘুরে যেত বা এই গ্রুপটি ঐ রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ভূমিকা পালন করতে পারত। ফলে বিএনপির এই চরম দুর্গতি হতো না এবং রাজনৈতিকভাবেও জনসমক্ষে এই দলের একটি আলাদা ভাবমূর্তি থাকত। এটি না করাতে বিদ্রোহী গ্রুপকে দোদুল্যমান, আপোসকামী এবং ক্ষমতালোভী বলে মনে হয়েছে এবং ক্ষমতা ভাগাভাগি করার জন্যই যে তারা তাদের তথাকথিত সংগ্রাম চালিয়েছিল—এমন

www.pathagar.com

অপবাদের মুখোমুখি হতে হতো না। এসব সমালোচনা সত্ত্বেও আজও আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, বিদ্রোহী গ্রুপের সিদ্ধান্ত ঠিকই ছিল। অবশ্য অনেকেই উপরোক্ত সমালোচনাগুলো বড় করে দেখিয়ে বিদ্রোহী গ্রুপের ভূমিকাকে হেয় করার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু আমি আজও মনে করি, সে সময় দল ভাঙলে নেহাতই ভুল হতো। একটি রাজনৈতিক দল ভাঙা অতি সহজ, কিন্তু তাকে ধরে রাখা বা গড়ে তোলা খুব কঠিন। ভাঙন অর্থই হলো নিজেদের দুর্বল করা। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে শত কারণ থাকা সত্ত্বেও এবং অনেক সমালোচনা এবং ব্যক্তিগত অপমান সহ্য করেও আমি দল ভাঙার সিদ্ধান্ত নিতে দেইনি।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থা দেখলে দারুণ দুঃখ পাই। দুয়েকটি সংগঠন ছাড়া প্রতিটি দল ক্ষতবিক্ষত এবং জর্জরিত। এমন দলও আছে যেগুলো ভাঙতে ভাঙতে ৮ বা ১০ অংশে পরিণত হয়েছে। ন্যাপ, মুসলিম লীগ, জাসদ, আওয়ামী লীগ—সব দলই ভেঙেছে। বাংলাদেশে এক একজন ব্যক্তি এক একটি দল—দুর্লক্ষণ বটে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলব, শতকরা ৯০ ভাগের উর্ধ্বে হবে, ব্যক্তিগত কারণ, ব্যক্তিগত ভাবগতিক, আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ, বিদ্বেষ এবং নেতৃত্বের আত্মবিশ্বাসের অভাব—এসবই হলো এসব ভাঙনের মূল কারণ। দল ভাঙার পেছনে প্রায়শ কোন আদর্শগত কারণ থাকে না, আর থাকলেও জনসাধারণ সেটা বোঝে না। আমরা যদি সেদিন আর একটি বিএনপি করতাম, তাহলে উপরোক্ত সমালোচনাগুলোকে তখন দল ভাঙার যুক্তি হিসেবে দেখানো হতো। কেউ বিশ্বাস করতে চাইতো না যে, আমরা কোন আদর্শগত কারণে পৃথক হয়েছি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঙাভাঙির খেলায় আমাদেরকেও তখন আর একটি নতুন সংযোজন বলে মনে করা হতো। সেই একই কথা বলা হতোঃ আমরা একসাথে থাকতে পারি না; একজন আর একজনের সাথে সমঝোতা করে চলতে পারি না; তুচ্ছ কারণে বৃহত্তর স্বার্থকে বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি; ভাঙনেই যেন আমরা আনন্দ পাই, ইত্যাদি। রোজই শুনি এ দল না হয় ও দল ভাঙছে। আমাদের সংবাদপত্রগুলো, বিশেষ করে জনপ্রিয় দৈনিকগুলোও এরকম ঘটনা ঘটলে বেশ খুশি হয়। তারা প্রতিনিয়ত উসকানি দেয়, না হয় নানা রকমের গল্প ফেঁদে একদিকে তাদের পৃষ্ঠপোষকদের খুশি করে, অপরদিকে পাঠক ধরে রাখে। আমরা সকলেই মুখে ইনস্টিটিউশন তৈরি করার কথা বলি, কিন্তু কাজেকর্মে ইনস্টিটিউশন ভাঙতেই বেশি আনন্দ পাই, এবং আমাদের এই আচরণের বহিঃপ্রকাশ সজ্ঞানে যতটা না ঘটে, মনের অজ্ঞাতেই তা বেশি ঘটে যায়। নিজেদের মনের অগোচরেই আমরা এ ধরনের ক্ষতিকর এবং ধ্বংসাত্মক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করি। শেষ পরিণতির কথা চিন্তা করি না। একটি দল ভেঙে আর একটি বিরাট দল করা যায় না। এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুব কম খুঁজে পাওয়া যাবে। এমনকি ব্রিটেনের মত দেশেও এটি সম্ভব হয়নি। ব্রিটেনে লেবার পার্টির অনেক নামকরা ব্যক্তি—রয় জেনকিন্স, শার্লি উইলিয়ামস, ডেভিড আওয়েন প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা নতুন দল সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (SDP) করলেন ঠিকই,

www.pathagar.com

কিন্তু নির্বাচনে জনগণের সমর্থন পাননি। এতকিছুর পরও শ্রমিক দলের মূল সংগঠনই বেশি শক্তিশালী রয়ে গেছে।

সাধারণত একটি বড় রাজনৈতিক দলের মূল স্রোতধারা অর্থাৎ মূল নেতৃত্ব যেদিকে থাকে সেটিই শক্তিশালী হয় এবং সেটিই আসল সংগঠন হিসেবে টিকে থাকে। এটিই নিয়ম হিসেবে দাঁড়িয়েছে। মিজানুর রহমান চৌধুরী অনেক ভাল ভাল লোক নিয়ে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু মূল স্রোতধারা অন্যত্র থেকে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁর আওয়ামী লীগ এক ব্যক্তিক সংগঠন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনিও জাতীয় রাজনীতিতে তেমন কোন ভূমিকা আর রাখতে পারেননি। নতুন ভূমিকায় তিনি তাঁর মেধা, ব্যক্তিত্ব এবং সাংগঠনিক শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম হননি। যদিও আওয়ামী লীগের মূল সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসার পেছনে আদর্শিক কারণ তিনি জোরালোভাবে দেখাতে পারেন, তবুও দলের অভ্যন্তরে থেকেই তিনি যদি সংগ্রাম করে যেতেন তাতে হয়তো শেষ বিচারে (ultimate analysis) ইতিবাচক ফল পেতে পারতেন। এ ধরনের অঢেল দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে রয়েছে, সেসবের বৃত্তান্ত এখানে না দিলেও চলবে, সবাই তা জানেন। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, একবার কেউ একটি রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িয়ে পড়লে সেই দলের মূল স্রোতধারা থেকে তার কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া উচিত নয়। ব্যক্তিগত অসুবিধা হলেও প্রতিকূল পরিস্থিতি সইবার শক্তি এবং ধৈর্য থাকলে শেষ পরিণতি শুভ হতে বাধ্য—অন্তত মনের দিক থেকে তৃপ্তি পাওয়ার অনেক কিছু থাকে। ভাঙন শুধু উভয় পক্ষকেই দুর্বল করে না, সাধারণ মানুষও এতে হতাশ হয়, রাজনৈতিক দল এবং নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারায়। রাজনৈতিক ইনস্টিটিউশনের উন্নয়ন বাধা পায়। আমার মতে, দলে থাকা যদি একেবারেই অসহনীয় হয়ে ওঠে, তাহলে দল না ভেঙে একা দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া অনেক ভাল।

দল ভাঙাভাঙিতে কায়েমী স্বার্থবাদীরা খুশি হয়। ক্ষমতাসীনরা এবং অন্যান্য বিরোধী (rival) দলগুলো ব্যাপারটা না বুঝে আনন্দ পায়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এই দুর্বলতার সুযোগে নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং সেই শূন্যতা অরাজনৈতিক শক্তিরা এসে পূরণ করে। তাই দল ভাঙলে শেষ পর্যন্ত কারো কোন লাভ হয় না, উপরন্তু জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তাই রাজনৈতিক নেতাদের উচিত হবে দল ভাঙাভাঙি প্রতিহত করা। শুধু নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য বা ইগোকে বাচিয়ে রাখার জন্য দল ভাঙার চেষ্টা প্রতিহত করা উচিত। হিরো হওয়ার জন্য বা কোন গোষ্ঠীর স্বার্থে যারা দল ভাঙে তারা সফল হতে পারে না। সংগঠনের মূল স্রোতধারা যেদিকে থাকে সেদিকের প্রতিই মানুষের আকর্ষণ থাকে—তাকেই মূল সংগঠন বলে মানুষ ধরে নেয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে সেটাই মূল শক্তি হিসেবে গণ্য হয়। যেমন এখন আওয়ামী লীগ থেকে আব্দুর রাজ্জাক বা ড. কামাল হোসেন বা সেরকম কোন ব্যক্তিত্ব যদি বেরিয়ে যান, দল দুর্বল হবে ঠিকই, কিন্তু সংগঠনের মূল স্রোতধারা শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সাথেই থেকে যাবে। বিএনপির ব্যাপারেও একই কথা

www.pathagar.com

প্রযোজ্য, মূল স্রোতধারা থাকবে খালেদা জিয়ার সাথেই। মেজর জলিল যদি বেরিয়ে যায় তাহলে জাসদের মূল স্রোতধারা আ. স. ম. আব্দুর রবের সাথে থেকে যাবে। আমার এই আলোচনা দেশের মূল সংগঠনগুলো এবং নামীদামী নেতাদের মনে রেখেই করা, ছোট দল বা নেতাদের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। তারা বেশিরভাগ নিজের সামাজিক গুরুত্ব বা ভুল রাজনীতি বা নিজেদের জীবিকা অর্জনের একটি পথ হিসেবে দলের সংখ্যা বাড়ায়।

ঠিক একইভাবে আমরা তখন আর একটি বিএনপি দাঁড় করালে জাতি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। কাজটি দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে চলে যেত। শুধু যে আমরা বিএনপির মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হতাম তাই নয়—দুটি বিশেষ ইস্যুতে, যেটা আগে উল্লেখ করেছি, সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করত এবং দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নস্যাত করার সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব বিদ্রোহী গ্রুপের ওপর চাপিয়ে দিত। সুতরাং আমাদের সেদিনকার দলের অভ্যন্তরেই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। দেশে সামরিক আইন জারি হওয়ার পর হুদা-মতিন যে উদ্দেশ্যেই দল ত্যাগ করে আর একটি বিএনপি তৈরি করুন না কেন এবং তাঁরা যদি আবার চোরাপথে মন্ত্রীও হয়ে যান, তবুও তাঁরা কোনদিন দেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দাঁড় করাতে পারতেন না। বিএনপির মূল স্রোতধারা সাত্তার-বেগম জিয়ার সাথে থাকবে, আর বেগম জিয়া যদি রাজনীতি সক্রিয়ভাবে করেন, তাহলে তাঁর সাথেই সেই মূল স্রোতধারা চলে যাবে। বিশেষ করে অনুন্নত দেশে একটি রাজনৈতিক দল একজন মূল নেতার সাথে চিহ্নিত (indentified) হয়ে যায় এবং তার একটি নিজস্ব ঐতিহ্য এবং কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। সেসব থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয় তারা মূল স্রোতধারা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

রাজনৈতিক দল ভাঙার আমি ঘোর বিরোধী, বিশেষ করে যেসব দলের, যারা প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করার ভূমিকা পালন করে। যদিও নতুন রাজনৈতিক দল বা স্রোত তৈরি করা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ারই অঙ্গ এবং রাজনীতিতে dynanism-এর স্বাক্ষর বহন করে, তবুও আমার মতে, আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থকে সবার ওপরে স্থান দিতে হবে। একটি দল ভেঙে যাক—অন্যান্য রাজনৈতিক দলের এই মানসিকতাও সমানভাবে ক্ষতিকর। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করতে না পারলে কোন রাজনীতি বা রাজনৈতিক দলেরই জাতি গঠনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে না। গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু রাখা বা বহাল করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। দেশের অর্থনৈতিক এবং সার্বভৌমত্বের বিষয়ে যেসব সঙ্কটের আমরা ক্রমাগতভাবে সম্মুখীন হচ্ছি সেসবের অবসান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। আমি চাই আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাসদ, জামায়াতে ইসলামী যেন না ভাঙে। প্রতিটি দলই যেন ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক দলগুলো শক্তিশালী না হতে পারলে শুধু দেশের সুদূরপ্রসারী সমস্যাগুলোই নয়, সাধারণ এবং রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। যাঁরা এদেশে

www.pathagar.com

বিপ্লব বা সমাজতন্ত্রেরে কথা চিন্তা করেন, উদার মার্ক্সিস বা আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চান, দেশে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি না হলে বা একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু না থাকলে তাঁদের পথও আরো কঠিন হয়ে যাবে। পেছনের দরজা দিয়ে বা গায়ের জোরে কোন দেশেই কোন আদর্শ বা কোন স্থিতিশীল ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয়।

তবে এরপরও একটি মৌলিক প্রশ্ন থেকে যায়। তবে কি একজন নাগরিক একবার একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য হলে তিনি তাঁর সমস্ত মৌলিক অধিকার হারিয়ে ফেলবেন? তাঁর চিন্তাচেতনার স্বাধীনতা, তাঁর বাকস্বাধীনতা, মুক্তবুদ্ধি ও মতাদর্শ চিরদিনের জন্য বিসর্জন দেবেন? একটি রাজনৈতিক দল যদি কখনো আদর্শচ্যুত হয় বা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেয়, তারপরও কি তাঁকে সেই দলেই থাকতে হবে? কোন একটি দলে যোগদান করে তিনি কি তাঁর বিবেককে বিক্রি করে দিয়েছেন? এমন একটি অবস্থায় তিনি কি দল ত্যাগ করতে পারবেন না, অন্য কোন দলে যোগ দিতে পারবেন না, অন্য দল গঠন করতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন। এটি শুধু তাঁর মৌলিক অধিকারই নয়, এখানে একটি নৈতিক দায়িত্ববোধেরও প্রশ্ন এসে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, শেখ মুজিবুর রহমান যখন গণতান্ত্রিক আদর্শকে ধূলিসাৎ করে একদলীয়, একনায়কত্ব স্থাপন করলেন, আওয়ামী লীগকে বিলুপ্ত করে দিয়ে বাকশাল কায়েম করলেন, তখন যাঁরা তাঁর প্রতিবাদ করে বাকশালে যোগ দিলেন না, তাঁরা কি অন্যায় করেছিলেন? না। বরং তাঁরা তখন সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের সাহসী এবং সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁরা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে দল ত্যাগ, দল ভেঙে দেয়া বা অন্য একটি দল করাকে মোটেও অযৌক্তিক মনে হবে না।

যাই হোক ফেব্রুয়ারির ঘটনায় আবার ফিরে যাওয়া যাক। ১১ ফেব্রুয়ারি সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে মন্ত্রিসভা বিলুপ্ত করে নতুন করে গঠন করা হয়। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গভবন থেকে ক্যান্টনমেন্ট চলে যায়। ১৫ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্ট অধিবেশনে বিচারপতি সাত্তারের ভাষণের আর তেমন গুরুত্ব থাকল না। এর মধ্যে ১১ ফেব্রুয়ারির পর এই মন্ত্রিসভা থেকে যাঁরা বাদ পড়েছিলেন বা সাত্তারের সিদ্ধান্তে যাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁদের অনেকে বিদ্রোহী গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত হন। সরকারের অভ্যন্তরে বিরোধী শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তবুও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষা করার স্বার্থে প্রেসিডেন্টের ভাষণ বর্জন করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু কোন চক্রান্তের ফলেই হোক আর নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যই হোক, পার্লামেন্টে দুই ঘণ্টাব্যাপী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে তিনি ১১ ফেব্রুয়ারি সামরিক হস্তক্ষেপের দরুন নিজের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা যৌক্তিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর ভাষণে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের অবহেলা, দুর্নীতিপরায়ণতা, দায়িত্বহীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কথা আবারও উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এর ফলে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে নানাবিধ সমস্যা এমনভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল

www.pathagar.com

যা "গণজীবনে অসন্তোষ, হতাশা ও নৈরাজ্যের সূচনা করে সামগ্রিক জাতীয় অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল।" ১১ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভা বাতিল করা প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন "দেশ এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং দেশের জনগণের আস্থার প্রতি সম্মান রেখেই পরিস্থিতির অবসানকল্পে সরকারকে বিভিন্ন জরুরি পদক্ষেপ নিতে হয়েছে।"

অন্যদিকে সাত্তার বলেন যে জিয়ার মৃত্যুর পর "সশস্ত্রবাহিনী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন এবং কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন তা সমগ্র জাতির জন্য পরম গর্বের বিষয়।" এরপর তিনি বলেন, "তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মত আমাদের দেশেও গণতন্ত্রের ওপর হামলা এসেছে বিভিন্ন সময়ে কিন্তু দেশপ্রেমিক জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেই হামলা অতীতেও প্রতিহত করেছি এবং ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে করব।"

১১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর সাত্তারের এই বক্তৃতা ছিল কেবলই আনুষ্ঠানিকতা। কিন্তু তিনিও তাঁর মন্ত্রীদের অপসারণকে নিজের পদক্ষেপ হিসেবে চালানোর এবং ঐ কাজকে যৌক্তিক প্রতিপন্ন করার যে চেষ্টা করেন তাতে সকলে অবাক হয়। জাতির কাছে তিনি আসল ঘটনা গোপন রাখেন। গণতন্ত্রের ওপর হামলাকে জনগণ ভবিষ্যতে প্রতিহত করবে শুধু এই আশা ব্যক্ত করেই তিনি সেই প্রসঙ্গের ইতি টানেন, অথচ তিনি ভাল করেই জানতেন যে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মতই আমাদের দেশেও গণতন্ত্রের ওপর হামলা ১১ ফেব্রুয়ারিতে অর্থাৎ মাত্র চার দিন আগে আর একবার হয়ে গেছে। কিন্তু ভাষণে সে ধরনের কোন ইঙ্গিত তিনি দেননি। হয়তো তিনি গণতন্ত্রকে শেষ রক্ষা করতে সেদিন ও ধরনের বক্তব্য রাখেন। তবে ব্যাপারটি যে ততক্ষণে তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল সেটা তিনি নিশ্চয়ই জানতেন, এবং দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হয়ে সংবিধান রক্ষা করতে তাঁর যে অসুবিধা হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে জাতিকে অন্ধকারে রাখার চেষ্টা করেন।

আগেই বলেছি সাত্তারের সূক্ষ্ম গুণাবলি (reflex) আর কাজ করছিল না। নেতৃত্বের দিক থেকে তাঁর মধ্যে কোন উদ্যোগ ছিল না। অতবড় একটি ঘটনার ব্যাপারে তাঁর অনুভূতি শক্তির সীমাবদ্ধতাই তাঁর অক্ষমতা এবং অদক্ষতাকে প্রকট করে দেয়। ভাইস প্রেসিডেন্টের কায়দায় পৃথিবীর জটিলতম দেশের সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কোন উদ্যোগ নেয়া বা কোন কিছু পরিচালনা করার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। নিজস্ব কোন চিন্তাধারা থাকলেও সেটা কার্যকরী করার শক্তি বা সাহস তাঁর লোপ পেয়েছিল। তাই সেনাপ্রধানের ঐ ধরনের প্রকাশ্য রাজনৈতিক বক্তব্য এবং দাবি শোনার পরও তিনি কোন পদক্ষেপ নেননি, উপরন্তু তিনি তাঁর vision হারিয়ে ফেলেন। হয় সেনাপ্রধানকে বরখাস্ত করা, আর না হয় তাঁর সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার উপযোগী এক ধরনের সমঝোতা—এ দুটির কোনটিই তিনি করেননি। সেনাপ্রধানের ঐসব বক্তব্যের পর এবং ১১ ফেব্রুয়ারি সামরিক অফিসারদের আচরণ এবং হস্তক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের এই যে পরিবর্তন আসে সেটা বুঝতে তিনি পুরোপুরি অক্ষমতার

www.pathagar.com

পরিচয় দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের ভুট্টো একবার সেনাপ্রধান জেনারেল গুল হাসানকে দুপুরে খেতে ডেকে আর অফিসে ফেরত যেতে দেননি। খাওয়ার পর তাঁর এবং বিমান প্রধান রহীমের সাথে গল্পগুজব করার সময় অন্য ঘর থেকে টিক্কা খানকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করেন এবং ওদের দুজনকে বরখাস্ত করেন। সেনাপ্রধান গুল হাসান ক্ষমতার ভাগ চেয়েছিলেন এবং খাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়ে ভেবেছিলেন সেই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যই বোধহয় তাদের ডাকা হয়েছিল। যদিও এরপর অনেক জেনারেলকে ডিঙিয়ে ভুট্টো যাঁকে তাঁর অনুগত বলে সেনাপ্রধান বানিয়েছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে সেই জিয়াউল হকই ভুট্টোকে শুধু ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে ক্ষান্ত হননি, তাঁকে ফাঁসিতেও ঝুলিয়েছিলেন। বাংলাদেশে সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল সেনাপ্রধান থেকে শুরু করে সাত্তারের আশপাশের সকলেই তাঁর সাদামাটা বা সিধাসাদা ব্যক্তিত্বের কথা জানত এবং জেনেশুনেই তাঁরা তাঁদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে এমনিতে নেহাতই ভদ্রলোক এই ব্যক্তিটিকে হেয়, অপদস্থ করেছেন এবং তার সাথে সাথে এদেশের যে কত বড় ক্ষতি করেছেন সেটা ভবিষ্যতই শুধু সাক্ষ্য দেবে।

এরশাদের ক্ষমতাগ্রহণ

তাই সাত্তারের ব্যর্থতার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন পড়ে না। তাঁকে একজন ব্যর্থ প্রেসিডেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করার বিভিন্ন অভিসন্ধি পুনর্ব্যক্ত করার দরকার নেই। তাঁকে প্রেসিডেন্ট করার পেছনে তাঁর অক্ষমতাকেই মূল পুঁজি করা হয়েছিল, তিনি তা বুঝতে পারেননি। তিনি ভেবেছিলেন সেনাবাহিনী এতই দুর্বল এবং দ্বিধাবিভক্ত যে তাদের নিজেদের স্বার্থেই তারা গণতন্ত্রের ওপর আস্থা জ্ঞাপন করেছে। সাত্তার ভেবেছিলেন তিনিই তাদের ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি নিজের সম্পর্কে এমন এক ভ্রান্ত ধারণা লালন করেছেন যে, জেনারেল এরশাদ এবং পুরো সামরিক বাহিনীর অস্তিত্বই যেন তাঁর ওপর নির্ভর করছিল, নিজেদের বাঁচার তাগিদেই তারা যেন সাত্তারকে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন করে গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছে। তাঁর ভাবখানা এই ছিল যে, তিনি নির্বাচনে দাঁড়াতে রাজি হয়ে জেনারেল এরশাদকে কৃতার্থ করেছেন। সেনাবাহিনী যখন তাঁকে সমর্থন দিয়ে প্রেসিডেন্ট করেছে, সুতরাং তাঁকে তারা তো আর অপসারণ করতে পারে না। তিনি ছিলেন আইনের মানুষ। তাই তিনি সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে যাবেন এবং সেনাবাহিনীর স্থান হবে ব্যারাকে, নির্বাচনের পর এরকম ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে যে, তাঁর তখনকার গোটা রাজনৈতিক উপলব্ধিটিই ভুল ছিল। সামরিক অফিসারদেরকে কি করে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় সেটা তাঁর জানা ছিল না। নির্বাচনের পরও নিজের মন্ত্রিসভা পরিবর্তন করতে পারেননি। নির্বাচনের আগে ছোট এবং দক্ষ মন্ত্রিসভা করবেন বলে জাতিকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর কাছের লোকজনদের চাপে সেই প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করতে পারেননি। ১১ ফেব্রুয়ারি পুরো মন্ত্রিসভাকে নানা অপবাদে অভিযুক্ত করে বাতিল ঘোষণা করে ঐ মন্ত্রিসভার পুরোনো

www.pathagar.com

সদস্যদের আবার পুনর্বহাল করেন, শুধু বিশেষ একটি গ্রুপের কয়েকজনকে বাদ দিয়ে। আর যাঁদেরকে বাদ দিলেন তাঁরাই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এবং বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী। এরপর অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সেই মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেই আবার দুর্নীতির মামলা এনে নিজের সরকারের মানমর্যাদা খোয়ালেন। একজন গ্রহণযোগ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত তিনি নিয়োগ করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে পারেননি। নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রথমে ড. এমএন হুদাকে নিযুক্ত করলেন। তারপর মীর্জা গোলাম হাফিজকে নিযুক্ত করার জন্য সব ব্যবস্থা নিয়েও প্রধানমন্ত্রীর চাপে সে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন। তারপর অন্য কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে জনাব মহম্মদ উল্লাহকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন, যাতে সামরিক-বেসামরিক উভয় গোষ্ঠীর প্রায় সকলই অসন্তুষ্ট হয়েছিল। অবশ্য এই নিযুক্তির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সামরিক অফিসাররা ক্ষমতা দখল করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সামরিক বাহিনীর প্রশাসনিক কাঠামো এবং চেইন অব কমান্ড পুনর্গঠন বা নিয়ন্ত্রণ করা দূরে থাক, তিনি নিজের ঘরই সামলাতে পারেননি। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা তখন যা খুশি তাই করতে থাকেন। আমলারা এমন স্বরাজ আগে আর কোনদিন পায়নি। বিএনপি সংগঠন কোন্ পর্যায়ে ছিল এবং এর অভ্যন্তরীণ সঙ্কট কি ছিল, সেটা তিনি গভীরভাবে পরীক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। ইচ্ছা করলেই দলকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারতেন কিন্তু নেতৃত্বের গুণের অভাবে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয়নি। অথচ এই মানুষটির সীমাবদ্ধতার কথা সম্যকরূপে অবগত থেকেই আমরা অনেকেই সজ্ঞানে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে সামনে রেখে দেশ পরিচালনা করার কথা বলে দেশের মানুষের সাথে কি প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতাই না করেছি। কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করেছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই পুরো ব্যাপারটি এক কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সাত্তারের মনোনয়নের সময় যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন, দলীয় গঠনতন্ত্রের কথা তুলেছিলেন, তাঁদের তখন ক্ষমতাসীনরা কতই না অপদস্থ করেছে, বিদ্রোহী আখ্যা দিয়ে দল থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করেছে। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে তারা দেশ, জাতি ও দলের স্বার্থকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে কুণ্ঠিত ছিল না। আজ তাই শুধু একা সাত্তারকে কোন কিছুর জন্য দায়ী করা অন্যায় হবে। জিয়ার মৃত্যুর পর যাঁরা সাত্তারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যরা, যাঁরা তাঁকে তখন নিয়ন্ত্রণ বা সমর্থন করেছিলেন, যাঁরা তাঁকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখতেন, তাঁরাও সাত্তারের ব্যর্থতার সমঅংশীদার, তাঁদের ব্যর্থতা সাত্তারের বার্থতার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

বিচারপতি সাত্তার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনগণকে শেষ পর্যন্ত আস্থায় নেননি। দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে যেমন তাঁর নিজের কোন লাভ-লোকসান (stake) ছিল না, তেমনি দেশের চলমান রাজনীতিতে তাঁর কোন ভিত্তি ছিল না, এবং তিনি এক দুর্ঘটনাহেতু অনেকটা দৈবক্রমে আকস্মিকভাবে প্রায় বিনা ত্যাগ বা পরিশ্রমে দেশের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে জনগণের কাছে যাওয়ার কথা

www.pathagar.com

ভাবাই সম্ভব হয়নি। তাঁর নিজস্ব কোন রাজনৈতিক শক্তি না থাকায় তিনি তাঁর আশপাশের গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া বাকি সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এই ব্যক্তিগত শক্তিহীনতার জন্য তাঁর মধ্যে রাজনীতির dynamics বলতে কিছু ছিল না। তাঁর অধীনে কি না ছিল? তাঁর ছিল একটি দল, একটি সরকার আর জনগণের ম্যান্ডেট। তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল একটি নির্বাচিত পার্লামেন্ট আর দুচারজন অফিসার ছাড়া সারা সামরিক বাহিনী। আর সবচেয়ে বড় কথা তাঁর সামনে ছিল অজস্র পথ এবং জনগণের দুর্দমনীয় গণতান্ত্রিক সচেনতা। তিনি সামরিক বাহিনীর সমস্যাটা জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারতেন, পার্লামেন্টে বিতর্কের ব্যবস্থা করতে পারতেন। বিরোধী দলগুলোকে তার আস্থায় নিতে পারতেন, সর্বদলীয় কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারতেন, জাতীয় সরকার তৈরি করতে পারতেন, আর তা নয় শেষ পর্যন্ত সংবিধান পরিবর্তন করে সংসদীয় ব্যবস্থা কায়েম করতে পারতেন এবং ঐ ইস্যুতে গণভোটের ব্যবস্থা করতে পারতেন। সকল রাজনৈতিক পথই তার কাছে উন্মুক্ত ছিল, সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নির্বাচিত ও আইনসম্মত অধিকারভোগী হিসেবে দাবার সকল গুটিই তাঁর হাতে ছিল।

সেনাপ্রধানের দাবিকে তিনি নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এমনকি বিষয়টি নিয়ে নিজের মন্ত্রীদের সঙ্গেও কোনদিন খোলাখুলি আলোচনা করেননি, দলীয় নেতৃবৃন্দদের ডেকে পরামর্শ করেননি। সংসদীয় দলের কোন সভায় ইস্যুটিকে উপস্থাপন করেননি। সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে যেমন কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বা তেমনই তাঁর সাথে কোন কার্যকরী সমঝোতায়ও পৌঁছানোর জন্য কোন অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তাঁর মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে যাঁরা সামরিক অফিসারদের সাথে গোপন বৈঠকে এবং যোগাযোগে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তাঁর গোয়েন্দা বিভাগগুলো বিশেষ করে, যে দুটি তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল, তাদের তৎপরতা বা মনোভাব কোন্ ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল তাও তিনি বুঝতে পারেননি। তারা তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করছিল বলে যে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল, তার সত্য-মিথ্যা তিনি পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন মনে করেননি।

বিচারপতি সাত্তার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করেছিলেন কিন্তু ঐ নিরাপত্তা পরিষদ কিভাবে গঠিত হয়েছিল, কি তার কার্যক্ষমতা ছিল এবং তার এখতিয়ার কি ছিল সেসব বিষয় কারো জানার উপায় ছিল না। এই পরিষদের আইনগত ভিত্তিই বা কি ছিল তাও জানার উপায় ছিল না। স্পিকারের এক রুলিং অনুযায়ী জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের ওপর কোন আলোচনাই পার্লামেন্টে করা সম্ভব হয়নি।

অথচ সেদিন বেগম খালেদা জিয়াকে বিএনপি মনোনয়ন দিলে আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস অন্য রকম হতে পারত, রাষ্ট্র ক্ষমতায় সামরিক নেতার হস্তক্ষেপ করার সাহসই হতো না।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত ২৪ মার্চ ১৯৮২ ভোরবেলায় সামরিক অফিসাররা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে দখল করে। ১১ ফেব্রুয়ারির হস্তক্ষেপের ঘটনার পর তারা একটি

www.pathagar.com

উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় ছিল। এই মধ্যবর্তী সময়ে তারা নানাভাবে নিজেদের প্রস্তুতি নিয়েছে। ফেব্রুয়ারির হস্তক্ষেপের পর থেকেই মন্ত্রিসভার একটি অংশ, দুটি গোয়েন্দা বিভাগ এবং কিছু আমলা সামরিক অফিসারদের সাথে কাজ করা শুরু করে। দেশের ৭৪টি তথাকথিত রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে কিছু কিছু দল গোপনে সামরিক অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রাখা শুরু করে। কিছু কিছু সংবাদপত্রও এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। সামরিকরা সরকার দখল করতে আসছে জেনে যে যার আখের গোছানোর লক্ষ্য নিয়ে তারা আগেভাগে সমর্থন দেয়া শুরু করে। তারা সকলে মিলে সরকারকে অপদস্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। সামরিকরা ক্ষমতায় এলেও যাঁদের মন্ত্রিত্বে থেকে যাওয়ার কথা তাঁরা তখন আর সাত্তারের প্রতি কোন আনুগত্য রাখেননি, বরং তাঁর বিরুদ্ধে আরো জোরেসোরে কাজ করা শুরু করেন। সাত্তার সরকারই ইমদাদুল হক ইমদুকে আশ্রয় দেয়ার জন্য আবুল কাসেম, গাড়িতে অস্ত্র পাওয়ার জন্য রুহুল আমিন, দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য জামালউদ্দিন আহমেদ, এস. এ. বারী এ. টি., ওবায়দুর রহমান, নূরুল হকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এবং আরো অনেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এইসবের ফলে সরকার এবং দল জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে এজন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

লক্ষণীয় বিষয় হলো দেশের বিশিষ্ট একটি রাজনৈতিক দল এবং কিছু নেতৃবৃন্দ এই গণতন্ত্র হরণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এদের অনেকে দেশের সার্বিক অবস্থা মূল্যায়ন করতে পারেননি। এরা গণতন্ত্রের দাবি তুলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করার কাজে সহায়তা করেন। কেউ জেনে কেউ না জেনে, কেউ প্রত্যক্ষভাবে আর কেউ পরোক্ষভাবে, এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। দেশের ক্ষমতার সমীকরণটি (power equation) তাঁদের মধ্যে অনেকে বুঝতে পারেননি। মাত্র নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু হেরে যাওয়ার পর থেকেই বিরোধী দলের তরফ থেকে এই সরকারের পদত্যাগের দাবি তোলা হয়। দেশে ১১ ফেব্রুয়ারি সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে যাওয়ার পর তাঁদের কেউ এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করেননি, বরং সাত্তার সরকারকে উৎখাত করার দাবি তোলেন। সাত্তারের পতনের ফলে দেশে যে সামরিক শাসন জারি হবে এটি প্রায় সকলেরই জানা ছিল, কিন্তু তবুও তাঁরা সরকারের ওপর আস্থাহীন হয়ে পড়েন। পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খান সরকারের ওপর যে সেনাবাহিনীর আস্থা নেই সেটাও উল্লেখ করেন এবং সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন। সামরিকদের পদধ্বনি যেখানে সুস্পষ্ট এবং ক্ষমতা দখল অত্যাসন্ন, তখন দেশের বৃহত্তম বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি তাদের অনাস্থা প্রকাশ করেন এবং ৭ মার্চ বায়তুল মোকাররমের এক বিরাট জনসভায় সাত্তার সরকারকে উৎখাত করার কথা বলেন। আওয়ামী লীগসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল তাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থরক্ষার জন্য তখন বিএনপি সরকারের চেয়ে সামরিক সরকারকেই বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছে।

www.pathagar.com

দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশের চেয়ে বিএনপির পতন তাঁদের কাছে অনেক শ্রেয় মনে হয়েছে। এমনকি অনেকে এটাও সন্দেহ করে যে, আওয়ামী লীগের একটি শক্তিশালী অংশের সাথে পরামর্শ করে বা তাদের সমর্থন নিয়েই সেনাপ্রধান ক্ষমতা দখল করেন। এটাও তখন শোনা গিয়েছিল যে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে ভারত সরকারের সমর্থন ছিল। এরশাদ ক্ষমতা দখল করার পর আওয়ামী লীগ সমর্থক *দৈনিক বাংলার বাণী* ও *দৈনিক সংবাদ*-এর ভূমিকা পর্যালোচনা করলে উপরোক্ত ধারণা এবং কথাবার্তার সমর্থনে অনেক যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। *বাংলার বাণী* ও *সংবাদ* সেনা সরকারকে যে ভাষায় সম্ভাষণ এবং সমর্থন জানিয়েছে দেশের অন্য কোন ব্যক্তিমালিকানাধীন পত্রিকা সেভাবে জানায়নি।

যাই হোক সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। প্রেসিডেন্টসহ মন্ত্রিসভা এবং জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়া হয়। সংবিধানের কার্যকারিতা স্থগিত করে দেয়া হয় এবং রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার প্রায় ১০ ঘণ্টা পর সামরিক অফিসারদের চাপে বিচারপতি সাত্তার সশস্ত্রবাহিনীর প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণও দেন। তৃতীয় বিশ্বের যে কোন দেশে নির্বাচিত সরকারকে অপসারণ করে সামরিক অভ্যুত্থান করার পক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো হয়, এখানেও তার ব্যত্যয় হয়নি। ১৯৫৮ সালের আইয়ুবের বক্তৃতার বিষয়বস্তুর সাথে জেনারেল এরশাদের বক্তব্যের বিষয়বস্তুর খুব একটা তফাৎ ছিল না। বলা হলো, অর্থনৈতিক জীবনের বিপর্যয়, দেশ পরিচালনায় বেসামরিক প্রশাসনের ব্যর্থতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং সমাজে সীমাহীন দুর্নীতি—এসব কারণেই সামরিক অফিসারদের ক্ষমতা দখল করতে হয়েছে। ক্ষমতা দখল করার সময় অন্যান্য দেশে যেমন কতগুলো উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয় এক্ষেত্রেও সেরকম করা হলো। উৎপাদন বৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা পুনর্বহাল, অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন—এসব প্রতিশ্রুতি তারা দিল। সামরিক শাসকদের আর একটি মূল লক্ষ্য থাকে গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে দেশে সাচ্চা গণতন্ত্র কায়েম করা। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

সেনাপ্রধান জিয়ার মৃত্যুর পর দেশের গণতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রতি সেনাদের আনুগত্যের কথা বলেছিলেন। তারপর নির্বাচনের মাসখানেক আগে থেকে তিনি সামরিক বাহিনীর একটি সাংবিধানিক ভূমিকার কথা বলতে থাকেন। নির্বাচনের পর ঢাকার পত্রিকা সম্পাদকদের কাছে তিনি তাঁর ঐ বক্তব্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন এবং সংবিধানকে সংশোধন করে প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর জন্য একটি স্থায়ী ভূমিকা দাবি করেন। কিন্তু ২৪ মার্চ যখন সামরিকপ্রধান ক্ষমতা দখল করেন তখন তার কারণ, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখান। অর্থাৎ গণতন্ত্র বা সাংবিধানিক ভূমিকার কথা আর উল্লেখ করা হলো না। একথা বলা হলো না যে, যেহেতু সাত্তার বা তাঁর সরকার সামরিক বাহিনীর জন্য একটি সাংবিধানিক ভূমিকার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি তাই সেটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বা সেটা নিশ্চিত করার জন্যই তারা ক্ষমতা দখল করেছে। বলাবাহুল্য, তারা পুরোপুরি

www.pathagar.com

ক্ষমতা দখল করে এবং গণতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক মূল্যবোধকে তোয়াক্কা করার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করেনি। এতদিন যেসব কথা বলে আসা হয়েছিল সেগুলোর কোনটিই আর অনুসরণ করা হলো না। তারা মাত্র চার মাস আগে জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে দিয়ে দেশের সমুদয় ক্ষমতা দখল করে নেয়। সমস্ত সংবিধানকে তুচ্ছ করে ঐ সামরিক অফিসাররা তাদের ইচ্ছা কার্যকরী করে। সেনাপ্রধানের সামরিক বাহিনীর জন্য একটি সাংবিধানিক ভূমিকার দাবির আসল অর্থ ছিল ক্ষমতা দখল এবং ক্ষমতা ভোগ করার একটি অভিসন্ধি মাত্র, সেই সন্দেহটিই শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হয়। সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিশেষ করে যখন একজন সেনাপ্রধান রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হতে চান তার অর্থই হয় তিনি ও তাঁর সহযোগীরা পুরোপুরি ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হবেন। এখানে কোন মাঝামাঝি পথ খোলা নেই। এটিই বাস্তব। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সরকার সংবিধান পাল্টিয়ে দেশের সেনাবাহিনীর সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করেছে বা তাদের ক্ষমতা দিয়েছে এরকম কোন নজির নেই। এটি ছিল একটি অবাস্তব প্রস্তাব। জেনারেল এরশাদ এবং তাঁর অফিসাররা এটি জানতেন। তাই যা হওয়ার তা হয়েছে। তবে সামরিকরা ক্ষমতায় এসে কতিপয় বেসামরিক আমলা এবং রাজনীতিবিদদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার চেষ্টা করে, কিন্তু সেটি ছিল নেহাতই নিজেদের স্বার্থে এবং ক্ষমতাকে যতদিন পারে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেই সেটি তাঁরা করেন। একটি বেসামরিক গণতান্ত্রিক সরকার সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা দিতে পারে না, কিন্তু একটি সামরিক সরকার, যাদের ক্ষমতা দখল করা একটি অনৈতিক কাজ এবং এই কাজ করে তারা রাজনৈতিক এবং মানসিকভাবে দুর্বল থাকে বলে তারা বেসামরিকদের সাথে ক্ষমতা শেয়ার করে এবং অবশেষে বেসামরিকদের কাছে তাদেরকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিতে হয়।

সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল একটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিবর্তনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই বিষয়টি সামরিক অফিসারদের মধ্যে যাঁরা ক্ষমতা দখল করেন, তাঁরাও ঠিক বোঝেন না। দেশপ্রেম বা ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ—যে কারণেই ক্ষমতা দখল করুক না কেন—এর সুদূরপ্রসারী পরিণতি অনুধাবন করার সাধ্য তাঁদের নেই। এর একটি খারাপ দিক হলো, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে আনুগত্য এবং শৃঙ্খলাবোধ নষ্ট করে দেয়। শুধু যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তারা দুর্বল, লোভী এবং দুর্নীতিপরায়ণ হয় তাই নয়, এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং ক্ষমতা দখল করার একটি মানসিকতা ঢুকিয়ে দেয়া হয়। সামরিক বাহিনীর মূল ভিত্তি হলো শৃঙ্খলাবোধ। তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ হলো সকল আইনকানুন মেনে চলা, একটি কাঠামোর মধ্যে সংগঠিত (regimented) হওয়া এবং এর অন্যতম মূল ভিত্তি (foundation) হলো ক্রমোচ্চ পদবিন্যাস (hierarchical), সিনিয়র অফিসাররা হলো জুনিয়রদের বাপ-মা, আদর্শ এবং গুরু। সেনাপ্রধান হলো তাদের আদর্শের অর্থাৎ শৃঙ্খলাবোধের প্রতীক, তাদের অনুপ্রেরণার উৎস। প্রশিক্ষণই তাদেরকে একটি গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখে। কিন্তু

www.pathagar.com

একবার যখন সেই সেনাপ্রধান তার গণ্ডির বাইরে চলে যায় সেটাই হয় বিশৃঙ্খলা এবং সামরিক বাহিনীর আচরণবিধি এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় (violation of army code of conduct, army discipline)। তারপর যখন সেই সেনাপ্রধান এবং সিনিয়র অফিসাররা একটি নির্বাচিত সরকারকে অপসারণ করে সংবিধানকে বাতিল বা স্থগিত করে এবং নিজেরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে, তখন তাদের প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সেটা হয়ে দাঁড়ায় একটি সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা ভঙ্গের কাজ (an act of highest indiscipline)। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই তাই পুরো সামরিক বাহিনীতে এর একটি chain of reaction হয়। সেনাপ্রধানের এই শৃঙ্খলা ভঙ্গের কাজটিকেই তখন তারা সুশৃঙ্খল একটি কাজ বলে ধরে নেয়। তাদের প্রশিক্ষণের গুণগত দৃষ্টিভঙ্গিতে সেনাপ্রধানের সমস্ত কার্যবিধি একটি শৃঙ্খলার আওতায় আসে। জুনিয়র অফিসাররা সিনিয়রদের অনুসরণ করার প্রশিক্ষণ পায়। সিনিয়র অফিসাররা যা করতে পারে জুনিয়ররাও সিনিয়র হলে তা করতে পারে। এইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার প্রবণতা এবং আকাঙ্ক্ষা সামরিক অফিসারদের মধ্যে জন্মলাভ করে। একজন কর্নেল, মেজর বা ক্যাপ্টেনও ভাবে এক পর্যায় গিয়ে সেও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল বা ভোগ করতে পারবে। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হতে পারবে। একজন উচ্চাভিলাষী অফিসারের জন্য তখন শুধু আর সেনাপ্রধান হওয়ার মধ্যে তার আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ থাকে না, বিভিন্ন পর্যায়ে সে তার ভূমিকা বিভিন্নমুখী হিসেবে দেখে। তখন সে তার পেশাগত মূল মানসিকতা, প্রশিক্ষণে অর্জিত কর্মক্ষমতা এবং শৃঙ্খলাবোধ থেকে দূরে সরে যায়। এইসব মনস্তাত্ত্বিক এবং বাস্তব কারণেই দেখা যায় সামরিকপ্রধান বা অফিসাররা একবার ক্ষমতা দখল করলে আর ছাড়তে চায় না, আর ছাড়লেও বার বার তাদের মধ্যে ক্ষমতায় আসার প্রবণতা থাকে। আর বাহিনীর শৃঙ্খলা যদি একবার ভেঙে পড়ে তখন জুনিয়ররা আর সিনিয়র বা সেনাপ্রধান হওয়ার অপেক্ষায় থাকে না—তারা নিজেরাই ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। অনুন্নত দেশে তাই সামরিকরা ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার পর দুচার বছরও অপেক্ষা করে না। পরবর্তী অফিসাররা তাদের পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। অনুন্নত দেশে যেহেতু দারিদ্র্য, দুর্নীতি এবং নানাবিধ সঙ্কট চিরস্থায়ী ব্যাপার, তাই সামরিক অফিসারদের ক্ষমতা দখল করার পক্ষে যুক্তি প্রায় যে কোন সময়ে দাঁড় করানো সম্ভব। তাই একবার যদি ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন সেটাকে যথার্থ প্রমাণ করার যুক্তির অভাব ঘটে না। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সেই দেশে বার বার ব্যাহত হতে হয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অনিশ্চয়তার মধ্যেই থেকে যায়।

২৪ মার্চ জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে জেনারেল এরশাদ জিয়ার মৃত্যুর পর থেকে সরকারের উপর্যুপুরি ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেন। অনুন্নত দেশে সামরিকদের ক্ষমতাগ্রহণের যে গৎবাঁধা কারণ থাকে জেনারেল এরশাদ তাইই উল্লেখ করেন। যেমন সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, নজিরবিহীন দুর্নীতি, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, প্রশাসনিক অচলাবস্থা,

www.pathagar.com

আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, জাতীয় নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি বিরাজমান হুমকি, ইত্যাদি। ক্ষমতা দখল করাকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্য কতগুলো কথা বার বার পুনর্ব্যক্ত করেন। ভাষণটি ছিল অনেকটাই কৈফিয়তদানের চেষ্টা (apologetic)। মূলত তিনি বলতে চেয়েছেন যে সরকারের ওপর দেশবাসীর আর আস্থা ছিল না এবং সেজন্য সাত্তারের অযোগ্যতা এবং দুর্বলতা দায়ী। ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারেননি। আর তাই "জনগণের ডাকে সাড়া দিতে হইয়াছে—ইহা ছাড়া জাতির সামনে আর কোন বিকল্প ছিল না।"

এ ব্যাপারে জেনারেল এরশাদ জাতির কাছে সত্য কথা বলেননি। তাঁর ভাষণেও তিনি অনেক সত্য গোপন করেন। এজন্য তাঁকে কোনদিন জবাবদিহি করতে হবে কিনা জানি না। তবে তাঁর ভাষণের মূল অংশ একটি ধুম্রজাল সৃষ্টির অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এটি তিনি কেন করেছিলেন বা কার প্রভাবে করেছিলেন তা আমাদের জানার কথা নয়। একটি বিষয় তুলে ধরলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে। সেনাপ্রধান ১১ ফেব্রুয়ারির পর নতুন মন্ত্রিসভাকে অসৎ, অযোগ্য ও দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেন, এবং বলেন যে সেই পুরোনো ব্যক্তিদের সমাবেশের ফলে জনমনে সংশয় এবং প্রশ্ন জাগে এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং মানুষ সরকারের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, ক্ষমতা দখল করার পর এরশাদ তুচ্ছ কারণে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিনা প্রমাণে অনেক সাবেক মন্ত্রীকেই দুর্নীতির অভিযোগে শারীরিক নির্যাতন থেকে শুরু করে ১৪ বছর পর্যন্ত সাজা দিয়েছেন, কিন্তু যে মন্ত্রিসভাকে উৎখাত করে, যে মন্ত্রিসভার ওপর থেকে মানুষের আস্থা চলে যাওয়ার ফলে সামরিক অফিসাররা ক্ষমতা দখল করেন, সেই মন্ত্রিসভার একজনকেও গ্রেপ্তার বা সাজা দেয়া হয়নি। সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর এরা বরং বুক ফুলিয়ে শহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন—অনেকে এও আশা করেছিলেন যে, তাঁরা মন্ত্রিসভায় যোগদান করার জন্য দাওয়াত পাবেন। সরকারের অভ্যন্তরে এই গ্রুপটি ছিল সামরিকদের অনুগত এবং সহযোগী। তাই সেনাপ্রধানের ভাষায় তাঁরা দুর্নীতিবাজ এবং অযোগ্য হয়েও তাঁদের কিছু হয়নি। মন্ত্রিসভায় হয়তো তাঁরা স্থান পাননি, কিন্তু নির্যাতন এবং কারাবরণ থেকে বেঁচে গেছেন। সরকারের অভ্যন্তরে আর একটি সরকার যে কাজ করছিল, এটি ছিল তারই আর একটি প্রমাণ।

আর একটি কথা এখানে বলার প্রয়োজন। সাত্তারের মন্ত্রিসভার সকলেই ছিলেন জিয়ার মনোনীত ব্যক্তি। তাঁদের অযোগ্যতা এবং দুর্নীতিপরায়ণতা যদি থেকে থাকেও তাহলে সেটা জিয়ার আমল থেকেই ছিল। জিয়ার মৃত্যুর পর তাঁরা সকলেই মন্ত্রিসভায় দীর্ঘ ছয় মাস থাকেন। সামরিকরা তখন কোন কথা বলেননি। নির্বাচনের পরও নতুন মন্ত্রিসভার দুয়েকজন ছাড়া বাকি সকলেই বহাল ছিলেন, তখনও কিছু বলা হয়নি, বরং এদের অনেকের সাহায্য নিয়েছেন সামরিক অফিসাররা এবং একসাথে নানাভাবে সরকার চালিয়েছেন বা সরকারের কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। সাত্তারের মনোনয়ন থেকে শুরু করে

www.pathagar.com

নির্বাচন পর্যন্ত এদের সাথে যোগসাজশ বরাবরই বহাল ছিল। এছাড়াও জিয়াউর রহমানের 'সুযোগ্য এবং গতিশীল নেতৃত্বের' কথা এরশাদ বলেছেন অথচ জিয়ার মৃত্যুর পর তারই মন্ত্রীদের দুর্নীতিবাজ আখ্যায়িত করেন এবং এটিকেই মূল কারণ দেখিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। নির্বাচনের আগে বা পরে একটি বারও তিনি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। সামরিক বাহিনীর প্রশাসনে অংশগ্রহণ করার কথা বলেছেন, নির্বাচনে সাত্তারকে সমর্থন জানিয়ে খবরের কাগজে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, কিন্তু দুর্নীতির কথা একবারও উল্লেখ করেননি। তাই ক্ষমতাগ্রহণের পরে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগটা ছিল একটি অজুহাত মাত্র।

যাই হোক, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশ পরিচালনায় সাত্তারের যোগ্যতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে যতটুকুই সত্যতা থাকুক না কেন তাঁর মনোনয়ন এবং নির্বাচনের ব্যাপারে জেনারেল এরশাদের ভূমিকা যে মুখ্য ছিল সেটা আগেই বলেছি। সাত্তারের যোগ্যতা সম্পর্কে জেনেই এরশাদ তাঁকে নির্বাচনে দাঁড়াতে রাজি করিয়েছিলেন এবং এরশাদের সমর্থন ছাড়া বিচারপতি সাত্তারের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভ করার উপায় ছিল না। তবে সেনাপ্রধানের বার বার হস্তক্ষেপ না হলে বিএনপি তখন তাদের নিজস্ব নেতৃত্ব এবং গতিপথ ঠিক করে নিত। তাতে যদি তারা ব্যর্থও হতো সেই দায়িত্ব আজ তারা নিত। সাত্তারের উত্থান জেনারেল এরশাদের কারণেই এবং তাই তাঁর ব্যর্থতার জন্য শুধু সাত্তারকে দায়ী করলেই চলবে না। এর দায়িত্ব জেনারেল এরশাদের ওপর অনেকটা বর্তায়। এটি কেন করা হয়েছিল, কি উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল এর পেছনে যে একটি অভিসন্ধি বা ষড়যন্ত্র ছিল এখন প্রায় পরিষ্কার। অনেকে মনে করেন, প্রথমে ধরে নেয়া হয়েছিল যে সাত্তার বেশিদিন বাঁচবেন না, নির্বাচনে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে তার ধাক্কা তিনি সইতে পারবেন না। আর যদি বাঁচেনও তিনি সরকার চালাতে পারবেন না। নিজেই একটি পর্যায়ে এসে সামরিকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে বিদায় নিবেন। কিন্তু যখন সামরিকরা দেখে যে সাত্তার শাসনকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য উন্নতির পথে, তখনই সেনাপ্রধান প্রথমে প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণের দাবি তোলেন। তারপর নির্বাচনের পর বিশেষ করে ১১ ফেব্রুয়ারি সাত্তার স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করলে, নিজেরাই ক্ষমতা দখল করে নেয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। তাই শেষে একটি কথা থেকে যায় যে, সাত্তারের ব্যর্থতা বা অযোগ্যতার কথা যতই বলা হোক না কেন, তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করেননি, বরং শেষ পর্যন্ত সেটা ঠেকানোর চেষ্টা করেছেন। ২৪ মার্চ ভোরবেলায় সেনা অফিসাররা বলপ্রয়োগ করেই ক্ষমতা দখল করেন। পরবর্তী পর্যায়ে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণে বিএনপির এক বিরাট জনসভায় সাত্তার এক লিখিত বক্তব্যে দেশবাসীকে একথা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে নির্বাচনের মাসখানেক আগে লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল এরশাদ গণতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্য ঘোষণা করেন তবে সাথে সাথে দেশের প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর জন্য একটি

www.pathagar.com

সাংবিধানিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। নির্বাচনের ঠিক পরপরই তিনি একটি বিবৃতির মাধ্যমে সেনাবাহিনীর জন্য এই ভূমিকা আবার দাবি করেন। কিন্তু ২৪ মার্চ সামরিক অফিসাররা পুরোপুরিভাবেই ক্ষমতা দখল করে নেন—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সংবিধানকে উপেক্ষা করে। সেদিন তারা তাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ভিন্নভাবে ব্যক্ত করেন এবং কোন সাংবিধানিক ভূমিকার কথা বা সাংবিধানিক ভূমিকার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য ক্ষমতা দখল করেছেন সেকথা বলেননি। অর্থাৎ তারা সংবিধানকে অমান্য করে রাষ্ট্র পরিচালনার পুরো দায়িত্ব নিজেরাই নিয়ে নেন।

যাই হোক ২৪ মার্চের আগে প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকের বিরূপ বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও দেশে যে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্ট দুটোই জনগণের দ্বারাই নির্বাচিত ছিল। মৌলিক অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আমাদের দেশে ১৯৭২-৭৪ সালে যেমন ছিল, মোটামুটিভাবে সেইরকমভাবেই বিরাজ করছিল। সামরিক আইন জারি হওয়ার পর সেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং প্রক্রিয়ার বিলুপ্তি ঘটে। অনুন্নত দেশের অন্য সামরিক শাসকদের মত বাংলাদেশের শাসকরাও গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারাই গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে, আবার তারাই গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কথা বলে। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে যারা গণতন্ত্রকে বিনষ্ট করে তারা গণতন্ত্রকে পছন্দ করে না এবং তারা গোষ্ঠীগত স্বার্থের কারণে কোনদিন গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। তাছাড়া সামরিক সরকার এবং গণতান্ত্রিক সরকার দুটো পরস্পরবিরোধী ধারণা (concept) এবং এদের সংঘাত চিরন্তন, এর পরিসমাপ্তি প্রায় সবসময় সামাজিক নৈরাজ্য এবং সংঘাতের মধ্য দিয়ে ঘটে।

আজ ষোল মাস পার হতে চলেছে দেশে পূর্ণ সামরিক শাসন চালু রয়েছে। পাকিস্তানের জিয়াউল হক ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলেছিলেন, কিন্তু আজ প্রায় ছয় বছর পার হতে চলেছে নির্বাচন আর হয়নি। বাংলাদেশেও মাঝে মাঝে সেনাপ্রধান এবং অন্য অফিসাররা নির্বাচনের কথা বলেন, কিন্তু সেটা ঠিক কবে হবে কেউ বলতে পারে না। অন্যান্য অনেক দেশের এবং আমাদের দেশের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শুধু একথাই বলা যায় সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়া একটি অত্যন্ত কঠিন পথ, এটি খুব সহজে অর্জন করা যায় না। এর সাথে অনেক ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ, শ্রেণীস্বার্থ জড়িয়ে পড়ে। সাংবিধানিক জটিলতা এসে যায়। শাসকচক্রের মধ্যে ক্ষমতা হারানোর ভয়ভীতি, সঙ্কীর্ণতা এবং ক্ষমতা ধরে রাখার মনোবৃত্তি প্রকটভাবে কাজ করে। সুতরাং ব্যাপারটা গভীরভাবে পরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করার প্রয়োজন। এর যেমন একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক আছে, ঠিক তেমনি একটি মনস্তাত্ত্বিক দিকও আছে।

গোষ্ঠী এবং শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার চিরন্তন নিয়ম অনুযায়ী সামরিকরা যতদিন পারে ক্ষমতায় থাকতে চেষ্টা করে। সীমিত ঘরোয়া রাজনৈতিক অধিকার আদায় করার জন্য ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি রক্ত দিতে হয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে ইচ্ছা সেনাপ্রধান ব্যক্ত

www.pathagar.com

করেছিলেন তার ব্যতিক্রম সেদিনই ঘটে যায়। সামরিকরা ক্ষমতা শান্তিপূর্ণভাবে হস্তান্তর করেছে তেমন নজির নেই বললেই চলে। ১৯৭১ সালে নির্বাচনের ৩ সপ্তাহের পর পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা কি ব্যবহার করেছে সেই দৃষ্টান্ত আমাদের কারো ভুলে যাওয়ার কথা নয়। ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য শুধু গণহত্যাই সংঘটিত করেনি, নিজেদের দেশকে পর্যন্ত দুটুকরো করে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। আর এখানে সঙ্কটের দানা তো আগে থেকেই বাঁধা ছিল। ভবিষ্যতের যে কোন রাজনৈতিক সমাধানে সেনাবাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ইয়াহিয়া খানের এই ধরনের কোন দাবি ছিল না, কিন্তু তবুও পাকিস্তানের সাংবিধানিক সমস্যার সমাধান হয়নি।

বাংলাদেশ বলতে গেলে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ, জনসাধারণ এখানে অনুন্নত এবং নিরক্ষর। সামরিক অফিসাররা এখন ক্ষমতাসীন—এটিই বাস্তব সত্য। ক্ষমতায় যারা থাকে রাজনৈতিক বল তাদের কোর্টেই থাকে। ক্ষমতাসীনদের প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, দেশাত্মবোধ এবং দূরদর্শিতার ওপর যেমন দেশে আবার একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরে আসতে পারে, ঠিক তেমনি তাদের নির্বুদ্ধিতা, অনভিজ্ঞতা, গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতা বা অদূরদর্শিতা জাতির জন্য চরম দুরবস্থা বয়ে নিয়ে আসতে পারে। আর যেখানে সামরিক অফিসাররা ক্ষমতায় থাকে, সেখানে ব্যাপারটি আরো সঙ্কটাপন্ন হয়, আরো কঠিন এবং জটিল আকার ধারণ করে।

দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বা প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকা থাকার অর্থ হলো যে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে সামরিকরাই থাকবে। একবার ক্ষমতা ভোগ করার পর তাদের পক্ষে কোন অপ্রধান বা রাজনীতিকদের অধীনে সহযোগী (subservient) ভূমিকায় যাওয়াটা মুশকিল হয়ে পড়ে। অংশীদারিত্বের যদি প্রশ্ন হয় তাহলে সামরিক বাহিনীর পক্ষে জুনিয়র পার্টনারের ভূমিকা নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এই ক্ষমতার বন্দোবস্ত power mechanismটি এমন এক জিনিস যে আমাদের জাতীয় জীবনে এই সমস্যা একটি ক্যান্সার হিসেবে বিরাজ করবে। যার যত সৎ উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত সঙ্কট নিরসন আর হয় না। সঙ্কট থেকেই যায়। ক্ষমতার বলে এবং বন্দুকের জোরে শেষ পর্যন্ত যে কোন ধরনের অংশীদারিত্ব চালু (evolve) করা হোক না কেন, সামরিকরাই হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার (decision-making) মূল শক্তি। অপ্রধান ভূমিকায় যদি তাঁরা খুশি হতেন তাহলে ২৪ মার্চ তাঁদের ক্ষমতা দখল করার প্রয়োজন হতো না। বিচারপতি সাত্তার যে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করেছিলেন তার মাধ্যমেই সামরিকরা যথেষ্ট প্রভাব এবং ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারতেন। সুতরাং দেশের প্রশাসনে সেনাবাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকার ভাষা যাই হোক না কেন, গণতান্ত্রিক সমাজে বা গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের দেশে তা অত সহজে মীমাংসা হওয়ার কথা নয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং এই দেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, চর্চা, সংস্কৃতি এবং মানুষের মনমানসিকতার আলোকে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই সমস্ত কারণেই এরশাদ এত বড় বড় কথা বলার পরও

www.pathagar.com

ঐ পথে আর অগ্রসর হননি। এছাড়াও এরশাদ জানতেন যে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা কোনদিনই কায়েম করা সম্ভব হবে না। ক্ষমতা দখল করার ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য আর সেনাবাহিনীর সমর্থন লাভের জন্যই অংশীদারিত্বের কথা এরশাদ তখন বার বার বলেছেন কিন্তু ক্ষমতা দখল করার পর এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, বিষয়টা তখন ইচ্ছা করেই ভুলে গিয়েছিলেন। এটি ছিল এরশাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আর একটি বহিঃপ্রকাশ।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৫

এরশাদ কর্তৃক গ্রেপ্তার: সামরিক শাসনের বৈশিষ্ট্য ও সামরিক রাজনীতির সীমাবদ্ধতা

সেদিন এশার নামাজ পড়ছি আল্লাহর কাছে কর্তব্য পালন করার জন্য। ১৪ নভেম্বর, ১৯৮২। হাসনা আমানকে ঘুম পাড়ানোর গল্প বলছে। হঠাৎ বেডরুমে দরজায় ভীষণ আওয়াজ। এই সময়টা শোয়ার ঘরে কারো আসা মানা। তার ওপর আবার এত জোরে দরজা প্রায় ভেঙে ফেলার মত শব্দ। আমি নামাজে তাই হাসনাই উঠে যায়। দরজা খুলে দেখে সামনে তিনজন উগ্র প্রকৃতির যুবক। ততক্ষণে আমি নামাজ থেকে উঠে এসেছি। আগন্তুকদের কাপড়চোপড়ে ভদ্রতার লেশ মাত্র নেই, দাড়ি কাটেনি, চুলে সিথি নেই। হাসনা ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। যখনই স্মরণ হয় তখনই সেই মুহূর্তটি এখনো আমাকে শিহরিত করে। আমার মনকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। প্রথমে ভাবলাম ওরা বুঝি ডাকাতি করতে এসেছে। এ ধরনের ঘটনা তো আজকাল অনেক ঘটছে। পরক্ষণেই ১৯৭১ সালের কথা মনে পড়ে। শুনেছি এভাবেই বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে রাজাকার আলবদরেরা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। মেয়েদের-শিশুদের খুন করেছে। ওদের মধ্যে একজন বলল, তার নাম ক্যাপ্টেন হালিম। সে ডিএফআই থেকে এসেছে। অর্থাৎ সে সামরিক গোয়েন্দাবাহিনীর লোক। সে বলল, আমাকে তাদের সাথে যেতে হবে। আমান বিছানা থেকে আমাদের কথাবার্তা সব শুনছে। ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে যায়। মশারির ভেতর থেকে আর বের হয় না।

ক্যাপ্টেন হালিমকে তার পরিচয়পত্র দেখাতে বললাম, সে তা পারলো না। তখন কে তাদের ওপরের অফিসার জানতে চাইলাম। সে বলল, কর্নেল নাসির। বললাম, আমি তার সাথে কথা বলতে চাই। এই কথাবার্তার মধ্যেই বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। সে কর্নেল নাসিরকে টেলিফোনে দিল ঠিকই। জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার! তিনি বলেন, এক ঘণ্টার জন্য তারা আমার সাথে কিছু কথা বলতে চায়, কথাবার্তা শেষ করে কিছুক্ষণ পরই বাসায় ফিরে আসতে পারব আমি। বললাম, রাতেরবেলায় কেন, কাল দিনেরবেলায় তো আসতে পারি। তিনি বলেন, না এখনই দরকার। বুঝলাম দেশে এখন সামরিক শাসন, সামরিক শাসনে ওয়ারেন্টের প্রয়োজন হয় না। যেতেই হবে। কাপড় পরিবর্তন করে গাড়িতে উঠলাম।

www.pathagar.com

আমানের কাছে থেকে বিদায়ও নিতে পারলাম না। দেখলাম বাড়ির বাইরে ওদের লোক-লস্কর অনেক। অনেক জীপ এবং মোটর সাইকেল। একেবারে যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে ওরা। ওরা সামরিক ব্যক্তি বলে ওদের মানসিকতাও সেরকম। আমরা অসামরিক ব্যক্তিরা যে উপায়হীন, শান্তিপ্রিয়, উপরন্তু আমরা যে অস্ত্রবিহীন এটি বোধহয় ওরা বিশ্বাস করতে পারে না। তাই ওদের এত আয়োজন—এত জনশক্তি আর অর্থের অপচয়।

রেল লাইন পেরিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ঢুকতেই গাড়ি থামানো হলো। আমাকে বলা হলো পিছনের জীপে উঠতে। নিজের রুমাল দিয়ে চোখ বাঁধতে বলল। আর কিছুই দেখার উপায় নেই। জীপ নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন্টের একটি অপরিচিত জায়গায়, সম্ভবত ডিএফআই কেন্দ্র হবে। আমাকে একটি বাড়িতে নেয়া হলো এবং সেখানে তারা আমাকে একটি চেয়ারে বসতে দিল। কর্নেল নাসিরের নাম আমি আগেও শুনেছি, তার বাড়ি ফেনী, কিন্তু কোনদিন তাকে দেখিনি। সামরিক বাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে আমার একেবারেই যোগাযোগ ছিল না। যাই হোক কর্নেল নাসির কিনা জানি না, একজন অফিসার আমাকে নানা প্রশ্ন করলেন। সব প্রশ্নই রাজনৈতিক ছিল। যেমন, বেগম জিয়ার বাড়িতে আমি কেন যাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অসন্তোষ এবং আন্দোলন। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান ইত্যাদি। তারপর ওখানকার একজন সাদা কাপড় পরা কর্মচারী আমাকে একটি ঘরে নিয়ে চোখ খুলে দিল। সেই ঘরটি ছিল জঘন্য ধরনের। ময়লা, দুর্গন্ধময়, একটিই দরজা, সেটি বন্ধ রাখা হয়, সবসময় অন্ধকার এবং কোথায় আছি বোঝার উপায় নেই। বাইরের কোন কিছু দেখা যায় না। দরজার ওপরের অংশ দিয়ে ছোট একটু আলো দেখা যায়। পাশে একটি নতুন বাড়ি উঠছে, তার ছাদের কিছু অংশও দেখা যায়। দরজা বন্ধ করার পর তাও দেখা যায় না।

একটি কম্বল এনে দিল মাটিতে ঘুমানোর জন্য। পাশের এক কোণে একটি মাটির পাত্র দেয়া হলো মলমুত্রের জন্য। ওপরের এক কোণে দেয়ালে একটি একজস্ট ফ্যান আছে। পাহারার লোকটা বলে, ওটা চালালে নাকি মশা কম লাগে। কিন্তু একজস্ট ফ্যান চালালে বিকট শব্দ হয়, তাই ওটা বন্ধই করে দিতে বলি। হাতমুখ ধোয়ার নাম করে দরজা খোলাতে দেখলাম, একই ধরনের সারি বাঁধা কয়েকটা ঘর। একই কায়দায় বোধহয় আরো অনেককে ঐসব ঘরে রাখা হয়েছে। ঘরের আলো সারা রাত জ্বালিয়ে রাখা হলো, তার ওপর ছিল অসম্ভব মশা। তাই সারা রাত নিদ্রাহীন নিষ্পলকভাবেই কেটে গেল। পরদিন সকালে নাস্তা আনলো এক বাচ্চা ছেলে। নাস্তা খাওয়ার মত নয়। একেবারেই অখাদ্য। আর কেউ এলো না। সেই ছোট অন্ধকার ময়লা ঘরে একেবারে নীরবতার মধ্যে একাকী বসে থাকা যে কি দুর্বিষহ সেটা যারা সেখানে যায়নি তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কোন মানুষ অন্য একজন মানুষকে যে এভাবে রাখতে পারে সে কল্পনাও করা যায় না। হিটলারের নাজি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পও নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভাল ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে এ ধরনের ব্যবহার যে বলবৎ রয়েছে তা আগে দেখিওনি, শুনিওনি। যে অপরাধই আমি করে থাকি না কেন বা অন্য কেউ করে থাকুক না কেন এখানে যেন আমার চরম শত্রুকেও কেউ কোনদিন না আনে।

www.pathagar.com

ছোট ঘরটার চারদিকের দেয়ালে অসংখ্য লেখা। এর আগে এই ঘরে যারা থেকে গেছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো একাজ করে গেছে। নানা কথা লেখা। হতাশা আর গ্লানির কথা লেখা। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে অনেকগুলো লেখা দেখলাম, যেভাবে নিজেদের সব কথা লিখেছে এইসব বন্দিদের মধ্যে নির্দোষ লোকের সংখ্যাই বেশি মনে হলো। কয়েকটা জায়গায় আবার সুন্দর করে দাগ কেটে কেটে কেউ কেউ দিনগুণতি করে গেছে। কে কতদিন ছিল। কেউ কেউ চার মাসের অধিককাল ঐ জায়গায় ছিল। ভেবে অবাক লাগে এত দীর্ঘদিন তারা বেঁচে ছিল কেমন করে? রীতিমত ভয় পেয়ে যাই। মোর্শেদ খানের মত লোককেও এরকম জায়গায় ৪৭ দিন রাখা হয়েছিল। সামরিক শাসন ঘোষণার পরপরই—সে আট মাস আগের কথা—যেসব মন্ত্রীদের তারা ধরেছিল তাঁদেরকেও এখানেই আনা হয়েছিল তাহলে! জামালউদ্দিন, হাসনাত, তানভীর সিদ্দিকি, সাইফুর রহমান, আতাউদ্দিন খান, মাজেদুল হক, এস. এ. বারী ওদেরকেও কি তাহলে এখানেই রাখা হয়েছিল? ডক্টর আনোয়ার হোসেন, আজিজ মোহাম্মদ ভাই, হাজী সালাহউদ্দিন? মোর্শেদ খানের কথাটাই বার বার মনে পড়ছিল, আর তাতে নিজের মধ্যে বিমর্ষ ভাবটা বাড়তে থাকে। তিনি কস্মপলিটিন চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ছিলেন, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি। সবসময় গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতেন। রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তাকে দিয়ে এই সরকারের অনেক উপকার হতো। তাকে কেন ধরেছিল কে জানে? মাস দুয়েক বিনা বিচারে আটক রেখে অকথ্য নির্যাতন করে পরে ছেড়ে দিয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে একজন লোক এসে খবর দিল আমাকে ডেকেছে অফিসে। চোখ বাঁধা হলো। নিয়ে যাওয়া হলো অন্য একটি ঘরে। বুঝলাম একজন অফিসার এসেছেন। ইংরেজি ভালই বলেন। তিনি আমাকে বোঝালেন, টেবিলের ওপর ৫টি লিখিত প্রশ্ন রাখা আছে উপরিওয়ালাদের জন্য, যার লিখিত উত্তর আমাকে দিতে হবে। যাওয়ার আগে আরো অনেক কথা বললেন, যার সবই রাজনৈতিক। অফিসার চলে গেলে আমার চোখ খুলে দেয়া হলো। লাল কালি দিয়ে হাতে লেখা ৫টি প্রশ্ন ইংরেজিতে। পাশে সাদা কাগজ এবং কলম। সেই ঘরটি ছিল অদ্ভুত ধরনের। সেই ঘরে নানা ধরনের জিনিসপত্র আছে। মোটা মোটা দড়ি আর সিলিংয়ের সাথে ঝুলানো রিং। চোখে ধরে রাখার জন্য বড় বড় বাল্বসহ বাতির সেড, এরকম আরো অনেক কিছু, পাশে বিরাট একটি টেবিল। রীতিমত ভয় পাওয়ার মত। এখানেই বোধহয় বন্দিদের ওপর শারীরিক নির্যাতন করা হয়। যাই হোক প্রশ্নগুলো সবই ছিল রাজনৈতিক।

এখানে আসার আগে ৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগের যে চারজন নেতাকে ১৯৭৫ সালের ঐ দিনে হত্যা করা হয়েছিল তাঁদের স্মরণে শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাড়ির সামনে আওয়ামী লীগ এক সমাবেশের আয়োজন করে। ঐ সমাবেশে সামরিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা নানা বক্তব্য এবং শ্লোগান দেয়। তারা এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, আওয়ামী লীগই দেশে একমাত্র সংগঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। পুলিশ তাদের নেতা আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করে মিরপুরে নিয়ে গিয়ে আবার ছেড়ে দেয়। আর কিছুই করেনি। পরের দিন খবরের কাগজে বড় বড় করে ঐ সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

এর তিন দিন পর ৭ নভেম্বর ছিল জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি দিবস। ১৯৭৫ সালের ঐ দিনে সিপাহী-জনতার এক বিপ্লবের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান বন্দিদশা থেকে মুক্ত হন এবং তাঁকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়। খালেদ মোশাররফের তিনদিনের সরকারের পতন ঘটে। বর্তমান সামরিক সরকারও এই দিনটিকে পালন করার জন্য সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে। বিএনপি এই দিনটি বরাবর পালন করে, কারণ এই দিনেই ঐ দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। তখন থেকেই এই দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়।

আর সেদিন এই বিশেষ দিনটি পালন করার জন্য বেগম জিয়া এবং বিচারপতি সাত্তারের সাথে আলোচনা করে আয়োজন করা হয়। অন্যান্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই আয়োজনের এটাও উদ্দেশ্য ছিল প্রমাণ করা যে, আওয়ামী লীগ ছাড়াও দেশে আর একটি বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে। আওয়ামী লীগই একমাত্র দল নয় এই দেশে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এটি দেখানোর প্রয়োজন ছিল। আমি সেদিন নেতৃত্ব দিলাম। পুলিশ আমাদের জিয়ার মাজারে যেতে দেবে না। অহেতুক বাধা দিল। সেখানে প্রচুর শ্লোগান হলো। শাহ আজিজের সমর্থক কিছু ছেলে যারা সরকারের দালালি করে বলে সকলেই জানত এবং জিয়ার আমল থেকে যাদের সরকারি একটি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে বলে লোকজনের সাধারণভাবে একটি ধারণা ছিল, তারাই সামরিক শাসন এবং জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে নানা শ্লোগান দেয়া শুরু করে। ওরা ছিল এজেন্ট প্রভোকেটিয়ার।

শেষ পর্যন্ত পুলিশ আমাদের মাজারে যেতে দেয়। বেশ লোক সমাগম হয়। সেদিন ছাত্রদলের ছেলেরা মূল ভূমিকা পালন করে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বেগম জিয়া। তাঁকে নিয়েই সব হৈ চৈ, শ্লোগান হলো। জিয়ারত শেষে তিনি শেরে বাংলা নগরের বড় রাস্তার ওপর উঠে এলেন। আমার অনুরোধেই তিনি সেদিন প্রথম জনসমক্ষে হাজির হলেন এবং তাঁর জীবনের প্রথম বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যটি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, মূলত উপস্থিত জনসাধারণ ও উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানালেন। তাতেই নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। তিনি চলে যাওয়ার পরই পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮/১০ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। যাই হোক অনুষ্ঠান সফল হয়। পরের দিন কাগজে এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে সবকিছুই প্রকাশিত হয়। আওয়ামী লীগ ছাড়াও দেশে যে আরো একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল আছে সেটাও প্রমাণিত হলো। কিন্তু এর দুয়েকদিন পরই মইদুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হলো, আর আমাকে ১৪ নভেম্বর তারিখে গ্রেপ্তার করা হলো।

যাই হোক আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার রাতে যে প্রশ্নগুলো আমাকে করা হয়েছিল মোটামুটি সেই প্রশ্নগুলোই এখন লিখিতভাবে দেয়া হলো। প্রশ্নগুলো এই ধরনের ছিলঃ (১) বর্তমান ছাত্র পরিস্থিতির জন্য আমিই দায়ী? (বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ নভেম্বর ছাত্রদের সাথে পুলিশের হাঙ্গামা হয়েছে) (২) ৭ নভেম্বর আমিই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়ার জন্য উসকানি দিয়েছি? (৩) আমি ছাত্রনেতাদের আর্থিক সাহায্য দিচ্ছি? (৪) বিএনপি ছাত্রদলের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি মিলন এবং কাসেমের সঙ্গে আমার

www.pathagar.com

কি সম্পর্ক রয়েছে? (৫) ৭ তারিখে বেগম জিয়াকে নিয়ে বিএনপির সমাবেশ আমি আয়োজন করেছি কিনা?

সব প্রশ্নের উত্তর লিখলাম এবং এটাও লিখলাম যে সরকার ৩ তারিখে আওয়ামী লীগকে অনুষ্ঠান করতে দিয়েছে বলেই, এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে ৭ তারিখে বিএনপি সমাবেশ করেছে। দুটো দল ভিন্ন রকম ব্যবহার পেতে পারে না।

এরপর আবার আমার চোখ বাঁধা হলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন অফিসার এসে আমাকে একটি গাড়িতে তুলে দিল। ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু অফিসার আমাকে আশ্বস্ত করে জানালো, ভাল জায়গাতেই আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। গাড়ি ছাড়ার দুয়েক মিনিটের মধ্যে সাথের একজন লোক অকথ্য ভাষায় মিলিটারিদের গালিগালাজ করা শুরু করল। আর একজন বলল, সাহেবের চোখ খুলে দে। ক্যান্টনমেন্ট ছাড়িয়ে গেলে চোখ খুলে দেয়ার কথা, কিন্তু তারা তখনই আমার চোখ খুলে দিল। দেখলাম আমি একটি ভ্যানে বসে চলেছি। পাশে রাইফেল হাতে দুজন পুলিশ, আর স্পেশাল ব্রাঞ্চের দুজন কর্মচারী। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছি। বলল, সেন্ট্রাল জেলে। পথে সারাক্ষণ পুলিশ আর ঐ কর্মচারীরা সামরিক বাহিনীর সমালোচনা করল। দেশের কত ক্ষতি করেছে তার হিসেব দিল। তেজগাঁও থানা পেরিয়ে ফার্মগেট হয়ে সোনারগাঁও হোটেলের কাছাকাছি পৌঁছে নিজের অজান্তে বুক ভরে বিরাট এক নিঃশ্বাস নিলাম। ডিএফআই-এর ঐ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে মনে হলো, আমি যেন নতুন এক পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছি। মনে হলো এক দিন নয়, যেন এক বছরের মত আর্মিদের গুহায় আমি কাটিয়েছি। পুলিশরা বলল, আমাদের ওপর এই নির্যাতনের বিচার একদিন হবেই। আমি চুপচাপ ছিলাম বলে ওরা আমাকে অনেক আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছে। সাহস দেয়ার চেষ্টা করেছে। তারা এমনও বলল, স্যার ঘাবড়াবেন না, দেশের মানুষ সামরিক শাসন চায় না, এদের দিন আর বেশি বাকি নেই।

১৯৭৫ সালে মার্চ মাসে মুক্তি পাওয়ার ৭ বছর পর আবার এলাম ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। গতবার ২৬ সেলে ছিলাম। কেন্দ্রীয় কারাগারে ওটাই সবচেয়ে ভাল সেল। এবার ওখানেই জায়গা দিতে বললাম। তারা তা মঞ্জুরও করল, সেখানে পৌঁছে অনেকের সাথেই দেখা হলো। ওরা যেন আমার অপেক্ষাতেই ছিল। মইদুল নাকি এসেই আমার খোঁজ করেছে, কারণ সে আমাকেই সবকিছুর জন্য দায়ী করে এসেছে। তাই সে ধরে নিয়েছিল যে আমাকেও গ্রেপ্তার করা হবে। জামালউদ্দিন এবং হাসনাত ছাড়া বাকি প্রায় সবাই ওখানে ছিল। এস. এ. বারী, সাইফুর রহমান, ওবায়েদ, তানভীর, আতা খান, কাসেম—সবাই খুশি হলো আমাকে দেখে। বন্দিরা আরো কেউ বন্দি হলে সাধারণত খুশিই হয়। পরদিন কাগজে দেখলাম আমাকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও ব্যাপারটা নিতান্তই রাজনৈতিক ছিল, কিন্তু তবুও ও ধরনের একটি কারণ উল্লেখ করাতে নিজের কাছে খারাপ লাগল। রাজনৈতিক কারণে চরিত্র হনন এখন প্রায় সার্বজনীন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে। আরো বিশেষ করে যখন একটি জনপ্রতিনিধিত্ব নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে, তখন। "দুর্নীতি উৎখাত করার" প্রতিশ্রুতি

www.pathagar.com

দিয়ে ক্ষমতাগ্রহণ করলে কিছু লোককে অন্তত স্কেপগোট করতে হয় মানুষের সমর্থন আদায়ের জন্য। আর তাই সবার আগে আঘাত আসে রাজনীতিকদের ওপর। বিশেষ করে যাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয় তাদের ওপর। তারা আমলাদের ওপরও আঘাত করতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না। নিজেদের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের ঠিকই আমলাদের সাথে আঁতাত করতে হয়। সিভিল-মিলিটারি আমলার সম্পর্ক জোরদার করতে হয়। অচিরেই ওদের মধ্যে প্রথম দিকের তিক্ততা কেটে যায়, তারপরই সৃষ্টি হয় গভীর বন্ধুত্ব, আমলাদের আনুগত্য লাভের জন্য প্রথম প্রথম ওদের ওপর দাপট দেখানো হয়, ভয় দেখানো হয়। তারপর একবার ক্ষমতায় সেটেল হয়ে গেলে সম্পর্ক মধুর হয়। ক্ষমতা ভোগ করার জন্য তখন ওরা দ্বিগুণ উৎসাহে একে অন্যকে সাহায্য করে। সিভিলরাও আমলা, মিলিটারি অফিসাররাও আমলা। তারা তখন দুই সহোদর ভাই হয়ে যায়, মিলেমিশে একসাথে দেশ চালায়। সাথে নেয় উঠতি পুঁজিপতি-মুৎসুদ্দী মুনাফাখোরী ব্যবসায়ীদের। এরা ক্ষমতাসীনদের প্রোটেকশন চায়। জাতীয় সম্পদ ভোগ করার জন্য এই তিন গ্রুপের স্বার্থ তখন অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। আইয়ুব খানের আমলে পাকিস্তানে এরকমটি হয়েছিল। সেমত অবস্থায় একমাত্র রাজনীতিকরাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর তাই তাদেরকে দেশের শত্রু আখ্যায়িত করা হয়। তাদের ওপরই নেমে আসে নির্যাতন। এই প্রক্রিয়ায় সামরিক-বেসামরিক আমলারা বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত এবং দেশের সাধারণ মানুষের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতা সামাজিক এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে আরো তীক্ষ্ণ করে তোলে, আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ে আসে নতুন নৈরাজ্য। ফলে সমাজে দেখা দেয় উত্তেজনা, ঘটে কনভালসন, রাজনৈতিক ওলটপালট, অস্থিরতা, তিক্ততা এবং রক্তপাত। পৃথিবীর সব সামরিক শাসনের পরিণতি প্রায় একই রকম। প্রায় সব সামরিক শাসকই 'সৎ উদ্দেশ্য' নিয়ে দেশের ভাল কাজ করার জন্যই ক্ষমতায় আসে। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই সামরিক শাসকরা অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ হিসেবে দেশে স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের জন্য শোষণহীন সমাজ, অর্থনৈতিক মুক্তি, দুর্নীতির উৎখাত—এসব কথা উল্লেখ করে থাকে। তাদের ভাষায় দেশে 'সত্যিকারের গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করাও প্রায়শ তাদের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পাকিস্তান, বার্মা, ফিলিপিনস, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন গরিব দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য প্রায় এক এবং অভিন্ন। একটি সামরিক শাসনের ইতিহাস পড়লে মূলত অন্য সব সামরিক শাসনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং রূপরেখা খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো অর্থাৎ যেসব দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য তাদের কথা আলাদা। এরকম দেশের সংখ্যা অল্প, আপাতত যেমন বার্মা, ইথিওপিয়া, আফগানিস্তান এদের বাদ দিলে সব দেশের অবস্থা এক এবং বাংলাদেশও এরকম একটি দেশ।

যে দেশ যত গরিব সে দেশে সামরিক নেতারাও রাজনীতিবিদদের মতই তত বেশি আশা এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করে। কিন্তু এসব দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতা

www.pathagar.com

খুব বেশি। অধিক জনসংখ্যা, ব্যাপক বেকারত্ব, জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের ভূমিহীনতা, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষতা এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস—এসব দেশের সাধারণ ছবি। সামরিক হোক, আর বেসামরিক হোক, এসব দেশের সরকারগুলো বিদেশের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। ভিক্ষা করে এদের দেশ চালাতে হয়। সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় এসে পরনির্ভরশীলতা কমানোর কথাও বলে। দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাকে একটি উদ্দেশ্য হিসেবে তুলে ধরে।

কিন্তু পৃথিবীব্যাপী সামরিক শাসনের পরিণতি হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত তিক্ত এবং করুণ। যদিও কোন কোন দেশে, যেমন ইন্দোনেশিয়া এবং পাকিস্তানে, তারা উন্নয়নের কিছু কাঠামো তৈরি করতে পেরেছেন, দালানকোঠা শিল্প, শহরের রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণ করতে পেরেছেন ১৫-২০ বছর একটানা সামরিক শাসন বহাল রেখে। কিন্তু এইসব অর্জন যতটা না সামরিক শাসনের জন্য হয়েছে তার চেয়ে বেশি হয়েছে একটি বিশেষ অর্থনীতি একটানাভাবে অনুসরণ করার জন্য। কোন গণতান্ত্রিক সরকার বা পদ্ধতি যদি একটানা অত বছর একসাথে চালু থাকত, তারও অর্থনৈতিক সুফল পরিমাণগতভাবে বেশি হতো এবং ঐসব সুফল সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রতিফলিত হতো। ব্যক্তি উদ্যোগের পরিবেশ আরো প্রসারিত থাকার কারণে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনেও অনেক অগ্রগতি অর্জিত হতো। এই দিক থেকে ভারতের অগ্রগতিকে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে। পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস এবং থাইল্যান্ডের পাশে ভারতের তুলনা করলে দেখা যাবে পূর্বোক্ত দেশগুলোতে হয়তো কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আংশিক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু ভারতের উন্নতি হয়েছে বহুমুখী এবং প্রায় অতুলনীয়। উন্নতি শব্দটা শুধু গাড়ি, বাড়ি, রাস্তার নয়, উন্নতি হলো মানুষের মনের, বিবেকের, চিন্তাধারার, মূল্যবোধের। একটি দেশের সার্বিক, সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের মানের উন্নতি কতটা হয়েছে সেটাই বিচার্য বিষয়। তার ওপর রয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—মানব উন্নয়নের এইসব মৌলিক উপাদানগুলো ভারতে রীতিমত একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে যা পূর্বোক্ত কোন দেশই অর্জন করতে পারেনি। এটিই হলো একটি দেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রকৃত স্থিতিশীলতা, যা পূর্বোক্ত দেশগুলোতে অনুপস্থিত।

পৃথিবীর সব সামরিক সরকারই গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা খুব জোর গলায় বলে। সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য—এই বলে তারা ক্ষমতাগ্রহণ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় গণতন্ত্র তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতেও তারা বিফল হয়। এর কারণ হলো ক্ষমতায় কিছুদিন থাকার পর তাদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং শ্রেণীস্বার্থের সাথে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একটি স্পষ্ট বিরোধ সৃষ্টি হয়। ক্ষমতায় তাদের একটি কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া বা ক্ষমতা হস্তান্তর করার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় সামরিক অফিসাদের এতদিনকার আরাম-আয়াস, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, দাপট ইত্যাদি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়া, যা কিনা মানুষের স্বাভাবিক ধর্মেই

www.pathagar.com

মানতে রাজি থাকে না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অপর অর্থ হলো সামরিক অফিসারদের বেসামরিক সরকারের অধীনতা মেনে নেয়া। স্বেচ্ছায় কেউ সাধারণত নিজেকে অন্যের অধীনতায় স্থাপন করতে চায় না, বিশেষ করে যদি একবার কারো পক্ষে অধস্তন অবস্থা থেকে যে কোন উপায়ে ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব হয়। একেই বলে ক্ষমতার স্বাদ। ক্ষমতার স্বাদ একবার পেলে সামরিক বাহিনী আর সহজে সেটা ছেড়ে দিতে চায় না, সেনাবাহিনী শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল ঘটনা।

নাইজেরিয়া ছাড়া পাকিস্তানে একবার সামরিক সরকার বেসামরিক সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। কিন্তু সেটা করেছিল এক করুণ এবং বিষাদময় পরিস্থিতিতে এবং তা যে কি মূল্যের বিনিময়ে করেছিল বিষয়টি সকলেরই জানা। শেষ পর্যন্ত দেশটিকে ভেঙে ফেলতে হয়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আলাদা হয়ে যায়, লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশুর রক্তে নদী বয়ে যায়, মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করে, হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করে, আর নিজেদের প্রায় ৯০ হাজার সৈন্য অন্য দেশে যুদ্ধবন্দি হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত বেসামাল অবস্থায় আন্তর্জাতিকভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তারপর সামরিক অফিসাররা ক্ষমতা বেসামরিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করে, কিন্তু তাকে দেশকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফিরিয়ে দেয়া বা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর বলা যেতে পারে না। সত্যি বলতে কি, অবস্থা অনুকূল নয় বলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কৌশল হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে সাময়িকভাবে লোকদের সরিয়ে নেয়, এবং ঐ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৭১ সালে ২০ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সামরিক সরকার জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

তাই দেখা যায়, পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সঙ্কটের মুখে, বা সঙ্কট সৃষ্টি করে, সেনাবাহিনী ৫ জুলাই ১৯৭৭ সালে আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেয়। প্রধান সেনাপতি জিয়াউল হক সেদিনই জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে তাঁর কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই এবং ৯০ দিনের মধ্যে তিনি দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন বলে দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করেন। দুবার সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার পর দশ বছরেও পাকিস্তানে কোন নির্বাচন হয়নি। আগামীতে কবে হবে কেউ জানে না। ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো ১৯৬৬ সালে ক্ষমতাগ্রহণ করার পর এখনো সেখানে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে পারেননি। বার্মার নে উইন ১৯৬২ সালে ক্ষমতা লাভের পর একদলীয় সমাজতান্ত্রিক সরকার কায়েম করেছিলেন। সে দেশেও এখনো গণতন্ত্র আসেনি।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ইন্দোনেশিয়া, এমনকি পাকিস্তান, বাংলাদেশের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে থাকা দেশ। ওদের সম্পদ এবং অর্থনৈতিক কাঠামো আমাদের তুলনায় দ্বিগুণের চেয়েও বেশি ভাল। কিন্তু তবুও সামরিক শাসন ঐসব দেশে তেমন উন্নতি আনতে পারেনি একটি সুস্থ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অভাবে। শেষ পর্যন্ত কোন একটি সুস্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে সামরিক শাসকরা ব্যর্থ হয়েছেন। বিভিন্ন দেশে যেমন উগান্ডা, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং আরো অন্যান্য অসমাজতান্ত্রিক তৃতীয় বিশ্বের দেশে, যেখানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে সেখানেই সামরিক শাসকরা সংস্কার এবং বৃহত্তর

www.pathagar.com

জনগোষ্ঠীর মঙ্গলের কথা বলেছে। ক্ষমতার প্রথম পর্যায়ে অনেক দাপটও দেখিয়েছে এবং কিছু কিছু কাজ দেখানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তারপর ক্ষমতা ধরে রাখার বাস্তবতার নিরিখে তারা নিজেদের স্বার্থের দিকে বেশি নজর দেয়া শুরু করেছে। যে সংস্কারই তারা করুক না কেন, তা শেষ পর্যন্ত শুধু শ্রেণীস্বার্থের অনুকূল হওয়ার জন্যই ফলপ্রসূ হয়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপকারে ঐসব সংস্কারের সুফল পৌঁছেছে খুবই কম। ভালভাবে বিচার করলে দেখা যায়, ঐসব সংস্কার সাধারণত সিভিল-মিলিটারি আমলা এবং উঠতি শ্রেণীস্বার্থকেই রক্ষা করার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে এসব সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে বলে মানুষকে বলা হয়েছে সেসব উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

প্রত্যেক সামরিক শাসনই যখন দেখে যে, তারা আর দেশের সমস্যার সমাধান করতে পারছে না বা নিজেরা দেশ চালাতে পারছে না, নিজেদের ক্ষমতাকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য তারা রাজনৈতিক অংশীদার খুঁজে বেড়ায়। সিভিল-মিলিটারি আমলা এবং উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণী ছাড়াও আর একটি দলকে তাদের সঙ্গে রাখা তখন তাদের জন্য জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। এরা হলো সরকারের ক্ষমতার ভোগে উৎসাহী তথাকথিত রাজনীতিকদের একটি গোষ্ঠী। এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের সাথে জনগণের খুব একটি সম্পর্ক থাকে না, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীতে এদের কোন সমর্থন বা ভূমিকা থাকে না, এরা তখন শর্টকাট পদ্ধতিতে ক্ষমতায় নগণ্য হিস্যার লোভে সামরিক শাসনকে সমর্থন দিতে এগিয়ে আসে। এদের মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতা বা ক্ষমতার উৎসের একজন হয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা। ব্যবসা-বাণিজ্য করে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা। এরা পূর্বোক্ত সেই উঠতি শ্রেণীরই এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। সামরিক শাসনের উদ্দেশ্য বা কর্মসূচির তোয়াক্কা তারা করে না। যখন যেমন তখন তেমন নীতি। আর জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এদেরই মাধ্যমে সামরিক সরকার জনগণের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। এরাই হয় সরকারের সাথে জনগণের মধ্যেকার সেতু। এটি করেই সামরিক সরকার তখন জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে বলে দাবি করার চেষ্টা করে।

এসব দেশগুলোর সামরিক সরকারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এরা বিদেশী সাহায্য এবং পুঁজির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সামরিক বাহিনীর খরচ তখন যে হারে বেড়ে যায়, দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সেই হারে বাড়ে না। অপরদিকে উঠতি মুৎসুদ্দী শ্রেণীকে হাতে রাখার জন্য নানা প্রকল্প হাতে নিতে হয়। মধ্যবিত্তকে খুশি করতে আমদানি বাড়াতে হয়, নানা কারণে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বাড়াতে হয়। এসবের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয় এবং সরকার উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অর্থের সঙ্কুলান করতে ব্যর্থ হয়। এর ওপর আছে মুদ্রাস্ফীতি এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মত আকস্মিক কিছু কারণ। তখন তাদের আরো প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সরকার তখন অভ্যন্তরীণ সম্পদের চাহিদা মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে প্রকল্প সাহায্য বাদ দিয়ে পণ্য এবং খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করে। এভাবে তাদের ঋণ বেড়েই চলে, আর সেই সুযোগ বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং অন্যান্য দাতা সংস্থাগুলো এসব সরকারকে তখন পেয়ে

www.pathagar.com

বসে। এই সংস্থাগুলোর সুপারিশ এবং নীতিমালার ওপর নির্ভর করে এদের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু এত সাহায্য এবং ঋণ পাওয়ার পরও এইসব দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট দিন দিন বাড়তে থাকে, ফিলিপিনসের বৈদেশিক ঋণের বোঝা ১৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, এবং এই ঋণের সুদ বাবদ তার রপ্তানি আয়ের প্রায় ২৪% তাকে দিয়ে দিতে হয়। ১৯৮২ সালে ঐ দেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার হয়েছে মাত্র ২.৬%। ইন্দোনেশিয়ার প্রায় একই অবস্থা। জনসংখ্যার সাথে সাথে বেড়েছে বেকারত্ব এবং বৈদেশিক ঋণের বোঝা। তেল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়ায় বিদেশী প্রকল্প এবং পুঁজি বিনিয়োগের ফলে এক দারুণ সঙ্কটে পতিত হয়েছে। নিজেদের জাতীয় শিল্প গড়ে তুলতে তারা এখনো সক্ষম হয়নি।

এই সামরিক সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না বলে এইসব সরকার দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী সংস্থাগুলোর নীতিমালা এবং পরামর্শ যদি জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধেও হয় তবুও সেই অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারে। সেজন্য বিদেশী দাতাদেশ এবং সংস্থাগুলো মুখে যদিও গণতন্ত্রের কথা বলে বা নিজেদের দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চালু রাখে, কিন্তু ঋণগ্রহীতা দরিদ্র দেশে সামরিক শাসনকে অপছন্দ করে না। দেশে সামরিক শাসন থাকলে রাজনৈতিক চাপ থাকে না, তারা এই সুযোগকে কাজে লাগায়। এই অবস্থায় তাদের কদর বৃদ্ধি পায়, তাদের নিজেদের স্বার্থও ষোল আনা বজায় রাখা সম্ভব হয়। দাতাদের স্বার্থে যে নীতি অনুসরণ করা ভাল, সামরিক শাসিত এই দেশগুলো সেসব নীতিই অনুসরণ করে। আর যে দেশ যত গরিব সে দেশের সামরিক সরকারও তত দুর্বল হয় এবং দাতাদের জাতীয় স্বার্থবিরোধী পরামর্শে সে দেশগুলোর আপত্তি তোলা বা ঐসব নীতিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও কম থাকে। যার ফলে জাতীয় স্বার্থ অনেক সময় বিসর্জন দিয়ে দাতা সংস্থাগুলোর নীতি তাদের মেনে চলতে হয়। তাছাড়া দাতা সংস্থাগুলোর জন্যও এ ধরনের সরকারের সাথে লেনদেন করতে সুবিধা হয়। দুচারজন অফিসারকে সম্মত করতে পারলেই তাদের কার্যোদ্ধার হয়ে যায়। কোন রাজনৈতিক চাপ বা প্রয়োজনের তোয়াক্কা করতে হয় না। তাই অনেকটা পারস্পরিক স্বার্থেই সামরিক সরকার এবং দাতা সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি কার্যকরী সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়। এর অপর একটি কারণ হলো, এসব বিদেশী দাতা সংস্থার মূল কাঠামো পুরোপুরি আমলাতান্ত্রিক। তখন দেশীয় এবং বিদেশী আমলারা মিলে একটি দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়, যাদের কোনদিন জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। এতে দুর্নীতির আশ্রয় নিতেও কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না, কোন কোন প্রকল্প চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে দেশী-বিদেশী আমলারা তখন পারস্পরিক স্বার্থে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে।

জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না বলে এবং কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার কারণে এসব দেশে আর একটি জিনিস মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, সেটি হলো দুর্নীতি। যদিও দুর্নীতি উৎখাত করার তথাকথিত অঙ্গীকার করে সামরিক অফিসাররা ক্ষমতায় আসে এবং প্রথম দিকে কিছু মামুলি ব্যবস্থাও গ্রহণ করার চেষ্টা করে, যেমন মিলিটারি আদালত, গাড়ির ড্রাইভিং

www.pathagar.com

লাইসেন্স বা কর দেয়া হয়েছে কিনা তা রাস্তায় রাস্তায় পরীক্ষা করা, ব্যবসায়ীদের জন্য কতিপয় নিয়মকানুন কড়াকড়ি করা, টেলিভিশন লাইসেন্স হালনাগাদ হয়েছে কিনা দেখা, কালো টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করা, দেয়াল লিখন মুছে দেয়া, ইত্যাদি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় তাঁরা নিজেরাই সব দুর্নীতিতে ডুবে যায়। এটি সিস্টেমের জন্য হয়, অন্য কোন কিছুর জন্য নয়। ইন্দোনেশিয়া বা থাইল্যান্ড বা ফিলিপিনস বা পাকিস্তান, উগান্ডা, আর্জেন্টিনা—সব দেশে একই অবস্থা। ইন্দোনেশিয়ায় বেশিরভাগ জেনারেল কোটিপতি এবং সেখানে এসব ব্যাপার সর্বজনবিদিত। দেশের সমস্ত ব্যবসায়, বড় বড় ব্যাংকে, প্রকল্পে, কোম্পানিতে, বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগে সামরিক অফিসারদের অংশ রয়েছে। সিনিয়র সিভিল এবং মিলিটারি আমলার সহযোগিতা ছাড়া সেখানে কোন ব্যবসা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করা সম্ভব নয়।

যতই আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য আর দেশপ্রেম নিয়ে সামরিক অফিসাররা ক্ষমতায় আসুক না কেন, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় তারা একই বৈশিষ্ট্য রচনা করে। বিশেষ করে গরিব, অনুন্নত, পরনির্ভরশীল, দুর্বল সমাজে সামরিক সরকারগুলোর প্রশাসন চালানোর ফল শেষ পর্যন্ত একই দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন কারণে তারা সফল হতে পারে না। বুদ্ধিজীবী এবং জনগণের কাছ থেকে ধিক্কার পায়। সকল দেশেই মিলিটারি শাসনের আমলকে একটি কালো অধ্যায় বলে চিহ্নিত করা হয়। কেউ এই শাসনকালকে একটি উজ্জ্বল শাসনামল বলে আখ্যায়িত করে না।

অথচ সর্বক্ষেত্রেই যে তারা ব্যর্থ হয় তা কিন্তু নয়। দেশের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে তারা ক্ষমতাগ্রহণ করে বা তাদের ক্ষমতায় আসতে হয়। সবসময় যে তারা একটি অনিষ্ট শক্তি হিসেবে আসে তাও নয়। একটি দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতা বা নিম্নমানের প্রেক্ষাপটে সামরিক বাহিনী সবচেয়ে সংঘবদ্ধ এবং শক্তিশালী দল হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে তারা ঐসব দেশের তাৎক্ষণিক কিছু মঙ্গলও সাধন করতে পারে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে কিছু নিয়মশৃঙ্খলা আনে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে সচেষ্ট হয়। রাজনীতিকরা যেসব সিদ্ধান্ত জনমতের ভয়ে নিতে পারে না অথচ দেশের স্বার্থে হয়তো করা প্রয়োজন, সেগুলো তারা করতে পারে। শিল্প-বাণিজ্য বাড়ে, রাস্তাঘাট হয়, ড্রাইভাররা ট্রাফিক আইন মান্য করে। কিন্তু এসবই হয় শহরভিত্তিক গুটিকয়েক স্থানে—একটি বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠী এসবের সুবিধা ভোগ করে। এগুলো হয় ক্ষণস্থায়ী এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃত্রিম। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা সামরিক বাহিনী একবার ক্ষমতায় এলে এবং তাদের ক্ষমতায় আসার যৌক্তিকতা থাক আর না থাক, তারা শুভশক্তি বা অশুভশক্তি যেভাবেই আসুক, তাৎক্ষণিক কোন মঙ্গল করুক আর নাই করুক—তারা ক্ষমতা আর সহজে ছাড়তে চায় না। ক্ষমতার স্বাদ বংশানুক্রমে ভোগ করার একটি স্পৃহা তাদের মধ্যে অটুট থাকে। তাই দেখা গেছে যে দেশে একবার সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় গেছে, তারা বার বার অভ্যুত্থান ঘটায়। মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দিলেও কিছুদিন পরই কোন না কোন অজুহাত নিয়ে জোর করে ক্ষমতা দখল করে বসে। এই প্রসঙ্গে আমাদের এই এলাকায় থাইল্যান্ড এবং পাকিস্তানের দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখানো যেতে পারে। অন্যান্য দেশেও প্রায় একই অবস্থা।

www.pathagar.com

সামরিক অভ্যুত্থান বা শাসনের যৌক্তিকতা বা কারণ হিসেবে পশ্চিমা পণ্ডিতরা বলেন, যে একটি দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতার জন্যই সামরিক বাহিনী অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ায় একটি শক্তি হিসেবে সমাজে জেগে ওঠে এবং ক্ষমতা দখল করে। স্যামুয়েল হাংটিনটন এবং এস. ই. ফাইনার দুজনেরই সেটিই মূল কথা, যদিও বিশ্লেষণে গিয়ে তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে সামরিক অভ্যুত্থান নির্ভর করবে একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়নের মানের ওপর। যে দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান যত নিচু সে দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা তত বেশি। সমাজকে আধুনিকীকরণের জন্য। যাই হোক এই পণ্ডিতরা কিন্তু কেউ এই কথাটার উত্তর দেননি কখন সামরিক বাহিনী ফিরে যায় বা কোন্ পরিস্থিতিতে তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানগত রাজনৈতিক মানের দুর্বলতার জন্য না হয় সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে বোঝা গেল, কিন্তু তারা ক্ষমতা দখল করার পর সেই মানের কি আর কোন উন্নতি হয়? এর উত্তর আর খুঁজে পেতে কষ্ট করার দরকার হয় না এইজন্য যে, সামরিকরা ক্ষমতা নেয়ার আগে একটি দেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যতটুকু মান উন্নয়ন করুক না কেন ওরা ক্ষমতায় আসার পর সে টুকুও ভেঙে পড়ে। তাদের শাসনে রাজনৈতিক মান উন্নয়নের কোন প্রচেষ্টা নেয়াও সম্ভব নয়। তারা নিজস্ব রাজনৈতিক প্রয়োজনেই সেই কাঠামোকে নষ্ট করে এবং নিজেদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য নিজস্ব কাঠামো তৈরি করে। তাই একটি দেশে সামরিক শাসন ও রাজনৈতিকভাবে মান উন্নয়ন পরস্পরবিরোধী হয়ে দাঁড়ায় এবং ব্যাপারটি একটি স্থায়ী দুষ্টচক্রে পরিণত হয়। এই চক্র থেকে উদ্ধার পাওয়া তখন খুবই কঠিন। হাংটিনটন অবশ্য এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটি উপায় বলেছেন তাঁর অপর একটি বই The Soldier and the State-এ। এই বইতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সামরিক বাহিনী যত বেশি সুদক্ষ, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে, সেই সামরিক বাহিনী ততই রাজনীতি বা রাজনৈতিক ব্যাপারে কম উৎসাহী হবে। তাঁর মতে সুদক্ষ, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনী তাদের গৌরব নষ্ট করতে চায় না। তারা রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে চায়।

এই দুই লেখক ছাড়াও আরো অনেক পণ্ডিত রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ বা সামরিকদের ভূমিকার ওপর গবেষণা করেছেন। এরা একটি দেশের রাজনৈতিক মান বা উন্নয়নের স্তরের ওপর অতটা গুরুত্ব দেন না। তাঁরা বলতে চান একটি সামরিক বাহিনীর নিজস্ব ব্যাকগ্রাউন্ড, চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীগত গুণাগুণ, সংস্কৃতি, চিন্তাধারা, অফিসারদের আশা-আকাঙ্ক্ষা—এসবই তাদের ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা যদি কোন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জন্মলাভ করে, তাহলে তারা সহজেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে পারে। নিজেদের প্রতিষ্ঠানগত চাহিদা মেটানোর জন্যও একটি গরিব দেশে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা নিতে পারে। আবার অনেক সময় কিছু অফিসার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্যও ক্ষমতা দখল করতে পারে। এইসব মিশ্র কারণের জন্য পণ্ডিতরা তাই সামরিকদের প্রতিষ্ঠানগত গুণাগুণের এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ওপর বেশি জোর দিয়েছেন।

www.pathagar.com

যাই হোক সামরিক শাসন যেসব দেশে রয়েছে বা যেসব দেশে সামরিক সরকার বেশিদিন ক্ষমতায় থেকেছে, তৃতীয় বিশ্বের সেইসব দেশে কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

১. সামরিকরা সহজে ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাদের একটি গোষ্ঠীগত প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ জড়িয়ে পড়ে। এই চক্র থেকে তাদের বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। সমাজে জনগণ এবং রাজনীতিবিদদের সাথে তাদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। এই দ্বন্দ্বের ফলে রাজনৈতিক নির্যাতন নেমে আসে এবং শেষাবধি এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য বেশিরভাগ দেশেই রক্তক্ষয় হয়।

২. সামরিকরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কোন সাংবিধানিক স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে পারে না। নিজেদের ক্ষমতা সংরক্ষণ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এটি আর সম্ভব হয় না। তারা নিজেদের ক্ষমতায় রাখার জন্য একটি সিস্টেম বা রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করে। এজন্য কিছু রাজনীতিবিদকেও সাথে নেয়, কিন্তু সেই সিস্টেম শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে না। ঐ সিস্টেম একটি একনায়কতন্ত্রে রূপ নেয়। কোন এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে সেই সিস্টেম তৈরি হয়—জনস্বার্থে নয়। শাসক ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরই সেই সিস্টেমের সমাপ্তি ঘটে। এমনকি একজন সামরিক নেতার ক্ষমতাচ্যুতির পর ক্ষমতায় যদি আর একজন সামরিক নেতা আসেন, তখনও তিনি পুরোনো সিস্টেম আর চালু রাখতে চায় না। তিনি তখন তাঁর নিজস্ব সিস্টেম চালু করেন, অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন বিধি ব্যবস্থা তাঁরা কায়েম করতে ব্যর্থ হন।

৩. পর নির্ভরশীলতা এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বেড়ে যায়। যদিও "উন্নয়ন" এবং "আত্মনির্ভরশীলতা" হয় সামরিকদের ক্ষমতা দখলের অন্যতম ঘোষিত লক্ষ্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামরিকদের আমলে বিদেশী সাহায্য এবং ঋণের ওপর নির্ভরতা বেড়ে যায়। এর একটি অন্যতম কারণ হলো সামরিক বাহিনীর জন্য নানা সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি সমরাস্ত্রের চাহিদা অনেক বেড়ে যাওয়ার ফলে বাজেটের একটা বিরাট অংশ সামরিক খাতে দিয়ে দিতে হয়। যেহেতু সামরিক বাহিনীই হয় ক্ষমতাধরদের মূল শক্তি, তাই তাদের খুশি রাখতে হয় সবার আগে। এর ফলে তাদের চাহিদা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি ক্ষমতাধররাও নিজদের ক্ষমতা রক্ষার্থে সেই ক্রমবর্ধিত চাহিদা মেটাতে সচেষ্ট থাকে। সামরিকরা প্রথমে ক্ষমতায় আসার পরপরই প্রথম সুযোগেই বাহিনীর বেতন ভাতা, পোশাক ভাতা থেকে শুরু করে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধি ঘটায়। ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে রাজস্ব বাজেটে সামরিক খাতে ব্যয় আগেকার বছরের রাজস্ব আয়ের শতকরা ১৩ শতাংশকে বাড়িয়ে ২৯ শতাংশ করেছিলেন। অর্থাৎ ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট বরাদ্দ যেখানে ছিল ৭৫ কোটি টাকা, সেটি বৃদ্ধি করে ১৯৭৬-৭৭ সালে ২১৯ কোটিতে নিয়েছিলেন। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায়

www.pathagar.com

আসার পর ঐ বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করে ৩৮৪ কোটি টাকায় নেয়া হয়েছে। অন্যান্য দেশের অবস্থাও তাই। পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড—এইসব দেশেই সামরিক বাজেট বিপুল আকারে বৃদ্ধি করতে হয়েছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কেবল অনুৎপাদন বা অনুন্নয়ন খাতের ৪৬ শতাংশ সামরিক বাহিনীর জন্য ব্যয় করা হয়। বাংলাদেশেও প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সবকিছু মিলিয়ে সামরিক শাসনামলে সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমান ৩০ শতাংশের কাছাকাছি হবে।

এছাড়াও নানা কারণে, বিশেষ করে শ্রেণীস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ বজায় রাখতে, দাতা সংস্থাগুলোকে খুশি রাখতে, উন্নয়নের সঙ্গে জনগণের অংশীদারিত্ব কম থাকাতে এবং সরকারকে জবাবদিহি করতে হয় না বলে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়ের মাত্রা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। দেশে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের আমদানি বাড়ে এবং এই সবকিছুর ফলে পরনির্ভরশীলতা আরো বেড়েই চলে। ইন্দোনেশিয়ার বৈদেশিক ঋণের বোঝা এখন ২২ বিলিয়ন ডলারের উর্ধ্বে; ফিলিপিনসের ১৭ বিলিয়ন ডলার এবং এদের রপ্তানি আয়ের প্রায় ২৫ শতাংশ সুদ হিসেবে পরিশোধ করতে হয়। পাকিস্তানের ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত মোট বৈদেশিক ঋণের অঙ্ক ছিল ৬৩০ কোটি ডলার, আর সেটা গত সাড়ে পাঁচ বছরের সামরিক আমলে এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৬০০ কোটি ডলারে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সীমিত হওয়ায় সামরিক বাহিনীর জন্য ব্যয় এবং অন্যান্য আরো নানা খাতের ব্যয় যদিও রাজস্ব আয় থেকে দেখানো হয়, কিন্তু সেটা আসলে মেটানো হয় বিদেশী খাদ্য এবং পণ্য সাহায্য থেকে প্রাপ্ত আয়ের মাধ্যমে। বিদেশী খাদ্য এবং পণ্য সাহায্য যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাতে অন্যান্য সঙ্কট ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার সামরিক বাহিনী এবং সরকারি অনেক কর্মচারীর বেতন দিতে সক্ষম হবে না। এসব খাদ্য এবং পণ্য বিক্রি করে সরকার যে টাকা পায় সেটাকে আমাদের আয় হিসেবে দেখানো হয় এবং কাজে লাগানো হয়। যাই হোক, এইসবের ফলে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি বিদেশী সাহায্য এবং ঋণের ওপর নির্ভরতাও বেড়ে চলে। সরকার পরিচালনার জন্য তখন এই সাহায্যপ্রাপ্তি এতটাই জরুরি হয়ে পড়ে যে, সে কারণে অনেক সময় জাতীয় স্বার্থকেও বিসর্জন দিতে হয়।

৪. যদিও অনেক সামরিক সরকার দেশকে শোষণমুক্ত এবং দেশের গরিব মানুষের সমস্যা দূর করতে নানা সংস্কারমূলক কাজ হাতে নেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। তাদের অবস্থানগত কারণে সামরিক-বেসামরিক আমলা উঠতি ধনিক শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী কোন সংস্কার তারা করতে পারে না। যেসব সংস্কার সামরিকরা আনে, তা নিজেদের এবং নিজেদের সমর্থকদের স্বার্থরক্ষা করার জন্যই আনে।

এসব কারণে দেখা গেছে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামরিক আমলে বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা, ভূমিহীনতা বা দারিদ্র্য না কমে বরং বেড়ে যায়। সত্যিকারের মূল্যে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। মাথাপিছু আয়ও কমে যায়। পাকিস্তান,

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড—এইসব দেশের সামরিক আমলের আর্থিক জরিপে এগুলো ধরা পড়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় এখনো প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। ফিলিপিনসে এবং পাকিস্তানে এরা ৫০ ভাগের কাছাকাছি। বাংলাদেশেও এরা শতকরা ৫০ ভাগের কাছাকাছি হবে।

৫. সামরিক শাসনের আর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এবং সামরিক শাসন অবশ্যম্ভাবীরূপে একনায়কত্ব সৃষ্টি করে। এ সময়ে বাক্‌স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মানুষের মৌলিক অধিকার এবং আইনের শাসন লোপ পায়। রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর চালানো হয় নির্যাতন। দেশের রাজনৈতিক কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াকে ভেঙে দেয়া হয়। রাজনৈতিক বিরোধীদের ব্যাপারে উপরোক্ত সবগুলো দেশেই মোটামুটি একই ধরনের নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। রাজনীতিবিদদের প্রতিপক্ষ জেনে তারা ঘৃণা করে, তাদের জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে, দুর্নীতিসহ নানা অজুহাতে মামলা এনে কারারুদ্ধ করে। তাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতন চালায়। অনেক সময় হত্যা করে। ঐ-সবগুলো দেশেই হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী বহু বছর যাবৎ বন্দিজীবনযাপন করেছে। ঐসব দেশে রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তিদের নানাভাবে ভয়ভীতি, লোভ, নির্যাতন করে দলভুক্ত বা স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের আত্মীয়স্বজনদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। নানা কৌশল প্রয়োগ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং প্রক্রিয়াকে নসাৎ করার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধীদেরকে তাদের শত্রু মনে করে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় পাঁচ লক্ষ রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছিল ১৯৬৫-৬৬ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের সময়। থাইল্যান্ড, ফিলিপিনসের সামরিক আইনের আমলে শত শত বিরোধী কর্মীর মৃত্যু ঘটেছে। পাকিস্তানে তো দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, ইসলামী সম্মেলনের চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফাঁসিই দেয়া হয়। বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থানে দুজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান খুন হয়েছেন। সামরিক শাসনামলে ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাবে সামাজিক জীবনে নেমে আসে অসাড়তা এবং হতাশা। সাংস্কৃতিক জীবনে চঞ্চলতা লোপ পায় এবং অপসংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। যে কৃত্রিম একটি শ্রেণী বা অর্থনীতি গড়ে ওঠে, তাদের স্বার্থে গড়ে তোলা হয় নতুন বিজাতীয় মূল্যবোধ। জাতীয় চিন্তা, চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধে আসে অবক্ষয়। মুক্ত জাতীয় চেতনার সংস্কৃতি তখন চলে যায় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনোরঞ্জন করার সীমিত গণ্ডিতে। ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপিনস এবং পাকিস্তানের দিকে তাকালে দেখা যাবে বিশ্বের দরবারে এদের কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা খুব বেশি বলা হয় না। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সামরিক শাসনের যে প্রতিক্রিয়া হয় সেটা অনেক পরে বোঝা যায়। দেশ যে কত পিছিয়ে যায় সেটা পরের জেনারেশন টের পায়। যারা ক্ষমতায় থাকে তারা এটি বুঝতে পারে না। মুক্ত পরিবেশ ছাড়া

www.pathagar.com

শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশ যে ঘটতে পারে না এটি সামরিকরা উপলব্ধি করে না। উপরোক্ত সবগুলো দেশই এইক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত করা শুরু করেছে। সার্বিক সমষ্টিগত উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক পেছনে পড়ে গেছে।

৬. সামরিক শাসনের অন্য আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, এ সময় সমাজে দুর্নীতি সকল সীমা পেরিয়ে যায়। জবাবদিহি করতে হয় না বলে সামরিক এবং বেসামরিক আমলারা নিজেদেরকে দুর্নীতির মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। যদিও দুর্নীতি উৎখাত করা সামরিক অভ্যুত্থানের একটি উদ্দেশ্য বলে প্রচার করা হয়, কিন্তু দিন যেতে না যেতে দেখা যায়, দুর্নীতির মাত্রা আগের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেউ দুর্নীতি বা অনিয়ম করলে, সে আমলাই হোক আর মন্ত্রীই হোক, জনগণ এবং সরকারের দৃষ্টিতে সেটা তুলে ধরার যে সুযোগ থাকে, এই সুযোগ সামরিক আমলে থাকে না। এই আমলে সামরিক বাহিনীর কোন সদস্য বা কোন উঁচুতলার আমলা বা মন্ত্রী সম্পর্কে কিছু বলার উপায় থাকে না। বাক্‌স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অনুপস্থিতিতে দুর্নীতি তখন আর চোরাগলিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি বেশ প্রকাশ্যেই বিস্তার লাভ করে। এর কোন প্রতিকার করা যায় না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রক্ষক ভক্ষক হলে সেই রক্ষকের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা যায়। খবরের কাগজে হেডলাইন হয়, কিন্তু সামরিক শাসনে রক্ষক যখন ভক্ষক হয় সেটা নীরবে সয়ে যেতে হয়। এই সুযোগে যারা দুর্নীতিপরায়ণ নয় তারাও লোভ সম্বরণ করতে না পেরে ঐ পথে পা বাড়ায় ও এই সীমাহীন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ সময় ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা এবং লোভের কারণে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করে অফিসাদের মধ্যে দুর্নীতি ঢুকে যায়, যার ফলে পুরো সামরিক বাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এবং জনগণের কাছে তখন তারা আগের একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয় না। এই অবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করে দেয় এবং বাহিনীর সাংগঠনিক ও নৈতিক শক্তি এবং শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে।

সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাগ্রহণ, উত্থান-পতন এবং তাদের শাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহের ধরন এবং চরিত্র মোটামুটিভাবে এক রকম হলেও কোন কোন দেশে যে ব্যতিক্রম ঘটেনি তা নয়। অনেক দেশে তারা জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে। কোন কোন দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে বিপুল পরিবর্তন এনেছে। তারপর তারা স্বউদ্যোগে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরে গেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে তারা অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতি আনতে সক্ষম হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া হলো তার একটি দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশের সামরিক অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। তাই সামরিক শাসনের সাধারণ যে বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচিত হয়েছে এদেশে সেগুলোর প্রয়োগ ও প্রতিফলনও হয়েছে ভিন্নভাবে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার উত্থান হয়েছে সিপাহী-জনতার একটি স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের মাধ্যমে, আর জেনারেল এরশাদের উত্থান ঘটেছে সুপরিকল্পিতভাবে

www.pathagar.com

ঠাণ্ডা মাথায় একটি নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে। একজন সফল জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট হয়েও জিয়াকে বিদায় নিতে হয়েছিল ঈর্ষান্বিত কিছু সামরিক অফিসারের দ্বারা একটি ষড়যন্ত্রমূলক হত্যার মাধ্যমে, কোন গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নয়। আর এরশাদকে বিদায় নিতে হয়েছিল অন্যান্য দেশের অনেক সামরিক শাসকদের মত একটি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

বাংলাদেশ খুবই গরিব একটি দেশ। কোন বছর বিশ্বব্যাংক আমাদের পৃথিবীর তৃতীয় দরিদ্রতম, কোন বছর দ্বিতীয় দরিদ্রতম আর কোন বছর দরিদ্রতম দেশ হিসেবে দেখায়। এসবই হিসেবের হেরফের মাত্র। দারিদ্র্যতায় আমাদের অবস্থানকে বুরুন্ডি আর ভূটানের সঙ্গে তুলনা করে দেখানো হয়। ওদের ওপরে থাকলে আমরা হলাম তৃতীয় দরিদ্রতম দেশ। যে স্তরে আমাদের অবস্থানকে দেখানো হয়, সার্বিক বিবেচনায় সেটি সঠিক নয়, তবে এটি নিশ্চিতভাবে সত্য যে, যদিও অনেক দিক থেকে আমরা অনেক দেশের তুলনায় এগিয়ে আছি, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে আমরা যে একটি অতি পশ্চাৎপদ দেশ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৫৪০০০ বর্গমাইল এলাকায় আমাদের জনসংখ্যা এখন প্রায় বার কোটি। এই জনসংখ্যার ৮০ ভাগই থাকে গ্রামে, আর জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। এখানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ এক বিঘার একটু বেশি, ০.৩৮ একর। ১ কোটি যুবক বেকার। মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করলে প্রায় দুই কোটি উৎপাদনক্ষম জনশক্তি এদেশে বেকার রয়েছে। তারা কর্মবিহীন জীবনযাপন করে। মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের মত অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছয় কোটির ওপর মানুষের বয়স ১৫ বছরের নিচে, যারা শিশু এবং কিশোর। সরকারিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১.৬% ধরা হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে এই হার আরো বেশি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার বজায় থাকলে ২০৩৫ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২৬ কোটিতে দাঁড়াবে। আমাদের জাতীয় সম্পদের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ আসে কৃষি থেকে, শিল্প থেকে আসে মাত্র ১২ ভাগ। আমরা রপ্তানি করে যা আয় করি, তার তিন ভাগের দুভাগ চলে যায় শুধু জ্বালানি তেল আমদানি করতে। আমাদের আমদানি রপ্তানির তুলনায় আড়াইগুণ বেশি, অর্থাৎ ১০০ টাকার জিনিস রপ্তানি করলে ২৫০ টাকার জিনিস আমদানি করি। এর মানে হলো, জাতীয় অর্থনীতিতে আমাদের বেজায় ঘাটতি। আর এই ঘাটতি পূরণ করতে হয় অন্যের কাছ থেকে ভিক্ষা এনে।

উন্নয়ন কর্মসূচি বা বাজেটে আমাদের জাতীয় হিস্যা দেখানোর জন্য নানা কলাকৌশলে আমরা আমাদের রাজস্ব বাজেটকে উদ্বৃত্ত দেখাই। আসলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে আমাদের কোন হিস্যা থাকে না। এটি পুরোপুরি নির্ভর করে বিদেশী ঋণ-সাহায্যের ওপর। এই কর্মসূচিতে আমরা যে টাকা বরাদ্দ দেখাই সেটা বিদেশ থেকে আনা খাদ্য এবং পণ্য বিক্রির টাকা থেকে দেখানো হয়। ওটা আমাদের কোন অর্জিত বা উৎপাদিত সম্পদ নয়। ১৯৭৯-৮০ সালের উন্নয়ন বাজেটে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ শতকরা ১০০ ভাগেরও ওপরে ছিল যদিও আমরা উন্নয়ন বাজেটে শতকরা ২৬ ভাগের মত আমাদের হিস্যা দেখিয়েছি। উন্নয়ন বাজেটের অনেক প্রকল্পের সাথে জাতীয় উন্নয়নের কোন সম্পর্ক

www.pathagar.com

থাকে না। তাছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ৯০ ভাগই দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ এবং শহরের একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থেই প্রণয়ন করা হয়, জাতীয় স্বার্থের জন্য নয়। উন্নয়ন বাজেটের খুব অল্প পরিমাণ অর্থ, বড়জোর শতকরা ৩ ভাগ গ্রামের দরিদ্রের জন্য ব্যয় করা হয়। বাকি ৯৭ ভাগই ঢাকা এবং শহরের একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে ব্যয় হয়।

বিদেশী সাহায্যের ওপর আমাদের নির্ভরতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ঋণ সাহায্য বাবদ বাংলাদেশ ৬০০ কোটি ডলারের ওপরে পেয়েছে এবং আরো প্রায় ৩০০ কোটি ডলারের মত পাইপলাইনে ছিল। ১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ যে ঋণ নিয়েছে তার মাথাপিছু বোঝা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৩ ডলার অর্থাৎ ১০০০ টাকার মত। সামরিক সরকার আসার পর ১৯৮২-৮৩ সালের বাজেটে বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরতা আরো বেড়ে গেছে এবং এটি ক্রমশ বাড়তেই থাকবে, কারণ আগেই বলেছি। এর ফলে আমাদের অর্থনীতি পুরোপুরিভাবে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়বে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সামরিক রাজনীতির সীমাবদ্ধতা

এবার আসা যাক আরো একটি বিষয়ের দিকে, যেটাকে আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমাদের দেশের জন্য আমরা যত আশা নিয়ে বুক বাঁধি না কেন, যত সংস্কারের কথা চিন্তা করি না কেন, যত পরিকল্পনা গ্রহণ করি না কেন, শ্রেণীগতভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে বা নিজেদেরকে যতই কর্মক্ষম বা দেশপ্রেমিক ভাবি না কেন, এদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে দেশের রাজনৈতিক গতিধারার ওপর। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা কোন্ রাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন করেছি, কতটা পরিপক্বতার পরিচয় দিতে পারি, তার ওপরই সবকিছু নির্ভর করবে। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, প্রগতি, স্থিতিশীলতা নির্ভর করবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মপন্থার ওপর। দেশের রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক কাঠামো এবং তার পরিচর্চা ও পরিচর্যার ওপর।

আমি আগেই আলোচনা করেছি যে নির্বাচনের মাসখানেক আগে লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল এরশাদ গণতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্য ঘোষণা করে দেশের প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর জন্য একটি সাংবিধানিক ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। নির্বাচনের ঠিক পরপরই তিনি একটি বিবৃতির মাধ্যমে এই ভূমিকা পুনরায় উত্থাপন করেন। কিন্তু ২৪ মার্চ সামরিক অফিসাররা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সংবিধানকে উপেক্ষা করে পুরোপুরিভাবেই ক্ষমতা দখল করে নেয়। এই ক্ষমতা দখলের সময় তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ভিন্নভাবে ব্যক্ত করেন এবং কোন সাংবিধানিক ভূমিকার কথা বা সাংবিধানিক ভূমিকার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য ক্ষমতা দখল করেছেন, সেকথা বলেননি। এর মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের জন্য একটি অসাংবিধানিক ভূমিকা রচনা করেন, শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের জন্যই সংবিধানকে অমান্য করে রাষ্ট্র পরিচালনার পুরো দায়িত্ব নিজেরাই নিয়ে নিলেন।

www.pathagar.com

যদিও তাঁরা ক্ষমতাগ্রহণের প্রথম দিন থেকেই বলতে থাকেন যে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল করার মূল লক্ষ্য হলো দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকার কথা আর উল্লেখ করেননি। ১৯৮৩ সালের ৩০ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশে জেনারেল এরশাদের দেয়া ভাষণেও দেশের ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামরিক অফিসারদের কি ভূমিকা হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। বরং তিনি যে জাতীয় পরিষদের কথা প্রস্তাব করেন সেখানে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কিন্তু সরকারের নতুন শিক্ষানীতি বর্জন এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে ঢাকায় ছাত্র বিক্ষোভ অতি দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। সামরিক নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ সালে ঢাকার ছাত্রদের ওপর শুধু গুলিই চলেনি, আইন প্রয়োগকারীরা সেদিন সন্ধ্যায় সান্ধ্য আইন জারি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ এক নির্মম হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে। এর আগেও ছাত্রদের ওপর হামলা হয়েছে অনেক, কিন্তু কোন সরকার আগে কখনো এত নৃশংসতার পরিচয় দেয়নি। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরাও এত হিংসাত্মক এবং বর্বরতার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রাণ কেড়ে নেয়নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণকে এত কলুষিত করেনি। ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে এর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভ হয় এবং সেদিনও একই ঘটনা ঘটে। অনেক ছাত্র-যুবক এই দুই দিনে প্রাণ হারায় এবং শত সহস্র ছাত্র-শিক্ষক-জনতা আহত হয়। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। এই ঘটনার পর কোন আইনগত ক্ষমতা ছাড়াই সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। প্রায় সাড়ে তিন মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল, যা এর আগে কোনদিন ঘটেনি। এর ফলে সারা দেশব্যাপী ছাত্রদের প্রায় একটি পুরো শিক্ষাবছর নষ্ট হয়। এ ব্যাপারে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা একটি নজিরবিহীন ঐক্য এবং আন্দোলন গড়ে তোলেন যেটা আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপরোক্ত ঘটনার পর ১৮ ফেব্রুয়ারি জেনারেল এরশাদ বলেন, "আমরা গণতান্ত্রিক এবং মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ... আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাই। আমরা এমন এক ব্যবস্থা চাই যেখানে সরকার পরিবর্তনে গুপ্তহত্যা বা রাজনৈতিক বিক্ষোভের প্রয়োজন হবে না।" এই ভাষণের মাধ্যমে তিনি ১৯৮৪ সালের শীতকালে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলেন এবং সীমিত সময়ের মধ্যে সংবিধানের এইসব মৌলিক সমস্যার সমাধানের জন্য একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা এবং সংলাপ শুরু করবেন বলে ঘোষণা করেন। একটি সুষ্ঠু এবং নির্ভরশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য দেশের সকল সংগঠন ও দলের সাথে আলোচনা শুরু করার কথা বলেন। সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাগ্রহণের বর্ষপূর্তির শুভলগ্ন থেকে এই জাতীয় সংলাপ শুরু করার কথা ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ১ এপ্রিল ১৯৮৩ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঘরোয়াভাবে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার অনুমতি দেয়া হয়।

www.pathagar.com

গোষ্ঠী এবং শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার চিরন্তন নিয়মানুযায়ী সামরিকরা চেষ্টা করে যতদিন পারে ক্ষমতায় থাকতে। সীমিত ঘরোয়া রাজনৈতিক অধিকার আদায় করার জন্য ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি যখন রক্ত দিতে হয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সেনাপ্রধানের ব্যক্ত ইচ্ছার ব্যতিক্রম তখনই ঘটে যায়। সামরিকরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে তেমন নজির নেই বললেই চলে, বরং ১৯৭১ সালে নির্বাচনের ৩ সপ্তাহের পরও পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা কি ব্যবহার করেছে সেই দৃষ্টান্ত আমাদের কারো ভুলে যাওয়ার কথা নয়। ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য শুধু গণহত্যাই সংঘটিত করেনি, নিজেদের দেশকে পর্যন্ত দুটুকরো করে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। আর এখানে সঙ্কটের দানা তো আগে থেকেই বাঁধা ছিল। ভবিষ্যতের যে কোন রাজনৈতিক সমাধানে সেনাবাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ইয়াহিয়া খানের এই ধরনের কোন দাবি ছিল না, কিন্তু তবুও পাকিস্তানের সাংবিধানিক সমস্যার সমাধান হয়নি।

এমনিতেই সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্র উত্তরণের সমস্যাই একটি বিরাট সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা, তার ওপর আবার সেনাবাহিনীর জন্য সাংবিধানিক ভূমিকার দাবি সমস্যাটিকে আরো জটিল এবং ভয়াবহ করে তুলতে পারে। তবে জেনারেল এরশাদ ইস্যুটিকে খোলাখুলি জনসমক্ষে উপস্থাপন করে একদিক থেকে ভালই করেছেন। দেশবাসী, বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের অজ্ঞাত থাকল না, সত্যিকারের সঙ্কটটি কোথায় এবং সামরিকরা প্রকৃতই কি চায়।

বাংলাদেশ, বলতে গেলে, পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ। জনসাধারণের জীবনমান এখানে অনুন্নত এবং তাদের বেশিরভাগ নিরক্ষর, সামরিক অফিসাররা এখন ক্ষমতাসীন—এসবই বাস্তব সত্য। ক্ষমতায় যারা থাকে রাজনৈতিক বল তাদের কোর্টেই থাকে। ক্ষমতাসীনদের প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, দেশাত্মবোধ এবং দূরদর্শিতা যেমন দেশে একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারে, ঠিক তেমনি তাদের নির্বুদ্ধিতা, অনভিজ্ঞতা, গোষ্ঠীস্বার্থপরতা বা অদূরদর্শিতা জাতির জন্য চরম দুরবস্থা বয়ে নিয়ে আসতে পারে। আর যেখানে সামরিক অফিসাররা ক্ষমতায়, সেখানে রাজনৈতিক পরিবেশ আরো সঙ্কটাপন্ন, কঠিন এবং জটিল আকার ধারণ করে। এর থেকে উত্তরণের উপায় কি? সামরিকরা কিভাবে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে পারে?

নৈতিকভাবে, নীতিগতভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে দেশ পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর কোন সাংবিধানিক ভূমিকা দেশের কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নেতা বা সংগঠনের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং সংঘাত অনিবার্য এবং সেই সংঘাতে আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অনিশ্চয়তার মধ্যেই থেকে যাবে। দেশে আন্দোলন যেমন হবে, নির্যাতন এবং নিষ্পেষণও তেমন চলবে—এই সংঘাত নিরসনের জন্য, সামরিকদের মানসিকতা এবং গোষ্ঠীস্বার্থ সম্পর্কে যাঁদেরই জ্ঞান আছে তাঁরাই জানেন যে, শেষ পর্যন্ত সামরিক অফিসাররা তাদের নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থের প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকারকে ভিত্তি করেই এগিয়ে যাবে। এই সাংবিধানিক সমস্যা বা সংঘাতকে নিরসন করতে গিয়ে তাদের কাছে গোষ্ঠীস্বার্থ

www.pathagar.com

তখন জাতীয় স্বার্থ হিসেবে মনে হবে এবং তাদের তখন এই মনোভাব জন্মাবে যে তারা জাতীয় স্বার্থেই সবকিছু করছে। সেটা করতে গিয়ে তারা অনেকটা গায়ের জোর খাটাতে চাইবে। তারা সামরিক আইনের অধীনে সংবিধানকে সংশোধন করে তাদের সেবাদাস কিছু আমলা, ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক ব্যক্তির সাহায্য, সহায়তা এবং সমর্থনে হয়তো শেষ পর্যন্ত একটি নির্বাচন করবে, কিন্তু তাতে দেশের স্থিতিশীলতা আসবে না, বিদ্যমান সাংবিধানিক সঙ্কটেরও নিরসন হবে না। যদি আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে, তাহলে সেনাবাহিনী ক্ষমতা ছেড়ে দিলেও কয়েক বছর পর অন্য আর একদল সামরিক অফিসার আবার ক্ষমতা দখল করবে। তাই সাময়িকভাবে গণতন্ত্র ফিরে এলেও সাংবিধানিক সঙ্কট থেকেই যাবে—দেশে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। অভিজ্ঞতাই বলে দেয় যে, অনুন্নত দেশে যেখানে সামরিকরা একবার ক্ষমতায় এসেছে সেখানেই তারা বার বার ক্ষমতায় এসেছে। বড় বড় পণ্ডিতরা এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করে এই কথাই বলেছেন যে, বাংলাদেশেও সেটা হওয়ার সম্ভাবনা সবসময় থাকবে যদি না সকল রাজনৈতিক দল বা দলের নেতৃবৃন্দরা সতর্ক থাকেন এবং বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করেন। সামরিক উত্থান বা শাসনের একমাত্র বিকল্প হলো একটি চলমান প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের বিকাশ।

দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বা প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকা থাকার অর্থ হলো ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে সবসময় সামরিকরাই মুখ্য ভূমিকা পালনকারী হিসেবে থাকবে। একবার ক্ষমতা ভোগ করার পর তাদের পক্ষে কোন কম গুরুত্বপূর্ণ বা রাজনীতিকদের অধীনে অধঃস্তন ভূমিকায় যাওয়াটা মুশকিল হয়ে পড়ে। অংশীদারিত্বের যদি প্রশ্ন হয় তাহলে সামরিক বাহিনীর পক্ষে জুনিয়র পার্টনারের ভূমিকা নেয়া কঠিন। ক্ষমতার বন্দোবস্তটাই এমন এক জিনিস যে, ক্ষমতার বলয়ে ঢুকে বন্দুকের জোরে শেষ পর্যন্ত যে কোন ধরনের অংশীদারিত্ব তৈরি করা হোক না কেন, সামরিকরাই প্রধান অংশীদার হিসেবে থেকে যাবে বা আত্মপ্রকাশ করবে অর্থাৎ জাতীয় কার্যপ্রণালীতে তারাই হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল শক্তি। এর থেকে গৌণ ভূমিকায় যদি তাঁরা খুশি হতেন তাহলে ২৪ মার্চ তাঁদের ক্ষমতা দখল করার প্রয়োজন হতো না। বিচারপতি সাত্তার যে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করেছিলেন তার মাধ্যমেই সামরিকরা যথেষ্ট প্রভাব এবং ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারতেন। তবে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক কারণে যদি গৌণ ভূমিকা গ্রহণও করতে হয় সেটা হবে সাময়িক। কিছুকাল পরেই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করার তাগিদ তাদের মধ্যে দেখা দেয়াটাই হবে স্বাভাবিক। সুতরাং দেশের প্রশাসনে সেনাবাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকায় ভাষা যাই হোক না কেন গণতান্ত্রিক সমাজে বা যে দেশের মানুষ গণতন্ত্র চায়, সে দেশে ব্যাপারটা অত সহজে মীমাংসা হওয়ার কথা নয়।

একেবারে একটি চরম অবস্থায় পৌঁছানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেনাবাহিনী তাদের সাংবিধানিক ভূমিকার প্রশ্নে অটল থাকবে। আগেই বলেছি প্রয়োজন হলে জোর করেই সামরিক আইনের অধীনে সংবিধানকে সংশোধন করে তারা সেটা করবেন। যার অপর অর্থ হলো দেশের রাজনৈতিক প্রশাসনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা চলতেই থাকবে এবং দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়

www.pathagar.com

বা প্রশাসনে সম্পৃক্ত থাকলে আরো যেসব প্রতিক্রিয়া এবং সামাজিক সংঘাত এবং অস্থিরতা সাধারণত ঘটে সেগুলো ঘটারও সম্ভাবনা প্রকটভাবে থেকে যাবে: (১) সামরিক বাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো সবার অলক্ষ্যে নিজেদের অনুপ্রবেশ ঘটানোর (infiltrate) চেষ্টা করবে এবং সেনাবাহিনীতে গ্রুপিং এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ হবে; (২) সেনাবাহিনীর অফিসাররা দুর্নীতির আশ্রয় নেবে, ফলে সমাজে তাদের ইমেজ নষ্ট হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেনাবাহিনী জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হবে; (৩) জুনিয়র অফিসার এবং জওয়ানদের ওপর বিশেষ কয়েকটি রাজনৈতিক দল প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করবে, এবং তাতে তাদের দ্বারা সিনিয়র অফিসারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা থাকবে। এ কারণে সেনাবাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হবে এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা লোপ পাবে।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া যায় যে দেশে এমন একটি নির্বাচিত সরকার কায়েম হলো যাতে গৌণ অথবা মুখ্য অংশীদার হিসেবে সামরিক বাহিনীর জন্য একটি সাংবিধানিক ভূমিকা রয়েছে। যেহেতু পরিবেশটি গণতান্ত্রিক, তাই পার্লামেন্ট থাকবে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে, মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সেগুলো প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রিমকোর্টের এখতিয়ার থাকবে। সেইরকম একটি পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে এবং সেনাবাহিনীকে সেগুলোর সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে: (১) জনসভা, সমালোচনা এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে রাজনীতিক বা রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি সামরিক বাহিনীকে সাধারণ মানুষের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে; এবং (২) সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ সমস্ত কর্মকাণ্ড প্রকাশ্য জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে এবং সাধারণ আদালতের এখতিয়ারভুক্ত হবে। এ ধরনের একটি পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর স্বাতন্ত্র্য, শৃঙ্খলা এবং মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হবে এবং জাতীয় নিরাপত্তা দারুণভাবে ব্যাহত হবে। বলাই বাহুল্য এরকম অবস্থা কোন জাতির জন্য কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না, অর্থাৎ একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সেনাবাহিনীর সাংবিধানিক অংশীদারিত্ব শুধু পরস্পরবিরোধীই নয়, একইসঙ্গে অসম্ভব, অকার্যকর এবং আত্মঘাতী হবে। এতে সামাজিক শক্তিসমূহের বিরাজমান ভারসাম্য ও সৌহার্দ্য নষ্ট হয়ে সংঘাত বৃদ্ধি পাবে যে কারণে সমাজে নৈরাজ্য ও অস্থিরতা প্রকট আকার ধারণ করবে। সেনাবাহিনী এই প্রক্রিয়ায় পুরোপুরিভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে যাবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং এই দেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, চর্চা, সংস্কৃতি এবং মানুষের মনমানসিকতার কারণে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা কোনদিনই কায়েম করা সম্ভব হবে না। তাই শুধু ক্ষমতা দখল করার ক্ষেত্র তৈরি এবং ঐ কাজে সেনাবাহিনীর সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের কথা এরশাদ বারংবার উল্লেখ করলেও ক্ষমতা দখলের পর এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, বিষয়টিকে তখন ইচ্ছা করেই ভুলে যাওয়া হয়েছিল। এটি ছিল কার্যোদ্ধারের পর অঙ্গীকারের বিষয় পুরোপুরি বিস্মিত হওয়ার এরশাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আরও একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৬

আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

হাজার বছরের শোষণ আর গ্লানি, আর এই করুণ দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও বাংলাদেশের মানুষ একটি বিশেষ চেতনাবোধের অধিকারী। স্মরণকালের ইতিহাসে দশম এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অল্পক্ষণের জন্য স্বাধীনতা ভোগ করা ছাড়া এদেশের মানুষ আধিপত্যবাদের দ্বারাই শোষিত হয়েছে। এমনকি সিরাজউদ্দৌলা যাঁকে আমরা বাংলার শেষ নবাব বলে আখ্যায়িত করি, গর্ববোধ করি যে তিনি বাংলার স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তিনিও বাঙালি ছিলেন না। তিনি তাঁর নবাবী রক্ষা করার জন্যই যুদ্ধ করেছিলেন। তাই বাংলার মানুষ শুধু দু'শ বছর ইংরেজদের আমলেই গোলামি করেনি, এই বঞ্চনা এবং গোলামির ইতিহাস হাজার হাজার বছরের। আর বাঙালি মুসলমান হিসেবে রাষ্ট্রীয় কাজে আমাদের অস্তিত্ব কোনদিন ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ই সর্বপ্রথম বাঙালি মুসলামান হিসেবে এদেশের মানুষের মনে অধিকার আদায়ের জাগরণ আসে, মানুষ হিসেবে বাঁচার আত্মপ্রত্যয় জন্মায়। এদেশের কৃষকের ছেলেরা শহরে এসে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন ভীত রচনা করে। রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সাথে সাথে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা প্রতিষ্ঠা করে।

তাদের এই গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ থেকেই জন্মলাভ করে ভাষা আন্দোলন। যতই নির্যাতন বেড়েছে এদেশের মাটি ততই উত্তপ্ত হয়েছে। রাজনীতিকরা বা ক্ষমতাধররা যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বা সাথে থাকতে পারেনি তাদেরকে পেছনে ফেলে বা উৎখাত করে মানুষ এগিয়ে গেছে। ১৯৫২, ৫৪, ৬২, ৬৬, ৬৮-৬৯-এর আন্দোলন এই অগ্রযাত্রার সাক্ষ্য বহন করে। তারপর আসে ১৯৭১। এখনো ভাবলে অচিন্তনীয় ব্যাপার বলে মনে হয়, যে বাঙালিরা কোনদিন যুদ্ধ করেনি তারাই কিনা অস্ত্রধারণ করে দেশ স্বাধীন করেছে। বন্দুকের নল দিয়ে একটি স্বাধীন দেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করেছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আদর্শ এবং মূল্যবোধ এই জাতির আগামী হাজার বছরের ইতিহাসের মূল ভিত্তি হিসেবে থাকবে। নেতারা ব্যর্থ হয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে, সংবিধান অকার্যকর হয়ে যেতে পারে, রাজনৈতিক কর্মীরা পথভ্রষ্ট হতে পারে, এমনকি স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী শক্তিরা ঘটনাক্রমে ক্ষমতাধরও হতে পারে। সে যাই হোক না কেন, আমার মতে, তা হবে ক্ষণস্থায়ী এবং তাতে এদেশের মানুষের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে না। স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মদানে

www.pathagar.com

যে চেতনার বীজ ছিল সেই চেতনাবোধ থেকেই যাবে। এদেশের ভবিষ্যতের সমস্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সেই চেতনাই হবে মূল শক্তি। যদি কোন সময় ভারত বা তাদের সেবাদাসরা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব খর্ব করতে চায়, তখনও সেই চেতনাবোধই কাজ করবে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরকম একটি রাজনৈতিক সাফল্য পৃথিবীর খুব কম মানুষই অর্জন করতে পেরেছে। হাজার বছরের শোষণ, বঞ্চনা আর নির্যাতনের ফলে আমাদের মানুষ হয়ে উঠেছে আবেগপ্রবণ, ক্রুদ্ধ এবং অস্থির। দারিদ্র্যের কষাঘাতে তাদের মন হয়ে রয়েছে তিক্ত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের হতাশা আরো বেড়েছে। ভূমিহীনদের সংখ্যা বেড়ে শতকরা ৫৫ জনে দাঁড়িয়েছে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। মাথাপিছু জমি ১৯৭৪ সালের ০.৪৭ একর থেকে আরো কমে এখন এসে দাঁড়িয়েছে ০.৩৮ একরে। বেকারের সংখ্যা, নিরক্ষরের সংখ্যা, পুষ্টিহীনতার মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। এসবের প্রতিক্রিয়া দেশের রাজনৈতিক জীবনে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। যে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে এদেশের মানুষ বছরের পর বছর সংগ্রাম করেছে, আন্দোলন করেছে, রক্ত দিয়েছে, সেই আওয়ামী লীগের নেতারা হাজার বছর পর পাওয়া স্বাধীনতার মূল চেতনা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য তাদের কাছ থেকে যে ত্যাগ এবং মননশীলতা মানুষ আশা করেছিল সেটা তারা পায়নি। নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেরাই ডুবে থাকলেন। জাতিকে পুনর্বিন্যাস করার জন্য সুদূরপ্রসারী কাজে হাত না দিয়ে তাৎক্ষণিক কাজে হাত দিলেন। তাঁদের অপরিণামদর্শিতার জন্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। ব্যক্তিগত লোভ সামলাতে না পেরে ও নেতাকর্মীদের মন তুষ্ট রাখতে তাঁরা পুরোনো কাঠামো ধরে এগিয়ে গেলেন। তাঁরা জনগণের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন। যে গণতান্ত্রিক সচেতনতার ওপর ভিত্তি করে দেশকে স্বাধীন করা হয়েছে তা স্তব্ধ করার চেষ্টা করলেন। দেশে একদলীয় একনায়কত্ব শাসন কায়েম করলেন। দেশের মানুষ সেটা মানেনি। ফারুক, রশীদ, ডালিম, নূর—এরা সেই সুযোগ নিয়ে অস্ত্র দিয়ে জাতির জনককে খুন করে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পথ যেখানে রুদ্ধ, সেখানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পথ তো ভায়োল্যান্স বা সংঘাতের মধ্য দিয়েই আসা স্বাভাবিক। এটি সবসময় সব দেশেই হয়ে এসেছে। একথা কারো অজানা থাকারও কথা নয়। তারপর এলেন খন্দকার মোশতাক। কিন্তু সামরিক বাহিনীর মধ্যে দ্বৈতশাসনের যে সমস্যা তখন দেখা দিয়েছিল, তার সমাধান করতে পারলেন না। খালেদ মোশাররফ তার সমাধান করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। আবির্ভাব হলো জিয়াউর রহমানের। ১৯৭১ সালের মেজর জিয়া, যিনি স্বাধীনতাযুদ্ধের সনদ ঘোষণা করেছিলেন চট্টগ্রাম বেতার থেকে। দেশে সামরিক শাসন থাকলেও জিয়া তার সুযোগ খুব কম নিলেন। স্বাধীনতাযুদ্ধে ছিলেন বলে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাল বুঝতেন। মিলিটারি শাসন এদেশের মানুষ পছন্দ করে না—এটি তিনি জানতেন। এরকম একটি গরিব দেশে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা অত সহজ নয়, কিন্তু অন্তত কথা বলার স্বাধীনতা দিলে কিছুটা ক্ষেদ কমবে। মানুষের অস্থিরতা এবং তিক্ততা একটু কম হবে। মানুষ ভায়োলেন্সের দিকে পথ ধরবে না। তাই জিয়া দেশে রাজনৈতিক

www.pathagar.com

প্রক্রিয়া চালু রাখলেন এবং সামরিক শাসন তুলে নিয়ে একটি সাংবিধানিক সরকার কায়েম করলেন। প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থা হলেও দেশের মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করলেন। বাক্‌স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আর আইনের শাসন অর্থাৎ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আবার কায়েম করলেন। দেশের মানুষ খুশি হলো। আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করে দেশের মানুষ জিয়াকে ভোট দিল। জিয়ার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের রাজনৈতিকভাবে রাজনীতি দিয়ে কাজের মাধ্যমে মোকাবেলা করার একটি সাফল্যজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। জিয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে পেরেছিলেন এবং তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেশকে ক্রমান্বয়ে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেত। একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো আরো সুদৃঢ় করা যেতে পারত। দেশের সনাতনী রাজনৈতিক দলগুলো যা করতে পারেনি, জিয়া তাই করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

কিন্তু সামরিক বাহিনীর কিছু মুক্তিযোদ্ধা অফিসার জিয়াকে নির্মমভাবে হত্যা করে। দেশের জন্য নয়, নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য। সামরিক বাহিনীর মূল সংগঠন তখন জনগণ, সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক সরকারের পাশে এসে দাঁড়ায়। ছয় মাসের মধ্যে ১৫ নভেম্বর ১৯৮২ সালে নির্বাচন হয়। প্রত্যক্ষ ভোটে দেশের মানুষ নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করল। ৮৫ লক্ষ ভোটে আওয়ামী লীগের ড. কামাল হোসেন ভাল প্রার্থী হয়েও পরাজিত হন। দেশের মানুষ গণতন্ত্র চেয়েছে, কিন্তু আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করতে পারেনি। তাই জিয়ার প্রতি তাদের সমর্থনকে প্রকাশ করার জন্য সাত্তারকে ভোট দিয়েছে দেশে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকার নিশ্চয়তার প্রত্যাশায়।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ৫ দিনের দিন সামরিকপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিবিসিতে এক সাক্ষাৎকারে দেশ পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর একটি ভূমিকা থাকতে হবে বলে জানালেন। এর ৮ দিন পর দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সাথে এক বৈঠকে তিনি লিখিতভাবেই সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকার কথা বিশ্লেষণ করলেন। আর এর ১১৫ দিনের মধ্যে ২৪ মার্চ ১৯৮২ সালে দেশের প্রধান সামরিক অফিসার একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে। সব সামরিক সরকার যে পদ্ধতি এবং বক্তব্য সাধারণত তুলে ধরে প্রায় ঠিক একই বক্তব্য দেয়া হয়। "সরকার অযোগ্য, অক্ষম এবং দুর্নীতিবাজ; দেশের অর্থনীতি ভেঙে গেছে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। মানুষের মনে এসেছে হতাশা এবং অনিশ্চয়তা। দেশের সার্বিক মঙ্গল, মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আর গণতন্ত্র কায়েম করার জন্য সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাগ্রহণ করতে হয়েছে। তাঁরা সামরিক শাসন চায়নি, কিন্তু দেশের জনগণের ইচ্ছায় তারা ক্ষমতাগ্রহণ করেছেন।"

সেদিন ছিল ২৪ মার্চ। আর আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো ১৪ নভেম্বর। ক্ষমতা দখলকারী সামরিকরা যে সরকারকে অযোগ্য, অক্ষম, দুর্নীতিবাজ বলেছে, আমি সেই সরকারের সদস্য ছিলাম না, বরং সাত্তারের মনোনয়নের বিরোধিতা করার অভিযোগে আমাকে জাতীয়ভাবে বিদ্রোহী গ্রুপের নেতা আখ্যায়িত করা হয়েছিল। জিয়াউর রহমানের শেষ সরকারের সদস্য

www.pathagar.com

আমি ছিলাম না। আমি জিয়াউর রহমানের সরকার ত্যাগ করি ২ জানুয়ারি ১৯৮০ সালে, তাঁর মৃত্যুর প্রায় দেড় বছর আগে আর সামরিক অভ্যুত্থানের প্রায় সোয়া দুবছর আগে। সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পরপরই সরকার যাদের মনে করেছেন নানা অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করেছে। বলাবাহুল্য যারা সত্যিকারের দুর্নীতিবাজ তাদের মধ্য থেকে খুব কম লোককেই ধরা হলো। তারা সব দিব্যি বহাল আছে, সবকিছু ভোগ করেই চলেছে। যাই হোক সামরিক শাসনের প্রথম দুয়েক মাস সব দেশেই এরকম হয়। অনেক ধরপাকড় হয় নানা ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত কারণে।

কিন্তু আমি যখন গ্রেপ্তার হই তখন আমার সরকার ত্যাগ করার সময় হবে পৌনে তিন বছর এবং সামরিক শাসনের প্রায় ৮ মাস। আমার সময় মন্ত্রিত্ব ছেড়েছে এমন কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। দুদিন পরে "সংবাদ" কাগজে দুর্নীতির অভিযোগগুলো বেরুলো। প্রথমটি হলো যেটা এফআইআর-এ ছিল না, কিন্তু পরে দিয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে যে, আমি ইস্ট-ওয়েস্ট ইন্টারকানেক্টর স্থাপনে সরকারের বিপুল অর্থের ক্ষতিসাধন করেছি। দ্বিতীয়টি হলো, আমি একটি পরিত্যক্ত বাড়ির দলিল জাল করে সেই বাড়ির দখল নিয়েছি। তৃতীয়টি, আমি সরকারি গাড়ি অপব্যবহার করেছি। চতুর্থটি, আমি অন্যায়ভাবে প্রায় ৭০০ টেলিফোন লাইন দিয়েছিলাম যখন আমি চার বছর আগে টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ছিলাম। পঞ্চম, আমার সম্পত্তির সঙ্গে আয়ের সঙ্গতি নেই। খবরের কাগজে খুব ফলাও করে নানা রকমের শব্দ ও রঙ চড়িয়ে এইসব অভিযোগ ছাপানো হলো এবং সারা দেশবাসীর কাছে আমার চরিত্র হনন করা হলো।

খারাপ লেগেছে এইজন্য নয় যে আমাকে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে বা গ্রেপ্তার করল রাজনৈতিক কারণে অথচ খবরের কাগজ ছাপালো দুর্নীতির অভিযোগ। দুঃখ লেগেছে অন্য একটি কারণে। নিজেকে নিয়ে মনে মনে একটি গর্ব ছিল যে পাবলিক লাইফে আমাকে কোন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়নি। আমার বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতির অভিযোগ কেউ তুলতে পারেনি। চুলচেরা বিচার করে চলেছি। বিশেষ করে আর্থিক ব্যাপারে। মানুষকে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন কিছুর বিনিময়ে নয়। আমার কোন ভাই, বোন বা আত্মীয়স্বজন আমার দ্বারা আর্থিকভাবে উপকৃত হয়নি। তারা আসতই না। ছোটখাটো ব্যাপারেও আমি খুব সজাগ থাকতাম বলে হাসনাও অনেক সময় রাগ করেছে। কবি জসীমউদ্দীন মারা যাওয়ার পর থেকে কমলাপুরের টেলিফোন অর্থ অনাদায়ে বন্ধ ছিল। বকেয়া পরিশোধ ছাড়া পুনরায় লাইন দিতে আমি অস্বীকৃতি জানাই। এত বড় একজন কবির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার খাতিরে এটি করা যেত। ক্ষমতাও ছিল। কিন্তু দেইনি। অনেক মাস পর কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করার শর্তে লাইন দেয়া হয়েছিল, যেটা নিয়মের মধ্যে ছিল। প্রতি শুক্রবার রাতে আম্মাকে পরিবাগের শাহ সাহেবের মাজার থেকে কায়েতটুলীতে পৌঁছানোর দায়িত্ব ছিল আমার ওপর অনেক বছর থেকে। সরকারে যোগ দেয়ার পর যতদিন আমাদের নিজস্ব গাড়ি ছিল সমস্যা ছিল না, কিন্তু আসিফের চিকিৎসার জন্য ওটা বিক্রি করার পর কত চিন্তা করেছি

www.pathagar.com

আম্মা সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন কিনা, এক থেকে দেড় মাইলেরও পথ নয়। শেষ পর্যন্ত আইনে দেখলাম আমার ওপর যেহেতু তিনি নির্ভরশীল ছিলেন, তিনিও গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন। এরকম আরো কত ছোটখাটো ঘটনা দেখতে হয়েছে। একদিন বিদ্যুৎবোর্ড একটি শীতাতপ যন্ত্র লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। পরের দিনই সেটা খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলাম। আমি খুব রাগ করেছিলাম। আমার আগের কেনা তিনটা শীতাতপ যন্ত্র বাড়িতে লাগানো হয়েছিল। বিদ্যুৎ বিভ্রাটে এর মধ্যে একটি পুড়েও গিয়েছিল। একেবারে নতুন মেশিন দাম ছিল ২৫ হাজারের মত। তবুও বোর্ডের মেশিন আমি ব্যবহার করিনি।

তারপর দলের জন্য চাঁদা তুললাম না, কেননা চাঁদা তোলার বিনিময়ে কিছু না কিছু একটি করতেই হতো। একটি অবলিগেশনে যেতে হবে তাই। আর হাজার সৎ থাকার চেষ্টা করলেও মানুষ দুর্নাম করার সুযোগ পাবে। এটি নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে মন কষাকষি, ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। উনি এও অভিযোগ করেছিলেন যে আমি দলকে ভালবাসি না। এরপর মানুষ অনেক সময় আমাকে টাকাও সেধেছে, কিন্তু আমি নেইনি। কারণ কিসের জন্য তারা দিতে চাইছিল সেটা আমি জানতাম। দলের জন্য টাকা দিচ্ছে বলেও অনেকে সেধেছে, কিন্তু নেইনি। অনেক সময় কোন একটি কাজ বা ব্যবসা পেয়ে যাওয়ার পর দলের জন্য টাকা দিতে এসেছে কেউ কেউ, কিন্তু নেইনি। লন্ডনে যখন আসিফের চিকিৎসা চলছে তখন ইস্ট-ওয়েস্ট ইন্টারকানেক্টরের ব্যবসায় জড়িত প্রতিদ্বন্দ্বী দেশী-বিদেশী দুটো দল বান্ডিল করে এনে টাকা সেধেছে, নেইনি। হাসনা জানে আমি কিভাবে কত অনুরোধ করে ওদের ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তবে আমি রাজনৈতিক মন্ত্রী ছিলাম। নানা কাজে টাকার দরকার হতো। অনেক গরিব মানুষ সাহায্যের জন্য আসত। ছোটখাটো খরচ নিজের আয় করা অর্থ দিয়ে মেটাতাম। আর বড় কিছু হলে দুয়েকজন নিকট বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিতাম। যুবদলের সম্মেলনের জন্য একবার ৫০ হাজার টাকা আর একবার আর একটি কর্মী সম্মেলনের জন্য ২০ হাজার টাকা দুজন বন্ধুর কাছ থেকে নিয়েছিলাম। তারা ব্যবসায়ী ছিল কিন্তু বিনিময়ে কোনদিন কিছু চায়নি। এগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিষয় ছিল, দলের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। নির্বাচনের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য দুচারজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়েছি। সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তারা ব্যক্তিগতভাবে শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। আমিও তাদের উপকার করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু শর্তহীনভাবে। তবে সেটাকে এক ধরনের দুর্নীতি বললে তা অস্বীকার করা ঠিক হবে না।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত আইনজ্ঞদের মত অভিজ্ঞতার সাথে সাথে আয়ের পরিমাণ বেড়েছে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে আমি উদার ছিলাম, মক্কেলদের চাপ দিতাম না, বরং পয়সা চাইতে সাধারণত লজ্জাই লাগে। যতটা বেশি সম্ভব আয়কর দেয়ার চেষ্টা করেছি।

১৯৭৬-৭৭ সালে, সরকারে যোগদান করার আগের বছরে আমি এবং আমাদের ল' ফার্ম যে আয়কর দিয়েছি তা আইন ব্যবসার কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের জন্য উল্লেখযোগ্য ছিল। ঐ বছর আয়কর বিভাগের কর্তারা বলেছেন, আইনজীবী হিসেবে আমি এদেশে সবচেয়ে বেশি কর দিয়েছিলাম। আমাদের আয়কর ব্যবস্থার গাফেলতি এবং দুর্বলতার জন্য আয়কর

সার্বিকভাবে দেয়া বা সব আয়ের ওপর কর দেয়া সম্ভব হয় না। বাংলাদেশ কেন পৃথিবীতে খুব কম ব্যক্তি আছেন যিনি বলতে পারবেন যে তিনি তার সমস্ত আয়ের ওপর কর দিয়েছেন। সেদিক থেকে হয়তো সমস্ত আয়ের ওপর কর দেয়া আমার পক্ষেও সম্ভব হয়নি। কিন্তু চেষ্টা করেছি এবং নিজের সম্পত্তি এবং আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কর নিয়মিতভাবে দিতে।

ব্যক্তিগত জীবনে পুরোপুরি না হলেও এই সমাজে যতটুকু সম্ভব অন্তত ততটুকু নিজেকে সৎ রাখার চেষ্টা করেছি। আমার বা আমার পরিবারের যা কিছু আছে সবকিছুই আইনজীবী হিসেবে আমার নিজের ন্যায়সঙ্গত আয় থেকে গড়া, এতে কোন মিশ্রণ নেই। আমাদের বাড়ি সম্পত্তি যা আছে সবই সরকারে যোগদান করার আগে কেনা। সরকার এবং রাজনীতিতে যোগদান করার পর বরং অনেক কিছু ক্ষতি হয়েছে ব্যক্তিগত জীবনের। আয়ও একেবারে কমে গেছে। আমাদের বিষয়সম্পত্তি যা কিছু আছে সরকারে যোগদান করার আগে থেকেই সেগুলোর উল্লেখ আয়কর বিভাগের রিটার্নে দেয়া আছে। এতে নতুন কোন যোগ ঘটেনি। এসবের ওপর কর ইত্যাদি প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আয়কর বিভাগের সাথে প্রতি বছর নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারের পরপর সুহৃদ অর্থমন্ত্রী, আবুল মাল আবদুল মুহিত কথাটা তুলেছিলেন জেনারেল এরশাদের কাছে। জেনারেল এরশাদ তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে উত্তেজনার সাথে তাঁর ভাব ব্যক্ত করেছেন। আমার ওপর তাঁর ভীষণ রাগ। বলেছেন, "জানেন, আমাকে মওদুদ খুনি বলেছে, আমি নাকি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করেছি। আমার বিরুদ্ধে ও শ্লোগান দিয়েছে।" একথা বলার পর ঐ উত্তেজনাকর অবস্থায় অর্থমন্ত্রী মুহিত জেনারেল এরশাদকে আর কিছু বলাটা ঠিক মনে করেননি। ৭ নভেম্বর বিএনপির র‍্যালিতে গোয়েন্দা সংস্থার কিছু লোক উসকানিমূলক শ্লোগান দিয়েছিল, "জিয়া হত্যার বিচার চাই, খুনি এরশাদের বিচার চাই।" এর সাথে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। ওরা আমাদের দলভুক্ত কেউ ছিল না, বরং তারা আমার বিরোধিতাকারী অংশের লোক। ওরা সেখানে ছিল প্ররোচনাকারী হিসেবে। ওদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। ওরাই পরবর্তী পর্যায়ে নতুন বিএনপি হুদা গ্রুপের মূল কর্মকর্তা হয়েছিল।

জেনারেল এরশাদকে যেভাবে বোঝানো হয়েছে তিনি সেভাবেই বুঝেছেন। ওনার অত সময় কোথায় ওসব যাচাই করে দেখার। ব্যাপারটা তাঁর ব্যক্তিগত ক্রোধের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং শাস্তি দিতেই হবে। বেচারা আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের সাথে তাঁর নারী আর ব্যবসা নিয়ে ছিল ঝগড়া-বিবাদ। ক্ষমতায় আসার পর দাপট হয় ক্ষমতা (arrogance is power), আর ক্ষমতাই হয় দাপট। একটি সাজানো মামলায় দশ বছরের সাজা দেয়া হয়েছে ওকে। অন্য অনেক উচ্ছৃঙ্খলতা ওর মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু যে মামলায় তাকে সাজা দেয়া হয়েছে সেই মামলায় সাজা হয় না কোনভাবেই। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্রোধের ছোবল পড়েছে গায়ে, তাই সে সেটা এড়াতে পারেনি।

যাই হোক ১৩ ডিসেম্বর নাখালপাড়ায় পার্লামেন্ট সদস্যদের হোস্টেলে দুই নম্বর সামরিক ট্রাইব্যুনালে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। ওখানে পাহারারত পুলিশ অফিসাররা অকথ্য ভাষায় সামরিকদের গালিগালাজ করল। সাধারণ কর্মচারীরাও দেশের অবস্থা সম্পর্কে

www.pathagar.com

বেজায় অসন্তুষ্ট বলে মনে হলো। চেম্বার থেকে আইনজীবীরা এলেন। হাসনাও এলো। শুনলাম আমার বিরুদ্ধে আরো দুটো নতুন অভিযোগ জোগাড় করা হয়েছে। প্রায় ১২টার দিকে ট্রাইব্যুনাল বসেছে। চেয়ারম্যানই সবকিছু, বাকিরা শুধু বসে থাকে। তিনি বললেন, মোট চারটি অভিযোগের বিচার হবে। প্রথমটি শুরু হবে আজ থেকেই। চার্জশিট শুনে তো অবাক। নতুন দুটি অভিযোগে এফআইআর-এ আমার নামের উল্লেখ নেই। কোন তদন্ত ছাড়া একবারেই চার্জশিট।

প্রথম অভিযোগ: অভিযোগ হলো ১৯৭৯ সালে আমি যখন বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম তখন পূর্ব-পশ্চিম বিদ্যুৎ আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের উপর।

সবচেয়ে মজা হলো, কাজটা টেন্ডারে সর্বনিম্ন মূল্যের ঠিকাদারকেই দেয়া হয়েছিল। তিনটি আন্তর্জাতিক ঠিকাদার কাজ করতে এগিয়ে এসেছিল। একটি ছিল ব্রিটিশ, একটি দক্ষিণ কোরিয়ার আর একটি আমেরিকান। আমেরিকার কোম্পানি (ভিনেল) কোন দরপত্র জমা দিল না, কোন বিডবন্ডও দিল না আর শুধু একটি চিঠির মাধ্যমে জানালো তারা "খরচ এবং ফি" (cost plus fee) ভিত্তিতে কাজ করতে রাজি আছে এবং তার জন্য আলোচনা করতে চায়। ব্রিটিশ (হাওয়ার্ড সিমেন্স) এবং কোরিয়ার (কেডিসি) এরা পূর্ণ দরপত্র অর্থাৎ গোটা কাজের বর্ণনা, তফসিল, ড্রয়িং পরিকল্পনা ইত্যাদি বিরাট বই আকারে সবই দিল আর ব্রিটিশরা ছয় কোটি এবং কোরিয়ানরা সাত কোটি টাকার ওপরে বৈদেশিক মুদ্রায় বিডবন্ড জমা দিল। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, এই আমেরিকান কোম্পানিকে কেন চুক্তি দেয়া হয়নি? এদেরকে দিলে একটি কাল্পনিক অঙ্ক ৪০ কোটি টাকা সরকার বাঁচাতে পারত।

ব্যাপারটা তামাশা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের ছোটখাটো ঠিকাদারও বলতে পারবে যে, কেন বিদ্যুৎবোর্ড আমেরিকান কোম্পানিকে কাজটা দেয়নি। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের এত বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যার অধীনে যমুনা নদীর ওপর ১২ মাইল এবং নদীর ৩৮০ ফুট গভীরে লোহার খুটি গেড়ে বিদ্যুতের লাইন টেনে নেয়ার বিষয় জড়িত, যে কোম্পানি কোন দরপত্রই দেয়নি, তাকে কি করে দেয়া যায়? যারা অর্থ জোগান দিয়েছে, অর্থাৎ কুয়েত সরকার, তারাই তাদের ঐ কাজ দিতে চায়নি, বিদ্যুৎবোর্ড কি করবে? বাকি দুটো কোম্পানির মধ্যে কোরিয়ান কোম্পানি ছিল নিম্নতম ঠিকাদার। ব্রিটিশ আর কোরিয়ানদের মধ্যেও তফাৎ ছিল প্রথমে ৪৪ কোটি টাকা, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩৩ কোটি টাকায়।

যাই হোক প্রত্যেকটি পর্যায়ে তিনটা কোম্পানির প্রস্তাবই বিবেচিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ে আমেরিকান কোম্পানির প্রস্তাব নাকচ হয়েছে। এইসব সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎবোর্ড নিম্নতম ঠিকাদার কেডিসিকে চুক্তি দেয়ার জন্য সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়ে সেটা পাঠায়। আমার মন্ত্রণালয় সেটা নিয়মানুযায়ী সারসংক্ষেপ তৈরি করে সমস্ত নথি এবং কাগজপত্র-ফাইল যা কিছু ছিল সব আমার সইসহ কেবিনেট সচিবের কাছে পাঠায় ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির বিবেচনার জন্য। উচ্চ পর্যায়ের সচিব কমিটিতে সেটা তখন পরীক্ষা করা হয়। ওদিকে আমি প্রেসিডেন্টকে এ ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্পর্ক জানালে তিনি

www.pathagar.com

মন্ত্রিপরিষদের পূর্ণ সভায় পুরো ব্যাপারটা আলোচনা করেন এবং এই প্রকল্পের সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রিকমিটিতে প্রধানমন্ত্রী এবং সংস্থাপনমন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করেন। উচ্চ পর্যায়ের সচিবদের সুপারিশসহ তখন বিষয়টি মন্ত্রিকমিটিতে বিবেচিত হয়। মন্ত্রিকমিটি নিম্নতম ঠিকাদার কোরিয়ান কোম্পানি কেডিসিকে চুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট অনুমোদন করার পর কেডিসিকে কাজটা দেয়া হয়। সচিব এবং মন্ত্রিকমিটির বৈঠকেও আমেরিকান কোম্পানির প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং কেন তাদেরকে কাজটা দেয়া যাবে না সেটাও মন্ত্রিকমিটির বৈঠকে লিপিবদ্ধ করা হয়। আমিও এই মন্ত্রিকমিটির সদস্য ছিলাম। সরকার বিরাট করে ঢাকঢোল পিটিয়ে সরকারি কাগজে দিনের পর দিন এই মামলাটা প্রচার করেছে। বিদেশী পত্রিকা *ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউতে* (ফেব্রুয়ারি ৩, ১৯৮৩) বলা হয়েছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এত বহুল প্রচারিত মামলা আর হয়নি। সামরিক শাসনের সেন্সরশীপের অধীনে খবরের কাগজে সরকারি ভাষ্য ছাড়া আর কিছুই বেরুলো না। এক অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমার চরিত্র হনন করার জন্য সরকার যেন ওঠে পড়ে লাগল। জনগণের কাছে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করাই হলো মূল লক্ষ্য। কিন্তু সকলেই জানত ব্যাপারটা মিথ্যা। ডক্টর হুদা যিনি মন্ত্রিকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনিও গোপনে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জমিরুদ্দিন আহমদের মাধ্যমে দুঃখপ্রকাশ করে খবর পাঠালেন। বর্তমানের অর্থমন্ত্রী এবং তখনকার সচিব আবুল মাল আবদুল মুহিতও সব জানতেন। যেসব অফিসার এর সাথে জড়িত ছিলেন তাঁরা হাসাহাসি করেছেন। কোরিয়ান সরকার, কুয়েত সরকার—সকলে অবাক হয়েছে। মোটকথা যারাই এ ব্যাপারে জানত তারা সকলেই আশ্চর্য হয়েছে। আমার জন্য দুঃখ করেছে।

এর মধ্যে দেশে যাই হোক বিদেশেও আমার গ্রেপ্তার নিয়ে কথা উঠল। প্রচারও হলো। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং আরো অনেক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা বিষয়টি বিভিন্ন পর্যায়ে তুলে ধরে। লন্ডনের *ফাইনান্সিয়াল টাইমস*, *গার্ডিয়ান* এবং *অবজারভার* পত্রিকায় বেশ বড় করে ছাপা হলো। মামলা সব বানানো—একথাও তাঁরা লিখলেন। বিশ্বখ্যাত সাপ্তাহিক *ইকনমিস্ট* লিখল 'জেনারেল অন ট্রায়াল' অর্থাৎ জেনারেলের বিচার। একটি লম্বা নিবন্ধে ওরা আমার অতীতের কথা লিখল, গণতন্ত্রের জন্য আমার সংগ্রামের কথা এবং বলতে চাইল আমার বিরুদ্ধে মামলায় বিচার হবে এরশাদের—দেশের ওপর তাঁর কতটুকু ক্ষমতা আছে সেটারই বিচার হবে। পৃথিবীর বড় বড় শহরের সব কাগজেই এসব উঠেছে, বিবিসিও কয়েকবার প্রচার করেছে। *ইকনমিস্ট* পত্রিকার নিবন্ধ বিবিসি প্রায় পুরোটাই প্রচার করেছে। লন্ডনে আমার মুক্তির জন্য আমার বিদেশী শুভাকাঙ্ক্ষীরা একটি কমিটিও গঠন করলেন। ইংল্যান্ডের নাম করা আইনজীবী ব্যারিস্টার জন ম্যাকডোনাল্ড কিউ সি কে তাঁরা আমার জন্য নিয়োগ করলেন। বিদেশ থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ব্যক্তিত্ব আমার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে জেনারেল এরশাদকে চিঠি এবং তারবার্তা পাঠিয়েছেন। অসংখ্য বন্ধুবান্ধব সরকারের কাছে লিখেছেন। এঁদের মধ্যে সিনেটর কেনেডি, সিনেটর পার্সি, মাইকেল ফুট, টমাস উইলিয়ামস—এ ধরনের অনেকেই ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিকরাও ছিলেন—এমিলি ম্যাকফারকার,

www.pathagar.com

টনি ক্লিফটন, পিটার গিল, লরেন জেনিকনস, জন পিলজার এবং আরো অনেকে। আমার ওপর ছিল এদের অগাধ বিশ্বাস।

আমার গ্রেপ্তারের পর পশ্চিম জার্মানির রাষ্ট্রদূত তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য জার্মান সরকারের তরফ থেকে জেলখানায় এসেছিলেন সরকারি অনুমতি নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে। এর আগে জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউটের আইন বিভাগের প্রধান, যাঁর উৎসাহে আমার দুটো বই লেখা সম্ভব হয়েছে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে, সেই ডক্টর ডিইটার কনরাড নিজের পয়সা খরচ করে ঢাকায় এসেছিলেন আমার গ্রেপ্তারের কথা শুনে। আমার প্রথম বইটা, "বাংলাদেশ: কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি," হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ছাপিয়েছিল। দ্বিতীয় বইটি "বাংলাদেশ: দি এরা অব শেখ মুজিবুর রহমান," এটিও ওরা ছাপাচ্ছে। ডক্টর কনরাড এসেছিলেন জেলখানায় আমার সাথে দেখা করতে। বললেন, "তোমাকে এই আধ ঘণ্টা দেখার জন্য আমি জার্মানি থেকে এসেছি।" ওর আরো খারাপ লেগেছে এই কারণে যে, সেপ্টেম্বরে আমার চার মাসের জন্য আবার হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা ছিল অন্য একটি ফেলোশীপে। তখন ওকে লিখেছিলাম দেশের অবস্থা এখন ভাল নয়, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। এখন তাই আমি দেশ ছেড়ে যেতে চাই না, অবস্থা ভাল হলে এপ্রিল মাসে যাব। সেইকথা স্মরণ করে আর আমার বর্তমান কারাবন্দি অবস্থার কথা ভেবে দুজনেই হাসলাম। আমার সাথে দেখা করার সুযোগ করে দেয়ার জন্য জেলগেটে কে জানি ওর কাছ থেকে টাকা চেয়েছিল অথচ উনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়েই আমার দ্বিতীয় বইটা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য জেলখানায় এসেছিলেন। "সামরিক আইনের অধীনে দুর্নীতি কমে যাওয়ারই তো কথা ছিল"—কথাটা ডক্টর কনরাড হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিলেন।

বিলেত থেকে আর একজন বন্ধুও ওদের ডিসেম্বরের বড়দিনের উৎসব ছেড়ে চলে এলেন। অ্যালেক্সান্ডার ডাফি, ডাক নাম অ্যালেক্স, অনেক দিনের বন্ধু। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্ট জিয়া যখন কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানদের সম্মেলনে গিয়েছিলেন তখন এই বন্ধুর মাধ্যমেই মার্গারেট থ্যাচারের সাথে জিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মার্গারেট থ্যাচার বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে জিয়া ছাড়া কমনওয়েলথের আর কোন সরকারপ্রধানের সাথে সেবার সাক্ষাৎ দেননি। আমাদের হাইকমিশন কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি। সে অনেক কথা, তবে অ্যালেক্সের মাধ্যমে তখন আমাদের দেশের অনেক উপকার হয়েছিল। যাই হোক অ্যালেক্স এসে এখানকার অনেকের সাথেই দেখা করেছেন। এমনকি জেনারেল এরশাদের সাথেও।

অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু *ডেইলি টেলিগ্রাফের* প্রাক্তন সাংবাদিক এবং বর্তমানে ব্রিটিশ থেমস টেলিভিশনের সাংবাদিক পিটার গিলও ঢাকায় এসেছিলেন। পিটার দেখেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে আমার কি অবদান ছিল। তখন প্রায় ২০০ বিদেশী সাংবাদিকদের আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে বুঝিয়েছি—বিভিন্ন রকমের পরামর্শ দিয়েছি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের সীমান্তের এ দিকে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটিতে নিয়ে আসতাম এই আশায় যে,

www.pathagar.com

যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁরা বিদেশে যেন আমাদের কথাটা একটু ভাল করে প্রচার করে। পিটার গিল এলো, কোর্টে আমার সাথে এসে দেখাও করেছে। যদিও ওকে কোর্টরুমের ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়নি। তবে পিটার জেনারেল এরশাদের সাথে দেখা করে গেছে। তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং বেশ বড় প্রতিবেদন ছাপিয়েছে।

যাই হোক চার্জশিট দেয়ার চার দিন পর মামলা শুরু হলো। ব্রিটিশ ব্যারিস্টার জন ম্যাকডোনাল্ডকে সরকার ভিসা দিল না। তাই তিনি আর আসতে পারেননি। অথচ ঔপনিবেশিক পাকিস্তান আমলে তখনকার সরকারের এক নম্বর শত্রু শেখ মুজিবের জন্য টমাস উইলিয়ামসকে আসতে দেয়া হয়েছিল। আমরা তাঁকে আনিয়েছিলাম। আমিই সব ব্যবস্থা করেছিলাম। স্বাধীন হলে অনুন্নত দেশে নাগরিকদের পরাধীনতা যে বেড়ে যায় আমার বিচার ব্যবস্থাটি ছিল তারই প্রমাণ। জন ম্যাকডোনাল্ড না আসাতে একদিকে ভালই হয়েছে। আগরতলা মামলার ট্রাইব্যুনালে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এস. এ. রহমান ছিলেন চেয়ারম্যান, আর বিচারের একটি মান ছিল। আদালত টমাস উইলিয়ামসের কথা অন্তত বুঝতে পেরেছিল। জন ম্যাকডোনাল্ড এখন ব্রিটেনের তিনজন উঁচুদরের সাংবিধানিক ব্যারিস্টারদের মধ্যে একজন। আমার কৌঁসুলি হলে এদেশের বিচার ব্যবস্থা, বিশেষ করে আমাদের সামরিক বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব খারাপ একটি ধারণা নিয়ে ফিরে যেতেন। কোন সাংবিধানিক প্রশ্নে টম উইলিয়ামস যেমন হাইকোর্টে পিটিশন করতে পেরেছেন, নিজের বক্তব্য পেশ করতে পেরেছেন, আমার বিচারের বেলায় তাও করার উপায় ছিল না। এই সামরিক সরকারের আমলে এদেশের ইতিহাসে এই প্রথম হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার তুলে নেয়া হয়েছিল। আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, খন্দকার মোশতাক, জিয়াউর রহমান কোন আমলেরই মার্শাল ল'র সময় হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার তুলে নেয়া হয়নি। অর্থাৎ এরশাদ প্রবর্তিত সামরিক শাসনে আইনের শাসনের নিম্নতম যে শর্ত আছে সেটা পর্যন্ত তুলে ফেলা হয়েছে। এরকম অবস্থা আগে কখনো হয়নি। বিচার বিভাগের এরকম অসহায় অবস্থা আগে কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। বিচার বিভাগের এমন পঙ্গু দশা আগের কোন শাসনকর্তাই করেননি। বিচারের দিন এলো, কোর্টের ঠাটবাট ঠিকই আছে। নাখালপাড়ার পার্লামেন্ট সদস্যদের হোস্টেলে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কর্মচারী এখন সপরিবারে থাকে। ঐ হোস্টেলের তিন তলার মাঝখানের একটি বড় ঘরকে কোর্টরুম বানানো হয়েছে। উঁচু পাটাতনের ওপর বিচারকদের আসন। লাল সালু দিয়ে ঘেরা দুদিকে দুটো কাঠের তৈরি কাঠগড়া—একটি একটু বড়, লম্বাটে, অপরটি ছোট, চারকোণা। বড়টা আসামিদের জন্য আর ছোটটা সাক্ষীদের জন্য। উকিলদের জন্য সামনে একসারি টেবিল, চেয়ার আর দর্শকদের জন্য গোটা পঞ্চাশেক চেয়ার। পুরো মেঝে কার্পেটে মোড়া। দেয়ালের চারদিকে চারটি বড় এয়ারকন্ডিশনার। আরাম-আয়েসের সবকিছুই বিদ্যমান। তখন জেলা জজদের এজলাসের কথা মনে পড়ে গেল। মানুষের ভারে ভারাক্রান্ত অন্ধকার ময়লা জরাজীর্ণ কোর্টরুম, যেখানে মামলার অন্ত নেই। এয়ারকন্ডিশনার তো সুপ্রিমকোর্টেই এখন পর্যন্ত কেউ কোনদিন দেখেনি। তবুও সেখানে বিচার হয়। জেলা জজদের ঘরে আরাম-আয়েস

www.pathagar.com

না থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে একটি স্বাধীন পরিবেশে আছে। তাঁদের একটি পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। তাঁরা একটি নিয়মের অধীনে কাজ করেন, নিয়ম তাঁদের অধীনে নয়। আইন এবং নিয়ম তাঁদের অনেক উর্ধ্বে থাকে সেখানে।

কোর্টে সেন্ট্রির আওয়াজের সাথে সাথে পাঁচজন বিচারক ঢুকলেন খুব গম্ভীর ভাব নিয়ে। দেখতে সিরিয়াস, সুবিচার হবেই—এমন ভাব। নৌবাহিনী আর বিমানবাহিনীর দুজন অফিসার দুই কিনারে, মাঝখানে চেয়ারম্যান, কর্নেল মুহম্মদ ইলিয়াস আর তার এক পাশে বেসামরিক অতিরিক্ত জেলা জজ, আর অন্যদিকে একজন ম্যাজিস্ট্রেট। শেষোক্ত দুজন আইনের লোক, কিন্তু তাঁদের কোন ক্ষমতা নেই। চেয়ারম্যান জিজ্ঞেস করলে কিছু বলেন, না হলে চুপ করে বসে থাকেন। নৌ আর বিমানবাহিনীর দুজনও প্রায় নির্বাক দর্শকের মতই। মাঝে মাঝে হয়তো দুয়েকটি প্রশ্ন করে। কিন্তু কথা বলেন চেয়ারম্যান। আসন গ্রহণের পর মাথা থেকে ক্যাপটা খুলে টেবিলে রেখে হাত দিয়ে নিজের চুল সিধা করে তারপর হুকুম দেন, You may take your seat—তোমরা এখন বসতে পারো। এতক্ষণ সবাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়েই ছিল। সামরিক বাহিনীর তিনজনের একজনও আইন জানেন না। আইনের সাথে তাঁদের কোন সংস্রবও ছিল না। আই.এ. অথবা বড়জোর বি.এ. পাস। চেয়ারম্যান এমন ভাব দেখান যেন তিনি আইন জানেন। হয় তো বা জানেনও। একেবারে মিলিটারি চেহারা। খুব মেজাজ। একদিন পরপরই নতুন নতুন ইউনিফর্মে সেজে আসেন। কাঁধের ওপর চক চক সব পিতলের পিপ্‌স। দেখে মনে হয় না যে কুমিল্লার নবীনগরের ছেলে।

আমার বিচার শুরু হওয়ার আগে মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ খানের জামিনের দরখাস্ত তাঁর উকিল পেশ করলেন। হাবিবুল্লাহ খান নয় মাস জেলে থাকলেও তাঁর বিচার হয়নি। অভিযোগ তৈরি হয়েছে মাত্র। কোর্টের চেয়ারম্যান খুব গুরুগম্ভীর ভাব নিয়ে উকিলের কথা শুনলেন, আর দরখাস্ত পড়লেন। তারপর হুকুম দিলেন, জামিন মঞ্জুর। ভাবটা এমন যেন তাঁর নিজের সুবিচারেই জামিন মঞ্জুর করেছেন। তারপর আরো কিছু অফিসারের দরখাস্ত। একই অবস্থায় জামিন মঞ্জুর। পুরো ব্যাপারটিই ছিল একটি প্রহসন। আইনে চেয়ারম্যানের জামিন দেয়ার ক্ষমতা থাকলেও আসল ক্ষমতা তাঁর ছিল না। স্বাধীনভাবে নিজের সুবিচার প্রয়োগ করার অধিকার তাঁর ছিল না। প্রধান সামরিক প্রশাসকের অফিস থেকে একটি হাতের লেখা চিরকুট আসে পাবলিক প্রসিকিউটরের কাছে। রাষ্ট্র আপত্তি না করলে কোর্ট জামিন দিতে পারে। সেই চিরকুটে লেখা থাকে নির্দেশ—ওমুককে জামিন দেয়া হবে। এভাবে সব ব্যবস্থা করে জামিনের দরখাস্ত করতে হয়। হাবিবুল্লাহ খানের জন্য যে চিরকুটটা এসেছিল তা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু ভাবটা এমন দেখানো হলো যে কোর্ট যেন নিজের সুবিচারে জামিন দিয়েছে।

আমার বিচার দেখার জন্য কিছু বিদেশী এসেছিল। তাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখার পর বিদায় করে দেয়া হয়। এদের মধ্যে ছিলেন আমার বন্ধু অ্যালেক্স ডাফি যিনি লন্ডন থেকে এসেছিলেন। পশ্চিম জার্মানির দূতাবাস আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি লিখে জানিয়েছিল বিচার প্রণালী দেখার জন্য তাদের একজন অবজার্ভার কোর্টে থাকবে। তাদের একজন সিনিয়র

www.pathagar.com

অফিসার এসেছিলেন। এরকম আরো দুতিনজন। এটি কোন গোপন বা ক্যামেরা বিচার ছিল না। আইনত একটি উন্মুক্ত বিচার ছিল। আর এটি ছিল কোর্টের চেয়ারম্যানের এখতিয়ারভুক্ত ব্যাপার। কিন্তু এদের কাউকেই ঢুকতে দেয়া হয়নি। পরে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের লন্ডন প্রতিনিধি যখন এসেছিলেন, তখন তাঁর দরখাস্তও নাকচ করে দেয়া হয়। এর আগে পিটার গিলকেও কোর্টের ভেতর বসতে দেয়নি। এসব আমার জন্য ভালই হয়েছে। মামলার সুবিচার যে কতটুকু হবে সেই সম্পর্কে একটি ধারণা এঁদের সকলেরই হয়ে গেল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বিদেশী আইনজীবী ছাড়াও বিদেশী সাংবাদিকরাও কোর্টের ভেতরে বসে থাকতেন আর এখানে তাঁদের দর্শকই হতে দিল না।

আর একটি মজার ব্যাপার হলো এত বড় মামলা অর্থাৎ কিনা ৪০ কোটি টাকার ব্যাপার, অথচ আসামি একমাত্র আমি। আর কোন মন্ত্রী, কোন অফিসার, বিদ্যুৎবোর্ডের চেয়ারম্যান বা মন্ত্রিকমিটির সদস্য বা সচিব কমিটির সদস্য বা কেডিসি'র কোন লোক বা কুয়েত ফাণ্ডের কোন ব্যক্তি বা বিদ্যুৎবোর্ডের টেকনিক্যাল মূল্যায়ন কমিটির কোন সদস্য বা কনসাল্টেন্টস—আর কেউ এই তথাকথিত দুর্নীতিতে জড়িত ছিল না, তারা কেউ আসামি নয়। আমি একাই সবকিছু করেছি, আমি একাই আসামি।

যাই হোক খুব হাঁক-ডাক করে বিচার শুরু হলো। সাক্ষীদের বেশিরভাগই সরকারি অফিসার। সবাই তাদের মনোনীত। বাইরের মাত্র একজন সাক্ষী—সেই আমেরিকান কোম্পানির বাঙালি প্রতিনিধি। তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, তাঁদের কোন নালিশ নেই। এই মামলায় তাঁকে সাক্ষী করেছে সরকারি সংস্থা। তাঁরা কোন দরপত্র জমা দেয়নি এবং তাঁরা কোন বিডবন্ড দেননি। দরপত্র এবং বিডবন্ড না দিলে টেন্ডার নাকচ হয়ে যায় এটাও তাঁরা স্বীকার করলেন। এ কাজে তাঁদের আর উৎসাহ ছিল না। বিদ্যুৎবোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অফিসাররা সত্যিকার যা ঘটেছে তাই বলে গেলেন। তখনকার সচিব আবুল মাল আবদুল মুহিতও একই কথা বললেন। সবকিছুই আমার পক্ষে এবং বাদীপক্ষের বিপক্ষে গেল। কোন একটি শব্দ আমার বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়নি। প্রায় দুসপ্তাহ মামলা চলল। আর প্রায় রোজই অশ্লীল ভাষায় খবরের কাগজে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ফলাও করে ছাপা হতে লাগল। প্রতারণা আর ৪০ কোটি টাকার ব্যাপারটি বড় করে পুনরাবৃত্তি করা হতে লাগল। শুনলাম আমার গ্রামের একজন অশিক্ষিত কৃষক উদাস হয়ে প্রশ্ন করেছে গ্রামের একজন বয়স্ক লোককে, "আচ্ছা কন চাই বাংলাদেশ ব্যাংকে এত টেয়া আচেনি? মওদুদ সাবের কত বস্তা লাইগচে এই টেয়া নিতে। এই বস্তাগুণ হ্যতেনে রাইখছে কোন্দায়? এইগুলার মাথা খারাপ অই গেছে।"

যাই হোক প্রথম মামলার শুনানি শেষ হলো ১১ জানুয়ারি, আর রায় দেয়ার আগে সেদিনই শুরু হলো দ্বিতীয় মামলা, দুটো অভিযোগ একসাথে। প্রথম অভিযোগ, আমি একজন বিদেশী ভদ্রমহিলা ইংগে ফ্লাটসের কথিত একটি পাওয়ার অব অ্যাটর্নি জাল করে সরকারকে প্রতারণার মাধ্যমে গুলশানের একটি বাড়ি, যে বাড়িতে আমরা বর্তমানে ভাড়া থাকি, সেটা দখল করে নিয়েছি এবং চল্লিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক হয়েছি। আর দ্বিতীয় অভিযোগ, আমি সরকারি গাড়ি নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে সরকারের

www.pathagar.com

৯৬ হাজার টাকা লোকসান করিয়েছি। প্রথমটির সাথে আমার মন্ত্রিত্ব বা সরকারের লোকসানের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, আর দ্বিতীয়টির সাথে সরকারের লোকসান জড়িত। প্রথমটি হলো সামরিক বিধির ১২ নম্বর ধারা, যার অধীনে সামরিকরা এই একটি মাত্র মামলাই করেছে। আয়ের সাথে সম্পদের অসঙ্গতির ওপর।

যাই হোক ১৭ জানুয়ারি সামরিক আদালত রায় দিয়ে প্রথম মামলায় আমাকে খালাস দিল। কিন্তু কুয়েত ফাণ্ডের বা ঐ দেশের সরকারের সাথে আমাদের সম্পর্ক আগের দিনে আবার কবে ফিরে যাবে জানি না। একজন ব্যক্তিকে মাত্র কয়েকটা শ্লোগান দেয়ার জন্য অপমান করতে গিয়ে এত অর্থ, এত দাপট, এত প্রচার আর জাতীয় স্বার্থের এত ক্ষতিসাধন করার জবাব এদেশের মানুষ বোধহয় কোনদিন পাবে না। আগেও বলেছি, শ্লোগান যারা দিয়েছিল তারা ছিল সরকারেরই লোক। তারাই এখন সরকারের 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার বাহক হয়েছে।

দ্বিতীয় অভিযোগ: আমরা এখন গুলশানের যে বাড়িতে ভাড়া থাকি তার মালিক হলেন একজন অস্ট্রিয়ান ভদ্রমহিলা। তাঁর স্বামী একজন পাকিস্তানী। সে ভদ্রমহিলা ১৯৬৩ সালে বিয়ের পর ঢাকায় ডিআইটি'র কাছ থেকে জমি নিয়ে ১৯৬৫ সালে নিজের নামে বাড়িটি তৈরি করেন। যেহেতু তাঁর স্বামীর এটি ছিল দ্বিতীয় বিয়ে, তাই তিনি বিয়ে করার পরও নিজের নাম এবং জাতীয়তা আলাদাভাবে বজায় রেখে যান। তাঁর নাম ইংগে ফ্লাটস। তিনি নিজের নামে কর দিতেন এবং ঢাকায় ও খুলনায় তাঁর নিজের নামেই অন্যান্য ব্যবসাও ছিল। প্রতি বছর আয়কর বিভাগে ঐসব বিষয়সম্পত্তি ও ব্যবসার হিসাব জমা দিয়েছেন নিজের নামেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক আগে ইংগে ফ্লাটস নিজের দেশে চলে যাওয়ার ফলে বাড়িটি লুট হয় এবং কিছু বাইরের লোক এটিকে দখল করে ভোগ করা শুরু করে। সরকার বাড়িটিকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে। ১৯৭৩ সালে আমি যখন লন্ডন যাই তখন ঢাকার ফাইসন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান স্টুয়ার্ট ম্যাথিসন, যিনি যুদ্ধের আগে এ বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, এই ব্যাপারে আইগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। দেশে ফিরে এসে জুলাই মাসে আমরা আইনজীবী হিসেবে ফার্মের তরফ থেকে মিসেস ফ্লাটসকে সব কাগজপত্র, প্রমাণ ইত্যাদি পাঠানোর জন্য চিঠি দেই। আগস্ট মাসের ৩ তারিখে মক্কেল আমাদেরকে সমস্ত কাগজপত্র পাঠায় জার্মানিতে আমাদের দূতাবাসের সীলমোহর এবং এন্ডোরসমেন্টসহ। এর মধ্যে ছিল ওকালতনামা, আমার নামে একটি পাওয়ার অব অ্যাটর্নি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় কাগজপত্র। আমরা সরকারকে লিখি এবং সরকারও আমাদের লেখে। এইভাবে চলতে থাকে সরকার এবং আমাদের মধ্যে পত্র এবং কাগজপত্র বিনিময় বছরের পর বছর।

এর মধ্যে অস্ট্রিয়ান সরকার ১৯৭২ সালের জুন মাস থেকেই তাদের দিল্লির দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কাছে তাদের দেশের নাগরিকদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য আবেদন জানায়। ১৯৭৪ সালে ওদের একজন রাষ্ট্রদূত ঢাকায় এসে সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে এ নিয়ে কথাবার্তা বলে আমাদের জ্ঞাত করেন। রাষ্ট্রদূত এও বলেন যে, বাংলাদেশ সরকারের সাথে তাদের এটিই একমাত্র বিবাদ। একজন বিদেশী নাগরিকের

www.pathagar.com

সম্পত্তি এভাবে বাজেয়াপ্ত করার অধিকার বাংলাদেশের নেই বলে অস্ট্রীয় সরকার এই ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে। এই সম্পত্তি ফিরিয়ে নেয়ার জন্য এরকম মোট তিনজন অস্ট্রীয় রাষ্ট্রদূত পরপর বাংলাদেশে আসেন ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। এই সাত-আট বছরে আমাদের ফার্ম এবং সরকারের মধ্যে, আমাদের এবং অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের সঙ্গে, অস্ট্রিয়ান দূতাবাস এবং সরকারের মধ্যে এবং আমাদের এবং ইংগে ফ্লাটসের মধ্যে একশতের ওপর চিঠি বিনিময় হয়েছে। অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্রদূত নিজে ১৩টি চিঠি লিখেছেন আমাদের কাছে। সরকার লিখেছেন ১৪-১৫টি।

১৯৭৭ সালে আমি যখন জাতিসংঘে তখন অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্রদূত ডক্টর স্যালেনবার্গ চেম্বারে এসে বলে গেছেন ফার্ম যেন ওদের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে আর সরকারের কাছে না লেখে, কারণ ব্যাপারটা এখন দুই সরকারের মধ্যে বোঝাপড়া হবে। রাষ্ট্রদূতকে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব এই আশ্বাস দিয়েছে। এরপর সরকার আমাদের কাছে তিনখানা জরুরি চিঠি দেয়া সত্ত্বেও আমরা বছরখানেক এগুলোর কোন জবাব দেইনি। ১৯৭৭ জুলাই থেকে ৮০ সালের মে পর্যন্ত অস্ট্রিয়ান দূতাবাসের অনুরোধে সরকারকে ফার্ম তিনখানা চিঠি দিয়েছে মাত্র। ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে দুটি এবং ১৯৭৯ সালের প্রথম দিকে একটি।

১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি সরকারে যোগদান করি। ইংগে ফ্লাটসের ব্যাপারটা বরাবর ব্যারিস্টার মইনুর রেজা চৌধুরী ও এডভোকেট ওদুদই দেখাশুনা করেছেন। সরকারে যতদিন ছিলাম চেম্বারের কোন ব্যাপারেই আমি আর খোঁজখবর রাখিনি। রাখার কোন দরকারও হয়নি। ১৯৮০ সালে ২ জানুয়ারি সরকার ত্যাগ করার পর আসিফ মারা গেল। নানা ঝামেলায় ছিলাম। চেম্বারে যাওয়ার পর শুনলাম ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রদূত স্যালেনবার্গ পূর্ত সচিবের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে ১৯৭৮ সালের জুন মাসে যে শেষ এবং কড়া আবেদন লেখেন তারই ফলশ্রুতি হিসেবে সরকার ঐ বাড়ি ইংগে ফ্রাটসকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকার চিঠির একটি কপি ফার্মের নামেও পাঠিয়েছে। এই বাড়ি ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। তাদের মতামত পূর্ত মন্ত্রণালয়ের রিভিউ কমিটি পরীক্ষা করে অনুমোদন করে। তারপর ব্যাপারটা যায় জাতীয় কোঅর্ডিনেশন এবং কন্ট্রোল সেলে যার চেয়ারম্যান ছিলেন সামরিক বাহিনীর চিফ অব স্টাফ। তাঁদের অনুমোদন লাভের পর বিষয়টি প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হয়। প্রেসিডেন্ট সেটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠান পরীক্ষা করে দেখার জন্য, ইংগে ফ্লাটস অস্ট্রিয়ান নাগরিক কিনা জানার জন্য। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের অভিমত দিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠায়। প্রেসিডেন্ট তখন আবার ভাইস প্রেসিডেন্টের মতামতের জন্য পাঠান। ভাইস প্রেসিডেন্টও ওটা অনুমোদন করে মত দিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠালে প্রেসিডেন্ট জিয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চূড়ান্ত অনুমোদন দেন। আমি সরকার ত্যাগ করি ঐ বছরের ২ জানুয়ারি।

এরপর পূর্ত মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রদূতকে চিঠি লিখে তাদের সিদ্ধান্ত জানায় এবং আমাদের ল' ফার্মকে একটি কপি দেয়। এরপর ইংগে ফ্লাটস আমাদের মাধ্যমে সম্পত্তির হস্তান্তর

www.pathagar.com

করার জন্য অস্ট্রিয়ান দূতাবাসের মাধ্যমে সরকারকে জানায়। সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সরকার রেজিস্ট্রি করে তাদের নিয়মানুযায়ী বাড়িটি ইংগে ফ্লাটসের নামে হস্তান্তর করে দেয়। যেহেতু এ বাড়িটিতে অন্য বিদেশী ভাড়াটিয়া ছিল, দখল আর তখন পাওয়া গেল না। সরকার ত্যাগ করার উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনেকটা মনের দুঃখে জুলাই মাসে, হাইডেলবার্গ এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশীপ নিয়ে আমি দেশ ছেড়ে চলে গেলাম। আগস্ট মাসে ইংগে ফ্লাটস হাইডেলবার্গে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। এই আমার জীবনে প্রথম তাঁকে দেখি। আমি যেহেতু ছয় থেকে আট মাস দেশে থাকব না, সেইজন্য তাঁকে মইনুর রেজার নামে একটি নতুন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দিতে বলি। তিনি বাড়ি বিক্রি করে দিতে চান, কিন্তু আমাদের পক্ষে ঐ বাড়ি কেনা সম্ভব নয় বলে জানালাম। তাঁরা অন্য ক্রেতাদের খোঁজখবর করে। যতদিন বিক্রি না হবে ততদিন পর্যন্ত একটি বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দিলেন যাতে বাড়ি ভাড়া বা বিক্রি সবকিছুই করা যায়। পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ফ্লাটস নিজে জার্মানির রাজধানী বন-এ গিয়ে আমাদের অফিসারের সামনে সই করেন এবং সেটি দূতাবাস থেকে এনডোরস করান—সেটিও দলিলে লেখা আছে।

আমরা দেশে ফিরলাম পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে, দেখলাম বাড়িটি তখন খালি। বাড়ি বিক্রি করতে হলে দখল অন্য কারো কাছে গেলে অসুবিধা হতে পারে। অন্যদিকে আমাদের বাড়ির দরকার ছিল আমানের জন্য। গুলশানের মত অত দূরে আমার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক—দুই কারণেই বাড়ি নেয়া সুবিধাজনক ছিল না। তবুও শহরের কাছাকাছি ভাল বাড়ি না পাওয়ায় ইংগে ফ্লাটসের বিশেষ অনুরোধে অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই বাড়িটিই আমরা ভাড়া নেই। আমার ওপর মক্কেলের অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তারপরও ভাড়ার দলিল রেজিস্ট্রি করে নেই। পাঁচ বছরের জন্য ভাড়ার মেয়াদ রয়েছে, সেইজন্য। এর মধ্যে বিক্রি হলে বাড়ির দখল দেয়া বা ছেড়ে দেয়ারও শর্ত থাকল দলিলে। বাড়িটিকে নিজের বসবাসের উপযোগী করার জন্য ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করার শর্তও থাকল। বাড়ি ভাড়া নিলাম ইংগে ফ্লাটসের কাছ থেকে তাঁর অ্যাটর্নি মইনুর রেজার মাধ্যমে। এ বাড়ি নিয়ে কোনদিন কোন গোলমাল হবে চিন্তাই করিনি। ১৯৮১ সালের মার্চ মাস থেকে বাড়িটি ভাড়া নেয়া হয়েছিল। যেসব জিনিস আমার জীবনে কোনদিন ঘটবে বলে কল্পনা করিনি সেসব জিনিসই আমার জীবনে ঘটতে শুরু করল। রাজনৈতিক কারণে বন্দিজীবনযাপন করা এক জিনিস, আর মানুষের সামনে মিথ্যা এবং অকপটভাবে ভিত্তিহীন অভিযোগে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া আর এক জিনিস। জীবনের গর্ব বলতে একটিই জিনিস ছিল সেটা হলো ইজ্জত। এই ইজ্জতটা রক্ষা করার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক জীবনে। আত্মসম্মানের খাতিরে শেষ পর্যন্ত সরকার ত্যাগ করেছি। প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং সাত্তার দুজনের সাথেই দ্বিমত পোষণ করে টিকে থাকলাম। সামরিক শাসনের ৮ মাস পার হয়ে গেল। গত ক'মাসে দুবার বিদেশ থেকেও ঘুরে এলাম। কিছু হলো না। দুটি সরকার আর এই সরকারের ৮ মাস কেউ আমাকে স্পর্শ করল না। কারণ এই বিশ্বাস ছিল আমি নিজের স্বার্থে কিছুই করিনি। তাই অন্তত দুর্নীতির অভিযোগে আমার কিছু হতে পারে না।

www.pathagar.com

বিভিন্ন দেশে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এক এক রকমের দুষ্ট গ্রহের আবির্ভাব হয়েছে সেইসব সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করার জন্য। ক্ষমতার দাপটে তারা দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে যায়। আইনের শাসনকে তারা নিজেদেরে শাসনে পরিণত করে। নিজেদের খেয়াল খুশি এবং স্বার্থের জন্যই সমাজের সবকিছুকে ব্যবহার করে। ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড তাদের হাতের মুঠিতে রাখে। সামরিক-বেসামরিক যেকোন সরকারের আমলেই এটি হতে পারে। আর এই অবস্থা যখন হয় তখন সমাজের পতন ঘটে। ইতিহাসে বড় বড় সভ্যতারও পতন এইভাবেই ঘটেছে। ক্ষমতার মোহে তারা তখন বিভোর, আত্মহারা হয়ে থাকে। যাকে খুশি তাকে চাবুক মারে, অপমান করে। মানুষ হয় ভীত-সন্ত্রস্ত আর মানুষের সেই ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থাকে মনে করে আনুগত্য এবং সম্মান। ওরা বুঝতে পারে না যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বা বন্দুকের ভয়ের ভেতরে কোন ভালবাসা থাকতে পারে না। সেই সন্ত্রস্তভাবের মধ্যে লুকিয়ে থাকে ঘৃণা আর বিদ্বেষ।

যাই হোক আমি ভেবেছিলাম খবরে কাগজে ওসব ফলাও করে ছাপিয়েছে অপমান করার জন্য শুধু, মামলা নিশ্চয়ই করবে না, কারণ অভিযোগ তো সব মিথ্যা, ওসবে তো কোন মামলা হয় না। কিন্তু ক্ষমতার ক্রোধ হয় ভয়াবহ। সেই ক্রোধে মাটি কাঁপে, দেয়ালের ইট খসে পড়ে, সামনে যারা থাকে তারা বাকহীন হয়ে পড়ে, নদীনালার পানি শুকিয়ে যায়, আর সমুদ্রের জোয়ারে ভাটা পড়ে। অন্তত ক্ষমতার 'দাপট' যাদের থাকে তারা তাই মনে করে। কথাই তখন হুকুমে পরিণত হয় আর হুকুম পরিণত হয় আইনে। তারা যা বলবে সেটাই তো আইন। তারা তখন টিয়া পাখিকে শালিক আখ্যায়িত করতে পারে, মহিলাকে পুরুষ ঘোষণা করতে পারে, কার সাধ্য যে প্রতিবাদ করে!

প্রথম চার পাঁচ দিনের মধ্যেই মামলার মূল শুনানি শেষ হয়ে গেল। বাদীপক্ষের ২ জন মূল সাক্ষী, একজন সি. আর. দত্ত, তখনকার পূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, আর একজন হস্তলেখা বিশেষজ্ঞ পুলিশ কর্মচারী। ডেপুটি সেক্রেটারি দত্ত ফাইল দেখে দেখে সমস্ত ব্যাপারটার পুরো ইতিহাস বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন যে তিনি নিজেই এই ব্যাপারটার দায়িত্বে ছিলেন এবং বিষয়টা initiate করেছেন।

আরো বললেন, এরপর সেই বছরের মে মাসে যখন অস্ট্রিয়ার আর একজন রাষ্ট্রদূত ঢাকায় আসেন তখন সরকার তাঁকে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে এবং সে মাসেই ১৩ তারিখে একখানা চিঠি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রদূতকে সরকারের সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এই চিঠির একটি কপি ল' কনসালটেন্টস অর্থাৎ আমাদের ল' ফার্মকে দেয়া হয়। এরপর ইংগে ফ্লাটস রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে চিঠি লিখে সরকারের সচিবকে জানান যে, ১৯৭৩ সালে ২ আগস্টে দেয়া তাঁর আইন উপদেষ্টা এবং ল' কনসালটেন্টসকে যে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দেয়া আছে সেই অনুযায়ী বাড়ি সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা হোক। সরকার সেই অনুযায়ী ২১ জুন দলিল রেজিস্ট্রি করে ইংগে ফ্লাটসের নামে বাড়ি হস্তান্তর করে দেয় আর আমাদের ফার্মকে বাড়ির দখল বুঝে নিতে বলে। এসব কথাও দত্ত বাবু ফাইল দেখে চিঠিপত্রের কথা উল্লেখ করে কোর্টকে বললেন।

www.pathagar.com

এরপর আমি কখন কিভাবে বাড়ি ভাড়া নিলাম, ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে সেটা আগেই বলেছি। বাড়ি ১৯৮০ সালে দখল নেয়া যায়নি। আমি চলে গেলাম জার্মানি এবং আমেরিকায়, হাইডেলবার্গ ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশীপে। ইংগে ফ্লাটস নতুন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দিল মইনুর রেজা চৌধুরীকে। আমাকে দেয়া আগের পাওয়ার অব অ্যাটর্নি তখন বাতিল হয়ে গেল। দলিল রেজিস্ট্রি করে আমি বাড়ি ভাড়া নিলাম।

যাই হোক এই দুটো পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আমাদের জার্মানির দূতাবাস থেকে সত্যায়িত ছিল। একটি ১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসে, আর একটি ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯৮০ সালে যে নতুন পাওয়াব অব অ্যাটর্নি দেয়া হয়েছে বাদীপক্ষ সেটা জানতই না। অর্থাৎ তথ্যানুসন্ধান না করেই বাদীপক্ষ মামলা দাঁড় করিয়েছে, অথচ দেশের প্রতিষ্ঠিত আইনানুযায়ী মামলা শুরু করার আগে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। যেহেতু সরকারের প্রধান অভিযোগ ছিল যে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি একটি জাল দলিল ছিল, আমরা নির্দিষ্ট তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে দুজন অফিসার জার্মানিতে আমাদের দূতাবাসে এই দলিলগুলো সত্যায়িত করেছেন তাঁদেরকে কোর্টে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে বলি। ১৯৭৩ সালের পাওয়ার অব অ্যাটর্নি যিনি সত্যায়িত করেছিলেন, মহম্মদ আমিনুল ইসলাম, তিনি এখন কোলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার, আর ১৯৮০ সালে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি যিনি সত্যায়িত করেছিলেন, আবদুল্লাহ আল-হাসান, তিনি ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন। দুজনই বেশ সিনিয়র অফিসার।

তাঁদের কোর্টে ডাকা হলো। দুজনই বলে গেলেন ব্যাপারটার সত্যতা। ইংগে ফ্লাটসের সইয়ের কথা। আগে অস্ট্রিয়ার দলিলগুলো ওদের নোটারি পাবলিক দিয়ে সত্যায়িত করতে হয়। তারপর দূতাবাস সেগুলোকে সত্যায়িত করে। সরকার বলতে চেয়েছেন এগুলো সবই মিথ্যা এবং জাল ছিল। কিন্তু এই অফিসাররা বলে গেলেন কোন্ অবস্থায়, কোন্ পদ্ধতিতে এগুলো সত্যায়িত করা হয়। একজন অফিসার তো বললেন, উনি ১৯৮০ সালের পাওয়ার অব অ্যাটর্নিতে আবার সই করার জন্য ইংগে ফ্লাটসকে অস্ট্রিয়া থেকে জার্মানির দূতাবাসে আনিয়েছেন এবং মহিলা তার সামনেই সই করেছেন।

কিন্তু তবুও তাঁদের বক্তব্য পেশের আগে সরকারের হস্তলেখা বিশেষজ্ঞ, যিনি কিনা ওদের দ্বিতীয় মূল সাক্ষী, বলে গেলেন যে ওসব সই সব জাল। ১৯৭৩ সালের পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ইংগে ফ্লাটস সই করেননি। ওটা ভুয়া। শুধু তাই নয়, পূর্ত সচিবের কাছে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ইংগে ফ্লাটসের দুটো চিঠিও নাকি জাল ও ভুয়া। অর্থাৎ একটি ইউরোপীয় দেশের রাষ্ট্রদূতও দুটি জাল চিঠি আমাদের সরকারকে পাঠিয়েছেন। প্রহসন এবং হেঁয়ালিরও একটি সীমা থাকে! যাই হোক ঐ দুটি পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, দুটি চিঠি, আর ১৯৬৫ সালের ডিআইটি'র সাথে যে দলিলে ইংগে ফ্লাটসের সই ছিল সেইসবগুলো আবার পরীক্ষা করার জন্য আর একবার হস্তলেখা বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হলো। এবার তিনজন বিশেষজ্ঞের একটি বোর্ড হলো। বোর্ডের মতামত কোর্টকে জানানো হলো। বোর্ড অভিমত দিল যে, সব সই ঠিক আছে, এবং কোন সই জাল বা ভুয়া নয়। এরপর তো আর কোন মামলা থাকে না।

www.pathagar.com

আমি ভাবলাম হয় বাদীপক্ষ মামলা তুলে নেবে, আর না হয় কোর্ট মামলা তখনই খারিজ করে দেবে। কোন পর্যায়ে কোন সাক্ষী আমার বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করেননি।

তৃতীয় অভিযোগ: গাড়ির ব্যাপারে অভিযোগ যে সরকারি পুলের একটি গাড়ি দেয়া সত্ত্বেও আমি টিএন্ডটি বোর্ডের একটি গাড়ি এবং মাইক্রোবাস ব্যবহার করেছি, অর্থাৎ সরকারের বিধি লঙ্ঘন করে একের চেয়ে অধিক গাড়ি মন্ত্রী হিসেবে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেছি। গাড়ি ঠিকই ব্যবহার করেছি, কিন্তু মাইক্রোবাস ব্যবহার করেছে স্টাফরা। পুলের গাড়ি দিয়ে কাজ চলতো না। একই গাড়ি বা ড্রাইভারের পক্ষে রাত দুটো তিনটা পর্যন্ত ডিউটি করে আবার সাতটা থেকে কাজ করা শারীরিকভাবে সম্ভবপর ছিল না। তাই প্রয়োজনে এবং সরকারি কাজেই দুটো গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারের যেসব সাক্ষী আসল তারা ক্ষতির কোন পরিমাণ জানাতে পারলো না। বোর্ডের গাড়ি এবং মাইক্রোবাসের লগবুক নেই—তারা হারিয়ে ফেলেছে। লগবুক ছাড়া গাড়ি ঠিক কবে কতটুকু ব্যবহার হয়েছে, কত গ্যালন তৈল গেছে, তার হিসাব কোথা থেকে পাওয়া যাবে? এসব কোন তথ্যই কোর্টের কাছে হাজির করা হলো না। গাড়ির ড্রাইভারকেও হাজির করা হলো না। কেউ বলল না যে গাড়ির জন্য কত ক্ষতি হয়েছে বা গাড়ি কোন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা, বরং সরকারি একজন সাক্ষী বলে গেল বোর্ডের গাড়ি সবসময় সরকারি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর মামলার আর বাকি কি থাকে।

যাক মামলা শুরু হওয়ার প্রায় দুই মাস পর ৯ মার্চ ১৯৮৩ তারিখে চেয়ারম্যান রায় দিলেন। দুটি অভিযোগেই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং কোন্ অভিযোগে কি শাস্তি তা উল্লেখ না করে বলা হলো—দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং তিন লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো তিন বছর কারাদণ্ড। কত সহজ ব্যাপার, জীবন কত সস্তা এখানে। সামরিক শাসনের বিচার। রায়ে যেসব কথা বলা হলো তার সাথে চার্জশিট এবং সাক্ষীদের বক্তব্যের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। রায়ে বলা হলো আমি ইংগে ফ্লাটসের সঙ্গে যোগসাজশে সরকারকে প্রতারণা করেছি, কিন্তু কি করে করেছি সেটা আর বলেনি বা কোন সাক্ষ্য প্রমাণও উল্লেখ করেনি। রায়ে বলা হলো আমি মক্কেলের কাছ থেকে কত ফিস নিয়েছি এত বছর কাজ করার জন্য বা তাঁকে কোন ভাড়া দিয়েছি কিনা তার কোন প্রমাণ কোর্ট পায়নি। কি আশ্চর্য, এটি তো আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল না। যদি অভিযোগ করা হতো তাহলে প্রমাণ দেয়া যেত। মামলার কোন পর্যায়ে এ ধরনের কোন অভিযোগ তোলাই হয়নি। তাছাড়া এটি তো একজন উকিল আর মক্কেলের ব্যাপার, একজন মালিকের সাথে ভাড়াটিয়ার ব্যাপার, এটি একটি সিভিল ব্যাপার। তাছাড়া মালিক তো কর্তৃপক্ষের কাছে কোন নালিশ করেনি। তারপর বলা হলো বাড়ি ভাড়ার দলিলটা ভাড়াটিয়ার পক্ষে বেশি পক্ষপাতপূর্ণ। কিন্তু এ ব্যাপারে কোর্টের কি বলার থাকতে পারে? এটি দুজন ব্যক্তির একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তারপর কোর্ট ১০০ টাকায় বাড়ি ফেরত দেয়ার কথা উল্লেখ করেছে। প্রায় দশ বছর সরকার অন্যায়ভাবে বাড়ি ভোগদখল করেছে, যা অন্য একজনের সম্পত্তি, যে বাড়ি পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঘোষণা করাই আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে বেআইনি, সেটা ফেরত ১০০ টাকায় দেয়া হলো

www.pathagar.com

কেন, এটি ছিল কোর্টের প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব আসামি কোথায় পাবে? এর জবাব বাড়ি যারা ফেরত দিয়েছিল অর্থাৎ সরকারকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল কোর্টের। দত্ত সাহেব থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত সবাইকে। আগেই বলেছি এটি সরকারি নীতি অনুযায়ী করা হয়েছিল। এমনকি দেশের পরিত্যক্ত সম্পত্তির আইনের অধীনেও একজন পাকিস্তানী ছাড়া অন্য কোন দেশের নাগরিকের সম্পত্তি নেয়ার অধিকার সরকারের নেই। বিভিন্ন মামলায় সুপ্রিমকোর্ট যে কয়েকটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে রায় দিয়েছেন তার অর্থ সেটিই দাঁড়ায়। আমরা ঠিক করেছিলাম, সরকার এভাবে বাড়ি না ছাড়লে হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট করে কোর্টের মাধ্যমে মক্কেলের বাড়ি ছাড়িয়ে নেব।

সামরিক রায়ে কোর্ট আর একটি অমূলক কথা উল্লেখ করল যে, এ কাজে নাকি অস্ট্রিয়ান দূতাবাসকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাদেরকে ম্যানুপুলেট করা হয়েছে। এই অভিযোগ যে কত ক্ষতিকর তা মিলিটারি চেয়ারম্যান বোঝেনি। এর প্রতিক্রিয়া যে কি ভীষণ হতে পারে সেটা ওরা জানে না। অন্য একটি সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রদূত বা দূতাবাস সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য দুটো রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কই নষ্ট করে দিতে পারে। রাষ্ট্র পরিচালনায় এসব উল্টোপাল্টা বক্তব্য বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে কত ক্ষতিকর হতে পারে তা সম্ভবত কোর্টের জানা ছিল না। কোন রাষ্ট্রদূত বা দূতাবাসকে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া এভাবে বলার অর্থ হলো, যে তারা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটি অন্যায় কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। কোন দূত বা দূতাবাসের প্রতি এরূপ কটাক্ষ তাদের সার্বভৌমত্বে আঘাতের শামিল। অস্ট্রিয়ান দূতাবাস ১৯৭২ সাল থেকে তাদের সরকারের নির্দেশে তাদের একজন নারিকের সম্পত্তি ফেরত নেয়ার জন্য সরকারের কাছে কূটনৈতিক ভাষায় যাকে "নোট ভারবাল" বলে তাই পাঠিয়েছে, তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সব জেনেশুনেই বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক পর্যায়ে এই বিষয় উত্থাপন করেছে এবং এক পর্যায়ে তারা এটাও জানিয়েছে যে এই বিষয়টির আশু নিষ্পত্তির জন্য অস্ট্রিয়ান সরকার ভীষণ গুরুত্বসহকারেই বলে এবং তার যথার্থ ফল পেতে চায়। আমরা তাদের সাথে নিজেদের থেকে কোন যোগাযোগ করিনি। অস্ট্রিয়ান তখনকার রাষ্ট্রদূত ১৯৭৪ সালে প্রথম আমাদের চিঠি লেখেন যে, তিনি ঢাকায় এলে আমাদের সাথে ইংগে ফ্লাটসের বাড়ির ব্যাপারে আলাপ করতে চান। এরপর থেকে ওনারা আমাদের কাছে বহু চিঠি লিখেছেন এবং নিয়মিতভাবে জানতে চেয়েছেন এই বিষয়ে কতদূর কি হলো এবং ব্যাপারটা কতদূর এগুলো। তিনজন রাষ্ট্রদূত ১৯৭৪ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে ঢাকায় এসেছেন সরকারের সাথে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য। এই ব্যাপারে আমাদের মক্কেল যেমন একদিকে আমাদের নিযুক্ত করেছেন উকিল হিসেবে, অন্যদিকে তিনি ভিয়েনায় তাঁর সরকারের কাছে আবেদন করেছেন তাঁর সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্য। এটি স্বাভাবিক যে, একজন মানুষ তাঁর হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার জন্য সব রকম চেষ্টা করবেন।

এই সবকিছুরই প্রমাণ রয়েছে। আমাদের সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং পূর্ত মন্ত্রণালয়ে সমস্ত তথ্যাদি রয়েছে। আমরাও সমস্ত চিঠিপত্র জমা দিয়েছি কোর্টে। যে কোন

www.pathagar.com

মানুষ এসব পড়লেই ঘটনার সত্যতা বুঝতে পারবেন, অথচ বিদেশী রাষ্ট্র এবং দূতাবাস সম্পর্কে এ ধরনের মিথ্যা এবং অমূলক অভিযোগ এনে কোর্ট শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয় দেয়নি, দেশের ক্ষতি করেছে। অস্ট্রিয়ান সরকার অত সহজভাবে ব্যাপারটাকে ছেড়ে দেবে না। এটি নিয়ে তারা কূটনৈতিক পর্যায়ে একটি নাজুক অবস্থার সৃষ্টি করবে।

গাড়ির ব্যাপারে কোর্ট নিজেই তার রায়ে উল্লেখ করেছে যে গাড়ি বা মাইক্রোবাসের কোন লগবুক বাদীপক্ষ হাজির করতে পারেনি এবং গাড়ি কোন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হয়নি বরং গাড়ি যে সরকারি কাজে শুধু ব্যবহার করা হয়েছে, সেটাই প্রমাণ হয়েছে। কিন্তু সাজা দেয়া হয়েছে এই কারণ দেখিয়ে যে, দুটি গাড়ি ব্যবহার করাতে সরকারের "নিশ্চয়ই কিছু ক্ষতি হয়েছে", সুতরাং অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। কিন্তু এরপরও সাজাটি কি দিল সেটি আর উল্লেখ করা হলো না। দুটি অভিযোগের সাজা একসাথে উল্লেখ করে দেয়া হলো।

আমি নির্বাক হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। মনে হলো আমি সব ভুল শুনছি। কোর্ট এসব বলছে না। এসব কথা অন্য কেউ বলছে, কোন শয়তান এসব কথা উচ্চারণ করছে। কিন্তু না, রায় পড়া শেষ করে চেয়ারম্যান উঠে চলে গেল। কোর্ট ভর্তি লোক ছিল। সকলের চোখে মুখে একটি বিষাদের ছায়া। যারা যুবক তাদের চেহারায় একটি কঠিন প্রতিবাদের ছাপ। যেন এখনই সব ভেঙে চুরমার করে দেবে। তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। এটি তো হওয়ারই কথা। সবই তো একটি ষড়যন্ত্র, একটি প্রহসন। আমাকে জেলে রাখার রাজনৈতিক পরিকল্পনা। এসবই ওদের মধ্যে আলাপ হচ্ছে। যারা প্রতিদিন মামলা শুনতে এসেছিল তাদের মুখে বিদ্রূপের হাসি। তারা তো সব সাক্ষীকে শুনেছে। সবই বুঝতে পেরেছে। পুলিশের এসিস্টেন্ট কমিশনার এবং অন্যান্যরা এগিয়ে এলো, গালিগালাজ করল কোর্টকে, আর সামরিক সরকারকে। কোর্টের পেশকার, বয়, আরদালির মুখে একটি দুঃখ এবং অবিশ্বাসের ভাব। ব্যারিস্টার নজরুল ইসলামের ফর্সা চেহারাটা যেন কেউ কালি দিয়ে লেপে দিয়েছে। পুরো মামলা চলার সময় তিনি একটি কথা প্রতিদিনই বলতেন, "আর কোন মামলায় কি হবে জানি না—এই মামলায় কোনদিনই কোন সাজা হতে পারে না। এটি কোন মামলাই না। সত্যিকারের কোর্ট হলে প্রথম দিনেই সব ছুঁড়ে ফেলে দিত।"

সবাই সামনে এগিয়ে এলো, জানতে চায় কি করবে ওরা। গ্রামের লোকও ছিল অনেক। বললাম, বাড়ি চলে যেতে। দেখলাম অনেকের চোখ ভিজে এসেছে। আর বোধহয় ধরে রাখতে পারেনি। একজন হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, কান্না বড় সংক্রামক জিনিস। বাকিদের মধ্যে দুয়েকজন তাই শুরু করল। কেউ কেউ নিজেদের সামলিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। হাসনাকে খুঁজলাম। আজ সবচেয়ে বেশি কষ্ট হবে যার, তাকে। কোর্টে কিছুক্ষণ থেকে সে চলে গিয়েছিল, কেন জানি না। কিছুক্ষণ পর আসল। চিন্তিত দেখাল, কিন্তু ভেতরের প্রতিক্রিয়া বুঝতে দিল না। আর একজনকে খুঁজলাম। আমানকে। তাকে দেখতে খুব ইচ্ছা করল। কিন্তু সে নেই। বাড়িতে হয়তো খেলছে নিজের মনে। এমনিতেই ও পুলিশকে ভয় করে, আর রোজ নাকি বলে আমাকে বাড়িতে ফিরে যেতে। কিন্তু আমান জানে না বা বুঝতে পারবে না যে, ওর বাবা বহু দিন কারাগারের অন্তরালে থাকবে! ওর ছোট্ট হৃদয়টা মাঝে মাঝে তড়িতাহত পাখির

www.pathagar.com

মত ছট্‌ফট্‌ করবে। চারদিকে খুঁজে বেড়াবে তার বাবাকে, কিন্তু উত্তর জানবে না। ও জানবে না কেন তাকে ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। ওর তো আর কোন ভাইবোন নেই। খেলার কোন সাথী নেই। এখন থেকে ওর মাকে নিয়েই ওকে থাকতে হবে।

আমি হাসনাকে বলেছিলাম, ওরা যখন একবার ধরেছে সাজা দেবেই। সামরিক আদালত হলো শোরুম। ওদের এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানোর জন্য হয় রাজনৈতিক আপোস আর না হয় প্রচুর টাকার দরকার হবে। এর কোনটাই যখন আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়, তখন যা হওয়ার তা হবেই। কিন্তু হাসনার মন মানে না। যোগাযোগ করেছে যাদের সাথে সম্ভব। বিশেষ করে প্রথম মামলায় খালাস পাওয়ার পর নানা জল্পনা কল্পনা। আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে। ঢাকায় ভীষণ গুজব। *ইত্তেফাকের* আনোয়ার হোসেন মঞ্জু হাসনাকে বলেছে, ও সিএমএল অফিস থেকে শুনেছে আমাকে জামিন দিয়ে দেবে। আনু-মোশাররফরা এসে বলে গেল যে, সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে আমাকে ছেড়ে দেবে। জেনারেল রহমান এই বার্তা তাদের বহন করে আমার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছে। আরো এ ধরনের অজস্র খবর। সবার মুখে একই কথা, বর্তমানের মামলাটা কোন কেইসই না। মাঝখানে একবার কামাল লোহানী এলো, সেও তাই বলল। আর মাসুদ তো রোজই ক্যান্টনমেন্টের খবর এনে এই কথাই বলছে।

কারাবন্দি আছি, কে না মুক্তি চায়? আর বিশেষ করে কে এ ধরনের একটি অপবাদ হাসি মুখে নিতে পারে? কিন্তু জানতাম এদের সাথে আমার আপোস হবে না। এদের সঙ্কীর্ণ মানসিকতার সাথে আমার মিল হবে না। হিংসা এবং বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ওরা যা করার সেটিই করবে। আমার আগেই খবর ছিল যে, প্রথম মামলাটি খালাস দিয়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মামলায় সাজা দেবে ক্রেডিবিলিটি অর্জন করার জন্য। উদ্দেশ্য একটিই, রাজনীতি থেকে আমাকে উচ্ছেদ করতে হবে। কিন্তু সাজা দিয়ে বা জেলে রেখে কাউকে কি রাজনীতি থেকে উৎখাত করা যায়? গুলি করে হত্যা করলে কিছুটা সম্ভব হয়—অন্তত রাজনীতি না হোক ব্যক্তিকে সরিয়ে ফেলা যায়। যাই হোক, যা হওয়ার তাই হলো। বাকি মামলাগুলো আরো হাস্যকর ছিল। তাই এই দুটি মামলাতেই সাজা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। সামরিক চেয়ারম্যানের কথা বাদই দিলাম, কিন্তু এই মামলায় সাজা দিতে অতিরিক্ত জেলা জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কেমন লেগেছে জানি না। ওদেরকে তো লোক দেখানোর জন্য রাখা হয়েছিল। ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এটি ছিল একটি ক্যাঙ্গারু কোর্ট (Kangaroo Court)। এই আদালত তো বিচারের জন্য তৈরি করা হয় না।

হাসনা কিছু খেতে দিল, কিন্তু মুখে দিতে ইচ্ছা করল না। আদালতে সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। হাসনাকে কি বলব ভাবছিলাম। ওকে বারান্দায় ডেকে বললাম ভাল থেকো, আমানের জন্যই আজ সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে। এদেশে থাকতে হলে এসব সহ্য করতে হবে। নিজের প্রতি যত্ন নিও। এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলতে পারলাম না। নিচে নেমে এলাম। রোজ সেখানকার কিছু কর্মচারী, কিছু দোকানদার পুলিশের গাড়িতে ওঠার আগে এগিয়ে আসে। আজও এলো। ওরা শুনেছে আমার সাজার কথা। একজন সাদা ধপধপে দাড়িওয়ালা বুড়ো ভদ্রলোক রোজই আমার সাথে হাত মেলান। কোন গরিব কর্মচারী হবেন। তাঁর সাথে

আজও হাত মিলালাম। তিনি করুণ সুরে বললেন, "আল্লাহ একদিন এর বিচার করবেন।" পুলিশের ভ্যানে গিয়ে উঠলাম। রোজ তারা কত কথা বলে, আজ সবাই চুপ। মাঝে মাঝে নিজেরাই গালিগালাজ করছে কোর্টকে। পাশে বসা রাজশাহী বাড়ি ইন্সপেক্টর রজব আলী সাহেব কিছুই বললেন না। একেবারে চুপ চাপ। মাত্র কিছুদিন হলো তিনি আমার মামলার ডিউটি করা শুরু করেছেন। গাড়ি থামলো, আমরা সবাই ভেতরে গেলাম। জেলগেটের দ্বিতীয় ফটক পার হওয়ার আগে একজন পুলিশ আমার ব্রিফকেসটা হাতে তুলে দিল। বিদায় নিলাম ওদের কাছ থেকে। হঠাৎ দেখি ইন্সপেক্টর রজব আলী একেবারে ফটকের কিনারে এসে গেছেন, আমাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাঁদতে শুরু করলেন বাচ্চা ছেলের মত, অথচ তাঁর বয়স তখন ৫০-৫৫ হবে। থামতেই চান না, অথচ মাত্র কিছুদিনের পরিচয়। আমাকে কোর্টে নেয়া আর ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ছিল তাঁর। এই আসা-যাওয়ার মাঝে এদের সাথে যে আমার একটি গভীর আত্মীয়তা জন্মেছে, সেটির প্রকাশ ঘটল মাত্র। এই নীরব আত্মীয়তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না।

রায়ের পর তিন-চার দিন আমি প্রায় নিশ্চল ছিলাম। আমি যেন সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। শুধু নিজের ওপর থেকেই নয়, পৃথিবীর সবকিছুর ওপর থেকে আমি যেন ক্রমশ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলাম। হাসনাকে চিঠি লিখে জানালাম যে, এ পৃথিবীতে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। দেনা-পাওনা সবই বুঝি চুকে গেছে। ভালমন্দ বলে যেন আর কিছুই থাকল না এই জগতে। সমাজ যেখানে এত কঠিন এবং নিষ্ঠুর, বিনা অপরাধে এত সহজে যে সমাজে মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয় সেই সমাজের প্রতি আমার কেন আর আকর্ষণ থাকবে। এত চেষ্টা করার পর, এত ভাল থাকার পরও যখন সরকারকে প্রতারণা করেছি বলে সাজা হলো সামান্য একটি বাড়িতে থাকি বলে, তাহলে এ সমাজের প্রতি আমাদের আর কোন কর্তব্য থাকতে পারে না। রোজ রোজ বক্তৃতা শুনি সামরিকদের মুখে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতার কথা। ছাত্ররাই জাতির ভবিষ্যৎ। তারাই ভবিষ্যতে দেশ চালাবে। আমিও তো ছাত্র ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমরা যারা লেখাপড়া করে সমাজে এগিয়ে এসেছি তাদের ভবিষ্যৎ কি দাঁড়িয়েছে? যাদের বলা হচ্ছে ভবিষ্যতের নেতা, তাদের সম্পর্কে আজ মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে। বলা উচিত ছিল তোমরা লেখাপড়া করো না, আর যদি করো তাহলে চুপচাপ থাকবে, আর তা না হলে টুঁটি চেপে তোমাদের হত্যা করা হবে। আর যদি সেটা না হয়, তাহলে জেলে ভরা হবে। মানুষ আর হঠাৎ করে আকাশ থেকে আসবে না। এই ছাত্ররাই যখন বড় হবে তাদেরই স্বাধীনতা কেড়ে নিতে হবে। অপবাদ দিয়ে চরিত্র হনন করতে হবে। জেলে রাখতে হবে। তাঁরা ভবিষ্যতে দেশ চালাবে বা দেশের নেতা হবে—এসব কথা বলা উচিত নয়। সত্য কথা বলা দরকার যে, তাদের ভবিষ্যতের কোন নিরাপত্তা নেই। তাদের জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করা হবে। প্রতিবাদের কণ্ঠনালিতে গরম পানি ঢেলে তাদের জীবনটাকে মুচড়ে দেয়া হবে। আমাদের ছাত্রদের এটিই আগে থেকে জানিয়ে দেয়া উচিত। যারা দেশের কাজে এগিয়ে আসবে তাদের বন্দুকের নল দিয়ে নিঃশেষ করে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

ঢাকায় লেখাপড়া শেষ করে যখন বিলেতে গেলাম তখন ওদের সমাজ ব্যবস্থা দেখে হিংসা হয়েছিল। দেশের জন্য আরো টান বেড়ে গিয়েছিল। আবেগ আর আদর্শ মনের মধ্যে আরো গভীরতা লাভ করে। পড়াশুনা শেষ করার পর দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছি যখন, তখন অনেকেই বলল দেশে ফিরে না যেতে। বলল "ঐ সমাজে টিকে থাকতে পারবে না, ওখানকার মধ্যবিত্তরা হলো ছোটলোক—ওদের চিন্তায় এবং কাজে কোন মিল নেই। ওরা সঙ্কীর্ণমনা, নিমকহারাম। ওটা একটি সাব-কালচারড জায়গা, ওখানে কোন নিয়মকানুন নেই। ওখানে গিয়ে দেশের জন্য কিছু করতে পারবে না। কারণ কেউ তোমাকে কিছু করতে দেবে না।" এ ধরনের যত কথা বলে একজনের দেশে ফেরাকে নিরুৎসাহিত করা যায়—সব কথাই নানাজনে বলেছে। দিনের পর দিন এসব নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, কত রাত যে ভোর হয়ে গেছে এসব আলোচনা করতে করতে! কেউ কেউ এমনও বলেছে, "দেশের জন্য কাজ করতে চাইলে বিলেতে বসেই অনেক কিছু করা যাবে।" কিন্তু তবুও আমরা অনেকে ফিরে এসেছি। সচেতনভাবে সবকিছু জেনেশুনে ফিরে এসেছি। আমরা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে বিশ্বাস করে লন্ডনে যে বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম, সেটি কার্যকর করতে হবে দেশে ফিরে গিয়ে। তারপর আমরা একটি স্বাধীন দেশকে গড়ে তুলবো নতুন করে—যে দেশ হবে সকল মানুষের জন্য। পাকিস্তানী সামরিকদের নির্যাতন আর শোষণ থেকে মানুষকে মুক্ত করব। সামরিকদের উৎখাত করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব। আমরা ফিরে এলাম—আবুল খায়ের খান, আলমগীর কবির, ফজলে লোহানী, সাখাওয়াত হোসেন, ফজলে হাসান আবেদ, ফজলে আলী, জাকারিয়া খান, মাহমুদুর রহমান, আরো অনেকে। এরা সকলেই যে যার ক্ষেত্রে চমৎকার অবদান রেখেছেন, কিন্তু আঃ রশীদ, লুতফর রহমান শাহজাহান, বেলায়েত হোসেন, কবিরুদ্দিন, অনেকেই খুশি নয়। যে আশা নিয়ে তারা দেশে ফিরে এসেছিল, সে আশা তাদের পূরণ হয়নি। তাদের কর্মক্ষমতা আর চেতনাবোধের কোন ব্যবহার বা মূল্যায়ন এই সমাজে হয়নি। অনেকে কোন বৃহত্তর সামাজিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশই করতে পারেনি। এই ঘুণে ধরা সমাজে গ্রামের একজন অশিক্ষিত কৃষক যেমন নিরুপায়, ঠিক তেমনি শহরের একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষও নিরুপায়। কিছুতেই কোন কিছু গড়ে তোলার উপায় নেই। আর আমার মত যারা বৃহত্তর প্রক্রিয়ায় জড়িয়েছে, তারা শুধু নিরুপায়ই নয়, তারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তাদের দেহ, মন, আত্মমর্যাদা, মূল্যবোধ, আদর্শ—সব ধুলোর সাথে মিশে গেছে। দুই বছরের মন্ত্রিত্বের জন্য দশ বছরের সাজা। সমাজের বৃহত্তর কাজে যুক্ত না হয়ে যদি স্বার্থপরের মত শুধু নিজের দিকেই নজর দিতাম, তাহলে অন্তত এই সাজা থেকে বেঁচে যেতাম। সে ক্ষেত্রে হয়তো হতাশা থাকত, কিন্তু অন্তর্জ্বালা বা তিক্ততা থাকত না।

প্রথম ক'দিন আমি নিজেকে প্রকাশ করারও ক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম। ভেতরটা কেমন জানি ফাঁকা মনে হলো। কোন কিছুতেই প্রতিক্রিয়া নেই, ভাবনার কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। চোখে কোন পানি এলো না, অথচ কাঁদতে পারলে ভাল হতো। ভেতরটা হাল্কা হতো। ভাল লাগতো, কিন্তু তা কিছুতেই হলো না। আমার কাছে নিজেকে কেন জানি

মুক্ত মনে হলো। মনে হলো সমাজে ন্যায়-অন্যায় বলে যখন কিছু নেই, তখন তো ভালই হলো। ভাল-খারাপ আর এখন থেকে বিচার করতে হবে না। এতদিন রোজ যার কাছে বিচার পাওয়ার জন্য চোখের অশ্রুতে হৃদয় ভিজিয়ে দিয়েছি, সেই বিধাতার কাছে এখন আর বিচার চাইতে হবে না। কর্নেল এবিএম ইলিয়াস সে বিচার করে দিয়েছে। এত বড় অন্যায় এবং নির্যাতন যখন এত সহজে হয়ে গেল, তখন আর কি পাওয়ার আশায় নিজের মনে স্বপ্ন বাঁধবো? এ সমাজে যখন সবকিছুই ন্যায়, আর সবকিছুই অন্যায়, সবকিছুই ভাল, আবার সবকিছুই খারাপ, সেখানে তাঁকে টেনে এনে ক্ষোভ প্রকাশ করে কি লাভ? নামাজ পড়তে তখন আর ইচ্ছা করল না। আমি যেন সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে গেলাম। আমি যেন নতুন করে মুক্ত হলাম।

অনেকেই বলবে আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। আমি জীবনযুদ্ধে পরাজয়বরণ করে নিয়েছি। আমি সংগ্রাম করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। অতি সহজে নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলার উপক্রম করেছি। কেউ বলবে এই সমাজে এসব হবেই। এইভাবেই এই সমাজ চলবে এবং এসব মেনে নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। বাংলাদেশের সমাজ একটি দারিদ্র্যে ভরা বহু শত বছরের শোষিত সমাজ। এখানকার যারা শাসক তাদের মনমানসিকতা এক শোষিত সমাজেরই প্রতিফলন। এখানে কোন মূল্যবোধ বা সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক কোন মানদণ্ডের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন হয়নি। উঠতি মধ্যবিত্তরা যেহেতু স্বার্থপর এবং কাঙাল মনোভাবাপন্ন, তাই সেখানে এই ধরনের বিচারব্যবহার তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হবে। সমাজের সর্বস্তরেই তো এইরকম নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। রাজনীতিবিদরা বলবেন দেশের এ অবস্থার পরিবর্তন আনার জন্যই তো রাজনীতি করা। এই অবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য কাউকে না কাউকে তো নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে, ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এগুলো সবই মধ্যবিত্তের মস্তিষ্কপ্রসূত মন ভুলানো কথা। যাঁরা এসব কথা বলেন, তাঁরা আসলে বাস্তবতাটি ভুলে যেতে চান, বা অন্তরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এসব স্তুতিবাক্য ব্যবহার করেন। তাঁরাও জানেন তাঁদের নিজেদের হতাশার কথা, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১, আর ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮২ সালের সমাজ বিবর্তনের কথা, সামাজিক মান এবং প্রক্রিয়ার কথা। ১৯৭১ সালে এদেশের মানুষ তো কম রক্ত দেয়নি?

আর এক দল উন্নাসিক বলবেন, এদেশে মন্ত্রিত্ব করলে তার উল্টো ফলও ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ আগে আরাম করেছ এখন তার মজা বোঝ। ক্ষমতা ভোগ করেছ এখন দুর্ভোগ পোহাও। এটি হলো ঈর্ষার কথা, পরশ্রীকাতরতার কথা।

কিন্তু কই তারপরও তো সবার বেলায় একই আচরণ প্রযোজ্য হয় না। বেসামরিক আমলারা তো গত ৮ বছরে সবচেয়ে বেশি মন্ত্রিত্ব করেছে, তাদের তো কেউ জবাবদিহি করতে বলে না, চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যায় না, জেলে ধরে রাখে না, কোন সাজা হয় না। পাকিস্তান আমল থেকে এটিই দেখা গেছে। আর সামরিক লোকদের তো কিছু হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। একটি নির্বাচিত বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে যখন সামরিক সরকার আসে, তারা বেসামরিকদের নানা রকম শাস্তি দেয়ার বিধান করে, বিশেষ আদালত বসায়,

www.pathagar.com

আরো অনেক বিধিনিষেধ কার্যকর করে। কিন্তু একটি সামরিক সরকারকে বহু রক্তক্ষয়ের পর অতি কষ্টে যখন উচ্ছেদ করে বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন তাদের সমস্ত পাপ ভুলে যাওয়া হয়। ১৯৬৯ সালে যখন আইয়ুব খান চলে গেলেন ১১ বছর শাসন করার পর, তাঁর বা তাঁর শাসনামলের কারো কি কোন বিচার হয়েছে? কোন আদালত বসেছে? অর্থাৎ ঐ সময় সমাজের ওপর যেন কোন অন্যায়, অত্যাচার বা শোষণ হয়নি? কোন দুর্নীতি হয়নি? সবকিছু ঠিকঠাক ছিল? তারপর ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে ভুট্টো যখন ক্ষমতায় এলেন, ইয়াহিয়া খানকে অন্তরীণ করে একটি কমিশন বসানো হয়েছিল শুধু। সামরিকদের জন্য এত বড় একটি হত্যাযজ্ঞ ঘটল, একটি দেশ দুই টুকরো হয়ে গেল, কিন্তু কারো কোন শাস্তি হলো না। শুধু তাই নয়, তারপর যখন ইয়াহিয়া খান মারা গেলেন তখন তাঁকে কি রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়নি?

ভুট্টো অবশ্য ১৯৭৩ সালের সংবিধানে কোন সামরিক অভ্যুত্থান বা নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতেও কোন লাভ হয়নি। অনেক জেনারেলকে ডিঙিয়ে যাঁকে তিনি বিশ্বস্ত মনে করে সামরিকপ্রধান বানিয়েছিলেন, তিনিই তাঁকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। সংবিধান অনুযায়ী জেনারেলের মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা, কিন্তু সেই জেনারেলই উল্টো তথাকথিত বিচারের নামে ভুট্টোকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছেন। ১৯৭৫ সালে যখন জাতির জনককে কিছু সামরিক অফিসার হত্যা করে তখন বেসামরিক সরকারই তাদের "সূর্য সন্তান" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং তাদের সমস্ত অপরাধকে অব্যাহতি দিয়ে আইন পাস করেছে। ১৯৮২ সালে জিয়াকে হত্যা করার পর কিছু অফিসারের ফাঁসি এবং শাস্তি হয়েছে, তার কারণ ছিল: (১) জিয়া নিজে ছিলেন একজন সামরিক জেনারেল। জিয়া যদি বেসামরিক রাজনৈতিক নেতা হতেন তাহলে কি হতো জানি না; আর (২) ব্যাপারটি ছিল সামরিক বাহিনীর দুই দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ব্যাপার, যে বিষয়ে পরে আরো বিশদ আলোচনা করেছি। ক্ষমতা তখন চলে যায় সামরিক বাহিনীর ঢাকা কেন্দ্রের কাছে। সাত্তার সাহেব নয়, এসব শাস্তির ব্যাপারে সামরিকরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে; (৩) শাস্তি হয়েছে হত্যা করার জন্য নয়, অভ্যুত্থান করার জন্য। তাহলে একটি জিনিস পরিষ্কার যে, সামরিক শাসকরা ক্ষমতায় এলে বেসামরিকদের সাথে যে ব্যবহার করে, বেসামরিকরা ক্ষমতায় এলে তা পারে না, যে কোন কারণেই হোক। তবে একটি কারণ দেখানো যায় এইভাবে যে, রাজনীতিবিদরা আইনের শাসন অনুসরণ করে বলে শাস্তি দেয়ার পথ সহজে বেছে নিতে পারে না, কিন্তু সামরিকরা আইনের শাসনের তোয়াক্কা করে না বলে নির্যাতন সহজেই করতে পারে। যাই হোক আইনের শাসন অনুসরণ করেও দেশের আইন অমান্যকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা যে যায় না তা নয়, কিন্তু ব্যাপারটির পূর্ণ বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। জানতে হবে এরকম কেন হয়? তবে এটি ঠিক যে সামরিক আর বেসামরিক ব্যাপারটি একটি নিতান্তই রাজনৈতিক বিষয় এবং একে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই দেখা বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

মন্ত্রিত্বের প্রশ্নে আসা যাক, যার খেসারত দেয়ার জন্য দশ বছরের সাজা ভোগ করেছি। বাংলাদেশ একটি গরিব দেশ, সবকিছুই প্রায় দানখয়রাতের ওপর নির্ভর করে। মাসিক বেতন দুহাজার টাকা। না আছে ইজ্জত, না আছে ক্ষমতা। আমাদের মত পেশাজীবীদের জন্য অর্থনৈতিক বিচারে একটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক পদ। মন্ত্রিত্বে থাকলে দেশের জন্য যে খুব বেশি কিছু করা যায়, তাও আমি মনে করি না। কি তার এত দাম যে এত বড় খেসারত দিতে হবে? বরং মন্ত্রিত্বে আমি হতাশ হয়েছি। যে আশা নিয়ে সরকারে যোগ দিয়েছিলাম সেটা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। যদিও কারো জন্যই তা সম্ভব নয়। এই অবস্থার জন্য দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাই দায়ী। মন্ত্রিত্বে যদি কিছুটা সন্তুষ্টি পাওয়ার কারণ থেকে থাকে সেটা হলোঃ

১. সেই সময় একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধার করার জন্য যেটুকু কাজ করেছিলাম;

২. কিছু গরিব মানুষের উপকার করার সুযোগ পেয়েছিলাম, আর নোয়াখালী জেলা এবং নিজের নির্বাচনী এলাকার সাধারণ মানুষের উপকারার্থে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করে দিয়েছিলাম;

৩. আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী গঙ্গার পানি বৃদ্ধির ব্যাপারে নীতিগতভাবে নেপালের অন্তর্ভুক্তিটা ভারতকে দিয়ে গ্রহণ করিয়ে দিয়েছিলাম। এছাড়া ওজারতির বছরগুলোতে গর্ব করার বা আত্মতুষ্টির মত আর কিছু করেছি বলে মনে করি না। যে কোন লোক টেলিযোগাযোগ বা বিদ্যুৎ-পানিসম্পদমন্ত্রী হলে ওসব কাজ হয়তো করতে পারতেন। কোন অসুবিধা হতো না। পেশা ছেড়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যা অর্জন করেছি, সেসবকে নগণ্য বলে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়া যায়।

এছাড়া আমার এই সাজাকে অত খারাপ লাগতো না, যদি আমার সাজাটিকে বৃহত্তর জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখতে পারতাম। ১৯৫৫ সালে ভাষা আন্দোলনে জেলে এসেছিলাম, ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসনের প্রাক্কালে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জেলে এসেছিলাম। এবার বিএনপিকে একটি রাজনৈতিক পথে আনার প্রক্রিয়া শুরু করা মাত্রই এই কারাবরণ। আর যদি দুমাস বাইরে থাকতে পারতাম, একটি সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা যেত। বেগম জিয়াও রাজি হয়েছিলেন। কয়েকটা বৈঠকও হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর জেরাও করেছে সব রাজনৈতক ব্যাপার নিয়ে। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়, বিএনপি এখনো একটি রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়নি। এর অনেক সমস্যা। এটি কোনদিন একটি সংগ্রামী রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে কিনা বলা কঠিন। তাই অতটা ভয় পাওয়ার কি ছিল সরকারের? তাছাড়া যদি শুধু সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে শ্লোগানটা বা "চিনেছি চিনেছি জিয়ার খুনিকে চিনেছি, জিয়া হত্যার বিচার চাই, জেনারেল এরশাদের বিচার চাই"—এ ধরনের শ্লোগানের জন্যই এই শাস্তি হয়ে থাকে,

www.pathagar.com

সেটিকেও দুঃখজনক বলতে হবে। কারণ এ ধরনের কোন শ্লোগান আমি দেইনি এবং কাউকে দিতেও বলিনি। অনেকে বলে এই সামরিক শাসন আসার পর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার আন্দোলনের প্রথম শিকার হয়েছি আমি এবং এটিকে আমার সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা উচিত। কথাটি যতই সত্য হোক না কেন, তারপরও আমার বিষয়টি যেন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো যে যার মত কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু বিএনপির তেমন কোন তৎপরতা নেই। এর সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক দুর্বলতার জন্য সে ধরনের কোন ভূমিকা নিতেও অনেক সময় লাগবে।

তাছাড়া আমাকে এই ধরনের একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন মামলায় সাজা দিয়ে সামরিক শাসকদের কি লাভ হয়েছে? নিজেদের একটি ভুয়া আন্তর্জাতিক ইমেজ রাখার জন্য—যে তারা রাজনৈতিক কারণে আমাকে জেলে রাখেনি, একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে রেখেছে—এরকম ধারণা তাদের জন্য নিজেদের আত্মতৃপ্তির কারণ হতে পারে, কিন্তু তার বেশি আর কিছুই নয়। দেশে এবং বিদেশে যারাই খবর রাখে, কি কারণে আমাকে জেলে রাখা হয়েছে তারা সবই জানে। মাঝখান থেকে সরকারের ইমেজই নষ্ট হয়েছে, বিশেষ করে বিদেশে। কাগজে লেখালেখি, বিবিসি, ভোয়ার প্রচার এবং নানা দেশ থেকে এত চিঠিপত্র—এসব সরকারকে শুধু বিব্রত করারই কথা। বিব্রত হয়েছেও ঠিক। *ইকনমিস্ট* পত্রিকায় মামলাটির রায়কে "লিগ্যাল ননসেন্স" পর্যন্ত বলেছে, সেটা আবার বিবিসি ফলাও করে প্রচারও করেছে।

তার ওপর প্রথম মামলায় যেমন কুয়েত ফাণ্ডের মত সংগঠনকে অসন্তুষ্ট করা হয়েছে, এই মামলাতেও একজন বিদেশী নাগরিকের সম্পত্তি, যাঁর নিজের কোন নালিশ নেই, তাঁকে ধরে টানাটানি করা হলো এবং তাঁর আইনসম্মত সম্পত্তি আদালত কর্তৃক ফেরত নিয়ে নেয়ার সুপারিশ করায় অন্যান্য বিদেশী নাগরিক এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে এই রায়ের ব্যাপারে একটি অশুভ প্রতিক্রিয়া হলো। ইউরোপীয় সমস্ত দূতাবাস তাদের নিজ নিজ সরকারকে এটি জানিয়েছে। তারপর অস্ট্রিয়ার দূতাবাস সম্পর্কে ঐ ধরনের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ার কথা আগেই বলেছি। সবকিছু মিলিয়ে দেখলে প্রশ্ন জাগে এই মামলাগুলোতে কার লাভ হয়েছে? গুটিকয়েক সামরিক অফিসারের খামখেয়ালি এবং তাদের একটি অহমিকার জন্য দেশের ক্ষতি হলো এবং সরকারেরও ক্ষতি হলো। ওরা এসব বুঝতে পারে কিনা আমার সন্দেহ। শুধু আমাকে জেলে রাখার জন্য? কতদিন? মামলায় যদি এককণা সত্যতা থাকত তাও হতো। পৃথিবীর নানা দেশের আন্তর্জাতিক সংগঠনের কাছে এই মামলার চার্জশিট, সাক্ষীদের বক্তব্য, সওয়াল-জবাব এবং অন্যান্য কাগজপত্র পৌঁছেছে। এখানকার বিভিন্ন সংগঠন দেখেছে, সকলেই জানে এটি কোন মামলা নয়। আমাকে নেহাত রাজনৈতিক কারণে সাজা দিয়ে জেলে রাখার মনোভাব বজায় রাখতে গিয়ে তাদের ক্ষতিটা আরো বেশি হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা একদিন ফেরত দিতেই হবে। হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার একদিন এই সরকারকেই বহাল করতে হবে। এই বিচারের বিচার সেদিন তো হবে। তারপরও আল্লাহ্‌র রোজহাসরের ময়দানে আখেরাতের বিচার তো রয়েছেই।

www.pathagar.com

তবুও মন শান্ত হয় না। বার বার সেদিনের জেলগেটে দাঁড়ানো পুলিশ ইন্সপেক্টরের কান্নায় ভেঙে পড়ার কথা মনে পড়ে। তাঁর মুখে থাকত সবসময় হাসি। সেদিন কেঁদে মুখ ভাসিয়ে দিলেন। মাত্র অল্প কয়দিনের পরিচয়। তাঁরও মনে নিশ্চয়ই অনেক দুঃখ রয়েছে। তাঁর সাত ছেলে তিন মেয়ে। বেতন পান ৮০০ টাকার মত। ঢাকায় ব্যারাকে থাকেন। পরিবার থাকে রাজশাহীতে। বড় ছেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এম.এ. ফাইনাল ইয়ারে। আর দেড় বছর বাকি আছে অবসর গ্রহণের। তাঁর ছেলে পাস করে চাকরি পেলে পরিবারের ভার গ্রহণ করবে। আর যদি চাকরি না পায় তাহলে তাদের জীবন ভেসে যাবে। দ্বিতীয় ছেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, প্রথম বছর। তিনি অনেক কষ্ট করে এদের লেখাপড়া করাচ্ছেন। পয়সার অভাবে বাকিদের লেখাপড়ার আর কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি। আর দেড় বছরের মধ্যে তাঁর কর্মজীবন শেষ হয়ে আসবে। তাঁর বাবাও পুলিশে ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন তাঁর কোন ছেলেকে আর পুলিশে দেবেন না। পুশিলকে এখন সবাই ব্যবহার করে, সামরিকরা এসে ওদের অনেকের চাকরি নিয়ে নিয়েছে বিনা কারণে। ন্যায়পরায়ণতা এবং নিজেদের সত্তা—এখন আর কোনটাই বজায় রাখা যাচ্ছে না। ছেলেগুলো লেখাপড়ায় ভাল। নিজেও ৩২ বছর চাকরিতে আছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে কারো প্রতি কোনদিন অন্যায় করেননি বলে তিনি দাবি করেন। কথাটা সত্য নিশ্চয়ই। ছেলেরা কিছু একটা হবে, চাকরি নিয়ে সকলের দেখাশুনা করবে—এই তাঁর আশা। বড় ছেলে স্বাধীনতাযুদ্ধে মারা গেছে। তাঁর ধারণা, সে বেঁচে থাকলে আজ আর কোন দুশ্চিন্তা তাঁকে গ্রাস করতে পারত না।

এতক্ষণ নিজের সেলের দরজার মোটা শিকগুলো ধরে দূরের উঁচু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। খেয়াল করিনি কখন চেয়ার থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়েছি, দারিদ্র্যের অসহনীয় জ্বালায় মুখে, দেহে, হৃদয়ে চাবুক খাওয়া সেই ইন্সপেক্টর রজব আলীর কথা ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে এসেছে তখন। বসন্তের কোকিল ডাক দেয়া শুরু করেছে। বাইরের বারান্দায় রাতে পাহারা দেয়া সিপাহী আলতাফের ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে পড়েছে রেলিংয়ের ওপর। মুখের হাড়টা বাতির আলোতে আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তার। রুগ্ন শরীর, ১৮ বছর একই কাজ করছে। জেলে বন্দিদের পাহারা দেয়। শেখ মুজিব যখন এই সেলে ছিলেন তখন ঐ সিপাহীকে না দিয়ে নিজে কিছু খেতেন না। ঐ কথা বলে এখনো সে গর্ববোধ করে। মুজিবের কথা ভেবে তার চোখে কান্না আসে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৭

হাসপাতাল থেকে কারামুক্তি

ট্রেনখানা শেষ পর্যন্ত দিনাজপুর রেল স্টেশনে এসে থামলো। দেখি, আমাদেরকে নিতে পুলিশ রেলওয়ে স্টেশনে হাজির। আমার মালপত্র, যার মধ্যে ছিল ছালায় ভরা বই, নদী পার হওয়ার সময় ভিজে যাওয়ার কারণে আমার চিন্তা ছিল বেশি। বইগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, প্রায় শ'খানেক বই ছিল ছালায়। আমার সঙ্গে ক্যাপ্টেন মুনির, এই মুনির ছিল জিয়া হত্যার সময় চট্টগ্রামে, তখন সে সেখানে জেনারেল মঞ্জুরের অধীনে কাজ করত। একেবারে সাদাসিধে যুবক, কিন্তু সামরিক আদালতে তার ২০ বছরের সাজা হয়েছিল। দিনাজপুর জেলখানা কেন্দ্রীয় কোন কারাগার নয়, একটি জেলা পর্যায়ের কারাগার। এখানে রাজনৈতিক নেতাদের রাখার বা ক্লাস ওয়ান প্রিজন সেল বলে কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেইজন্য প্রথমে আমাকে একটি নতুন তৈরি করা কনডেম সেল অর্থাৎ ফাঁসির আসামিদের ফাঁসি হওয়ার আগে কিছুদিন যেই সেলে রাখা হয়, সে ধরনের সেলে রাখা হলো। এখানে একেবারে কোন আলো বাতাসের চিহ্ন ছিল না, সূর্যের আলো হয়তো কোনমতে দিনে আধ ঘণ্টার জন্য দেখা যেত। কামরাটি খুব ছোট, কিন্তু এর থেকে ভাল জায়গা দিনাজপুর জেলখানায় আমার জন্য তখন আর ছিল না। যাই হোক পরে আমাকে আর মুনিরকে একটি বড় কামরায়, যেখানে সাধারণ কয়েদিরা থাকত সেটাকে পরিষ্কার করে আমাদেরকে সেখানে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। ঘরটি বিরাট, কিন্তু স্যাঁতসেঁতে, চুনকামের কোন বালাই নেই। তবু মোটামুটিভাবে আগের সেলের চেয়ে ঢের ভাল। অন্তত খোলামেলা জায়গা ছিল, একটি ছোট উঠান ছিল, পানির কল ছিল, আর দুই একজন ফালতু ছিল যারা আমাদের রান্নাবান্না করে দিত। কয়েদিরা যখন শুনলো আমি এসেছি তাদের তো মহাআনন্দ। মফস্বলের জেলখানাগুলোতে অত কড়াকড়ি থাকে না। কয়েদিরা দল বেঁধে এসে দেখা করেছে। তারা তাদের মামলা-মোকদ্দমার কথা বলেছে, জেলখানার করুণ অবস্থার কথা বলেছে। সেই একই অভিজ্ঞতা। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যেরকম দেখেছি, এখানে ও তাই। আসামিরা বেশিরভাগ এখানেও হাজতি অর্থাৎ বিচারাধীন বা অনেকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। ৫৪ ধারায় কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া সন্দেহবশত আটক রাখা হয়েছে। অনেক ছোট ছোট ছেলেকেও দেখেছি যাদেরকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে, কি কারণে জানা কঠিন। এখানেও ধারণক্ষমতার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেশি কয়েদি। যাই হোক, একটি মফস্বলী পরিবেশ জেলখানাতেও বিরাজ করছিল।

www.pathagar.com

দিনাজপুর এসে নিজেকে ধাতস্থ করতে বেশ কয়েকদিন সময় চলে গেল। আমি সময় নষ্ট করতে চাইনি। কারণ, আমি আমার এই জেলবাসকে লেখার কাজের জন্য অপূর্ব সুযোগ মনে করেছি। আমি দিনে প্রায় ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা লেখার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতাম। শুধু খাওয়া, গোসল করা, আর নামাজের সময় ছাড়া বাকি সময়টুকু আমি আমার নিজের চেয়ার টেবিলে বসে আমার লেখার কাজ করতাম। মুনির টগবগে যুবক, সে উঠে শরীরচর্চা করত অনেকক্ষণ ধরে। ঐ নিয়েই নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করত সে। দিনাজপুর জেলে হাসনা জানালো, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকার সময় আমার যখন বিচার চলছিল, তখন সে জানতে পারে যে, আমাদেরই হাইকোর্টের একজন বিচারপতির স্ত্রীর সঙ্গে এরশাদের একটি সম্পর্ক রয়েছে এবং তিনি মাঝে মাঝে সেই মহিলার সাথে রাতে দেখা করতে যান। এরশাদের সেই মহিলা আবার কোন একসময়ে হাসনার সঙ্গে স্কুলে লেখাপড়া করতেন। সেই সূত্রে তাঁর সাথে হাসনার যোগাযোগ হয়। এরশাদ নাকি তাঁর সেই বান্ধবীকে বলেছেন, আমাকে শাস্তি দিতে হবে, কারণ আমি বেগম জিয়ার সঙ্গে রাজনীতি করি এবং আরো নানা রকমের কথা। সামরিক শাসনের আমলে সামরিক অফিসাররা মানুষকে বিপদে ফেলে নানা ধরনের সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে। এরশাদ নিজেও নিয়েছেন, যেমন বদরুদ্দীনের স্ত্রী মরিয়মের কথা বলা যেতে পারে। তাঁকে এরশাদ বিয়ে করেছিলেন বলে তিনি দাবি করেছিলেন। সেটা নিয়ে অনেক লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছে। এরশাদ এ ধরনের অনেক কাজ করেছেন। হাসনার ঐ বান্ধবীর সূত্র ধরে একজন সামরিক অফিসার আমার মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করবে বলে হাসনার সঙ্গে যোগাযোগ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন চাকমা অফিসার। বাসায় এসে সে বলে গেছে যে আমার চিন্তা করার কোন কারণ নেই। আমার মুক্তি হয়ে যাবে, কারণ মামলাগুলো সব মিথ্যা এবং আমাকে একটি শিক্ষা দেয়ার জন্যই জেলখানায় নেয়া হয়েছে। আমার অপরাধ একটিই, কেন আমি এরশাদের বিরুদ্ধে শ্লোগানের ব্যবস্থা করেছিলাম জিয়ার মাজারের সামনে? যাই হোক আমার ইংরেজি বইটির লেখা যখন শেষের পথে, যা পরবর্তী সময়ে Democracy and the Challenge of Development নামে ছাপা হয়েছিল, আমি তার পাশাপাশি নিজের জীবনকে নিয়ে এই প্রথমবারের মত বাংলায় লেখা শুরু করলাম। স্বীকার করি আমি বাংলায় তেমন ভাল লিখতে পারি না এবং অভ্যস্ত নই। যাই হোক, তবু লেখা শুরু করে দিলাম এবং মাসখানেকের মধ্যে লেখা বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল।

দিনাজপুর জেলে প্রায় দুমাস ছিলাম। ঢাকা থেকে মফস্বলের কোন জেলখানায় রাজনৈতিক নেতারা গেলে তাদের সমাদর আরো বেড়ে যায়। কারাবন্দিরা অনেক উৎসাহিত বোধ করে, তাদের মধ্যে অনেক উদ্দীপনা বাড়ে। কারা কর্তৃপক্ষ অনেক সম্মানের সঙ্গে তাদের দেখাশুনা করেন। তাই যদিও ঢাকার তুলনায় দিনাজপুর জেলখানার বসবাস করার অবস্থা অনেক খারাপ, তারপরও তারা যতটুকু সম্ভব সেখানে থাকার সুব্যবস্থা করার চেষ্টা করে। এর মধ্যে হাসনা একদিন আমানকে নিয়ে আসল। ২ দিন দিনাজপুরে ছিল তারা। রাত কাটিয়েছে দিনাজপুর সার্কিট হাউসে। বাইরের খবর জানার জন্য কারাবন্দিদের মনে এক বিরাট উৎকণ্ঠা থাকে, বিশেষ করে দেশের অবস্থা জানার জন্য। তবে একজন কারাবন্দির জন্য সবচেয়ে

www.pathagar.com

মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তার নিজের মুক্তি। হাসনা তার সমস্ত প্রচেষ্টার কথা জানালো। মিলিটারি অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলল। এরশাদের বান্ধবীর মাধ্যমে কথাবার্তা হয়েছে বলে জানালো, কিন্তু কি কথাবার্তা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। কোন আপোসের জন্য নয়, আমার দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আমি যে রিভিউ করার জন্য আপিল করেছি তার জন্য। হাসনাকে দেখে ভাল লাগল। চুল ছোট করেছে, কপালে টিপ দিয়েছে, মোটামুটি হাসি খুশি, বেশ আত্মবিশ্বাসী বলে তাকে মনে হলো। আমানকে কারা কর্তৃপক্ষ কারাগারের ভেতরে যেতে দিল। আমানের ফুর্তি যেন ধরে না। তার বাবা কোথায় থাকে, কিভাবে থাকে, সেসব দেখার উৎসাহ তার চোখে মুখে ধরা পড়ল। সে ইটের ভাঙা একটি দেয়ালের ওপরে টপকে টপকে হেঁটে বেড়ালো আমার চোখের সামনে।

দিনাজপুর জেলে আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গেল। স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটল। আমাকে রাজশাহী জেলে বদলি করার জন্য ডাক্তার পরামর্শ দিল। কিন্তু রাজশাহী জেলেও তেমন কোন ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। তবে শেষ পর্যন্ত ঢাকার পিজি হাসপাতালের প্রিজন সেলে ভর্তির অর্ডার এলো। আবার দিনাজপুর থেকে ঢাকায় ফিরে এলাম। ভোরবেলায় পৌঁছলাম। হাসনা, আমার শাশুড়ি বেগম জসীমউদ্‌দীনকে নিয়ে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। বেশি কথা বলার সুযোগ হলো না। সেখান থেকে আমাকে সোজা পিজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আমাদের আরো কিছু সহকর্মীর সাথে দেখা। তাঁরাও চিকিৎসার জন্য প্রিজন সেলে এসেছেন। ওবায়দুর রহমান, তানভীর সিদ্দিকী এরা সবাই ছিলেন। লতিফ সিদ্দিকীর সাথে সেখানেই দেখা। জেলখানা থেকে প্রিজন সেল অনেক ভাল। শুধু থাকা-খাওয়া নয়, পরিবেশটাও ভাল। খোলামেলা, জানালা দিয়ে অনেক দূর দেখা যায়, মানুষ দেখা যায়, যানবাহন দেখা যায়, মুক্ত আকাশ দেখা যায়। শরীরটা আস্তে আস্তে ভাল হতে লাগল। জুন মাসে আমার আপিল প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে বলে খবর পেলাম। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দুজনের কাছে আমার কাগজপত্র পাঠানো হয়েছিল, জানি না শেষ পর্যন্ত কোন্ পর্যায়ে কোন্ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা জেলে গেলে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ হয় পরিবারের। স্ত্রীর ওপর প্রচণ্ড একটি মানসিক চাপ পড়ে। ছেলেমেয়েদের মনের মধ্যে নানা রকমের প্রতিক্রিয়া হয়, বিশেষ করে যাদের বয়স কম। এমনকি ৩-৪ বছরের শিশুদের মনও প্রকটভাবে প্রভাবিত হয়। এই ঘটনা তাদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সন্তানদের পিতামাতা ক্ষুব্ধ হন বিচলিত হন। বন্দির স্ত্রীকেই তখন নানা দিক সামলাতে হয়। আর্থিক, সামাজিক, সবটাই। মানুষের দ্বারে দ্বারে যেতে হয়। সচিবালয়ে যেতে হয়, আদালতে যেতে হয়। আইনজীবীদের কাছে যেতে হয়। স্বামীর জন্য জেলখানায় প্রথম শ্রেণীর মর্যাদার জন্য অফিসারদের কাছে ধর্ণা দিতে হয়, নানাজনের কাছে নানা বিষয়ে তদবির করতে হয়। স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি নিতে হয়। এসব করতে গিয়ে তাঁদের নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়। হয়রানি এবং অপমান সইতে হয়। সবচেয়ে অসুবিধা হয় যাদের আর্থিক অনটন থাকে তাদের এবং তারাই সংখ্যায় বেশি। তাঁরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

তাঁদের টাকা ধার করতে হয়, না হয় অনুদান চাইতে হয়, অনেকটা ভিক্ষা চাওয়ার মত। এর ওপর পরিবারের খাওয়াদাওয়া, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, জামাকাপড়, আরো শত রকমের দৈনন্দিন খরচ জোগাড় করা এ সময় কত যে কঠিন হয়ে ওঠে তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই বোঝেন, অন্যদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, তাঁদের বোঝানোও সম্ভব নয়। ভুক্তভোগী অর্থাৎ বন্দিদের স্ত্রীদের মলিন মুখ আর চোখের কান্না সহ্য করা মুশকিল হয়ে পড়ে। একই কথা প্রযোজ্য প্রায় সকল প্রকার কারাবন্দিদের পরিবারবর্গের ক্ষেত্রে। যাঁরা একেবারে গরিব তাঁদের যন্ত্রণা এক রকম। আর মধ্যবিত্তদের যন্ত্রণা আর এক রকম। সেটা আরো গভীর হয় নানা সামাজিকতার কারণে। আমার এই কারাবাসের জন্য হাসনাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে এবং তাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে।

৭ জুলাই আমার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী ছিল। প্রিজন সেলের বারান্দায় আমি নামাজ পড়তাম। সেদিনের এশার নামাজ পড়া শেষ করে দরূদ পড়ছিলাম, সে মুহূর্তে খবর এলো যে আমার মুক্তির আদেশ এসেছে। বিকালে এডভোকেট ওদুদ এসে খবর দিয়ে গেলেন যে সরকার আমাকে জামিনে মুক্তি দিতে রাজি হয়েছে। আমি বললাম খবর দিতে যে, আমি জামিনে বের হব না। আইনগতভাবে আমার আপিলের রিভিউ নিষ্পত্তি যেভাবে হবে সেই অনুযায়ী আমার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। আমার আপিল নাকচ হয়ে গেলে আমি জেলে থাকব, আর আপিল মঞ্জুর হলে আমি মুক্তি পাব। জামিনের প্রশ্ন কেন আসে? জামিনে মুক্তি দেয়ার বিষয়টিকে আমার ওপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার একটি কৌশল হিসেবে দেখেছিলাম। খবরটা হাসনাকে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য বলি। এর তিন-চার ঘণ্টা পর ঢাকা জেলের একজন ডেপুটি জেলার এবং আরো একজন অফিসার আমার মুক্তির আদেশ নিয়ে প্রিজন সেলে উপস্থিত হলেন। জায়নামাজ থেকে উঠে এসে যখন তাঁদের সঙ্গে দেখা করলাম, তখন তাঁরা আমার নিঃশর্ত মুক্তির খবরটা দিলেন। আমি ফিরে গিয়ে মোনাজাত শেষ করে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেদিন রাত ৯ টার দিকে আমি প্রিজন সেল থেকে মুক্তি পেলাম। সেদিন বাবার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল ছিল আমাদের কায়েতটুলীর বাড়িতে। ভাই, বোন, আত্মীয়স্বজনদের সেইদিন খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেই খাবার তারা প্রিজন সেলে পাঠিয়েছিল আমার জন্য। সেই খাবার নিয়ে আমি সোজা চলে এলাম গুলশানের বাড়িতে, যেখানে হাসনা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়েছিল অধীর আগ্রহে। হাসনা বৈঠকখানা ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল। আমি যেদিন গ্রেপ্তার হই, সেদিনও আমি এশার নামাজে জায়নামাজের ওপরে বসা ছিলাম। কি উদ্ভূত মিল, গ্রেপ্তার ও মুক্তির ২টি সময়ই আমি জায়নামাজে বসা ছিলাম।

প্রায় আট মাস বন্দিজীবনযাপন করার পর ৭ জুলাই ১৯৮৩ সালে নিঃশর্তভাবে মুক্তি লাভ করে আমি হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আসার পরপরই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আমাকে টেলিফোন করে বললেন 'Let us forgive and forget'। তিনি আমার সাহায্য চান এবং একসঙ্গে কাজ করতে বলেন। আমি বললাম আমার পক্ষে তাঁকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। কথা সেখানেই শেষ।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৮

কারাগারে গ্রন্থ রচনা

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম কারাবন্দি হই আওয়ামী লীগ শাসনামলে। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর জরুরি আইন ঘোষণা করলেন এবং ২৯ তারিখের ভোরবেলায় আমি গ্রেপ্তার হই। তখন কারাগারে থাকি বিনা বিচারে প্রায় তিন মাস। এরপর এরশাদ ক্ষমতা দখল করার প্রায় ৮ মাস পর ১৪ নভেম্বর সামরিকরা আমাকে গ্রেপ্তার করে। সেই কারাবাস ছিল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য, প্রায় আট মাস। ১৯৯০ সালে সরকার পতনের পর অন্তরীণ এবং কারাবন্দি থাকি বিনা বিচারে প্রায় চার মাস। পাকিস্তান আমল থেকে এই পর্যন্ত আমাকে মোট পাঁচবার কারাবরণ করতে হয়েছে। আমি প্রথমে কারাবন্দি হই ১৯৫৫ সালে ভাষা আন্দোলন, বিনা বিচারে এক মাস।

কারাবন্দিরা অবশ্যই এক দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের বেলাতেও তাই। কারাগারে সাধারণ কয়েদিদের জন্য বিভিন্ন কাজ থাকে, যেমন বাগান করা, শাকসব্জির চাষ করা, পানি সরবরাহ করা, রান্না করা, ঝাড়ু দেয়া, পুরো জেলখানাকে পরিষ্কার করা এবং আরো অনেক কিছু। ওদের একটি দৈনিক রুটিন আছে, একটি সিস্টেম কার্যকর রয়েছে। যার ফলে তাদের মধ্যে একটি ব্যস্ততা আছে। কিন্তু রাজবন্দিদের বা প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত কারাবন্দিদের জেলখানায় দিনেরবেলায় কিছু করার থাকে না, কেউ কেউ বই পড়েন—তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। অনেকে খবরের কাগজ এবং ম্যাগাজিন পড়েন। কিন্তু তারপরও হাতে প্রচুর সময় থেকে যায়। তাই বেশিরভাগ সময় রাজবন্দিরা আড্ডা দিয়ে সময় পার করে দেন। ঐ আড্ডায় সরকারের সমালোচনা, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, দেশের সব সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা, ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় থাকে। যেসব সেলে খেলাধুলার সুযোগ আছে সেখানে রাজবন্দিরা বিকালে ব্যাডমিন্টন খেলেন বা ক্যারাম বোর্ড খেলেন। সুযোগ থাকলে বাগানে কাজ করেন। ভোরবেলায় শরীরচর্চা করেন। তবে রাজবন্দিদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হলো তাস। সন্ধ্যায় লকআপের পর সেখানে হ্যারিকেন থাকে। তার মৃদু আলোতে কিছু করা যায় না। তাই রাতে রাজবন্দিদের প্রায় বাধ্য হয়েই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না।

www.pathagar.com

আমি জেলখানায় নিজের সময়টিকে ওভাবে পার করতে চাইনি, বরং সময়ের পুরোপুরি সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছি পড়াশোনা ও বই লিখে। লেখার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে জীবনের সেই নিঃসঙ্গ সময়ে কিছুটা হলেও আনন্দের খোরাক খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি। এতে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি ছিল। আমি কোন স্কলার নই বা কোন পেশাগত লেখক বা সাহিত্যিক নই। পরীক্ষায় কোনদিন ফার্স্ট হইনি বা স্ট্যান্ডও করিনি। ফলাফল সবসময় গড়পড়তা বা মাঝারি মানের ছিল। সুতরাং আমার কোন বই লেখার কথা নয়। কেউ প্রত্যাশাও করেনি। তবে কিছু লেখার জন্য আমার ইচ্ছাটা ছিল খুবই প্রবল। সৃষ্টিশীল কিছু করার জন্য আমার মধ্যে সবসময় এক ধরনের ব্যাকুলতা কাজ করে, এ ধরনের কাজ আমাকে প্রবলভাবে টানে। এটি কিছুটা আমার বাবার প্রভাবের কারণেও হতে পারে। তিনি সবসময় লেখাপড়া করতেন এবং উঁচুমানের স্কলার ছিলেন।

আমি যখনই জেলে গিয়েছি, তখনই কিছু বইপত্র সবসময় সুটকেসে ভরে নিতাম এবং সাথে সাথে নিজের সময় ব্যবহারের জন্য একটি রুটিন নির্ধারণ করে নিতাম। কত ঘণ্টা পড়ার জন্য, আর কত ঘণ্টা লেখার জন্য, কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত, একেবারে ছক বাঁধা এক ধরনের নিজে থেকেই নিজের ওপর চাপিয়ে দেয়া শৃঙ্খলার মত। আমার জমানো এবং সংগৃহীত বিভিন্ন ফাইল এবং আরো প্রয়োজনীয় বইপত্র প্রথম দুয়েকদিনের মধ্যেই লিস্ট পাঠিয়ে বাড়ি থেকে আনিয়ে নিতাম বা সেগুলো ছাড়াই চলমান কোন কাজের ওপর লেখা শুরু করতাম। অনেক সময় কোন একটি বিষয় ঠিক করে লেখা শুরু করে দিতাম। এইভাবে আমার তিনটি বই জেলখানাতে নিজের হাতে long hand-এ লেখা। প্রথমটি Constitutional Quest for Autonomy, বাংলায় অনূদিত "স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা", দ্বিতীয়টি Era of Sheikh Mujibur Rahman বাংলায় অনূদিত "শেখ মুজিবের শাসনকাল", আর তৃতীয়টি Democracy and the Challenge of Development যা এখন লিখছি। অনুবাদসহ বইগুলো বাংলাদেশে ঢাকায় দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ছাপিয়েছে, আর দুটোই অনুবাদ করেছে বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী সুহৃদ জগলুল আলম। সমস্যা হলো, প্রতিটি বই ছাপাতে অনেক বছর সময় লেগেছে। কারামুক্ত হওয়ার পর ৫ থেকে ৭ বছর পর্যন্ত। কিন্তু তারপরও বই শেষ পর্যন্ত ছাপানো হয়েছে। এইজন্য প্রয়োজন হতো অনেক ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের। কারণ একবার জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর বইয়ের ওপর কোন মৌলিক কাজ করা আর সম্ভব হতো না। একটানা হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি খুলে দেখার সময় হতো না ঢাকার পরিবেশে। প্রতিবারই এইসব পাণ্ডুলিপি সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা চূড়ান্ত করার জন্য আরো গবেষণা করতে হয়েছে, fact-figures এবং বিভিন্ন তথ্যাবলি বার বার check, re-check করতে হয়েছে। প্রতিটি পাণ্ডুলিপি অন্তত তিন-চারবার পুরোটা টাইপ করতে হয়েছে। প্রথম বই Constitutional Quest for Autonomy'র ওপর কাজ করার জন্য ১৯৭৬ সালে জার্মান সরকারের সহায়তায় হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউটে ফেলোশীপ নিয়ে যাই। দ্বিতীয়টি Era of Sheikh Mujibur Rahman-এর জন্য ১৯৮০তে ফেলোশীপ

www.pathagar.com

নিয়ে যাই আবারও সেই হাইডেলবার্গে এবং ১৯৮০-৮১ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্সে, তৃতীয়টি Democracy and the Challange of Development-এর জন্য, যেটা এখন লিখছি কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে, সেই সুযোগ কবে আসবে, জানি না। কিন্তু তারপরও প্রতিটি বই চূড়ান্ত করে প্রকাশকদের হাতে তুলে দেয়ার আগে আরো দুতিন বছর চলে যায়, কারণ পুনরায় বার বার করে পাণ্ডুলিপিটা তখন পড়তে হয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়ার মত। রাজনীতি এবং একটি ব্যস্ত আইন পেশায় নিয়োজিত থাকায় এ ধরনের গুরুতর কাজ করার জন্য সময় এবং পরিবেশ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। গাড়িতে, কোর্টরুম, গভীর রাত বা একেবারে ভোরবেলা, ইংল্যান্ড-আমেরিকার রেল স্টেশন, বাস, রেলগাড়ি আর বিদেশ ভ্রমণের সময় উড়োজাহাজ, যখন যেখানে পেরেছি এক পাতা দুই পাতা হলেও আর একবার চোখ বুলিয়েছি, শুদ্ধ করেছি। তারপরও প্রকাশকদের কাছে ঐ পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত রূপ পেতে প্রায় বছরখানেক লেগে যায়। তাদেরও রয়েছে সম্পাদনা এবং ছাপানোর বিভিন্ন প্রক্রিয়া। তারপর যখন বইটা শেষ পর্যন্ত ছেপে বের হয়, তখন সত্যিই খুব ভাল লাগে। একটি অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি, সেই সঙ্গে সুখানুভূতি মনকে এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে দেয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৯

বিপদে বন্ধুর পরিচয়: বিদেশী বন্ধুদের ভূমিকা

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই বিশ্রাম নেয়ার সাথে সাথে কারাবাসের সময়ে আমাকে পাঠানো দেশী-বিদেশী অগণিত চিঠিপত্র, শুভেচ্ছাবাণী, ঐ সময়ের খবরের কাগজের ক্লিপিং, সবকিছুই দেখার এবং পড়ার সুযোগ হলো। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শত শত পরিচিত-অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে সমবেদনামূলক চিঠিগুলো পড়তে গিয়ে মনে এক বিরাট সান্ত্বনা পেলাম, মনে সাহস ফিরে আসতে থাকে। নতুন উৎসাহ উদ্দীপনায় মনের অনেক হতাশা কেটে যায়। আমার কারাবাসকালীন বিদেশী শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমার মুক্তির ব্যাপারে যে উৎকণ্ঠা জানিয়েছেন এবং তাঁরা যে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা দেখিয়েছেন তা কখনোই ভুলে যেতে পারব না। এঁদের অনেকেই আমার মুক্তির জন্য যা করেছেন তার ঋণ কোনদিন পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। এইসব বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কয়েকটি ঘটনা এবং কার্যক্রম উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঁদের মধ্যে সবার আগে যাঁর নাম মনে আসে, তাঁর নাম Emily MacFarquhar। বিশ্ববিখ্যাত *ইকনমিস্ট* সাপ্তাহিকের স্বনামধন্য সাংবাদিক এবং এশিয়া এডিটর।

এমিলির সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৬৯ সালে। পূর্ব পাকিস্তানে তখন চলছে গণআন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তখন স্বাধিকারের আন্দোলনে রূপ নিতে চলেছে। দেশময় চলছে সভা-সমাবেশ, মিছিল, হরতাল। গণজোয়ারের মুখে ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিঃশর্তভাবে প্রত্যাহার করে নেয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি লাভ করলেন। রাজনীতিতে বীরের মত তাঁর আবির্ভাব, এক অবিসম্বাদিত নেতা। একটি গণঅভ্যুত্থানের সকল উপাদান তখন বিরাজমান। ঢাকায় তখন আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের প্রচুর আনাগোনা। তাঁরা সকলেই জানতে চান কি হচ্ছে, কি হতে চলেছে এবং কি হতে যাচ্ছে; বাঙালিদের এই আন্দোলন কতদিন গড়াবে, কি রূপ নেবে আর কোথায় শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াবে। এদের মধ্যে অন্তত ২০ জনের মত ছিল খুবই নামকরা এবং বাঙালিদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন, বিশেষ করে মামলার শেষের দিকে, গণআন্দোলনের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল এবং মামলা নিঃশর্তভাবে প্রত্যাহার করার দাবিতে জনগণের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য গড়ে ওঠে। সমাজের সকল

www.pathagar.com

স্তরের এবং পেশার মানুষ এবং সংগঠন একই দাবি তোলে। সকল রাজনৈতিক দলের দাবিও তাই ছিল। আটদলীয় Democratic Action Committee (DAC) তখন আরো জোরদার হয়েছে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশী সাংবাদিকদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। এদের মধ্যে ছিলেন *গার্ডিয়ান* পত্রিকার মার্টিন ওলাকট, বিবিসির মার্টিন এইডনি, *টাইমস*-এর পিটার হেজেল হার্স্ট, *নিউজ উইক*-এর লরেন জেনকিন্স এবং টনি ক্লিফটন, *টেলিগ্রাফ*-এর পিটার গিল, এপি'র আরনল্ড জাইটলিন, ফরাসি পত্রিকা *লা'মন্ড*-এর জেরার্ড ভিরাটেল, *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর মিনিয়ার্ড পার্কার প্রমুখ বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ। এদের সাথে পরে যোগ দিয়ে যুদ্ধকালীন সময় পর্যন্ত থেকে যান এন্থনি মাসকারেনহাস, *ডেইলি মিরর*-এর জন পিলজার, *টেলিগ্রাফ*-এর সাইমন ড্রিংগ, *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর সিডনি স্যানবার্গ এবং আরো অনেকে। এদের মধ্যে Legacy of Blood-এর লেখক মাসকারেনহাস মারা গেছেন, বাকি প্রায় সকলের সাথে আমার এখনো যোগাযোগ রয়েছে।

এমিলির ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। সংবাদ সংগ্রহে সে ছিল নিবেদিত। ছিমছাম, সুন্দরী এবং আকর্ষণীয় একজন পেশাদার সাংবাদিক। এমিলি ও অন্যান্য যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম তাঁদের সকলেই বাংলাদেশর স্বাধীনতা আন্দোলনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং তাঁরা আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে অনেকটা আবেগজাত (emotionally involved) হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের জন্মলাভের পর এরা সকলেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধি চেয়েছেন। বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর কিছু হলে তাঁরা দুঃখ পেয়েছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এঁদের বেশিরভাগই দায়িত্ব পালনে অন্যত্র চলে যান। তবে বাংলাদেশে কি হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা খবর রাখতেন। আবার কেউ কেউ কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে রিপোর্ট পাঠানোর দায়িত্ব পালন করার জন্য বাংলাদেশে এসেছেনও। এঁদের মধ্যে যাঁরা বাংলাদেশের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছিলেন বা বাংলাদেশের ব্যাপারে উদ্বেগ অনুভব (concerned feel) করতেন বা আমার সাথে যোগাযোগ বা বন্ধুত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে এমিলি ছিল অন্যতম। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা আন্দোলন এবং যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠা সেই পরিচয় এবং বন্ধুত্ব এখনো অব্যাহত রয়েছে অনেকের সাথে। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় ছিল যে, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও আমি যখন ক্ষমতায় ছিলাম তখন তাঁরা কেউ বাংলাদেশে আসেননি। কিন্তু যখনই বিপদে পড়েছি তাঁরা সাহায্য করার জন্য সকলেই এগিয়ে এসেছেন।

১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে একদলীয় শাসন কায়েমের প্রস্তুতি হিসেবে যখন শেখ মুজিবুর রহমান জরুরি আইন ঘোষণা করে সমস্ত মৌলিক অধিকার স্থগিত করে দিলেন এবং সর্বপ্রথম আমাকেই গ্রেপ্তার করার হুকুম দিলেন এবং ২৯ ডিসেম্বর ভোরবেলায় কারাগারে পাঠালেন, তখন এই বন্ধুরাই সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। গ্রেপ্তারের দিন পিটার গিল ঢাকায় ছিল এবং আমার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে *ডেইলি টেলিগ্রামে* এক কড়া প্রতিবেদন ছাপায়। গ্রেপ্তারের এক মাসের মধ্যে *নিউজ উইকের* তখনকার এশিয়ার ব্যুরো

www.pathagar.com

চিফ লরেন জেঙ্কিন্স হংকং থেকে বাংলাদেশে এসে শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আমার মুক্তি দাবি করে। তখন শেখ মুজিব একদলীয় সরকারের প্রেসিডেন্ট। তারপর লরেনসহ আরো অনেকে আমার বিষয়টি তাঁদের বিভিন্ন প্রতিবেদনে তুলে ধরেন। তাঁরা তাঁদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে আমার গ্রেপ্তারকে নিন্দনীয় করে তোলেন। সিনেটর টেড কেনেডিও তখন আমার মুক্তির জন্য শেখ মুজিবকে চিঠি লেখেন এবং তাঁর চিফ অব স্টাফ জেরী টিঙ্কার একটি কংগ্রেসনাল টিমের সাথে ঢাকায় এসে আনুষ্ঠানিক এক সাক্ষাতের সময় শেখ মুজিবের কাছে আমার মুক্তির কথা উত্থাপন করেন।

১৯৮২ সালের নভেম্বরে যখন এরশাদের সামরিক সরকার আমাকে গ্রেপ্তার করে, তিনটি দুর্নীতির মামলা দায়ের করে, যার বিস্তারিত বিবরণ আমি আগেই দিয়েছি, তখন আমার বিদেশী বন্ধুরা আমাকে সাহায্য করার জন্য অকৃত্রিমভাবে এগিয়ে আসেন। সাধারণত এটি হয় না। কিন্তু এর মূল কারণ ছিল, আমার ওপর তাঁদের অগাধ বিশ্বাস। আমার দ্বারা এ ধরনের দুর্নীতি হতে পারে এটি তারা কখনই গ্রহণ করতে পারেননি, অন্যান্য সকলের মত তাঁরাও এটিকে একটি রাজনৈতিক নির্যাতন ছাড়া অন্য কিছু নয় বলেই আখ্যায়িত করেছেন। মামলাগুলো ছিল তাঁদের ভাষায় "Trivial" and "Insubstantial", নগণ্য এবং সারবত্তাহীন, অমৌলিক। এই মামলা চলাকালীন সময় দেশে-বিদেশে নানা শুভাকাঙ্ক্ষী সর্বতোভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন।

ক্ষমতাধর রাজনীতিবিদরা যখন বিপদে পড়ে, বিশেষ করে সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে, তখন প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষই দূরে সরে যায়। বিশেষ করে যারা সেই ব্যক্তির কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা নিয়েছিল তারা তো আর কাছেই আসে না। শেষ পর্যন্ত থেকে যায় শুধু নিজের স্ত্রী-পরিবার এবং অল্প কিছু বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী। সাধারণ মানুষ অবশ্য অনেকে দোয়া করে, রোজা রাখে, সমবেদনা জানায়। সামরিক শাসনের প্রেক্ষাপটে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য এদের কেউই তখন কোন প্রভাব বা অর্থবহ ভূমিকা রাখতে পারে না। তারা বড় জোর গোপনে কিছু পোস্টার ছাপিয়ে দুয়েকটি সভা মিছিল করতে পারে এবং সেটাও নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। আমার বেলাতেও তাই হয়েছে। ব্যক্তিগত কিছু অনুরাগী নিজেদের উদ্যোগে রাজধানীতে বেশ কিছু পোস্টার লাগিয়েছে, সভা সমাবেশ মিছিল করেছে।

তবে বহিঃর্বিশ্বের কথা আলাদা। সীমিত সংখ্যক হলেও বিদেশী বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা তখন এগিয়ে আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আমার বন্দিজীবন দীর্ঘতম ছিল ১৯৮২-৮৩তে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের প্রথমার্ধে। Frank Mills ছিলেন তখন বাংলাদেশে যুক্তরাজ্য সরকারের হাইকমিশনার (রাষ্ট্রদূত)। আমি কারাগারে যাওয়ার অল্প কয়েকদিন পরই তাঁর স্ত্রী হাসনার কাছে আমাদের ছেলে আমানের জন্য একটি উপহার পাঠিয়ে জানালো যে তারা আমাদের কথা চিন্তা করে।

আর্থার গোল্ডবার্গ (Arthur J. Goldberg) ছিলেন আমেরিকার একজন বিখ্যাত আইনজীবী এবং সাবেক বিচারপতি। প্রেসিডেন্ট কেনেডির খুব বিশ্বস্ত একজন উপদেষ্টা

www.pathagar.com

এবং জাতিসংঘে আমেরিকার স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন। হাসনা যখন জাতিসংঘে কাজ করত তখন পরিচয় ঘটে। হাসনাকে খুব স্নেহ করতেন। আমাদের বিয়ের পর আমাকেও ছেলের মতই দেখতেন। বিচারপতি গোল্ডবার্গ আমার গ্রেপ্তারের কথা শুনে তখনই State Department-এ টেলিফোন করে পরামর্শ দেন বাংলাদেশে অবস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত যেন বাংলাদেশ সরকারকে আমার ব্যাপারে আমেরিকার উদ্বেগের কথা জানিয়ে দেয়। তিনি আরো জানালেন যে State Department-এর যে কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়েছিল তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকে টেলিফোন করে জানিয়েছেন যে আমেরিকার Secretary of State (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) এ ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ঢাকাস্থ আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে বলা হয়েছে আমার ব্যাপারে তাদের উদ্বেগের কথা বাংলাদেশ সরকারকে জানাতে। বিচারপতি গোল্ডবার্গ কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। তিনি আমাদের একজন নিকট আত্মীয়ের মত ছিলেন। একজন সংবেদনশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন:

Arthur J. Goldberg
December 2, 1982

My dear Hasna

I am very sorry about your husband. I can only trust that after due consideration, the government will not proceed with a trial against him. I also hope that his term of imprisonment will be neither oppressive nor of long duration.

Immediately upon receiving your letter I telephoned the desk officer in our State Department dealing with Bangladesh and requested that, for humanitarian reasons, a cable be sent to our Ambassador requesting that he quietly express the concern of our government about Moudud's imprisonment.

A few minutes ago I received a telephone call from this fine young Foreign Service officer advising me that, with the approval of the Secretary of State, a cable along the line I suggested has been sent to our Ambassador in Dacca.

Since it is in the discretion of the Ambassador to act in this matter, I do not know how he will respond and therefore do not want to raise any false hopes on your part. Let us, therefore, hope for the best.

Sincerely yours

Sd/-
Arthur J. Goldberg

www.pathagar.com

প্রায় একই সময়ে জন পিলজার (John Pilger), বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক এবং চিত্রকার, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যার ছিল অপরিসীম অবদান, হাসনাকে চিঠি লিখে জানালো যে সে President Ershad-কে তারবার্তা পাঠিয়েছে। হাসনার মনে সাহস জুগিয়ে লিখেছে যে সে আমার অন্যান্য সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছে এবং তারাও একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। হাসনাকে বলে সাহস রাখতে।

Daily Mirror
Mirror Group Newspapers Limited

Holborn Circus London EC1P1DQ
Switchboard: 01-353 0246
Direct Line: 01-8223...
Telex: 27286

December 6, 1982

Dear Hasna

I am sending this to the only address I have for Moudud. I shall enclose a copy of a cable sent to the President; please use it as you wish. I am in touch with other journalists who, I hope, will take similar action. Please keep me informed, and your spirits up!

Very best wishes

Regards

Sd/-
John Pilger

৮ ডিসেম্বর লন্ডন *ডেইলি টেলিগ্রাফের* নামকরা সাংবাদিক পিটার গিল (Peter Gill) হাসনাকে তার উদ্বেগের কথা জানিয়ে আশা প্রকাশ করে যে, সে যখন জানুয়ারিতে বাংলাদেশে আসবে ততদিনে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের ২৮ তারিখ জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরই শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে যখন আমাকে গ্রেপ্তার করে মতিঝিলে আমার ল' চেম্বারে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মামলাগুলোর কাগজপত্র search করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেই নিরাপত্তা বেস্টনি ভেদ করে যে সাংবাদিক তখন আমার সাথে কথা বলেছিল এবং পরের দিন *ডেইলি টেলিগ্রাফে* ফলাও করে তিন কলামের সংবাদ পরিবেশন করেছিল, তিনি ছিলেন এই Peter Gill যে স্বাধীনতা সংগ্রাম-যুদ্ধে বরাবরই বাংলাদেশের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের

www.pathagar.com

অবস্থায় ব্যথিত হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকলাউডের সাথেও সে বাংলাদেশে বছর দেড়েক আগে এসেছিল। পিটার গিলের চিঠিটা ছিল:

December 8, 1982

Mrs. Hasna Moudud	306 Euston Road
159 Gulshan Avenue	London
Gulshan, Dacca	NW1

Dear Hasna

I was immensely sorry to hear the news about Moudud, and I very much hope that you will soon have better news. They will not keep a good man down.

By chance I am due to visit Dacca in the early part of January because we are pursuing the issue of adoption rackets and hoping for some official assistance. I understand that you and Moudud met my colleague Alan Stewart when he was in Bangladesh in the summer. I hope that we will be able to meet in January and that we will discuss things further then.

Let us hope that I shall also be able to see Moudud at liberty then.

With best wishes

Yours Sincerely

Sd/-
Peter Gill

এমিলির হৃদয় ছিল কোমল এবং সংবেদনশীল। একজন সহমর্মী মানুষ। আমার গ্রেপ্তারের কথা বিদেশে আমার পরিচিতদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এমিলি খবরটা পায় আরেক বন্ধু লরেন জেনকিংসের স্ত্রী *নিউ ইয়র্ক টাইমসের* সাংবাদিক ন্যান্সি জেনকিন্সের কাছ থেকে। সাথে সাথে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কাছে আমার মুক্তির জন্য লিখে আর এই চিঠিগুলোর কপি পাঠিয়েছে আমাদেরই আরেক বন্ধু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য রে হুইটনির কাছে। হাসনা এবং বিশেষ করে আমানের জন্য ছিল তাঁর অনেক উৎকণ্ঠা। হাসনাকে আশ্বস্ত করে এই বলে যে, সে আমার মুক্তির জন্য সবকিছুই করবে এবং আমার মুক্তির জন্য আমার বন্ধুরা একটি campaign শুরু করবে। অর্থাৎ এমিলি নিজের উৎকণ্ঠা এবং উদ্যোগে, আমার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাসের

কারণে, বিপদের সময় এগিয়ে এসেছিল, আমাদের পক্ষে এসে দাঁড়াতে, সত্যিকার একজন বন্ধুর পরিচয় দিতে।

55 Camden Hill Road
London W. 8
December 9, 1982

Dear Hasna

I was appalled to hear of Moudud's arrest from my old college friend, Nancy Jenkins, in America. As you can see from the enclose, I have written to the Foreign Minister and also to Amnesty International and I am ready to do anything else you think might be helpful. I shall send these letters to Ray Whitney MP who once served in Dacca and anybody else I think might work for Moudud's release.

I do hope you are keeping your spirits up under these terrible circumstances. And I hope too that your son is doing well. Please do not hesitate to call on me if there is anything at all I can do. If you have an opportunity to speak to Moudud please tell him that his friends are organising a campaign on his behalf.

All my fondest wishes

Sd/-
Emily MacFarquhar

একইসাথে এমিলি একই তারিখে অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর ১৯৮২ লন্ডনস্থ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের টনি হাইম্যানকে চিঠি লেখে আমার পরিচয় দিয়ে।

www.pathagar.com

১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রিচার্ড পোরডেস এবং তাঁর স্ত্রী জেনারেল এরশাদকে বেশ কড়া ভাষায় আমাকে একজন বিশ্বখ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী এবং দুর্নীতির ঊর্ধ্বে একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে আখ্যায়িত করে জানালো যে, যদি আমার কোন ক্ষতি হয় তাহলে সেটা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটাবে। তার বার্তায় লেখা ছিল:

Richard Pordes
884 Westend Ave
New York NY 10025

This mailgram is a confirmation copy of the following message.

LNT General H. M. Ershad CMLA
Dacca, Bangladesh

Deeply disturbed by disappearance and apparent arrest of our friend and former colleague Moudud Ahmed. we urge you to release Moudud, a consistent defender of peace, justice and human rights, We assure you this world-renowned lawyer and patriot is above corruption. any harm that befalls him can only reflect adversely on the good reputation of Bangladesh in the community of nations.

Richard and Carolyn Pordes

ব্যারন ভন মার্শাল ছিলেন তখন বাংলাদেশে পশ্চিম জার্মানির রাষ্ট্রদূত, Dean of the Diplomatic Corps অর্থাৎ ঢাকাস্থ সকল দেশের রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম। একজন অত্যন্ত ভাল মানুষ এবং বাংলাদেশের অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী। আমাদের পাশের বাড়িতে থাকেন। এই বিপদের সময় তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য সাধারণ। রাষ্ট্রদূত হয়েও কূটনৈতিক শিষ্টাচারের তোয়াক্কা না করে প্রায় প্রতিদিনই হাসনার সাথে যোগাযোগ রেখেছেন। প্রথম দিকে হাসনা বহির্বিশ্বে ভন মার্শালের মাধ্যমেই যোগাযোগ স্থাপন করেছিল, যা ছিল তখন অকল্পনীয়। নিয়মিত চিঠিপত্র বিনিময় হতো তাঁরই মাধ্যমে। সরকারের বিভিন্ন খবরাখবরও তিনি হাসনাকে নিয়মিত জানাতেন। বিদেশে আমার বন্ধুদের চাপে জার্মান বুন্দেস্টাগে (পার্লামেন্ট) আমার বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল, আর তারই ফলে জার্মান সরকারের নির্দেশে সামরিক প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে ভন মার্শাল আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে এসেছিলেন। একজন বিদেশী রাষ্ট্রদূতের একজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে কারাগারে গিয়ে সাক্ষাৎ করার আর কোন দৃষ্টান্ত আছে বলে আমার জানা নেই।

www.pathagar.com

সামরিক ট্রাইব্যুনালে আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলার শুনানি শুরু হওয়ার সাথে সাথে ভন মার্শাল ১৩ ডিসেম্বর আদালতের চেয়রাম্যানের কাছে চিঠি লিখে শুনানির সময় উপস্থিত থাকার অনুমতি চাইলেন। চিঠিতে ভন মার্শাল জানালেন যে, আমি জার্মানির উচ্চ রাজনৈতিক অঙ্গনে খুবই পরিচিত এবং তারাই এই মামলার বিচারকার্য পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছে। ভন মার্শাল লিখেছিলেন:

The Ambassador Dhaka, December 13, 1982

The Chairman of the
Special Martial Law Tribunal II
MP Hostel, Nakhalpara, Dhaka

Re. Case against Barrister Moudud Ahmed

Mr. Chairman

I have just been informed that the hearing of the case against former Deputy Prime Minister Barrister Moudud Ahmed has been started and that the next hearing has been fixed for Sunday, 19 December 1982 at 11:00 a.m.

Barrister Moudud Ahmed has visited the Federal Republic of Germany several times and has also been sponsored by the well known Friedrich Ebert Foundation to work and lecture at the renowned South Asia Institute of the University of Heidelberg. Thus he is well known in high political circles of the Federal Republic of Germany, and I have been requested to witness his trial and report on it.

I have been told that the trial will be public, but in my special case I should like to receive your express permission to be able to attend the proceedings of the Special Martial Law Tribunal in this case. As I might be out of Dhaka on the 19th of December, I should be most grateful if this permission could be made valid as well for my Deputy Chief of Mission, Dr. Hans Joachim Goetz, Counsellor at the Embassy of the Federal Republic of Germany.

The Embassy's telephone numbers are: 300315, 300166 and 300167. My Residence number is 300345 and Dr. Goetz's Residence number is 301622.

Please accept, Mr. Chairman, the assurances of my highest consideration.

Sd/-
Baron von Marschall

cc: Dr. Goetz.

www.pathagar.com

ব্যারন ভন মার্শাল পরিবারের একজন সত্যিকারের বন্ধু এবং অভিভাবক হিসেবে কাজ করা শুরু করলেন। রাষ্ট্রদূত হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে দাঁড়ালো আমার মুক্তি আদায় করা। তিনি ঢাকাস্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতদের সাথে যোগাযোগ করা শুরু করলেন। যেহেতু আমার বিরুদ্ধে প্রথম মামলায়, যেটাতে East-West Inter-connector প্রকল্পে Korean Developemnet Corporation (KDC) চুক্তিপ্রাপ্ত ঠিকাদার হিসেবে জড়িত ছিল (মামলাটিতে শেষ পর্যন্ত সামরিক আদালত আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছিল), তাই ভন মার্শাল কোরিয়ান রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলে হাসনাকে জানালেন সে যেন তাঁকে বিশদভাবে বিষয়টি অবহিত করে:

December 16, 1982

Dear Hasna

I talked to the Korean Ambassador last night and again this morning at Savar.

He had not received anything from you yet, but he was very willing to help and promised to do his utmost. Thus please write him and tell him what he might be able to do to help the defence.

Yours, as ever

Sd/-
Baron von Marschall

পরের দিন ১৭ ডিসেম্বর ব্যারন ভন মার্শাল দীর্ঘ একটি চিঠিতে এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত খবর দেন। কোরিয়ান রাষ্ট্রদূতের (Mr. Moon) সাথে তাঁর বিশদ আলোচনার কথা এবং বিভিন্ন পরামর্শ ছিল ঐ চিঠিতে। তিনি আরো জানান যে, মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেইন কুন (Jane Coon) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা ইতোমধ্যেই আমার বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে কথা বলেছেন। চিঠির বয়ান ছিল এরকম:

Der Botschafter Dhaka, December 17, 1982
Der Bundesrepublik Deutschland

Dear Hasna

Yesterday afternoon I talked to Ambassador Moon again. He had by then received your letter and he told me that he read it with great interest, for it did contain a good deal of information which had not be known by him hitherto. He said that neither he nor his embassy or the KDC had been approached by the Government until now to provide information in view of Moudud's trial. As it was also in the

www.pathagar.com

interest of KDC and his country's honour that it was not established in Court that KDC had won the contract through corruption only, he was watching the trial very carefully. It seems to me that he does not have any helpful facts available right now, but if the defence (Mr. Mainur Reza Chowdhury) approach him, I am certain that he will most sympathetically answer all their questions to the best of his knowledge. Thus I should propose that Moudud's lawyers contact the Korean Ambassador, if they think that he or his Embassy might have some helpful information.

The Ambassador was slightly concerned about your request that he talk to the CMLA. He said -and I agreed- that as an Ambassador he could not possibly talk to the CMLA about such an internal affair. I then said that I did not understand your request in that way, but that you probably had only wanted to say that if he had a chance to talk to the CMLA on the golf course and if this matter came up given the involvement of KDC—that then he might use the opportunity to say something about Moudud.

Finally, I also managed to have a short word with Jane Coon. (Almost every time one starts talking confidentially at these receptions, someone cuts in and interrupts you!) I told her that I deemed it very important that the Bangladesh Government realized that Embassies like ours were watching the trial very closely and would take due note of any unfair proceedings. She said that she was fully aware of that and that her Embassy had already talked about Moudud's case "on high levels". She could not elaborate, because we were interrupted again.

If you think you know her well enough personally, it might not do any harm if you wrote her a personal note asking her to do whatever was possible for her to do to assure a fair trail for Moudud. Her residence address is Corner Roads 55/58, Gulshan.

Hastily

Yours, as ever

Sd/-
Baron von Marschall

এর মধ্যে আমাদের বন্ধু Alexander Duffy, যে ব্যক্তি ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে মার্গারেট থ্যাচারের এক ঐতিহাসিক প্রাতরাশ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য লন্ডন থেকে চলে এসেছে। হাসনা চেয়েছিল ভন মার্শালের সাথে Alex-এর সাক্ষাৎ হোক। ভন মার্শাল প্রস্তাবে রাজি হন এবং আরো

www.pathagar.com

জানান যে, কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে হবে যে, আমার বিরুদ্ধে মামলা খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং এর ওপর বিদেশে এই সরকারের সুনাম অনেকটা নির্ভর করবে। ১৮ ডিসেম্বর ভন মার্শাল তাঁর চিঠিতে সেটা লিখেছিল।

দুদিন পর জার্মান রাষ্ট্রদূত জানালেন যে, মামলার শুনানির সময় ট্রাইব্যুনাল তাঁদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ প্রত্যাখান করেছে এবং তাতে সবদিক থেকে ভালই হয়েছে এবং আমার সাথে আলাদাভাবে মামলা শুরুর আগে সকালবেলায় দেখা করাটাও সঠিক হবে না। তিনি আমাদের জন্য যে কাজ করছেন সেটা আনুষ্ঠানিক থাকাটাই ভাল হবে। একথাও জানালেন যে তাঁর বোন Ruth এসেছে এবং হাসনার সাথে শীঘ্রই সাক্ষাৎ করবে। চিঠিটা ছিলঃ

Dhaka, December 20, 1982

Dear Hasna

Thank you very much for your kind letter. I am thinking of you and Moudud (and Amon) and praying for you.

After Jochen's exchange with the Chairman we have sent a verbal note to the Ministry of Foreign Affairs today so that nobody can say that we did not really try to be in the trial.

In a way, however, this (stupid) refusal to let us watch suits my strategy very well. For neither Jochen nor I would have the time to sit in the trial for hours and hours and days and days. Had we been permitted in and then not been able to spend all the time, they could always have told us that we did not get the real picture. Now, as we are barred, I may always tell the Government that I had to rely on the information received from the defence and that the mere fact that we were barred could not serve to inspire us with confidence in the impartiality and fairness of the trial.

Ruth left for Bandura at 6 a. m. this morning. She will be back on Wednesday or Thursday, and I am sure she will visit you as soon as she can.

It's late! Good night!

Yours, as ever

Sd/-
Baron von Marschall

একজন অকৃত্রিম বন্ধুর পরিচয় দিয়েছে অ্যালেক্সান্ডার ডাফি (Alexander Duffy)। জাতিগতভাবে ভাল বংশের ফরাসি, কিন্তু উচ্চশিক্ষা শেষ করে বহু বছর যাবৎ ইংল্যান্ডের

www.pathagar.com

অধিবাসী। মনমানসিকতায় ফরাসি, খোলামন এবং আবেগপ্রবণ, রাজনৈতিক কথা বলতে ভালবাসে কিন্তু আচার-ব্যবহার চরিত্রে একেবারে ইংরেজ। পাঁচটি ভাষায় পারদর্শী, অত্যন্ত মেধাবী, যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট। অসম্ভব উদ্যোগী এবং well-connected। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে তাঁর রয়েছে সহজ সম্পর্ক। বিশেষ করে রাজনৈতিক এবং সাংবাদিক জগতের সাথে তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠতা।

ঢাকায় এসে হাসনার সাথে দেখা করার পর প্রথমেই সব গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রদূত, সাংবাদিক এবং সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে খোঁজখবর নিল, বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করল। আদালতকক্ষে তাঁকে ঢুকতে দেয়ার অনুমতি না দেয়াতে সে আরো জোরালোভাবে এই মামলার বিরুদ্ধে বলার সুযোগ পেল। জেনারেল এরশাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আমার মুক্তির জন্য দাবি জানিয়ে এলো। আদালতে উন্মুক্ত শুনানি হওয়ার কথা, কিন্তু তাঁকে প্রবেশ করতে না দেয়াতে বিচারের বৈধতার প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদ জানালো। অ্যালেক্স খুব ব্যস্ত জীবনযাপন করে লন্ডনে। কাজ ফেলে চলে এসেছিল। তারপরও সাত দিন ঢাকায় থেকে তোলপাড় করে গেছে। এরশাদের সঙ্গে দেখা করেছে। লন্ডন ফিরে গিয়ে অনেক কাজ করেছে আমাদের জন্য। কিছুদিন পরপরই হাসনাকে ফোন করেছে, আমাকে চিঠি লিখেছে। ইউরোপ আমেরিকায় আমার পরিচিত সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, সমন্বয় করেছে একসাথে কাজ করার জন্য। ঢাকা থেকে ফিরে যাওয়ার পর অ্যালেক্সের চিঠিগুলো পড়লে বোঝা যায় তাঁর কাজের বিস্তৃতি এবং ক্ষমতা:

London 588-6345 December 24, 1982

Moudud Ahmed
159 Gulshan Avenue
Gulshan, Dhaka, Bangladesh

105 Speed House
The Barbican
London EC2Y 8AU

Dear Moudud

I have now been back in England for just over 48 hours and I am just finishing the last points of what I will have done since receiving a phone call last tuesday about your then impending trial.

I have throughout tried to understand where your best interests and your own desires lay (I believe they are different) and my friendship told me to act in line with your desires whilst my mind told me to act in your interests. This twin strand guided my actions throughout my period of involvement in this matter.

I believe that my physical presence, and then what I said and did and thought were significant factors in the development of your trial and of the broad background to it.

I have spoken to Tom Williams and Dietrich Conrad at some length and I have attempted to guide John Macdonald and Emily to 'help'

you. I will also contact John Pilger and Michael Chalrton. This brings us to your book.

I have read it line by line. 'Salus Populi est suprema lex' combined with the 'thrid function' of the armed forces is the very essence of your political involvement in your country's life. On the cover of your book is a Bengali translation of the fundamental declaration of human rights. As a frenchman I thank you for that.

I personally believe that the greatest service you could render Bangladesh (or more accurately the world and history of Bangladesh) is to complete your second book (about which I talked with dietrich) and then write a third which would end with Sattars Decree naming Ershad as CMLA. I understand though that it is probably impossible for you to write what you have written and to then not take the corresponding political stance.

Although I know that you would not necessarily reply to this do try to in this case because there is the added complication of any eventual censorship, ie. i would like to know if this letter has actually reached you.

I do hope that when you and Hasna have some children you would in addition to the various family names, and Ziaur(?), consider somewhere tacking into the name that of Iskander.

My respects

Alex

অ্যালেক্সের চিঠিগুলো অনেক ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও হাসনার মাধ্যমেই আমি জেলখানায় পেতাম।

London 588-6345 — December 29, 1982

Moudud Ahmed
159 Gulshan Avenue
Gulshan, Dhaka, Bangladesh

105 Speed House
The Barbican
London EC2Y 8AU

Dear Moudud

Since writing to you last time has been the great enemy but I have tried to do what I could.

I spoke to Sean MacBride in Dublin, but he was not very interested but is willing to look at the papers. I have been in close touch with the *Guardian* and they may be running a story tomorrow, and if they do I will append a footnote to this letter. I have spoken to John

www.pathagar.com

Bullock, the Diplomatic Editor of the Daily Telegraph, who is interested in the story but cannot print it until next monday. I am trying to get a story into the *Financial Times* but so far without joy. The foreign Editor of the Sunday Observer, Nigel Hawkes, is willing to look at the story but will to some extent be guided by what the *Guardian* does (ie if the *Guardian* prints then so will they probably).

I was told by Emily that aperson I met with you at MPA Hostel, and whom you introduced to me as a Barrister, may be coming to London. If so I want to meet and help him.

The most important thing, in my opinion, has happened so far is that I have had a reply (not just an acknowledgement) by the Private Secretary to No. 10 further to a handwritten note I delivered there the morning of the 23rd. The reply was sent the very day. This is the way I work, as you know, and the Press and media is not my forte. In addition I was holding back because Emily said she would look after it.

I do not know anything about any censorship in Bangladesh but in any case I dont mind who sees this letter as long as you do.

My regard to you and Hasna

Alex
P.S. Guardin say they are running tomorrow.

উপরোক্ত চিঠিতে উল্লেখিত Sean Macbride ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত মানবাধিকার আইনজীবী। No. 10 বলতে 10 Downing Street অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বুঝিয়েছে।

অ্যালেক্স ও অন্যান্য বিদেশী বন্ধুদের প্রচেষ্টার ফলে ১৯৮২ সালের ৩০ ডিসেম্বর লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকা আমার মামলার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে আমাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কি আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস, আমাকে কিভাবে গ্রেপ্তার করা হলো, আমাকে জামিন দেয়া হয়নি, আমার ব্রিটিশ আইনজীবীকে আসতে দেয়া হয়নি, কোন বিদেশী নাগরিককে আদালতে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি, এই সবকিছুই ঐ প্রতিবেদনে ছাপানো হলো। প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ:

The Guardian December 30, 1982

Trial of Former Minister Begins

The martial law administration in Bangladesh has begun a series of trials in special martial law tribunals of many of the ministers of the previous, popularly elected civilian government. The charges include corruption. The trials began some weeks ago, but the most

www.pathagar.com

important person to appear in a tribunal is the former deputy Prime Minister Mr. Moudud Ahmed. Mr. Ahmed, a British-trained barrister, is an opponent of the martial law administration and of any military government, and has consistently spoken in public in favour of democratic rule.

Mr. Ahmed was taken from his home on December 13 by three plainclothes policemen and placed in solitary confinement in Dacca city gaol. He was told later that day that his trial would start on December 19. In the intervening six days he was not allowed access to any papers which could serve as a part of the defence case. He was given limited access to his lawyers. Foreign visitors were unable to see him in gaol. A leading British QC was retained to represent him, but the QC was not allowed to enter Bangladesh.

When the trial started, Mr. Ahmed was refused bail, was refused an adjournment to have more time to prepare his defence, and was refused the right to equal coverage for the prosecution and the defence cases in the local press. Foreign observers, including one from Britain, were not allowed into the "open" courtroom.

The verdict is expected any day. Under the special martial law tribunals there is no right of appeal. At least five other former ministers are said to be held in preventive detention before being formally charged.

একই ধাঁচে ১৯৮৩ সালের ৪ জানুয়ারি লন্ডনের *Financial Times*-এ আমার ব্যাপারে সরাসরি একটি প্রতিবেদন বের হলো। এই প্রতিবেদনে মূলত ব্রিটিশ আইনজীবী জন ম্যাকডোনাল্ডকে আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য ভিসা না দেয়ার প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে মামলাটি যে সাজানো মামলা ছিল, প্রতিবেদনে তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

The Financial Times January 4, 1982

Men & Matters

In Defence

Wherever human rights are under attack, it seems, one of the first moves in their defence is to turn to a British lawyer for help.

None has been more in demand than John Macdonald, the QC who has been refused entry to Bangladesh to represent former deputy Prime Minister Moudud Ahmed—himself a British trained barrister—at his trial by a martial law tribunal.

Macdonald, a former chairman of the Liberal lawyers and now a Liberal Alliance parliamentary candidate for Folkestone and Hythe, has for most of the past decade been prominent in the fight for

www.pathagar.com

various "hopeless" causes throughout the world. Some 60 per cent of his practice is in administrative and constitutional cases.

Back in the mid 1970s, Macdonald represented the Ocean IsLanders in their long legal battle with the UK Government over compensation for their removal from their tiny South Pacific homeland, rendered virtually uninhabitable by phosphate mining.

In 1977, Macdonald was engaged by the family of Yuri Orlov to lead the defence of the Russian dissident but was barred from the trial at which Orlov was sentenced to seven years' imprisonment.

More recently Macdonald has fought in the courts to safeguard the rights of Canadian Indians threatened by the Canada Act; and secured £5m compensation for the inhabitants of Diego Garcia who were evacuated from the Indian Ocean island so that it could be tried into an American military base.

The 51-year-old barrister was asked to go to Dacca to help defend Moudud Ahmed shortly before Christmas. But his application for a visa has met only "somewhat evasive replies".

Charges against Moudud Ahmed had "every appearance of being trumped-up'" says Macdonald, and the trial has now been adjourned. But if the martial law administration persists in going ahead with it, Macdonald says the defence must now rest with the UN.

অ্যালেক্স ডাফির পরবর্তী চিঠি ছিল এরকম:

Moudud Ahmed January 4, 1983
159 Gulshan Avenue
Gulshan, Dhaka, Bangladesh

Dear Moudud

I enclose the latest press thing about your trial and present situation in Bangladesh.

I wrote the first piece in the *Guardian* last week but this piece I had written in the *Financial Times* by the people concerned. It was one way to pay John MacDonald, since he will be grateful for the publicity in what could be an election year in England.

I think that these two articles are the best I can do during the trial. I shall hopefully try to place two more articles in the press, but they will be of a more general nature since the 'story' of your trial is now stale in the news sense. It will only reawaken when the trial is over, which story I will then try to place in "The Times". But as such that wont help you.

www.pathagar.com

I need the transcripts on the evidence, which I have asked you for repeatedly. If any press or other campaign is to be organised, whether you are found innocent or guilty, I need the transcripts.

I saw Monju Hossain (if ive got the spelling right) yesterday in London. He gave me background material on various things, I also spoke to walt on the phone in the states on sunday. He sends you and Hasna his love.

as do i.

Alex

Registered office: 107 Cheapside London EC2V 6HA. Registered no:1151932 England.

John Macdonald একজন QC এবং স্বনামধন্য ব্রিটিশ আইনজীবী যাঁকে আমার মামলা করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু সরকার তাঁকে বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য ভিসা দেয়নি।

জার্মানির একজন স্কলার এবং Heidelberg University-র সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের আইন বিভাগের প্রধান ড. ডিইটার কনরাড (Dieter Conrad)-এর সাথে ১৯৭৬ সাল থেকে আমি কাজ করে এসেছি। Heidelberg Universityতে তিনবার ফেলোশীপ পেয়েছিলাম এবং আমার ৩টি বইয়ের কিছু কিছু অংশ সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটে বসে লিখেছি। তাঁর সহযোগিতা এবং পরামর্শ ছাড়া বইগুলো পূর্ণতা লাভ করতে পারত না। এই সময়গুলোতে ড. কনরাডের সঙ্গে আমার এবং আমার পরিবারের পরম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। উপমহাদেশের ওপরে তাঁর অনেকগুলো মূল্যবান লেখা রয়েছে। আমার কারাবন্দি হওয়ার কথা শুনে তিনি ঢাকায় ছুটে আসেন। সেই সময়ে আমার লেখা *বাংলাদেশ: এরা অব শেখ মুজিবুর রহমান*-এর পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল। সেই অজুহাতে তিনি আমার সাথে জেলখানায় দেখা করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতিও পেলেন। জেলখানায় তাঁকে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই এবং তাঁকে যে সামরিক সরকার অনুমতি দিল সেটি ভেবে আশ্চর্য হই। এরকম একজন গুণী ব্যক্তিকে কারাগারের ফটকের পাশে আধো-অন্ধকার একটি কামরায় একটি টুলের ওপরে বসে থাকতে দেখে আমি চোখের পানি সম্বরণ করতে পারিনি। নাৎসি (Nazi) ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জার্মানির মানুষ সম্পর্কে সাধারণ impression ভাল নয়। তাদেরকে এখনো মনে হয় খুব প্রাণহীন কঠোর প্রকৃতির মানুষ। ঐতিহাসিক কারণে এই ধরনের একটি ভুল ধারণা বিশ্বব্যাপী অনেকের মধ্যে এখনো রয়ে গেছে। কিন্তু ড. ডিইটার কনরাড ছিলেন বর্তমান যুগের সত্যিকারের মানবদরদি জার্মান নাগরিক। জেলগেটে পাণ্ডুলিপির বিষয়টি আলোচনা করলাম ঠিকই, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি আমাকে এক নজর দেখার জন্যই জার্মানি থেকে চলে এসেছেন,

www.pathagar.com

আমার মনে সাহস যোগাতে এবং উৎসাহ দিতে। বিদায় নেয়ার সময় শুধু বললেন আমরা জার্মানিতে সবাই তোমার পাশে থাকব এবং যতদিন তোমার মুক্তি না হয় ততদিন আমরা কাজ চালিয়ে যাব। দিল্লি হয়ে জার্মানিতে ফিরে যাওয়ার পর Dr. Conrad যে চিঠিটা লিখেছিলেন সেটা ছিল:

January 8, 1983

Dear Hasna

I am using the opportunity to send you a direct note. On my return trip to Delhi, I was able to contact A. G. Noorani (on phone) who writes for the Indian Express & once reviewed Moudud's first book there. He will write on Moudud's case. Unfortunately I could not get an interview with the editor, Vergheese at short notice. If I remember correctly he met Moudud on your last visit to India? I also saw the local representative to Ebert Foundation in Delhi and gave him the information I had; he will perhaps be able to do something from there, but has to await instructions from the head office. With the ... office contacts have been delayed, because the man in charge was on leave up to 10-1-83, and Mrs. Heidermann who had been handling Moudud's case, has died last year. On my letter from Dhaka Prof. Rothermund had immediately cabled to Ershad and also sent a follow-up letter. He also wrote to Pole Ardees from Amnesty in London.

Alexander Duffy rang me up from London on 23 December and told me he had been to Dhaka and seen Ershad. (Your letter had reached apparently only thereafter since I had mailed from Frankfurt on my arrival 18.12 morning). He seemed rather optimistic, but from what I learned in the "Guardian's" article on Dec' 30, things look rather stiff. The Q. C. retained was Tom Williams or some younger man?

This note is just to inform you that we will try to keep up pressure from whatever quarters we can. I am also contacting German newspapers, but it is a difficult job since they report on Bangladesh only cursorily.

The most important thing I would ask you is to keep me informed about all the facts available. Newspapers, from Bangladesh reach here with much delay, and anyway will not contain much truth about the matter. I took a promise from Jamiruddin Sircar (whom I saw the last evening in Dhaka) to pass on information, but perhaps he needs a reminder. I know nothing about the point of charge dug up at the last moment apart from what appeared in *Bangladesh Times*. How is the proceeding in Special Martial Law Court being handled? For making an exemplary case for the newspapers here it

www.pathagar.com

is important to be informed about details, too. What is Moudud's post address right now? Can I write to him?

So far to-day, because I must reach the outgoing mail. Please forgive my hurried handwriting. I hope you are keeping up spirits and also tell Moudud we will not let the matter rest. I have not yet heard from Mohiuddin (Dhaka University Press). How is Aman?

I was very happy to have been in Dhaka and to have been able to meet Moudud at least once and to find him in good & fighting spirit. Ana and I send you our warm greetings & love to the boy.

We are keeping fingers crossed

With kindest regards

Yours

Dieter

কয়েক বছর আগে Dr. Conrad মাত্র ৬২ বছর বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

সরকার যখন আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা শুরু করে সামরিক আদালতে, *Economist*-এ, যে সাময়িকীতে বাংলাদেশের ওপর বছরে একটিও প্রতিবেদন ছাপানো হয় না, সেখানে এমিলি সেই পত্রিকায় লিখেছে ৮ জানুয়ারি ১৯৮৩ সালের সংখ্যায় "জেনারেলের বিচার" শিরোনামে, ইংরেজি প্রতিবেদনটি ছিল:

The Economist January 08, 1983

Bangladesh

General on trial

A former deputy Prime Minister of Bangladesh, Mr. Moudud Ahmed, has been singled out as the first prominent politician to be charged with corruption by the nine-month-old military regime of General Ershad. Five other former ministers were convicted of corruption in martial law courts last year, but the charges had initially been brought by the previous, elected government. Another ex-minister has been arrested but not yet tried.

Mr. Ahmed is being held without bail in one of the less sordid cells of the central jail in Dhaka (formerly Dacca). The verdict on him must be confirmed by General Ershad himself. The General came to power in a bloodless coup last March, 10 months after Bangladesh lost a second president, General Ziaur Rahman to an army assassination

www.pathagar.com

squad. General Ershad has ruled with a relatively light hand. He has resisted pressure from younger officers who have little patience for legal niceties and who would prefer to see corruption suspects strung up. But it is not clear how nice the legalities have been in the Moudud Ahmed case.

As a barrister and veteran defender of political prisoners, Mr. Ahmed is well suited to direct much of his own defence (he was imprisoned once before, in the early 1970s, for campaigning for civil rights). He has several local lawyers, but a British trial lawyer was denied a visa to assist at the trial. Foreign observers were not admitted to the "open" court, although local friends of the accused were allowed in. Mr. Ahmed's petitions for bail, for fair press coverage and for the production of essential documents were refused. The trial began on December 19th and resumed on January 2nd after a week's adjournment.

Mr. Ahmed was bundled out of his home and taken to the army cantonment in Dhaka on November 14th, a week after an eruption of student protest. In the first week of November Bangladesh's two main political parties observed the seventh anniversary of an earlier military takeover, the Awami League to mourn the murder of four of its ministers; the Bangladesh National party (BNP) to commemorate the accession to power in 1975 of its creator, the late President Zia. During a graveside tribute to Zia, students loyal to Mr. Ahmed's faction of the BNP shouted political slogans. Mr. Ahmed was interrogated about his alleged instigation of the student protest before being charged with abuse of power and taking kickbacks during his tenure as minister of power in 1979.

All political activity has been banned in Bangladesh, along with strikes and student organisations, since General Ershad's takeover, violators can be sentenced to five years in jail. But nothing can stop Bengalis talking politics. Recently politicians have been meeting in each other's homes to discuss taking joint action. Mr. Ahmed was one of the BNP leaders exploring co-operation with the Awami League.

General Ershad himself has also been extending political feelers. He is expected to allow a revival of politics in the next few months as a prelude to holding local elections. The next step will be to follow General Zia's example and throw his own braided cap into the ring.

General Ershad's most likely political vehicle is the BNP, which was Zia's party. The party is now split into two factions. Mr. Ahmed, who drafted the original party constitution for Zia, is one of its spearheads. Another, more conservative faction, led by the former prime minister, Shah Azizur Rahman, maintains close financial and religious ties with the Kuwaitis and Saudis and is believed to have used Arab money to political effect in Bangladesh. The other

www.pathagar.com

recently arrested minister Mr. Mayeedul Islam, is a young activist from this faction.

So far General Ershad has not shown favour to either group. Nor has he adopted the role of a populist politician in the Zia style. He has concentrated on what must be a high priority for any Bangladeshi leader keeping the international Monetary Fund and donor countries Sweet.

General Ershad's control in Bangladesh is not disputed. There are no identifiable challengers either inside or outside the army. General Ershad is said to make concessions to colleagues on occasion, but when he asserts his will, he prevails. And his will is the one that matters to a politician on trial.

কুলদীপ নায়ার ভারতের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলামিস্ট। অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন সাংবাদিক। বলতে গেলে নিজেকে একটি ইনস্টিটিউশন হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। একসময় তিনি ব্রিটেনে ভারতের রাষ্ট্রদূত (হাইকমিশনার) নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং বহু বছর ভারতের রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার মাধ্যমে সাংবাদিকতায় নিজস্ব প্রতিভার স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। তিনি একজন সংবেদনশীল উঁচু স্তরের মানুষ। উদার, সাহসী, মননশীল এবং বস্তুনিষ্ঠ একজন ব্যক্তিত্ব। সময়ের সাথে সাথে আমাদের এই পরিচয় এবং বন্ধুত্ব আরো সুগভীর হয়। দিল্লিতে আমরা কেউ গেলে বা নায়ার ঢাকায় এলে সাক্ষাৎ হবেই এবং বাড়িতে আপ্যায়ন অবধারিত।

এরশাদ আমাকে কারাবন্দি করার পর কুলদীপ নায়ার একটি দীর্ঘ এবং শক্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে ভারতের নামকরা সাপ্তাহিক *সানডে*তে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। "দেয়ার ইজ নো ইনডিপেনডেন্স ইন বাংলাদেশ" শিরোনামের এই প্রতিবেদনে কুলদীপ নায়ার তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

Weekly Sunday January 9, 1983

Exclusive
By Kuldip Nayar

There is no Independence in Bangladesh

In the free atmosphere of India when a ministerial delegation was discussing recently with New Delhi a set of proposals for augmenting water at Farakka, I received a letter from B Dhaka to remind me of the darkness which has engulfed that country. I mean the military dictatorship, which is tightening its noose day by day. The letter conveyed me the news that Moudud, a lawyer-politician, who met me the other day in New Delhi, was arrested following a large-scale

www.pathagar.com

student agitation at Dhaka university. There has been very little news about the agitation to the outside world but it was grim.

The letter described how Moudud was picked up from his house: "Three men in plain clothes announced themselves as university students but representing military intelligence (carrying no identification) took him away. Inside the cantonment they blindfolded him and took him in a jeep to their destination. They interrogated him, again blindfolding him on his involvement with the present revival of the BNP (Bangladesh National Party) and the protests of the students against the martial law government. They held him responsible for the students movement. But they sent him to the central jail on false charges of corruption."

Moudud left the government three years ago, and the corruption charges leveled against him are of that period; even these charges have come late, eight months after Gen. H. M. Ershad's takeover. I recall having long discussions with Moudud in Dhaka on the BNP which, I would argue, was the government's loyal party and was controlled first by Gen. Zia-ur Rahman, the Bangladesh military ruler who founded it, and later by Mr. Abdus sattar, who succeeded Gen. Zia. Moudud would stoutly defend his party and refer to Sheikh Mujibur Rahman's Awami League as "Pro-India." What impressed me was his fight to democratise the BNP and make it broad based. Moudud was a great supporter of his Zia but was an invetered opponent of any political party system which concentrated power in the hands of a few. He was very much a democrat who, I thought was in a wrong party.

I know charges in a case like Moudud's have to be those of corruptions stated to taint their reputations. But also know that the public comes to realise how fake the charges are against those who fight for democratic values and principles. We experienced this during the Emergency. In the long run, persons like Moudud are remembered, not military dictators.

The letter concludes thus: "The country is in a bad shape. The army has destabilised the society and have miserablely failed. The only way to save the country, economy and army as an institution is to go for an immediate political process"

I feel bad not only because liberty in one more country has been snuffed off but also because the image of Bangladesh I have had is that of a free, pulsating society. There was one Bangladesh which I experienced soon after its liberation. The press was free and the criticism of government untrammelled. It was the heady wine of freedom that the people had drunk because the military rule of Yahya Khan from Islamabad had turned the country into a concentration camp, with the population having no say.

www.pathagar.com

Another Bangladesh was that of Gen. Zia, who took over from Sheikh Mujibur Rahman after a military putsch. It was not an open society but the people were not in bondage. They expressed themselves with restraint and it was still not a police state. I recall free, heated discussions on the need to return to democracy. The third Bangladesh -that of President Sattar—was, in fact, freer and even though he appeared to be a stalking horse of the military, he did retain the initiative. He, like other Bangladeshi, talked in terms of a free parliament, a free press and a free judiciary. That was the reason why he was overthrown even after a massive verdict in his favour in the election.

The Bangladesh of Today, under Gen. Ershad, is a country where the proverbial pre-dawn knock on the door is common and there is no knowing who is next on the list and what will be his plight. The military is all powerful and there is nobody worth the name who is functioning without the men in khaki, looking over his shoulders. The worse is that there does not look to be an end of the night.

The question is what we in India can do for the people groaning under the weight of jackboots. True, we cannot interfere in domestic affairs of any country, but the point to consider is whether to demand for freedom or a protest against the detention of thousand matter? We, who nearly lost liberty in 1975, can at least sympathise with those who are now living in the darkness of dictatorship. That it has happened in Bangladesh is indeed sad because this is the country which we helped liberate from the colonial military rule of Islamabad. I never expected that the Bangladesh, who sacrificed everything to win independence from Gen. Yahya's regime would go under another military regime.

But the redeeming factor in all these countries, where the military has taken over, is that the fire of defiance burns, however small and slow. The individual is not dead yet. I think that the essence of free outlook lies not in what opinions are held, but in how they are held. It is too bad that men like Moudud are not free to participate in this debate which is important not only for Bangladesh but the entire sub-continent.

আমার পক্ষে কারাবন্দি অবস্থায় অ্যালেক্সের কোন চিঠির উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি। সামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের টেলিফোনে আড়িপাতা, চিঠিপত্র সেন্সর, দিনরাত বাড়ির চারদিকে নজরদারির মধ্যে হাসনাকে কাজ করতে হয়েছে। আমাদের একেবারে লাগানো বাড়িতেই ভন মার্শাল থাকতেন বলে রক্ষা। এটি একটি ভাগ্যের ব্যাপার। তাছাড়া তিনি ছিলেন জার্মানির মত দেশের একজন রাষ্ট্রদূত, তাঁর ছিল Diplomatic immunity। অল্প কয়েকদিন হাসনা অ্যালেক্সের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি বলে অ্যালেক্স উৎকণ্ঠিত

www.pathagar.com

হয়ে পড়ে এবং নিয়মিত তাকে সব খবর দেয়ার জন্য তাগিদ দেয়। এরই মধ্যে সে Sir Thomas Williams এবং Amnesty International-এর কাছে আমাদের সমস্ত কাগজপত্র জমা দিচ্ছে বলে জানালো। এই চিঠিতে অ্যালেক্স আমাদের জন্য তার যে কত দুশ্চিন্তা এবং সে যে আমাদের একজন প্রকৃত বন্ধু সেটিই প্রমাণ করেছে।

London   January 13, 1983

Dear Moudud

I spent quite a lot of time and effort on Amnesty International on Monday, to some effect. Yesterday evening I spent nearly an hour with Sir Thomas, who is much better.

I am submitting a whole series of papers to Amnesty and to Sir Thomas. He will use them to contact two bodies who would be prepared to take up the cudgels on your behalf. Amnesty is also prepared to take up the cudgels. I have asked both sets of people to so do.

I have now been back in the UK 22 days. I have tried to move heaven and earth for you. And i have heard nothing from you. You will possibly remember the troubles we had working together last time, re General Rahman' and Mrs. T, possibly because we are so similar. But this time it is more important. Your very credibility and reputation in the short term are on the line. I really wish you would do something to keep me informed.

At present the only news comes to me from the Foreign Office and Amnesty. Surely you could ask Hasna at least to write to me. I need to know whether any of my letters have reached you, whether you approve of what I am doing, is there anything else we could do?

Your case matters to you, it matters to Bangladesh, but it also matters to your friends. I do not know if I am one but I know that poor Dietrich Conrad has to phone me to try to find out what is going on. And that Sir Thomas Williams, who so likes you, has not had a copy of your excellent book which you promised him.

Do keep your spirits up, but also try to keep ours up by telling us what is going on. I hear that the prosecution called 19 witnesses at the hearing on the first charge and you called none.

Do please please, please, please please send me further bits of the depositions. We need them, and you should want to send them.

All the best

Sd/-
Alex

www.pathagar.com

১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে মিসেস মার্গারেট থ্যাচারের বৈঠক আয়োজন প্রসঙ্গে General Rahman এবং Mrs. T শব্দগুলো ব্যবহার করেছে। যদিও অ্যালেক্সের সকল চিঠি আমাকে উদ্দেশ করে লেখা, কিন্তু এগুলোর মাধ্যম ছিল হাসনা অথবা ভন মার্শাল। আমার সাথে সরাসরি কোন যোগাযোগ সম্ভব ছিল না। অ্যালেক্সের চিঠির কোন শেষ ছিল না। এই বইতে শুধু আবশ্যকীয় কিছু চিঠির উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

এর মধ্যে *ডেইলি টেলিগ্রাফের* সাংবাদিক পিটার গিল ঢাকায় এসে হাসনার সাথে দেখা করে গেছে। পিটার গিল এখন Thames Television-এর প্রযোজক এবং উপস্থাপক। জেনারেল এরশাদের সাথে ১১ জানুয়ারি সাক্ষাৎ করে সে আমার মুক্তির জন্য দাবি জানায়। পিটার ফিরে গিয়ে আমার বন্ধুদের জানায় যে, এরশাদ তাকে বলেছেন আমার জন্য কোন দুশ্চিন্তা না করতে।

অ্যালেক্স ডাফি আমার মামলা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র ব্রিটিশ আইনজীবী জন ম্যাকডোনাল্ড, স্যার টমাস উইলিয়ামস, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং ব্রিটিশ ফরেন অফিসে দেবে বলে জানিয়েছে। আমার মামলা শুনানি যাতে নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু হয় সে ব্যাপারে তারা যা কিছু করার করবে। ইংল্যান্ডের আইনজীবীসহ অন্যান্য খরচপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা অ্যালেক্স তাঁর এবং আমার বন্ধুদের কাছ থেকে জোগাড় করার কথা জানায়। বিবিসি'র সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান (Panorama)-এর উপস্থাপক Michael Chalrton-এর সাথে অ্যালেক্স যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। অ্যালেক্সের এই ধরনের নিঃস্বার্থ অবদান আমি চিরদিন মনে রাখব।

London January 18, 1983

Dear Moudud

I received this morning in the post a series of papers, for which immense thanks. I am taking a copy of them to John MacDonald, to Tom Williams, to Amnesty and to the Foreign Office.

You seem to be missing the last page of the deposition of PW 3, so I enclose the original. I have a copy already. Peter says you looked well but apprehensive.

Peter is now in the Falklands, and will have travelled some 25,000 miles in less than a week. Upon his return we will liase. I am also trying to get Michael Chalrton to help.

Thanks again for the papers. They are invaluable. And we are all with you.

All the best

Alex

www.pathagar.com

লন্ডনে আমরা যখন ছাত্র, মাইকেল ফুট ব্রিটিশ লেবার পার্টির একজন উদীয়মান নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। একজন সম্মানীয় বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর তখন খুব খ্যাতি। তিনি ছিলেন কট্টর বামপন্থী এবং তরুণদের খুবই প্রিয়। অসম্ভব ভাল বক্তা ছিলেন। ৬০ দশকের বিশ্বব্যাপী উদার এবং বামপন্থী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ রাজনীতিতে মাইকেল ফুটের জনপ্রিয়তা আরো বাড়ে। ছুটির সময় আমি লন্ডনের উত্তর-পশ্চিম এলাকার সুন্দর আবাসিক পাড়া হ্যামস্টেডের যে বাড়িতে থাকতাম তার ঠিক পাশের বাড়িতেই থাকতেন মাইকেল ফুট। এটি একটি সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। যে ব্যক্তির কথা এত শুনতাম, যাকে শুধু রুপালি পর্দায় দেখতাম, তাঁকে এত কাছে পাব ভাবিনি। রোজ ভোরবেলায় তিনি খুব কাছেই সুবিখ্যাত হ্যামস্টেড হিতে হাঁটতে যেতেন। আমার হাঁটার কোন অভ্যাস বা ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু তাঁর সাথে পরিচিত হওয়ার পর দুয়েকদিন তাঁর সাথে হাঁটার সৌভাগ্য হয় এবং তার মাধ্যমেই সামান্য পরিচয়। সেই দিনগুলো থেকে ২০ বছর পর আমি যখন কারাবন্দি হই তখন মাইকেল ফুট রাজনীতির শীর্ষস্থানে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতা। আমার বন্ধুরা যখন তাঁকে আমার কথা জানালেন, তিনি সাথে সাথে জেনারেল এরশাদকে চিঠি লিখে আমার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলেন এবং আমার বিচার যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করলেন।

House of Commons London SWIA OAA January 24, 1983

The Office of the Leader of The Opposition

Your Excellency
I am concerned about reports of the trial of Mr. Moudud Ahmed, a former deputy prime minister of Bangladesh. I urge you to ensure that Mr. Ahmed will receive a fair trial in the best traditions of your country.

With best wishes

Michael Foot

His Excellency
Lieutenant General Hussain Muhammad Ershad
Office of the Chief Martial Law Administrator
Dhaka, Bangladesh

আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মূল মামলার বৃত্তান্ত আগেই উল্লেখ করেছি। সেটা ছিল East-West Inter-connector-এর টেন্ডার সংক্রান্ত অভিযোগ। খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে আমার চরিত্র হনন করার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু প্রায় দেড় মাস শুনানির পর সামরিক আদালতেও

www.pathagar.com

আমি শেষ পর্যন্ত নির্দোষ প্রমাণিত হই। সেজন্য দুরাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জানালাম। বিচারের রায় দেশে-বিদেশে বহু পত্রিকায় ছাপিয়েছে এবং অনেকেই, বিশেষ করে বিদেশের বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীরা টেলিফোন করে চিঠি লিখে হাসনাকে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। পত্রিকাগুলোর মধ্যে *ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউতে* মামলাটির বিষয়টি বেশ বিস্তারিতভাবে বলা আছে বলে সেটাই শুধু এখানে উল্লেখ করলাম।

Far Eastern Economic Review February 3, 1983
Bangladesh

A Tender Judgment

A military court surprises observers by freeing a former politician

By S. Kamaluddin

Dhaka: In the most publicised trial of this country's turbulent 11-year history, a special martial-law tribunal has acquitted former deputy prime minister Moudud Ahmed of corruption charges. Moudud was whisked away from his home on the evening of November 13 and brought to court after charges under martial-law regulations were hastily levelled against him. As his arrest and trial came in the wake of student violence at the Dhaka University campus on November 8, analysts suspected political motives.

Adding to these suspicions was the fact that Moudud's family tried to hire a lawyer from London but the lawyer was refused a visa, and that foreigners were barred from the proceedings. Many believed that a guilty verdict was a foregone conclusion. However, most observers were surprised and impressed with the impartiality of the 3,400-word judgment. Moudud's wife, Hasna Moudud, a former Dhaka University lecturer who sat through the proceedings, told the REVIEW: "This was a remarkably free and fair trial."

Moudud was accused of obtaining some Taka 400 million (US$15.2 million) "either for himself or for others" in 1979 by abusing his position as deputy prime minister in awarding a contract worth Taka 1.27 billion to a South Korean construction firm. Denying the charges, Moudud told the Court: "The case has been instituted against me for political reasons with the aim of victimising me."

The five-member tribunal, headed by Col A. B. M. Elias and composed of two other military officers and two civilian Judges, took the prosecution to task in its Judgment: "There being no evidence on record, direct or circumstantial, in support of the above contention of the prosecution, we are inclined to observe that the prosecution

www.pathagar.com

has stretched its imagination to an absurd limit." The contract involved the construction of about 13kms of power-transmission line over some of the most difficult riverine terrain in Bangladesh. In response to an international tender, three firms—Korean Development Corp. (KDC), Howard Siemens Construction and Vinnell Corp.—submitted bids of Taka 1.27 Billion, Taka 1.71 billion and Taka 945 million respectively. The standing committee for evaluation of the Power Development Board (PDB)—the implementing agency—after scrutinising the offers declared that they were unacceptable.

The Committee recommended re-tendering, but if the contract was to be awarded by November 1979, it favoured negotiations with KDC, the lowest bidder, so that it could fulfill all the tendering requirements. Merz and McLellan, the foreign consultants to the project, also gave an almost identical report. But it did not favour re-tendering as that would delay the implementation of the project. Instead, it recommended negotiations with both KDC and Howard siemens.

During the negotiations, KDC brought in Raymond Technical Facilities Inc. of the United States as a partner to overcome some of its technical deficiencies. KDC's offer was Taka 1.09 billion while Howard Siemens' offer stood at Taka 1.42 billion.

The PDB recommended that since Howard Siemens' offer was higher, contained major conditions and delayed completion, a letter of intent should be issued to KDC. The PDB observed that the foreign consultants and representatives of Kuwait, which was a major financier of the project, found the capabilities of Raymond Technical Facilities satisfactory. The PDB recommendation was then sent to a cabinet committee for final decision.

The Judgment quoted the cabinet committee as saying: "The committee also discussed the informal offer of Vinnell Corp. of USA on the Basis of fixed fee plus reimbursible cost. It was unacceptable not only because it was not a formal tender but also because the committee did not feel that the concept of award of a contract on the basis of fixed fee plus reimbursible cost was desirable for the project.

The Court dismissed as absurd the prosecution's claim that KDC's case was finalised due to official patronage which could have come only through Moudud who was in charge of the power industry in the cabinet at that time.

The prosecution alleged that Moudud misrepresented and suppressed facts at the cabinet committee meeting, but the judgment said: "The minutes of the council [cabinet] committee meeting do not contain anything to lead us to an inference of fraud and misrepresentation against the accused minister. Nothing was suppressed about Vinnell

www.pathagar.com

in the council committee. The committee discarded the very concept of awarding contract on cost-plus-fee basis in this project.

However, Moudud's battle with the law are not yet over. He faces two more trials, one of them now in progress, on charges of taking illegal possession of property, forgery and abuse of his official position.

হার্ভার্ডে আমার ভায়রা ডক্টর তৌফিক এলাহী চৌধুরী স্বাভাবিকভাবেই আমার মুক্তির জন্য সচেষ্ট ছিল। আমেরিকায় অবস্থিত আমাদের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রেখেছে এবং নানাভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। প্রথম মামলায় খালাসের খবর পেয়ে তৌফিক লিখেছিল:

কেম্ব্রিজ ফেব্রুয়ারি ৫, ১৯৯৩

হাসনা আপা

আপনার চিঠিগুলোর সবকটিই পেয়েছি। ঢাকা যাওয়ার লোক না পাওয়ায় এতদিন উত্তর দিতে পারিনি। Justice Goldberg-এর সাথে টেলিফোনে আলাপ হয়েছে—খুব খুশি হয়েছেন খবরটা শুনে। উনি বললেন যে State Department-এর সাথে উনি যোগাযোগ করে বলেছিলেন যে, মওদুদ ভাইর ব্যাপারে তারা খুব উৎকণ্ঠিত। আপনাকে বিশেষ করে best wishes জানিয়েছেন। Mr. Pordes-এর কাছে চিঠি লিখে সব জানিয়েছি। Dr. Brown, আকিনো—এদের সাথেও যোগাযোগ করেছি। Loren Jenkins, Nancy-র সাথে আলাপ হয়েছে। সবাই আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। Loren বলল যে, সে নাকি শুনেছে Ted Kennedyও এ ব্যাপারে Intervene করেছিল। ও আরো বলল ITN-এর Washington Post-র New Delhi-র লোক নাকি বাংলাদেশে গিয়েছিল, আপনার সাথে দেখা হয়েছিল কি? Christian Science Monitor-এর একটি মেয়ে আপনার সাথে ঢাকায় যোগাযোগ করেছিল কি? মওদুদ ভাইর অন্যান্য কেসের ব্যাপারে কি হলো জানাবেন। এখান থেকে কি করব তাও জানাবেন।

তৌফিক

আকিনো বলতে ফিলিপিনসের প্রখ্যাত নেতা নিনয় আকিনোকে বুঝিয়েছে। নিনয় আর আমি একসাথে হার্ভার্ডে ছিলাম, Center for International Affairs-এ আমরা Fellow ছিলাম।

খালাস পাওয়ার খবর পেয়ে সকলেই খুশি। ডক্টর কনরাড আমাকে জার্মানিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফেলোশীপের উদ্যোগ নিলেন। তাঁর ১১ ফেব্রুয়ারির চিঠিটা পড়লেই সেটা বোঝা যায়।

www.pathagar.com

ডক্টর কনরাডের উদ্যোগের ফলে আমার ফেলোশীপের অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ফ্রেডরিক এবার্ট ফাউন্ডেশন (Friedrich Ebert Foundation) ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকাস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূতের কাছে লিখিত প্রস্তাব পাঠিয়েছে, অথচ আমি তখনও জেলে এবং আমার মুক্তি ছিল অনিশ্চিত।

Translation

Friedrich Ebert Foundation
Management, Bonn

Bonn, February 15, 1983
Ref.:Gd/Bu/wds

To
H. E. The Ambassador
Of the Federal Republic of Germany
Dr. W. Baron von Marschall
Dhaka, Bangladesh

Excellency

We have come to know through Dr. Conrad of the South Asia Institute of the University of Heidelberg that Mr. Moudud Ahmed, Barrister, Supreme Court of Bangladesh, and former Deputy Prime Minister and Member of Parliament, was arrested at the end of 1982, and that several weeks ago a trial before a Martial Law Tribunal has already been instituted against him. As matters stand, a lengthy detention may possibly be imposed upon him.

We are deeply concerned by this information, as Mr. Moudud Ahmed has been known to us for many years. Both in the years 1976 and 1980 he had been for several months a research scholar of the Research Institute of the Friedrich Ebert Foundation. His first study-stay enabled him to successfully conclude the work for his book "Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy, 1950-1971", a work he had already started in Bangladesh.

Also his second stay in 1980 was dedicated to a book. This book was in print at the time when we received news from him last (September 1982).

The Research Institute of the Friedrich Ebert Foundation granted Mr. Moudud Ahmed for the year 1983 another research scholarship of three months' duration, leaving the departure time to his discretion. In his letter, date 14.09.1982, Mr. Ahmed wrote to us that he was not yet in a position to state a fixed date, that he would, however, let us know as soon as possible when he would be able to depart.

We are not in a position to judge in how far the accusations are substantiated or in how far they were as a pretext for his elimination from politics.

www.pathagar.com

Excellency, I would, therefore, be very grateful if you could inform us regarding the circumstances leading to Mr. Ahmed's arrest and the nature of the accusations brought against him.

If you are of the opinion that the Friedrich Ebert Foundation can do something—within the framework of their possibilities to help Mr. Ahmed, I would appreciate your suggestions very much.

You may rest assured that we shall take no steps which are not in accordance with your counsel or which are without your explicit consent.

If it is possible for you to speak to Mr. Ahmed or to send a message to him, please convey to him our warmest regards and best wishes for a favorable conclusion of the trial against him.

I should like to thank you in advance very much for your efforts and hope to receive further news from you soon.

With Kindest regards

Sd/-
Dr. Gunter Grunwald, Manager

চিঠিখানা জার্মান ভাষায় লেখা ছিল। রাষ্ট্রদূত ভন মার্শাল অনুবাদ করে হাসনাকে পাঠিয়েছিলেন।

Sir Thomas Williams অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন। তারপরও আমার মামলার খালাসের কথা শুনে উৎসাহিত বোধ করেছেন। কিন্তু আমার জন্য তাঁর উদ্বেগ কমেনি। তবে তিনি সমস্ত কাগজপত্রসহ্ আমার বিষয়টি International Parliamentary Union এবং International Commission of Jurists-এ পাঠিয়ে দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলেন ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন।

Telephone: 01-670 9630 November 25, 1983

Wickers Oake
Dulwich Wood Park
London, SE19 IXJ

From His Honour Judge Sir Thomas Williams, Q.C

Dear Hasna

Forgive me that I have not written before this, in answer to your letter. You may know, however through Alex Duffy that I have been ill and in hospital.

I have been very concerned about Moudud but was a little encouraged to learn that he has already been acquitted of some of the charges brought against him.

www.pathagar.com

Unfortunately, I no longer practice at the Bar, but I have done what lies in my power to help. I have sought to interest the International Parliamentary Union's Committee for the Protection of the Human Rights of Parliamentarians and have their promise that they will take up his case with the government. I have also written the International Commission of Jurists and awaiting the reply. Alex Duffy has promised to keep in touch.

We all feel deeply for you—you have had so much to bear recently. Let us pray you may soon be delivered from these troubles.

Yours Sincerely

Sd/-
Thomas Williams

Alex Duffy ইটালির মিলান শহর থেকে জানালো যে, Tom Williams-এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে International Parliamentary Union তাদের পরবর্তী সভায় আমার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য গ্রহণ করেছে এবং International Commission of Jurists-কেও নোটিশ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ইংল্যান্ডের একটি অন্যতম এবং প্রভাবশালী গবেষণাকেন্দ্র (Think Tank) Chatham House তাকে বাংলাদেশের ওপর একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য নিয়োগ করেছে শুনে খুব খুশি হলাম। অন্যদিকে জানালো যে, Tony Mascarenhas, আরেকজন বিখ্যাত সাংবাদিক এবং আমাদের বন্ধু ঢাকায় আসছে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩-র চিঠিতে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য রয়েছে।

Anthony Mascarenhas তাঁর "Bangladesh: Legacy of Blood" বইয়ের জন্য বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

মার্চের ৯ তারিখে আমার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মামলা একসাথে শুনানি শেষে রায় ঘোষণা করে সামরিক আদালত আমাকে ১০(দশ) বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১(এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরো ৩ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে। একটি মামলা ছিল আমরা যে বাড়িতে থাকি তার মালিকানা এবং অন্যটি উপপ্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ২টি গাড়ি ব্যবহারের অভিযোগ সংক্রান্ত, যার বিস্তারিত বিবরণ আগেই দিয়েছি। মূল মামলায় খালাস পাওয়ার পর এ ধরনের তুচ্ছ এবং ভিত্তিহীন মামলায় সাজা দেয়াতে সামরিক শাসকদের আসল রূপ ধরা পড়ে গেল। দেশে-বিদেশে সকলেই হতভম্ব ও ক্ষুব্ধ হলো। বন্ধু-বান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষীরা এটিকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরে নিল।

সক্রিয় রাজনীতিবিদ, বিশেষ করে যারা ক্ষমতাবান হন তাদেরকে মানুষ এবং মিডিয়া সবসময় কড়া নজরে রাখে, সন্দেহ করে, সমালোচনা করে। অন্যদিকে রাজনীতিবিদদের মানুষ শ্রদ্ধাও করে, ভালবাসে। কারণ তারাই সবসময় সাধারণ মানুষের সাথে থাকে, তাদের

www.pathagar.com

অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরে, বিপদ-আপদে তারা তাদের ওপরই নির্ভর করে। কর্মসংস্থান, রাস্তাঘাট, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, স্কুল-কলেজ, মক্তব-মাদ্রাসা আরো হাজারো রকমের সমস্যা সমাধান ও দাবি পূরণের জন্য তারা তাদের রাজনৈতিক নেতাদের ওপরই নির্ভর করে। রাজনীতিবিদরাই সমাজের পরিবর্তন ঘটায়, স্বাধীনতা আনে। তবে তাদের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে দেশের যে অমঙ্গল হয়, সে ব্যাপারেও মানুষ সচেতন।

সামরিক আদালত কর্তৃক আমার বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশের কোন গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। প্রথমত, বিচারটি ছিল প্রচলিত আইনবহির্ভূত। এটি ছিল একটি Kangaroo Court-এর রায়। দ্বিতীয়ত, এটি ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি মামলা। তৃতীয়ত, অভিযোগগুলো ছিল অত্যন্ত মামুলি ধরনের, দেশের কাগজগুলো সামরিক শাসনের ভয়ে খবরটিকে বড় করেই ছাপিয়েছে, কিন্তু উৎসাহের অভাব ছিল। বিদেশে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে ভিন্ন।

পিটার গিলের কাছে এই দণ্ডাদেশ অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। রায়ের কথা শোনার সাথে সাথে সে এরশাদকে ১০ মার্চ এক তারবার্তা পাঠিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ১১ জানুয়ারি যখন পিটার এরশাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল, তখন এরশাদ আমার বন্ধুদের দুশ্চিন্তা করতে মানা করেছিলেন। পিটার এরশাদকে অনুরোধ করেছে রায়টাকে পুনর্বিবেচনা করতে। জানালো আমাকে ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দিলে আমার পরিবারের কষ্ট হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশের যে বন্ধুরা ঐ সংগ্রামের ওপর পশ্চিমা দেশগুলোতে রিপোর্ট করেছে তাদের কাছে আমিই তখন বাংলাদেশের মানুষের গণতন্ত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে personify করেছিলাম।

Thames Television Limited March 10, 1983

Dear Hasna

I was appalled to hear the news this morning. And I just wanted you to see a copy of the telegram I have sent today to General Ershad.

With thoughts and sincere best wishes.

Peter Gill

Telegram Message from:	Message To:
Name: Peter Gill	Name: Lt. Gen. H.M. Ershad
Dept: TV Eye	Telex Number:
Extn: 478	Address: Chief Martial Law Administrator & Head of Government
Date: March 10, 1983	CMLA Sectt, Dhaka, Bangladesh

Text of Message:

Shocked and saddened to hear of the harsh sentence handed down on Moudud Ahmed. Recalling your reassurances during our meeting on January 11th that Moudud's many friends were not to be worried

for his future. I now earnestly urge you to review the validity of the evidence and the severity of the sentence before confirmation.

In the meantime particular distress would be caused to his family if Moudud was to be sent outside Dhaka. Please be aware that for many friends of Bangladesh including those who reported to the west on your liberation struggle that Moudud personified democratic urgings of Bangladesh people. Sincerely and in hope.

Peter Gill, Thames Television TV EYE programme and former South Asia Correspondent *Daily Telegraph*.

সামরিক আদালতে আমার সাজা হওয়ার পর আরো অনেকের মত এমিলি ভীষণ মর্মাহত হয়েছিল। অ্যালেক্স ডাফির কাছ থেকে খবরটা পেয়েই এমিলি হাসনাকে চিঠি লিখে জানায় যে এ ধরনের মামলা বিদেশে শুধু সরকারকে বিব্রত করবে, একথাটা সে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছে লন্ডনে। সে আরো জানায় যে, বিদেশে আমাদের বন্ধুরা আমার মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করে যাবে।

55 Camden Hill
London W 8
March 12

Dear Hasna

My heart goes out to you. Alex told us about Moudud's sentence. What can one say except that it is dreadful and out of all proportion to the charges against him even if these had been proved.

We are hoping against hope that the additional testimony Alex is hoping to get from Austria will lead to a reconsideration of the verdict. Or that General Ershad will exercise his right to review the decision.

Cases like Moudud's can only embarrass the government in foreign eyes. I stressed this to the foreign minister when we met in London in February.

Your friends will certainly continue to do everything we can to call attention to Moudud's situation through international pressure groups. But we are also very concerned about you and your son. I trust that nobody would be so heartless as to harass you. But if, for medical or other reasons, you should need to come to London please know that you have a room in our house.

Please let Moudud know that we are deeply distressed for him and are still trying to help in any way we can.

Sd/-
Emily and Rod

www.pathagar.com

রায়ের কপি পেয়ে অ্যালেক্স ১৫ মার্চে জানালো যে রায়টা তাকে আশ্চর্য করেছে। তার মতে রায়টা ভুল এবং আইনসম্মত নয়। সেও এরশাদকে রায়টা যে ভুল সেটা লিখে জানিয়েছে। জহরাত আরা (যার ব্রিটিশ স্বামী লেবার পার্টির একজন প্রভাবশালী স্থানীয় নেতা ছিলেন) জানিয়েছে যে, মাইকেল ফুটকে আবার লেখা হয়েছে যাতে সে এরশাদকে আমার ব্যাপারে যোগাযোগ করে। এমিলি, টম উইলিয়ামস, পিটার গিল, টনি ক্লিফটন, Ray Whitney MP, অ্যামনেস্টি এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়—সকলেই এই রায়ে হতবাক হয়েছে। জন ম্যাকডোনাল্ড আমার ঢাকাস্থ আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি আছে বলে জানান। David Ennals-কে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

London March 15, 1983

Dear Hasna

I have just today obtained a copy of the judgment in Moudud's case. I am greatly surprised. The judgment does not stand up in law. It is completely wrongly found.

If you are indeed evicted from Mrs. Flatz house do please send me an address where I can reach you and a phone number. With such an amazing judgment there can be no doubt that moudud's reputation will grow and that his many friends will have further cause to support him.

I have written to General Ershad pointing out the mistakes in the judgment. To think that he was found innocent on the corruption charges and that the judgment on the abuse of power case is completely wrong means that he was completely innocent in the eyes of the world.

Zaharat Power phoned me today, she will try to help in her way. She tells me that Michael Foot, the labour party leader has written to Ershad asking for Moudud's rights to be contacted. After the Darlington bye-election he will be contacted again about this case.

Emily, Sir Thomas, Peter Gill, Tony Clifton, amnesty, the foreign office are all stunned by the judicial mistake. John Maconald has suggested that if your lawyers want to hold a conference with him in London he would be glad to see them.

Apart from that not much news. do tell moudud that we know what has happened to him and that we shall make sure that the right people know about it. Ray Whitney was also deeply shocked. David Ennals has also been told.

All the best, and keep up your morale. Politics is an up and down profession. I am today writing to frau Flatz about the case Ive spoken to her, but will now confirm in writing.

Sd/-
Alex

www.pathagar.com

১৬ মার্চ লন্ডনের *Financial Times*-এ অ্যালেক্সের একটি চিঠি ছাপানো হলো:

The Financial Times March 16, 1983

Politics in Bangladesh
From Mr. A. Duffy

Sir,—Moudud Ahmed, former deputy Prime Minister of Bangladesh, was sentenced on March 9 to a 10-year term for "abuse of power while in office" by a special martial law tribunal in Dhaka. The judgment has not yet been made public, pending its formal ratification by Lieutenant General Ershad, head of state.

Friends of Bangladesh will be deeply saddened by this latest sign of instability and rash decision-making by the present martial law regime. Mr. Ahmed has many friends in the West, but his best work was obviously reserved for his own country where he is widely seen as a staunch proponent of modern management methods in government and of a full and free democratic process in bringing politicians to power.

By jailing Mr. Ahmed on what is apparently very flimsy evidence the Government is showing that it is unwilling to work with all sectors of the country. Bangladesh is desperately poor but actually has real hopes for sustained development. It obviously can ill afford to go around jailing democratic and capable politicians solely because they are opposed to military rule.

Readers will know how important it is that a leadership team have clear goals and yet be able to corporate into its strategy good ideas from all quarters. On that basis Bangladesh is sadly failing.

Alex Duffy

১৭ মার্চ লন্ডনের *The Times* পত্রিকায় আমার দণ্ডাদেশের খবরটি এভাবে ছাপানো হলো:

The Times March 17, 1983

Politician Jailed in Bangladesh

Mr. Moudud Ahmed, a former Deputy Prime Minister of Bangladesh, has been sentenced to 10-years imprisonment by a special martial law tribunal in Dhaka on charges of abuse of power, our foreign staff writes.

A British trained barrister, he was in office in 1979-80 under President Ziaur Rahman. He was detained in November after calling on General Ershad to return the country to democratic rule.

www.pathagar.com

২ এপ্রিল লন্ডনের বিখ্যাত সাময়িকী *The Economist*-এ সামরিক আদালতের রায়ের ওপরে আর একটি রায়ের মত করে প্রতিবেদনে বলা হলো যে, এই মামলাগুলো ছিল insubstantial and unsubstantiated। একজন ব্রিটিশ আইনজীবীর মতে "A legal nonsense"। পরিশেষে এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এরশাদ যদি রায়টিকে পাল্টে দেন, তাহলেই মনে হবে তিনি বাংলাদেশে রাজনীতিকে মুক্ত করতে চান।

The Economist April 2, 1983

Bangladesh Muzzled

After weeks of half-gestures by its military rulers, Bangladesh remains a depoliticised zone. Last week General Ershad celebrated his first anniversary in power and the country's independence day by releasing several hundred students who were arrested during anti-government demonstrations in February. The 60 politicians who were jailed at the same time had already been let out. But they are still muzzled men, waiting for a promised dialogue with their military rulers about a notional political opening.

The opening General Ershad has in mind is narrow and slow. He has now lifted his ban on "indoor" political activity; outdoor rallies, which is how politics are brought to the people in this hot, overpopulated place, are still outlawed. He is planning non-party local elections later this year, with parliamentary elections postponed to the fuzzy future. The last parliament survived only four months before it was closed down a year ago, when General Ershad seized power.

One of the politicians who was fighting then for a stronger, more democratic legislature will be out of the battle now. Mr. Moudud Ahmed, sometime deputy prime minister, othertime backbench Young Turk, was locked away last month for 10 years' "rigorous imprisionment".

The government's method of disposing of this nettlesome politician was curious. In January Mr. Ahmed was acquitted by a military court of taking kickbacks on a government contract. But he was kept in Dacca jail to be tried on two further, seemingly trivial charges: taking possession of an abandoned house and misusing a government car. The cases against him were insubstantial and unsubstantiated: in the words of a British lawyer, "a legal nonsense". Vital allegations of forgery and fraud, involving foreign diplomats, were disproved. Nevertheless the court convicted Mr. Ahmed of colluding to cheat the government (not the present one) and sentenced him to a punishment, which in no way fitted his "crime".

There is no appeal against military convictions in Bangladesh. Only General Ershad has the power to reverse the ruling on Moudud Ahmed. His action in this case will be one indication of whether a reluctant army ruler really intends to set Bangladeshi politics free.

www.pathagar.com

মামলাগুলোর রায়ের খবর পেয়ে তৌফিক হতাশ হয়নি। বরং আরো উৎসাহ জুগিয়েছে, বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের সাথে যোগাযোগ করেছে। ন্যান্সি জেনকিন্স—আমার বন্ধু *নিউজ উইক*-এর দক্ষিণ ও দক্ষিণ এশিয়া সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে ইউরোপীয় সম্পাদক লরেন জেনকিন্সের স্ত্রী—এবং সে নিজে *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর একজন সম্পাদক (খাদ্য বিভাগ), নিউ ইয়র্কের সাংবাদিক জগতে খুবই সম্মানিত এবং প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিল। যদিও লরেনের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, কিন্তু দুজনই আমাদের প্রিয়জন হিসেবে থেকে যায়। ন্যান্সি বলাতে নিউ ইয়র্কের মানবাধিকার সম্পর্কিত আইনজীবীদের আন্তর্জাতিক কমিটি আমার বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দেয়। ডক্টর ব্রাউন ছিলেন হার্ভার্ডে আমার প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর এবং সান্ড্রা ছিলেন নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর। দুজন সিনেটর—সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ও সিনেটর Powel Tsongas এদের সঙ্গে যোগাযোগও অব্যাহত থাকে আমাদের। ৩১শে মার্চ ১৯৮৩-এ লেখা চিঠিতে তৌফিক আরো অনেক কিছু জানায়।

এর মধ্যে ১৬ এপ্রিল ১৯৮৩, শাস্তি হিসেবে আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে একেবারে দিনাজপুরে পাঠিয়ে দেয়া হলো। কারণ এবং পরিস্থিতি এই বইয়ের প্রারম্ভে বলেছি, কিন্তু এত হঠাৎ করে ঘটনাটি ঘটেছে যে অ্যালেক্স এবং অন্যান্যরা ভেবেছে আমাদের পরিবারকেও উচ্ছেদ করে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে অন্য কোথাও। অ্যালেক্স হাসনার সাথে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে এবং এর মধ্যে আমার জন্য *লন্ডন টাইমসের* সম্পাদকের কাছে তার চিঠি দেয়ার বিষয়সহ সে আর কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে তারও বর্ণনা দেয় তার ১৩ মে ১৯৮৩-র চিঠিতে।

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আমার ভূমিকা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার সঠিক মূল্যায়ন কোনদিন হবে কিনা জানি না। দেশের মানুষ আমার ভূমিকার কথা খুব একটা জানেনও না, আর যাঁরা জানেন তাঁরাও নানা কারণে ঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেন না বা চান না। আমি নিজেও খুব একটা বলি না। নিজের সম্পর্কে বলতে ভাল লাগে না, বিব্রত বোধ করি। তা না হলে মুক্তিযুদ্ধে নিজের ভূমিকার ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখে ফেলতে পারতাম। যাই হোক ১৯৮৩ সালের ১৩ মে লন্ডনের *টাইমস* পত্রিকায় জন পিলজার এবং টনি ক্লিফটনের মত বিশ্ববরেণ্য সাংবাদিক এবং জন ম্যাকডোনাল্ড ও অ্যালেক্স ডাফি যে চিঠি দিয়েছেন সেটা সেই সুদূর দিনাজপুরে জেলের একটি অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে কামরায় দিনেরবেলায় মোমবাতি জালিয়ে যখন পড়ছিলাম তখন চোখের পানি সামলাতে পারিনি। অশ্রুসিক্ত চোখ এতবার মুছতে হয়েছে যে, চিঠিখানা প্রথমবার পড়তেই অনেক সময় লেগেছে। তাঁরা লিখেছেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার ব্যক্তিগত সাহস এবং বিশ্বাসের কারণেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি বিশ্বমিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বসমর্থন জোগান দিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং যুদ্ধে সফলতা অর্জনে সাহায্য করে। আমার জন্য এর চেয়ে বড় গৌরব আর কি হতে পারে? আরো অনেক কথা যা চিঠিটি পড়লে অনুধাবন করা যাবে।

www.pathagar.com

The Times May 13, 1983

Ahmed Imprisonment

From Mr. John Pilger and others

Sir, We read with surprise and sorrow about the conviction, on abuse of power charges, and sentencing to 10 years' rigorous imprisonment of the former deputy Prime Minister of Bangladesh, Moudud Ahmed, by a martial law tribunal in Dhaka *(The Times, March 17)*

During Bangladesh's liberation war in 1971 it was Mr. Ahmed's own personal courage and conviction which played a pre-eminent role in bringing to the attention of the world press the Bangladesh case for freedom and it was the very understanding and propagation of this case which played a significant role in helping Bangladesh to win a significant degree of world support in its eventually successful liberation war.

After independence Mr. Ahmed's own personal qualities and political skills led him to play a major role in running the country and helping it to build up its institutions.

It is sad indeed that a man who has contributed so much already to his country should now not be able to play a part in helping to build his nation's future because he has, apparently, fallen out of favour with the present military regime in Bangladesh.

We call on the Government of Bangladesh to release this eminent prisoner of conscience and upon all friends of Bangladesh in this country to support our plea.

Yours etc.

John Pilger, Tony Clifton, John Macdonald, Alex Duffy

এর মধ্যে ব্যারন ভন মার্শাল আবার আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মান সরকারের নির্দেশনা পেলেন আমার জন্য তাদের উদ্বেগের বিষয়টা নিয়ে সরকারের সাথে কথা বলতে। তিনি এরই মধ্যে দুজন জেনারেলের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তিনি মনে করেন এরশাদ পর্যন্ত তাদের এই উদ্বেগের কথা পৌঁছেছে। তিনি জানালেন যে, বাংলাদেশ সরকারের ধারণা করতে হবে যে, আমার এই বিষয়টি নিয়ে দুই সরকারের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে—এমনভাবে তিনি কাজ করছেন। সরকারের তরফ থেকে তাঁকে জানানো হয়েছে যে, আমার রিভিউ পিটিশনের ওপর একটি সিদ্ধান্ত শিগগির হবে। এর মধ্যে Friedrich Ebert Stiftung আবার তাঁকে জানিয়েছে যে, আমি যদি চাই তাহলে তারা আমাকে আর একটি স্কলারশীপ দিতে প্রস্তুত আছে। তিনি আরো জানান, যদি সরকার এ ধরনের

www.pathagar.com

কোন প্রস্তাব দেয় যে, আমি কিছু দিনের জন্য দেশ ত্যাগ করে exile-এ চলে যাব, তাহলে জার্মানিতে যাওয়ার সব ব্যবস্থা তিনি খুব দ্রুত করতে পারবেন। তবে যদি আমি এতে সম্মতি দেই তাহলেই তিনি এরশাদকে বলবেন। হাসনা অবশ্য সাথে সাথেই জানিয়ে দিয়েছে এ ধরনের কোন ব্যবস্থায় আমি কখনো রাজি হব না, আমার মুক্তি হতে হবে নিঃশর্ত, কারণ আমি কোন অপরাধ করিনি। আমার রিভিউ প্রত্যাখ্যাত হলে আমি জেলখানাতেই থাকব যতদিন তারা আমাকে রাখতে পারে। রাষ্ট্রদূত জানালেন যে, ব্রিটিশ হাইকমিশনার ফ্রাংক মিলসও খুব সাহায্য করছেন সরকারের কাছে এই কথা বলে যে, ইংল্যান্ডে আমার জন্য উদ্বেগ ক্রমাগত বাড়ছে এবং রানীর আসন্ন বাংলাদেশ সফর তাঁকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে।

Dhaka, May 14, 1983

Dear Hasna

I have now received clear instructions from Bonn which enable me to speak with the full backing and authority of the German Government when expressing our concern about Moudud's case. I have already been able to talk to two Generals, one of them being very close to Ershad and I am quite confident that my message has reached the CMLA. From what I have heard it seemed opportune to me not to press too much for an audience with General Ershad right now—for I could approach him personally only once—but rather wait for a while. I am quite sure that he has been told that the German Government is concerned and would like to see the case reopened in a fair trial.

Please understand that in these efforts I do not keep in too close touch with you. In Dhaka everything becomes known very quickly, and I shall be most successful if it is believed that I am really expressing the German Government's concern about a severe deterioration of bilateral relations and not only act as Moudud's and your agent out of personal friendship. Therefore I avoid on purpose not to be seen going in and out of your house right after having had some talk to an important person on Moudud.

It has been intimated to me that a decision on Moudud and on the review of his case might be taken fairly soon. In this context, I should like to tell you that I have received another communication from Friedrich Ebert Stiftung that they would be prepared to give Moudud another scholarship if he would like to get one.

Thus, if a deal should be offered that Moudud leaves the country for a while and if he should want to accept, I think that his departure for Germany could be arranged rather quickly. This is just for you

www.pathagar.com

to know. I have not informed anyone who might tell the CMLA and would only do so with Moudud's express approval.

With all the best wishes
Yours, as ever

Von Marschall

P.S. I think that Frank Mills has also been very helpful in the last days in his own discreet way dropping hints about growing concerns in England and this worrying him in view of the forthcoming visit of the Queen.

১৮ মে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির বৈদেশিক নীতি উপদেষ্টা Jan Kalicki তৌফিককে জানান যে, আমার ব্যাপারে তাঁরা অবগত আছেন এবং এরই মধ্যে তাঁরা কয়েকবার State Department-এর সাথে যোগাযোগ করেছেন। এমনকি একেবারে হালনাগাদ আমার ব্যাপারে সিনেটর কেনেডি ব্যক্তিগতভাবে এরশাদকে approach করেছেন আমার রিভিউর ব্যাপারে ন্যায়বিচার করার জন্য। এ ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে জানান।

United States Senate
Washington DC 20510

Mr. Tawfiq E. Chowdhury May 18, 1983
Harvard University
Center for Population Studies
9 Bow Street
Cambridge, MA 02138

Dear Mr. Chowdhury

Thank you very much for your letter and enclosures concerning the plight of Moudud Ahmed. The materials you sent will be very helpful in pursuing this case, and we have been careful to keep your correspondence confidential as you requested.

We were already aware of Mr. Ahmed's case and have contacted the State Department on several occasions to express Senator Kennedy's concern. Most recently, the Senator has personally approached General Ershad, stressing the importance of full due process and urging leniency in his review of Mr. Ahmed's case.

Please be assured that we will continue to follow this and similar cases with a view to ensuring that international standards of legal

www.pathagar.com

and human rights are observed. I very much appreciate your letter and concern.

With best wishes

Sincerely

Jan H. Kalicki
Foreign Policy Advisor

আমাদের পরিবারের অতি পুরোনো একজন বন্ধু ৭০ বছর বয়স্ক Mary Donaldson-এর চিঠির উত্তরে State Department-এর দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত মানবাধিকার ব্যুরো জানায় যে তারা, আমার চিকিৎসার বিষয়টি ঢাকার সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে উপস্থাপন করেছে এবং আশা প্রকাশ করে যে, অদূর ভবিষ্যতে আমার জামিনে মুক্তি হবে। তবে তারা আমার বিষয়টির জন্য তাদের কাজ অব্যাহত রাখবেন।

United States Department of State
Washington DC 20510

Dr. Mary Katherine Donaldson May 24, 1983
181 Marlborough Street
Boston, Massachusetts 02116

Dear Dr. Donaldson

Thank you for your letter of may 2, 1983 regarding Mr. Moudud Ahmed.

The Department of State shares your concern over Mr. Ahmed's treatment, and our Embassy in Dhaka has raised the matter at the appropriate levels in Bangladesh.

While the final outcome of his case is not yet known—there is an appeal process—we are hopeful that he may be released on bail in the not-too-distant future. In any event, we intend to continue to follow his case very closely and to seek appropriate means of assistance.

Sincerely

Donald A. Roberts
Regional Officer for the Near East and South Asia Bureau of Human Rights and Humanitarian Affairs

কারাবন্দি থাকাকালীন এ ধরনের অগণিত চিঠি আমরা পেয়েছি বিদেশী বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে। প্রবাসী বাংলাদেশীরাও অনেকে লিখেছেন, খোঁজখবর নিয়েছেন

www.pathagar.com

এবং এদের প্রত্যেকেই যার যার পরিসরে যতটুকু সম্ভব আমার মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। আজ তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। এদের, বিশেষ করে আমার বিদেশী বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীদের এই ধরনের জোরালো এবং অব্যাহত কার্যক্রমের কারণেই সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হয়েও এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার নিঃশর্ত মুক্তি সম্ভব হয়েছিল। আজ বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি যে এ ধরনের বিপদের সময়ে আমার জন্য কেউ এতটুকু করবে, বিদেশীরা তো দূরে থাক। এটি সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার, আল্লাহর অসীম রহমত ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার মুক্তির জন্য তাঁদের এই প্রচেষ্টা কতটুকু কাজে লেগেছে সেটা বড় কথা নয়, আমার কাছে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, আমার প্রতি তাঁদের এত অগাধ বিশ্বাস এবং সদিচ্ছা, যা ভেবে আমি আজও আশ্চর্য হই।

এর মধ্যে সামরিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আমার রিভিউ আবেদন বিবেচনা শেষে আমাকে নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেয়া হয় ৭ই জুলাই ১৯৮৩, যার বিবরণ আগে দিয়েছি। মুক্তির পর দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য টেলিফোন এবং চিঠি আসে। এগুলোর মধ্যে অল্প কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম আসে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের দ্বিতীয় ব্যক্তি (Deputy Chief of Mission) এবং তখনকার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত Karl Walter Schmidt এবং তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে। তাঁরা জানালেন আমার মুক্তিতে সব আমেরিকান খুশি হয়েছে। চিঠির সাথে কিছু ফুলও পাঠালেন।

July 8, 1983

Welcome Home!

We wish you a speedy and thorough recovery and hope that these flowers from Hasna House will remind you that your American friends are delighted you are home again.

Looking forward to seeing you after our vacation.

With all good wishes

Rika and Carl

ভারত থেকে কুলদীপ নায়ার খুব চমৎকার একটি কথা লিখলেন:

No tunnel, however long and dark, is unending

Season's Greetings

Love

Kuldip Nayar

www.pathagar.com

আমাদের কাছে লেখা কেনেডির চিঠিটা খুঁজে আর পাওয়া যায়নি, তবে তৌফিকের কাছে কেনেডি লিখেছিলেন যে, তিনি খুব খুশি যে আমার মুক্তির ব্যাপারে তিনি যে সহায়তা করতে পেরেছেন।

Edward M. Kennedy
Massachusetts

United States Senate
Washington DC 20510

Mr. Tawfiq E. Chowdhury July 26, 1983
Harvard University
Center for Population Studies
9 Bow Street, Cambridge, MA 02138

Dear Mr. Chowdhury

I recently was able to confirm reports of Mr. Moudud Ahmed's release with the Embassy of Bangladesh here in Washington.

I was heartened by the news and pleased that I could be of assistence in obtaining his release. Please convey to Mr. Ahmed my regards and my best wishes for the future.

Thank you very much for your very kind letter to Dr. Kalichi. I appreciate help and concern in this matter during the past few months. With best personal regards.

Sincerely

Edward M. Kennedy

আমার নিঃশর্ত মুক্তির পর এমিলি খুব খুশি হয়েছিল এবং আমাদের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। অনেকবার তাকে দাওয়াত দিয়েছিলাম, কিন্তু সে আসেনি। এমনকি অন্য সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক শুভাকাঙ্ক্ষীরা যারা বিপদের সময় আমার জন্য জোরালোভাবে কাজ করেছে তারাও কেউ আসেনি। পরে আমি যখন এরশাদ সরকারে যোগদান করি তখন এদের অনেকে সেটি পছন্দ করেনি। সিনেটর টেড কেনেডি তো লিখিতভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এবং আমাদের বহু দিনের সম্পর্কটাই প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরে দেশে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর তাঁকে আশ্বস্ত করতে পেরেছিলাম। কিন্তু এমিলি এটিকে খারাপ চোখে দেখেনি বরং আমি যে রাজনৈতিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছি এবং আমার বিরুদ্ধে এরশাদের মামলাগুলো যে মিথ্যা ছিল সেটা প্রমাণিত হওয়ায় এমিলি খুশিই হয়েছিল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ২০

বিশ্ব কমিউনিজমের বিপর্যয় ও চীন দেশের উত্থান

এমিলির কথায় ফিরে যেতে হয়। সমগ্র এশিয়া, বিশেষ করে উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিক্রমা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। এইসব দেশের প্রায় সকল বড় বড় নেতার সাথে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়। প্রায় সকলে তাঁকে জানতেন, চিনতেন-ভুট্টো, মুজিব, ইন্দিরা—সকলেই। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন এবং পরবর্তী ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় কয়েকশত বিদেশী সাংবাদিক ঢাকায় আসা-যাওয়া করেছে। আগেই বলেছি এঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন খুব নামকরা। তখন এঁদের অনেকের সাথে আমার পরিচয় ঘটে এবং ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে। এ ধরনের বেশ কিছু বিখ্যাত সাংবাদিকের সাথে বছরের পর বছর বিভিন্ন সময় দেখা সাক্ষাৎ এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে সম্পর্ক থেকে যায়। বেশিরভাগই অবশ্য সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীর নানা দিকে নানা কাজে হারিয়ে যায়। যাদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ থেকে যায় এবং একটা আস্থা এবং বিশ্বাসের বন্ধন গড়ে ওঠে এমিলি ছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

এমিলির স্বামী রডারিক যাঁকে আমরা রড বলে ডাকি তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ। ছাত্রাবস্থায় মেধাবী বলে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনি লেবার পার্টির একজন বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। অতি অল্প বয়সে ১৯৭৪-৭৯ নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় বার হেরে যাওয়ার পর রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে লেখাপড়ার কাজে মনোনিবেশ করেন। চীনা রাজনীতি এবং ইতিহাসের একজন বিশ্লেষক হিসেবে অতি দ্রুত আন্তর্জাতিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এক পর্যায়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে tenure অর্থাৎ আজীবনের জন্য প্রফেসর করতে চাইলে, স্বামী-স্ত্রী ব্রিটেন ছেড়ে আমেরিকা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। স্বামীর এই গৌরবময় সুযোগ আর নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার আকর্ষণে পেশাগত অর্জনকে পরিত্যাগ করে *Economist*-এর মত সাময়িকীর মর্যাদাসম্পন্ন এশিয়া সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিল। কেম্ব্রিজে এসে এমিলি *US News* বলে ওয়াশিংটনের একটি পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন আর রড অধ্যাপনা শুরু করে দুজনই সুনাম অর্জন করে।

www.pathagar.com

চীনের জন্য আকর্ষণ পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কারণ, চীন হলো এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। যতদিন চীন সোভিয়েত-নেতৃত্বের অধীনে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ছিল ততদিন সোভিয়েত কমিউনিজমই সারা বিশ্বকে প্রভাবিত করেছে এবং পশ্চিমা দেশগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে সোভিয়েত নেতৃত্বের সাথেই মোকাবেলা বা বোঝাপোড়া করেছে। চীন দেশের আলাদা কোন ভূমিকা বা গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু কমিউনিজমের নানা তাত্ত্বিক ইস্যু নিয়ে দুই দেশের নেতৃত্বের মধ্যে বিভেদ ছিল এবং ক্রমান্বয়ে সেটা বাড়তে থাকে। সাথে সাথে বাড়ে চীন দেশের নিজস্ব রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা। ধীরে ধীরে দুই দেশের মধ্যে আদর্শগত ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে মাও সে তুঙ বিভিন্ন সম্মেলনে চীনের নেতৃবৃন্দকে সব বিষয়ে সোভিয়েত নেতৃত্বের লেজুড়বৃত্তি করার মানসিকতাকে পরিত্যাগ করার জন্য পরামর্শ দিতে থাকেন। তাঁর মত হলো, অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশের মত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে, কিন্তু সব ব্যাপারেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে নকল করাটা হবে দাসত্বের শামিল। তিনি চীন নেতৃবৃন্দ এবং গণমানুষকে নিজেদের চেতনা কে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আহ্বান জানান। চীন দেশের উন্নয়নের জন্য মাও সে তুঙ তখন ব্যাপকভাবে সম্মিলিত (collectivism) কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তিমালিকানা সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে collectivism-এর ওপর অর্থনৈতিক নীতিমালা তৈরি করতে থাকেন এবং সর্বক্ষেত্রে তা প্রয়োগের ব্যবস্থা নিলেন। দুই দফায় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য Great Leap Forward কর্মসূচি গ্রহণ করলেন, একইসাথে চলে ১২ বছর মেয়াদী কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচি। ১৯৬০ সালে দ্বিতীয় Leap Forward কার্যক্রম শেষ হয়।

স্টালিন মারা যাওয়ার পর মাও সে তুঙয়ের উত্থান আরো বড় আকারে দেখা দেয়। সোভিয়েত-চীনের সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে নিকিতা ক্রুশেভের সময়কালে। তাত্ত্বিক দিক থেকে একদিকে যেমন মাও'র নেতৃত্বে চীন আরো কঠোর বৈপ্লবিক অবস্থান গ্রহণ করে, অন্যদিকে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে আন্তর্জাতিক খেলায় নিয়োজিত থাকার কারণে একটি moderate ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়। বিশ্ব মঞ্চে তাদের একটি ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়। বিশ্ব রাজনীতিতে সময় দিতে গিয়ে অভ্যন্তরীণ নেতৃবৃন্দ অর্থনীতির দিকে নজর দিয়েছেন কম। অপর দিকে দুর্নীতিও চরম আকার ধারণ করে। পশ্চিমা সভ্যতার সাথে আনাগোনাও সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যে চরিত্রগত পরিবর্তন আনা শুরু করে। সোভিয়েত মিলিটারি এবং আণবিক শক্তিকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয়ের কারণে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মোটকথা রাজনৈতিকভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিজম নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন দেশের মধ্যে polemics-র একটি নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। চীন, সোভিয়েত রাজনীতিকে revisionist বলে আখ্যায়িত করে, আর সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন স্টালিন-লেনিনিজম থেকে সরে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ করে। এই দ্বন্দ্ব এবং polemics চলতে থাকে বহু বছর। একদিকে দুই পরাশক্তির স্নায়ুযুদ্ধ এবং পুঁজিবাজার। অন্যদিকে বিশ্বে

www.pathagar.com

সোভিয়েত-চীনের এই দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক কমিউনিজমকে দুর্বল করতে থাকে। পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তৎপর হয়ে ওঠে এবং এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কমিউনিজমের এই দুই মহাশক্তির মধ্যে ব্যবধান আরো বাড়িয়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত দুই দেশের সীমান্ত নদী উসুরি (USSURI) চীনাদের নিকট উজুলি জিয়াং (UZULI ZIANG)—নদীর ধারে সোভিয়েত-চীন সৈন্যদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ ও রক্তপাতের ঘটনা তাদের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটায় এবং ক্রমান্বয়ে বিশ্ব কমিউনিজম দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। ফলে দেশে দেশে কমিউনিস্ট এবং তাদের দলগুলো সোভিয়েতপন্থী এবং চীনপন্থী বলে পরিচিত হতে থাকে। মাওবাদ ও লেনিনবাদের নামে নতুন মেরুকরণের সৃষ্টি হয়। চীন মাও সে তুঙয়ের নেতৃত্বে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন একটি অবস্থানে আসে। তার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য ক্রমান্বয়ে ব্যাপক রূপ ধারণ করে।

তবে এরই সাথে সাথে চীন দেশের অভ্যন্তরে প্রচুর ঘটনা ঘটতে থাকে, মাও সে তুঙয়ের একক উত্থানে নেতৃত্ব উগ্রপন্থীদের হাতে চলে যায় এবং এরাই তাঁকে ঘিরে রাখে। Polemics শুরু হয় নেতৃত্ব নিয়ে। পার্টি এবং মিলিটারির মধ্যে গভীর যোগসূত্র থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোন্ পক্ষ কত শক্তিধর সেটাই ছিল বড় কথা। কিন্তু যেহেতু মাওবাদী উগ্রপন্থীরা ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে তারা দুটোরই নেতৃত্ব দেয়ার চেষ্টা করে।

চীন-সোভিয়েত প্রথম উন্মুক্ত যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ২০তম কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে, যখন তাদের নতুন নেতা ক্রুশ্চেভ-স্টালিনের ঘোর কমিউনিস্ট নীতি প্রত্যাখ্যান করে একটি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেন। অথচ চীন নেতৃবৃন্দের নজরে লেনিন-স্টালিনের নীতিই ছিল কমিউনিজমের মূল স্রোতধারা। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করার জন্য সারা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রে বিপ্লব ঘটানো এবং প্রয়োজনে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে পশ্চিমা পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক আধিপত্য এবং সম্প্রসারণবাদকে ধ্বংস করে বিশ্ব কমিউনিজমের বিজয় প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মূল লক্ষ্য। চীনের দৃষ্টিতে ক্রুশ্চেভের ঘোষিত নীতি ছিল ঐ নীতির পরিপন্থী। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের আপেক্ষিক উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি এবং তা বজায় রাখা এবং আরো উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জন করার লক্ষ্যে বিশ্ব শান্তি বজায় রাখা নতুন নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য মনে হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আণবিক সমরাস্ত্র দিয়ে পশ্চিমা সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়ার ক্ষমতা থাকলেও তারা সাথে সাথে জানত যে সেটা করতে গেলে তাদের নিজেদের ধ্বংসও ছিল অবধারিত। এই নিছক সত্য উপলব্ধি থেকেই doctrine of deterrent-এর উৎপত্তি হয়। পশ্চিমা পুঁজিবাদী শক্তিধররাও বাস্তবতার নিরিখে নিজেদের ধ্বংসের কথা চিন্তা করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এই বাস্তবতাকে চীন মানতে রাজি ছিল না। তারা সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদক্ষেপকে পশ্চাদগামী আপোসকামী ও revisionism বলে মনে করে একে কমিউনিজমের চরম বিকাশ এবং বিজয়ের সাথে একটি মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা বলে আখ্যায়িত করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যতই মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে, চীন ততই

www.pathagar.com

মাও সে তুঙয়ের নেতৃত্বে কমিউনিজমের কঠোর পথ বেছে নিয়েছে। মাও সে তুঙ যখন চীনের অর্থনীতিকে মার্কসিস্ট আঙ্গিকে জোরদার করার জন্য Great Leap Forward কর্মসূচি গ্রহণ করেন, ক্রুশেভ তখন চীনকে কোন সাহায্য সহযোগিতা করলেন না; কৃষি খাতে মাও সে তুঙ যখন বিপ্লব সাধন করার জন্য total collectivism-এর ওপর ভিত্তি করে commune প্রথা চালু করে, ক্রুশেভ তার সরাসরি বিরোধিতা করেন। ১৯৬০ সালে, Great Leap Forward-এর শেষ বছরে, সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন দেশ থেকে তাদের সকল উপদেষ্টা এবং কারিগরি পরামর্শক সাহায্য প্রত্যাহার করে। ১৯৬২ সালে কিউবান মিসাইল সঙ্কটের সময় পশ্চিমাদের সাথে ক্রুশেভের আপোস আর চীন-ভারত যুদ্ধের সময় তাঁর ভারত ঘেঁষা নীতি দুদেশের সম্পর্কের মধ্যে আরো ব্যবধান সৃষ্টি করে। দুদেশের এই দ্বন্দ্ব খুব দ্রুত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে যায়। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে খোলাখুলি প্রচারাভিযানে নেমে পড়ে এবং বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশ একে অন্যের বিরুদ্ধে উসকানি দিতে থাকে এবং ছোট ছোট দেশগুলোকে নিজেদের দলভুক্ত করার কাজে নেমে পড়ে। ১৯৬৪ সালে ক্রুশেভের পতনের পর অবস্থার সামান্য উন্নতির লক্ষণ দেখা গেলেও তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। কসিজিন-বেজনেভের যুগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রুশেভের নীতিই অনুসরণ করে। এর মধ্যে দুদেশের সীমান্ত এলাকায় সংঘর্ষ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে উসুরি নদীর তীরে সীমান্ত বিরোধে দুই দেশের সেনাবাহিনী মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর কমিউনিস্ট বিশ্বের এই দুটো দেশ সম্পূর্ণভাবে দুটো ধারায় বা শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়।

এর মধ্যে চীনের বিভিন্ন প্রদেশে শস্যহানির ফলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়। Great Leap Forward কর্মসূচির পাশাপাশি এই ভয়াবহ প্রাণঘাতী দুর্ভিক্ষ চলতে থাকে যার অনেকটাই গোপন রাখা হয়েছিল। আনহুই (Anhui), শিচুয়ান (Shichuan), স্যানডং (Shandong), হেনান (Henan), হেবী (Hebei)-র মত প্রদেশগুলোতে মহামারীতে এত মানুষের মৃত্যু ঘটে যে সেসব এলাকায় জনসংখ্যার হার অনেক কমে যায় এবং প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হয়ে পড়ে। এই দুর্ভিক্ষ মাও সে তুঙয়ের Great Leap Forward কর্মসূচিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। Total collectivism-এর ওপর ভিত্তি করে commune ব্যবস্থা এবং Great Leap Forward-এর মাধ্যমে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করা একটি সংগ্রামী প্রয়াস ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু চীনের সাধারণ মানুষের ভাগ্যের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং এইসব কর্মসূচি যখন ব্যর্থতার দিকে এগিয়ে যায় সেই সময় মাওপন্থীরা আবার সাংস্কৃতিক বিপ্লব (cultural revolution) শুরু করে।

কিন্তু বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চে মাও সে তুঙয়ের গুরুত্ব এবং মর্যাদা আরো বাড়ে এবং চীন দেশের অভ্যন্তরে তাঁর শক্তি এবং ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। মাও সে তুঙ তখন একটি cult-এ রূপান্তরিত হন। চরমপন্থীরা তাঁকে ঘিরে এবং তাঁর নেতৃত্বে কমিউনিজমকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করার জন্য শুদ্ধি অভিযানের নামে উপরোক্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু

www.pathagar.com

করে। তথাকথিত এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পুরোধাররা সমাজের উচ্চ পর্যায় থেকে গ্রামের সাধারণ পর্যায় পর্যন্ত যাদেরকে তাদের পুরোপুরি একমতাবলম্বী মনে করেনি তাদেরকে বিভিন্ন পদ থেকে সরিয়ে দেয়, হেয় প্রতিপন্ন করে, কারাবন্দি করে। এই প্রক্রিয়ায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। চীনের বড় বড় নেতা যারা মাও সে তুঙয়ের সাথে লং মার্চে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। যাঁরাই একটু সতর্কতার কথা বা বাস্তবমুখী হওয়ার কথা বলেছেন তাঁদের হয় নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, না হয় নির্মূল করা হয়েছে। একমাত্র চৌত্রনলাই ছাড়া বাকি প্রায় কেউই রাজনীতি বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল স্রোতধারায় টিকে থাকতে পারেননি। লী সাওকি, দেঙ জিয়াও পিঙ, পেনজেন—এদের সকলকেই সরে যেতে হয়েছে। মাও সে তুঙয়ের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের কারণে এসব নেতৃবৃন্দ সেদিন কোন মতে প্রানে বেঁচে যান। তবে রাজনৈতিকভাবে তাঁরা যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শিকার হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসলে collectivism আর Great Leap Forward কর্মসূচির ব্যর্থতার কারণে চীনা জনগণের মধ্যে যে হতাশা আর বিক্ষোভ দেখা দেয়, তাকে ঢেকে রাখার জন্য বা অন্য খাতে প্রবাহিত করার জন্য এই "সাংস্কৃতিক বিপ্লব" শুরু করা হয়।

চীনের ইতিহাসে কমিউনিজমের পূর্ণতা অর্জনের প্রয়াসে যে সকল কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অথচ বিপর্যয়মূলক কর্মসূচি ছিল এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব। প্রায় এক দশক ধরে চলা এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব চীনের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে খণ্ড খণ্ড করে দেয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। যে দেশকে গড়ার জন্য, যে কমিউনিজমকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মাও সে তুঙ আজীবন পরিশ্রম এবং সংগ্রাম করে গেছেন, প্রায় সারা জীবনটাই উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁরই শুরু করা সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দরুণ প্রায় সর্বক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতা নেমে আসে। আর তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে আজকের আধুনিক চীনের সূত্রপাত। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে একটি দিক্‌নির্দেশনা থাকলেও খুব শিগগির তা আদর্শচ্যুত হয়ে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী নিধনের কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়। সামাজিক আর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে নিজেদের নেতৃত্ব রক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের আদর্শগতভাবে প্রতিহত করার বিষয়টি অভ্যন্তরীণভাবে ব্যক্তিআক্রোশে পরিণত হয়। এই সময় বিভিন্ন বাহিনীর উৎপত্তি ঘটে, বিশেষ করে লালবাহিনী (red guards)। সবচেয়ে উগ্রপন্থী এই বাহিনী সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে সেনাবাহিনী, যা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির মূল স্তম্ভ, তাদের সাথে বিরোধ বাধে। লালবাহিনী, পার্টি এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে কোন সুপরিকল্পিত সমন্বয় না থাকায় সামাজিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি নৈরাজ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে এবং স্তরে ব্যাপক আকারে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে হত্যা, গুম, রাহাজানি, হয়রানি, চাকরিচ্যুতি, দল থেকে পদচ্যুতি এবং আরো নানাভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হতে থাকে। এই সবকিছুর নেতৃত্বে ছিলেন মাও পত্নী এবং আরো তিনজন নেতা, যাঁরা পরে চার কুচক্রী বলে পরিচিতি লাভ করেন।

www.pathagar.com

যাই হোক, চীনের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব। আজকের চীনের এই নতুন আবির্ভাবের ইতিকথা মূল্যায়নের জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং তার চরম ব্যর্থতার বহুমুখী বিশ্লেষণ এখনো আন্তর্জাতিক পণ্ডিতদের জন্য গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তাঁরা গবেষণার কাজ এখনো অব্যাহত রেখেছেন। প্রফেসর রডারিক ম্যাকফারকার এই বিষয়ের ওপর একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ ঐ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পাওয়ার পর থেকে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জন ফেয়ার ব্যাঙ্কের (John Fair Bank) তত্ত্বাবধানে রড চীনের ১৯৫৬-৫৭ সালের বিভিন্ন ঘটনাবলির ওপর লেখা শুরু করে। তাঁর এই গবেষণা চলতে থাকে। এমনকি ১৯৭৪-৭৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য থাকাকালীনও, যখনই তিনি সময় পেয়েছেন, চীন দেশে গিয়েছেন। মাসের পর মাস চীনের বিভিন্ন শহরে দিনযাপন করেছেন। বড় বড় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, বিভিন্ন পাঠাগারে সময় কাটিয়েছেন, চীনের বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিজীবীদের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। অধ্যাপনা করেছেন। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত তিনি চীন দেশের ওপর অসংখ্য নিবন্ধ রচনা করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত The China Quarter-র সম্পাদক হিসেবে তাঁর সুখ্যাতির কথা কে না জানে! তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রচনা হলো এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পটভূমি এবং মূল সূত্রের ওপর The Origins of the Cultural Revolution বইটি তিনটি বড় বড় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগের এক দশকের ওপর রচনা নিয়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। ৪৩৯ পৃষ্ঠার এই বইতে রড ১৯৫৬-৫৭ সালের ঘটনাবলির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ক্রুশ্চেভ-স্টালিনের রাজনীতি বিসর্জনের প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট বিশ্বে মাও'র নতুন করে উত্থান এবং Great Leap Forward কর্মসূচির সূচনা এবং দর্শনের ওপর আলোকপাত করেছেন। একই ধারাবাহিকতায় লিখেছেন ৪৭০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় খণ্ড, যা প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে। এরপর আসে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত ৭৩৩ পৃষ্ঠার তৃতীয় খণ্ড ১৯৬১-৬৬ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলির ওপর, সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। এই তিনটি খণ্ডেই আছে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। যদিও মাও'র নেতৃত্বের কোন বিকল্প ছিল না, কিন্তু তারপরও অনেক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ ছিল। এই সময় মাও সে তুঙ দলের চেয়ে নিজের Vision of China-কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যার জন্য দলের অনেক নেতাকে সরিয়ে দেয়া হয়। দল, মিলিটারি এবং পরবর্তীকালে রেড গার্ডদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়নি বলে শেষ পর্যন্ত মাও সে তুঙয়ের তিনটি আন্দোলন বা গণবিপ্লব সাধনের কর্মসূচি Absolute Collectivism, Great Leap Forward এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কোনটাই সফল হয়নি। সবগুলোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ব্যর্থতার সাথে সাথেই মাও সে তুঙয়ের পতন ঘটে। তবে মাও সে তুঙ যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস কারো ছিল না।

www.pathagar.com

তারপর আরো একটি কথা থেকে যায়। স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত নেতাদের সাথে মাও সে তুঙয়ের মতভেদ এবং চীন দেশে পরবর্তীকালে যে তিনটি বিশেষ কর্মসূচি তিনি হাতে নিয়েছিলেন এগুলো সব কি নিজের নেতৃত্বকে সমুন্নত এবং অটুট রাখার জন্য করেছিলেন? নাকি লেনিন-স্টালিনের নীতি অনুসরণ করে কমিউনিজমের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার জন্য একটি আদর্শগত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন? এই বিষয়ে অনেক রকমেরই বিশ্লেষণ আছে। তবে মাও সে তুঙয়ের মৃত্যুর পর মাওপন্থীদের সর্বনাশ নেমে আসে এবং তাঁর নীতি আদর্শের পতন ঘটে। দলের মূল স্রোতধারা চলে আসে দেঙ জিয়াও পিঙয়ের নেতৃত্বে ৪ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পক্ষে। মাও-এর ঘনিষ্ঠতম নেতাদের ৪ কুচক্রী বলে আখ্যায়িত করে কারাবন্দি করা হয়। ডেঙয়ের সেই নতুন কর্মসূচি এবং নীতিমালার ধারাবাহিকতায় চীন এখন পরিচালিত হচ্ছে এবং এর ফলে বিপুল অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করেছে। তাই প্রশ্ন ওঠে, আজকের চীন আর ক্রুশ্চেভ-কসিজিন-ব্রেজনেভ-গরবাচভের সোভিয়েতের সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আর তফাৎ থাকল কোথায়! চীন দেশকেও কি তাহলে পশ্চাদ্‌গামী আপোসকামী revisionist বলতে হবে? চীন এখন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সমাজতন্ত্র আর অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী সংস্কার নীতি অনুসরণ করে চলেছে। সোভিয়েত বা রাশিয়ার সাথে চীন দেশের আদর্শগত বিভেদটা এখন কোথায় এবং কতটুকু সেটাই এখন নতুন গবেষণার বিষয়। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন নেই এবং সোভিয়েত কমিউনিজম বা সোভিয়েতকে ঘিরে বিশ্ববলয় বা মেরুকরণ বলতে যা বোঝায়, এখন তার আর অস্তিত্ব নেই। রাশিয়াসহ সোভিয়েত বলয়ের বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশে এখন চলছে গণতন্ত্রায়ন এবং অর্থনৈতিক উদারতার ব্যাপক সংস্কার। বলতে গেলে শুধু চীন দেশেই এখনো রাষ্ট্র ক্ষমতা এবং পরিচালনায় কমিউনিস্ট কাঠামোটি রয়ে গেছে। কতদিন চীন এই ব্যবস্থা ধরে রাখতে পারবে, সেটাই আজ সারা বিশ্বের ঔৎসুক্যের বিষয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের উত্থানের নতুন প্রেক্ষাপটের আলোকে রডারিক ম্যাকফারকারের গবেষণার কাজ আগামী শতাব্দীতে আরো অনেক গুরুত্বের সাথে আলোচিত হবে।

বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে চীনের এই উত্থান একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। শুধু বিশ্ব পরিমণ্ডলে নয়, এশিয়ার এই আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে এর একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। গণতান্ত্রিক একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে একদিকে ভারতের আবির্ভাব অন্যদিকে পুঁজিবাদের আদলে নিয়ন্ত্রিত কমিউনিস্ট চীনের এক প্রচণ্ড অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাঝখানে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য আগামী কয়েক দশক এই অবস্থান আমাদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিরাজ করবে। যদিও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে সমর্থন দেয় এবং তার বিপরীতে চীন পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে পরোক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন যোগায় এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে

www.pathagar.com

স্বীকৃতি দেয়নি, কিন্তু ১৫ আগস্ট এদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে চীন বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শহীদ জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হওয়ার পর চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক গড়ে ওঠা শুরু হয় এবং তাঁরই শাসনকালে সেই সম্পর্কের একটি স্থায়ী ভিত্তি রচিত হয়। সেই সম্পর্ক পরবর্তীকালে সকল সরকারের সময় অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক কারণে চীনের সাথে একটি গভীর আস্থার সম্পর্ক অব্যাহত রাখা জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষাপটে এখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ২১

বিরোধী আন্দোলন: আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আর এরশাদ সরকারে যোগদান

৭ জুলাই আমার মুক্তির সময় সামরিক আইনের অধীনে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি থাকাতে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে রাজনৈতিক তৎপরতা চলতে থাকে পুরোদমে। বিভিন্ন ইস্যু এবং দিবস পালন উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায়, অডিটোরিয়ামে এবং অফিস প্রাঙ্গণে সরকারবিরোধী সভা সমাবেশ চলতে থাকে। ১৯৮৩ সালের ১৪ নভেম্বর থেকে প্রকাশ্য রাজনীতি ঘোষণা করার পর বিরোধী আন্দোলন আরো শক্তি সঞ্চয় করে। আওয়ামী লীগ ১৫ দলীয় এবং বিএনপি ৭ দলীয় ঐক্যজোট গঠন করে যার যার রাজনৈতিকবলয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং যুগপৎ আন্দোলনের সূচনা করে। বেগম জিয়াকে নিয়ে আমরা তখন প্রতিদিন ঢাকায় সভা করেছি। পুরোনো ঢাকার নয়াবাজারে আমাদের যে অফিস ছিল সেখান থেকে পায়ে হেঁটে প্রেস ক্লাব পর্যন্ত আমরা বেগম জিয়ার নেতৃত্বে অনেকবার বিক্ষোভ-মিছিল করেছি। ধানমন্ডির ২৭ নম্বর রাস্তায় শহীদ জিয়ার রেখে যাওয়া সেই অফিসেই বিএনপির অফিস ছিল।

ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাগুলোর নির্বাচনের পর এরশাদ ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তারিখ ঘোষণা করলে দুজোট তার ঘোর বিরোধিতা করে। যুগপৎ আন্দোলনকে আরো জোরদার করার জন্য তারা ন্যূনতম কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করে একটি ৫ দফা দাবি প্রণয়ন করে এবং এই আন্দোলনের মুখে এরশাদ উপজেলা নির্বাচন বাতিল করতে বাধ্য হন। পরবর্তী সময়ে সরকার উপজেলাবিরোধী আন্দোলনকে দমন করার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের গ্রেপ্তার এবং নানা রকম হয়রানি শুরু করে। সামরিক আইনকে আবার কঠোরভাবে প্রয়োগ করে সব ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা পুনরায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

এই পুরো বছরটিতেই আমরা অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, রাতে বাড়িতে থাকতে পারতাম না, প্রায় প্রতি রাতেই বাড়িতে পুলিশ আসত, বিশেষ করে যখন কোন সঙ্কট দেখা দিত। সরকারের নীতি ছিল আমাদের তাড়া করা অর্থাৎ আমাদের দৌড়ের মধ্যে

www.pathagar.com

রাখা। আর যখন রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ ছিল তখন স্বনামধন্য নারীনেত্রী রোকেয়া কবিরের গুলশানের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলাম বেশ কিছু দিন। মাঝে মাঝে যখন বাড়িতে থাকতাম তখন রাতেরবেলায় হাসনা আর আমানকে নিয়ে আমাদের বাড়ির সাথে লাগানো জার্মান রাষ্ট্রদূত ভন মার্শালের বাড়িতে গিয়ে থাকতাম। আমাদের জন্য একটি কামরা আলাদা করা ছিল। আমাদের বাড়ির এদিকে দেয়ালের সাথে লাগানো একটি মই, আর দেয়ালের ওপারে রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে আর একটি মই রাখা থাকত। যখনই পুলিশের হামলা বেড়ে যেত বা আতঙ্কিত থাকতাম তখন বউ বাচ্চাকে সাথে করে রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে রাত কাটাতাম। এ ধরনের পলাতক অবস্থায় আমি একটি কবিতা লিখেছিলাম। প্রায় সকল বাঙালি শিক্ষিত যুবকের মত আমিও ছোটবেলায় মাঝে মাঝে কবিতা লিখতাম। যৌবনের আবেগ মিশ্রিত সখের কবিতা। কোন সঙ্কলন নেই, সবই প্রায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু এই কবিতাটি পাণ্ডুলিপিতে রয়ে গেছে:

পলাতক অবস্থায়: সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে (মার্চ ১৯৮৪)

আমরা তোমাদের ভয় করি না
ঘৃণা করি
ছোট এবং নীচ ভাবি;
আমরা বাড়ি যেতে পারি না
স্ত্রী পুত্র কন্যা এমনকি বিরাশি বছরের
বুড়ো মাকে দেখতে পারি না।

তোমাদের অস্থি মজ্জা চর্বি মাংস
যেসব গরিব দুঃখী অসহায় মানুষের
শরীরকে নিঃস্ব করে তৈরি হয়েছে,
তাদের আমরা ভয় করি না।

নিষ্প্রয়োজন এই শক্তি;
শুধু ব্যভিচার করে, মানুষকে ভয় দেখায়
আর লুটতরাজ করে নির্বিবাদে
ভাঁওতা দেয় মানুষকে মিথ্যা কথা বলে;
তাতে কি আসে যায় তাদের
মৃত্যু যাদের জয় করতে পারে না।
মুক্তিযুদ্ধের কথা এরা ভুলে যায়নি
যখন তোমরা ভয়ে আশ্রয় নিয়েছিলে
শত্রুপক্ষের আস্তানায়

www.pathagar.com

সাহস হয়নি তোমাদের
জাতীয় যুদ্ধে অংশ নিতে।

এরপরও কথা বলো মুক্তিযুদ্ধের,
শঠতার একটা সীমা নিশ্চয়ই আছে;
এরপরও মিথ্যা কথা বলো
গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলো,
ভুলে যাও কেমন করে ক্ষমতা দখল করেছো,
কেমন করে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছো।

ভাবো মানুষ এতই বোকা
অশিক্ষিত দরিদ্র বলে
তারা কিছুই বোঝে না?
এবার তোমাদের দেখাবে তারা
কেমন করে জব্দ করতে হয়
কেমন করে শেষ করে দিতে হয় চিরতরে
তোমাদের বুটের আওয়াজ।

আসিফ আর আমানের রক্তে গ্লাইসিন পাওয়ার পর আর একটি সন্তান লাভ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা ভীত ছিলাম। বন্ধু-বান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষীরা নানা রকমের পরামর্শ ও উপদেশ দিয়েছে। জ্যোতিষীরা নানা রকমের ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। কেউ বলেছে অপেক্ষা করতে, কেউ বলেছে মেয়ে হলে ভাল হবে ইত্যাদি। আসিফের মৃত্যু আর আমানের প্রতিবন্ধিতা আমাদের আর একটি সন্তান লাভের ব্যাপারে বরাবরই নিরুৎসাহিত করেছে। বিদেশী ডাক্তার-বিশেষজ্ঞরা বলেছে ব্যাপারটা হবে ঝুঁকিপূর্ণ। দুটি সন্তানের পর পরবর্তী সন্তানের রক্তে গ্লাইসিন না থাকার সম্ভাবনা বেশি, তবে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। জেনেশুনে একটি ঝুঁকি নিতে হবে। ১৯৮৪ সালের শেষের দিকে আজমীর শরীফ গেলাম জিয়ারত করার জন্য। আর একটি সুস্থ সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে তাঁর দয়া ভিক্ষা চাইলাম।

দিল্লিতে ফিরে এসে শুনলাম দেশে আবার ধরপাকড় শুরু হয়ে গেছে। এরশাদ সরকার উপজেলা নির্বাচন করার জন্য বিরোধী দলের আন্দোলনকে দমন করতে চায়। খবর পেলাম ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করার সাথে সাথেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে। আমি যেন এই সময়ে দেশে না ফিরি। তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম হাসনা আমানকে নিয়ে ঢাকায় ফিরে যাবে, আর আমি লন্ডনে যাব। কিন্তু সাথে তো টাকা নেই। শেষ পর্যন্ত আমাদের একজন সাংবাদিক বন্ধু টালরেজা মাথরা, যার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় ১৯৭১ সালে যুদ্ধের প্রারম্ভে আগরতলায়, তার কাছ থেকে টাকা কর্জ নিয়ে টিকেট কিনে লন্ডন চলে গেলাম। কয়েক

www.pathagar.com

মাস অনেকটা স্বেচ্ছানির্বাসনে থাকতে হলো। কিছুদিন প্রন কিং বলে পরিচিত চিংড়ি ব্যবসায়ী মিয়ার বাসায় ছিলাম। কিন্তু তাঁর ব্যবহার ভাল ছিল না। পাঁচশ পাউন্ড ধার চেয়েছিলাম কিন্তু দিলেন না। বললেন, অসুবিধা আছে। অথচ মন্ত্রী হিসেবে যখন গিয়েছি তখন কত না খাতির। অবাক লাগল যে, বিপদের সময় পাশে দাঁড়ালেন না।

এরপর দেখা করতে গেলাম চার্টার্ড একাউন্টেন্ট রেজাউর রহমানের সাথে তাঁর পিকাডিলির অফিসে। এরকম একটি মানুষ হয় না। নিজের থেকেই জিজ্ঞেস করলেন কিছু লাগবে কিনা। পাঁচ শত পাউন্ড চাইতেই পকেট থেকে বের করে দিলেন। এর পর বহুবার সেধেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত টাকাটা আর ফেরত নেননি। এই একটি ঋণ এখন পর্যন্ত থেকে গেল। আমি কোনদিন কারো কাছ থেকে কোন অর্থ সাধারণত ধার করিনি। এটি আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ। মিথ্যা কথাও আমার মুখ দিয়ে সাধারণত আসে না। পরিচিত অনেককে দেখেছি, অতি সহজে অকপটে মিথ্যা কথা বলে। অনেক সময় অনেকটা নিস্প্রয়াজনে। যাই হোক প্রায় তিন মাস নির্বাসনে থাকার পর দেশে ফিরে এসে আবার বেগম জিয়ার নেতৃত্বে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লাম, সাথে সাথে সুখবর পেলাম আজমীর শরীফ থেকে ফেরার পর হাসনা আবার মা হতে চলেছে।

১৯৮৫ সালের প্রথমার্ধে হয়ে গেল এক বিরাট ঝড়। উপকূলীয় অঞ্চলে মানুষের জন্য নেমে আসে এক মহাদুর্যোগ। আবদুল আউয়াল মিন্টুর কাছ থেকে একটি পাজেরো জীপ চেয়ে নিয়ে বেগম জিয়াকে নিয়ে আমরা চলে গেলাম সেই নোয়াখালীর চরে, সঙ্গে কিছু ত্রাণসামগ্রী নিয়ে গেলাম ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য। সেদিন রাত্রেই ফিরতে হবে, কিন্তু রওনা হতে হতে রাত প্রায় ৯টা বেজে গেল। পথে খাওয়াদাওয়া করতে আরো দেরি হলো। আমি ড্রাইভারের পাশে বসা। আমার ঠিক পিছনের সিটে বেগম জিয়া এবং তাঁর সঙ্গী জাহানারা বেগম এবং তাঁর পিছনে ছিলেন জাফর ইমাম এবং আরো দুয়েকজন। রাত তখন প্রায় দেড়টা-দুটো হবে, আমাদের গাড়ি বেশ দ্রুতগতিতে চলছিল। ড্রাইভার বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ এক বিকট শব্দ এবং গাড়িটি গিয়ে রাস্তার ওপারের একটি বিরাট গাছের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খায় এবং একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়ি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আমি তার কিছুদিন আগেই লন্ডন থেকে ফিরেছি। সেই অভ্যাসে সিট বেল্ট বাঁধা ছিল আমার। আমাদের দেশে কেউ সিট বেল্ট বাঁধে না এবং আমিও বাঁধি না। কিন্তু কেন জানি সেদিন সিট বেল্ট বেধেছিলাম, কারণ বিদেশে এটি আইন, অমান্য করলে শাস্তি পেতে হয়। আমি সিট বেল্ট বাঁধা অবস্থায় থাকাতে একটি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছি বললেই হয়। আমরা সবাই আঘাতপ্রাপ্ত হই। বেগম জিয়া সামান্য আঘাত পেলেন, কিন্তু আমি আর গাড়িচালক সবচেয়ে বেশি আঘাত পাই। আমার ছয়টা পাঁজর ভেঙে যায় এবং আমি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক কষ্টের মধ্যে ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই রাতেই দুর্ঘটনাস্থলে লোকজন জড়ো হয়ে যায় এবং আমাদেরকে কুমিল্লা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি কিছুটা প্রায় অজ্ঞানই ছিলাম বলে মনে হয়। যখন পুরো জ্ঞান ফিরেছে তখন অসম্ভব ব্যথা অনুভব করি। রাত পোহানোর পর সকালবেলা আমাদের

www.pathagar.com

সবাইকে ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে প্রায় ১৫/২০ দিন চিকিৎসার পর বাসায় আসি। বাসায় আমাকে শয্যাশায়ী হয়ে বেশ কিছুদিন কাটাতে হয় এবং সুস্থ হতে বেশ সময় লাগে। পাঁজর ভেঙে গেলে বিশ্রাম ছাড়া কোন বিশেষ চিকিৎসা নেই। তবে সেরে যাওয়ার পরেও অনেক সময় ব্যথা থাকে।

এই দুর্ঘটনার পর যা ঘটেছে তা আরো দুঃখজনক। আমি তখনো বাড়িতে রোগশয্যায় এবং বিশ্রামে আছি। এর মধ্যে ঈদ গেল। আমি তখন সাংঘাতিক রকমের অসুস্থ, কিন্তু কেউই আমার কোন খোঁজখবর নিল না। বেগম জিয়া বা তাঁর পক্ষ থেকে একটি টেলিফোনও কেউ করলেন না অথচ তাঁর সাথে একই গাড়িতে জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িরও ব্যবস্থা আমি করেছি। গাড়ির মালিককে একটা ধন্যবাদ দেয়া বা দুঃখপ্রকাশ করা, সেটাও করা হলো না। যাই হোক তারও প্রায় মাসখানেক পরে, হঠাৎ করে দল থেকে বেগম জিয়ার সই করা ইংরেজিতে লেখা তিন পাতার একটি 'কারণ দর্শাও' নোটিশ পেলাম। এর মধ্যে শাহ আজিজুর রহমান বিএনপি ভেঙে নতুন বিএনপি করে এরশাদের সঙ্গে যোগদান করেন। কিন্তু এরশাদ শেষ পর্যন্ত শাহ আজিজকে মন্ত্রিসভায় কোন পদ দেননি। বিএনপি থেকে শাহ আজিজ চলে যাওয়ার পর তখন অনেক গুজব যে, অনেকেই আর বেগম জিয়ার সঙ্গে থাকছে না, তারা সবাই এরশাদ সরকারে যোগদান করবে। কিন্তু কারণ দর্শাও নোটিশ পেয়ে আমি তো অবাক। দুইটি মূল কথা নোটিশে ছিল। প্রথমটি হলো, আমি যারা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অর্থাৎ শাহ আজিজ এবং এদের সঙ্গে দলের মধ্যে ষড়যন্ত্র করছি। অথচ শাহ আজিজের সঙ্গে আমার কোন রাজনৈতিক সম্পর্কই ছিল না। সুতরাং এটি ছিল একটি নেহাৎ ভিত্তিহীন অভিযোগ। বাস্তবতা হচ্ছে, আমি নিজেই একজন মুক্তিযোদ্ধা। বেগম জিয়া জানতেন কিনা জানি না, স্বাধীনতাযুদ্ধে আমার একটি ভূমিকা ছিল। সেটি জানলে এ ধরনের অভিযোগ তোলার সুযোগ ছিল না। আর তাছাড়া আমার ধারণা, এই নোটিশ নিশ্চয়ই অন্য কেউ লিখে দিয়েছে, উনি তাতে সই করেছেন। তাঁকে ভুল বোঝানো হয়েছিল। দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল, আমি সরকারের সঙ্গে কোন একটা সমঝোতা করার চেষ্টা করছি। এই দুই অভিযোগ করে বলা হলো, কেন আমাকে সদস্য পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে না, তার উত্তর দিতে।

আমি নোটিশ পাওয়ার সাথে সাথে উত্তর দিলাম। বললাম যে, অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা। বেগম জিয়াকে টেলিফোন করলাম। তিনি আমাকে বললেন, নোটিশটি প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। কিন্তু সেই কারণ দর্শানোর নোটিশ কোনদিনই আর প্রত্যাহার করা হয়নি। কি কারণে হয়নি, কেন হয়নি, কারা এর পেছনে ছিল, কেন করা হয়েছিল—এইসব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে এখনো অজানা। পরে শুনেছি যারা এটার সাথে জড়িত ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল নেতৃত্বের কাতার থেকে আমাকে সরিয়ে দেয়া। অর্থাৎ দলে যারা আমার প্রতিপক্ষ ছিল তারাই ষড়যন্ত্র করে মির্জা গোলাম হাফিজের মাধ্যমে বেগম জিয়াকে বুঝিয়ে এই কারণ দর্শানোর নোটিশটি পাঠায়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই বেগম জিয়ার সঙ্গে আমার ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয় এবং এতে আমার মনে হয় যে, আমার

www.pathagar.com

ওপরে তাঁর আর আস্থা নেই এবং আমাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পারস্পরিক আস্থাহীনতা সৃষ্টি হলে তখন আর যাই হোক একসাথে রাজনীতি করা সম্ভব হয় না। অনেক উন্নত দেশে এই চর্চা বা কালচার অর্থাৎ এরকম অবস্থায় এরকমই ধারণা করে নেয়া হয়। আমিও বিষয়টিকে সেভাবেই দেখেছি এবং ভেবে দেখলাম, যে দলের জন্য এত কিছু করলাম, যে দলের জন্ম থেকে আমার সম্পর্ক এবং যে দলের ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্রের প্রথম খসড়া আমার তৈরি করা, যে দল গড়তে আমার অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, বাংলাদেশে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আমি শহীদ জিয়ার সঙ্গে যাইনি এই দল গঠন করার জন্য, আজকে সেই দল থেকে এ ধরনের একটি অপমানজনক মিথ্যা কারণ দর্শানো নোটিশ আমার ওপর জারি করা হলো! এই ঘটনায় আমি যে কি দুঃখ পেলাম, আমার মনের মধ্যে কি ক্ষোভ ও হতাশা জন্মালো তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এ ধরনের একটা ব্যবহার আমার মত মানুষের সাথে যদি করা হয়, তাহলে বিএনপিতে যত নেতাকর্মী আছে তাদের ভাগ্যে কি আসবে বা কি জুটবে! কত হেঁটেছি বেগম জিয়ার সঙ্গে। তাঁকে নিয়ে কত সভা, সমাবেশ, মিছিল করেছি। প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাহাদাতবরণ করার পর বেগম জিয়াকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর প্রস্তাব করা এবং তাঁকে রাজনীতিতে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে যে কয়েকজনের অবদান ছিল, আমার ধারণা আমি ছিলাম তাদের মধ্যে অন্যতম। এমনকি ১৯৮২ সালে ৭ নভেম্বর শহীদ জিয়ার মাজারের অনুষ্ঠানে বেগম জিয়ার প্রথম রাজনৈতিকভাবে আত্মপ্রকাশের পেছনে আমার সক্রিয় ভূমিকা ছিল জেনেই জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসন জারি হওয়ার প্রায় আট মাস পর আমাকে গ্রেপ্তার করেন। যখন দেখলাম একটা অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি, আর কারণ দর্শানো নোটিশ প্রত্যাহার হলো না, আমি ধরে নিলাম বিএনপির সঙ্গে আমার সম্পর্ক বোধহয় সেখানেই শেষ হয়ে গেছে এবং এটা আমার নিজের কোন কারণে নয়। আমি বিএনপি ছেড়ে দেইনি, বরং বিএনপি আমাকে আর চায় না।

এই শূন্যতার সুযোগ নিয়েছেন এরশাদ। তাঁরা তো সব খবর রাখতেন। টেলিফোন নিয়মিতভাবে আড়িপাতা হতো। এই সুযোগে এরশাদ আমার সাথে যোগাযোগ করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, তিনিও গণতন্ত্রে ফিরে যেতে চান; সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান; নির্বাচন দিতে চান; জনগণের অধিকার জনগণকে ফেরত দিতে চান। প্রশ্ন করেন, আপনি যদি জিয়াউর রহমানকে সাহায্য করতে পারেন, তাহলে আমাকে পারবেন না কেন? জিয়াউর রহমানও একজন জেনারেল ছিলেন, আমিও একজন জেনারেল, আমিও তো গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে চাই। জিয়াউর রহমান যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের রাজনীতি করেছেন, আমিও তো একই রাজনীতিতে বিশ্বাসী, ইত্যাদি। এই কথা বলে তিনি তাঁর অফিসারদের পাঠানো শুরু করলেন। শেষ পর্যায়ে মনে হলো এরশাদ বেশ সিরিয়াস এবং সত্যিই একটা ভাল কিছু করতে চান।

আমার এলাকার মানুষ এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এলাকার মানুষ চায় তাদের এলাকার উন্নয়ন, বেকার যুবকরা চায় চাকরি,

www.pathagar.com

এবং দেশের মানুষ চায় তাদের জন্য একটা কিছু করি। তারা এটাও বোঝে যে ক্ষমতা ছাড়া এলাকার উন্নয়ন হয় না। তাই তারাও চাপ দিতে থাকে সরকারে যোগদান করার জন্য। দেশে তখন সামরিক আইন। জীবনেরও তো একটা বয়স আছে। শহীদ জিয়া যখন গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার কথা বললেন তখন তাঁকে যতটা পেরেছি সাহায্য করেছি। এখন একই প্রশ্ন এলো আবার। হয় বসে থাকা ও কিছু না করা, আর না হয় এরশাদকে সাহায্য করা, তাঁর সরকারে যোগদান করা। আমি তো একজন রাজনৈতিকভাবে সচেতন ব্যক্তি। আমাদের মত মানুষের পক্ষে ইতিহাসের চলমান স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কঠিন। এলাকার মানুষের কথা চিন্তা করলাম। অন্তত যদি কিছু রাস্তা করে দিতে পারি, কিছু বিদ্যুৎ এনে দিতে পারি, তাদের কিছু সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে পারি, কিছু বেকার যুবকদের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারি, আর জাতীয় পর্যায়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যদি কিছু অবদান রাখতে পারি, নীতিনির্ধারণে যদি নিজের চিন্তাচেতনার কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারি তাহলে কিছুটা হলেও আত্মতৃপ্তি পাওয়া যাবে। অথচ সময় তো ফুরিয়ে যাচ্ছে, আমরা তো সবাই চলে যাব, সুতরাং বয়স থাকতে, যখন দৈহিক সামর্থ্য আছে, তখন দেশের জন্য কিছু করার সুযোগ গ্রহণ করা হয়তো ভাল হবে। তাছাড়া এখন তো সেই ১৯৬২, ৬৮, ৬৯, ৭০ এবং ৭১-এর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আর নেই। বাংলাদেশ জন্মলাভ করেছে, স্বাধীন হয়েছে। বাস্তব হলো এখন দেশকে গড়ে তুলতে হবে। সামরিক আইনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি না, সামরিক আইন বাংলাদেশের কেন, কোন দেশেরই উন্নয়ন আনতে সক্ষম হয়নি এবং হবেও না, এ ব্যাপারে আমার ধারণা অত্যন্ত পরিষ্কার। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো দেশে সামরিক শাসন বলবৎ রয়েছে। এই সামরিক আইনের অবসান ঘটাতে হবে এবং কাউকে না কাউকে কাজ করতে হবে, কাউকে না কাউকে এতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

আমি মনে করি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে রাখতে হলে বাংলাদেশের নিজস্ব একটি সত্তা থাকা দরকার, নিজস্ব বৈদেশিক এবং অর্থনৈতিক নীতি থাকা দরকার। নিজেদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে শক্ত মনোবল বজায় রাখার দরকার। দরকার উন্নয়নের নিজস্ব কৌশল রচনা করে অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করা। তবে ভারতের মত একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র, বিরাট রাষ্ট্র তিন দিক থেকে আমাদেরকে বেস্টন করে রেখেছে—এটিই বাস্তবতা এবং এই বাস্তবতাকে আমাদের স্বীকার করতে হবে। একটি প্রতিবেশী ছোট রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের অবশ্যই ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে কিন্তু আমাদের পররাষ্ট্রনীতি, আমাদের অর্থনীতি ভারতের বা ভারতের মার্চেন্ট ক্লাসের অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে তা আমাদের দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ভারতের গণমানুষের বিরুদ্ধে আমাদের বলার কিছু থাকতে পারে না। ভারতের রাষ্ট্রের উদ্দেশেও এই কথাগুলো নয়, কিন্তু ভারতকে যারা পরিচালনা করেন, যারা ভারতের চালিকাশক্তি, নীতিনির্ধারক বা central establishment, তাদের আধিপত্যবাদের কৌশল থেকে দেশের স্বার্থকে সবচেয়ে আগে স্থান দিয়ে বাংলাদেশকে

www.pathagar.com

স্বাধীন এবং মুক্ত রাখতে চাইবে দেশের মানুষ। কিন্তু আওয়ামী লীগের নীতি এবং মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা ভারতকে গুরু মনে করে, ভারতের কাছে তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে যায়। আমার মনমানসিকতায় আমি সেটা পছন্দ করি না। আমি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় নিজেকে যে কারণে জড়িত করেছিলাম এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে যেইভাবে যেই আঙ্গিকে অংশগ্রহণ করেছিলাম, সেই চেতনাকে আমি কখনো নষ্ট হতে দিতে চাই না। একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে থাকার নীতি এবং মনমানসিকতা নিয়ে এই বিশ্বায়নের যুগেও আমাদের জাতীয় সত্তাকে সমুন্নত রেখেই ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। একটা অধঃস্তন শোষিত জাতি হিসেবে নয়। তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন অর্থ হয়নি। এত আন্দোলন কেন করেছি, দেশকে স্বাধীন কেন করেছি? আমার মনের এই অনুভূতি, এই ভাবধারাই হলো, আমার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।

এই সমস্ত চিন্তা করে তখন আমি সিদ্ধান্ত নেই যে সরকারে যোগদান করব এবং ১৯৮৫ সালের ৫ আগস্ট তারিখে আমি এরশাদের সরকারে যোগদান করি। এই যোগদানের পেছনে অবশ্য বন্ধু আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর একটা ভূমিকা ছিল। সে অনেক দিন যাবৎ বলে আসছিল যে বাস্তবতার নিরিখে সরকারে যোগদান করাই ভাল হবে এবং চেয়েছিল যে আমরা একসঙ্গে যোগদান করি। কিন্তু আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলাম, মনে খুব ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তারপরে যখন সবকিছু বিচার বিবেচনা করে দেখলাম যে যদি এই সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে আবার গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ায় দেশকে ফিরিয়ে আনতে পারি তাহলে দেশের জন্য ভাল হবে। ঠিক আছে আমার বদনাম হবে, আমাকে লোকে দুর্নাম করবে, সুযোগসন্ধানী বলবে, বলবে আমি মন্ত্রী হওয়ার জন্য যোগদান করেছি, বলুক গিয়ে। আদর্শের তো বিচ্যুতি ঘটবে না। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শেই তো কাজ করে যাব। আমি আবার নিজেকে সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে যতটুকু করা সম্ভবপর দেশের জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছি। একটা কথা বলতে পারি যে, সততা আর নিষ্ঠার সাথে যতটুকু পেরেছি কাজ করেছি এবং এরশাদের নতুন দলের ঘোষণাপত্র এবং গঠনতন্ত্রের খসড়া তৈরি করে দেই। যেভাবে প্রেসিডেন্ট জিয়ার জন্য করেছিলাম। প্রেসিডেন্ট জিয়ার ১৯ দফাকে সমন্বিত করে এরশাদের ১৮ দফা প্রণয়ন করা হয়েছিল। তাই বিএনপির ঘোষণাপত্রের সঙ্গে জাতীয় পার্টির ঘোষণাপত্রের কোন তফাৎ ছিল না। ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির কিছু সমস্যা হলেও আদর্শগতভাবে আমি আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হইনি। তাছাড়া মানুষের কল্যাণের জন্যই তো রাজনীতি করা। এলাকার মানুষ বা তাদের উন্নয়ন সেই রাজনীতিরই তো একটি অংশ। এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা হবে কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।

www.pathagar.com

অধ্যায় ২২

কন্যা লাভ: আনা কাসফিয়া প্রিয়দর্শিনী

এদিকে জুলাইয়ের একেবারে শেষের দিকে হাসনা খুবই advanced অবস্থায় আমেরিকায় চলে গেল। সাধারণত এই অবস্থায় কোন এয়ারলাইন্স এ ধরনের প্যাসেঞ্জার নেয় না এবং কারো উচিতও নয় এত বড় ঝুঁকি নিয়ে যাওয়া। কিন্তু হাসনা determind ছিল। সন্তান প্রসবের ঝুঁকি ঢাকায় সে নিতে চায়নি। নয় বছর পর সন্তান হবে আর গ্লাইসিনের বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বস্টনের Children's Hospital-এর সুপরিচিত প্রসিদ্ধ ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে সন্তানের জন্ম হোক—এটাই তার ইচ্ছা। আমিও একমত ছিলাম। এমিলি ও তাঁর স্বামী রডারিক ম্যাকফারকার ঐ সময় চীনে থাকবেন, তাই তাঁদের কেম্ব্রিজের বিরাট বাড়িটা ছেড়ে দিলেন হাসনার জন্য। হাসনা সে বাড়িতে গিয়ে উঠল আর সন্তান প্রসবের জন্য বস্টনের প্রসিদ্ধ মহিলাদের হাসপাতাল Bigham Women Hospital-এ ভর্তি হলো। তাদের নিয়মিত তত্ত্বাবধানে এমিলিদের বাড়িতে থাকতে লাগল। আমি এরশাদ সরকারে যোগদান করার দিন দশেক পরে চলে গেলাম আমেরিকায় হাসনার পাশে থাকার জন্য। আমরা একইসাথে এমিলিদের সেই সুন্দর বাড়িতে থাকলাম বেশ কিছু দিন। ৩১ আগস্ট ভোরবেলায় হাসনার প্রসব বেদনা দেখা দিলে অ্যাম্বুলেন্স এলো হাসনাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। এর মধ্যে আমরা জেনে গিয়েছিলাম যে আমাদের কন্যাসন্তান হবে। তাই আমরা দুজনই খুশি ছিলাম এবং অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছি, ৯ বছর পর দুটি পুত্রসন্তানের পর এবার 'আনা' আসবে। বিজ্ঞানের কারণে কি সন্তান হবে সেটা এখন আগেই জানা যায়। মাত্র আবিষ্কার হয়েছে। তাই পিতামাতারা আগে থেকে সেরকমের প্রস্তুতি নেয়। নামকরণ থেকে জামাকাপড়, কোথায় থাকবে, কোথায় রাখবে, এমনকি কি ধরনের স্কুলে যাবে তাও আগে থেকে পরিকল্পনা করে রাখতে পারে। হাসনা বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের সাথে আলোচনা করার মাধ্যমে আমরা আসন্ন কন্যাসন্তানের নামও ঠিক করে রেখেছিলাম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনীতিক তৌফিক আলীর স্ত্রী নাম রাখতে বললেন "আনা কাসফিয়া।"

বিকালের দিকে হাসনার প্রসব বেদনা বাড়তে লাগল। দুতিনজন নার্স হাসনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছিল। আমাকেও কাছে থাকতে বলল হাসনাকে সাহস জোগানোর

www.pathagar.com

জন্য। হাসনা তখন ব্যথায় চিৎকার করছে, আর নার্সরা তাকে ধরে রেখে উৎসাহ দিচ্ছে আর বলছে আরো চেষ্টা করতে, যেন সন্তান বেরিয়ে আসে।

আমি তখন দূরে সরে এসেছি, কিছুটা জড়তা, কিছুটা ভয়, আর কিছুটা আশঙ্কায়, কি হয় কে জানে! এক আল্লাহ ছাড়া আর কে বলতে পারবেন। সন্ধ্যার একটু আগে হাসনা যখন প্রসবের দ্বারপ্রান্তে তখন তাকে নিয়ে যাওয়া হলো পাশের অপারেশন থিয়েটারে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে নার্স বেরিয়ে আসল কাপড় দিয়ে জড়ানো সদ্য জন্মলাভ করা তাজা ফুটফুটে সুন্দর ঘন কালো চুলসহ আমাদের কন্যা আনা কাসফিয়া প্রিয়দর্শিনী মওদুদকে। পাশে পাশে হাসনাকে নিয়ে আসছে একটি রোলিং বিছানায়। হাসনা সজাগ, আমাকে দেখে হাসি দিল। স্বাভাবিক প্রসব কোন অস্ত্রপচার লাগেনি। তখনও আনার শরীর কিছুটা ভেজা, কাপড়ে রক্তের দাগ। আমার কোলে তুলে দিল। ওজন আট পাউন্ডের একটু ওপরে। Boston Children's হাসপাতালের প্রসিদ্ধ প্রফেসর লেভীও এতক্ষণ সাথে ছিলেন। বললেন, আনার রক্তে গ্লাইসিনের কোন সমস্যা নেই। সবকিছুই একেবারে স্বাভাবিক। এর চেয়ে আনন্দের খবর আমাদের জীবনে তখন আর কিছুই ছিল না। আল্লাহর কাছে মনে মনে অনেক কৃতজ্ঞতা জানালাম। হাসপাতালে তিন দিন থাকার পর চতুর্থ দিনে হাসনা আনাকে নিয়ে প্রথমে এমিলিদের বাড়িতে, তারপর ওরা দেশে ফিরে আসার কারণে আরেক বন্ধু আরনল্ড জাইটলিনদের বাসায় গিয়ে উঠল। হাসপাতাল থেকে মুক্তির আগে যুক্তরাষ্ট্র আইনানুযায়ী আনার নাগরিকত্ব আমেরিকান হওয়াতে তার পাসপোর্ট নিতে হলো। বস্টনের একটি অফিস দুঘণ্টার মধ্যেই পাসপোর্ট দিয়ে দিল হাসপাতালের দেয়া জন্মের সার্টিফিকেট দেয়ার সাথে সাথে। এর দুয়েকদিন পর মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করার জন্য আমি দেশে ফিরে আসি। আমান তখন ইংল্যান্ডের গ্লস্টার সায়ারের Rose Hill বোর্ডিং স্কুলে পড়ে টিমসনদের তত্ত্বাবধানে। হাসনা কিছুদিন আরনল্ডদের বাড়িতে থাকার পর আনাকে নিয়ে ইংল্যান্ডের টিমসনদের বাড়িতে উঠল। উদ্দেশ্য আমানকে তার বোন আনাকে দেখানো। আমান মহাখুশি। টিমসনরা খুব আদরযত্ন করল, আনাকে প্রিন্সেস ডাকা শুরু করল। টেলিফোনে সব খবর দিল। আনার ছবি পাঠালো। আনার আগমন আমাদের পারিবারিক জীবনে এক নতুন আনন্দ বয়ে আনে। আমার জন্য বয়ে আনে গুডলাক অর্থাৎ সৌভাগ্য, যা রাজনীতিতে আমার অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করেছে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ২৩

সরকারে আমার ভূমিকা এবং অবদান

আমি যখন এরশাদ সরকারে যোগদান করি তখন সামরিক শাসনের প্রায় সাড়ে তিন বছর পার হতে চলেছে। তাই গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার তাগিদটা ছিল সবচেয়ে বেশি। সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রের ক্রান্তিকাল কখনো মসৃণ হয় না, বিশেষ করে যেখানে দেশের দুটো বৃহৎ রাজনৈতিক দল পুরোপুরিভাবে অসহযোগিতা করার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়ার জনপ্রিয়তা এবং তাঁর ক্ষমতায় আসার প্রক্রিয়াটি ভিন্ন হওয়ায় তাঁর গণতন্ত্রায়নের ক্রান্তিকালটি ছিল খুব সহজ। কিন্তু একটি নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে সামরিক ক্যু করে ক্ষমতায় আসার কারণে এরশাদের জন্য ক্রান্তিকালটি ছিল খুবই কঠিন। গণতন্ত্রায়নের একই মডেল অনুসরণ করা হয়েছে এদেশে—প্রথমে স্থানীয় সরকার অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, তারপর গণভোট, পার্লামেন্ট নির্বাচন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন; ফ্রন্ট গঠন, তারপর মূল দল গঠন, এই সবকিছু প্রেসিডেন্ট জিয়াও করেছিলেন, কিন্তু গুণগতভাবে এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুটোর মধ্যে ছিল অনেক তফাৎ।

এরশাদ সরকারে রাজনীতি তেমন মুখ্য ছিল না। মতাদর্শে স্বচ্ছতা না থাকাতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি ছিল কম। রাজনীতি ছিল ক্ষমতাকেন্দ্রিক, গণভিত্তিক নয়; conviction বা commitment-এর চেয়ে expediency বেশি কাজ করেছে। যাই হোক এর মধ্যেও কাজ করতে হবে, দেশকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে হবে। সামরিক আইন তুলে নিয়ে সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করলাম। নানা রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে প্রেসিডেন্ট জিয়ার রাজনীতিতে যে আনন্দ বা উদ্দীপনা ছিল সেটা এখানে ছিল না। এরশাদ সরকারে আমার ভূমিকা বা অবদানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. এলাকার উন্নয়ন;

২. জাতীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারণী কিছু কাজ; আর

৩. রাজনীতি এবং গণতন্ত্রায়ন।

www.pathagar.com

এলাকার উন্নয়ন এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারণী কিছু কাজ

জাতীয় রাজনীতি এবং উন্নয়নের পাশাপাশি একজন নির্বাচিত রাজনীতিবিদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন। এটি শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, এর সাথে জড়িত আছে সার্বিকভাবে নির্বাচনী এলাকার মানুষের কাছে নিজের জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতাকে টিকিয়ে রাখা। এটি একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর মূল কারণ হলো দারিদ্র্য, যার জন্য সমস্যার কোন শেষ নেই। দাবি এবং চাহিদার অন্ত নেই। যত কাজ তত চাহিদা। দারিদ্র্যের কারণে সমস্যাগুলোর ধরন, প্রকৃতি, মান এবং মাত্রাও স্বাভাবিকভাবেই আলাদা। উন্নত দেশগুলোতেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিজের নির্বাচনী এলাকায় সময় দিতে হয় অনেক। তবে তাঁদের যেসব সমস্যা সমাধান করতে হয় সেসবের ধরন ও প্রকৃতি অন্য ধরনের। তাদের রাস্তা-বিদ্যুৎ-গ্যাসের কোন সমস্যা নেই। স্কুল পাকাকরণ, মাদ্রাসার সংস্কার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, ডাক-টেলিফোন স্থাপন—কোন সমস্যা নয়। নির্বাচনী এলাকার প্রতিষ্ঠানসমূহের, বিশেষ করে বৃদ্ধদের আবাসন, স্বাস্থ্য সুবিধা, পেনশন, বেকারদের ভাতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, পরিবেশগত বিষয়ে ব্যবস্থাপনার নীতিগত সমস্যার সমাধান করতে হয় তাঁদের। আর থাকে অনেক ব্যক্তিগত সমস্যা। ইংল্যান্ডে হাউস অব কমনস্-এর এক বন্ধু এমপিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি ধরনের ব্যক্তিগত সমস্যা তাদের সমাধান করতে হয়। তিনি বললেন, তার এলাকায় কার কুকুর কার বাগান বা লন ময়লা করে দিয়ে এসেছে, এটি খুব কমন নালিশ বা পাশের বাড়িতে মাঝ রাতের পরও সঙ্গীত বাজতে থাকা যার কারণে ঘুমের ব্যাঘাত, ইত্যাদি। যুক্তরাজ্যে সাপ্তাহিক ছুটিতে এমপি'রা যার যার এলাকায় চলে যান এবং মানুষের সাথে নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। এটিকে তাঁরা "সার্জারি" বলেন। কেন এই নাম জানি না। নিশ্চয়ই একটি ইতিহাস আছে। ওরা বলেন, এটিই হলো tradition অর্থাৎ ঐতিহ্যগত ব্যাপার, চলে এসেছে শত বছর ধরে।

আমার এলাকার উন্নয়নের কাজ শুরু হয় শহীদ জিয়ার স্পর্শে। কোম্পানীগঞ্জ থানার বসুরহাট হলো এলাকার কেন্দ্রস্থল। ছোট একটি বাজার, রাস্তা কাঁচা। গোটা বিশ-পঁচিশেক কাঁচা দোকান। বৃষ্টি হলে এক হাঁটু কাদা। তখন চালককে গরুর গাড়ি ঠেলতে হয়। মানুষের হাঁটারও উপায় থাকে না। বিদ্যুৎ নেই বললেই চলে। বাজারে প্রায় সবসময় ডায়নামো দিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। ১০ লাইনের এনালগ টেলিফোন। ঢাকা থেকে বসুরহাট পৌঁছাতে তখন সাত থেকে আট ঘণ্টা লাগতো। পথে তিনটা ফেরী পার হয়ে আসতে হতো। দাগনভূঞা থেকে বসুরহাট পাঁচ কিলোমিটার অতিক্রম করতে লাগতো এক ঘণ্টারও বেশি সময়, রাস্তার পুরোটাই হয় কাঁচা না হয় ইটভাঙা। দিনে একটি কি দুটো বাস ছাড়ত। ঢাকা থেকে বসুরহাটে পৌঁছাতে বাসে লাগতো প্রায় দশ ঘণ্টা। অর্থাৎ সারা দিন। সারা কোম্পানীগঞ্জে তখন কোন পাকা রাস্তা ছিল না। থানা হেডকোয়ার্টারের বাইরে সব ছিল অন্ধকার। চৌধুরীহাট থেকে চাপরাশীরহাট আর ওদিকে বাংলাবাজার পর্যন্ত কোন একটি বাজারে কোন ডাকঘর বা টেলিফোন সংযোগ ছিল না।

www.pathagar.com

১৯৭৮ সালের মার্চ মাস হবে। তখন আমি মাত্র মাস দুয়েক আগে প্রেসিডেন্ট জিয়ার উপদেষ্টা নিযুক্ত হই। নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছিলাম, আমাকে ডেকে আনা হলো। ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হলো। প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে আমি তখন বিভিন্ন শহরে গণসংযোগে বের হতাম। মাইজদী থেকে ফেনী যাওয়ার পথে হঠাৎ প্রেসিডেন্ট বললেন, আমার এলাকায় যাবেন। পুলিশের ওয়ারলেসে খবর দেয়া হলো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সকাল দশটার দিকে বসুরহাট পৌঁছলাম। খবর পেয়ে লোকে লোকারণ্য। সবকিছু স্বতঃস্ফূর্ত, কারণ জাগদল তখন মাত্র শুরু হয়েছে। বসুরহাট হাইস্কুলের ভেতরে মাইক লাগানো হয়েছে। Typical গ্রামের স্কুল। চারদিকে বাঁশের বেড়া, ওপরে টিন। প্রায় অন্ধকার পরিবেশ। ভেতরের চেয়ে বাইরে বেশি মানুষ। আমি সামান্য কিছু বললাম। তারপর প্রেসিডেন্ট জিয়া বক্তৃতা করলেন। এলাকার জন্য কি চাই জানতে চাইলে উপস্থিত সবাই বলল, বাজার পাকাকরণ হলো এক নম্বর সমস্যা। প্রেসিডেন্ট বাজারের রাস্তার জন্য ৩ লক্ষ এবং স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মসজিদের জন্য আরো ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করলেন। মানুষ মহাখুশি। এর আগে দেশের কোন প্রেসিডেন্ট এই এলাকায় আসেননি। তার ওপর আবার প্রেসিডেন্ট জিয়ার মত মানুষ। তাদের কাছে এটি ছিল একটি স্বপ্নের মত। আমার এলাকার উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয় তখন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগের উপদেষ্টা বা মন্ত্রী ছিলাম। তাই সব বড় বড় বাজারে, একেবারে সদরের কবিরহাট বাজার পর্যন্ত, ডাকঘর আর টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হলো। নানা ধরনের সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা আসা শুরু করল, বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হলো। হাজার হাজার টন গম দিয়ে এলাকার ছোট বড় সব রাস্তার কাজ শুরু হলো। স্কুল কলেজ মাদ্রাসার উন্নয়ন হাতে নেয়া হলো। সারা এলাকায় বিশেষ করে চরাঞ্চলে খাওয়ার পানির ভীষণ অভাব তখন। নতুন নতুন কল বসানো হলো। মানুষ খুব খুশি।

আওয়ামী লীগ-বাকশালের সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে এই এলাকার মানুষের ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। চাঁদাবাজী, অপহরণ, ছিনতাই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। জমি দখল, ঘর দখল থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ও বাদ পড়েনি। ভাল যে কিছু হয়নি তা নয়। তখনকার পার্লামেন্ট সদস্য নাসের চৌধুরীর উদ্যোগে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে কলেজের নামে বাজারে যে অনানুষ্ঠানিক ট্যাক্স বসানো হয়েছিল সেকথা মানুষ এখনো ভোলেনি। যাই হোক এরপর এলাকায় নেমে আসে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার, যা তাদের ছোটখাটো সাফল্যগুলোকে ম্লান করে দেয়। প্রকাশ্য বাজারে, স্কুলের মাঠে রক্ষীবাহিনী গুলি করেছে জাসদের কর্মীদের। বিনা ওয়ারেন্টে যাকে-তাকে গ্রেপ্তার, যার-তার ঘরে প্রবেশ এবং মালপত্র দখলে নেয়া সমস্ত এলাকাকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। যুবক ছেলেরা তখন গ্রাম ছেড়ে সব পালিয়ে গিয়েছিল।

এরই প্রেক্ষাপটে জাতীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট জিয়ার আবির্ভাব, তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা আর এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড—সবকিছু মিলিয়ে কোম্পানীগঞ্জে নেমে আসে শান্তি।

www.pathagar.com

মানুষ স্বস্তি পায়। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তখনকার সভাপতি জনাব আব্দুল মালেক উকিলকে পরাজিত করে আমি প্রথমবারের মত বিপুল ভোটের ব্যবধানে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হই। এলাকার পুরুষ-মহিলা সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। নির্বাচনের পর আমি হলাম পার্লামেন্টের উপনেতা এবং উপপ্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট জিয়া আমাকে বিদ্যুৎ, পানি, সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিলেন। বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে সাড়ে চার কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে আড়াই কোটি টাকা আমার এলাকার কাজে লাগানো হয়েছে। এর ফলে এলাকার সকল বড় বড় বাজারে বিদ্যুতায়ন সম্ভব হয়েছে। বসুরহাটের ধারণক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেয়া হয়। নতুন বড় ট্রান্সমিটার বসানো হয়। সদর পূর্বাঞ্চলের আব্দুল্লাহ মিয়ার হাট থেকে চরপার্বতীর চৌধুরীহাট, ওদিকে বাংলাবাজার থেকে চাপরাশীরহাট—কোনটাই বাদ পড়েনি। সেচমন্ত্রী হিসেবে প্রায় ৮০ হাজার টন গম দিয়ে আউটার বেড়ীর কাজ হাতে নিয়ে লক্ষ লক্ষ একর জমি চাষের অধীনে আনা হয়েছে এবং সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস থেকে হাজার হাজার কৃষক পরিবারের জীবন রক্ষা করা হয়েছে। নদী, নালা ও খাল কেটে পানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও ফেনী আমার নির্বাচনী এলাকা নয়, কিন্তু আমি দাতা সংস্থাকে রাজি করিয়ে মহুরী প্রকল্প থেকে ১০ কোটি টাকা কর্তন করে ফেনী-সোনাগাজী রাস্তা পাকা করিয়ে দিয়েছিলাম। এটি নিয়ে আমার বিরুদ্ধে নালিশও হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট যখন শুনলেন, এটি আমার নিজের নির্বাচনী এলাকার বাইরে অন্য এলাকার জন্য করেছি, তখন আবার আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। গম বরাদ্দ দিয়ে এলাকার বড় বড় রাস্তার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে—সদরের সোনাপুর থেকে কবিরহাট হয়ে বসুরহাট হয়ে একেবারে বাংলাবাজার আর ওদিকে চাপরাশিরহাট পর্যন্ত প্রায় ৩৬ কিলোমিটার। ১২ ফুট উঁচু আর ৪০ ফুট রাস্তার মাটির কাজ দেখে অনেক মানুষ বলেছে এত বড় রাস্তা তো তারা চায়নি, অর্থাৎ আশা করেনি। আরো অসংখ্য রাস্তার মাটির কাজ হয়েছে। ফলে দুবছরের মধ্যে তখনকার সময় শুকনো মৌসুমে আমার নির্বাচনী এলাকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ১০০ কিলোমিটার হবে আমি গাড়ি করে যেতে পারতাম। এলাকার শিক্ষিত-অশিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ছিল আর একটি কাজ। এলাকার উন্নয়ন আর কর্মসংস্থানের জন্য সব কাজ দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য করেছি। বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার জন্য, তখন লক্ষ্মীপুর ও ফেনী অন্তর্ভুক্ত, একইভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করেছি। যে কোন ব্যক্তি আমার কাছে এসেছেন আমি তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। দিনে যে কত দরখাস্ত সুপারিশ করেছি তার একটি হিসাব রাখা দরকার ছিল। বছরে হয়তো ২৫-৩০ হাজার হবে। দেশের সরকারি বেসরকারি অফিসে এবং মিলকলকারখানা ছাড়াও জাহাজে চাকরি, অর্থাৎ সিডিসি দিয়েছি অন্তত হাজারখানেক। এদের বেশিরভাগই বিদেশে বিশেষ করে লন্ডন ও নিউ ইয়র্কে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। আমার এলাকারই অন্তত চার-পাঁচশত লোক হবে শুধু নিউ ইয়র্কে আছেন।

www.pathagar.com

২ জানুয়ারি ১৯৮০ সালে দুবছর মন্ত্রী থাকার পর যেদিন আমাকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার মন্ত্রিসভা থেকে হঠাৎ করে বিদায় নিতে হলো, এলাকার মানুষ হতভম্ব। নেতাকর্মীরা সব হতাশ, আর সাধারণ মানুষ খুব দুঃখ পেল। উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতি তারা বোঝে না। অনেকে কান্নাকাটি শুরু করল, মুরুব্বিরা মসজিদে দোয়া পড়ালো আর মহিলারা অনেকে পরের দিন রোজা রাখল। আমি এলাকায় গিয়ে ঘুরে ঘুরে সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে রাজনীতিতে এরকম হয়। মন্ত্রিত্ব কোন স্থায়ী পদ নয়। প্রেসিডেন্ট জিয়ার জন্য কাজ করে যেতে হবে, দলকে সুসংগঠিত করতে হবে। কিন্তু এতসব কথা তারা তখন শুনতে রাজি নয়। ঘরোয়া বৈঠকে নেতাকর্মীদের অবশ্য এই ঘটনার পটভূমি যা আগেই বলেছি তার কিছুটা বলতে হয়েছে। তারা সবাই ক্ষুব্ধ এবং রাগান্বিত। সবার একমত, প্রেসিডেন্ট জিয়া ভুল করেছেন, অন্যায় করেছেন, ইত্যাদি। যাই হোক যতটা পারলাম তাদের সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। আমি দলে থাকব, তাদের পাশেই থাকব, এসব কথা বলে আশ্বস্ত করলাম। যত কথাই বলি না কেন, একথা গ্রামের মানুষ ঠিকই বোঝে মন্ত্রী-মিনিস্টার না থাকলে এলাকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকারে প্রভাব না থাকলে রাস্তা, বিদ্যুৎ, স্কুল-মাদ্রাসার উন্নয়ন সহজে করা যায় না। দেশ দরিদ্র, সম্পদের অভাব, সরকারও তাই গরিব। তাই মন্ত্রিত্ব ছাড়া উন্নয়নের জন্য ভাল বরাদ্দ ও ভাল প্রকল্প পাওয়া যায় না। তাদের সেই আশঙ্কাটাই পরে সঠিক প্রমাণিত হয়।

এলাকার উন্নয়নের যে একটা গতি এসেছিল সেটা ক্রমান্বয়ে মন্থর হয়ে গেল। যদিও পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু সেই গতি ধরে রাখাটা সম্ভব হয়নি। আগে যেরকম বেশ সহজে একজন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছি, জাহাজে খালাসি বা নাবিক হিসেবে উঠিয়ে দিতে পেরেছি, সেটা আর এখন সম্ভব নয়। মন্ত্রী হিসেবে যে কাজ তিনবার তদ্বির করলে হয়, এখন তিরিশবার করলেও হয় না।

এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর আমাকে যখন কারাবন্দি করেন, এলাকার মানুষ আরো বিমূঢ় হয়ে পড়ে। দুর্নীতির অভিযোগ এলাকার মানুষ বিশ্বাস করেনি। মসজিদে মসজিদে দোয়া পড়িয়েছে, অগণিত নারী-পুরুষ রোজা রেখেছে। আমার নিঃশর্ত মুক্তি লাভের দেড় বছর পর যখন আমি বেগম জিয়ার সাথে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত অবস্থায় শয্যাশায়ী, তখন আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করার জন্য আমার ওপর "কারণ দর্শানো" নোটিশ জারি করা হলে এলাকার মানুষ আমার চেয়েও বেশি মর্মাহত হয়। তাই এরশাদ যখন আমাকে তাঁর সরকারে যোগদান করে তাঁকে সাহায্য করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন, এলাকার মানুষ একবাক্যে আমার পাশে থাকে এবং যখন সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রশ্ন আসে তখন তারা আমার সরকারে যোগদানের পক্ষে মতামত দেয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, গ্রাম-ইউনিয়নের মানুষ সবাই একই মত দেয়। আমি সেদিন ইচ্ছা করলে স্থানীয় সব বিএনপি নেতাকর্মীকে নিয়ে এরশাদ সরকারে যোগ দিতে পারতাম, কিন্তু আমি তা করিনি। আমি তাদের কিছু বলিনি, কোন আহ্বানও জানাইনি। তবে অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার

www.pathagar.com

সাথে চলে এসে বিএনপি ছেড়ে দেয়। সাধারণ মানুষের কথা আলাদা। এলাকায় আমার সমর্থনের মূল ভিত্তি হলো গরিব কৃষক, যুবক, মহিলা, দিনমজুর, রিক্সাওয়ালা, ক্ষেতখামারে যারা কাজ করে, আর গ্রামের মুরুব্বিরা। একটি বিরাট অংশ আছে যারা বলে "আমরা দল বুঝি না, আমরা বুঝি মওদুদ সাহেবকে।" তাই গ্রামের সাধারণ মানুষরাই হলো আমার আসল শক্তি, অনুপ্রেরণার উৎস। এলাকার উন্নয়ন তো আমি এদের জন্যই করি। রাজনীতি করতে হলে অবশ্যই নেতাকর্মীদের প্রয়োজন, তবে জনসমর্থনই হলো আসল কথা। দলমত নির্বিশেষে আমি সকলের জন্যই কাজ করি এবং আমি মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এটিই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া।

এলাকার অনেক কাজ অসম্পন্ন থেকে গিয়েছিল। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর কোন কাজ আর হয়নি। সোনাপুর-কবিরহাট-বসুরহাট-বাংলাবাজার-চাপরাশীরহাট ৩৬ কিলোমিটার রাস্তা এখন পাকা করতে হবে। দাগনভূঞা-বসুরহাট রাস্তা পুনঃনির্মাণ করা, গ্যাসের ব্যবস্থা করা, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়ন, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-মসজিদের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, আরো অসংখ্য কাজ। অসংখ্য সংযোগ রাস্তার সংস্কার এবং পাকাকরণ, স্বাস্থ্য সুবিধাগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। কাজের কোন শেষ নেই। অনেক দূরের চরএলাহী, চরআলগী, নবগ্রাম, আদর্শগ্রাম পর্যন্ত রয়েছে নানা রকমের সমস্যা। নিজের এলাকা ছাড়াও রয়েছে সারা জেলার সার্বিক উন্নয়নের প্রশ্ন। জেলার মানুষ তা-ই আশা করে।

এরশাদ সরকারে যোগদানের সময় আমাকে প্রথমে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। তখন দাগনভূঞা-বসুরহাট রাস্তার অবস্থা করুণ। মন্ত্রী হওয়ার পর এলাকায় যাওয়ার পথে দাগনভূঞার মানুষ সম্বর্ধনা জানালো। অনুষ্ঠান শেষে বাজারে নামলাম, রাস্তার উন্নয়নের দাবি সকলের মুখে। সাথে সড়ক বিভাগের প্রকৌশলীরা ছিলেন। রাস্তাটির বেশিরভাগ অংশ, দুদমুখা পর্যন্ত ফেনী, আর বাকিটা নোয়াখালী সড়ক বিভাগের অধীনে। এটাও আর একটি সমস্যা। যাই হোক ছয় মাসের মধ্যে এক কোটি টাকা খরচ করে উপজেলা সংযোগ সড়ক হিসেবে রাস্তাটি সুন্দর করে দেয়া হলো।

একটানা প্রায় পাঁচ বছর শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, একনেকের সভাপতি, উপপ্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন পর্যন্ত এলাকার উন্নয়নের জন্য আরো কিছু কাজ করার সুযোগ হয়। অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ছাড়াও এলাকার অবকাঠামোর অনেক উন্নয়ন সাধন করা হয়। সোনাপুর-কবিরহাট-বসুরহাট-পেশকারহাট-চাপরাশীরহাট-বাংলাবাজার সুপরিসর রাস্তাকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে ৩৬ কিলোমিটারের পুরো রাস্তা প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে পাকা করার কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই ঘটনাটিকে একটি স্বপ্নের ব্যাপার বলে আমার নিজের কাছেও মনে হয়েছে। অনেকে বলে, এটি আমি না থাকলে বোধহয় পঞ্চাশ বছরেও করা সম্ভব হতো না। এই ধরনের রাস্তা ঢাকার অনেক রাস্তার চেয়ে ভাল। এছাড়া আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পাকা করা হয় এবং প্রচুর রাস্তায় মাটির কাজ হয়। আউটার বেড়ীর কাজ সম্পন্ন করা হয়। অনেক দিনের অবহেলিত পুল-কালভার্ট-

www.pathagar.com

ব্রীজের কাজ হয়েছে। নোয়াখালী খালের ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। অশ্বদিয়া থেকে নোয়াখালী সদরে যাওয়ার জন্য নোয়াখালী খালের ওপর অনেক দিনের দাবি, বিরাট লোহার ব্রীজ, তৈরি করা হয়েছে। আরো অনেক বাজারে বিদ্যুৎবোর্ডের মাধ্যমে নতুন লাইনের সংযোজন দেয়া হয়েছে। এরপর এলাকার সবটুকুই পল্লী বিদ্যুতায়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে ফেনী থেকে চৌমুহনী, মাইজদীসহ লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প অনুমোদনের জন্য যখন একনেকে উত্থাপিত হয়, তখন আমার এলাকায় গ্যাসের লাইন নেয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ আসে। বসুরহাট হলো ফেনী-চৌমুহনী মূল সড়ক থেকে ৬ কিলোমিটার ভেতরে। প্রকল্পে এর জন্য কোন বরাদ্দ ছিল না, কারণ কোন উপজেলায় গ্যাস দেয়ার প্রক্রিয়া তখনও শুরু হয়নি। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বেশিরভাগ জেলা শহরেই তখনও গ্যাস পৌঁছায়নি। উত্তরবঙ্গের তো প্রশ্নই নেই, কারণ যমুনা সেতু না হওয়া পর্যন্ত সরকার এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। যাই হোক গ্যাস লাইন প্রকল্পের অনুমোদন স্থগিত রেখে প্রকল্পটিকে রি-কাস্ট করতে বলা হলো। বিশ্বব্যাংকের স্থানীয় প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে অনেক কষ্টে একই প্রকল্পে বসুরহাট পর্যন্ত গ্যাস পাইপ লাইন সম্প্রসারণের কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হলো এবং পুনঃপ্রাক্কলিত প্রকল্প দুমাস পরে একনেকের সভায় অনুমোদন দেয়া হলো। এর ফলে ৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ে আমার নির্বাচনী এলাকা পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, যা কিনা বাংলাদেশের কোন উপজেলায় এই প্রথম।

বিদ্যুৎ-গ্যাস-রাস্তা এবং সার্বিক অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে ১৯৭৮ সালের সেই একটি গ্রাম্য বাজার থেকে বসুরহাট পরিণত হয়েছে একটি ছোট কর্মচঞ্চল শহরে। রাত ১১-১২টা পর্যন্ত বাজারের দোকানগুলো খোলা থাকে। অসংখ্য পাকা ঘর এবং তিন থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত পাকা ইমারত গড়ে উঠেছে এখন। প্রায় প্রতিটি দোকানে, রেস্তোরাঁয়, টেলিভিশন-ভিসিআর চলে। প্রতি তিন চার মিনিট পরপর বাস ছাড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম-ফেনীর উদ্দেশে। ঢাকার সায়েদাবাদের মত ব্যস্ত এখন বসুরহাটের বাস টার্মিনাল। নাইট কোচ, লাক্সারী কোচ, বিরতিহীন কোচ আরো অনেক ধরনের বাস যাতায়াত করে। একদিকে সোনাপুর-কবিরহাট, অন্যদিকে বাংলাবাজার-চাপরাশীরহাট পর্যন্ত বাস রুট হয়েছে। আবার সেগুলো বসুরহাটে আসে। না দেখলে বিশ্বাস হবে না। অসংখ্য বেবিট্যাক্সি এবং টেম্পোর সমাগম ঘটেছে বসুরহাটে। কিন্তু তারপরও রিক্সাওয়ালারাই সবচেয়ে খুশি হয়েছে এবং তাদের বেশিরভাগই আমার গোঁড়া সমর্থক।

আমার নির্বাচনী এলাকায় দুটি কলেজকেই আমি সরকারিকরণ করেছি। এতে এলাকার মানুষ খুব খুশি হয়েছে। তখন সরকারের নীতি ছিল প্রতি নির্বাচনী এলাকায় একটি মাত্র কলেজকে সরকারিকরণ করা। আমার নির্বাচনী এলাকায় প্রথম দুটি কলেজ সরকারিকরণ করা হয়। কলেজ দুটি ছাড়াও উপজেলাকেন্দ্রে দুটি হাইস্কুলও সরকারিকরণ করা হয়।

www.pathagar.com

একটি মেয়েদের, অপরটি ছেলেদের। ছেলেদের স্কুলটি শত বছর পুরোনো। আমার বাবাও নাকি এই স্কুলে লেখাপড়া করেছেন।

উপজেলাকেন্দ্র বসুরহাটকে পৌরসভায় উন্নীত করা হয় আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে। প্রথমদিকে ব্যবসায়ীসহ অনেকে এর বিরোধিতা করেছিলেন বিভিন্ন ধরনের করের কথা চিন্তা করে। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলেন যে এর সাথে সুযোগ-সুবিধাও অনেক বাড়ছে, তখন সকলেই এই নতুন প্রতিষ্ঠানকে সানন্দে গ্রহণ করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বসুরহাট পৌরসভাকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌরসভায় উন্নীত করা হয়। ফলে পৌরসভাকে কেন্দ্র করে শহরীকরণ প্রক্রিয়া অনেক অগ্রগতি লাভ করে। অনেক ছোট ছোট কলকারখানাও প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরো পৌর এলাকায় বিদ্যুৎ আর গ্যাস সরবরাহ সুসংহত করায় এই এলাকার চেহারার অনেক পরিবর্তন ঘটে।

আমার নির্বাচনী এলাকায় আমি কখনই সন্ত্রাস বা প্রতিহিংসার রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেইনি। আমার নেতাকর্মীরা একথা ভাল করেই জানে। প্রশাসনের কর্মকর্তারাও একই কথা জানেন। কিন্তু যেহেতু কোন ধরনের জুলুম বা রাজনৈতিক নির্যাতন আমার অপছন্দ, নেতাকর্মীদের মধ্যে এর অপরিসীম প্রভাব পড়ে এবং ফলে রাজনৈতিকভাবে ১৯৭৭-৯০ সাল পর্যন্ত আমার নির্বাচনী এলাকাকে একটি শান্তিপূর্ণ এলাকা বলে গণ্য করা যেতে পারে। আমার ব্যক্তিগত চরিত্র, মনোভাব এবং মনোবৃত্তি আমার এলাকাবাসীকে নিঃসন্দেহে আনন্দ এবং স্বস্তি দিয়েছে। আমার বাবা এবং আমার ওপর তাদের বিশ্বাস আমার জনপ্রিয়তাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে।

একই সময় জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন মহাসড়ক এবং মেঘনা ব্রীজ তৈরির প্রকল্প ছাড়াও বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার সড়ক পথের অনেক উন্নতিসাধন করা হয়। ফেনী-চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর-রায়পুর-রামগঞ্জ-চাটখিল-মাইজদী রাস্তার কাজ অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। নতুন রাস্তাগুলোর মধ্যে আমার উদ্যোগের কারণে রামগঞ্জ-হাজীগঞ্জ এবং লাকসাম-সোনাইমুড়ীর রাস্তা তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।

আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস

বাংলাদেশের রেল যোগাযোগের অবস্থা ছিল সত্যিই করুণ। ট্রেনে আলো নেই, পানি নেই, টয়লেট নেই আর সবকিছু ভীষণ অপরিষ্কার ও নোংরা। ট্রেন সময়মত ছাড়ে না। যেখানে-সেখানে স্টেশন ছাড়াই থেমে যায়। মধ্যবিত্তের ট্রেনে ওঠার আর উপায় ছিল না। সকল ট্রেনেই ছাদের ওপর বিনা টিকিটে অনেক মানুষ ভ্রমণ করে। রেল ব্যবস্থাপনায় ছিল বিরাট সঙ্কট। আমার সচিব ছিলেন ডাকসাইটে কিন্তু কঠোর পরিশ্রমী এবং মননশীল একজন আমলা, জনাব হাসান আহমদ। ট্রেনের ব্যবস্থাপনা এবং মান উন্নয়নের জন্য অনেকগুলো কর্মসূচি হাতে নেয়া হলো। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ট্রেনে ভ্রমণ করাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য উন্নতমানের বিরতিহীন শহর থেকে শহরে যাওয়ার জন্য ইন্টারসিটি ট্রেন চালু করা।

www.pathagar.com

তখনকার সময় এটা চিন্তা করাটাই ছিল অকল্পনীয়। পর্যাপ্ত ট্র্যাক এবং উপযুক্ত সিগনাল সিস্টেমের অভাব ছাড়াও অন্যান্য অজস্র সমস্যার কথা উল্লেখ করলেন বিজ্ঞ প্রকৌশলীরা। তাঁদের সকলের এক কথা, এটি একটি অসম্ভব এবং অবাস্তব প্রস্তাব। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বিলাসী স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আমি সিদ্ধান্ত দিলাম, এই ট্রেন চালু করতে হবে। সচিব হাসান আহমদও ছেড়ে দেয়ার মানুষ নন। আমার প্রকৌশলগত জ্ঞানের খুবই অভাব, তাই মনে মনে ভয় ছিল এই ধরনের ট্রেন জোর করে চালু করাতে গেলে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে আমার দুঃখ এবং কষ্টের সীমা থাকবে না। সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমাকে বহন করতে হবে। জেনারেল এরশাদকে যখন বললাম, তিনিও অনেকটা হতবাক হলেন। সম্ভব হবে কিনা বলে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তবে তিনি উৎসাহ দিলেন, কারণ নতুন কিছু করার প্রবল বাসনা তাঁর মধ্যেও সবসময় ছিল, যে কোন ধরনের সংস্কারের জন্য এরশাদ বেশ ব্যাকুলতা দেখাতেন।

হাসান আহমদ গভীর রাত পর্যন্ত কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে কাজ করেছেন প্রকৌশলীদের সাথে, আমি নিজেও মাঝে মাঝে সভা করেছি। ধীরে ধীরে রেলওয়ের কর্মকর্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করা শুরু করলেন যে, দেশে বিরতিহীন ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে, বিশেষ করে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে। কিন্তু তারপরও বাধার শেষ নেই। প্রশ্ন উঠল ট্রেনের সাজ-সরঞ্জাম কোথায় পাওয়া যাবে? নতুন সিট, বৈদ্যুতিক বাতি এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রী, টয়লেট, বেসিন, কল, পানি, ইত্যাদি। নকশা অনুযায়ী ট্রেনের জন্য আলাদা রঙ প্রয়োজন—এসব কোথা থেকে আসবে? বাজেট বরাদ্দের বাইরে অর্থ মন্ত্রণালয় এই ধরনের কোন প্রকল্পের জন্য কোন সাহায্য করতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। আর প্রকল্প হিসেবে অনুমোদনের যে প্রক্রিয়া বাংলাদেশে বিদ্যমান তা সম্পন্ন করতে আমার মন্ত্রিত্বের সময়কালও শেষ হয়ে যেতে পারে।

পাকিস্তান আমল থেকে রেলওয়েতে কাজ করে একজন বয়স্ক সুপারভাইজার আমার উদ্বেগ দেখে অনেকটা গোপনে কানের কাছে এসে বললেন যে রেলওয়ের গোডাউনে এ ধরনের মালপত্র পাওয়া যেতে পার। সাথে সাথে আমি বেরিয়ে পড়লাম দেশের বিভিন্ন গোডাউনগুলো দেখতে এবং সেখানে আবিষ্কার করলাম হাজার হাজার বাতি, ব্র্যাকেট, বেসিন, কল, টয়লেট—সবকিছুই, যা যা আমাদের প্রয়োজন—সবই আছে এমনকি রঙও পাওয়া গেল, ঘিয়া আর নীল। ছয় মাসের মধ্যে কমলাপুর রেল স্টেশনে ১৯৮৬ সালের প্রথমার্ধে জেনারেল এরশাদ উদ্বোধন করলেন ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশের প্রথম বিরতিহীন ট্রেন "মহানগর"। উদ্বোধনী ট্রেনে কিছু পথের জন্য আমরা যাত্রী ছিলাম, সাথে দুজন বিদেশী সাংবাদিকসহ আরো অনেক সাংবাদিক। কিছুদূর যাওয়ার পর টঙ্গীর কাছাকাছি আমাদের নামিয়ে দিয়ে ট্রেনখানা শেষে একটানা চট্টগ্রামে গিয়ে থামলো। ঠিক ৪ ঘণ্টায়। সময়সূচি এমনভাবে করা হলো যাতে চট্টগ্রাম থেকে সকাল ছ'টায় ছেড়ে একজন নাগরিক ঢাকায় এসে পৌঁছাতে পারে দশটায়। সারাদিন রাজধানীতে কাজ সেরে আবার চারটায় ঢাকা ছেড়ে চট্টগ্রামে পৌঁছাতে পারে

www.pathagar.com

আটটায়। একইভাবে ঢাকা থেকে সকালে একই সময় চট্টগ্রামের জন্য আর একটি "মহানগর" ছাড়বে। চমৎকার ব্যবস্থা, ঠিক সময়মত ট্রেন ছাড়বে এবং পৌঁছাবে। টিকেট ছাড়া কেউ ট্রেনে উঠতে পারবে না, প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত সিট থাকবে তিনি যে শ্রেণীতেই ভ্রমণ করুণ না কেন। টিকেট কিনে না গেলে বা টিকেট বিক্রি না হলে সিট খালি থাকবে। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ট্রেনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হলো। রেস্তোরাঁ, নামাজের ঘর, আজানের ব্যবস্থা; সব কামরায় বাতি, পানি, বেসিন, টয়লেট—সবই আছে। ট্রেনের ছাদে কোন মানুষ থাকে না। এরপর দুমাসের মধ্যে আরো ২৪টি ইন্টারসিটি ট্রেন চালু করা হয় নতুন নতুন নামকরণে। ঢাকা-নোয়াখালীর জন্য আমি উদ্বোধন করলাম বিরতিহীন ট্রেন "উপকূল"। পরিকল্পনায় ছিল ট্রেনগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। প্রতিটি কামরায় টেলিভিশন থাকবে, সিনেমা দেখানো হবে এবং এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত ট্রলী করে হাল্কা নাস্তা ও মনোহারি সামগ্রী বিক্রি করা হবে।

এই ধরনের একটি বিরতিহীন ট্রেন চালু করা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলা যেতে পারে। কোন জাতীয় প্রকল্প তৈরি করতে হলো না। একনেকের অনুমোদন লাগল না। কোন বিদেশী সাহায্য লাগল না, কোন পরামর্শক লাগল না, আর কোন কারিগরি সহযোগিতারও প্রয়োজন হলো না। আরো বড় কথা হলো, সরকারের আলাদা কোন পয়সাও লাগল না। এই বিরতিহীন ইন্টারসিটি ট্রেন ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এই ট্রেনগুলো এখনো চালু আছে।

এই অর্জন বা সাফল্য আমার জীবনে নতুন আশাবাদ সৃষ্টি করে। আমাদের নিজেদের মেধা এবং শ্রমের ওপর আরো বেশি আস্থা জন্মায়। সবই আমরা নিজেরাই করলাম। রেলওয়েতে কর্মরত আমাদের দেশের প্রকৌশলী এবং কর্মচারীরাই তো এই সাফল্য অর্জন করেছে! এতে প্রমাণিত হয় যে জাতীয় জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রেও আমরা একই ধরনের সাফল্য অর্জন করতে পারি। এর জন্য প্রয়োজন নেতৃত্বের অঙ্গীকার, সততা এবং নিষ্ঠা। একটি দুর্নীতিমুক্ত নেতৃত্বের সদিচ্ছা এবং মনোবল। এই সাফল্যের অনুভূতি এবং বিশ্বাস পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনে সাহায্য করেছে এবং অনুপ্রেরণার একটি উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

শিল্পায়ন: বিরাষ্ট্রীয়করণ

মাত্র আট মাস যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে ছিলাম। ১৯৮৬ সালের মে মাসে পার্লামেন্ট নির্বাচনের পর আমি দ্বিতীয়বারের মত উপপ্রধানমন্ত্রী হলাম এবং আমাকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। এটিও একটি জাতীয় নীতিনির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। বাজার অর্থনীতি পালনের প্রেক্ষাপটে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব একদিকে যেমন বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া, আর অন্যদিকে রয়েছে বেসরকারি খাতে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলা এবং পরিবেশ সৃষ্টি করা। একদিকে ক্রমাগতভাবে লোকসানরত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন

www.pathagar.com

শত শত শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হয় বন্ধ করে দেয়া বা বিক্রি করা, আর অন্যদিকে রপ্তানিমুখী নতুন শিল্প-বাণিজ্য গড়ার মাধ্যমে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা।

আমি প্রায় একটানা পাঁচ বছর শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম। এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমাকে একনেকের সভাপতির দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল। একই সময় যখন প্রফেসর ওয়াহিদুল হক অর্থমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিলেন, জেনারেল এরশাদ আমাকে খুব করে অনুরোধ করেছিলেন অর্থমন্ত্রী হওয়ার জন্য, কিন্তু আমি রাজি হইনি। কারণ আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে, এই ধরনের একটি মন্ত্রণালয় চালানোর যোগ্যতা বা দক্ষতা বা temperament আমার আছে কিনা। তাছাড়া জেনারেল এরশাদকে বোঝালাম যে, আমার মত রাজনীতিবিদের অর্থমন্ত্রী হওয়া ঠিক হবে না। এত তদ্বির এবং রাজনৈতিক চাপ আসবে যে, আর্থিক খাতে যে শৃঙ্খলা থাকার প্রয়োজন, সেটি রক্ষা করা কঠিন হবে। জেনারেল এরশাদ তখন জেনারেল মুনিমকে আবার অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করলেন।

যাই হোক শিল্পমন্ত্রী হিসেবে আমার সময় ৫৫৬টি ছোট বড় শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করা হয়। সরকারি খাতের বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পুঁজিকরণ (capitalisation)-এর মাধ্যমে ৪৯ শতাংশ শেয়ার বেসরকারি খাতে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে ১০-১৫% শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছে বিক্রির মাধ্যমে শিল্প ব্যবস্থাপনায় তাদের একজন পরিচালক নিয়োগের বিধান করা হয়। প্রথম দিকে শ্রমিকরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলন শুরু করে। আমার অফিস "শিল্প ভবনের" সামনে বিরাট ব্যানার টাঙানো হয়। পরে আমি নিজে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়ে তাদের পুরো বিষয়টি বুঝিয়েছি যে, মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকছে এবং তার ওপর এই প্রথমবারের মত শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের একজন প্রতিনিধিকে পরিচালক হিসেবে বোর্ডের সদস্য রাখতে পারবেন। এতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকরা কিছুটা শান্ত হলেও, বেসরকারি খাত শুধু কিছু শেয়ারের মালিক হতে রাজি ছিলেন না। যাই হোক এটি ছিল বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে মেজরিটি শেয়ার বেসরকারি ব্যক্তিদের কাছে তুলে দিয়ে ব্যবস্থাপনার দায়ভার থেকে সরকারকে মুক্ত করা হয়েছে। পুঁজিকরণের মাধ্যমে বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রক্রিয়াকে সফল করার জন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।

দেশে রপ্তানিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার বিষয়টি ছিল সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার। বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে হস্তান্তরিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায় গেলে শ্রমিক ছাঁটাই একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। খরচ কমিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করে মুনাফা করার নীতি সার্বজনীন একটি বিধান। এমন অবস্থায় কারখানা বন্ধ করে দেয়ারও নজির আছে অনেক। তাই কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা একটি অপরিহার্য শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। বহির্বিশ্বে পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে যাওয়াতে দেশের পাটশিল্প একটি দারুণ সঙ্কটের

www.pathagar.com

সম্মুখীন হয়। বাজারে ভারতীয় সুতা এবং কাপড়ের অনুপ্রবেশের কারণে বস্ত্রশিল্প বিকাশের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তাই ঐতিহ্যগতভাবে যে দুটি শিল্প বিকাশের ওপর বাংলাদেশের অর্থনীতি নির্ভর করে সে দুটো খাতই এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। সেইজন্য রপ্তানির দ্বার আরো ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ছিল না। চা ছাড়া বাংলাদেশ থেকে কাঁচা চামড়া আর কিছু হিমায়িত মাছ তখন রপ্তানি করা হতো।

বাংলাদেশে পোশাকশিল্পের ভিত্তি তখনই রচিত হয়। ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার অনুমতিসহ সরকারের আরো কিছু প্রগতিশীল দূরদর্শী নীতির কারণে এই পোশাকশিল্পের বিকাশ দ্রুত ঘটতে থাকে ও মূল্য সংযোজন কম হলেও কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। বিদেশী বিনিয়োগ এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য চট্টগ্রাম এবং ঢাকায় রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ জোনগুলোকে আরো জোরদার করা হয়। হিমায়িত মাছ রপ্তানিকারকদের সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়। ইউরিয়া সারের আমদানি খরচ কমানো এবং রপ্তানির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করার জন্য দেশের গ্যাস ব্যবহার করে সার কারখানা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়।

কাঁচা চামড়া রপ্তানি বন্ধ করে চামড়াজাত দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানির বিকাশ ঘটানো ছিল একটি কঠিন কাজ। তিন বছর হাতে দিয়ে আমি ১৯৮৯ সাল থেকে কাঁচা চামড়া রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করেছিলাম। এতে চামড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে তোলপাড় কাণ্ড সৃষ্টি হয়। হাজারীবাগের ট্যানারির মালিকরা আমার বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণার মত প্রতিবাদী অবস্থার সৃষ্টি করে, আন্দোলনে নামে, আমার কুশপুত্তলিকায় আগুন দেয়। সভা, সমাবেশ, মিছিল করে। মালিকদের অনেকেই ছিলেন নোয়াখালীর। অনেক ধরাধরি ও তদ্বির করা হয়। কিন্তু আমি পিছু হটিনি। আমি জানতাম এটি দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। এই transformation-এর জন্য যেসব আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা সরকার করেছিল সেগুলো ব্যাখ্যা করে তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপোস করিনি। এই সিদ্ধান্ত এবং নীতির কারণে চামড়া খাতে রপ্তানি আয় কয়েকশতগুণ বেড়ে যায় এবং এই শিল্পে উৎকর্ষের ব্যাপক বিকাশ সাধন ঘটে। এজন্য ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়, যাঁরা আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন সেই চামড়াশিল্পের মালিকরাই ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আমাকে এক বিরাট সম্বর্ধনা দেন।

বাংলাদেশে শিল্পায়নের নতুন নীতিমালা ঘোষণা করা হয় ১৯৮৬ আমার তত্ত্বাবধানে। মৌলিক কাঁচা মালের অভাবে দেশে বৃহৎ বা ভারি শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। দেশে উৎপাদিত কাঁচা মাল, যেমন গ্যাস আর কৃষিজাত দ্রব্য বা পাট ও চাভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা থাকলেও বিনিয়োগের তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। যেমন চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানায় আমরা বিনিয়োগ করেছি প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা কিন্তু কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ৯০০ শ্রমিকের। একই অবস্থা গ্যাসভিত্তিক নতুন নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্রে। পাটশিল্পে কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ থাকলেও বিশ্ববাজারে

www.pathagar.com

মন্দা পরিস্থিতি আর অব্যবস্থাপনার কারণে এই শিল্পকে পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করতে অনেক বিনিয়োগ এবং সময়ের প্রয়োজন হবে। তাই দেশে শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের একমাত্র সম্ভাবনা রয়েছে ক্ষুদ্রশিল্পে।

বেকারত্ব আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। বাজারে চাহিদা বাড়াতে হলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে, আর তা করতে হলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, আর কর্মসংস্থানের জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এটিকে বলে অর্থনীতির চাকা। যে দেশ যত জোরে এই চাকা ঘুরাতে পেরেছে সেই দেশ তত তাড়াতাড়ি উন্নতি লাভ করেছে। কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিন দিন কমে আসছে। উন্নতমানের বীজ এবং উপকরণ, সেচ এবং যান্ত্রিকীকরণের কারণে ক্ষেতে-খামারে উৎপাদন বাড়বে, কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সীমিত হতে থাকবে। আমাদের দেশে কর্মক্ষম যুবকের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি। তাছাড়া রয়েছে নারী সমাজের একটা বিরাট অংশ যারা এখন কাজ করে উপার্জন করতে চায়। যে কোন ধরনের শিল্পায়নের জন্য দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। সেই দিক থেকেও একমাত্র ক্ষুদ্রশিল্পই ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানের যোগান দিতে পারে।

ধোলাইখাল কনসেপ্ট: স্মল ইজ বিউটিফুল

স্বল্প বিনিয়োগে অধিক কর্মসংস্থানের একমাত্র পথ হলো ক্ষুদ্রশিল্প। স্মল ইজ বিউটিফুল। বাংলাদেশের শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের জন্য এটিই একমাত্র পথ। তাছাড়া ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশ ছাড়া কোন ধরনের শিল্পায়ন সম্ভব নয়। পৃথিবীর সব শিল্পোন্নত দেশেই শিল্পের ভিত্তি রচনা করেছে ক্ষুদ্রশিল্প। ইংল্যান্ড, জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান আর থাইল্যান্ড এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

শিল্পমন্ত্রী হিসেবে আমি সবচেয়ে আগে মনোযোগ দিয়েছি ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশের ওপর। সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থাকে সুসংগঠিত করে চাঙ্গা করা হয়েছে। এই সংস্থার গুরুত্ব এবং অগ্রাধিকার আমার নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ও আমার ঘন ঘন ঐ সংস্থার অফিসে এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। আমি শুধু ঢাকা নয়, সারা দেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং ক্ষুদ্রশিল্পনগরী পরিদর্শনের জন্য ভ্রমণ শুরু করি। চট্টগ্রাম থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত প্রতি শহরে এবং উপজেলায় নতুন নতুন শিল্পনগরী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেই। সারা দেশে একটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ফিরে আসে। ক্ষুদ্রশিল্প খাত পুরোটাই ব্যক্তিমালিকানায় নিয়ন্ত্রিত। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনীতে আমি শিল্পনগরী উদ্বোধন করার এক বছরের মধ্যে সমস্ত প্লটেই কারখানা গড়ে উঠেছিল এবং উদ্যোক্তারা আর একটি শিল্পনগরীর জন্য দাবি তুলেছিল। কোম্পানীগঞ্জ এবং সেনবাগ উপজেলায়ও শিল্পনগরী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলাম।

ঢাকার ধোলাইখাল ও জিঞ্জিরা ছিল নিন্দনীয় এলাকা। অবহেলিত, নিগৃহীত, নিন্দিত। অথচ এগুলো হলো রাস্তার ধারের ছোট ছোট কারখানা বা বাসাবাড়ির সঙ্গে ছোট ছোট

www.pathagar.com

কারখানা। এক একটি ছোট ঘর, এক একটি কারখানা। ছোটখাটো গ্যারেজেও দেখা যায় এরকম কারখানা। এরা লেদ এবং অন্যান্য ছোট ছোট মেশিন দিয়ে অসংখ্য ধরনের যন্ত্রাংশ তৈরি করতে পারে। হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং, প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক্স এবং আরো অনেক যন্ত্রাংশ ও যন্ত্রপাতি নির্মাণে এরা পারদর্শী। এরা যে কোন যন্ত্রাংশ অত্যন্ত পারদর্শিতার সাথে অবিকল নকল তৈরি করে দিতে পারে। বস্ত্রশিল্পকারখানার লুম তারাই তৈরি করে। আমি জিঞ্জিরায় গিয়ে বক্তৃতা দিলাম "যত পারো নকল করো।" ক্ষুদ্রশিল্পের মালিকরা হতবাক। তারা ভাবল এতদিন এ ধরনের শিল্পমন্ত্রী কোথায় ছিল। এ যাবৎ তারা তো শুধু হয়রানির শিকার হয়েছে। নকল উৎপাদনের অভিযোগে মাঝে মাঝে পুলিশ এসে তাদের দোকান, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু বললাম পরীক্ষার হল, ওষুধ আর যে কোন খাওয়ার জিনিস ছাড়া, সব যন্ত্রাংশ নকল করুণ, কোন অসুবিধা নেই। তারা খুব খুশি হলো সেদিন। পরের দিন সব দৈনিক কাগজে হেডলাইন হয়েছিল "যত পারো নকল করো।" বিদেশী যন্ত্রাংশ নকল না করলে কারিগর হবে কি করে?

ধোলাইখালের চুন্নু মিয়া, কোনদিন স্কুলে যায়নি, কিন্তু একজন সফল কারিগর এবং উদ্যোক্তা। এরকম আরো অনেক চুন্নু মিয়া রয়েছে সারা দেশে। শিক্ষিত কিছু মানুষও আছে। সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে আমার সাথে পড়তো মতলুব। তাকে আবিষ্কার করলাম সেখানে। সে তখন ধোলাইখাল ক্ষুদ্র মালিক সমিতির সভাপতি। সারা দেশের ক্ষুদ্রশিল্প মালিকদের সাথে আমি অগণিত সভা করেছি। শুধু রাজধানী নয়, নরসিংদী, ঘোড়াশাল, যশোর, খুলনাসহ ছোট বড় সব শহরে, চট্টগ্রাম থেকে একেবারে পঞ্চগড় পর্যন্ত। মতবিনিময় করেছি, তাদের সমস্যা জানার এবং বোঝার চেষ্টা করেছি।

তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো স্বীকৃতি। বিসিক তাদের স্বীকৃতি দেয় না, ব্যাংক তাদের ঋণ দেয় না, আর সরকারি সংস্থাগুলো তাদের উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করে না। একটি নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে বিসিকের স্বীকৃতি অর্থাৎ নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। এই সংস্থার সুদক্ষ চেয়ারম্যান মুশফেকুর রহমানের সক্রিয় সমর্থনের কারণে অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রথম সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হলো। আমলা হলেও মুশফেক ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সমসাময়িক সহপাঠী। তার মধ্যে দেশের জন্য একটা গভীর কমিটমেন্ট ছিল। তাই কাজ করতে সুবিধা হয়। দুজনের লক্ষ্য ছিল একই। শুধু নিবন্ধীকরণ নয়, ক্ষুদ্রশিল্প উদ্যোক্তাদের অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তাদের উৎসাহ দেয়ার জন্য আমি নিজেও অনেক প্রশিক্ষণকোর্স উদ্বোধন করেছি এবং অনেক সময় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে অংশ নিয়েছি।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো বাজারজাতকরণ। দেশে ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তখন আমদানি হতো ৩২০ কোটি টাকার। অথচ এর প্রায় সবটাই বাংলাদেশে তৈরি করা সম্ভব ছিল। সরকারি সংস্থাসমূহ, যেমন রেল বিভাগ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাট ও বস্ত্র কর্পোরেশনসহ ৪৮টি সংস্থা এ ধরনের যন্ত্রাংশ আমদানি করে বৈদেশিক মুদ্রায়। অথচ

www.pathagar.com

তারা দেশের তৈরি যন্ত্রাংশ কিনবে না, একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। অথচ এসব যন্ত্রাংশের সঙ্গে কোন high technology-র সম্পর্ক ছিল না। নাট, বল্টু পর্যন্ত তখন আমদানি করা হতো। এসব সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে আমি অনেকবার বৈঠক করেছি। তাদের motivate করার চেষ্টা করেছি। যন্ত্রাংশ দেশের ক্ষুদ্র কারখানাগুলো থেকে কেনার জন্য অনুরোধ এবং কোন কোন সময় দাবিও জানালাম। এতে অনেক চেয়ারম্যান, মহাপরিচালক সাড়া দিলেন ও সমর্থন জানালেন এবং উৎসাহ দেখালেন। তবে বেশিরভাগ ছিলেন অনড়। তারা নানা পদ্ধতিগত সমস্যার কথা তুলে ধরলেন। এগুলোর মধ্যে ছিল সরকারের ক্রয়নীতি, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মর্জি, দাতা সংস্থার শর্তাবলি এবং আরো অনেক কিছু।

তৃতীয় সমস্যা হলো অর্থায়ন। ব্যাংক তাদের স্বীকৃতি দেয় না, ঋণ দেয় না। চুন্নু মিয়া তো সবসময় লুঙ্গি পরে। ব্যাংকের অভ্যন্তরে যাওয়ার সাহস তার কুলায় না; ম্যানেজার সাহেবের ঘরে প্রবেশের তো প্রশ্নই ওঠে না। ব্যাংকগুলো এমনিতেই শিল্পে অর্থায়ন করতে চায় না, দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ঝুঁকি অনেক বেশি। তাই ব্যাংকগুলো trading অর্থাৎ আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে ঋণ দিতে পছন্দ করে যাতে ঋণ তাড়াতাড়ি ফেরত পাওয়া যায়। তাছাড়া শিল্প খাতে ব্যাংকের ঋণদান পদ্ধতি নানা কারণে অনেক জটিলতার জন্ম দেয়। ঋণ প্রক্রিয়া অনেক দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। ঋণের জন্য দরখাস্ত করলে সিদ্ধান্ত দিতে অনেক সময় দুতিন বছর গড়িয়ে যায়, ততদিনে যে সম্ভাব্য মূল্যের ওপর ভিত্তি করে ঋণ দেয়া হয় তার বাজার মূল্য আরো বেড়ে যায়, ফলে কারখানা প্রথমেই ঘাটতির সম্মুখীন হয়। এরপর উদ্যোক্তা যখন মেশিনপত্র আমদানি করে উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হয় তখন তার জন্য চলতি মূলধনের অভাব ঘটে। সময়মত ঋণ এবং চলতি মূলধন না পাওয়ার কারণে একটি শিল্প উৎপাদনে যাওয়ার আগেই রুগ্ন হয়ে যায়। এরকম শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে। অনেক উদ্যোক্তা আবার ঋণের টাকা অন্য কাজে ব্যবহার করে শিল্পের কৃত্রিম সঙ্কট এবং রুগ্নতা দেখিয়ে আরেক রকমের মুনাফা লুটতে চায়। তাছাড়া রয়েছে ব্যাংকের ঋণদান প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, এবং অর্থ আত্মসাতের লক্ষ্যে ব্যাংক কর্মকর্তা এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যে যোগসাজশ।

আর ক্ষুদ্রশিল্প মালিকদের ঋণ দেয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো একেবারেই উৎসাহী না। অল্প টাকার বিনিয়োগে ব্যাংক কর্মকর্তাদের incentiveও কম। ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য আলাদা কোন portfolio নেই। অর্থাৎ তারা বলে, এই খাতে কোন টাকা নেই। তারপর প্রশ্ন আসে বন্ধকীর। চুন্নু মিয়ার আছেই কি যে বন্ধক রেখে ঋণ নেবে। তাদের হয়তো প্রয়োজন পঞ্চাশ হাজার, এক বা দুচার লক্ষ টাকার। এক কোটি টাকার ওপর প্রকল্প খুবই কম। সেই অর্থ ব্যাংক কোন কিছু বন্ধক না রেখে ঋণ হিসেবে দেবে না। যদি কেউ বন্ধকী দিতেও পারে, ব্যাংকের এই খাতে ঋণ দেয়ার কোন নীতি নেই।

শিল্পায়নে ঋণদানের এই সার্বিক সমস্যা সমাধান করার জন্য ব্যাংকগুলোর সাথে বসলাম। কয়েকবার ঢাকায় বৈঠক করলাম রাষ্ট্রায়ত্ত সকল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের

www.pathagar.com

সাথে। যৌথসভা করলাম উদ্যোক্তাদের নিয়ে। ছোট বড় সব উদ্যোক্তাদের একই নালিশ। ঋণ পেতে অনেক সময় লাগে। অনেক টাকা খরচ করতে হয়। মূলধন পাওয়া গেলেও চলতি মূলধন পাওয়া যায় না, কোন কিছুই সময়মত পাওয়া যায় না। যারা সৎ এবং পরিশ্রমী বা উদীয়মান ও প্রতিভাশীল উদ্যোক্তা, তাদের জন্য এই দীর্ঘসূত্রতা আরো হতাশাব্যাঞ্জক; তারা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। বিনিয়োগ আর করতে চায় না। ব্যাংক পরিচালকদের কথা হলো প্রকল্প যাচাই বা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করার জন্য তাঁদের পর্যাপ্ত কলাকৌশলী নেই। তাঁদের ওপর রাজনৈতিক চাপ থাকে। বরাদ্দ কম থাকলে দুর্নীতির অনেক সুযোগ থাকে বলে তাঁরা স্বীকার করেন। ঋণ দেয়ার পর উদ্যোক্তারা সময়মত টাকা ফেরত দেন না। ব্যক্তিগত কাজে বা অন্য ব্যবসায় ঋণের টাকা divert করে।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা মূলত ঢাকায় ব্যস্ত থাকেন। বড়জোর বছরে এক-আধবার ঢাকার বাইরে অন্য কোন শহরে যান। মাঠ পর্যায়ের সমস্যাগুলো বোঝার সুযোগ তাঁদের হয় না। সারা দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁদের যোগাযোগ কম। উদ্যোক্তারা ব্যাংকে গিয়ে যে কতভাবে হয়রানি হন, কত ধরনের দুর্নীতির শিকার হন—এটা তাঁরা বোধহয় জানার চেষ্টাও করেন না।

আমি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদেরকে সাথে নিয়ে সারা বাংলাদেশের সকল শহরে গিয়েছি। একেবারে দিনাজপুর পর্যন্ত। এতে দুয়েকজন ছাড়া পরিচালকদের সবাই অসন্তুষ্ট হন। এত কষ্ট, আর ঢাকায় তাঁদের কত কাজ! অনেকে আড়ালে আপত্তি করেছেন। নালিশ করেছেন। কয়েকটি শহরে যাওয়ার পর বিষয়টি জেনারেল এরশাদের কানে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এবং ব্যাপারটা কি জানতে চাইলেন। এমডি ছাড়া তাঁদের কোন সিনিয়র প্রতিনিধি হলে চলবে কিনা জানতে চাইলেন। আমি রাজি হলাম না, কারণ বেশ বুঝতেই পারি, এটি দায়িত্ব এড়ানোর একটি প্রচেষ্টা। আমি উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবে যেতে পারলে এমডি'রা যেতে পারবেন না কেন? আমি বুঝিয়ে বলাতে তিনি আর আপত্তি করলেন না, বরং সমর্থনই দিলেন। প্রতিটি শহরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং শিল্প বণিক সমিতি, ক্ষুদ্রশিল্প মালিক সমিতি, বিসিকশিল্প মালিক সমিতি এবং আরো নানা খাত-উপখাতের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা করেছি। বিভিন্ন শহরে অনেক উদ্যোক্তার সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা হয়। ধীরে ধীরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মনোভাব শিথিল হয়, তাঁরা ক্রমশ সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যাংক এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে। প্রায় দুবছর আমি এই কাজ করেছি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে ব্যাংকগুলোতে শিল্প খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয় এবং ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগের জন্য আলাদা পোর্টফোলিও তৈরি করা হয়। Venture capital-এর দ্বার উন্মুক্ত হয়। শিল্পে বিনিয়োগকারী দেশের ছোট বড় সকল উদ্যোক্তা, শিল্পপতি এবং সকল ধরনের বণিক সমিতি আমার উদ্যোগে দারুণভাবে উৎসাহিত হয়। দেশে বিনিয়োগের একটা নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের ক্রয়নীতির পরিবর্তন করতে প্রায় তিন বছর সময় লেগে যায়। অজস্র আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অসংখ্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা, সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে বৈঠক, ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে দেনদরবার করে ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য একটি ভিন্ন ক্রয়নীতি চূড়ান্ত করা হয়। মন্ত্রিপরিষদে উত্থাপনের আগে সমর্থনের জন্য সিনিয়র মন্ত্রী এবং আমলাদের সাথে আলাপ করি। মন্ত্রিপরিষদের সভায় সকলেই আমার প্রস্তাবের পক্ষে মতামত দেন। একটি বিধিমালা আকারে এই ক্রয়নীতি অনুমোদন লাভ করার পর পয়লা অক্টোবর ১৯৮৯ তারিখে গেজেট করা হয়। এটি ছিল একটি বিরাট অর্জন। নতুন ব্যবস্থা মতে বিসিকের তালিকাভুক্ত ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য ব্যাংকে আলাদা কোন বন্ধকী দিতে হবে না, আলাদা কোন ব্যক্তিগত সিকিউরিটিও দিতে হবে না। বিসিক এবং বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি সংস্থার সাথে সাব-কন্ট্রাকটিংয়ের আওতায় একটি সমঝোতা চুক্তির ভিত্তিতে ক্ষুদ্রশিল্পকারখানায় তৈরি উৎপাদনসামগ্রী ক্রয়ের জন্য কোন পাবলিক টেন্ডারের প্রয়োজন হবে না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে না, দরপত্রের জন্য কোন মূল্য বা কোন আর্নেস্ট মানি দিতে হবে না। গুণগতমান সাপেক্ষে বিসিকের তালিকাভুক্ত প্রতিটি আইটেমের উৎপাদনকারীদের মধ্যে সীমিত টেন্ডারের মাধ্যমে বাছাই করে ক্রেতা সংস্থা সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যপত্র বা ক্রয়পত্র দান করবে। ধারা ৩-এর অধীন এই বিধিমালা সকল মন্ত্রণালয় এবং তাদের অধীনস্থ সংস্থার জন্য প্রযোজ্য করা হয় এবং ধারা ১৪-এর অধীনে সরকারের অধীনস্থ দেশের সমস্ত সরবরাহকারী কর্পোরেশন, সংস্থা, প্রকল্প এবং কারখানার জন্য এই বিধিমালা বাধ্যতামূলক করা হয়। আমার বিবেচনায় একটি দিক্‌নির্দেশনামূলক এবং বিস্তারিত সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এই বিধিমালা ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ইতোমধ্যে বিসিক সারা দেশে অবস্থিত ক্ষুদ্রশিল্পসমূহের এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য এবং ঐসব পণ্যের গুণগত মানের বিশ্লেষণসহ একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করে এবং সকল সংস্থাকে অবহিত করে। শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিক, ব্যাংক এবং সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে মোটামুটি একটা টিমওয়ার্ক বা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা সরকারের ক্রয়নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক হয়।

সারা দেশে ক্ষুদ্রশিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করা হলো। গোটা শিল্পাঙ্গনে একটি কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসে। শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে আস্থা এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে আসার কারণে ছোট বড় সব ধরনের শিল্পে বিনিয়োগের হার দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। সংবাদপত্রসমূহ আমার এই উদ্যোগকে “ধোলাইখাল কনসেপ্ট” বলে আখ্যায়িত করে এবং এই কনসেপ্ট দ্রুত সারা দেশে বিস্তৃতি লাভ করে।

ক্ষুদ্রশিল্পের আর একটি অঙ্গন ছিল ইলেকট্রনিক্সের সংযোজন শিল্প। ঘড়ি, পোর্টেবল এবং পকেট রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিপি এমনকি কম্পিউটার সংযোজন করার ছোটখাটো অনেক প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রশিল্পের আওতায় এনে তাদের উৎসাহিত করা হয়।

www.pathagar.com

আমি নিজে এ ধরনের অনেক কারখানা পরিদর্শন করি। অতি অল্প পরিসরে এবং স্বল্প বিনিয়োগে এসব সংযোজন শিল্প—বিশেষ করে ঘড়ি, পকেট ট্রানজিস্টার, ভিসিআর, ভিসিপি তৈরি গড়ে তোলা যায়।

একবার এক যুবক আমাকে হাটখোলায় তার রেডিও তৈরির কারখানা দেখাতে নিয়ে যায়। ছোট একটি ফ্ল্যাট, ১ হাজার বর্গফুটও হবে না। দেখি একটি কামরায় লম্বা একটি টেবিলে আট-দশটি ছেলেমেয়ে। লেখাপড়া খুব করেছে বলে মনে হলো না। খুব ছোট পকেট ট্রানজিস্টার সংযোজন করছে। ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে একটি করে ট্রানজিস্টার তৈরি হচ্ছে। দাম পড়ে মাত্র এক'শ টাকা। নবাবপুরের দোকানগুলোতে সরবরাহ করা হয় ১২০ টাকায় এবং তারা এটি বিক্রি করে ১৩০ টাকায়। ক্রেতা হলো একেবারে নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ, এমনকি রিক্সাওয়ালারা পর্যন্ত এটা কেনার সামর্থ্য রাখে। আমি হতবাক হলাম এই উদ্যোগ দেখে, এই সম্ভাবনা দেখে। তার ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারণ করার জন্য তাকে বিসিকের তালিকাভুক্ত করে ঋণের ব্যবস্থা করে দিলাম। পরে শুনেছি, ভিসিআর-ভিসিপি, এমনকি কম্পিউটার সংযোজন করার জন্য সে বেশ বড় একটি কারখানা করেছিল। এই ধরনের অচেনা অজানা অনেক নীরব উদ্যোক্তার সাথে আমার পরিচয় ঘটেছে। আমিও তাদের খুঁজে বের করতাম।

এ ধরনেরই একজন উদ্যোক্তা বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার সংযোজনের একটি ছোট কারখানা স্থাপন করে এবং বাংলাদেশ থেকে প্রথম সংযোজিত ৫০০ কম্পিউটার সোভিয়েত ইউনিয়নে রপ্তানি করার কার্যাদেশ পায় এবং ততদিনে বেশ কিছু চালানও দিয়েছে। আমি তার কারখানা দেখতে গিয়েছিলাম। কাজী নজরুল ইসলাম সড়কের একটি গলির মধ্যে ছোট তিনটা ঘর, কিন্তু ছিমছাম। মেয়েরা সবাই ব্যস্ত তাদের সংযোজনের কাজ নিয়ে। ১৯৮৬ সালের পার্লামেন্টে আমার এক বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী হিসেবে আমি এই রপ্তানির কথা উল্লেখ করাতে সকলেই টেবিল চাপড়ে হর্ষ প্রকাশ করেন। তখনকার সময় অবিশ্বাস্য মনে হলেও বিষয়টি ছিল সত্য। তবে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্ট সদস্য শেখ সেলিম তাঁর বক্তৃতায় এটিকে নিয়ে খুব ঠাট্টা মশকরা করেন। মন্তব্য করেন যে, এই ধরনের অবাস্তব কল্পনাবিলাসী কম্পিউটার সংযোজনের কারখানা নিশ্চয়ই শিল্পমন্ত্রীর বাড়ির বাগানে অবস্থিত। পরের দিন আমি একটি বড় বাক্সে ব্যাংকের রপ্তানি করার ইস্যুকৃত কাগজপত্রসহ দেশে সংযোজিত একটি কম্পিউটার নিয়ে পার্লামেন্টে হাজির হই এবং স্পিকারের অনুমতি নিয়ে হাউসের মধ্যে সোজা শেখ সেলিমের কাছে পাঠিয়ে দেই। তাঁর বক্তব্যের উত্তরে বলি, দেশের মানুষের ওপর আস্থা রাখতে এবং হতাশ না হতে। এই ঘটনাটি পার্লামেন্টের কার্যবিবরণীতে এখনো লিপিবদ্ধ আছে।

সংজ্ঞানুযায়ী ৫০ জনের কম শ্রমিক কাজ করে অথবা যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ কোটি টাকার কম, এমন ধরনের ক্ষুদ্রশিল্পের বিস্তার অত্যন্ত ব্যাপক। সারা দেশে এই ধরনের নানা শিল্প গড়ে উঠেছে। সরকারের নির্ধারিত শিল্পনগরীর বাইরেও অজস্র শিল্পকারখানা রয়েছে এবং তাদের সংখ্যাই বেশি। ধাতব ঢালাই, হাল্কা

www.pathagar.com

ইঞ্জিনিয়ারিং, প্লাস্টিক, সিরামিক্স, ইলেকট্রিকেলস, ইলেকট্রনিক্স, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, বস্ত্র, বনজসামগ্রী, কাগজ, মুদ্রণ, চামড়া, রাবার, কাচ, রসায়ন, ওষুধ এবং আরো বিভিন্ন উপখাতে অসংখ্য শিল্প রয়েছে। এছাড়া রয়েছে অগণিত কুটিরশিল্প। লক্ষ লক্ষ নরনারীর কর্মসংস্থান হয় এই শিল্পে। পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করলে ৫-৭ জন মানুষের কর্মসংস্থান হয় এবং ক্ষুদ্রশিল্প বিকশিত হয়ে মাঝারিশিল্পে পরিণত হয়। একটি লেদ মেশিনে ১০ জন মানুষ কাজ করতে পারে। ঢাকার ধোলাইখালে এ ধরনের ৪৫০টি ছোট ছোট এক বা দুইঘরবিশিষ্ট কারখানা আছে। ক্ষুদ্রশিল্প বিকশিত করার এই ধোলাইখাল কনসেপ্ট সারা দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং দেশের মানুষের মধ্যে একটি বড় আশার সঞ্চার করে।

একই ধাঁচে দেশে মাছ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার করার জন্য বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা সম্প্রসারিত করে দেশের একটি বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী মাছ, মাংস, দুধ, ডিম সহজলভ্য করা সম্ভব হয়। সরকারের এই নীতিকে আরো গতিশীল করার জন্য আমি কাজ করেছি অনেক।

মিশুক আর সুজন

রাজধানীতে যতদিন মানুষচালিত রিক্সা চলবে ততদিন বাংলাদেশ একটি পশ্চাৎপদ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ধরে নিতে হবে আমাদের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়নি, আমরা আধুনিক হতে পারিনি। অথচ বিষয়টি সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণে বেশ জটিল। হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের প্রশ্ন জড়িত। রাজনৈতিক কারণে তাদের রাস্তা থেকে তুলে দেয়াও সম্ভব নয়। তাছাড়া অর্থ আর প্রযুক্তির অভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে আধুনিক যানবাহন দিয়ে রাজধানীর অধিবাসীদের জন্য বিকল্প যানবাহনের ব্যবস্থা করা রাতারাতি সম্ভব নয়। রিক্সাচালকদের জন্য অনত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। এই অবস্থার উত্তরণের জন্য প্রয়োজন একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, সাধারণ যাত্রীদের জন্য যন্ত্রচালিত যানবাহনের দ্রুত ব্যবস্থা। যাত্রীদের জন্য কম খরচে অল্প সময়ে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা। নিজের দেশে উদ্ভাবিত বা প্রস্তুতকৃত ছোট ছোট যানবাহন দিয়ে এই যাত্রা শুরু করার জন্য উদ্যোগ নেয়া শুরু করলাম।

টঙ্গীতে সরকারি মালিকানায় একটি মোটর সাইকেল সংযোজনের কারখানা ছিল। নাম এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড। আমদানি করা হুন্ডা মোটর সাইকেলের CKD (Completely Knocked Down), SKD (Semi Knocked Down) component আকারে এনে এখানে সংযোজন করে বাজারজাত করার ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। কারখানার বেশিরভাগ সময় অলস পড়ে থাকত। Capacity-র চেয়ে utilisation কম ছিল। এই কারখানার কর্মকর্তা আর কারিগরদের সাথে অনেক বৈঠক করলাম। বেবিট্যাক্সি সব ভারত থেকে আসে। নিজেরা একটা কিছু উদ্ভাবন করা যায় কিনা, এর বিকল্প কিছু তৈরি করা যায় কিনা, চিন্তা করতে বললাম। বাংলাদেশ জন্মলাভ করার পর এই ধরনের একটি

www.pathagar.com

নতুন কাজ করতে আগে তাদেরকে কেউ বলেনি। আমার উদ্যোগ দেখে কারখানার প্রকৌশলী, কারিগর আর কর্মচারীরা এটিকে অতি উৎসাহের সাথে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করলেন। ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের সিনিয়র প্রকৌশলীরা এগিয়ে আসলেন সাহায্য করার জন্য। মাসখানেকের মধ্যে ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন—সব দেখালেন। আমি অনুমোদন দিলাম। শুধু ইঞ্জিনটা আমদানি করতে হবে, বাকিটা সব দেশে তৈরি করা যাবে। পৃথিবীর কোন মোটর গাড়ি বা যে কোন ধরনের যানবাহন কোন একটা একক কারখানায় তৈরি হয় না। টয়োটা গাড়ির সাথে অন্তত তিন ডজন কারখানা লিঙ্কেজ শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। গাড়ির এক একটি অংশ এক একটি কারখানায় তৈরি হয়। তারপর সেগুলোকে টয়োটার কেন্দ্রীয় কারখানায় একত্রিত করে finished unit হিসেবে উৎপাদন করে বাজারজাত করা হয়। আমাদের সমন্বিত উদ্যোগে এখানেও গাড়ির কিছু কিছু অংশ বাইরের বিভিন্ন ক্ষুদ্র লিঙ্কেজ কারখানায় তৈরি করে একটি নতুন ধরনের তিন-চাকার বেবিট্যাক্সির বিকল্প গাড়ি তৈরি করা সম্ভব হলো। বলতে গেলে দেশের তৈরি এই প্রথম একটি স্বল্প পরিসরের যানবাহন তৈরি হলো। সবাই মিলে নাম দিলাম "মিশুক।" আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করার পর গাড়িটি সংবাদপত্রে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় এবং এই বাহনের চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ম করা হলো, রিক্সাচালক স্বয়ং রিক্সামালিক হয়ে থাকলে তাঁকে মিশুক বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হবে। দ্বিতীয় গ্রুপ থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যারা পার্টটাইমে বা ছুটির দিনে আয়ের ব্যবস্থা হিসেবে এই গাড়ি চালাতে চায়। অনেক ছাত্র বেশ কষ্ট করে লেখাপড়া করে। কাজ করে কিছু অর্জন করা খুবই সম্মানজনক। আমি নিজেও ছাত্রাবস্থায় লন্ডনে গাড়িচালক হিসেবে কাজ করেছি। এরপর আসবে একটু বুদ্ধিমান এবং সঙ্গতিসম্পন্ন রিক্সাচালকরা। আমাদের এই কর্মসূচিতে অনেক ছাত্র এগিয়ে আসে। এরপর ব্যাংকের অর্থায়নে ইস্পাত কর্পোরেশনের মাধ্যমে এই তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য মিশুক বরাদ্দের প্রথম experiment শুরু করা হয়। প্রথম দিকে "মিশুক" ছাত্ররাই চালাতো, পরে উৎপাদনের চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে এর চালক এবং মালিকানার বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আসে।

জয়দেবপুরে অবস্থিত মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি দেশে যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ তৈরি করার সর্ববৃহৎ কারখানা। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত এই কারখানা চালানোর যোগ্য মানুষ নেই। উদ্যোগও নেই। অনেক বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে, তারপরও লোকসানের শেষ নেই। একটি শ্বেতহস্তীর মত। এত বিশাল প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণেরও উপায় নেই। ক্রেতা পাওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত একটি কাজ করেছি এই কারখানায়। চট্টগ্রামে গালফ্রা হাবিব এবং প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজে কিছু কম্পোনেন্ট তৈরি করে ঢাকার মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরিতে একটি নিজস্ব তৈরি টেম্পো পূর্ণাঙ্গ আকারে উৎপাদন করার ব্যবস্থা করা হলো। যানবাহনের ক্ষেত্রে উন্নতিসাধনের জন্য এটি ছিল একটি বিরাট পদক্ষেপ। এর উৎপাদন তদারক করার জন্য আমাকে বহুবার সেই কারখানায় যেতে হয়েছে। জেনারেল

www.pathagar.com

এরশাদের সাথে আলাপ করে নাম দিলাম "সুজন।" দেশের ছোট বড় কারিগরদের সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে আমি বাংলাদেশে তৈরি টেম্পো "সুজন" উদ্বোধন করলাম। প্রথম দিনেই ১০টি বিক্রি হয়। "মিশুক" আর "সুজন" ছিল বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত প্রথম তিন-চাকার যানবাহন। গবেষণা, অধ্যবসায় আর দেশপ্রেমকে সম্বল করে দেশে যে আরো উন্নতমানের যানবাহন তৈরি করা যায় আমার এই উদ্যোগের মাধ্যমে তার প্রাথমিক ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়া হয়েছিল।

একনেক

উপপ্রধানমন্ত্রী এবং পরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি প্রায় পাঁচ বছর একনেকের সভায় সভাপতিত্ব করেছি। বিদেশী সাহায্যপুষ্ট সকল প্রকল্পের অনুমোদন দেয় দেশের এই সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক কমিটি। প্রায় প্রতি সপ্তাহে বসতে হয়। ৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে তখনকার সময় নিজেদের অর্থায়নে অন্য সকল প্রকল্পের অনুমোদনও এই কমিটি দিয়ে থাকত। এছাড়াও জটিল অর্থনৈতিক বা নীতিনির্ধারণী যে কোন বিষয়ের ওপর গঠিত অন্য আরো অনেক মন্ত্রিপরিষদ কমিটির সভাপতির কাজ আমাকে করতে হয়েছে। এসব কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব এরশাদ আমার ওপর দিতেন। বাজেট ঘোষণার পর বিভিন্ন খাতের ওজর-আপত্তি এবং দাবিদাওয়ার ওপর আলোচনা এবং মীমাংসার ভারও আমার ওপর দিতেন। পাট, বস্ত্র, পোশাকশিল্প, চামড়া সেক্টরের বিভিন্ন জটিল সমস্যার বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে আমাকে সমাধান দিতে হয়েছে।

বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থা যে কোন প্রকল্পে সাহায্য দেয়ার আগে পরামর্শক নিয়োগ দান করে। সেই পরামর্শক প্রকল্পের সম্ভাবনা যাচাই করেন এবং কাঠামো তৈরি করেন। তাঁর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প চূড়ান্ত করা হয়। প্রকল্প চূড়ান্ত করার আগে অবশ্য একনেকের প্রাথমিক অনুমোদন নিতে হয়। কিন্তু একনেক পর্যন্ত আসার আগে প্রকল্পের বিভিন্ন স্তর আছে এবং প্রক্রিয়াটি সময় সাপেক্ষ এবং জটিল। অনুমোদিত প্রকল্পেও বিদেশী পরামর্শক থাকে। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেশীয় পরামর্শক নিয়োগ করা হয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বা বড় যে কোন প্রকল্পে বিদেশী পরামর্শক থাকে। তাদের ওপর প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে। তাই প্রকল্প তৈরি বা বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত এবং যোগ্য পরামর্শক নিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এই নিয়োগের ব্যাপারে আমরা সবসময় দক্ষতা বা সচেতনতার পরিচয় দেই না। যদিও পরামর্শকের নিয়োগদান করে সরকার।

একবার গ্রামাঞ্চলে স্যানিটেশনের জন্য তিনজন পরামর্শক রাখার প্রস্তাবসহ একটি প্রকল্প একনেকে আসে অনুমোদনের জন্য। দেখা গেল পরামর্শকদের খরচ মূল প্রকল্প ব্যয়ের ৬০ শতাংশ এবং একজন পরামর্শকের জীবনবৃত্তান্ত পড়ে দেখলাম, তিনি একজন Car Mechanic, গাড়ির মিস্ত্রী। এই প্রকল্প অনুমোদন না করাতে হৈ চৈ পড়ে গেল। নানা চাপ আসা শুরু করল। লোকাল এজেন্ট এবং আমলারা যৌথ অভিযান শুরু করল যার যার স্বার্থে। এর সাথে অনেক টাকা জড়িত। কিন্তু আমি আপোস করিনি। আমার

www.pathagar.com

মত ছিল, গ্রামে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তেমন কোন Technology-র প্রয়োজন নেই। বিদেশী পরামর্শকের এখানে কি প্রয়োজন? আর যেখানে প্রকল্পের বেশিরভাগ খরচ তাদের পেছনেই ব্যয় করতে হবে? এ ধরনের বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ইআরডি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের গ্রহণ করাই উচিত হয়নি। পরিকল্পনা কমিশনের উচিত ছিল এটি নাকচ করে দেয়া। অথচ এই প্রকল্প চূড়ান্ত করতে প্রায় দুবছর সময় লেগেছে এবং কিছুটা কাজ শুরুও হয়ে গেছে। এসব চিন্তা করে, আর যেহেতু পারমর্শক ছাড়া বিদেশীরা ঋণ বা অনুদান কোনটাই দেয় না, সিদ্ধান্ত দিলাম যে একজন পরামর্শক রেখে প্রকল্পটা revise করা হোক এবং কোন Car Mechanicকে এই স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা চলবে না। একটি প্রকল্প যখন চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য একনেক পর্যায়ে আসে তখন একনেক সদস্যদের পক্ষে তার চুলচেরা বিচার করা সম্ভব হয় না। কিছু নীতিগত বিষয় সেখানে আলোচনা করা হয়। তাই একনেকের অনুমোদনটি ধরা যেতে পারে একটি আনুষ্ঠানিকতা। একনেক কোন প্রকল্প একেবারে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে এ ধরনের কোন নজির নেই বললেই চলে। দাতারা অনেক সময় কোন কোন প্রকল্প চাপিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করে। একটি প্রকল্প না নিলে অন্য আর একটি প্রকল্পের সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়ে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করে। গরিব দেশ বলে সাহায্য যেমন নিতে হয়, তার সাথে আবার অনেক শর্তও মেনে নিতে হয়। শর্তযুক্ত দান-খয়রাতের সাথে অনেক সময় অভিশাপও নেমে আসে। দাতাদের মধ্যেও প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে অনেক দুর্নীতি থাকে।

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংকের কনসেপ্ট, এর আকার, চরিত্র এবং ব্যাপকতা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের মননশীল বুদ্ধি এবং একটি অনন্য প্রতিভার প্রতিফলন। আজ এর প্রশংসা সারা বিশ্বে। প্রফেসর ইউনূস বহির্জগতে বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন স্বীকৃতি ও পরিচিতি এনে দিয়েছেন। আশা করি একদিন হয়তো তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হবেন। সেটি বাংলাদেশের জন্য আরো একটি বড় রকমের গৌরব নিয়ে আসবে। গ্রামীণ ব্যাংকের সৃষ্টি হয় একটি আইনের মাধ্যমে। এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সরকারি সংস্থা। অন্য যে কোন সংস্থাপ্রধানের মত প্রফেসর ইউনূসকেও বিদেশে যাওয়ার জন্য সরকারের অনুমোদন নিতে হতো। গ্রামীণ ব্যাংককে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনা করতে দেয়ার একটি প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য একনেকের এজেন্ডাভুক্ত করা হয়। সরকারের অভ্যন্তরে এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা ছিল অনেক। প্রফেসর ইউনূস আমাকে টেলিফোন করে বললেন যে, বর্তমান কাঠামোতে তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে চান। সরকারের কাছে যাতে কোন কাজের জন্য তাঁকে যেতে না হয়, বিদেশে যাওয়ার জন্য যাতে তাঁকে অনুমতি নিতে না হয়, সেই ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। আজ আমি

www.pathagar.com

মনে প্রচুর আনন্দ পাই এই ভেবে যে, একনেকের সভায় আমি সিদ্ধান্ত দিতে পেরেছিলাম যে, গ্রামীণ ব্যাংক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলবে এবং এই প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারি কোন হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। গ্রামীণ ব্যাংকের বিকাশ এবং বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জনে এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই সহায়ক হয়েছিল।

কুয়েত যুদ্ধ

একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট টেনে ইরাক যখন কুয়েত দখল করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন কুয়েত এবং সৌদি সরকারের আমন্ত্রণে এবং তাদের নিজস্ব স্বার্থে আমেরিকা কুয়েতকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল সংখ্যক সৈন্য এবং সমরাস্ত্র মোতায়েন করে। ইরাকের সাথে তখন জেনারেল এরশাদের গভীর সম্পর্ক এবং ঢাকায় ইরাকি রাষ্ট্রদূত ছিলেন এরশাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একদিন সৌদি আরবের বাদশার এক বিশেষ দূত আসলেন কুয়েতে বাংলাদেশের সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ জানাতে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকাও তাই চায়। মুসলিম বিশ্ব তখন বিভক্ত। তাই কূটনৈতিক কারণে মুসলিম দেশসমূহ থেকে সৈন্য নেয়ার প্রয়োজন বেশি অনুভূত হয়েছে। আমরা বিষয়টি আলোচনা করলাম এবং শেষ পর্যন্ত কুয়েতে সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরশাদের জন্য এটি ছিল একটি কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু সেদিন এরশাদ ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের চেয়ে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখেছিলেন। সাহস এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্তে দুই বন্ধুরাষ্ট্র, বিশেষ করে আমেরিকা এরশাদের ওপর খুব খুশি হয়েছিল।

কুয়েতে বাংলাদেশের কয়েক হাজার মানুষ বসবাস করে, চাকরি করে, রোজগার করে নানাভাবে। অনেকে ব্যবসা করে। বৈদেশিক মুদ্রায় দেশে অনেক টাকা পাঠায়। তাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য আমরা কুয়েত যুদ্ধের প্রাক্কালে তাদের প্রত্যাবাসন এবং পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই জটিল সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। এমন ধরনের পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। আমার জন্য বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। প্রবাসী বাংলদেশীদের মধ্যে একটি আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। তারা প্রায় সকলেই দেশে ফিরে আসতে চায়। জীবনের নিরাপত্তার ও বেঁচে থাকার জন্য তাদের বিষয়সম্পত্তি, ব্যাংক একাউন্ট সবই ফেলে দেশে চলে আসতে চায়।

এই গুরুত্বপূর্ণ কমিটির বৈঠক প্রায় প্রতিদিন আমাদের করতে হয়েছে। যুদ্ধের আতঙ্ক এবং সময়ের কারণে কুয়েতে অবস্থানরত হাজার হাজার নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে আনাটা ছিল সে সময়ের সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। বিমান এয়ারলাইন্সের একার পক্ষে এত অল্প সময়ে এত অধিক সংখ্যক লোক পরিবহন করা সম্ভব ছিল না। তাই উড়োজাহাজ ভাড়া করতে হয়। দিন রাত প্রতিদিন অন্তত পনের শত থেকে দুই হাজার মানুষ ঢাকার বিমানবন্দরে নামতে শুরু করে। বিমানবন্দরে তাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়। অনেকের পাসপোর্ট ছিল না, পকেটে কোন টাকা ছিল না, কারো কারো সাথে স্ত্রী পরিবার এসেছে, কে কোথায়

www.pathagar.com

যাবে কোন ঠিক নেই। এরা একদিন আবার প্রত্যাবর্তন করবে বলেও আশা করে। সেজন্য তাদের সব হিসাব-নিকাশ এবং সব ধরনের তথ্যসংরক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য তাদের ফেলে আসা বিষয়সম্পত্তি, ব্যাংক একাউন্ট ইত্যাদির বিবরণী লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে। বিমানবন্দরে তাদের খাওয়া, তাদের হাতে কিছু নগদ অর্থ দেয়া, তাদের থাকার জন্য ক্যাম্প তৈরি করা, গ্রামদেশে বা কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে পৌঁছে দেয়াসহ সবকিছুরই ব্যবস্থা করতে হয়েছে আমাদের। আমাদেরকে war footing-এ কাজ করতে হয়েছে। যেহেতু সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থা এর সাথে জড়িত ছিল তাই এদের কাজের মধ্যে সমন্বয় করাটা ছিল সবচেয়ে বড় ও কঠিন কাজ। সময়সূচি অনুযায়ী সকল বাংলাদেশীর নিরাপদে প্রত্যাবর্তন সফলতার সাথে সম্পন্ন করা হয়। প্রত্যাগতদের জন্য দেশের মানুষের অনেক সহানুভূতি থাকায় সকলেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এই বিরাট গুরুদায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হই। ব্যক্তিগতভাবেও এটি আমার জন্য ছিল একটা মূল্যবান অভিজ্ঞতা।

বিনিয়োগ বোর্ড

বিরাষ্ট্রীয়করণের সাথে সাথে আমি দেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য অনেক কাজ করি। দেশী বা বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং একটি স্বচ্ছ নীতিমালার অভাব। বিনিয়োগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা। বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বৃদ্ধি করার জন্য একটি সুদূরপ্রসারী শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়, অল্প কয়েকটি সেক্টর ছাড়া বাকি সবই বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। তখন আমাদের দেশে ছিল বেসরকারি উদ্যোগ এবং পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের প্রারম্ভিক পর্যায়। প্রেসিডেন্ট জিয়ার শুরু করা প্রক্রিয়া তখন আরো জোরদার করা হয়। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের জন্য বিশ্বাস অর্জন করা একটি দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা এবং রাজনীতিবিদ এবং আমলাদের মনমানসিকতার ওপরও নির্ভর করে। এই সবকিছু চিন্তা করে, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহ এবং শিল্পনীতির বাস্তব সুফল নিশ্চিত করার জন্য একটি "one-stop service" বা "one-roof service" concept প্রবর্তন করা হয়। অর্থাৎ কোন বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের প্রস্তাব একবার গৃহীত হলে তাকে যেন আর অন্য কোন অফিস বা সংস্থার দ্বারে যেতে না হয়। Department of Industriesকে বিলুপ্ত করে দিয়ে Board of Investment বা বিনিয়োগ বোর্ড গঠন করা হয়। এইজন্য ১৯৮৯ সালে নতুন আইন করি Investment Board Act 1989। কোন বিনিয়োগের প্রস্তাব বোর্ড কর্তৃক আনুমোদিত হলে সেটা ধরে নেয়া হবে সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন। জমি বরাদ্দ থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ-টেলিফোন সংযোগ পর্যন্ত সরকারি কোন সংস্থার নতুন কোন অনুমোদন লাগবে না। পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা একটি বিরাট পরিবর্তন আনে। আরো লক্ষ্য ছিল যে, Board of Investmentকে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের

www.pathagar.com

আদলে গড়ে তোলা হবে। এটি দক্ষতা এবং সার্ভিসে একটি পেশাগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। যদিও প্রথম দিকে শিল্প দপ্তরের সকল সরকারি কর্মচারীদের নিয়েই বোর্ডকে কাজ চালাতে হবে এবং সেই কারণে অনেক প্রশাসনিক এবং মনমানসিকতার সমস্যা থাকবে, কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি দেশে পুঁজি বিনিয়োগের একটি anchor-sheet হিসেবে কাজ করবে। বিনিয়োগ বোর্ড সৃষ্টির ব্যাপারে এ. কে. এম. মোশারফ হোসেন আর জেনারেল এরশাদ বিশেষ অবদান রাখেন।

বিদেশী বিনিয়োগ

মানুষ পুঁজি বিনিয়োগ করে মুনাফা করার জন্য, লোকসানের জন্য নয়। সে যাচাই বাছাই করেই বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, আর কর্মসংস্থান রোজগার বাড়ায় অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা বাড়ায়, যার ফলে বাজারে পণ্যের চাহিদা বাড়ে এবং চাহিদা বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন কলকারখানা তৈরির ক্ষেত্র তৈরি করে। আমাদের দেশে পুঁজি এবং প্রযুক্তির অভাবের কারণে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ অত্যাবশ্যক। কিন্তু পুঁজি বিনিয়োগের আগে বিনিয়োগকারীরা মুনাফার সম্ভাব্যতা যাচাই করে। বিনিয়োগের পরিবেশ এবং আইনগত কাঠামো পরীক্ষা করে দেখে। বিনিয়োগের নিশ্চয়তা আইনের অধীনে কতটুকু আছে তা দেখতে চায়। তাই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা এবং বিশ্বাস অর্জন করার জন্য আর একটি আইন আগেই প্রেসিডেন্ট জিয়া প্রণয়ন করেছিলেন ১৯৮০ সালে আমারই পরামর্শে। এ সময় সেই আইনটিকে আরো উন্নত করা হয়। এই আইনটি হলো: Foreign Private Investment (Promotion and Protection Act) 1980।

বাংলাদেশ সম্পর্কে বহির্বিশ্বের ধারণা বেশ নেতিবাচক। তারা মনে করে এই দেশ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ; মানুষ গরিব, ক্রয়ক্ষমতা নেই, অনাহারে মানুষ মারা যায়; প্রায় প্রতি বছর প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আর ভয়াল বন্যা হয়। তাই সেই দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ কোথায়? বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিবন্ধকতা ছিল এই image problem। এটা কাটাতেই আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়। তারপর তাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয় সরকারের নীতি এবং আইনগত বিষয়সমূহ। অন্যান্য অনেক অনুন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশে পুঁজি বিনিয়োগের পরিবেশ এবং সুযোগ-সুবিধা অনেক ভাল—এসব কথা তথ্যমূলক দলিল তৈরি করে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হয়। এতে শিল্পনীতি, বিনিয়োগ বোর্ড সৃষ্টি, বিদেশী পুঁজির সংরক্ষণ এবং নিশ্চয়তা বিধান, চট্টগ্রাম এবং ঢাকার রপ্তানি এলাকায় প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা, সবই স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে।

বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য স্বাধীনতার পর ঢাকায় প্রথম একটি সফল আন্তর্জাতিক ইনভেস্টরস ফোরামের আয়োজন করি। তিন দিনব্যাপী এই চমৎকার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কিছুটা উজ্জ্বল করা সম্ভব হয়। জেনারেল এরশাদ ফোরামের উদ্বোধন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় আড়াইশ ব্যবসায়ী এবং পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রতিনিধিরা আমাদের রাজধানীতে আসেন এবং আমাদের

www.pathagar.com

বিনিয়োগকারীদের সাথে তাঁদের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। সেই ফোরামের তিন কার্যদিবসে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিভিন্ন খাতে প্রায় ৪০টি যৌথ উদ্যোগের MOU স্বাক্ষরিত হয়। এসব চুক্তির কতগুলো শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে সেটি বড় কথা নয়, বাংলাদেশের জন্য এই উদ্যোগটি ছিল একটি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক এবং প্রতিশ্রুতিশীল শুভ যাত্রা। এই ফোরাম অনুষ্ঠানের ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে যৌথ কমিটি বা কাউন্সিল বা চেম্বার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। সরকারের এই খোলানীতি আমাদের দেশের উদ্যোক্তাদের মধ্যেও নতুন উদ্দীপনা আনে। আমাদের চেম্বার ফেডারেশন, মেট্রোপলিটন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃবৃন্দরা তখন অত্যন্ত গতিশীল নেতৃত্বের পরিচয় দেন। সর্ব জনাব আবুল কাসেম, হাজী একরাম, মাহবুবুর রহমান, এস. এ. মাহমুদ, লতিফুর রহমান এবং আরো অনেকে তখন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

দেশে বিদেশী পুঁজি আকৃষ্ট করার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সুইজারল্যান্ডের ডেভসে বাংলাদেশের তরফ থেকে প্রথমবারের মত বিশ্ববিখ্যাত ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামে যোগদান করার সুযোগ পাই। এটি ছিল পৃথিবীর উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারক এবং সরকারপ্রধানদের সবচেয়ে সম্মানজক ফোরাম। সেখানে অনেক সরকারপ্রধানদের সাথে সাক্ষাতের এটি ছিল অপূর্ব সুযোগ। এতে যোগ দিয়ে শিল্পায়ন এবং বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য কোন্ দেশ কি ধরনের প্যাকেজ দিচ্ছে এবং কৌশল অবলম্বন করছে তা জানার সৌভাগ্য হয়। দেখলাম, যেসব উন্নয়নশীল দেশ ভাল করছে, সেখানে তাদের কদর আলাদা। তখন একদিকে যেমন ছিল আর্জেন্টিনা আর অপরদিকে ছিল দক্ষিণ কোরিয়া। ক্ষুদ্র অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমার বক্তব্য বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। অনেকে এজন্য ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানান।

আমি আমাদের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন দেশে গিয়েছি, বিভিন্ন বাণিজ্যিক শহরে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সাথে যৌথসভা করেছি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চেম্বারে বক্তৃতা করেছি, মতবিনিময় করেছি। আমেরিকায় US-Bangladesh Business Council প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য লন্ডন, প্যারিস, কলোন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, টোকিও, ব্রাসেলস, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, হিউস্টন, লসএঞ্জেলস, সানফ্রান্সিসকো এমনকি রিয়াদে পর্যন্ত গিয়েছি।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কয়েকজন এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিকরণ

বিরাষ্ট্রীয়করণে আমার উদ্যোগের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার আমাকে খুব পছন্দ করতেন। তাঁর সাথে আমার তিনবার সাক্ষাৎ হয় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে। একবার ১৯৮৮ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে আর দুবার অনানুষ্ঠানিকভাবে। আমি লন্ডনে যখনই গিয়েছি তখনই আমি চাইলে তিনি সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বেসরকারিকরণের একজন মহাপ্রবক্তা। তিনি তখন ব্রিটেনে পানি, বিদ্যুৎসহ সব সেক্টর

www.pathagar.com

ব্যক্তিমালিকানায় দিয়ে দিচ্ছিলেন। কেউ কেউ এমনও বলেন যে, তিনি যদি আর এক মেয়াদ প্রধানমন্ত্রী থাকতেন, তাহলে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড অর্থাৎ ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্তত একটি অংশ ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দিতেন। আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের সাক্ষাতের সময় দেশে আমরা বেসরকারি খাতের জন্য কি করছি তা বলার সময় তিনি একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আমার কেবিনেটে তোমার মত একজন মন্ত্রী থাকলে আমি খুশি হতাম। "I wish I had a Minister like you in my cabinet।" আমিও কূটনৈতিক সৌজন্য রক্ষা করার জন্য বলেছিলাম, "You are very popular in our country. If you wish to contest any election in Bangladesh there will always be a seat for you" অর্থাৎ আপনি আমার দেশে খুব জনপ্রিয়, আপনি যদি কখনো আমাদের দেশে নির্বাচন করতে চান আপনার জন্য সবসময় একটা আসন থাকবে। তিনি ধন্যবাদ দিলেন, আর দুজনে একসাথে হাসলাম। এই সাক্ষাৎকারের সময় প্রধানমন্ত্রী থ্যাচারের সচিব ছাড়াও বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্যার টেরেন্স স্টিটন উপস্থিত ছিলেন। আনুষ্ঠানিক এই সাক্ষাতের জন্য তাঁকে লন্ডনে ডেকে আনা হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর জন্য উপহার হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া নাসরীন করিমের তৈরি পোশাকসামগ্রী একটি টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখা হয় এবং বিদায় নেয়ার সময় আমাকে সেগুলো দেখিয়ে মিসেস থ্যাচার খুব প্রশংসা করেন এবং বলেন, একদিন সেগুলো পরিধান করে দেখবেন, "কেমন লাগে।" সেদিন আলোচনাকালে মিসেস থ্যাচার বলেছিলেন, আমি যেন ইনস্টিটিউট অব ইকনোমিক অ্যাফেয়ার্সে ব্রিটেনের বিরাষ্ট্রীয়করণের বিশেষজ্ঞদের সাথে সাক্ষাৎ করি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণের ব্যাপারে তাঁরা কি করছেন, সেখানে আমি তা জানতে পারব। এই কেন্দ্রটি ছিল মিসেস থ্যাচারের "থিঙ্ক ট্যাঙ্ক", সে এক বিশাল গবেষণাকেন্দ্র। যাঁরা সেখানে কাজ করেন তাঁরা বয়সে ছিলেন অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং মেধাবী। তাঁদের wizards বা জাদুকরও বলা যেতে পারে। অনেকক্ষণ ছিলাম সেখানে। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে অনেক কিছু জানলাম এবং আনন্দ পেলাম।

লন্ডনে অবস্থিত চ্যাথাম হাউস হলো ইংল্যান্ডের আর একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহ্যবাহী গবেষণাকেন্দ্র, একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। এখানে রয়েছে রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স। ইনস্টিটিউট অব ইকনোমিক অ্যাফেয়ার্সের তুলনায় এই প্রতিষ্ঠান আরো সনাতনী এবং এই প্রতিষ্ঠানটি মূলত বৈদেশিক নীতিনির্ধারণ এবং ঐ বিষয়ে দিক্‌নির্দেশনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৮৮ সালের ২৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেদিন আমি বাংলাদেশে "কারেন্ট ট্রেন্ডস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টসে"র ওপর বক্তৃতা দেই। এই বক্তৃতার ওপর দুঘণ্টা আলোচনা চলে। চ্যাথাম হাউসে এর আগে বাংলাদেশের কোন রাজনীতিবিদ বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ পাননি। ৩০ জন নির্ধারিত অতিথিদের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চীনের মহান নেতা দেঙ জিয়াও পিঙয়ের সাথে আমার পরিচয় এবং ঐতিহাসিক সাক্ষাতের কথা আগেই বলেছি। সেটা ছিল প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময়কার কথা। আঞ্চলিক

www.pathagar.com

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট জিয়া চীনের সাথে যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তারই একটি অংশ ছিল সেই সাক্ষাৎকার। সেই ধারাবাহিকতায় চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরো জোরদার হয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময় লিপেঙ্গ চীনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশ সফরে এসে আমাদের গুলশানস্থ বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁর সাথেও আমার একটি ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

ফাঁসোয়া মিতেঁরা ছিলেন ফ্রান্সের একজন মহান মানবতাবাদী, সংবেদনশীল ও উদারপন্থী নেতা। তিনি দলমত নির্বিশেষে ফ্রান্সের গণমানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে এখনো সকল শ্রেণীর মানুষই অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেন। তাঁর সাথে আমার দুবার সাক্ষাৎ হয়। একবার ১৯৮৯ সালে প্যারিসে, আর একবার ১৯৯০ সালে ঢাকায়। আমার সাথে পুত্রের মত স্নেহ করে কথা বলতেন। বাংলাদেশের জন্য তাঁর একটা আলাদা টান ছিল। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এলিসি প্রাসাদে গেলাম। পথে আমার গাড়ির বহর পার করার জন্য সাঁজে লিজের মত বিশাল এবং ব্যস্ততম রাস্তার একটি দিক কয়েক মিনিট বন্ধ রাখা হয়। মিতেঁরার সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলে আগে তাঁর প্রধান সহকারী, জ্যাঁক আতালীর ঘরে বসতে হয়। আমি পৌঁছানোর সাথে সাথে তিনি আমাকে বসতে বললেন এবং আরো জানালেন যে, ভেতরে আর্জেন্টিনার প্রখ্যাত বিরোধীনেতা কার্লোস মেনেম আছেন। একটু সময় লাগছে, কিছু মনে না করতে। ফ্রান্সের এই প্রতিভাবান, অপেক্ষাকৃত তরুণ ও প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদের সাথে নানা বিষয় মতবিনিময় হয়। আলোচনায় জানতে পারি বাজারে জ্যাঁক আতালীর বেশ কয়েকটি বই আছে এবং সেই মুহূর্তে তিনি ইউরোপের ভবিষ্যতের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বই রচনায় ব্যস্ত আছেন।

কয়েক মিনিট পরেই পাশের ঘরের বিরাট দরজা খুলে মিতেঁরা মেনেমকে নিয়ে বেরিয়ে আসলেন। আমার সাথে হাত মিলিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন মেনেমের সাথে, আর বললেন, "ইনি হলেন আর্জেন্টিনার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট।" বুঝতে পারলাম কূটনৈতিক শিষ্টাচারের তোয়াক্কা না করে ফ্রান্স খোলাখুলিভাবে আর্জেন্টিনার বিরোধী দলকে সমর্থন দিচ্ছে। বিষয়টি আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হলো। মেনেম বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমার সাক্ষাতের জন্য সময় নির্ধারণ করা ছিল ৩০ মিনিট, কিন্তু আমরা প্রায় এক ঘণ্টা একসাথে থাকি। সংক্ষেপে আমরা বাংলাদেশে কি করছি তাঁকে জানালাম। এরপর তিনি দ্বিপাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন। ইউরোপকে আরো শক্তিশালী কেন এবং কিভাবে করতে হবে, আমেরিকার ওপর খুব বেশি নির্ভর করা ঠিক হবে না, ইত্যাদি। আমাদের প্রসঙ্গ আসলে তিনি ফ্রান্সকে বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে গণ্য করতে বললেন এবং ইউরোপিয়ান বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর কোন কোটা আরোপ করা হবে না বলে আশ্বস্ত করলেন। মিতেঁরার স্ত্রী ড্যানিয়েলও ফ্রান্সের নামকরা একজন সমাজকর্মী এবং তাঁর নিজের একটি বেসরকারি সংস্থার তিনি প্রধান। ১৯৮৮ সালের ভয়ঙ্কর বন্যার সময় মিতেঁরার স্ত্রী বাংলাদেশে ছিলেন এবং আমাদের দেশের মানুষের মন জয় করেছিলেন।

www.pathagar.com

জ্যাক আতালীকে আমি সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, এত ব্যস্ততার মধ্যে তিনি বই লেখার সময় পান কিভাবে। উত্তরে তিনি বললেন, সময় করে নিতে হয়, 'আমি খুব সকালবেলায় আমার লেখার কাজ করি। ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে তিন-চার মগ কালো কফি পান করি, আর লেখার কাজ করি'। মিতেঁরার বাংলাদেশ সফরের ব্যাপারে জ্যাঁকের সাথে ঢাকায় আরো দুবার আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর সাথে আমার একটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে মিতেঁরার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, জ্যাঁক আতালী লন্ডনে অবস্থিত ইউরোপিয়ান ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। কিন্তু একজন সমাজতান্ত্রিক হিসেবে পরিচিত ব্যক্তি হয়ে নিজের অফিস সাজানোর জন্য ২ কোটি ডলার খরচ করায় অতিশীঘ্রই বিশ্বমিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাছাড়া দেখা গেল যে, জ্যাঁক আতালী তাঁর একটি বইতে নকলের (Palegiarism) আশ্রয় নিয়েছিলেন। এইসব কেলেঙ্কারিতে জড়িত হয়ে জ্যাঁক আতালীকে শেষ পর্যন্ত ব্যাংক ছেড়ে দিতে হয়। তবে ভোরবেলায় উঠে বই লেখার কথাটা আমি ভুলিনি। তখন থেকে আমার লেখাপড়ার সমস্ত কাজ আমি ভোরবেলাতেই করি, এখন এটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। শুধু কফি পান করি না, অভ্যাস নেই বলে।

অপরদিকে আর্জেন্টিনার নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে কার্লোস মেনেম সে দেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হন। মিতেঁরার কথাই সত্য হয়। কিন্তু দুতিন বছরের মধ্যে ভাইয়ের ব্যবসায়িক কেলেঙ্কারির কারণে মেনেম আর দ্বিতীয়বার জয়লাভ করতে পারেননি।

ফ্রান্সের আর একজন নেতা, মিতেঁরা সরকারের Minister for Humanitarian Affairs ডক্টর বার্নাড ক্রুসনা ছিলেন তাঁর দেশের একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। সকলেই তাঁকে চেনে। একজন স্বনামধন্য সমাজসেবক। অত্যন্ত মননশীল একজন মানুষ। এমন মানুষ আছেন যাঁদের সাথে কথা বললেই ভাল লাগে, বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, বার্নাড সেরকমেরই একজন মানুষ। ঐ একই সফরের সময় বার্নাডের সঙ্গে পরিচয় হয়। প্যারিসের হোটেল ক্রিয়'তে প্রিন্স করিম আগা খান আর বার্নাড ক্রুসনাকে সস্ত্রীক এক ঘরোয়া ডিনারে দাওয়াত করি। তোজাম্মেল হক তখন ফ্রান্সে আমাদের রাষ্ট্রদূত। আগের দিন সকালেই প্রিন্স আগা খানের সাথে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারি যে, বার্নাডের স্ত্রী মারিয়া ফ্রান্স টেলিভিশনের একজন প্রখ্যাত অ্যাঙ্কর পার্সন। তাঁর বার্ষিক রোজগার ফ্রান্সের যে কোন ব্যক্তির চেয়ে বেশি। মারিয়া তখন পেশাগত কাজে আলজেরিয়ায়, আর আগা খানের স্ত্রী থাকেন সুইজারল্যান্ডে। কিন্তু আনন্দের বিষয় হলো আমার ডিনারে উপস্থিত হওয়ার জন্য দুজনেই প্যারিস ফিরে আসেন।

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর আমি তখন বিরোধী দলের একজন পার্লামেন্ট সদস্য। বার্নাড মন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর সফরসূচির বাইরে সরকারি প্রটোকল ভেঙে আমাদের সাথে গুলশানের বাসস্থানে দেখা করে যান। আমি কথাটা তোলাতে বলেন, "একজন বন্ধুর সাথে দেখা করতে কোন বাধা থাকতে পারে না।" এরপর বার্নাডের সাথে আর একবার দেখা হয়েছিল অক্সফোর্ডে।

www.pathagar.com

১৯৮৮ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ব্রাসেলসে এক বিরাট ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল নিয়ে গিয়েছিলাম। বেলজিয়াম সরকার এই সফরকে একটি সরকারি সফর হিসেবে গণ্য করে অনেক আতিথেয়তার ব্যবস্থা করে। সেবার ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্টের সাথে খুবই অর্থপূর্ণ আলোচনা হয়। তিনি আমাদের পোশাক রপ্তানির জন্য ইউরোপীয় বাজার কোটামুক্ত রাখার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বেলজিয়াম সরকার পরিবারসহ আমাকে সরকারপ্রধানদের মত রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে থাকার ব্যবস্থা করে। বেলজিয়াম প্রধানমন্ত্রী Mr. Wilfred Martens-এর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক ছিল এবং রাতে তিনি মনোমুগ্ধকর পরিবেশে আমার সম্মানে এক বিরাট ব্যাঙ্কোয়েট দেন। সেই সফরে ফ্রান্সের প্যারিসের মত ব্রাসেলসেও আমার যাতায়াতের সময় মোটর সাইকেলের বহর দিয়ে অন্যান্য যানবাহন বন্ধ করে আমার যাত্রা নিশ্চিত করা হয়েছিল। সেখানে অবস্থানকালে এক দিনব্যাপী একটি অত্যন্ত সফল যৌথ বিনিয়োগ সভায় আমি সভাপতিত্ব করি।

১৯৮৮ সালে কানাডার ভ্যানকুভার শহরে অনুষ্ঠিত হয় কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানদের সম্মেলন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ যোগদান করতে যাবেন সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেবার প্রথমবারের মত তাঁর ডেলিগেশনে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করলেন, আমি আবার তখন প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী একইসাথে ভ্রমণ এবং দেশের বাইরে থাকা সাধারণত ঘটে না। যাই হোক আমাকে সাথে নেয়ার একমাত্র কারণ ছিল কানাডিয়ান সরকার সেই সম্মেলন চলাকালীন সময় বাংলাদেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য একটি যৌথ বিনিয়োগ সভার আয়োজন করেছিল, যার উদ্বোধন করবেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মালরোনি এবং উপস্থিত থাকবেন আমাদের প্রেসিডেন্ট। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য আমাকে নেয়া হয়। বিনিয়োগ সভায় কানাডার প্রধানমন্ত্রী খুব উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য রাখেন এবং আমি বাংলাদেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের নীতি এবং বিভিন্ন সুবিধাদিসহ গৃহীত পদক্ষেপসমূহের একটা বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করি। এই সভার পর বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে কানাডার বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সহায়ক ক্ষেত্র তৈরি হয়।

১৯৮৯ সালের প্রথমার্ধে আমি ওয়াশিংটনে গেলাম সেখানকার নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে মতবিনিময় করার জন্য। এছাড়াও ছিল বাংলাদেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য গঠিত US-Bangladesh Business Council-এর প্রথম আনুষ্ঠানিক সভায় বক্তৃতা দেয়ার কর্মসূচি। আমেরিকার ব্যবসায়ী ফেডারেশন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দরা অনেক উৎসাহ নিয়ে আমার কথা শুনেছেন। তাঁদের কাছে ব্যবসায়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের কোন গুরুত্ব ছিল না বললেই চলে। অনেকের কাছে বাংলাদেশ একেবারেই অচেনা। আর যাঁরা বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু জানেন তাঁরা শুধু নেতিবাচক দিকের সাথেই পরিচিত। আমাদের যে অনেক ভাল দিক আছে সে ব্যাপারে তাঁরা একেবারেই অবহিত নন। বাংলাদেশ সম্পর্কে একই ধরনের অজ্ঞতা বিরাজ করে সে দেশের বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত মহলে। হাওয়ার্ড সেফার ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের একজন সফল রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি তখন কারনেগী

www.pathagar.com

ফাউন্ডেশনে ছিলেন। জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিরাট হলরুমে তিনি ছাত্র-শিক্ষকদের এক সভায় "দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের ভূমিকার" ওপর বক্তৃতা দেয়ার জন্য ব্যবস্থা করেন। প্রশ্নোত্তরের সময় অনেক কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, তাঁদেরকে বাংলাদেশ সম্পর্কে নানা কথা বুঝিয়ে বলেছি। ওয়াশিংটনের প্রসিদ্ধ হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে "বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের ভবিষ্যৎ"-এর ওপর সেমিনারে বক্তৃতা করি। ফাউন্ডেশনটি একটি রক্ষণশীলদের গবেষণাকেন্দ্র। উন্নয়নশীল দেশসমূহ সম্পর্কে তাঁরা অনেক কিছুই জানেন এবং তারপরও আরো জানার জন্য তাঁদের আগ্রহের ঘাটতি ছিল না।

যুক্তরাষ্ট্র সফরে আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী, যার পদবি হলো সেক্রেটারি অব স্টেট, জেমস বেকারের সাথে। রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রেসিডেন্টের পরই তাঁর স্থান। নির্ধারিত সময় আমাদের রাষ্ট্রদূত আতাউল করিমসহ আমরা স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান ফটকের গাড়ি বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। গাড়ি থেকে নামতে যাব এমন সময় একজন গার্ড কিছু বলতে চাইলে রাষ্ট্রদূত জানালা নামালে গার্ড আমাদের গাড়িতেই অপেক্ষা করতে বলে জানায় যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং আমাকে অভ্যর্থনা (receive) করতে আসছেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জেমস বেকার এসে গাড়ির দরজা খুলে আমাকে সহাস্যে বললেন, 'welcome'। তারপর ছবি তোলা হলো। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন সাত তলায় তাঁর দফতরে। খুবই পেশাদারি মানুষ, highly articulated, বলতে গেলে সারা পৃথিবীর বোঝা তাঁর ঘাড়ের ওপর, অথচ দেখে মনে হয় না যে, সেজন্য তাঁর কোন টেনশন আছে। একেবারে relaxed। ছোট একটি সভাকক্ষে মুখোমুখি ৪৫ মিনিটের সভা। শুনতে চাইলেন আমরা কি করছি। বিরাষ্ট্রীয়করণ এবং বিদেশী বিনিয়োগের ব্যাপারে আমাদের কর্মসূচি জানালাম। এইক্ষেত্রে তাঁরা মোটামুটি খুশি হলেন, কিন্তু কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করার ওপর জোর দিলেন। উপমহাদেশে ভারতের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যাগুলোর সমাধান তাঁরা দেখতে চান। যদিও পাকিস্তানকে তাঁরা পুরোনো বন্ধু হিসেবে মূল্য দেন, কিন্তু কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন। বিদায় নেয়ার আগে আমার মঙ্গল কামনা করে বললেন, তোমাদের সামনে যে উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ রয়েছে সে ব্যাপারে মার্কিন সরকার সহযোগিতা আরো জোরদার করবে। গাড়িতে ওঠার আগে নিচের লবিতে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা জানালেন যে, জেমস বেকার আগে কখনো অনুন্নত দেশের কোন প্রধানমন্ত্রীকে এইভাবে নিজে এসে সম্বর্ধনা জানাননি। আমাকে নাকি তিনি এই বিশেষ সম্মান দেখিয়েছেন। কিন্তু কি কারণে তা আজও আমার কাছে অজানা রয়ে গেছে। তবে ঘটনাটি চিন্তা করলে মনে মনে এখনো গৌরব বোধ করি।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট একইসাথে জনগণের ভোটে রানিংমেট হিসেবে নির্বাচিত হন। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের কাছে। ভাইস প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট নির্ধারণ করে দেন। তবে তাই বলে তাঁর যে কোন গুরুত্ব নেই তা নয়। যে কোন সময় প্রেসিডেন্টের পদে তাঁকে step in করতে

হতে পারে। ১৯৬১ সালে নির্বাচিত হওয়ার মাত্র দুবছরের মাথায় প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি যখন আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন তখন তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন সেই ডালাসের বিমানবন্দরেই উড়োজাহাজের মধ্যে বাকি দুবছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় পরবর্তী নির্বাচনে লিন্ডন জনসন আরো চার বছর প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ওয়াটার গেইট কেলেঙ্কারিতে সত্য কথা গোপন রাখা এবং মিথ্যা কথা বলার জন্য ১৯৭৪ সালে রিচার্ড নিক্সনকে যখন পদত্যাগ করতে হয় তখন তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড বাকি তিন বছরের জন্য প্রেসিডেন্টের শপথ নিয়ে রাষ্ট্র চালিয়েছেন। কিন্তু জেরাল্ড ফোর্ড দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হতে পারেননি। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটদের প্রার্থী জিমি কার্টার ফোর্ডকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তাই দেখা যায় যে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করলে প্রেসিডেন্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে ভাইস প্রেসিডেন্টের জন্য পরবর্তী নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

আমার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল ভাইস প্রেসিডেন্ট জেমস ড্যানফোর্থ কোয়েলের সঙ্গে। তাঁর দফতরটি হোয়াইট হাউসের আঙিনায় আলাদা একটি অংশে অবস্থিত। যদিও তিনি এর আগে ১৯৮০ এবং ১৯৮৬ সালে দুবার সিনেটর নির্বাচিত হয়েছিলেন, তারপরও তাঁকে কেউ একজন সিরিয়াস রাজনীতিবিদ হিসেবে বিবেচনা করেন না। উপরন্তু তাঁর সম্পর্কে আমেরিকায় অনেক মুখরোচক গল্প আছে। তাঁর ব্যাপারে মিডিয়া একেবারেই বিরূপ ছিল, তাঁর সম্পর্কে কেউ কখনো ভাল কথা লিখত না। যদিও তিনি পেশায় একজন আইনজীবী ছিলেন, কিন্তু আসলে লেখাপড়ায় নাকি গোল্লা ছিলেন। লোকশ্রুতি ছিল যে, তিনি ধনী পরিবারের সদস্য হওয়ার সুবাদে টাকা দিয়ে শিক্ষা ক্রয় করেছেন। একবার নাকি পটেটো বানান ভুল লিখেছিলেন। সেই থেকে তাঁর কপাল মন্দ। তাঁকে ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত করার জন্য জর্জ বুশকেই সকলে দায়ী করে। প্রেসিডেন্ট নাকি ঘরোয়াভাবে এইজন্য অনুশোচনাও করেন। কিন্তু তাঁকে আমার খুব Impressive মনে হয়েছিল। বেশভূষা, কথাবার্তায় খুব আকর্ষণীয়, দেখতেও স্মার্ট। আমাদের আলোচনাও খুব ভাল হয়েছিল। নিজের সই করা পরিবারের একটি ছবিও দেন। আমি যখন বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে বললাম, তাঁকে আমার খুব ভাল লেগেছে, শুনে আমার আমেরিকান সাথীরা অবাক হলেন, হাসলেন, অনেকে বললেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং।

এরপর বৈঠক হয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার পরিচালকের সাথে। তাঁর অফিসও হোয়াইট হাউসে। ওয়াশিংটনের বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হোটেলে আমার সাথে পালা করে সাক্ষাৎ করেছেন। মোটামুটি যুক্তরাষ্ট্রে আমার সফর সফল হয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছিল।

এছাড়াও আমি বিভিন্ন সময় চীনের ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভারতের রাজস্থানে অবস্থিত ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজে, হাইডেলবার্গ, লন্ডন, অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড এবং হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক সমাবেশে ও সেমিনারে বাংলাদেশের

www.pathagar.com

ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এসব পরিশ্রম এবং উদ্যোগের ফলে বিনিয়োগ হয়তো প্রথম পর্যায়ে তাৎক্ষণিকভাবে তেমন হয়নি, তবে এইসব প্রচেষ্টা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করেছে এবং নিঃসন্দেহে বিনিয়োগের জন্য একটি সহায়ক ক্ষেত্র তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

পেশায় আইনজীবী

রাজনীতি, বিদেশে লেখাপড়া এবং কারাগারে থাকার কারণে আমার পেশাগত জীবন বার বার ব্যাহত হয়েছে, যার ফলে আমার রোজগারও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পেশাগত আয় আমার আয়ের মূল সূত্র। যা কিছু বিষয়সম্পত্তি আছে সবই এই পেশাগত আয়ের মাধ্যমে অর্জিত। একটি বাড়ি যা আগা খানের আইনজীবী হিসেবে ১৯৭৫-৭৬ সালের এক বছরে অর্জিত ফিস দিয়ে তৈরি, তার ভাড়া ছাড়া আমার বা আমার স্ত্রীর আয়ের আর কোন উৎস নেই। আমাদের দুজনের প্রকাশিত বইগুলো থেকে যে রয়্যালটি পাই তা অতি সামান্য, আমার অংশটা আমি আবার দান করে দেই। আমাদের অন্য কোন ব্যবসা-বাণিজ্য নেই। আমরা কোন প্রতিষ্ঠানে কোন Sleeping partner'ও নই। কোনভাবে কোথাও আমাদের কোন ব্যবসায়িক স্বার্থ নেই। যদিও এ ধরনের অনেক offer পেয়েছি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, কিন্তু সেটা গ্রহণ করিনি। অগণিত মানুষকে ব্যবসায় সাহায্য করেছি, কিন্তু নিজেদেরকে কোন ব্যবসায় জড়িত করিনি। এই চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্যই সাহসের সাথে কাজ করতে পেরেছি এবং অন্যদের সাহায্য করা সম্ভব হয়েছে। আমার মতে, নিজের বা পরিবারের যদি ব্যবসা থাকে তাহলে সেই ব্যক্তিকে, বিশেষ করে অনুন্নত দেশে, মন্ত্রী নিযুক্ত করা ঠিক নয়, কারণ সেইক্ষেত্রে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয় না।

১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরার তিন মাস পরই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত ঘটে এবং সেই মামলা চলে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পেশাগত আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছি ১৩ মাস ঠিকই, কিন্তু বিনা পয়সায়। গণঅভ্যুত্থানের পর গোলটেবিল বৈঠক, তারপর নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ, বলা যেতে পারে এই সবকিছুর ফাঁকে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বছর দুয়েক হয়তো প্র্যাকটিস করা সম্ভব হয়েছে। স্বাধীনতার পর প্রায় তিন বছর পেশার কাজ করা সম্ভব হয়েছে। তারপর ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হলাম। মার্চ মাস পর্যন্ত প্রায় তিন মাস গেল জেলে। মুক্তি পেয়ে প্রায় দেড় বছর প্র্যাকটিসের পর ১৯৭৬ সালে চলে গেলাম হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলোশীপ নিয়ে। ফিরেছি ডিসেম্বর মাসে। ৯ মাস প্র্যাকটিসের পর ১৯৭৭ সালে প্রথমে গেলাম সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে। ফিরে এসেই ২৯ ডিসেম্বর যোগদান করলাম প্রেসিডেন্ট জিয়ার সরকারে। দুবছর মন্ত্রিসভায় থাকার পর প্রায় আড়াই বছর আবার প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাই, যদিও এর মধ্যে হাইডেলবার্গ এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশীপে দু দফা মোট প্রায় আট মাস বাইরে থাকি।

www.pathagar.com

সুতরাং ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফিরে আসার পর প্রথম ১৮ বছরে আমি কখনো তিন বছরের বেশি একটানা আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাইনি। বার বার সেটা ব্যাহত হয়েছে বিভিন্ন কারণে। এই সময়ের মধ্যে জেলখানায় কেটেছে প্রায় মোট ১১ মাস, মুক্তিযুদ্ধে ৯ মাস, মন্ত্রী ছিলাম দুবছর, বিদেশে ফেলোশীপে ছিলাম তিনবার মোট ১২ মাসের জন্য। তারপরও বলব প্র্যাকটিসে প্রসার ছিল অনেক। ল' ফার্ম হিসেবে আইন অঙ্গনে একটা সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়েছিলাম।

আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সহজ কাজ নয়। একসময় একমাত্র বিত্তশালী বা জমিদার পরিবারের সন্তানরাই আইনজীবী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারতেন। ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য বিলেতে গিয়ে লেখাপড়ার সামর্থ্য অন্যদের থাকারও কথা নয়। মধ্যবিত্তের জন্য বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাস করা ছিল একটি স্বপ্ন। তারপরও নিজের জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য, নিজের উদ্যমে, আমার মত আরো বেশ কিছু ছাত্র তখন লেখাপড়া করার জন্য এই ধরনের ঝুঁকি বা উদ্যোগ নেয়া শুরু করে। যে সকল ছাত্রের অভিভাবক লেখাপড়ার খরচ বহন করতে পারেননি তাদের প্রায় সকলকেই কায়িক শ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকা-খাওয়া এবং লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে। আমাদের মধ্যে যাদের ব্যারিস্টারি পড়ার খরচ অভিভাবকরা বহন করেছেন তারা ছিল অবশ্যই ভাগ্যবান, কিন্তু আমার সেই সৌভাগ্য হয়নি। তবে আগেই বলেছি আমাকে কোন কায়িক শ্রম করতে হয়নি, বরং বেশ সৌভাগ্যবান ছিলাম, ধনী স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি পাওয়ার কারণে। এমনকি নিজেকে কোনদিন রান্না করে খেতে হয়নি।

দেশে ফিরে আসার পর ব্যারিস্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। আমার ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল আরো কঠিন। বাবা ছিলেন একজন শিক্ষক। পরিবার বা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কোন বিত্তশালী ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী ছিলেন না। প্রাথমিক পর্যায় অন্তত দুতিন বছর যে পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন পড়ে তা ছিল না বললেই চলে। অনেকে উকিল বা জজ বা কোন ধনী পরিবারে বিয়ে করে এই সমস্যার সমাধান করে। আমিও পারতাম, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মনমানসিকতার জন্য তা সম্ভব হয়নি। বরাবরই আমি একজন স্বাধীনচেতা মানুষ, ঐ ধরনের পথ বেছে নিতে আমার মন চায়নি। আগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তারপর বিয়ে করব—এটিই ছিল পরিকল্পনা। তাই নিজের উদ্যম, আত্মপ্রত্যয় আর কঠোর পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে বেশি। আর তার সাথে ছিল ভাগ্য, আন্তরিকতা এবং পেশাগত সততা। ঢাকায় বাবা-মা, ভাইবোন এবং কায়েতটুলীতে নিজেদের বাড়ি ছিল। তাই অন্তত খাওয়া-থাকার কোন অসুবিধা ছিল না। প্রথমে বাড়ির একটি কামরায় চেম্বার করলাম। কিছু কিছু মামলায় জুনিয়র হিসেবে খবরের কাগজে নাম বের হওয়া শুরু হলো। ওদিকে আবার বহুল প্রচারিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাও শুরু হয়েছে। চট্টগ্রামের স্টিল রিরোলিংয়ের মালিক বোরা সম্প্রদায়ের মহম্মদ ভাই হাইকোর্টের একটি মামলা নিয়ে এলেন আমার এক আত্মীয়ের রেফারেন্সে এবং ফি বাবদে চার হাজার টাকা দেন। তখনকার সময়ে চার

www.pathagar.com

হাজার টাকা অনেক। এই একই সময় যার সাহায্যে বলা যায় আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হয়, তিনি হলেন জনাব আব্দুর রশীদ, সম্পর্কে আমার মামা হন। তিনি তখন বাঙালিদের মধ্যে প্রথম কাতারের একজন সিভিল সার্ভেন্ট, কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ সচিব। একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, ক্ষমতাবান, যোগ্য এবং দক্ষ ব্যক্তি। বাঙালিদের জন্য তাঁর অনেক দরদ ছিল। তিনি একবার ঢাকায় এলে আমি দেখা করি। তিনি তখন পদাধিকারবলে শত্রু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ডের চেয়ারম্যান। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর দুটো দেশই নিজ নিজ দেশে অবস্থিত অপর দেশের নাগরিকদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। এইসব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার জন্য গঠন করা হয় এনিমি প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট বোর্ড, কাকরাইলের একটি বাড়িতে এই বোর্ডের কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত ছিল। এই সংস্থায় আইনগত অনেক কাজ এবং মামলা পরিচালনা করার প্রশ্ন জড়িত ছিল। মাসিক একটি সুনির্দিষ্ট অঙ্কের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে তিনজন আইনজীবী নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। মামা পেশাগত কাজে দক্ষতা অর্জন করার জন্য আমাকে একটি ল' ফার্ম গঠন করার জন্য পরামর্শ দিলেন। তখন আমি আর আমীরুল ইসলাম মতিঝিলের টেক্সটবুক বোর্ড ভবনে ল' কনসালটেন্টস নামে আমাদের ল' ফার্ম প্রতিষ্ঠা করি। মামা তখন আমাকে নিজের নামে না দিয়ে আমাদের ল' ফার্মকে মাসিক ৫০০ টাকা পারিশ্রমিকে উপরোক্ত বোর্ডের রিটেইনার হিসেবে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করেন। মামা একবার এই চেম্বার দেখতেও আসেন। এই বোর্ডের অনেক মামলা ছিল সুপ্রিমকোর্টে এবং পেশার প্রথম পর্যায় রশীদ মামার এই অবদান আমি সবসময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

স্বাধীনতার পর স্বাভাবিকভাবেই একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে এসে নতুন আর একটি সার্বভৌম দেশ গঠনের প্রেক্ষাপটে আইনজীবী হিসেবে পেশাগত কাজের অনেক সুযোগ এবং সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। যেহেতু আমি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলাম না এবং কোন রাজনৈতিক বা সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম না, আমি তখন পুরোপুরিভাবে পেশায় মনোনিবেশ করার সুযোগ পাই। কিন্তু একটি কাজ করলাম। নিজের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধে আমার বিশেষ ভূমিকার প্রেক্ষাপটে অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকার বা সরকারি কোন সংস্থার কোন পেশাগত কাজ গ্রহণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম। অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্টরের মক্কেলদের ওপর নির্ভর করে প্র্যাকটিস জোরদার করলাম। প্রথমে আসে যেসব বহুজাতিক কোম্পানি পাকিস্তানে নিবন্ধীকৃত ছিল অথচ অফিস বা কারখানা ছিল বাংলাদেশে, তাদের re-capitalise করে নতুন করে নিবন্ধীকরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ টোবাকো, রঙ প্রস্তুতকারী বার্জার, ওষুধ প্রস্তুতকারী ফাইসন্স, জার্মানির ওষুধ কোম্পানি হয়েক্সট, পাম্প প্রস্তুতকারী কেএসবি এবং এ ধরনের আরো বেশ কিছু কোম্পানির কাজ হাতে আসে। জাতীয়করণের ফলে অনেক বিদেশী বহুজাতিক বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের সম্পদ পুনরুদ্ধার করা অথবা সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার কাজ ছিল অনেক। প্রিন্স করিম আগা খানের

www.pathagar.com

আমি ব্যক্তিগত আইনজীবী নিযুক্ত হই, বিভিন্ন সংস্থায়, বিশেষ করে তিনটি জুট মিলে তাঁর শেয়ার-স্বার্থরক্ষা করার জন্য। র‍্যালি ব্রাদার্স, ডানকান ব্রাদার্স, জেনারেল মোটরস, সিটি ব্যাংক, কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (সিডিআই), মার্ক শার্প অ্যান্ড ডোম (এমএসডি)—এদের জন্যও একই ধরনের কাজ ছিল। স্কানসকা, মিটসুই ওভাইশি এবং আরো কিছু কোম্পানির সরকারের কাছে অনেক পাওনা ছিল। স্কানসকা পূর্ব পাকিস্তানে চারটি আধুনিক সাইলো তৈরি করেছিল, মিটসুই ওভাইশি শীতলক্ষা ব্রীজ তৈরি করেছিল। আমি পাকিস্তান আমল থেকেই তাদের আইনজীবী ছিলাম। এছাড়া ছিল নানা ধরনের নতুন-পুরোনো বিদেশী বাণিজ্যিক কোম্পানির কাজ। বিশেষ করে সুমিতোমো, নিপ্পন, মিতসুবিসির মত আরো আধাডজন জাপানি কোম্পানির কাজ। ১৯৭৪ সালে এলো নতুন তেল কোম্পানি আমেরিকার আরকো, কানাডিয়ান সুপিরিয়র, জাপানের বিওডিসি এবং ইউগোশ্লাভিয়ার ইনা ন্যাফতালিন। এ ধরনের আরো অনেকগুলো বিদেশী কোম্পানির আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছি আমরা। এইসব কোম্পানির কাজের জন্য বিদেশেও যেতে হয়েছে অনেকবার। ১৯৭২-৭৭ সালের মধ্যে আগা খানের জন্য একবার প্যারিসে এবং একবার সুইজারল্যান্ডে; ফাইসন্স, সিডিসি, র‍্যালির জন্য লন্ডনে অনেকবার; সিটি ব্যাংক, জিএম এবং এমএসডির জন্য নিউ ইয়র্কে এবং হয়েক্সট ও কেএসবির জন্য জার্মানিতে কয়েকবার যেতে হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে ফেলে যাওয়া, বিশেষ করে পাকিস্তানী নাগরিকদের বিষয়সম্পত্তি সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং মালিকানায় আনার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইন (Abandoned Property Order) জারি করা হলো। সরকার কর্তৃক এই আইনের অপব্যবহার আইনজীবীদের জন্য ছিল একটি bonanza। এই আইনের অধীনে শত শত বাড়ি-ঘর, জমি, কলকারখানা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে সরকার তার নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং সেগুলো পরিচালনার জন্য প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দলীয় লোকদের কাছে হস্তান্তর করে। রীতিমত লুটপাট চলে, সে এক নৈরাজ্যকর অবস্থা। উর্দুভাষী অবাঙালিদের, এমনকি অনেক বাঙালির, যাঁরা কোন কারণে হয়তো দেশে ছিলেন না, তাঁদের প্রায় সকলের সম্পত্তির ক্ষেত্রে সরকার এই আইন প্রয়োগ করা শুরু করে। অথচ এদের প্রায় সকলেই ছিলেন আইনানুযায়ী বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা এবং নাগরিক। আগা খান সম্প্রদায়ের প্রায় সকলের এবং অবাঙালি বাংলাদেশীদের একটা বিরাট অংশের জন্য আমি হাইকোর্টে কয়েকশত রিট ফাইল করেছি এবং তাদের সম্পত্তি রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। এসব অনেক মামলা বিভিন্ন পত্রিকা এবং ঢাকা ল' রিপোর্টে (ডিএলআর) ছাপানো হয়েছিল। এসবের ফলে আইনজীবী হিসেবে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

তবে আইনজীবী হিসেবে আমার নৈতিক দিকটা আমি অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছি। সততা এবং আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছি, এ ব্যাপারে আপোস করিনি। বিত্তবান মক্কেল এবং অনেক অর্থ উপার্জনের দিকেই কেবল মনোনিবেশ করিনি সাথে সাথে সমাজের প্রতি আমার কমিটমেন্টকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছি। ফিস

www.pathagar.com

দিতে অসামর্থ্য বলে কোনদিন কোন গরিব মানুষের ব্রিফ বা মামলা আমি ফিরিয়ে দেইনি। উপরন্তু আমার প্র্যাকটিসের অন্তত ৩০ ভাগ ছিল হয় মানবাধিকার সংক্রান্ত মামলা, না হয় উপায়হীন দরিদ্র মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য মামলা। এসবের বেশিরভাগ বিনা পয়সার মামলা। অনেক সময় মামলার খরচই শুধু বহন করিনি, মক্কেলদের ব্যক্তিগত খরচও দিয়েছি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছাড়াও অগণিত রাজনৈতিক মামলা আমি পরিচালনা করেছি। শেখ মুজিবের শাসনামলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে জাসদ এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় হাজারখানেক নেতাকর্মীর জন্য রিট ফাইল করে সুপ্রিমকোর্টের মাধ্যমে তাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছি। এটি হলো আমার পেশাগত জীবনের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার একটি অন্যতম দিক। এই কাজে আমি কখনো ক্লান্ত বোধ করিনি বরং এই কাজ সবসময় আমার মনকে এক অনাবিল তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। আমার মূল আয় হয়তো কমে যায়, কিন্তু মনের মধ্যে যে গভীর প্রশান্তি অনুভব করি তুলনায় তার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। টাকাই জীবনের সবকিছু নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা বহু দিন যাবৎ আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছে। এই অঞ্চলে উপজাতীয়দর স্বশাসনের দাবি সবকটি সরকারের জন্যই ছিল অস্বস্তিকর একটি বিষয়। উপযুক্ত সমাধানের অভাবে ঐ এলাকায় দেখা দিয়েছে সশস্ত্র বিদ্রোহ, সংঘর্ষ, প্রতিহিংসা, সামরিক হস্তক্ষেপ। ব্যাপক হারে উপজাতীয়দের ভারতে পলায়নের ঘটনা ঘটেছে। আবার সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক উপজাতীয় বাংলাদেশ ভূখণ্ডে পুনঃপ্রবেশ করে হামলা চালিয়েছে। এই অঞ্চলের জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্টের কারণে বছরের পর বছর ধরে সরকারের চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এইসব হামলা সেখানে বহু সামরিক ও বেসামরিক জনগণের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। কিন্তু তাতে কেউ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি, সমস্যা দিনে দিনে জটিল ও স্থায়ী আকার ধারণ করেছে।

জনগণের মধ্যে একক বাঙালি জাতির জাতীয় সংহতির সমস্বত্বতা স্থাপনের অভিপ্রায়ে মুজিব সরকার গৃহীত নিম্নাঞ্চলের জনগণের জন্য পাহাড়ি এলাকায় বসতিস্থাপনের কর্মসূচি কেবল ভ্রান্তই নয়, পরবর্তীকালে বিপজ্জনক প্রতিপন্ন হয়। পাহাড়ি এলাকায় প্রায় পাঁচ লাখ উপজাতীয় জনগোষ্ঠী শতাব্দীকাল ধরে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করে আসছিল। তাদের এলাকায় বর্ধিত হারে অস্থানীয় বাঙালিদের বসতিস্থাপনের ফলে তাদের স্বাভাবিক জীবন-জীবিকা ব্যাহত হয় ও জাতিগত স্বার্থ বিঘ্নের সম্মুখীন হয়। সে কারণে তাদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত একটি রাষ্ট্রের দাবি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা বাঙালি জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ তাদের বিবেচনায় এসবই ছিল বহিরাগত। এবং এজন্য তারা ১৯৭২ সালের সংবিধানের বর্ণনা অনুযায়ী নিজেদেরকে 'বাঙালি' বিবেচনা করতে কোনভাবেই সম্মত ছিল না। বস্তুত নিম্নাঞ্চল

www.pathagar.com

থেকে আগত প্রায় পাঁচ লক্ষ বসতিস্থাপনকারীরা উপজাতীয়দের ঐতিহ্যময় জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছিল এবং তাদের বহুকালের ঐতিহ্যমণ্ডিত চাষাবাদ—জুম চাষ ধ্বংস করে ফেলছিল। বসতিস্থাপনকারীদের এ সময় উপজাতীয়দের মালিকানাধীন জমি ব্যাপকভাবে বরাদ্দ দিয়ে তাদের আবাসভূমি থেকে উৎখাত করা হচ্ছিল এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক গৌরবকে অবহেলা ও তাচ্ছিল্য করা হচ্ছিল।

শুরুতে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে উপজাতীয়রা প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় কতিপয় উচ্চাভিলাষী ও রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ উপজাতীয় নেতা গেরিলা গ্রুপ গঠন করে ও বিভিন্ন নামে জোট গঠন করে। অতঃপর 'জনসংহতি' নামে একটি বৃহত্তর সমিতি গঠন করে তারা তার অধীনে 'শান্তিবাহিনী' নামে একটি সশস্ত্র গ্রুপ তৈরি করে এবং বসতিস্থাপনকারীদের ওপর নির্বিচারে হত্যালীলা শুরু করে দেয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তখন ঐ বিদ্রোহীদের দমন করে বসতিস্থাপনকারীদের রক্ষা করতে এগিয়ে এলে দুই পক্ষের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বসতিস্থাপনকারীদের সেনাবাহিনীর প্রহরাধীনে চিহ্নিত ক্যাম্পসমূহে পুনর্বাসিত করা হয় এবং কতিপয় গেরিলা গ্রুপ শরণার্থী রূপে আশ্রয় এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশে সীমানা অতিক্রম করে ভারতে চলে যায়।

এই গোলোযোগ ও অব্যাহত অশান্তির কারণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি ১৩ হাজার বর্গকিলোমিটারব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রামকে সেনাবাহিনীর অধীনে আনা হয় এবং বিদেশী পর্যটক ও অন্যান্য সকলের সেখানে যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ফলে বাঙালিদের বসতিস্থাপনের মাধ্যমে "একক বাঙালি জাতি" সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য অচিরেই ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। তখন থেকে বসতিস্থাপনকারীরা বাস করতে থাকে প্রহরাধীন বিভিন্ন ক্যাম্পে, তাদের জীবনযাত্রা ও যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে, চাষের জমির ওপর তারা অধিকার হারায় এবং চরম নিরাপত্তাহীন অবস্থায় তারা সম্পূর্ণভাবে সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে জাতীয় সম্পদের ওপর সৃষ্টি হয় এক বাড়তি চাপ। একইভাবে বসতিস্থাপনকারী বা গেরিলাদের দ্বারা উৎখাতকৃত ও ভারত থেকে ফিরে আসা কতিপয় উপজাতীয় শরণার্থী গ্রুপও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রহরাধীন ক্যাম্পসমূহে আশ্রয় নিয়ে সরকারি অনুদানের মাধ্যমে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা চালায়।

এক পর্যায়ে সকলেই এটিকে একটি রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করা শুরু করে। কিন্তু কিভাবে এই সমস্যার সমাধান ঘটানো হবে সেটাই ছিল মূল প্রশ্ন। চট্টগ্রামে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর প্রায় প্রত্যেক অধিনায়ক রাজনৈতিকভাবে সমস্যাটি সমাধানের সুপারিশ করেন। জেনারেল মঞ্জুর পার্বত্য চট্টগ্রামের সেনাপ্রধান হিসেবে তাঁর পক্ষ থেকে একসময় সরকারের কাছে সামরিক পন্থা ত্যাগ করে রাজনৈতিকভাবে এটি সমাধানের জন্য প্রস্তাব দেন। আসলেও রাজনীতিবিদরা এক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই সমস্যা দিনে দিনে ঘনীভূত হয় এবং এটিকে উপলক্ষ করে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কে তিক্ততা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

www.pathagar.com

এরশাদের সামরিক শাসনামলের প্রথম তিন বছর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ওপর সরকারের নীতি অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ সরকার সামরিক সমাধানের পথে থেকে যায়। তাঁর শাসনামলে গৃহীত প্রথম দিকের অর্থনৈতিক কর্মসূচিগুলোর মধ্যে ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে উক্ত এলাকায় উপজাতীয়দের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক তৎপরতা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে সহযোগিতা করা। এই কর্মসূচির অধীনে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় সেগুলো হলো: (১) ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের জন্য কর মওকুফ; (২) মূলধন, যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার; (৩) কোন প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে পরবর্তী দশ বছর পর্যন্ত মাত্র ৫ শতাংশ হারে সুদ আরোপ; (৪) ব্যাংক ঋণের সুদ ৫ শতাংশে কমিয়ে আনা; (৫) বারো বছরের জন্য কর অব্যাহতি; এবং (৬) সিনেমা হলগুলোর ওপর আরোপিত সকল আবগারি ও প্রমোদ কর প্রত্যাহার।

উপজাতীয় লোকদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বিত করার লক্ষ্যে তাদের জন্য সকল সরকারি কর্মক্ষেত্রে ৫ শতাংশ চাকরি সংরক্ষিত রাখা হয়। এছাড়া সরকার দেশের বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও ব্যাংকের প্রায় ১৮০০ শূন্য পদ উপজাতীয়দের দ্বারা পূরণের সিদ্ধান্ত নেয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহেও উপজাতীয়দের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে ভর্তির জন্য যোগ্যতা নির্ধারক গ্রেড তাদের জন্য ৪৫ থেকে ৬৫ শতাংশের স্থলে উপজাতীয়দের জন্য ৪০ শতাংশে স্থির করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২ লাখ টাকার বেশি মূল্যের সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্প উপজাতীয় ঠিকাদারদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এছাড়া উক্ত এলাকায় ১০ শতাংশ উন্নয়ন প্রকল্প নির্মাণের কাজ ভারত থেকে প্রত্যাগত উপজাতীয়দের দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উপরন্তু এর বাইরেও উপজাতীয় ঠিকাদাররা প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডারের ভিত্তিতে কাজ সংগ্রহ করতে পারবেন। ১৯৮৪-৮৫ সালে একটি বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে কেন্দ্রীয় বাজেটে উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অনুদানের অতিরিক্ত হিসেবে বাড়তি ২৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

এরশাদ যখন পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান সামরিকভাবে করা সম্ভব নয়, তখন তিনি এর রাজনৈতিক সমাধানের জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব.) এ. কে. খন্দকারের নেতৃত্বে এবং এরিয়া কমান্ডার জেনারেল আবদুস সালামের সহযোগিতায় একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে বিক্ষুব্ধ উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে দেনদরবার শুরু হয়। এ প্রক্রিয়া প্রায় আট মাস ধরে চলে। এতে দুপক্ষের সম্মতিক্রমে একটি লিখিত সমঝোতার ভিত্তিতে সার্বভৌম বাংলাদেশের কাঠামোর অধীনে কিভাবে তাদের জন্য সর্বাধিক স্বশাসন দেয়া যায় সে ব্যাপারে কাঠামোগত পরিবর্তনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো নিরূপণ করা হয়। এ ব্যবস্থায় উপজাতীয়রা তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহাল রাখার অধিকার ফিরে পান, একইসঙ্গে তাঁদের প্রশাসনিক অধিকারও অর্জন করেন। পরে মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনক্রমে এই

www.pathagar.com

সমঝোতা আইনবদ্ধ করে রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলাসমূহের জন্য স্থানীয় সরকারের তিনটি পৃথক আইন জারির ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং এই সমস্ত আইন প্রণয়নে আমার সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

এই পরিকল্পনার অধীনে প্রতি জেলায় ৩১ সদস্যের একটি স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠনের বিধান থাকে। এতে বলা হয় যে, পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা এমন এক প্রক্রিয়ায় সরাসরি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হবেন যাতে উপজাতীয় এবং বসতিস্থাপনকারীরা জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। তবে যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন, এর চেয়ারম্যান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নেয়া হবে উপজাতীয়দের মধ্য থেকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, গবাদিপশু এবং অন্যান্য বিষয় বাদে উপজাতীয়দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দুটি ক্ষেত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দেয়া হয় সেগুলো হলো ভূসম্পত্তির ওপর অধিকার এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ। উপজাতীয়রা বহিরাগতদের দ্বারা তাদের জমি ক্রয় ও লীজের ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং তখনকার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাদেরকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারছিল না। আইনে বলা হয় যে, নির্বাচিত পরিষদের অনুমোদন ছাড়া গোটা জেলায় কোন জমি হস্তান্তর করা যাবে না এবং পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পর্যায় অবধি আইন রক্ষাকারীবাহিনীর সকল সদস্য স্থানীয় ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। পুলিশবাহিনী পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে কাজ করবে। উপজাতীয়দের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করে এবং তাঁকে উপমন্ত্রীর মর্যাদা প্রদান করে ডেপুটি কমিশনারসহ বিপুল সংখ্যক উচ্চপদস্থ অফিসারের সমন্বয়ে নয়া প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করে সকলকে চেয়ারম্যানের অধীনে নিয়ে আসায় উপজাতীয়দের মধ্যে নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে আস্থা ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে দীর্ঘদিনের সমস্যার একটি প্রত্যাশিত শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের পথে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে পারস্পরিক সহাবস্থানের ভিত্তিতে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব, যেখানে উপজাতীয়রা তাদের নিজেদের জীবন-জীবিকার বিকাশের এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অবাধ চর্চার অধিকার সংরক্ষণ করতে পারবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার জন্য প্রণীত এই আইনের বিধিগুলো ছিল অভিন্ন, কিন্তু দেশের অন্য যে কোন স্থানে অবস্থিত উপজেলার জন্য প্রণীত আইনের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই আইনের বিশেষ দিকগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. জেলা কাউন্সিলগুলোর নামকরণ করা হবে স্থানীয় সরকার কাউন্সিল।

২. প্রতি কাউন্সিলে উপজাতীয়দের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিশ্চয়তা দেয়া হবে এবং চেয়ারম্যান ও সদস্যরা সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন।

৩. উপজাতীয়দের প্রতিটি গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা থাকবে।

www.pathagar.com

৪. চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন উপজাতীয়দের মধ্য থেকে এবং তিনি হবেন স্থানীয় সরকার কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী।

৫. ঐসব জেলার উপজাতীয় প্রধান, যেমন রাঙ্গামাটির চাকমাপ্রধান, খাগড়াছড়ির মংপ্রধান এবং বান্দরবানের বোমাংপ্রধান, কাউন্সিলের বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৬. জেলার ডেপুটি কমিশনার কাউন্সিলের সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

৭. কাউন্সিল নয়া পদ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অফিসার নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদের আচরণবিধি তৈরি করতে পারবে।

৮. প্রতি বছরের জন্য কাউন্সিলের নিজস্ব উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট থাকবে এবং ঐ বাজেট দ্বারা তারা আইনের মাধ্যমে তাদের ওপর অর্পিত ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।

৯. কাউন্সিল খাজনা, স্থানীয় কর ও টোল প্রয়োগের অধিকারী হবে এবং তা আদায়ের পন্থা উদ্ভাবন করবে।

১০. কাউন্সিল নিজেকে পরিচালনার উদ্দেশ্যে আচরণবিধি প্রণয়ন করবে এবং তাদের আইনগত নিয়ন্ত্রণাধীন সকল ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে। আইনে এরকম ২৯টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়।

স্থানীয় সরকার কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে কাউন্সিলের আওতাভুক্ত বিষয়গুলোর একটি তালিকা আইনের ২২নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে একটি পৃথক সংযোজনী হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়। কাউন্সিলের আওতাভুক্ত বিষয়গুলো হলো: আইনশৃঙ্খলা সংরক্ষণ; গোটা জেলার উন্নয়ন তৎপরতার সমন্বয়, সহায়তা এবং সমর্থন; শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, গণস্বাস্থ্য, কৃষি ও বন, গবাদিপশু, মৎস্য, সমবায়, শিল্প ও বাণিজ্য, সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতি, রাস্তা ও সেতু নির্মাণ; ফেরী নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ; কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন; যোগাযোগ, সেচ, পানি সরবরাহ এবং উপজাতীয় এলাকার কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় অন্য সকল কর্মতৎপরতা।

আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যেসব ক্ষমতা দেয়া হয় সেগুলো ছিল:

১. পুলিশবাহিনীর প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ। সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরের নিচে পুলিশবাহিনীর সকল সদস্য কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। কাউন্সিলের নিজস্ব বিধি অনুসারে তাঁদের নিয়োগ, বদলি ও অপসারণ করা হবে। কাউন্সিল তাঁদের চাকরির শর্ত, মেয়াদ, প্রশিক্ষণ, নিয়োগ ও ইউনিফর্ম নির্ধারণ করবে। জেলায় কোন ঘটনা সংঘটিত হলে ইন্সপেক্টর অব পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে তা কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে অবহিত করবেন এবং পুলিশ চেয়ারম্যানের নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবে।

www.pathagar.com

২. কাউন্সিলের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া কোন জমি কোন প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরিত করা বা বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না এবং জেলার স্থায়ী অধিবাসী ছাড়া আর কারো কাছে কোন জমি বিক্রি করা বা বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না। কেবল ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এমন জমির ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবে এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে কোন হস্তান্তরের প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় নির্দেশে তা করা যাবে।

৩. কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা উপজাতীয় বিষয়ে উপজাতীয় এলাকার সদস্যদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিষয়টি স্থানীয় হেডম্যানের গোচরে আনা হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসরণে বিষয়টির মধ্যস্থতা ও সমাধান করবেন। জেলার প্রধানদের কাছে এ ধরনের নিষ্পত্তির ওপর আপিল করা যাবে এবং এর জন্য কাউন্সিল প্রয়োজনীয় বিধি ও পদ্ধতি নিরূপণ করবে।

একই মাসে জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের কতিপয় আইন, বিধি, প্রথা, ঐতিহ্য এবং উপজাতীয় মূল্যবোধ সংরক্ষণার্থে একটি বিল পাস করা হয়। ১৯০০ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন বাতিল করে শতাব্দীকালের লালিত আইনের অবসান ঘটানো হয়। নতুন আইন প্রণয়নকালে বলা হয় যে, উপজাতীয়রা তাদের নিজস্ব জীবনধারা ও সংস্কৃতি বহাল রাখতে পারবে। এই আইনের মাধ্যমে উপজাতীয়দের পূর্বে ভোগকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বহাল করা হয় এবং তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারে তার গ্যারান্টি দেয়া হয়। এ সমস্ত বিধানের মধ্যে ছিল (ক) নিজ নিজ কর্তৃত্বাধীন এলাকায় চাকমাপ্রধান, বোমাংপ্রধান এবং মংপ্রধানের অফিস পুনর্গঠন ও পুনঃস্থাপন। বিদ্যমান প্রধানদের তাদের স্বপদে বহাল থাকার নিশ্চয়তা; (খ) উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য উপজাতীয়দের হেডম্যানের জন্য অনুরূপ বিধান প্রণয়ন করে তাদেরকে তহশিলের কর্তৃত্ব দান। এতে বলা হয় যে, জেলার প্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন হেডম্যানকে অপসারিত করা যাবে না।

আইনে ডেপুটি কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীন ঐতিহ্যগত জুম চাষ পদ্ধতি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জুম চাষের জন্য খাজনা প্রয়োগ করে কিভাবে সেই খাজনা আদায় করা হবে এবং কিভাবে সরকারকে জমাদানের পর বাকি অংশ হেডম্যান এবং চিফের মধ্যে বণ্টন করা হবে সে ব্যাপারে আইনগত নির্দেশনা দেয়া হয়।

জুম টার্জি প্রথা অব্যাহত রেখে হেডম্যানকে তত্ত্বাবধানের জন্য চিফের ওপর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। উপজাতীয় জনগণকে কোন রয়্যালটি না দিয়ে গৃহস্থালি প্রয়োজনে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় জন্মানো বিশেষ ধরনের মোটা ঘাস কাটার ও ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। এতে বিদ্যমান পশুচারণ ভূমি একই পদ্ধতিতে এবং একই হারে বহাল রাখা হয়। যে কোন উপজাতীয় হেডম্যানের অনুমোদনক্রমে বসতঘর নির্মাণের জন্য কোন রকম বন্দোবস্ত না নিয়ে পৌর এলাকার বাইরে অনধিক ৩০ শতাংশ জমির দখল নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়।

www.pathagar.com

এ ধরনের রাজনৈতিক সমাধান থেকে সুফল পেতে হলে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। এরপরেও কতিপয় বিদ্রোহী গ্রুপ একটি পৃথক আবাসভূমির দাবিতে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ফলে জনগণের মন থেকে অব্যাহতভাবে নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা আর অপসারিত হয়নি। বসতিস্থাপনকারীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার লক্ষ্যে ক্যাম্প থেকে বের হয়ে আসতে ইতস্তত করতে থাকে এবং ভারত থেকে শরণার্থী হিসেবে ফিরে আসা উপজাতীয়রা আগের ন্যায় মুক্ত জীবনযাপন না করে নিজ ভূমিতে ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়ে বাঁধাধরা জীবনযাপনে বাধ্য হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা রক্ষায় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, নতুন আইনগত ব্যবস্থার অধীনে আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং নিজেদের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ থাকায় উপজাতীয়দের দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যাহত সমস্যার ক্রমান্বয়ে এখন একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হয়ে ওঠে। উপজাতীয়দের ওপর জোর খাটাবার পরিবর্তে ভবিষ্যতে নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে স্থাপিত স্থানীয় সরকারসমূহ যদি জারিকৃত আইনের অনুসরণে তাদের নিজ নিজ ঐতিহ্য ও কৃষ্ট অনুসারে স্বশাসিত হওয়ার সুযোগ পায় একদিন জনসমর্থনের অভাবে বিদ্রোহের মাত্রা ঝিমিয়ে পড়তে বাধ্য হতো। সে অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় ও বসতিস্থাপনকারীরা পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতে নিজেদের সার্বভৌম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গৌরবজনক স্থানে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতো।

যদিও সন্তু লারমার নেতৃত্বে চরমপন্থীরা এই রাজনৈতক এবং আইনগত সমাধান মেনে নিতে সম্মত হয়নি, কিন্তু পার্বত্য উপজাতীয়দের একটি বিরাট অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সমঝোতাকে স্বাগত জানায়। দেশের সকল উপজাতীয়দের প্রতি বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করার জন্য মিনিস্ট্রি অব স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স নাম দিয়ে একটি ভিন্ন মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এই অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে আমার পরিচয় ঘটে এবং তাদের সমস্যাগুলো আরো গভীরভাবে অনুভব করার সৌভাগ্য আমার হয়। পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন স্থান আমি পরিদর্শনে গিয়েছি। আমার মূল দায়িত্ব ছিল তিন জেলার জন্য প্রণীত তিনটি আইন বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এটি একটি জটিল এবং কঠিন কাজ ছিল। নতুন আইনের অধীনে প্রাথমিক কাঠামো তৈরি করা একটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। কারণ শুধু আইনত বা সামাজিক জটিলতাই নয় এর সাথে জড়িত ছিল অনেক রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আমলাতান্ত্রিক সমস্যা যার জন্য প্রয়োজন ছিল অনেক ধৈর্য এবং সহনশীলতার। নতুন জেলা কাউন্সিল পরিচালনার জন্য উপজাতীয় নেতাদের সাথে দিনের পর দিন বৈঠক করতে হয়েছে। অন্যদিকে ছিল অউপজাতীয়দের অগণিত সমস্যা আর ভারতে আশ্রয় প্রার্থী প্রত্যাগত উপজাতীয়দের পুনর্বাসনের বিষয়টি। উপজাতীয়দের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যগত রীতিনীতির চর্চা ছাড়াও যে দুটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর ছিল তাহলো উপজাতীয়দের নিরবচ্ছিন্ন জুম চাষ

www.pathagar.com

এবং জমির মালিকানার অধিকার। সমতল ভূমির যে প্রায় পাঁচ লক্ষ অউপজাতীয় অধিবাসী যাদের পার্বত্য এলাকায় বসবাস করার সুযোগ অতীতের বিভিন্ন সরকার করেছে, তারা উপজাতীয়দের উপরোক্ত দুটি মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। জুম চাষ নষ্ট করেছে এবং জমি দখল করেছে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত ও বর্তমানের মূল সমস্যা। এর সমাধান একমাত্র একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। একটি আইনগত কাঠামোর অধীনে শান্তিপূর্ণ উপায়ে একটি অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলার জন্য তিনটি আইন এবং ঐ আইনের বাস্তবায়ন উপরোক্ত সমস্যার সমাধান অর্জনের জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সকল পদক্ষেপের মৌলিক ভিত্তি ছিল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ওপর এই সমাধানের দায়িত্ব অর্পণ করা। এই সমস্যা সমাধানের অন্য সমস্ত বিকল্পের চেয়ে নির্বাচনই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পথ। নিয়মিত এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলে একদিকে যেমন চরমপন্থীদের শক্তি ধীরে ধীরে কমে আসত, অন্যদিকে পার্বত্য এলাকার উপজাতীয়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং নিজেদের এলাকার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ববোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হতো। দুর্ভাগ্যবশত এই মৌলিক বিষয়টি আজও অবহেলিত রয়ে গেছে। আইনগত এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও স্বপ্নকল্প (vision) এবং সাহসের অভাবে কোন সরকারই এই পথে অগ্রসর হয়নি। নতুন তিনটি আইনের অধীনে তিনটি পার্বত্য জেলায় ১৯৯০ সালে অনেক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারপর আর কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

www.pathagar.com

অধ্যায় ২৪

কিছু মৌলিক সংস্কারের কথা

সরকারে যোগদান করার পর এরশাদের প্রবর্তিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের পুনর্মূল্যায়ন করার সুযোগ আমার হয়। এই সংস্কারগুলোর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমার ভূমিকা কি ছিল তাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ক্ষমতাগ্রহণের দুবছরের মধ্যে এরশাদ এই সংস্কারগুলো প্রবর্তন করেন। এগুলো ছিল: (১) শিল্পকলকারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ বা বেসরকারিকরণ; (২) উপজেলা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ; (৩) থানা এবং জেলা পর্যায়ে আদালত স্থাপন করে বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ; (৪) ওষুধনীতি; এবং (৫) ভূমি সংস্কার।

এরশাদের উপরোক্ত প্রতিটি সংস্কারই ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং বিষয়গুলো ছিল খুবই মৌলিক। সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণের নীতি ছাড়া বাকি সবগুলোর ব্যাপারে আমার কোন দ্বিমত ছিল না, বরং আমার নিজের বিশ্বাসের কারণে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য আমি অনেক আগ্রহ নিয়ে কাজ করেছি। আমার মন সংস্কারমুখী, তাই আমি সবসময় পরিবর্তনের পক্ষে। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, বর্তমানকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। সময় এবং যুগের পরিবর্তনের সাথে মানুষের কল্যাণের জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন, সবকিছু করতে হবে। মনের এই তাগিদ এবং তাড়না থেকে জন্ম নেয় সংস্কারের জন্য এক গভীর আবেগ। আমার সকল বিশ্বাসকেই আমি আন্তরিকতার সাথে লালন করি। সেখানে সততার কোন ঘাটতি থাকে না।

১. শিল্পকলকারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ বা বেসরকারিকরণ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি পুঁজির প্রাধান্য বাড়ানোর নীতি গ্রহণ করা হয়। জাতীয়করণের ফলে দেশের শিল্পের একটা বিরাট সম্পদ যে অবক্ষয়ের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা লোকসান দিয়ে সরকারকে এগুলোর দায়ভার বহন করতে হচ্ছিল। আগের কোন সরকারই এগুলোর কর্মক্ষমতা, উৎপাদন বা মুনাফা বাড়াতে পারেনি। এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাথে আমলাদের একটি vested interest তৈরি হয়েছিল। যে উদ্দেশ্যে জাতীয়করণ করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

আর অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এই প্রশ্নে আর কোন আদর্শ বা দর্শন কাজ করেনি। কিন্তু যেহেতু এর সাথে অনেক মানুষের চাকরি, বিশেষ করে, শ্রমিক এবং নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে, তাই কোন গণতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক সরকারের পক্ষে বিজাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়নি বা ঐ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া ভবিষ্যতেও খুব কঠিন হতো। অথচ সরকারের ঘাড়ে এটি একটি বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যাপারটি প্রায় saturating point-এ পৌঁছে গিয়েছিল এবং শিল্প খাতে প্রায় একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল। তাই সামরিক সরকার প্রথমেই ব্যাপক ভিত্তিতে বিরাষ্ট্রীয়করণের কর্মসূচি গ্রহণ করে, বিশেষ করে পাট, বস্ত্র এবং চিনি খাতে সরাসরি বিরাষ্ট্রীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করার জন্য সচেষ্ট হন। এতে পশ্চিমা দেশগুলোও খুশি হয়। ফলে এরশাদ সামরিকপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আনুষ্ঠানিক দাওয়াতে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল প্রায় একটানা ৫ বছর শিল্পমন্ত্রী হিসেবে আমি বিরাষ্ট্রীয়করণ এবং বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি। এই কাজটা করতে আমি অনেক সমস্যা এবং বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম কিন্তু তারপরও আমার উৎসাহ এবং উদ্যম হারাইনি। কারণ আমি অন্তর দিয়ে এই নীতিকে সমর্থন করেছিলাম এবং এখনো করি। কারণ এটি মূলত একটা বিশ্বাসের ব্যাপার ছিল। ব্যক্তিমালিকানা, ব্যক্তি উদ্যোগ, ব্যক্তি মেধা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ব্যক্তি দক্ষতাই হলো সমাজের সার্বিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই উন্নয়নের মান এবং শক্তি—দুটোই অর্জন করা সম্ভব। মানুষকে আত্মনির্ভর করার জন্য এর কোন বিকল্প নেই। তাই এই নীতি অনুসরণ করার জন্য কে খুশি হলো আর কে তাতে ক্ষুব্ধ হলো, সেদিকে আমার কোন খেয়াল ছিল না। কোন গুরুত্ব দেইনি কারণ বিষয়টি ছিল আমার বিশ্বাসের অঙ্গ। সেইজন্য আমি মন লাগিয়ে ও নির্ভয়ে কাজ করেছি। এই ধরনের নীতি বাস্তবায়নে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক বিরোধিতা ছাড়াও আমলাতান্ত্রিক বাধাটাই সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এরকম নীতি সফল করা সম্ভব হয় না। এর জন্য প্রয়োজন হয় পুরো আমলাতন্ত্রের ওরিয়েন্টেশন। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পাশাপাশি বাস্তবায়নকারীদের সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকতে হয়। এই দিক থেকে আমি কিছুটা ভাগ্যবান ছিলাম। অন্তত ওপরের দিকে সমন্বয় এবং সমর্থনের অভাব ছিল না। এই নীতিটি ছিল সরকারের একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং এরশাদ নিজে এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই আমার সমস্ত উদ্যোগে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। রসায়ন শিল্প সংস্থার চেয়ারম্যান এবং পরবর্তী সময়ে শিল্প সচিব হিসেবে এ. কে. এম. মোশাররফ হোসেনও একই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সরকারপ্রধান, মন্ত্রী এবং সচিব কোন বিষয়ে একমত এবং এক নীতিতে বিশ্বাসী থাকলে যে কোন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। এই কারণেই শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন আমার পক্ষে ৫৫৬টি শিল্প-বাণিজ্য স্থাপনা বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়েছিল। এই সমন্বয়ের ফলেই চিনিশিল্পের

www.pathagar.com

সঙ্কট নিরসন, চামড়াশিল্পের রূপান্তরকরণ, পোশাকশিল্পের বিকাশ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের অভূতপূর্ব জাগরণ, ধোলাইখাল কনসেপ্টের সফলতা, পুঁজিকরণ (capitalisation) ও পুঁজি প্রত্যাহারের মাধ্যমে সরকারি মালিকানাধীন বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার বিক্রয় করার আইনগত কাঠামো সৃষ্টি করা, "মিশুক" আর "সুজন" তৈরি করে বাজারজাতকরণসহ আরো অগণিত কাজ করা সম্ভব হয়েছে। এখনো অনেক শিল্পউদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন সংগঠন সেই বছরগুলোকে বেসরকারি উদ্যোগের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করে। এইক্ষেত্রে আমার ভূমিকা আর অবদানের কথা কিছুটা এরই মধ্যে উল্লেখ করেছি।

২. উপজেলা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ

উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও উত্তরাধিকারসূত্রে একটি ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থার অধিকারী হয়। ব্রিটিশরা মূলত দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল—রাজস্ব আদায় এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ। এই দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনগণের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের কাছে দায়বদ্ধ একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীভূত এক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক গণআন্দোলনে গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সালের মহাগণঅভ্যুত্থান অবধি, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল দেশে এমন একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানান, যা জনগণের কাছাকাছি অবস্থান করে গণউন্নয়ন নিশ্চিত করবে। পাকিস্তানের উন্ন্যাসিক আমলাতন্ত্র সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের জনগণের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এর ফলে গোটা প্রশাসন ব্যবস্থার ওপর জনগণের একটি বিদ্বেষমূলক মনোভাব গড়ে উঠেছিল।

স্বাধীন একটি দেশের আমলাতন্ত্রের গঠন কাঠামো এবং বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ঔপনিবেশিক একটি সরকারের আমলাতন্ত্রের গঠন কাঠামোর চেয়ে ভিন্নতর হবে, এটিই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়া যায়। কাজেই কেন্দ্র থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় অবধি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই জনগণের সময়ের দাবি পূরণের উপযোগী শ্রেণী বিন্যস্ত করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে সময়ের দাবি ও প্রয়োজন এই বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপিত হতে হবে এবং দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সে সম্পর্কে গভীরভাবে ওয়াকেবহাল হতে হবে। আমলাতন্ত্রকে সময়োপযোগী করার এই উদ্দেশ্যটির বাস্তবায়ন কেবল গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের পক্ষেই সবচেয়ে বেশি সম্ভব হতে পারে এবং তারাই দেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থাকে জনগণের হাতের নাগাল অবধি পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে অধিকতর সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে। সে কারণেই বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জনগণের কাছে দেয়া সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং বিদ্যমান পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কান্বিত করার বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের

www.pathagar.com

পাশাপাশি প্রশাসনের নিম্নতর স্তরগুলো যারা দেশব্যাপী জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে কাজ করে, তাদের ভূমিকাও একইভাবে বিশ্লেষণ করে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মোটকথা, আমলাতন্ত্রকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করে তুলতে হলে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি হলো একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে এবং গণতান্ত্রিক একটি সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আমলাতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। এমতাবস্থায় একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী করে এর কার্যপ্রণালী, গঠনপ্রণালী, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিকে নবতর অবয়ব প্রদানের বিষয়টি নব্য অধিষ্ঠিত নেতাদের দায়িত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। দেশের সংবিধানে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত একটি সংসদীয় গণতন্ত্রভিত্তিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের নির্দেশনা ছিল এবং সে অনুযায়ী কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা পার্লামেন্টের মাধ্যমে জনগণের কাছে দায়ী ছিল। এছাড়াও সংবিধানের ১৩৩ থেকে ১৩৬ অনুচ্ছেদ অবধি প্রজাতন্ত্রের সরকারি চাকরি ব্যবস্থা পুনসংগঠনসহ চাকরির শর্তাবলি পরিবর্তনের জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। ফলে উপরোক্ত সাংবিধানিক বিধিবলে সরকার গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর সার্বিক কর্তৃত্ব অর্জন করে। স্থানীয় সরকার প্রশাসনকেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে দায়ী করে রাখার একটি উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা সবসময়ে বর্তমান ছিল। সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকারের প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলো বিলুপ্ত করে স্থানীয় প্রশাসনের এক নয়া পদ্ধতি চালু করা হয়। এতে প্রতি জেলায় প্রেসিডেন্ট কর্তৃক একজন গভর্নর নিয়োগ করে সেই গভর্নরের মাধ্যমে জেলা প্রশাসন চালানোর ব্যবস্থা রাখা হয়। সময়ান্তরে সেই গভর্নরকে সরাসরি জনগণদ্বারা নির্বাচিত করার ব্যবস্থা রাখা হয় এবং সেই গভর্নর একাধারে বেসামরিক প্রশাসন এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবেও কাজ করবে। কিন্তু সেই পদ্ধতি পুরোমাত্রায় চালু হওয়ার আগেই মুজিব নিহত হন এবং সে কারণে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। জিয়াউর রহমান ক্ষমতাগ্রহণ করার এবং সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর তাঁর ওপর প্রশাসন গণতন্ত্রীকরণের জন্য এবং প্রশাসনকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করে তোলার জন্য চাপ আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট জিয়া পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্য হতে প্রতি জেলায় একজন করে উন্নয়ন সমন্বয়কারী নিযুক্ত করেন এবং জেলার কৃষি কমিটির ন্যায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ জেলা কমিটির সভাপতিত্ব করার জন্য পার্লামেন্ট সদস্যদের ক্ষমতা দেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার 'গ্রাম সরকার' গঠনের উদ্যোগ আইনগত কারণে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি।

দেশের বিভিন্ন সরকারসমূহের সবগুলো পদক্ষেপ চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সত্যিকারের গণমুখী প্রশাসন কিংবা জনগণের অংশীদারিত্বভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া

www.pathagar.com

উদ্ভাবনের পদ্ধতি নিয়ে কখনোই কোন সুস্পষ্ট চিন্তাধারার অস্তিত্ব ছিল না, সুতরাং প্রশাসনিক কাঠামোয় তার প্রতিফলন ঘটানো তো দূরের কথা, বরং যখন যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে সেসবের বাস্তবায়নে শিথিল উদ্যম, অপরিকল্পিত এবং পরস্পরবিরোধী প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে দায়িত্বশীল একটি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বা গণতন্ত্রীকরণ ঘটাতে গিয়ে অবশ্যই সুপরিকল্পিত ও সুস্পষ্ট একটি নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ছিল। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীয়করণ বা গণমুখীকরণে মুজিব কিংবা জিয়ার গৃহীত কোন তৎপরতারই আইনগত কোন ভিত্তি ছিল না। ফলে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত প্রশাসনিক সব ক'টি স্তর সবসময় আমলাতন্ত্রের অধীনে সচিবালয়ের উচ্চপদস্থ কর্তা বা ঢাকাস্থ পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ সালে পার্লামেন্টে আমার নীতিনির্ধারণী বক্তৃতা, যা পরের দিন সব দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে বড় করে ছাপিয়ে ছিল, সেদিনও আমি থানাকে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার প্রস্তাব করেছিলাম। প্রস্তাবে বর্তমান জেলা এবং ডিভিশন তুলে দিয়ে, সাবডিভিশনকে জেলায় রূপান্তর করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের সম্পদ উৎপাদন করে মূলত কৃষকরা, কিন্তু জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কোন সুফল এদেশের গ্রামবাসী পায় না বললেই চলে। উন্নয়ন বাজেটের একটি অত্যন্ত নগণ্য, ডক্টর আবদুল্লাহ ফারুকের মতে শতকরা ৩ শতাংশ, গ্রামদেশের মানুষের কাজে লাগে। এই প্রেক্ষাপটে আমার প্রস্তাবের সারাংশ ছিল যে, উন্নয়ন বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ যদি ৩০০০ কোটি টাকার বাজেট হয় তাহলে ১০০০ কোটি টাকা আনুপাতিক হারে প্রতি থানায় বরাদ্দ করতে হবে। এতে করে গড়ে প্রায় ২ কোটি টাকার মত প্রতি থানা পাবে। একটি নির্বাচিত পরিষদের মাধ্যমে প্রতিটি থানা তাদের বরাদ্দকৃত অর্থের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের স্থানীয় অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। গ্রামদেশের অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের (resurgence) জন্য এটি অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গ্রামদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো, রাস্তা, পানি এবং বিদ্যুৎ ইত্যাদি একবার যদি গড়ে দেয়া যায় তবে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে একটি যুগান্তরকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

সামরিক সরকার নীতিগতভাবে এই জাতীয় বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করাতে আমি খুব আনন্দ পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, এটি ছিল পার্লামেন্টে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম মোটামুটি তারই প্রতিফলন। প্রতি উন্নীত থানাকে উপজেলা করা হয়েছে। এডিসি র‍্যাঙ্কের একজন সিনিয়র অফিসার এখন থানার প্রধান নির্বাহী কর্তা হয়েছেন এবং থানা পরিষদের নির্বাচনের পর জনগণের ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যানই হবেন থানার প্রধান কর্মকর্তা। অর্থ বরাদ্দ কম হলেও এই সরকার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে তা প্রশংসনীয়, কিন্তু এর মধ্যে একটি বিরাট প্রশ্ন রয়ে গেছে। এই ধরনের কোন সংস্কারই কোনদিন সফল হবে না, যদি না এর সাথে মানুষের সচেতনতা সম্পৃক্ত থাকে। ধারণাগতভাবে এই সংস্কার ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি থানা পর্যায়ের গণতান্ত্রিক কাঠামোর সাথে জাতীয় কাঠামোর

www.pathagar.com

অভিন্নতা না থাকে। অর্থাৎ ওপরে একটি অগণতান্ত্রিক বা সামরিক ব্যবস্থা, আর নিচে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া—এমন উদ্ভট ব্যবস্থা কোনদিন কার্যকরী হতে পারে না। থানা পর্যায়ের নেতৃত্ব এবং কর্মকাণ্ডের বিকাশ আর ঘটবে না। আমলাদের দৌরাত্ম্য গুটিকয়েক টাউট-বাটপার শ্রেণীর লোকের স্বার্থপরতা এবং দুর্নীতির ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার অচিরেই জনপ্রিয়তা হারাবে। আর, একবার জনপ্রিয়তা হারালে পরবর্তী সরকারকে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে বা তুলে নিতে হতে পারে। এই সংস্কার যাতে টিকে থাকে বা আরো উন্নতিসাধন করে সেইজন্য জাতীয় পর্যায়ের গণতান্ত্রিক এবং প্রশাসনিক কাঠামোর একটি অংশ হিসেবে এই বিকেন্দ্রীকরণমূলক সংস্কারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাহলেই এটি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং একদিন না একদিন জাতি এর একটি স্থায়ী সুফল অবশ্যই ভোগ করবে। আর একটি কথা, যে কোন সংস্কারকে সফল করার জন্য সময়েরও প্রয়োজন। থানা পর্যায়ে এত বড় দায়িত্ব নেয়ার মত নেতৃত্ব থানায় আছে কিনা এই প্রশ্নও ওঠা স্বাভাবিক। শত শহস্র বছরের অবহেলার কারণে এবং বার বার দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় শুধু থানা পর্যায়ে কেন জাতীয় পর্যায়েও নেতৃত্বের মান এবং বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি রয়েছে। থানা পরিষদ প্রথম দিকে তাই অনেক জায়গায় কিছু টাউট শ্রেণীর লোকের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে পারে। প্রথম নির্বাচনে তাই উপযুক্ত মানুষ বা নেতৃত্ব অনেক থানায় হয়তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু সিস্টেম যদি চালু থাকে তাহলে ক্রমাগত সেই মানুষ এবং নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। এই সংস্কারকে সফল করতে হলে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে থানা পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে অটুট বিশ্বাস থাকতে হবে। আগেই বলেছি, ওপরে সামরিক শাসন বা স্বৈরতন্ত্র আর নিচে গণতন্ত্র—এতে কোন কাজ হবে না।

জাতীয় নেতৃত্বকেও একটি গণতান্ত্রিক মূল্য বিন্যাসে আসতে হবে। প্রতিটি থানায় উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ প্রতি বছর ৩০/৪০ লক্ষ টাকা থেকে কমপক্ষে দুই কোটি টাকায় উন্নীত করতে হবে, এবং সেইসঙ্গে ঐ টাকা ২০/৩০টি খাতে এই বরাদ্দ ও ব্যয়ের বর্তমান ধারা বাতিল করতে হবে। বিদ্যুৎ, সড়ক এবং সেচ—এই তিনটি খাতে অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই অবকাঠামো একবার গড়ে উঠলে বাকিগুলো এমনিতেই গড়ে উঠবে। থানা পর্যায়ে উন্নয়ন বরাদ্দ অন্তত প্রথম তিন বছর বিদ্যুৎ, সড়ক ও সেচ ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যয় করা বন্ধ রাখতে হবে। আর যদি ৩০/৪০ বা ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের খাতে খরচ করতে দেয়া হয় তাহলে কোন খাতই এক দুই লাখ টাকার বেশি পাবে না এবং এর ফলে আমি মনে করি এই সংস্কার ব্যর্থ হবে। এই ব্যয় এবং এই ব্যয়ের ফলে উন্নতি লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে যাবে। তাই বরাদ্দের টাকা আমলা এবং টাউটরাই ভোগ করবে অথবা নষ্ট হবে। এখনকার অনেক জাতীয় প্রকল্পের মত সব খাতেই কিছু কিছু খরচ করা হবে কিন্তু কোন প্রকল্পই সম্পন্ন করা হবে না। বছরের পর বছর একই প্রকল্পের জন্য অল্প অল্প টাকা খরচ অপব্যয়েরই শামিল হবে।

www.pathagar.com

যাই হোক উপজেলা পদ্ধতি স্থাপনের মাধ্যমে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপকে আমি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছি। এটি ছিল একটি মৌলিক সংস্কার। যদিও বিরোধী দলসমূহ রাজনৈতিক কারণে এই নতুন প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করেছে, কিন্তু এই বিরোধিতার কোন যৌক্তিক ভিত্তি ছিল না। এরশাদ তাঁর নিজের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য উপজেলা পদ্ধতি চালু করেছেন—একথাটা ছাড়া তাঁরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর অন্য কোন একটি যুক্তিও উপস্থাপন করতে পারেনি। গণতন্ত্রকে সমাজের প্রতিটি স্তরে সুসংহত করার একটি অপরিহার্য শর্ত হলো প্রশাসন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়। এর একটি দার্শনিক এবং সাংবিধানিক ভিত্তিও রয়েছে। এর প্রতিফলন ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানেও আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, নব্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রে এমন একটি গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসৃত হবে যাতে সকল পর্যায়ের প্রশাসনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। ৯ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয় যে, প্রজাতন্ত্র এলাকা বিশেষের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করবে। ৫৯ অনুচ্ছেদে সংবিধানের প্রণেতাগণ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুভব করেছে যে, উন্নয়ন ও প্রশাসনের সার্বিক দায়-দায়িত্ব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের ওপর ন্যস্ত করা হবে। সেই অনুযায়ী প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিট স্থানীয় সরকার আইনের ভিত্তিতে নির্বাচিত ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত সংস্থার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং তারা নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবে:

ক. প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কর্মকাণ্ড;

খ. জনশৃঙ্খলা সংরক্ষণ;

গ. জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকারকে কর আরোপ, বাজেট প্রণয়ন এবং তহবিল সংরক্ষণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এরশাদ কাগজে-কলমে এবং চেতনায় মূল সংবিধানের এসব বিধান কাজে পরিণত করার চেষ্টা করেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামীণ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মূল ভিত্তি হিসেবে উপজেলা নামে নয়া প্রশাসনিক ইউনিট গঠন করা হয় এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এই ইউনিট ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ নেয়া হয়। সংবিধানের দিক্‌নির্দেশনা অনুসারে এভাবে স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন চালানোর জন্য সম্পূর্ণ নয়া একটি প্রেক্ষিত অনুসরণ করা হয়। প্রতিটি ইউনিট একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয় এবং এই চেয়ারম্যানকে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত করার বিধান করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ এবং জনগণের বিভিন্ন অংশ থেকে

www.pathagar.com

প্রতিনিধি নিয়ে উপজেলা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। নিয়মানুযায়ী চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন:

ক. এলাকার সমস্ত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড;

খ. দুর্যোগকালীন সকল ত্রাণ তৎপরতা;

গ. উপজেলায় সরকারের নীতিমালা ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন;

ঘ. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

ঙ. প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা;

চ. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান;

ছ. উপজেলায় কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ;

জ. উপজেলায় কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন তৈরি এবং তাদের ছুটি, বেতন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ;

ঝ. উপজেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ, প্রণয়ন, চিহ্নিতকরণ এবং বাস্তবায়ন;

ঞ. উপজেলার জন্য কর ও খাজনা আদায় এবং তহবিল সংগ্রহ;

ট. উপজেলার তহবিল সংরক্ষণ ও হিসাবরক্ষণ; এবং

ঠ. উপজেলা পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

উপজেলাকে উন্নয়নের একটি কার্যোপযোগী ইউনিটে পরিণত করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সকল বিভাগের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩৭টি অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়। প্রতিটি উপজেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ তৎপরতা চালানোর জন্য আটজন করে গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল চিকিৎসক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। উপজেলা চেয়ারম্যানকে সাহায্য করার জন্য একজন প্রধান নির্বাহী অফিসার, একজন ম্যাজিস্ট্রেট, একজন অর্থ সংক্রান্ত অফিসার, একজন প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার এবং তাঁদের সঙ্গে কাজ করার জন্য অন্যান্য সহযোগী ও স্টাফের সংস্থান রাখা হয়।

স্বনির্ভরতা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদির সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী উন্নয়নের প্রায় সকল বিষয় উপজেলা পরিষদের অধীনে নিয়ে আসা হয়। এভাবে অর্থনীতির বাস্তব প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপযোগী উৎস হিসেবে উপজেলা মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি শক্তিশালী ভিত্তি কাঠামো হিসেবে আবির্ভূত হয়। এভাবেই তৃণমূল পর্যায় থেকে ঔপনিবেশিক কায়দায় পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূলোৎপাটনের এই বিশাল এক চ্যালেঞ্জকে বলিষ্ঠভাবে মোকাবেলা করা হয়।

www.pathagar.com

উপজেলা পরিষদকে তাঁর নিজস্ব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, অগ্রাধিকার নিরূপণ, মূল্যায়ন, সম্ভব্যতা জরিপ পরিচালনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এভাবে পরিকল্পনার প্রতিটি পর্যায়ে প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব চলে আসে উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে। জাতীয় প্রকল্পগুলো বাদ দিলে এগুলোই গ্রামীণ বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে গ্রামীণ একটি পরিকল্পনার অনুমোদন ও অর্থ সংস্থানের জন্য সূদুর গ্রামবাংলা থেকে রাজধানীতে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়। এতে জনগণকে শুধু নিজেদের গৃহীত পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণেই উদ্বুদ্ধ করা হয়নি, তাদেরকে নিজস্ব উন্নয়নের দায়িত্ব নিতেও উৎসাহিত করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন তহবিল প্রাথমিকভাবে দুটি উৎস থেকে আহরণের দিক্‌নির্দেশনা ছিল। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি বরাদ্দ এবং দ্বিতীয়ত, অনুরূপ তহবিল সংগঠনের জন্য কর, খাজনা ও লেভীর আকারে স্থানীয় উৎস থেকে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আহরিত স্থানীয় সম্পদ। স্থানীয়ভাবে যত বেশি তহবিল সংগ্রহ করা হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও সে অনুপাতে বর্ধিত পরিমাণে বরাদ্দ সংগ্রহের বিধান রাখা হয়। উপজেলা পরিষদের জন্য বিশাল অঙ্কের চলতি বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় এবং নিজস্ব তহবিল থেকে ঈপ্সিত ফল লাভ না হওয়া অবথি সেই অর্থ বরাদ্দের এই গতি অব্যাহত রাখা হয়। পরিকল্পনা শুরু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উপজেলাকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে এর সার্বিক দায়-দায়িত্ব বহন করতে থাকে। প্রতি উপজেলায় প্রায় ৪০০ সরকারি কর্মচারীর বেতন, যাদের অনেকে ডেপুটেশন ভিত্তিতে উপজেলায় কাজ করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান থেকে মেটানো হয় এবং বছরে এই বাবদে প্রতি উপজেলায় প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় হতে থাকে। উপজেলার জন্য মঞ্জুরীকৃত জাতীয় বাজেটের বরাদ্দ থেকে বৃহত্তর অংশ উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়নের কাজে ব্যয়িত হয়। এর মধ্যে মুখ্য ব্যয় হয়েছে অফিস বিল্ডিং, আবাসিক ভবন ও আদালত ভবন নির্মাণে। বাকি অংশ ব্যয়িত হয়েছে সরাসরি উন্নয়ন বাজেট হিসেবে। এর ফলে গত ৬ বছরে জাতীয় সম্পদের এক বিশাল অংশ গ্রামীণ এলাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে অনেকগুলো খাতে তহবিলের ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি উপজেলাতেই রয়েছে নিজস্ব অবকাঠামো এবং স্বশাসিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হওয়ার উপযোগী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। উপরন্তু অর্থনীতির অন্যান্য খাত ও তাদের তহবিল স্থানান্তরের মাধ্যমে উপজেলাকে উন্নত ও সুসজ্জিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করে নয়া চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার চেষ্টা করা হয়। যোগাযোগ খাত ইতোমধ্যেই এক উপজেলাকে অন্য উপজেলার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং সড়কগুলো জেলা সদর হয়ে রাজধানী ঢাকামুখী মহাসড়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি উপজেলায় জেলা সদর ও ঢাকার সঙ্গে সরাসরি টেলিফোন ডায়ালিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। জ্বালানি খাত প্রতিটি উপজেলায় বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করেছে, যার ফলে অধিকাংশ উপজেলায় বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে।

www.pathagar.com

অন্যভাবে বলা যায়, উপজেলা ব্যবস্থার কারণে গ্রামীণ বাংলাদেশের জীবনে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে। গ্রামের একটি ক্ষুদ্র ও অন্ধকার বাজার পরিণত হয়েছে ছোট্ট একটি শহরে এবং উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে সারা দেশের উন্নযনে উপজেলা একটি আর্থ-সামাজিক ভূমিকা রেখে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এরশাদের সমালোচক ও বিরোধী পক্ষগুলো প্রথমদিকে সন্দেহ করেছিলেন যে, এই সংস্কার আসলে একটি ভাঁওতামাত্র এবং এই প্রচেষ্টাকে এরশাদের নিজের জন্য একটি রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপনের উদ্যোগ বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু যাই হোক, অচিরেই উপজেলাকে রাজনৈতিক তৎপরতার চেয়ে অর্থনৈতিক তৎপরতার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে দেখা গেছে। প্রথমে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে বলা হয়েছিল যে, স্থানীয় উৎস থেকে সমানুপাতিক তহবিল গঠন না করা গেলে উপজেলার জন্য কেন্দ্র থেকে বিশাল তহবিল স্থানান্তর অযৌক্তিক। খুব সম্ভবত ঐসব সমালোচনা প্রতিহত করার জন্যই জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ নিয়ে সম্ভাব্য প্রতিকূলতার মোকাবেলা করা হয়।

যাই হোক, এই সংস্কারকে অত্যন্ত ফলদায়ক হিসেবে গণ্য করা যায় এবং জনগণকে প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার এই প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে সফল হিসেবে প্রমাণিত হয়। এতে বোঝা যায় যে, প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অভিজ্ঞ নেতৃত্ব তৈরি করার জন্য একসময় এই প্রক্রিয়া একটি কার্যকর ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হবে। এতে এমন একটি গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর উদ্ভব ঘটবে যারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধানে সক্ষম হবে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে উপজেলা ব্যবস্থাকে কাজে লাগাতে তারা উৎসাহিত হবে। এতে যে কোন দুর্যোগ মুহূর্তে তারা রাজধানীর দিকে ছুটে না গিয়ে উপজেলাতেই তাদের সমস্যা সমাধান করতে পারবে। তাই দেখা যায়, ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময়ে এবং বন্যার পরে অন্যান্য সময়ের মত গ্রামবাসীরা আর শহরে এসে ভাসমান জনারণ্য সৃষ্টি করেনি। এভাবে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলো রাজধানী ও শহরাঞ্চলের ওপর চাপ কমাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এর প্রধান কারণ ছিল, জনগণের দুঃখদুর্দশা মোচনে উপজেলা ব্যবস্থা অত্যন্ত সফল ভূমিকা পালন করেছে। এতে উৎসাহিত হয়ে পরে প্রকল্প উন্নয়ন এবং বেসামরিক প্রশাসনের উন্নয়ন সাধন করে জনগণের কল্যাণে আরো অর্থবহ ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে এরশাদ মহকুমাগুলোকে জেলায় পরিণত করেন।

এটি সত্য যে, প্রথম উপজেলা নির্বাচনের পর নির্বাচিত চেয়ারম্যানরা এরশাদের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং তিনি তাঁদের নেতৃবৃন্দদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করতেন। চেয়ারম্যানদের একজন নেতা হিসেবে কুমিল্লার ফখরুল ইসলাম মুন্সী তখন সরকারের নৈকট্য লাভ করেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে একজন জুনিয়র মন্ত্রী করা হয়েছিল। উপজেলা পদ্ধতির মাধ্যমে নিঃসন্দেহে গ্রামাঞ্চলে সরকারের এক শক্তিশালী সমর্থন সৃষ্টি হয়েছিল যেটা যে কোন রাজনৈতিক সরকারের জন্য একটি স্বাভাবিক পরিণতি বা অর্জন হিসেবে গণ্য করা যায়, কিন্তু তাই বলে এই নতুন ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করার কোন যুক্তি ছিল না। এখনো ইউনিয়ন পরিষদের যে নির্বাচন হয় বা নির্বাচিত চেয়ারম্যান-মেম্বারদের

www.pathagar.com

সমর্থন রাজনৈতিকভাবে হিসাব করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করে উপজেলা পদ্ধতি বিলুপ্ত করে ভুল করেছিল। এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখলে শুধু জাতীয়ভাবে নয়, রাজনৈতিকভাবেও বিএনপি লাভবান হতো। ১৯৯৬ সালের পর আওয়ামী লীগ উপজেলা পদ্ধতিকে একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে আরো শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু কোন সরকারই নিজেদের স্বপ্নকল্প (vision) এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে ঐ আইনটি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু সংস্কারটি যে ভাল এবং এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হলে উন্নয়ন, গণতন্ত্র এবং সুশাসন অর্জনে একটি যে সুদূরপ্রসারী সুফল জাতি অর্জন করতে পারত এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করে না।

৩. থানা এবং জেলা পর্যায়ে আদালত স্থাপন করে বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ

বাংলাদেশ উত্তরাধিকারসূত্রে এমন একটি ব্রিটিশ বিচার পদ্ধতি লাভ করেছিল যা ছিল নৈতিক মূল্যায়নে উপমহাদেশে তাদের অনুসৃত বেসামরিক প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছুটা পৃথক। বেসামরিক প্রশাসনের যেখানে মূল লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক শোষণ ও প্রজাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা, সেখানে বিচার বিভাগ ছিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে অনুসৃত নীতিবোধভিত্তিক। যদিও মৌলিক কতগুলো আইন ভ্রান্ত ও নেতিবাচক ধারণার ওপর ভিত্তিশীল ছিল এবং সেগুলোতে শাসিত জনগণের ওপর ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তিরই প্রকাশ ঘটেছে, তবু সাধারণভাবে বিচার বিভাগের মূলনীতি ও পদ্ধতি ছিল তাদের নিজ দেশে অনুসৃত পদ্ধতিরই অনুরূপ।

একটি আধুনিক বিচার ব্যবস্থা সভ্যতার একটি পরমোৎকৃষ্ট অবদান। সুবিচারের ধারণাকে কার্যকর করে তুলতে হলে, তা সে সামাজিক, নৈতিক বা আইনগত, যা-ই হোক না কেন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোভিত্তিক একটি নীতিমালার ওপর তাকে ভিত্তিশীল হতে হয়। সমাজের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্নমুখী শক্তির মধ্যে অবস্থানরত বিবদমান শ্রেণী ও ব্যক্তিস্বার্থ সবসময়ই বেসামরিক শাসনের উন্নয়নকে অস্থিতিশীল করে তোলার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে সমাজের অন্তর্গত জনগণের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও সহাবস্থানভিত্তিক একটি ভারসাম্য কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। রোমানরা এই ভারসাম্য নির্ধারণের জন্য আইন ব্যবস্থায় যে নীতিমালা প্রণয়ন ও উন্নয়ন সাধন করেছে, তাদের সে প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে মানবাচরণে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

এর ফলেই একটি ভারসাম্য বেসামরিক শাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। পরবর্তীকালে ক্রমোন্নয়নশীল ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে উদ্ভূত দ্বন্দ্বগুলো সমাধান করতে গিয়ে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব এই ভারসাম্য আনয়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। উৎপাদন, মুনাফা এবং প্রগতি যখন উন্নতির অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় এবং বহির্ক্ষেত্রে তা শোষণবাদ ও সম্প্রসারণবাদের আকারে করাল থাবা বিস্তার করে, তখন একটা জাতি

www.pathagar.com

সাম্য এবং সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে টিকে থাকার জন্য তাদের অধিকারের প্রশ্নে আরো ঘোরতর দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে থাকে।

এই দ্বন্দ্বের কারণে পর্যায়ক্রমিকভাবে সমাজে সকল মানুষের সমান আচরণ লাভ, আইনের সমঅধিকার এবং সার্বভৌম সাম্যের ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটতে থাকে। সমাজের দুর্বল, গরিব এবং অবহেলিত লোকজন শোষণের বিভিন্ন হাতিয়ার এবং অন্যান্য বৈষম্যমূলক আচরণের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিদারুণভাবে অনুভব করতে শুরু করে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিপক্ষদের সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের দায়-দায়িত্ব ও অধিকার রক্ষার জন্য একটি আইনভিত্তিক সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করা সমাজ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়ায়।

এ ব্যাপারে যে সহজ প্রশ্নটির সমাধান জরুরি হয়ে দাঁড়ায় তা হলো, সমাজের মধ্যে একটি সামাজিক অপরাধ সংঘটিত হলে বা একে অন্যের অধিকার খর্ব করলে বিবদমান পক্ষগুলো কি করবে? সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী গোষ্ঠীর সামনে দুর্বল, দরিদ্র ও অসহায় লোকদের বা গোটা সরকারের সামনে সাধারণ নাগরিকদের অবস্থান কিরূপ দাঁড়াবে? এক্ষেত্রে কোন আইনগত ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের অস্তিত্ব না থাকলে ক্রমশ নৈরাজ্যের বিস্তার ঘটতেই থাকবে। এক্ষেত্রে সমাধান হলো, একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অবস্থিতি, যারা কোন ভয় বা আনুকূল্যের তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন বিবাদের নিস্পত্তি করবে। তাদের সিদ্ধান্ত আইন দ্বারা গৃহীত ও বলবৎ করা হবে। সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে এবং সেরকমই অপর একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তা পুনর্বিবেচনা করবে। এ হলো যে কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য সবচেয়ে সভ্য ও শান্তিপূর্ণ পন্থা। এভাবে আইনের প্রতি সাম্যের নিশ্চয়তা এবং নাগরিকদের সমঅধিকার, পাশাপাশি বিচার প্রশাসন পরিচালনাকারীর স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে উদ্ভূত বিচার বিভাগের ধারণা মানবজাতির উন্নয়ন এবং প্রগতির বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। ব্রিটিশদের অনুসৃত বিচার ব্যবস্থা সমাজের বিবদমান বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ভারসাম্য বিধানে একটি সুদৃঢ় ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। অনেক ক্ষেত্রে একে প্রাগৈতিহাসিক ও মান্ধাতার আমলের বলে মনে হলেও এবং অসংখ্য চ্যুতি ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এই পদ্ধতি তার দার্শনিক ও আইন বিজ্ঞানগত যোগ্যতার কারণে সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হলো সাধারণ মানুষের জন্য সুবিচারের অধিকর নিশ্চিত করা। আমাদের দেশে বিচার বিভাগ একটি ঐতিহ্যধর্মী ও রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয় বলে একদিকে সুবিচার প্রার্থীদের জন্য সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অন্যদিকে তাদের দুঃখদুর্দশা লাঘব করার মত একটি নীতিমালা প্রণয়নের কাজ তেমন সহজ ছিল না। অন্যদিকে বিচার ব্যবস্থার জন্য না হলেও দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে জড়িত বহিস্থ কারণে এখানে আইনি প্রক্রিয়া এবং বিচার পদ্ধতি অনেকটাই হতাশাব্যঞ্জক। বহিস্থ এসব কারণের মধ্যে রয়েছে অপর্যাপ্ত কোর্টরুম, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

www.pathagar.com

বিচারকের স্বল্পতা, বিচারকদের নিম্ন বেতন, প্রতি আদালতে জমে ওঠা মামলার পাহাড়, পদ্ধতিগত জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা এবং আইনের ফাঁক-ফোকড়। পদ্ধতিগত দুর্বলতা হলো এর অন্তর্নিহিত ধীর গতি। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এখানে সাধারণ মানুষের জন্য সুবিচার লাভ তেমন সহজলভ্য নয়। উপরন্তু বঞ্চনা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব এবং জনসংখ্যাধিক্যের কারণে অধিকাংশ জনগণ তাদের অধিকার সংরক্ষণে সক্ষম নয়, কিংবা তাদের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় পদক্ষেপ নেয়া হলে তারা আইনের দ্বারস্থ হয়ে প্রতিকার লাভ করতে পারে না। অল্প কথায় বলা যায়, দেশের জনগণের একটি বিরাট অংশ তাদের সুবিচার পাওয়ার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

বিচার বিভাগ ও প্রশাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ স্কিমের মাধ্যমে এরশাদ গ্রাম পর্যায়ের লোকজনের জন্য আইনগত প্রতিকার সংক্রান্ত অধিকার সকলের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণকে আরো জোরদারকরণ এবং উপজেলা পদ্ধতিকে স্বশাসিত করে তোলার লক্ষ্যে গৃহীত সংস্কারের তালিকায় বিচার প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণকেও একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় ধরনের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য প্রতি উপজেলায় মুন্সেফ কোর্টসহ একটি ম্যাজিস্ট্রেসী গঠন করা হয়। আগে এই বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করা হতো জেলা পর্যায়ে। ফলে দেশের সব ক'টি উপজেলা আদালতে লোকবল নিশ্চিত করতে গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় এক হাজার বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জেলখানাসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোও গড়ে তোলার দরকার হয়। নতুন বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও দ্রুত নিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। ইমারত ও আদালতকক্ষ নির্মাণের জন্য কেন্দ্র থেকে তহবিল বরাদ্দ করা হয়। এর পাঁচ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে দেখা যায় যে, প্রতি উপজেলায় পরিপূর্ণ সুসজ্জিত আদালত স্থাপন করে বিচার ব্যবস্থা গ্রামের জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বিচার প্রার্থীদের আর সুবিচারের আশায় দূর থেকে দূরান্তরে যেতে হচ্ছে না।

নিঃসন্দেহে প্রাথমিকভাবে এই কর্মপন্থা বাস্তবায়নে অসংখ্য ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। অবকাঠামোর কোন অস্তিত্ব ছিল না। বেশিরভাগ আদালত নিয়মিত বসত না এবং বিচার পরিচালনার মানও ছিল নিম্ন পর্যায়ের। বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট, বেঞ্চ ক্লার্ক, আইনজ্ঞদের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে অনেক ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অভিজ্ঞতার অভাব ছিল এর অন্যতম প্রধান কারণ। বহু ক্ষেত্রে উপজেলা আদালতের বিচার নিষ্পত্তির মান সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়নি। তবু সময়ের সাথে সাথে পাঁচ বছরের মধ্যেই এই পদ্ধতি উদ্ভূত সব রকম চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে এবং এই আদালতের জন্য যুক্তিসঙ্গত একটি অবকাঠামো ও অন্যান্য উপকরণাদি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। জনগণও প্রাথমিক সমস্যা কাটিয়ে সংস্কারের সুফল ভোগ করতে শুরু করেন। সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিরোধ সত্ত্বেও এই পদ্ধতি ভালভাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিচার প্রশাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে গিয়ে এরশাদ প্রথমেই সুবিচারের আশায় প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনগণকে কেন রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত

www.pathagar.com

হাইকোর্টে গিয়ে মামলায় অংশ নিতে হবে, সেই প্রশ্নটি জরুরিভাবে উত্থাপন করেন। সেই সমস্যার অবসানকল্পে তিনি হাইকোর্ট ডিভিশনের এখতিয়ারকে বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ থাকাকালে সুপ্রিমকোর্ট ছিল করাচিতে, পরবর্তীকালে এই কোর্ট ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হয়। সুপ্রিমকোর্টের একটি বেঞ্চ নির্দিষ্ট সময়ান্তরে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঢাকায় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের জন্য ছিল ঢাকায় অবস্থিত নিজস্ব একটি হাইকোর্ট। কিন্তু সে সময়েও আইনজীবী এবং রাজনৈতিক দলগুলো জেলাসমূহে সার্কিট বেঞ্চ বসানোর জন্য দাবি জানিয়ে ছিলেন।

বাংলাদেশ পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী শাসন হতে মুক্তি লাভ করার পর জনগণের উপরোক্ত দাবিটিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে হাইকোর্ট ডিভিশনের সেশন বসানোর জন্য সুপ্রিমকোর্টকে ক্ষমতা দেয়া হয়। তবে ঢাকার আইনজীবীগণ এতে ভিন্নমত পোষণ করতেন এবং সুপ্রিমকোর্ট কখনো রাজধানীর বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের সেশন বসানোর লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়নি। জিয়াউর রহমানের আমলে একবার হাইকোর্ট ডিভিশনকে সুপ্রিমকোর্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক উচ্চ আদালত গঠনের মাধ্যমে বিচার প্রশাসন পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে সংবিধান সংশোধন করে নিজস্ব প্রধান বিচারপতি সম্বলিত পৃথক হাইকোর্ট গঠনের বিধিসম্মত একটি সামরিক আইন ঘোষণা ও জারি করা হয়। এর ফলে ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের অস্থায়ী বেঞ্চ বসানোর কাজ সহজ হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এর প্রতিবাদ অব্যাহত রাখায় এবং বিচারপতিরা ঢাকার বাইরে যেতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করায়, বিচারকাঠামো আবার তার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। এভাবে সুপ্রিমকোর্টের অধীনে হাইকোর্ট ডিভিশন ও আপিল ডিভিশন এই দুটি বিভাগের অস্তিত্ব বহাল রেখে দেশের একক প্রধান বিচারপতির কর্তৃত্বাধীন পূর্ববৎ পদ্ধতিটি অবিকৃত রাখা হয়।

এরশাদ ক্ষমতাগ্রহণের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইকোর্ট বিভাগ সম্প্রসারণের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে চলেন। সে সময় সংবিধান স্থগিত থাকায় এবং সেই কারণে সুপ্রিমকোর্টকে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের সেশন বসানোতে বাধ্য করা সম্ভব না হওয়ায় সামরিক সরকার ১৯৮২ সালের ৮মে সামরিক আইন ঘোষণা (দ্বিতীয় সংশোধনী) আদেশের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করে। পরবর্তীকালে সংবিধান পুনর্বহাল হওয়ার পর এই স্থায়ী বেঞ্চগুলো ভেঙে দেয়া হয়, কিন্তু ১০০ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পরামর্শ সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর এবং সিলেট—এই ছয়টি শহরে সেশন বেঞ্চ বসানোর উদ্যোগ নেন। ১৯৮৮ সালে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে আবার ১০০ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে একই স্থানে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ বসানো এবং এক বেঞ্চ থেকে অন্য বেঞ্চে বিচারকদের বদলি করার ক্ষমতা ঐ অনুচ্ছেদে যুক্ত করেন। এর পাশাপাশি এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল স্থায়ী বেঞ্চগুলোকে স্বাধীন এখতিয়ার

www.pathagar.com

ও মর্যাদা দান। এতে বলা হয় যে, সংবিধান বলে হাইকোর্ট ডিভিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সীমিত থাকবে সেসব নির্ধারিত ক্ষেত্রে যেগুলো প্রেসিডেন্ট প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত করবেন অর্থাৎ ঢাকায় অবস্থানরত হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা হবে কেবল সেগুলো, যেগুলো হবে প্রেসিডেন্টের নির্বাচিত এলাকাবহির্ভূত অবশিষ্ট এলাকা। এভাবে ১৯৭২ সালের সংবিধানে উল্লিখিত হাইকোর্ট বিভাগসহ প্রায় গোটা সুপ্রিমকোর্টের কাঠামোই পরিবর্তিত করে ফেলা হয়। আসলে স্থায়ী বেঞ্চের জন্য বিচারকদের এক বেঞ্চ থেকে অন্য বেঞ্চ বদলি করার ক্ষমতা প্রদানের মূল উদ্দেশ্যই ছিল দেশের সাতটি স্থানে স্থায়ী বেঞ্চের ওপর সে ক্ষমতা অর্পণ করা।

এ নিয়ে ঢাকার আইনজীবী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সামরিক আইন ঘোষণা জারি হওয়ার পর প্রথম দিন থেকেই সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এর প্রতিবাদ জানায়। তাদের মতে বাংলাদেশের মত একটি দেশে বিচার বিভাগকে বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্তটিকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মত একই ধরনের জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করার কোন যুক্তি ছিল না। এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে গেলে যে পরিমাণ অর্থ ও যে সংখ্যক জনবল প্রয়োজন, প্রাপ্ত ফল তার আনুপাতিক হবে না। ফলে এই ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত নয়। উপরন্তু সুবিচার নিস্পন্ন করতে আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও দুর্নীতি নিয়ে জনমনে ইতোমধ্যেই সমালোচনা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ করে অধস্তন আদালতগুলো বিভিন্ন কারণে প্রত্যাশা অনুযায়ী ত্বরিত, স্পষ্ট ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে বললেই চলে। মামলার সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও দিনে দিনে বেতন কাঠামোসহ বিচার প্রশাসনে জড়িত চাকরিজীবীদের কর্মপরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন যুক্তি প্রদর্শন করে যে, বিচার বিভাগের কাঠামো পরিবর্তন না করে বরং সাংগঠনিকভাবে এবং উপকরণাদি দিয়ে বিদ্যমান কাঠামোটিকে উন্নত করা অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। তাঁদের মতে বাংলাদেশের মত সীমিত সম্পদের দেশে উপজেলা পর্যায়ে আদালত ভবন নির্মাণ কিংবা ছয়টি জেলা সদরে হাইকোর্টের সেশন বা বেঞ্চ বসানোর জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় বাস্তবপক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক।

দ্বিতীয়ত, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ যেখানে সারা দেশে একটি বৃহত্তর প্রেক্ষিতে সাদরে গৃহীত হচ্ছে এবং জনগণের সার্বিক উপকারার্থে এই উদ্যোগের একটি দিগন্তপ্রসারী অবদান থাকবে বলে সাধারণভাবে আশা করা হচ্ছে, সেখানে জনগণের কল্যাণার্থে বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ থেকে জনগণের উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে অনেক সীমিত। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রতি জেলাতে গড়ে যত মামলা দায়ের করাহয় তা সাধারণত কয়েক হাজারের বেশি হবে না এবং এর মধ্যে ফৌজদারি, দেওয়ানি, বাণিজ্যিক, আপিল এবং অন্তর্বর্তীকালীনমূলক আবেদনসমূহও অন্তর্ভুক্ত। বিচার প্রশাসনের কার্যাবলি শুধু তাদের জন্যই ভূমিকা পালন করে যাঁরা আইনের আশ্রয়ে গিয়ে সুবিচার প্রার্থনা করেন। যাঁরা মামলায় যান না, তাঁদের জন্য বিচার প্রশাসনের কোন ভূমিকা নেই,

www.pathagar.com

বিচার প্রশাসনের আশ্রয় নেয়া যে কোন ব্যক্তির পছন্দ অপছন্দের একটি বিষয়। কোন রাষ্ট্র বা সরকারই জনগণকে মামলায় যেতে অনুপ্রাণিত করে না। রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক বিচারপ্রার্থী যেন নিশ্চিতভাবে সুবিচার লাভ করে সেজন্য ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সকলের কাছে বিচার ব্যবস্থাকে অধিগম্য করে তোলা। অনেক লোক অত্যন্ত গরিব বলে আদালতে গিয়ে মামলার মাধ্যমে সুবিচার প্রার্থনা করতে পারে না বা সেজন্য কোন আইনজীবী নিয়োগ করতে পারে না—এটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও একটি স্বতন্ত্র ইস্যু। রাষ্ট্র সক্ষম হলে এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য রাষ্ট্রের তরফ থেকে আইনগত সাহায্য নিয়ে তাদের সহায়তা করা যেতে পারে।

শেষত, কেবল বিচার প্রশাসনের বিষয়টি বিবেচনা না করে নিষ্পত্তিকৃত বিচারের মান রক্ষার বিষয়টিও অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। যারা বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন তাঁদের জ্ঞান, ঐতিহ্য এবং আন্তরিকতা সফল বিচার প্রশাসনের অন্যতম নিয়ামক। সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এ ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে যুক্তি প্রদর্শন করে যে, তাড়াহুড়া করে নিযুক্ত মুন্সেফ এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচার পরিচালনার উপযুক্ত নন। এই পদ্ধতি গ্রামবাসীদের অকারণে মামলার আশ্রয় নিতে উৎসাহিত করছে এবং উপজেলা পর্যায়ে সুবিচারপ্রাপ্তির অনুকূল পরিবেশ না থাকায় সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে নানা দুষ্টচক্র যারা বিচারের প্রক্রিয়াকে কলুষিত এবং দুর্নীতিযুক্ত করে তুলছে। নতুন বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও ধরাছোঁয়ার বাইরে অবস্থান করছেন এবং ফলে সুবিচার ও সাম্যের প্রতিভূ না হয়ে তাঁরা বরং তাঁদের চাকরিকে নির্বাহী প্রতিনিধির তুল্য জ্ঞান করছেন।

হাইকোর্ট ডিভিশনের বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে যে সমস্যার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয় তার গুরুত্ব ছিল আরো সুদূরপ্রসারী। প্রশ্ন করা হয়েছিল নতুন ব্যবস্থায় বিচারকরা সুবিচারের ঐতিহ্য ও আদর্শ যথাযথভাবে বজায় রাখতে পারবেন কিনা? বিশেষ করে সুপ্রিমকোর্টে বিচার প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিচার সম্বন্ধীয় নীতি অনুসরণে নজিরের ভূমিকা। বিদ্যমান অবস্থায় এ নিয়ে নতুনতর সমস্যার উদ্ভব ঘটার আশঙ্কা ছিল এবং সেগুলো সহজে সমাধানযোগ্য ছিল না। তাছাড়া একটি সার্বভৌম দেশে একই সুপ্রিমকোর্টের অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন বেঞ্চ স্বাধীনভাবে বিচার পরিচালনা করলে একই ধরনের ইস্যুতে বিভিন্ন বেঞ্চ থেকে পরস্পরবিরোধী আদেশ ও রায় আসা খুবই স্বাভাবিক। ফলে বিকেন্দ্রীকৃত বিচার প্রশাসন দ্বারা কোন অবস্থাতেই বিদ্যমান পদ্ধতির চেয়ে উন্নততর ধারণাগত বা বিষয়গত ফলাফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। অষ্টম সংশোধনীর পরে ঢাকার বাইরে ছয়টি বেঞ্চ স্থাপন করে তাদের স্বাধীন আইনগত এখতিয়ার দান এবং বিচারকদের বদলি করার অধিকার থাকার ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে। হাইকোর্ট বিভাগের কাঠামোগত এই পরিবর্তন যথাক্রমিক জেলা ও উপজেলায় যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা কেবল আশঙ্কাযুক্তই ছিল না, তা দেশের অখণ্ডতার ওপর জিজ্ঞাসার চিহ্ন নিয়ে আসে এবং সার্বিকভাবে দেশের ও জাতির ঐক্য ও সংহতির ওপর হুমকির সৃষ্টি করে বসে।

www.pathagar.com

সচরাচর সামরিক শাসকরা বিচার বিভাগের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করতে চান না। প্রাথমিকভাবে বিচার বিভাগকে যে কারণে দৃষ্টির বাইরে রাখা হয় সেটি হলো, আদালত আইনের বাইরে কোন কর্মসম্পাদন করতে পারে না এবং দেশ একবার সামরিক আইনের আওতায় চলে এলে আদালত সামরিক আইনের কাঠামোর অধীনেই বিচারকার্য পরিচালনা করেন। বাস্তবে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে যে, আদালতসমূহ সামরিক শাসকদের আইনি ছত্রছায়া দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে সাহায্য করেছে। আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল আইনবহির্ভূত বলে চ্যালেঞ্জ করা হলে সুপ্রিমকোর্ট সেই সরকারকে বৈধতা পেতে সাহায্য করেছিল। প্রধান বিচারপতি মুনীর সে সময় অভিমত দেন যে, যে কোন সরকারের আদেশ যখনই সবাই মেনে নেন, তখন সে সরকারকে বৈধ সরকার বলা যায়। কাজেই যত অবৈধ কিংবা অনৈতিক উপায়েই হোক না কেন, একবার সফলভাবে ক্ষমতা দখল করে নেয়ার পর নয়া সরকারের জারিকৃত আদেশ সবাই মেনে নিলে এবং আদেশ-নির্দেশ পালন করলে সেই ক্ষমতা দখলকে সফল হিসেবে বিবেচনা করা যায় এবং ক্ষমতা দখলকারী সরকারকে বৈধ সরকার হিসেবে প্রতিপন্ন করা যায়।

এরশাদ যখন হাইকোর্টকে বিভক্ত বা বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নেন, তখন এটি এমন একটি পদক্ষেপ ছিল যা সচরাচর সামরিক শাসকরা গ্রহণ করেন না। উপজেলা পর্যায়ে আদালত স্থাপন করার ফলে বিচার প্রশাসনের মৌলিক চরিত্র বা কাঠামোর ওপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল না, বরং অনেকেই এই সিদ্ধান্তকে একটি উত্তম সিদ্ধান্ত হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হারের প্রেক্ষিতে বিচারের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য উপজেলায় আদালত স্থাপন আসলে ছিল সময়ের দাবি। কিন্তু হাইকোর্টকে স্পর্শ করার অর্থ ছিল বিচার বিভাগ নামক প্রতিষ্ঠানকে স্পর্শ করা, যা রাষ্ট্রের একটি অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। এইসব বিচার করে পূর্বের যে কোন সামরিক সরকার সবসময় এই রক্ষণশীল ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছেন এবং ফলে এতদিন যাবৎ সামরিক সরকারের সঙ্গে আদালতের কোন দ্বন্দ্বের কারণ ঘটেনি, কিন্তু এরশাদের এই সিদ্ধান্ত সরকার ও আদালতকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

এর উপকারিতা যাই হোক না কেন, হাইকোর্ট বিভাগ বিভক্ত করার সিদ্ধান্তকে সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন প্রথম থেকেই বিচার বিভাগের ওপর একটি অসম্মানজনক হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করে। ঢাকার বাইরে ডিক্রি বলে স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করে তা এমন সব জায়গায় বসানো হয় যার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। কোন ব্যাখ্যায়িত আদর্শ বা যুক্তির চেয়ে অনেকটা ব্যক্তিগত খেয়ালে এসব স্থান নির্বাচন করা হয়। বিভাগীয় সদরদপ্তর আদালত রাজশাহীতে না করে রংপুরে কেন স্থাপন করা হলো, ঢাকা এবং চট্টগ্রামে একটি করে বেঞ্চ থাকার পর কুমিল্লা এবং সিলেটে কি উদ্দেশ্যে তা বসানো হলো? খুলনা বিভাগীয় সদরদপ্তর হওয়া সত্ত্বেও যশোর বা বরিশালে আদালত স্থাপন করা হলো কেন, ইত্যাদি প্রশ্ন উঠে আসে। এর ওপর এইভাবে একের পর এক হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপন করার পর জনগণ

www.pathagar.com

প্রতিটি জেলায় একটি করে হাইকোর্ট বেঞ্চ বসানোর দাবি জানাতে থাকে। সম্পদে অপ্রতুল একটি দেশে, যেখানে জন অনুপাতে বিচারপ্রার্থীর সংখ্যা নগণ্য, সেখানে এত অধিক সংখ্যক হাইকোর্ট স্থাপন একটি অযৌক্তিক বিষয় বলেই প্রতিপন্ন হতে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে হাইকোর্টে এক বিবাহ বিচ্ছেদ মামলায় ব্যক্তিগত ঝামেলার মুখোমুখি হওয়ার পর একজন জেনারেলের, বর্তমানে পরলোকগত, মাথায় সর্বপ্রথম এই হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের চিন্তা আসে। তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্যের পেছনে ছিল ঢাকায় বসবাসরত বিচারক এবং আইনজ্ঞদের শায়েস্তা করা। একজন বীতশ্রদ্ধ সামরিক জেনারেলের সুপারিশে এরশাদ সায় দেয়ার পর আইনজীবী মহল ও সরকার এবং আইনজীবী মহল ও বেঞ্চের মধ্যে যে বিষময় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তা ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে এক পর্যায়ে এরশাদ সরকারের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই দ্বন্দ্ব ছিল বহুমুখী। প্রাথমিকভাবে ক্ষমতাসীন একজন জেনারেলের প্রতিহিংসাপরায়ণতা থেকে এর উৎপত্তি ঘটলেও পরবর্তীকালে তাঁরা এই বলে হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে যুক্তি দেখাতে থাকেন যে, এতে করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের জনগণকে তাদের বিবাহ সম্পর্কির মামলাসহ অন্যান্য সকল মামলার নিষ্পত্তির জন্য সুদূর রাজধানীতে ছুটে যেতে হবে না। আসলে এক শ্রেণীর আইনজীবী ঢাকায় বসে বসে হাইকোর্টের সব মামলা পরিচালনা করে তরতাজা হতে থাকবেন, অথচ সামরিক সরকারের সরব ও প্রত্যক্ষ সমালোচনা করবেন এটি তারা সহ্য করতে পারছিল না। এরশাদ ধরে নিয়েছিলেন হাইকোর্ট বিভক্ত করার ফলে আইনজীবীরাও বিভক্ত হবেন এবং এতে যারা উপকৃত হবে তাদের এক বিরাট অংশ তাঁকে সমর্থন দেবে। বাস্তবেও দেখা গেল যে, যেসব জেলায় হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ বসানো হয় সেসব জায়গায় আইনজীবীরা এরশাদের সংস্কারকে সমর্থন দিলেন এবং সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেন।

অন্যদিকে সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন হাইকোর্ট বিভাগের বিভক্তির এই পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও বিচার প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার একটি নীলনক্সা হিসেবে অভিহিত করে। আগে থেকেই আইনজীবীরা সামরিক আইনের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ছিলেন। এবার তাঁরা অবতীর্ণ হলেন আরো রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে। এর ওপরও সত্য এই যে, বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বিচারকদের চেয়ে ঢাকাভিত্তিক আইনজ্ঞরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং তাঁরা এই সংস্কারকে তাদের কায়েমী স্বার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বিচার করেছেন। মূলত এইসব আইনজীবীর নেতৃত্বে আইনজীবীদের একটি বৃহৎ অংশ এই ইস্যুতে এরশাদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ও অব্যাহত অবস্থান নিয়ে আইনজীবীদের পাশাপাশি জনমতকেও সংগঠিত করতে নেমে পড়েন এবং অন্যান্য জাতীয় বৃহত্তর রাজনৈতিক ইস্যুর সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে ফেলেন। এরশাদের গোটা নয় বছরের শাসনকাল জুড়ে এই অবস্থা অব্যাহত থাকে।

যাই হোক, সংবিধানের অধিকাংশ অংশ বাতিল করে একটি সামরিক আইন ঘোষণার মাধ্যমে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হলেও সুপ্রিমকোর্ট বার

www.pathagar.com

অ্যাসোসিয়েশন এবং আইনজীবীরা প্রথম থেকেই একে একটি অসাংবিধানিক পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁরা ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপন করে সাংবিধানিক বিধান লঙ্ঘন করার দায়ে তখনকার প্রধান বিচারপতি এফ. কে. মুনিমকে সরাসরি দোষারোপ করে মাসের পর মাস সুপ্রিমকোর্ট বর্জন করেন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে নানা রকম নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কয়েক বছর অবধি একাদিক্রমে প্রধান বিচারপতির কোর্ট বর্জন করা হয় এবং প্রধান বিচারপতি প্রায় তিন বছর কোন আদালতে বসেননি। এভাবে বিচার বিভাগ প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়ে। ফলে সার্বিকভাবে বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি ও মর্যাদাও যথেষ্ট ক্ষুণ্ন হয়। সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের এই রাজনৈতিক ভূমিকায় আইনজীবী মহল কিংবা বেঞ্চে কারোর অবস্থানের মর্যাদা কিংবা খ্যাতি বাড়াতে সাহায্য করেনি। কতিপয় সিনিয়র আইনজীবী মিলে দেশের প্রধান বিচারপতিকে জনসমক্ষে হেনস্থা করে যে অশোভন নজির স্থাপন করেছেন তাতে বিচার বিভাগের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

উপরন্তু এটি ভবিষ্যতের জন্য এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে, কোন সমস্যা সমাধানে আইনগত পদক্ষেপ না নিয়ে আইনজীবীরা তাঁকে রাজপথে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারেন কিংবা প্রধান বিচারপতির ওপর শারীরিকভাবে হামলা চালাতে পারেন। প্রধান বিচারপতি যদি অবৈধ কিছু করে থাকেন কিংবা সংবিধানের কোন বিধান লঙ্ঘন করে থাকেন, তাহলে তার আইনগত প্রতিকার পাওয়ার রাস্তা খোলা ছিল। পক্ষান্তরে প্রধান বিচারপতিকেও প্রথমবার সমালোচনা কিংবা অপমান করার পরই তাঁর অফিস এবং প্রতিষ্ঠানের সম্ভ্রম রক্ষার্থে তাঁর পদত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু বছরের পর বছর নিগৃহীত হওয়ার পরও তিনি তাঁর অফিস আঁকড়ে ধরে বসে থাকায় আইনজীবী মহল এবং বেঞ্চের মধ্যকার তিক্ততা আরো ঘনীভূত হয়। এরশাদ এবং তাঁর সামরিক অফিসাররা যদি সংস্কারের কারণে এই ভুল পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে বলা যায় যে, কতিপয় আইনজীবী যে আচরণ করেছেন তাও শুধু পেশার স্বার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—উভয় গ্রুপই একে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।

পরবর্তীকালে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের একটি সিদ্ধান্ত বলে হাইকোর্ট বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টির চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করা হয়। আদালত অষ্টম সংশোধনীতে আনীত ১০০ অনুচ্ছেদের বিকল্প হিসেবে ঢাকার বাইরে স্থাপিত হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের অংশটি বাতিল করে দেয় এই বলে যে, এতে সংবিধানের বর্ণিত বিধানানুসারে নির্দেশিত হাইকোর্টের গঠন ও বৈশিষ্ট্য এবং এখতিয়ার পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে বলা হয় যে, সংবিধানের মৌলিক চরিত্র ও কাঠামো পরিবর্তনের এই বিষয়টি ছিল আলট্রা ভায়ার্স অর্থাৎ সংবিধানের বহির্ভূত বা অসাংবিধানিক এবং তাই আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না। এটি একটি ঐতিহাসিক রায় ছিল এইজন্য যে, এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত বাংলাদেশের সুপ্রিমকোর্ট সংবিধানবলে গঠিত দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা সার্বভৌম পার্লামেন্টের প্রণীত আইন ও সংশোধনীকে বাতিল করে দেয়। সংবিধান সংশোধনীতে পার্লামেন্টের ক্ষমতা এবং সুপ্রিমকোর্ট পার্লামেন্টের সংশোধনী ক্ষমতা রহিত

www.pathagar.com

করতে পারেন কিনা এ নিয়ে উপরোক্ত রায় বিপুল বিতর্কের জন্ম দেয়। আদালতকক্ষে বসে থাকা চার পাঁচজন বিচারক কি জনগণের ভোটে নির্বাচিত ৩৩০ জন পার্লামেন্ট সদস্যের চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন বা বেশি কর্তৃত্বের অধিকারী এ নিয়ে হাজারো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানকে এক অর্থে অতুলনীয় বলা চলে। কারণ এতে জাতীয় সংসদের হাতে সংবিধান সংশোধন করার দ্ব্যর্থহীন ও চূড়ান্ত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, পার্লামেন্টের মাধ্যমে সংবিধানের যে কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, বিকল্প স্থাপন কিংবা রহিতকরণের মাধ্যমে সংশোধন করা যাবে। এ সংক্রান্ত যে কোন বিল বা প্রস্তাব পার্লামেন্টের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হওয়ার পর সাত দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট তাতে তাঁর সম্মতি প্রয়োগ করবেন। তিনি সাত দিনের মধ্যে সম্মতি না দিলে বিলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইনে পরিণত হয়ে যাবে। কেবল সংবিধানের প্রস্তাবনা, ৮, ৪৮, ৫৬, ৬৮, ৮০, ৯২ক এবং ১৪২ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে গেলে তা গণভোটের জন্য প্রেরণ করতে হবে। ১৪২ অনুচ্ছেদের এই বিধি-নিষেধ ছাড়া অন্য যে কোন আইনের সংশোধনী আনার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের চূড়ান্ত ও একক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে।

যে কোন আইনত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে রায় যতই বিতর্কমূলক হোক না কেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করে তা আইন হিসেবে মেনে নেয়া হয়। পার্লামেন্টে এ নিয়ে পুনরায় সংশোধনী আনা যেতে পারে। কিন্তু না হওয়া অবধি সুপ্রিমকোর্টের রুলিংই বলবৎ থাকবে। এভাবে অষ্টম সংশোধনীর ১০০ অনুচ্ছেদবলে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের আদেশ সুপ্রিমকোর্টের রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিকভাবে রহিত করে দেয়া হয়। এভাবে সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং অব্যাহত প্রতিবাদের মুখে শেষ পর্যন্ত সমস্যাটির সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশ্য ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ১০০ ধারা বলে ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের সেশন বসানোর যে বিধান ছিল যে বিধান অপরিবর্তিত থেকে যায়। তারপরও সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের সেশন বসানো এবং উপজেলা পর্যায়ে আদালত স্থাপনের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁদের বিক্ষোভ অব্যাহত রেখে দেয়।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিটি সরকার কার্যকর সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু তার অধিকাংশই ছিল লোক দেখানো ও উদ্যমহীন। সুবিচারের সমস্যা জাতিকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে, গোটা বিচার ব্যবস্থার ওপর জনগণ আস্থা হারাতে বসেছেন। ক্ষমতায় আসার পরপরই এরশাদ বিচার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণের কাজে হাত দিয়েছিলেন এবং এই বিষয়ে আমার প্রতিক্রিয়া আগেই বলেছি। আমি তখন জেলখানায় ছিলাম। আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যদিও বিষয়টি জটিল এবং স্পর্শকাতর, কিন্তু তারপরও বলতে হয় বিচার ব্যবস্থাকে

www.pathagar.com

মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনাটি যে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। উপজেলা পর্যায়ে আদালত এবং সাতটি জেলা সদরে হাইকোর্ট ডিভিশন স্থাপনকে রাজধানীর বাইরে সকলেই স্বাগত জানায়, বিশেষ করে ঢাকার বাইরের আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থীরা।

এরশাদ সরকারে যোগদান করার পর আমি পড়লাম দ্বিমুখী সঙ্কটে। একদিকে নৈতিকভাবে আমি ছিলাম বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে, অন্যদিকে রয়েছে আমাদের সংবিধানের মৌলিক কাঠামো যা নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতি উপস্থাপন করেছে কতগুলো মৌলিক প্রশ্ন। একদিকে রয়েছে যেমন সামরিক আইন ও শাসনের সাথে বিচার বিভাগ অর্থাৎ আইনের শাসনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, আর অন্যদিকে ছিল জনগণের কল্যাণের প্রশ্ন। তবে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে একথা বলা যেতে পারে যে, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত নিম্ন আদালতের বিস্তৃতিকে আমার কাছে আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি অতি দ্রুত too advanced reform বলে মনে হয়েছে। আর হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ, আমার মতে, ভাল হলেও ছিল সংবিধান পরিপন্থী। সামরিক ফরমান দিয়ে এই সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করা গেলেও পরবর্তী পর্যায়ে সেগুলো রাজনৈতিকভাবে আর রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। হাইকোর্ট ডিভিশনের বিকেন্দ্রীকরণকে আরো মার্জিত করে সংবিধানসম্মত করার জন্য অষ্টম সংশোধনীর প্রতি যদিও আমার সমর্থন ছিল, কিন্তু সেটাও শেষ পর্যন্ত সুপ্রিমকোর্টে টেকেনি। আইনজীবীদের পেশাগত স্বার্থের সঙ্গে যে কোন জনকল্যাণমূলক সংস্কার সংঘাতমূলক হলেই আইনজীবীরা তাঁদের স্বার্থটাকে বড় করে দেখেন। জনস্বার্থ তাঁদের কাছে তখন গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সুপ্রিমকোর্টের রায় এবং আইনজীবীদের আন্দোলনের পরিণতি হিসেবে শেষ পর্যন্ত উপজেলা পর্যায় থেকেও আদালতসমূহ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

৪. ওষুধনীতি

বাংলাদেশের জনগণ দরিদ্র এবং তাদের বেশিরভাগই অশিক্ষিত বলে সবসময়েই শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হন। এই জনগণের মধ্যে পুষ্টিহীনতা ও রোগব্যাধির প্রকোপ ব্যাপক। জনগণ এখানে সাধারণ অসুখবিসুখ সম্পর্কে খুবই অজ্ঞ। স্থানীয় চিকিৎসক এবং তাদের দেয়া ওষুধের ওপর তাদের রয়েছে প্রচণ্ড আস্থা। অন্যদিকে স্থানীয় এবং বহুজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারকরা এখানে এমন অনেক ওষুধ উৎপাদন করছিলেন যেগুলো ছিল অপ্রয়োজনীয় এবং দুর্মূল্য। ওষুধ উৎপাদনকারী এবং আমদানিকারকরা জনগণকে অপ্রয়োজনীয় এবং দুর্মূল্যের ওষুধের বিরাট এক বাজার হিসেবে বিবেচনা করে এসেছিলেন।

ওষুধনীতির মূল লক্ষ্য ছিল অপ্রয়োজনীয় ওষুধের উৎপাদন, আমদানি এবং বিক্রয় নিষিদ্ধ করা এবং জনগণের কাছে কম মূল্যের ওষুধের সহজপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এই নীতিতে জীবনরক্ষাকারী ওষুধ উৎপাদনে মনোনিবেশ করা, জীবনরক্ষাকারী ও প্রয়োজনীয় ওষুধের একটি তালিকার ভিত্তিতে ওষুধ ও ভেষজাদি বিপণন সীমিত করা এবং তাৎক্ষণিকভাবে ওষুধপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা। এ ব্যাপারে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক—

www.pathagar.com

উভয় ক্ষেত্রে বহু ধরনের কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের অস্তিত্ব থাকায়, একদিকে ওষুধনীতি প্রণয়ন যেমন কোন সহজ কাজ ছিল না অন্যদিকে ঐ নীতির নিরুপদ্রব বাস্তবায়নও ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

১৯৮২ সালের ওষুধ অধ্যাদেশ জারি করে ওষুধের উৎপাদন, আমদানি, সরবরাহ ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে গোটা ওষুধ সাম্রাজ্যকে একটি আইনগত কর্তৃপক্ষের অধীনে নিয়ে আসার লক্ষ্যে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই সংস্কার শুরু করতে গিয়ে ২৬৫টি আইটেমের ওষুধ প্রথম তিন মাসের মধ্যে ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দিয়ে আরো ৭৪২টি আইটেম নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। একইসঙ্গে আরো ১৩৪টি আইটেমের উৎপাদন ও বিক্রয় অধ্যাদেশ জারির ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়। নিষিদ্ধ ঘোষিত ও বাতিলকৃত ওষুধের কাঁচামাল আমদানি ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। তৈরি ওষুধ এবং আমদানিকৃত কাঁচামালের সর্বোচ্চ বাজারদর স্থির করার দায়িত্ব সরকার নিজের কাঁধে তুলে নেন। বিদেশী যে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিদ্যমান যে কোন ধরনের লাইসেন্সভিত্তিক চুক্তি বাতিল করার অধিকারও সরকারের হাতে সংরক্ষিত থাকে। মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি উৎপাদনকারী ইউনিটে একজন করে রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ওষুধের বিজ্ঞাপনী প্রচারের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এই আইনে কেবল লাইসেন্সের অধীনে বিদেশী কোম্পানিকে বাংলাদেশে ওষুধ উৎপাদনে অনুমতি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং বাংলাদেশে মূল বিদেশী কোম্পানির কোন কারখানা না থাকলে সেই কোম্পানির মাধ্যমে তৃতীয় কোন উৎপাদনকারী পক্ষের ওষুধ বাংলাদেশে বিপণন নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। আইনবলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত ওষুধের ক্ষুদ্র একটি তালিকা প্রস্তুত করে কেবল জীবনরক্ষাকারী ও প্রয়োজনীয় ওষুধের মধ্যে সেই তালিকা সীমিত রাখা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই অপ্রয়োজনীয় ওষুধের উৎপাদনকারী ও আমদানিকারকরা সরকারের এই বৃহদায়তন সংস্কারের ব্যাপারে কোন অনুকূল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেননি। বিশেষ করে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলো এতে খুব ক্ষুব্ধ হয়। এতদিন যাবৎ তাঁরা তাঁদের ওষুধ জনগণের কোন উপকারে আসল কি না আসল, সেসব বিবেচনা না করে বাংলাদেশকে তাঁরা নিজেদের পণ্যের বিশাল এক বাজার হিসেবে বিবেচনা করে আসছিলেন। ওষুধনীতিতে প্রয়োজনীয় ওষুধ বা কাঁচামাল বাছাই করতে গিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে ভুলভ্রান্তি ও নিয়মবহির্ভূত পদক্ষেপ নেয়া হলেও সংস্কার তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। বিশেষ করে বহুজাতিক ওষুধ উৎপাদনকারীরা হয় জীবনরক্ষাকারী ও প্রয়োজনীয় ওষুধ উৎপাদনে উৎপাদনকে সীমিত করে, আর না হয় অন্যান্য বিকল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। যারা এর কোনটাই করতে পারেনি তারা ব্যবসা গুটিয়ে চলে যায়। বাকিরা দেশে থেকে নয়া ওষুধনীতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়।

অন্যদিকে এই ওষুধনীতি থেকে জাতি ও জনগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়। এই নীতির ফলে প্রয়োজনীয় ওষুধের কম মূল্যে সহজপ্রাপ্তি নিশ্চিত হয় এবং অপ্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

ওষুধ সেবনে জনগণ নিরুৎসাহিত হয়। এই নীতির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে, বাংলাদেশ সহজেই প্রয়োজনীয় ওষুধ উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যায়। ওষুধের মান বিশেষভাবে উন্নত হয় এবং দেশীয় উৎপাদনকারীর সংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। অপরদিকে আমদানি কমে যাওয়ায় সরকারের প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়।

এরশাদ সরকারের ওষুধনীতি ছিল একটি যুগান্তকারী সুদূরপ্রসারী সংস্কার এবং শিল্পমন্ত্রী হিসেবে এই নীতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এই নতুন নীতির ফলে দেশে ওষুধের গুণগত মান উল্লেখযোগ্য হারে উন্নত হয়। ১৯৮১ সালে যেখানে নিম্নমানের ওষুধ উৎপাদন ছিল মোট উৎপাদনের ৩৬ শতাংশ, ১৯৯১ সালে তা নেমে আসে ৯ শতাংশে। সংস্কারের আগে দেশে ব্যবহৃত মোট ওষুধের মাত্র ৩০ শতাংশ আসত স্থানীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে, যা বেড়ে উন্নীত হয় ৮০ শতাংশে। ১৯৮২ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী দশ বছরে যেখানে পণ্য মূল্য বেড়েছে শতকরা ১৭৩ ভাগ, সেখানে একই সময়ে ২৫টি প্রয়োজনীয় ওষুধের মূল্য বেড়েছে মাত্র ২০ ভাগ। এর আগে আটটি বহুজাতিক ওষুধ কারখানা উৎপাদিত ওষুধের ৬৫ ভাগ এবং মোট বাজারের ৭৫ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করত। সংস্কারের পর উৎপাদন ও বাজার উভয়ের ৬০ ভাগ চলে আসে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের নিয়ন্ত্রণে। সরকারি খাতে প্রায় ৭০ শতাংশ ওষুধের সরবরাহ আসতে থাকে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে।

ওষুধনীতির প্রধান সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হয় যে, এর মাধ্যমে কতিপয় বহুজাতিক কোম্পানিকে বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে নিষিদ্ধ ঘোষিত ওষুধের চোরাচালান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, ইত্যবসরে নতুন নতুন যেসব ওষুধ বের হয়েছে জনগণ তার ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এসব সমালোচনা আংশিকভাবে সত্য হলেও ওষুধনীতি থেকে যে ব্যাপক উপকার পাওয়া গেছে, এসব সমালোচনা দিয়ে তাকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রায় ১৬০০ অপ্রয়োজনীয় ওষুধ নিষিদ্ধ করা ছাড়াও ওষুধনীতি যেসব ক্ষেত্রে সাফল্যজনক ও ইতিবাচক অবদান রেখেছে সেগুলো হলো:

প্রথমত, প্রয়োজনীয় ওষুধের স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; দ্বিতীয়ত, ওষুধের বাজার মূল্য স্থিতিশীল আকার ধারণ করেছে; তৃতীয়ত, ওষুধের মোট উৎপাদনের সিংহভাগ চলে এসেছে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের নিয়ন্ত্রণে; চতুর্থত, আমদানিকৃত ওষুধের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছে এবং ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে এবং শেষত, ওষুধের গুণগত মান আশাতীতভাবে উন্নত হয়েছে।

৫. ভূমি সংস্কার

ভূমিহীন কৃষক আর ভূমি সংস্কারের জন্য আমার বরাবরই একটি গভীর আগ্রহ ছিল। আমি সরকারে যোগদান করার আগেই ১৯৮২-৮৪ সালে সামরিক আইনের অধীনেই

www.pathagar.com

ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে এরশাদ অনেক দূর এগিয়ে যান এবং আইন প্রণয়নসহ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আমি সরকারে যোগদান করার পর এই সংস্কারকে সফল করার জন্য আরো বেশ কিছু নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেই এবং সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করি।

ভূমি সংস্কার বিষয়ক কমিটি এবং নতুন আইন

ভূমি ব্যবস্থাপনা একটি জটিল বিষয় এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এখানে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় প্রায় ১২ কোটি মানুষ বাস করে যে কারণে এদেশটি পৃথিবীর সবচেয়ে অন্যতম ঘন জনবসতিপূর্ণ দেশ হিসেবে স্বীকৃত। সারা দেশে চাষাবাদের উপযোগী ভূমির পরিমাণ ২ কোটি ৬০ লাখ একর। দেশের মাত্র ১০ শতাংশ গ্রামীণ ভূমিবান প্রায় ৫১ শতাংশ জমির মালিক এবং ৮০ শতাংশ লোকের মালিকানায় রয়েছে মাত্র ২৫ শতাংশ জমি। ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা প্রতি বছর বেড়ে চলেছে। এই বৃদ্ধির হার ১৯৬০ সালে ২৮ শতাংশ, ১৯৬৮ সালে ৩১ শতাংশ এবং ১৯৮২ সালে ৪৮ শতাংশ। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। অন্যদিকে মাত্র ১০ শতাংশ জমির মালিক নিজে চাষাবাদ করেন, ৪৩ শতাংশ জমির মালিক কৃষি শ্রমিক ব্যবহার করেন, ৩৮ শতাংশ জমি মালিক বর্গাদারের ভিত্তিতে এবং ক্ষুদ্র চাষীরা মাত্র ৪ শতাংশের কিছু বেশি জমি চাষ করেন। অন্যভাবে বলা যায়, মোট ৪৩ শতাংশ চাষযোগ্য জমির মধ্যে প্রায় ৩৯ শতাংশ জমি বর্গাপ্রথার অধীনে চাষাবাদ করা হয়।

চাষ ও বিতরণের বিদ্যমান পদ্ধতি উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানুষ ও জমির অনুপাত যুক্তিসঙ্গত করা সম্ভব হলে এই উৎপাদনের হার বহু গুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব। বর্গাদার এবং কৃষি শ্রমিকেরা জাতির জন্য প্রধান উৎপাদক শক্তি হলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ তাঁরা বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হয়েছেন। এর আগে বহুবার ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপ নেয়া হলেও বিশেষ করে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে তা কখনো সফল হয়নি। বর্গাদার এবং কৃষি শ্রমিকদের কখনো তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যহিসসা কিংবা ন্যায্যমজুরি বা তাদের ফসলের জন্য ন্যায্যদাম দেয়া হয়নি। অন্যদিকে জমির ওপর বা তা ব্যবহার করার ওপর তাদের অধিকারের বিন্দুমাত্র নিশ্চয়তা নেই এবং যে কোন সময়ে মালিকেরা তাঁদের জমি থেকে বিতাড়িত করতে পারেন। এরা লাঙল, বীজ, গরু-বলদ, সার, পানি, বিদ্যুৎসহ সব ধরনের কৃষি উপকরণ নিজ ব্যয়ে জোগাড় করে চাষাবাদ করেন, কিন্তু উৎপাদিত মোট ফসলের ৫০ ভাগ চলে যায় জমির মালিকের ঘরে। ন্যূনতম মজুরির কোন নিশ্চয়তা না থাকায় কৃষি শ্রমিকেরা জমির মালিকের করুণানির্ভর ক্রীতদাসের ন্যায় জীবনযাপন করেন। যে জমির ওপর বর্গাদার চাষ করেন, কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সে জমির ওপর তার বিন্দুমাত্র অধিকারও থাকে না। একজন কৃষি শ্রমিক কখনো জানে না, কত মাস, কত দিন, কত ঘণ্টা ভূমি মালিক তাঁকে কাজে বহাল রাখবেন।

www.pathagar.com

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সরকারি মালিকানাধীন বা খাস জমির আবাদ এবং বণ্টন। গত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন সরকার এসব খাস জমি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে চাষের জন্য বণ্টন করে দিচ্ছেন বা তাঁদের বসতিস্থাপনের জন্য বিতরণ করছেন। ভূমিহীন পরিবারের সাধারণ সংজ্ঞা হলো যাঁদের কোন বসতভিটা বা চাষযোগ্য জমি নেই, যাঁদের বসতভিটা আছে কিন্তু চাষজমি নেই কিংবা যাদের দুটোই আছে, কিন্তু চাষজমি আধা একরের কম। এই শ্রেণীর জনগণ মূলত কৃষির ওপর পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল এবং তাদের জীবনধারণের অন্য কোন অবলম্বন নেই। বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ভূমি বৈশিষ্ট্যের কারণে সরকারের পক্ষে খাস জমির সঠিক পরিমাণ নির্ণয় কখনো সম্ভব হয়ে ওঠে না, কিন্তু তারপরও সাগর ও নদীবিধৌত চরাঞ্চলসহ মোট খাস জমির পরিমাণ ১৫ লাখ একরের বেশি হবে না। জমির জরিপ একটি জটিল বিষয় এবং খাস জমি সরকারি মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার কাজটি আরো বেশি জটিল ও শ্রমসাপেক্ষ।

এসব বিবেচনায় রেখে মূলত ভূমিহীন পরিবারবর্গকে উৎপাদনশীল করে তোলা এবং তাঁদের পুনর্বাসনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভূত হয়ে আসছিল। যেহেতু গ্রামাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবার জমির ওপর নির্ভরশীল থাকলেও তাদের নিজস্ব কোন জমি নেই, সেহেতু ভূমি সংস্কারের মূল কর্মকাণ্ডটিই হচ্ছে ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বিতরণ এবং জমির মালিকদের ভূমির ওপর মালিকানা সীমিত করে দেয়া।

বাংলাদেশের ভূমি সারা বিশ্বে উর্বরতম ভূমির মধ্যে অন্যতম। এ ভূমিতে আগামী এক দশক কিংবা তৎপরবর্তীকালের জন্য দেশের গোটা জনগণের চাহিদার সমান খাদ্যোৎপাদনের সুযোগ রয়ে গেছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিবেচনায় রাখলেও দেশীয় উৎপাদন দ্বারা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব। সে কারণেই জমির দাম উত্তরোত্তর বাড়ছে এবং এ কারণেই জমির ওপর বাড়তি জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে এবং অনিবার্য কারণে জমির অব্যাহত বিভক্তিতে দেশে ক্রমাগতভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশে দায়েরকৃত মামলাগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা ভূমিবিরোধ সংক্রান্ত। তদুপরি জমির মালিকানার ধরন, হস্তান্তর, মালিকানার অধিকার, উত্তরাধিকার আইনে মালিকানা বণ্টন এবং ভূমিহীনতার ফলে উদ্ভূত জনগণের স্বাভাবিক দারিদ্র্য ইত্যাদির সংমিশ্রণ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়টিকে ভয়ানক দুরূহ ও জটিল করে তুলেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন পর্যন্ত কৃষিভিত্তিক। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ এখনো ভূমির ওপর নির্ভরশীল। মোট জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান প্রায় ৪০ শতাংশ এবং মোট রপ্তানি আয়ে কৃষির অবদান প্রায় ৬০ শতাংশ। দেশের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ জমি ব্যবস্থাপনা এবং জমির ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করছে। ভারত বিভক্তির পর থেকে নীতি প্রণেতাদের কাছে এই ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সবচেয়ে জরুরি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে থেকে শুরু করে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমি সংস্কারের দাবি উঠেছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিটি দলীয় ইশতেহারে, প্রতিটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এবং প্রতিটি সরকার ভূমি সংস্কার কর্মসূচির প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন যে, যাঁরা জমিতে কাজ করেন এবং যাঁরা জমির ওপর নির্ভরশীল, তাঁদের জন্য সর্বোচ্চ সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

ব্রিটিশ শাসনামলে এই দাবির প্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে চাষী ও কৃষি শ্রমিকদের উদ্যোগে ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। নীলচাষ এবং তেভাগা আন্দোলনের ঐতিহাসিক ঘটনা এখনো দেশের বর্ষীয়ান প্রজন্মের স্মৃতিতে জাগরূক। স্বাধীনতার পর মুজিবের সামনে নব্যস্বাধীন এই দেশের এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব এসে পড়ে। তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করতে গিয়ে মুজিব বাংলাদেশ ভূমি মালিকানা (সীমিতকরণ) আদেশ ১৯৭২ জারি করে পরিবার পিছু জমির মালিকানা ১৯৫০ সালের ৩৭৫ বিঘা থেকে ১০০ বিঘায় সীমিত করে দেন। এছাড়াও আওয়ামী লীগ সরকার জমির জন্য অনাদায়ী খাজনা, রাজস্ব ও সুদ মওকুফ করে দেন এবং বিভিন্ন আদালতে চাষীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত প্রায় ৬০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা খারিজ করে দেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির অধিকারী পরিবারের ভূমিকর মওকুফ করে দেয়া হয়। তার এই সংস্কার ছিল স্পষ্টতই জমির মালিকানা বেধে দেয়ার ওপর কেন্দ্রীভূত এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয় একটি ঘোষিত আইনের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়। অত্যন্ত সীমিত সুযোগ সৃষ্টি করলেও মুজিবের এই নীতিমালা ছিল সঠিক পথের লক্ষ্যে কমপক্ষে একটি প্রসংশনীয় পদক্ষেপের সূচনা।

এছাড়াও মুজিব ভূমিহীন এবং দেড় একরের কম মালিকানায় চাষীদের মধ্যে খাস জমি বিতরণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নদীবিধৌত চর সরকারি মালিকানায় নিয়ে আসার পক্ষে একটি আইন জারি করেন। এর আগের আইনানুযায়ী নদী ভাঙার কবলে পড়ে জমি বেহাত হওয়ার পর ২০ বছরের মধ্যে চরের আকারে সেই ভূমি জেগে উঠলে কিংবা নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে হারানো জমির আশপাশে চর দেখা দিলে জমির মালিকরা তাঁর আইনগত মালিকানা দাবি করতে পারতেন। কিন্তু মুজিব সেই আইন বাতিল করে নদীতে জেগে ওঠা যে কোন চরাঞ্চল সরকারি মালিকানায় নিয়ে এনে তা ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত নেন।

এরপরও মুজিবের কর্মসূচিকে একটি ব্যাপক সংস্কার বলে চিহ্নিত করা যায় না এবং কার্যকর কোন রাজনৈতিক দিক্‌নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে এই পরিকল্পনা ইতিবাচক কোন ফল প্রদর্শন করতে পারেনি। তৎকালীন উত্তপ্ত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সরকারের পক্ষে খাস জমি প্রকৃত ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা কিংবা নতুন জেগে ওঠা চর সরকারি মালিকানায় নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। আইনে পরিবার প্রতি জমির পরিমাণ ১০০ বিঘায় সীমিত করে উদ্বৃত্ত জমি সরকারের কাছে প্রত্যর্পণের বিধান থাকলেও ১৯৭৬ সাল নাগাদ মাত্র ৩১,২৫০ একর জমি সরকারের হাতে সমর্পণ করা হয়।

তবে যে কোন সরকারের বেলায় ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণের অভিজ্ঞতা সবসময়ে হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। সযত্ন-চর্চিত কোন কর্মসূচির আওতাধীনে

www.pathagar.com

এসব উদ্যোগ পরিচালিত হয়নি বলে একদিকে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি, অন্যদিকে তেমনি ভূমিহীনদের একটি উৎপাদক শক্তি হিসেবে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন একজন ব্যক্তি হলেন সবচেয়ে অসহায় ব্যক্তি। দূরবর্তী অঞ্চলে তাঁকে একখণ্ড জমির মালিকানা দিয়ে দিলে যেমন তিনি ভূমিহীন শ্রেণী থেকে ভূস্বামী শ্রেণীতে উন্নীত হয়ে যান না, তেমনি দেশের উৎপাদনকারী মূলধারায় সহসা নিজেকে সম্পৃক্ত করে নেয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রথমত, জমির মালিকানা পেলেও তা দখল করা বা দখলে রাখার মত সামাজিক ক্ষমতা তাঁর নেই। দ্বিতীয়ত, জমিতে চাষ করা বা প্রয়োজনীয় চাষোপকরণ সংগ্রহ করার মত আর্থিক সঙ্গতি তাঁর নেই। ফলে একদিকে তিনি জমির দখল নিতে ব্যর্থ হন এবং অন্যদিকে দখল নিতে পারলেও তাতে চাষ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। জোতদাররা হয়তো তাঁকে জমির দখলদারিতে বাধা দেন কিংবা নামমাত্র মূল্যে ঐ জমি বিক্রি করে ফেলার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। ফলে ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বিতরণের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। সে কারণেই পূর্ববর্তী যে কোন সরকারের আমলেই ভূমি সংস্কার কর্মসূচি ইতিবাচক কোন ফলাফল নিয়ে আসতে পারেনি।

এদেশে তাই যে কোন ধরনের ভূমি সংস্কারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত (১) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা অর্থাৎ জমির উৎপাদন শক্তি বাড়ানো; আর (২) কৃষকের মজুরি এবং উৎপাদনের ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করা। এ দুটো কথা বা লক্ষ্যকে মনে রেখে সংস্কারের পথে এগুতে হবে। উপরোক্ত দুটি লক্ষ্যই যে কোন সমাধান বা প্রস্তাবের চূড়ান্ত ফলাফল হতে হবে। এ দুটি লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যে কোন যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা সময়ের দাবি। জমির নতুন সিলিং বা জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ বা বর্গাদারকে জমির ওপর স্বত্ববান করা বা আরো যেসব প্রস্তাব আছে সেগুলোর গুণগত গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে ঐসব প্রস্তাব উপরোক্ত দুটি শর্ত বা লক্ষ্যকে পূরণ বা অর্জন করতে পারবে কি না। আমাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে যেভাবেই বর্ণনা করা হোক না কেন—তা উপপুঁজিবাদই হোক বা আধা সামন্তবাদই হোক বা পেটি বর্জুয়াই হোক—উপরোক্ত শর্তগুলোই বর্তমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে একমাত্র প্রয়োগযোগ্য লক্ষ্য হতে পারে। মার্ক্সিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়তো উপরোক্ত লক্ষ্যগুলো যথেষ্ট হবে না—তারা সার্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন করে তারই আওতায় বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে ভূমি সংস্কারকে একটি অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করবে—একটি total frame work-এর অধীনে শ্রেণীবিন্যাস এবং সকল উৎপাদন শক্তির নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করবেন। সুতরাং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভূমি সংস্কার এই ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন শাসকবর্গ (intermediate regime) করতে সক্ষম নয়। কিন্তু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চাপে এই ধরনের সরকার তাদের নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে ভূমি সংস্কারের কথা বলে অনেক সময় তার সঠিক সীমারেখা টানতে ভুল করে। বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে মার্ক্সিস্ট চিন্তাধারার জট বাধিয়ে ফেলে এবং তার ফলে যে পরস্পরবিরোধিতার সৃষ্টি হয়, তাকে এড়াতে পারে না। এই কারণে intermediate regime-রা ভূমি সংস্কারের

www.pathagar.com

ব্যাপারে কোন বলিষ্ঠ বা পরিচ্ছন্ন ধারণার জন্ম দিতে প্রায় সময় ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত তারা কোন ভূমি সংস্কারের কর্মসূচি সফল করতে পারে না।

তাই এ ব্যাপারে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং কাঠামো সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকতে হবে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঠিক যতখানি করা সম্ভব ততখানিই হাতে নেয়া উচিত হবে। নিজেদের ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা—দুটোকেই বিচার করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে হবে। আমাদের দেশে শুধু যে জমির পরিমাণ অতি কম তাই নয়, জমি এবং মানুষের সম্পর্কও অত্যন্ত জটিল। আজকে যদি দেশে একটি মার্ক্সিস্ট সরকার থাকত বা সেরকম কোন সরকার ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা দেখতাম, তাহলে ব্যাপারটা হয়তো সহজ হতো। একটি নির্দিষ্ট theory সেখানে রয়েছে, যা প্রয়োগ করা হতো। কিন্তু যেহেতু সেটি নেই তাই সেই দিকটা আলোচনা করেও লাভ নেই। শুধু এটুকু বললেই চলে যে, আমাদের আর্থ-সামাজিক বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে আপাতত ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য হিসেবে ওপরে উল্লেখিত দুটি লক্ষ্যকে ধরে নেয়াটা অযৌক্তিক হবে না।

কোন আদর্শিক polemics-এ না গিয়ে কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মজুরি ও উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভূমি সংস্কারের প্রশ্নে আসা যাক। এ ব্যাপারে যে কোন পদক্ষেপই নেয়া হোক না কেন এর সাথে দেশের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ জড়িত। যে কোন প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে গেলেই ব্যাপারটির একটি গভীর রাজনৈতিক আকার ধারণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই প্রথমেই বলা দরকার যে কোন অরাজনৈতিক সরকারের জন্য ভূমি সংস্কারের কোন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব নয়। নিলেও সেটা তারা বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। দুর্নীতি, হয়রানি এবং সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট তাতে শুধু বাড়বেই, কমবে না। এমনকি সকল ধরনের রাজনৈতিক সরকারগুলোর পক্ষেও এ ধরনের কোন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে ওঠে। বাকশালের আমলে জমির মালিকানা না নিয়ে প্রতি গ্রামে বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায়ের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগেই সেই সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। আওয়ামী লীগ সরকার একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, জমির মালিকানার সিলিং পরিবার পিছু ১০০ বিঘায় নামিয়ে দেয়া, জমির ঐ সিলিং এখন ৬০ বিঘায় নামিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু ঐ লক্ষ্য পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি বলেই অনেকের বিশ্বাস। এই সিলিং নির্ধারণের ফলে মাত্র ৩১ হাজার একর জমি সরকারের হস্তগত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের এত জনপ্রিয়তা, এত বড় একটি রাজনৈতিক সংগঠন এবং দেশে স্বাধীনতা-উত্তরকালের অত উৎসাহ উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের এর চেয়ে বেশি কিছু অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তাই একথা আমরা যেন ভুলে না যাই যে, উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আমরা যে কোন পদক্ষেপই নেই না কেন তাকে বাস্তবায়ন করার জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক সংগঠন এবং নেতৃত্ব সকল পর্যায়ে থাকতে হবে। একটি নিবেদিত রাজনৈতিক কর্মীবাহিনী থাকতে হবে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত ভূমি সংস্কারের যে কোন পদক্ষেপকে কার্যকরী করার জন্য। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ শুধু অত্যন্ত গরিবই নয়, উপরন্তু নিরক্ষর এবং একেবারে

www.pathagar.com

উপায়হীন ব্যক্তি। তার অধিকার আদায় এবং প্রয়োগের ভার থানার গুটিকয়েক আমলা ও টাউটদের হাতে দিলে তার জীবন আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। তার যা আছে সেটাও সে হারিয়ে ফেলতে পারে। তাই রাজনৈতিক কর্মীদের সক্রিয় সাহায্য এবং সহায়ক নির্দেশনা ছাড়া তার পক্ষে এই জটিল বিষয় মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

ভূমি সংস্কারের ওপর উল্লিখিত দুটি লক্ষ্য অর্জন করার জন্য তাই যে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হোক না কেন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সংগঠন ছাড়া সেসব পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। এইক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভূমির ব্যাপারে যে কোন ধরনের সংস্কারমূলক পদক্ষেপ জাতীয় অর্থনৈতিক নীতিমালা বা কাঠামোর বাইরে কোন আলাদা ইস্যু হিসেবে নেয়া সম্ভব হবে না। অর্থাৎ শিল্প খাতে এক নীতি আর কৃষি খাতে আর এক নীতি, শহরে এক নীতি আর গ্রামে আর এক নীতি এটি শুধু পরিস্পরবিরোধীই হবে না, এটি হবে অবাস্তব পদক্ষেপ। সে ধরনের কোন পদক্ষেপ শুধু নৈতিক কারণেই নয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। শহরে এবং শিক্ষা খাতে পুঁজিবাদী নীতিমালা প্রয়োগ করে গ্রামে এবং কৃষি খাতে সমাজতান্ত্রিক বা অন্য কোন নীতিমালা গ্রহণ করলে তা ফলপ্রসূ হবে না। কারণ ঐ পদক্ষেপকে শহরের পুঁজিবাদী শক্তি বানচাল করে দেবে। এখনো দেশের জমি নিয়ন্ত্রণ করে শহরের বাবুরাই। শ্রেণীগতভাবে জোতদাররা শহরের আমলা-মুৎসুদ্দী-পুঁজিপতিদেরই একটি অংশ। তাঁদের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন। ভূস্বামীদের জমির সিলিংয়ের সাথে শহরের শিল্পমালিকদের সিলিংবিহীন সম্পদ উপার্জন করার খোলা নীতি একসাথে চলতে পারে না। সেখানে শ্রেণীগতভাবে তারা দুজনেই মিলে সেটাকে প্রতিহত করবেন। তার কারণ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁদের সম্পর্ক এবং স্বার্থ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে গাঁথা রয়েছে।

আওয়ামী লীগ শহরে বা শিল্পকারখানার জাতীয়করণ করে দেশে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিল, কিন্তু তবুও গ্রামে বা জমির ব্যাপারে ঐ সিলিং নির্ধারণ করে দেয়া ছাড়া আর এগোতে পারেনি। অনেকে হয়তো বলবেন যে, আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক কোন দল ছিল না বা সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য উপযুক্ত সংগঠন ছিল না, কিন্তু সেটি সত্য বা অসত্য যাই হোক, এখানে যেটি বিবেচ্য বিষয়, তা হলো জাতীয়ভাবে সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করেও গ্রামের জমি-মানুষের সম্পর্কের জটিলতার কারণে এবং দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার পেরিপ্রেক্ষিতে কৃষি জমির ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা কতটুকু প্রয়োগ করা সম্ভব সেটিও পরীক্ষা করার বিষয়। অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা হলেও, কৃষি খাতে বা ভূমির বিষয়ে সংস্কার আনাটা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অতটা সহজ হবে না। সেখানে পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক কাঠামো দাঁড় করানো খুব কষ্টসাধ্য হবে, যদিও এটি মূলত বাস্তবায়নের সমস্যার সাথে জড়িত বিষয়।

ভূমিহীনদের সমস্যাও আমাদের অজানা নয়। তাঁদের সংখ্যা এত বেশি যে, ১০০ বা ৬০ বিঘার ওপরে সকল জমিও যদি সরকারের হাতে আসে তাহলেও ভূমিহীনদের

www.pathagar.com

অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশকেই পরিমাণ মত জমি দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব কিনা তাতে অনেক সন্দেহ রয়েছে। ভূমিহীনদের শুধু জমি দিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান হবে না।

তার দখলিস্বত্ব বা দখলের নিশ্চয়তা দিতে হবে। তারপর তার লাঙল, গরু এবং বসতবাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাকে চাষের উপকরণসমূহ দিতে হবে। তাহলেই সে উৎপাদক শক্তি হিসেবে সমাজের অর্থনীতিতে অংশ নিতে পারবে। এখন তাঁরা জমির দখলই নিতে পারেন না জোতদারদের দাপটে—আর দখল নিলেও পুঁজির অভাবে সেই জমি তিনি আর চাষ করতে পারেন না—অত্যন্ত নিম্নমূল্যে তিনি ঐ জমি বিক্রি করে দেন, তারপর দিনমজুর বা বর্গাদার হিসেবে নিজের জমি নিজে চাষ করেন।

তাই ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে আবেগ এবং হঠকারিতা দুটোকেই দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সংগঠন ছাড়া এই কাজে হাত দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। যে দিনমজুর এখন কাজ করে খাচ্ছে বা যে বর্গাদার এখন তাদের চাষের জমির কিছুটা নিশ্চয়তা ভোগ করে, সেটিও তাদের হাত থেকে চলে যেতে পারে। আমলা টাউটদের খপ্পরে পড়ে তারা নিঃস্ব হয়ে যেতে পারে। সামরিক সরকার জাতীয় পর্যায়ে শহরে এবং শিল্প খাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে জোরদার করেছে তাই ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে খুব বেশি কিছু তারা করতে পারেব বলে মনে হয় না। কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ তারা বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

জমির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সকল জমির পূর্ণ ব্যবহার অত্যাবশ্যক এবং দেশের একটি বিরাট জনসমষ্টি, যারা বেকার বা ভূমিহীন বা বর্গাদার, তাদেরকে আরো সক্রিয়ভাবে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় জড়িত করা প্রয়োজন। জমির সিলিং নির্ধারণ করে বাড়তি জমি তাদের মধ্যে বিলি করে বা তাদেরকে ভোগস্বত্ব দিয়ে স্বত্ববান করে ইনসেনটিভ দেয়া এবং উৎপাদক শক্তি হিসেবে আরো জোরালোভাবে কাজে লাগালে কৃষি উৎপাদন বাড়বে এই আশা নিয়েই উপরোক্ত ক্ষেত্রে সংস্কারের কথা বলা হয়। এখানে সামাজিক বৈষম্য দূর করার কথাটা নাই বা বললাম কারণ সেটা বললেই শহরের এবং শিল্প খাতের প্রশ্নটা চলে আসে। আমরা এখানে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদনের শ্রম আর উৎপাদনের ন্যায্যমূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই। কিন্তু এরপর ও সিলিং নির্ধারণ, ভূমি বণ্টন এবং tenancy right-এর প্রশ্ন এসে যায়। আর উঠে আসে কোন না কোন রকমের সংস্কারের প্রশ্ন এবং তা বাস্তবায়ন করার সমস্যা। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি করার আরো অনেক পন্থা রয়েছে। কৃষি উপকরণ সহজে এবং সস্তায় কৃষকদের কাছে পৌঁছালে যে কোন সংস্কারের চেয়ে হয়তো দ্রুত ফল দিতে পারত। উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ, পানি, বিদ্যুৎ এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি নিম্নতম ন্যায্যমূল্য-পণ্যসামগ্রী এবং শ্রম, দুটোর জন্যই, যদি ব্যবস্থা করা যেত তাহলে হয়তো ভূমি সংস্কারের জটিল এলাকায় হস্তক্ষেপ না করে অনেক সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব হতো। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ন্যায্যমূল্যের সাথে সাথে কৃষকের কর্মসংস্থান এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। তাই শিল্প ক্ষেত্রের মত কৃষিতে

www.pathagar.com

একটি উদারনীতি গ্রহণ করা দরকার। কৃষিঋণ নয়, কৃষি উপকরণ দিতে হবে সময়মত কৃষকদের হাতে। শিল্প খাতে গুটিকয়েক মানুষের জন্য বিরাট সাহায্য-সহযোগিতা এবং নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা, ট্যাক্স মওকুফ থেকে শুরু করে সহজ শর্তে ঋণ সবই দেয়া হয়। হিসাব করলে দেখা যাবে যে শিল্প খাতে মাথাপিছু যে সুযোগ-সুবিধা এবং শত ধরনের সাবসিডি দেয়া হয় তার তুলনায় কৃষকরা আলাদাভাবে যা পায় তা অতি নগণ্য। তাই কৃষি খাতে একই মনোভাব এবং নীতি যদি পোষণ করা হয় এবং সার, বীজসহ অন্যান্য উপকরণ সস্তা, সহজলব্ধ করার পরিকল্পনা নেয়াটাই অনেক বেশি বাস্তবমূখী পদক্ষেপ হবে। এর সাথে কৃষি শ্রমের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্যের যদি নিশ্চয়তা বিধান করা যায় তাহলে ভূমি সংস্কারের যে দুটি মূল লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো অর্জন করা সহজতর হবে। এইক্ষেত্রে এবং এই লক্ষ্যকে আরো কার্যকরভাবে অর্জন করার জন্য বহুমুখী নয়, পণ্যভিত্তিক গ্রাম সমবায় গঠন করার প্রয়োজন।

এরশাদ ভূমি সংক্রান্ত সমস্যাদি সমাধান করার জন্য সকল ক্ষেত্র চিহ্নিত করে একটি ব্যাপক কর্মসূচি প্রণয়নের চেষ্টা করেন।

১৯৮৪ সালের জানুয়ারিতে এরশাদ তাঁর ভূমি সংস্কার নীতিমালা ঘোষণা করেন। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জমির মালিক ও বর্গাদারদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ ছিল জমির ভোগ দখল, জমির দখলীস্বত্ব এবং হস্তান্তর সংক্রান্ত আইনসমূহ পুনর্বিন্যস্ত করা। এতে গৃহীত মূল পদক্ষেপগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা থেকে ৬০ বিঘায় স্থির করা হয়।

২. এ উদ্দেশ্যে প্রণীত আইনে স্থাবর সম্পত্তির বেনামি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়। বেনামি হস্তান্তরের ব্যাখ্যায় বলা হয়, যে কোন ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থে অন্যের নামে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবেন না।

৩. বিভিন্ন আইনগত পদক্ষেপ নিয়ে কৃষকদের তাদের ভূসম্পত্তি থেকে উৎখাত করার যুগব্যাপী প্রচলিত আচরণ বন্ধ করা হয়। কোন অফিসার, আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, ক্রোক, বিক্রি বা নিলামের মাধ্যমসহ অন্য কোন আইনগত প্রক্রিয়ায় বসতবাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত জমি থেকে কাউকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া রহিত করা হয়। এতে বলা হয়, এ ধরনের জমির মালিককে কোনভাবে তার জমি থেকে উৎখাত করা যাবে না।

৪. এতে বলা হয়, বসতবাড়ি হিসেবে ব্যবহারের যোগ্য কোন খাস জমি পাওয়া গেলে সরকার ভূমিহীন কৃষক বা শ্রমিকের অনুকূলে তা বরাদ্দ করবেন।

৫. বর্গাদাররা জমির মালিক ও বর্গাদারের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির ভিত্তিতে যে কোন জমি অন্যূন পাঁচ বছরের জন্য চাষাবাদের অধিকার অর্জন করবেন। আইন ঘোষিত হওয়ার আগে থেকে যেসব বর্গাদার কারো জমি চাষ করছেন, তাদের বেলায়ও উপরোক্ত আইন প্রযোজ্য হবে। যদি কোন ভূমির মালিক আইনগত

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষের নির্দেশ জারি হওয়ার পর দুই সপ্তাহের মধ্যে উক্ত চুক্তি বলবৎ করতে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে আইনগত কর্তৃপক্ষ জমির মালিকের পক্ষ থেকে সেই চুক্তি বলবৎ করার ব্যবস্থা নেবেন।

৬. কোন বর্গাদারের মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারী মেয়াদের বাকি সময়ের জন্য বর্গাস্বত্ব অর্জন করবেন।

৭. আইনে উল্লিখিত কতিপয় সীমিত কারণে আইনগত কর্তৃপক্ষ আদেশ জারি না করলে কোন বর্গাবিষয়ক চুক্তি বাতিল করা যাবে না।

৮. বর্গাজমির উৎপাদিত ফসল সাম্যভিত্তিতে বণ্টন করা হবে। তিনটি সমান ভাগে পুরো উৎপাদিত ফসল বিভক্ত করতে হবে। এক ভাগের মালিক হবেন জমির মালিক, এক-তৃতীয়াংশ পাবেন বর্গাদার এবং বর্গাদার উৎপাদনের সকল উপকরণ সরবরাহ করলে বাকি এক-তৃতীয়াংশেরও মালিক হবেন বর্গাদার। মালিক বর্গাদার উপকরণের অংশীদার হলে সে অনুপাতে শেষোক্ত এক-তৃতীয়াংশ বিভাজন করা হবে। মালিক সমস্ত উপকরণের ব্যয় বহন করলে শ্রমের মূল্য বাদ দিয়ে সেই এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী হবেন জমির মালিক।

৯. জমির মালিক তাঁর জমি বিক্রি করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে তার অংশীদার বা পরিবারবর্গের কাছে বিক্রি করা না হলে বর্গাদার তা ক্রয়ের প্রথম সুযোগ পাবেন।

১০. একজন বর্গাদার ১৫ বিঘা পর্যন্ত জমি চাষাবাদ করতে পারবেন। মালিক বা বর্গাদারের মধ্যে কোন বিরোধ ঘটলে তাতে মধ্যস্থতার জন্য আইনের বিধান রাখা হয়েছে। আইনের পূর্ণ কার্যকারিতা এবং বাস্তবায়নের জন্য সরকার ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের ২২নং ধারাবলে প্রয়োজনীয় বিধিসমূহ প্রণয়ন করেন।

১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এরশাদ আরেকটি আইন প্রণয়ন করে কৃষি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত করে দেন। এই আইনের ৩নং ধারাবলে এই নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হয় ৩.২৭ কিলোগ্রাম চাল অথবা স্থানীয় বাজারে সমপরিমাণ চালের আর্থিক মূল্যমান। সরকার অবশ্য এই নিম্নতম মজুরি পর্যালোচনা করার এবং সময়ে সময়ে বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের মজুরি নির্ধারণে অধিকার সংরক্ষণ করেন। এতদুদ্দেশ্যে একটি কৃষি শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ও মূল্য নির্ধারণ কাউন্সিল গঠন করে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনাসাপেক্ষে কৃষি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি সুপারিশ করার জন্য কাউন্সিলকে ক্ষমতা দিয়ে আইনের বিধান প্রণয়ন করা হয়। ন্যূনতম মজুরির ক্ষতিপূরণ এবং তা আদায়ের জন্যও আইনে বিধান প্রণয়ন করা হয়।

ভূমি সংস্কারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এরশাদ সরকার ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ করে কৃষকদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজের সবচেয়ে কার্যকর শক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে একটি ব্যাপক ও স্বশাসিত কর্মসূচি প্রণয়ন করে। ভূমিসংস্কারের লক্ষ্য ছিল: (ক) জমির কার্যকর ব্যবহার ও আয়ের সুষম বণ্টন; (খ) মোট জাতীয় আয়

www.pathagar.com

বৃদ্ধির লক্ষ্যে জমির সর্বোচ্চ উৎপাদিকা শক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; (গ) ভূমিহীন পরিবারের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুনঃসঞ্চালন; এবং (ঘ) শহরমুখী জনস্রোত বন্ধ করার লক্ষ্যে গ্রামীণ জীবনকে আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা। এরশাদের উপরোক্ত সংস্কারমূলক পদক্ষেপসমূহ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু এর সাফল্য নির্ভর করবে এসবের অর্থপূর্ণ বাস্তবায়নের ওপর। ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই ধরনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব ভাল লেগেছে এবং আমি এরশাদ সরকারে যোগদান করার পর মাঠ পর্যায়ের এইসব সংস্কার কার্যকর করার জন্য সুদৃঢ়ভাবে কাজ করেছি।

এভাবে খাস জমি সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থা একটি আরো ব্যাপক ও বিধিবদ্ধ উপায়ে পরিচালিত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। জমি সংজ্ঞায়িত ও শ্রেণীভুক্ত করে কিভাবে তা সরকারের নিয়ন্ত্রণে ও দখলে নিয়ে আসা যাবে তার উপায় উদ্ভাবন করা হয়। খাস জমি দখল করার প্রক্রিয়া স্থির করা হয় এবং এর দায়িত্ব চিহ্নিত করে তা বণ্টন করার ব্যবস্থা করা হয়। ভূমিহীন পরিবারের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারিত করে জমি বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য অগ্রাধিকারসমূহ নিরূপণ করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জমি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে সুবণ্টনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। দিক্‌নির্দেশনায় খাস জমি বন্দোবস্তের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ্য বৈঠকের মাধ্যমে প্রকৃত ভূমিহীনদের সঠিক তালিকা প্রস্তুত করারও ব্যবস্থা নেয়া হয়।

সরকার কর্তৃক 'অভিযান' হিসেবে বিবেচিত ভূমিসংস্কারের এই কর্মসূচির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল কেবল ভূমিহীন পরিবারের অনুকূলে খাস জমির বন্দোবস্ত নয়, কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের পুনর্বাসন এবং তা সমন্বিত করার লক্ষ্যে সহায়তা করার জন্য আইনগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সহায়তার একটি প্যাকেজ বিধান প্রণয়ন করা। প্রথমত, এতে একর প্রতি এক শ' টাকা অথবা তারও কম টাকা দিয়ে স্থায়ীভাবে পরিবারকর্তার নামে অথবা পরিবারের স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ নামে জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। এতে অধিকারের নতুন একটি ক্ষেত্র উন্মোচিত করে নারীদের সম্পত্তির ওপর সমান অধিকার দিয়ে তাদের সমাজের উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনের সঙ্গে সমন্বিত (integrate) করা হয়। এতে আরো বলা হয় যে, স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতার কারণে স্বামী গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে খাস জমিতে তার বন্দোবস্ত বাতিল হয়ে যাবে এবং পুরো জমি কেবল স্ত্রীর অধিকারে চলে যাবে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে জমির বন্দোবস্ত বাতিল হয়ে যাবে। জমির ওপর ভূমিহীন পরিবারের আইনগত দখল স্বত্বের নিশ্চয়তা দেয়ার জন্য জমি থেকে সর্বোচ্চ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য সুচিহ্নিত এলাকায় একটি সমবায় সমিতি সংজ্ঞায়িত করার পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এ ধরনের কমপক্ষে ত্রিশটি ভূমিহীন পরিবারকে একত্র করে তাদের একটি পৃথক গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের জন্য সুন্দর একটি নাম দেয়া হবে। সমাজের সদস্যরা তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা ও মুনাফা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিজেদের

www.pathagar.com

নিবন্ধনকৃত ও সংগঠিত করে তাদের নিজেদের সম্পদ ব্যবহার করে শক্তিশালী একটি জোটে পরিণত হবে।

এভাবেই আমরা বাংলাদেশের হতদরিদ্র অবহেলিত ভূমিহীন কৃষকদের নিয়ে সুখী সমৃদ্ধ 'গুচ্ছগ্রাম' গড়ার ধারণা নিয়ে ভূমি সংস্কার বাস্তবায়নে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালে একবার পার্লামেন্ট সদস্যদের সাথে এরশাদের এক সভায় এ বিষয়ের ওপর হাসনা একটি খুব চমৎকার বক্তব্য রাখে এবং সরকারের খাস জমি শুধু স্বামী বা পিতার নামে বরাদ্দ বা বিক্রি করার বিরোধিতা করে। সেই সভাতেই হাসনার সুপারিশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে খাস জমি পরিবারকর্তা যদি মহিলা হন তাহলে তার নামে আর স্ত্রী যদি স্বামী বেঁচে থাকে তাহলে স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ মালিকানায় জমি হস্তান্তর করতে হবে। খাস জমির ব্যাপারে নারী অধিকার এভাবে নিশ্চিত করা হয়।

এ ধরনের ভূমিহীন পরিবারকে প্রাথমিকভাবে সমাজের প্রত্যেকের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে চাষাবাদে অর্থনৈতিক সমর্থন দেয়ার লক্ষ্যে জমি চাষাবাদ করার জন্য দুটি বলদ ক্রয়ে সাহায্য করতে আর্থিক অনুদান দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বসতবাড়ি নির্মাণের উদ্দেশে এদের জন্য টিন ও বাঁশ জাতীয় নির্মাণ সামগ্রী মঞ্জুর করা হয়। গুচ্ছগ্রাম সৃষ্টির পর পানি সরবরাহ এবং মৎস্য চাষে সহযোগিতার জন্য দীঘি নির্মাণ, স্কুল গৃহ স্থাপন, খেলার মাঠ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। বেসরকারি সাহায্যদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রামবাসীদের মধ্যে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, যেখানে ২০ একর খাস জমি একসঙ্গে পাওয়া যাবে সেখানে ভূমিহীন পরিবারদের নিয়ে নতুন একটি গ্রামের পত্তন করা হবে এবং ক্ষুদ্র বাগান ও বসতবাড়ি নির্মাণের জন্য প্রতিটি পারিবারকে ০.৮ একর করে জমি মঞ্জুর করা হবে। কৃষি কাজের জন্য দেয়া হবে জমির আকার ও প্রকৃতিভেদে পরিবারপিছু এক থেকে দুই একর করে চাষযোগ্য জমি। স্থির হয় যে, প্রতিটি গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, উপজেলা পরিষদ এবং বেসরকারি সাহায্যদানকারী সংস্থাগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করবে। এই কর্মসূচি মনিটরিং, পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কমিটি গঠনেরও সুপারিশ করা হয়। সরকার এই কর্মসূচিকে জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে অব্যাহত কর্মসূচি প্রক্রিয়ার 'আন্দোলন' হিসেবে অভিহিত করে।

এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ওপর উচ্চ অগ্রাধিকার আরোপ করে তার তত্ত্বাবধান এবং বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিল নামে উচ্চ পর্যায়ের একটি পরিষদ গঠন করা হয়। এরশাদ নিজে এই পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীসহ তেরোজন মন্ত্রী, চারজন পার্লামেন্ট সদস্য, এগারোজন সচিব, তিনজন বিশেষজ্ঞ, সশস্ত্রবাহিনীর তিন বিভাগ—সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধানগণ এবং কতিপয় সিনিয়র আমলা। ভূমি সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য প্রতি জেলায় একটি করে টাস্কফোর্স এবং প্রতি উপজেলায় একটি করে টাস্কফোর্স এবং প্রতি উপজেলায় একটি করে ভূমি সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা কোন পার্লামেন্ট সদস্য কিংবা

www.pathagar.com

নির্বাচিত উপজেলা কমিটির চেয়ারম্যানকে এসব কমিটিতে স্থান দেইনি যাতে করে, বিশেষ করে খাস জমি পুনরুদ্ধার ও বণ্টন নিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব ভূমি সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত না করে তোলে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রধান দায়িত্ব গিয়ে দাঁড়ায় ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং এ উদ্দেশ্যে সেখানে একটি বিশেষ সেল স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে ভূমি সংস্কার ও ভূমি শাসন সম্পর্কিত সরকারের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে একটি ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন করা হয়। সংস্কার বাস্তবায়নে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ১৯৮০ সালের ভূমি প্রশাসন বোর্ড আইন বাতিল করে গঠন করা হয় একটি ভূমি আপিল বোর্ড। ভূমি সংস্কার প্রশাসন এবং বাস্তবায়নের জন্য কমিশনারের অধীনে একটি স্বাধীন ভূমি সংস্কার শাখা গঠন করা হয় এবং উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত নতুন পদ সৃষ্টি করে ও নতুন কর্মচারীর যোগান দিয়ে ভূমি সংশ্লিষ্ট আমলাতন্ত্রকে জোরদার করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

গ্রামীণ বাংলাদেশে কৃষকদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো বেসরকারি মহাজনি ব্যবস্থা। আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের, বিশেষ করে কৃষকদের মধ্যে কৃষিঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণের আগে দেশে মহাজনি ব্যবস্থা নামক বেসরকারি ঋণদান ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। চাষীরা সে সময়ে মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ সুদের বিনিময়ে ঋণগ্রহণ করতেন। কখনো কখনো এই সুদের হার বার্ষিক ৮০ থেকে ১০০ শতাংশে দাঁড়াত। এ প্রক্রিয়ায় ঋণগ্রহীতারা ঋণদানকারী প্রভাবশালী লোকজনের নির্যাতন ও শোষণের শিকারে পরিণত হতো। এই প্রথার ফলে কৃষকরা মহাজনদের কাছে এমনভাবে আত্মসমর্পণ করত যে, সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তার ক্ষেতের ফসল, এমনকি জমি পর্যন্ত কেড়ে নেয়া হতো। এভাবে তাদের অত্যাচার নিষ্পেষণে পরিবারগুলো প্রজন্মান্তরে ক্রমশ ভূমিহীন পরিবারে পরিণত হতো। কৃষিঋণ প্রবর্তনের পর মহাজনিপ্রথা এখন আর আগের মত ব্যাপকভাবে প্রচলিত নেই, কিন্তু গ্রামের দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা পুরোপুরিভাবে আগের ঐ প্রথার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি। ব্যাংক ঋণ সংগ্রহের কঠোর শর্ত, আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদি কারণে স্পষ্টত সচ্ছল চাষী ও ভূমিবানরাই সাধারণভাবে ব্যাংক ঋণের সুবিধা ভোগ করেন এবং বর্গাদার এবং ক্ষুদ্র ভূস্বামীরা তাদের ঋণের জন্য আজ পর্যন্ত মহাজনসহ বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক উৎসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে।

এভাবে আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংক কিংবা মহাজনের মাধ্যমে যেভাবেই কৃষিঋণ মঞ্জুর করা হোক না কেন, কৃষকদের ওপর ঋণের বোঝা অব্যাহতভাবে বাড়ছে এবং দেশের সব রাজনৈতিক দল ও সরকার সবসময় তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডাতে কৃষিঋণ মওকুফ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে চলেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সমস্ত সরকারই কোন না কোনভাবে চাষীদের কৃষিঋণের সুদ ও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ অঙ্ক পর্যন্ত মূল ঋণ মওকুফ করে দিয়ে গরিব এবং প্রান্তিক চাষীদের সাহায্য করেছে। এরপরেও মহাজনিপ্রথা বিরাট সংখ্যক কৃষকের উৎপাদিকা শক্তি ও সম্ভাবনার ওপর হুমকি হিসেবে অবস্থান করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অবিভক্ত বাংলার প্রবাদ পুরুষ

www.pathagar.com

ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক তাঁর শাসনামলে ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করে দুঃস্থ বাঙালি চাষীদের দুঃখ মোচনে এগিয়ে এসেছিলেন। এ. কে. ফজলুল হকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহাজনি ঋণের দুর্দশা থেকে চাষীদের রক্ষা করার লক্ষ্যে প্রতি উপজেলায় ঋণ সালিসী বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে একটি আইন পাস করে এই অবৈধ সুদ ব্যবসার হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য আনুষ্ঠানিক একটি পন্থার উদ্ভাবন করা হয়। আইন করে মহাজনি ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করা গেলেও মাঠ পর্যায় গ্রামীণ জীবনে এই আইন বাস্তবায়ন করা একটি দুরূহ ব্যাপার বলে বিবেচিত হয়। তাই মহাজনি ব্যবস্থার বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়ে সেই ঋণ নগদ অর্থ কিংবা অনধিক শতকরা বার্ষিক ২০ ভাগ সুদ নগদ অর্থে এবং বাকি অংশ শস্যের আকারে পরিশোধের শর্ত আরোপ করা হয়। শস্যের মাধ্যমে দেয় সুদ কোন অবস্থাতে চাষীর উৎপাদিত মোট শস্যের ২০ শতাংশের বেশি ধার্য করা যাবে না।

মহাজনি ঋণগ্রহীতা ঋণের বিপরীতে সুদের হার এবং সুদসহ দেয় টাকার পরিমাণ এবং কিস্তি নির্ধারণের জন্য বোর্ডের কাছে আবেদন জানাতে পারবেন। এতদুদ্দেশ্যে একজন চেয়ারম্যান এবং দুই থেকে চারজন সদস্যের সমন্বয়ে প্রতি জেলায় একটি ঋণ সালিসী বোর্ড গঠন করা হবে। কোন বিবাদ কোন সহকারী বিচারকের কাছে মধ্যস্থতার জন্য পাঠানোর পর তা সেখানে অপেক্ষমাণ থাকা অবস্থায় বোর্ডের কাছে আবেদন জানানো হলে বিচারকের কাছে অপেক্ষমাণ আবেদনের ওপর আপনা হতেই স্থগিতাদেশ কার্যকর হবে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ২৫

এরশাদের রাজনীতি: এরশাদবিরোধী আন্দোলন, ক্ষমতা হস্তান্তর এবং গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণ

রাজনীতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এরশাদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। সামরিক প্রশাসনকে বেসামরিকীকরণের ক্ষেত্রে নিজস্ব জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতার কারণে প্রেসিডেন্ট জিয়া যতটা সহজে সফলতা অর্জন করতে পেরেছিলেন এরশাদের জন্য তা আদৌ একটি সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। একটি নির্বাচিত সরকার এবং জনপ্রিয় দলকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করায় সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি সামরিকবিরোধী মনোভাব প্রথম থেকেই বিরাজ করা শুরু করে। এর সাথে আরো অসুবিধা ছিল যে এরশাদের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল না, তিনি একজন মিলিটারি প্রশাসক ছিলেন। নিজেকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য উপযোগিতাভিত্তিক রাজনীতি করেছেন, তাঁর মধ্যে কোন দিক্‌নির্দেশনামূলক আদর্শ ছিল না। তাই এরশাদকে একটি সার্বিক সুবিধাবাদ রাজনীতি করতে হয়েছে। একদিকে ১৮ দফার মাধ্যমে মোটামুটি শহীদ জিয়া এবং বিএনপির রাজনীতির কথা বলেছেন, অন্যদিকে বিএনপির ওপর চরম আঘাত এনে আওয়ামী লীগের সাথে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করেছেন। আওয়ামী লীগ-বিএনপির মধ্যে আদর্শভিত্তিক যে মেরুকরণের রাজনীতি বিরাজমান তার মাঝখানে এরশাদ একটি স্থান করে নেয়ার চেষ্টা করেছেন, আর সেই কারণেই তাঁর রাজনীতির কোন স্বচ্ছতা ছিল না। সকাল বিকাল তাঁকে দুধরনের কথা বলতে হয়েছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে তিনি কোন পরিষ্কার স্বতন্ত্র রাজনীতি বা নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন উদ্ভাবন করতে সক্ষম হননি। তাছাড়া এরশাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন ছিল।

এরশাদের গোটা শাসনামলে তাঁর ব্যক্তিত্বের এই বিশ্বাসযোগ্যহীনতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য তিনি ক্ষমতাগ্রহণকালে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সবই একের পর এক বিস্মৃত হয়েছে। এমনকি প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর অংশীদারিত্বের যেকথা বলে তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন, সেইকথা আর একবারও উচ্চারণ করেননি। তাঁর শাসনামলের শেষ দিনগুলো অবধি তিনি রাজনৈতিক

www.pathagar.com

দল ও জনগণের কাছে নিজেকে গ্রহণ করানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর শাসনের এই মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে হলে অর্থবহ এমন একটি নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে যেখানে জনগণ অবাধে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

অবস্থার স্বাভাবিকীকরণের লক্ষ্যে এরশাদ সরকার ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয় এবং ১৯৮৪ সালের ২৪ মে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য পার্লামেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৮৩ সালের ১৪ নভেম্বর থেকে প্রকাশ্য রাজনীতি করার অনুমতি ঘোষণা দেয়। তিনি গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপে অংশ নেয়ারও আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে বিরোধী দলগুলো বিভিন্ন গ্রুপে ও জোটে ঐক্যবদ্ধ হয়। নিজ নিজ দাবিসমূহ আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ ১৫ দলীয় ও বিএনপি সাতদলীয় ঐক্যজোট গঠন করে। উভয় জোটের সমর্থনপুষ্ট একটি পাঁচ দফা দাবিনামা প্রণীত হয়। জোট দুটো নিজ নিজ পরিচিতি ও আদর্শ বহাল রেখে উত্থাপিত সেইসব দাবি বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়।

রাজনৈতিক সংলাপের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ৭৫টি রাজনৈতিক দলের ৩৬০ জন নেতা বিভিন্ন পর্যায়ে এরশাদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ আলোচনায় অংশ নিয়ে যার যার দলের দাবিনামা ও পরামর্শ এরশাদের কাছে পেশ করেন। বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানসহ এরশাদের পক্ষের কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানান। পরে অবশ্য তিনি বঙ্গভবনে এরশাদের সঙ্গে এককভাবে আলোচনায় বসেন। যাই হোক, অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিন্ন মত প্রকাশ করায় এবং তাদের মতামত এরশাদের স্বার্থের অনুকূল না হওয়ায় সংলাপ শেষ পর্যন্ত কোন ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসতে পারেনি। এরশাদের লক্ষ্য ছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজের শর্তে রাজি করিয়ে তাঁর শাসনকে বৈধ করা, পক্ষান্তরে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজ নিজ দাবিতে অটল থাকে।

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো অবশ্য নির্বাচন নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন ছিল, তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিল নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে। তারা সামরিক আইনের অধীনে নির্বাচনে উৎসাহী ছিল না, কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, এরশাদ ক্ষমতায় থাকাকালীন নির্বাচন হলে তা অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে না। অন্যদিকে এরশাদের একমাত্র আগ্রহ ছিল নির্বাচনের আয়োজন করা এবং স্বয়ং তাতে জয়লাভ নিশ্চিত করা। ফলে দুপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্দেশ্য এবং স্বার্থ পরস্পরবিরোধী হওয়ায় সংলাপ ভেস্তে যায়। তবে এরশাদের পক্ষে ইতিবাচক দিকটা ছিল এই যে, গোটা বিশ্বের কাছে তিনি গণতন্ত্রে উত্তরণের পক্ষে তাঁর প্রচেষ্টা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের কয়েকজন নেতাকর্মীকে জেল থেকে মুক্ত করে আনা ও সরকার কর্তৃক আগে বাজেয়াপ্ত করা গুটিকয়েক তহবিল মুক্ত করা ছাড়া তেমন কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

www.pathagar.com

যাই হোক এরশাদ বিভিন্ন পন্থায় রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালান, কারণ তাছাড়া তাঁর ক্ষমতাগ্রহণসহ সকল কর্মকাণ্ড বৈধ করা কিংবা তাঁর দেশ শাসনকে বৈধকরণের অন্য কোন পথ ছিল না। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সুস্পষ্টভাবে এই বৈধতা প্রদানেরই বিরোধিতা করে আসছিল। তারা মনে করছিল যে, এরশাদ বেআইনি পন্থায় বলপূর্বক দখলের মাধ্যমে একটি অবৈধ সরকার গঠন করেছেন এবং দেশ শাসন করার কোন অধিকার তাঁর নেই। তাঁর এই বৈধতার প্রশ্নে দ্বন্দ্ব এবং গণআন্দোলন সেনা শাসনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এরশাদকে তাড়া করে ফিরেছে।

তবে ক্যান্টনমেন্টের নিরঙ্কুশ সমর্থন এবং বিরোধী দলগুলোর প্রকাশ্য দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে এরশাদ বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতিপক্ষদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হন। ১৯৮৩ সালে তিনি সামরিক আইন শিথিল করে মুক্ত রাজনীতির অনুমতি দেন, পরবর্তীকালে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেন। সংলাপের আয়োজন করে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি আবার কড়াকড়িভাবে সামরিক আইন প্রয়োগ করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। ১৯৮৪ সালের ২৮ নভেম্বর বিরোধী দলগুলো আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে সচিবালয় ঘোরও করে সচিবালয় ভবনের ক্ষতিসাধন করে। এরশাদ এতে পুনরায় সামরিক আইন জোরদার করে মিছিল মিটিংসহ সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে দেন এবং ঘোষণা করেন যে, বিরোধী পক্ষকে দমন করার জন্য সামরিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।

এ পর্যায়ে তিনি তাঁর ও সরকারের অবস্থান সংহত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী উপজেলা নির্বাচন ও তাঁর নিজের জন্য একটি গণভোটের আয়োজন করেন। ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সামরিক আইনের অধীনে এবং সেনাবাহিনীর কড়া তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দলগুলো এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে বিরত থাকে। তাদের নীরব প্রতিবাদের মুখে সরকার নির্বাচনী ফলাফল নিজের পেক্ষ টেনে নেয়। সরকারিভাবে এটি একটি দল নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেও কার্যত নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানরা সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করে। একইসঙ্গে সংক্ষিপ্ত এবং বিশেষ সামরিক আইন আদালতসহ জোনাল, সাব-জোনাল এবং জেলা সামরিক আইন কর্তৃপক্ষগুলো ত্বরিত গতিতে পুনর্বহাল করা হয়। ১৯৮৫ সালের ১ মার্চ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে এরশাদ ঘোষণা করেন যে, ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ দেশব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।

এভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসার পর এরশাদ এবার আইয়ুব এবং জিয়ার পদাংক অনুসরণ করে দেশ শাসনে জণগণের অনুমোদন সংগ্রহার্থে একটি জাতীয় গণভোট অনুষ্ঠানের কাজে হাত দেন। স্থগিত সংবিধান অনুসারে দেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া অবধি প্রেসিডেন্ট হিসেবে এরশাদের প্রতি জনগণের আস্থা এবং তাঁর গৃহীত নীতি পরিকল্পনাসমূহের ওপর জনগণের অনুমোদন রয়েছে কিনা গণভোটে তা জনগণের কাছে জানতে চাওয়া হয়।

বলাবাহুল্য, বিরোধী শক্তিসমূহের অনুপস্থিতিতে জনগণ সরকারকে তার "প্রত্যাশিত" রায় দিল। শতকরা ৮৬ ভাগ ভোটার এরশাদের ক্ষমতা অব্যাহত রাখার প্রশ্নে হ্যাঁ-সূচক

www.pathagar.com

ভোট দেয় যার কোনটাই সত্য ছিল না। এভাবে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর এরশাদ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কিছুটা স্বস্তিকর সময় অর্জন করলেন। অন্যদিকে সব ধরনের বিধিনিষেধ সত্ত্বেও বিরোধী দলগুলো ক্রমশ শক্তি অর্জন করে এবং প্রধান জোটগুলো একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি পালনের জন্য পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে। তারা সামরিক আইন বিধিসমূহ লঙ্ঘন করে হরতাল এবং সরকারবিরোধী কর্মসূচি পালন করতে থাকে। বিরোধী দলের আহ্বানে ঢাকায় নির্দিষ্ট দিনে হরতাল ডাকা হয়েছে, বিবিসি থেকে এ সংবাদ প্রচার হওয়া মাত্র রাজধানী অচল হয়ে যাওয়ার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সরকার বিরোধী দলসমূহের নেতাদের ঘরে ঘরে অবৈধ তল্লাশি, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি অব্যাহত রাখে এবং এতে করে নানা স্থানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। কোন কোন বিরোধী নেতার ওপর সন্ধ্যার পর শারীরিক হামলাও চালানো হয়। সরকার এবং বিরোধী দলগুলোর মধ্যে এ ধরনের ঘটনা ক্রমশ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

সামরিক আইন দেশ শাসনের স্থায়ী কোন ব্যবস্থা হতে পারে না, এ বাস্তবতা অনুধাবন করে এরশাদ এবার নিজের জন্য আরো গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক ভিত্তি প্রস্তুত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন এবং রাজনীতির সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে ১৮ দফা একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ কর্মসূচি ছিল জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচির প্রায় অনুরূপ। উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন এবং সার্বভৌমগত সংহতি অর্জনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। বাস্তবপক্ষে তিনি যদি জিয়ার কর্মসূচিটিই নিজের বলে গ্রহণ করতেন তাহলে বিএনপির বিদ্যমান অবস্থানের প্রেক্ষিতে অনেক সমস্যার আরো সহজে সমাধান হতে পারত। তিনি কেন তা করেননি, তার একটি পৃথক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

নিজস্ব রাজনৈতিক মঞ্চ গঠন করার আগে এরশাদ ছাত্র, যুবক ও শ্রমিক সংগঠন তৈরি করেন। এসব অঙ্গ সংগঠন বিরোধী দলের মুখোমুখি হয়ে এরশাদের পক্ষে গণসমর্থন অর্জনে ব্যাপৃত হয়। ১৯৮৪ সালে তিনি 'জনদল' নামে নিজস্ব একটি রাজনৈতিক দলের গোড়াপত্তন ঘটান। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো ইতোমধ্যে জোট ও গ্রুপ গঠন করায় এরশাদ মূলত জিয়ার জাগদলের কায়দায়ই জনদল গঠন করেন। যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, অন্যান্য দলকে জনদলের সঙ্গে যুক্ত করে এরশাদ তাঁর দলের কলেবর, শক্তি ও সমর্থন বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। প্রাথমিক পর্যায়ে জনদলের প্রতি গণসমর্থন ছিল নিতান্তই অল্প এবং তারা গুরুত্বপূর্ণ কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দলে টানতে পারেনি। জিয়ার সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে যে এরশাদের পদযাত্রা ছিল অনেক অস্বচ্ছ এবং তাতে ছিল না সুনির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক দিক্‌নির্দেশনা, যা পরবর্তী ঘটনাসমূহের আলোচনায় আরো স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হবে।

এই পর্যায়ে এরশাদ বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সাথে গোপন দেনদরবার চালাতে শুরু করেন। অসৌজন্যমূলকভাবে আতাউর রহমান খানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে

www.pathagar.com

অপসারিত করে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিকে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর দলের ভিত্তি ব্যাপক ও সুদৃঢ় করার উদ্যোগ নিলেন। এরশাদ দুটি প্রধান বিরোধী জোটে ভাঙন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা কোরবান আলী ও বিএনপির সিনিয়র নেতা আবদুল হালিম চৌধুরীকে তিনি মন্ত্রিপরিষদে স্থান দেন। এদের মধ্যে হালিম চৌধুরী ছিলেন জোটগুলোর মধ্যে সমন্বয় রক্ষাকারী লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক। পনেরদলীয় জোটের শরিক দল মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের খণ্ডাংশ, সাতদলীয় জোটের শরিক দল ইউপিপি'র কাজী জাফর আহমেদ এবং সিরাজুল হোসেন খানের গণতন্ত্রী দল জোট ছেড়ে এরশাদের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে ভাঙনের সূত্রপাত ঘটে। ইতোমধ্যে বিএনপির একটি অংশের নেতা শামসুল হুদা চৌধুরী ও ডা. এমএ মতিন এবং আওয়ামী লীগের সাবেক চিফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এরশাদের সঙ্গে হাত মেলান। উপরন্তু জিয়াউদ্দিন আহমেদ, আনিসুল ইসলাম মাহমুদের মত বিএনপির কিছু নেতা, মুসলিম লীগের একাংশের নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং দলবিহীন বিশেষ ব্যক্তিত্ব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এরশাদের হাত শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে আসেন।

এ সমস্ত তৎপরতায় এরশাদের হাত দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং জনগণের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়তে থাকে। বিরোধী পক্ষের জন্য এটি ছিল এক দুঃসময়। সরকার এ সময় একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে মঞ্চে আবির্ভূত হয়। একের পর এক নেতা সরকারে যোগ দেয়ার ফলে বিরোধী দলগুলোর অবস্থা তখন প্রায় শোচনীয়। অন্যভাবে বলা যায় ১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় জোট সংখ্যানুপাতে সমান সংখ্যক শরিক দল নিয়ে বহাল থাকলেও তাদের মনোবল ও রাজনৈতিক শক্তি বহুলাংশে হ্রাস পায়। যাই হোক, তারা হরতালকে প্রতিবাদের প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তাদের সরকারবিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে। সব রকমের বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার প্রেক্ষাপটে জোট দুটি মূলত প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এইসব ঘটনার বেশ কিছুদিন পর আমি এরশাদের সরকারে যোগদান করি। কি অবস্থায় এবং কোন পরিস্থিতিতে আমি বিএনপি ত্যাগ করেছিলাম সেটা আমি বিস্তারিত বলেছি।

১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট আমরা জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করি। জনদল, বিএনপির একাংশ, ইউপিপি, গণতান্ত্রিক পার্টি এবং মুসলিম লীগের সমন্বয়ে এই ফ্রন্ট গঠন করা হয়। ফ্রন্টের কর্মসূচি ছিল বহুলাংশে জনদলের ১৮ দফা কর্মসূচির অনুরূপ। একমাত্র শাহ আজিজুর রহমান বাদে ফ্রন্টের শরিক দলের প্রতিটি অংশ থেকে নেতাদের মন্ত্রিপরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরশাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল দল হিসেবে বিএনপিকে দুর্বল করে ফেলা এবং বিএনপির সঙ্গে জোট গঠনকারী অন্যান্যদের সমর্থন থেকে বিএনপিকে বঞ্চিত করা।

বিএনপিকে ভাঙনের জন্য এরশাদ কয়েক দফা প্রচেষ্টা চালান। শাহ আজিজ (শাহ) গ্রুপ জাতীয় ফ্রন্টে যোগ দেয়ার পর সারা দেশ থেকে বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মী সরকারে

যোগ দেয়। এর ফলে বিএনপি তার জাতীয়তাবাদী রাজনীতি প্রণয়ন ও পরিচালনাকারী এমন বেশ কিছু নেতাকে হারায় যাঁরা জন্মলগ্ন থেকে বিএনপির সাথে জড়িত এবং জিয়ার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের দলত্যাগে নিঃসন্দেহে বিএনপি দুর্যোগের সম্মুখীন হয় এবং দলের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। তবে এই ক্ষতি একেবারে অপূরণীয় ক্ষতি ছিল না। খালেদা জিয়া তাঁর দলকে প্রধান সরকারবিরোধী দল এবং সেই দলরে ওপর নিজস্ব রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন। সাধারণত দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যখনই কোন রাজনৈতিক দল কারো ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তখন সেই নেতার নেতৃত্বাধীন দলের মূল অংশের স্থায়ী ক্ষতিসাধন করা সম্ভবপর হয় না। এর ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা থাকে না এবং দলের নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচারের উদ্ভব হয়। সেটি এখানে ভিন্ন প্রসঙ্গ, কিন্তু মোদ্দা কথা হলো এতকিছুর পরও বিএনপির কিছু নেতৃবৃন্দ এরশাদ সরকারে যোগদান করলেও দলের মূল স্রোতধারা বেগম জিয়ার নেতৃত্বে থেকে যায়।

এরশাদ তাঁর গোটা শাসনকালে বিএনপিকে অবমূল্যায়ন করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই ধারণার বশীভূত হয়ে রাজনীতির খেলায় নেমে একদিকে আওয়ামী লীগকে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং অন্যদিকে বিএনপির প্রতি মুষ্টাঘাত হেনেছেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে কৌশলগত একটি বোঝাপড়ায়ও আসেন। আওয়ামী লীগের বিবেচনায় বিএনপির তুলনায় এরশাদ ছিলেন কম অপশক্তি। কোন প্রকাশ্য আচরণে তা প্রমাণিত না হলেও 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু' এই নীতিমালার আলোকেই উপরোক্ত ধারণার প্রতি সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। এরশাদ তাঁর শাসনামলে ভারতের প্রতি নমনীয় আচরণ প্রকাশ করলে আওয়ামী লীগ ও এরশাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে জনমনে সন্দেহ আরো দানা বাঁধা সত্ত্বেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে সক্ষম হন, আওয়ামী লীগ তেমনি বিএনপির মোকাবেলা করে জাতীয় রাজনীতিতে নিজের অবস্থান সংহত করে নিতে সক্ষম হয়।

এরশাদ শেখ হাসিনাকে কমপক্ষে দুবার আশ্বস্ত করেন যে, শেখ মুজিবকে সরকারিভাবে জাতির পিতা হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং মুজিব হত্যাকারীদের বিচারের ব্যবস্থা করা হবে। দুই মহিলা নেত্রীকে পৃথক রাখার ব্যাপারে এরশাদ যে কৌশল অবলম্বন করেন তা আওয়ামী লীগের অনুকূলে কিছু করার জন্য তিনি করেননি, তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিকভাবে নিজের টিকে থাকা। এরশাদ তাঁর সমস্ত মেধা এবং উৎস এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছেন এবং এ ব্যাপারে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয়ে তিনি কখনো কার্পণ্য করেননি।

২ মার্চ ১৯৮৬ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে এরশাদ সর্বাগ্রে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্মত হন এবং ঘোষণা দেন যেসব মন্ত্রী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী তাঁরা তাদের মন্ত্রীর অবস্থান থেকে গদত্যাগ করবেন, জোন পর্যায়ের সামরিক আইন প্রশাসকের কার্যালয়গুলো উঠিয়ে দেয়া হবে এবং সামরিক আইন আদালতগুলো ভেঙে দেয়া হবে। অবশ্য যদি কেবল বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিতে সম্মত হয় তাহলেই

www.pathagar.com

এসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে। নির্বাচনী প্রচারকার্য চালাবার জন্য বিরোধী পক্ষের জন্য প্রচারমাধ্যমে সমান প্রচার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতিও সরকার দেয়।

মন্ত্রীদের নির্বাচনে যাওয়ার জন্য দফতর থেকে পদত্যাগ করার সরকারি সিদ্ধান্তটি ছিল বিরোধী দলের একটি বিশেষ প্রাপ্তি। এরপরেও বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং নির্বাচন প্রতিহত করার হুমকি দিতে থাকে। এদিকে বিরোধী জোটগুলো, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সরকারের অনানুষ্ঠানিক আলোচনা অব্যাহত থাকে। সরকার ধারণা করছিল যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিলে বিএনপির নির্বাচনে না গিয়ে কোন উপায় থাকবে না। এরশাদ তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতির বাইরে আওয়ামী লীগকে আরেক দফা প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি স্বয়ং নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেবেন না। বিএনপি তখন পর্যন্ত ছিল সাংগঠনিকভাবে দুর্বল এবং দলের কতিপয় নেতা সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হওয়ায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কাজেই নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের তেমন কোন উৎসাহ ছিল না।

২১ মার্চ ১৯৮৬ জাতির উদ্দেশে ভাষণে এরশাদ আরেক দফা বিশেষ সুযোগদানের প্রতিশ্রুতি দেন, যেমন উপজেলা চেয়ারম্যান বা প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কাউকে কোন নির্বাচনী দল বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচার চালাতে বা সহযোগিতা করতে দেয়া হবে না। নির্বাচন হবে অবাধ ও নিরপেক্ষ এবং নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। এই পর্যায়ে এরশাদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে পড়েছিলেন এবং আওয়ামী লীগের প্রতি মনোনিবেশ করে সেই দলের নেতাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে দেনদরবার করতে থাকেন এবং নির্বাচনে যাওয়ার শর্তে শেখ হাসিনার সব ক'টি দাবি মেনে নেন।

সরকারের সাথে এক গভীর সমঝোতার পর আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তারা তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। আগের ধারণানুযায়ী আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিলে বিএনপির জন্য নির্বাচনে অংশ নেয়া বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়াবে—এক্ষেত্রে তা আর প্রযোজ্য হলো না। বিএনপি আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগে আওয়ামী লীগকে সরাসরি দোষারোপ করে এবং অভিযোগ করে যে, আওয়ামী লীগ এরশাদকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য এবং তাঁর শাসনকে বৈধতাদানের জন্য এক অশুভ সমঝোতায় এসেছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ একটি ঐক্যবদ্ধ প্রার্থী তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ না নিয়ে সমঝোতা ভঙ্গ করে বিএনপি জনগণের সঙ্গে বেঈমানী করেছে বলে দোষারোপ করে। তারা বলে যে, বিএনপি উক্ত সমঝোতার ভিত্তিতে নির্বাচনে এলে সহজেই সরকারকে উৎখাত করা সম্ভব হতো। এই ইস্যুতে ১৫ দলীয় জোটে আরেক দফা ভাঙনের সূচনা ঘটে। রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে পাঁচদলীয় ঐক্যজোট নির্বাচন থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এর ফলে নয়া একটি ৫ দলীয় জোটের জন্ম হয়।

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে জাতীয় ফ্রন্টকে একটি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক পার্টিতে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। কাজী জাফর আহমেদ জিয়ার সময় যে ভুল করেছিলেন সে ভুলের আর পুনরাবৃত্তি না করে সর্বাগ্রে তাঁর ইউপিপিকে স্বেচ্ছায় ভেঙে দিয়ে এরশাদের দলে যোগ দেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পার্টির আত্মপ্রকাশ ঘটে।

জাতীয় সংসদে সামরিক আইনের বৈধকরণের জন্য বৈধতাকরণ বিল পাস করানোর লক্ষ্যে সংবিধান অনুসারে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন ছিল। ১৯৭৯ সালে জিয়াও একইভাবে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে তাঁর শাসনের ওপর বৈধতার আবরণী দিয়েছিলেন। বৈধতাকরণ বিল পাস করানোর জন্য অত্যাবশ্যকতাটি ছিল সরকারি দলের প্রতীকবাহী হিসেবে যত বেশি সম্ভব প্রার্থীর মনোনয়ন দান এবং পার্লামেন্টে পর্যাপ্ত সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য যত বেশি সম্ভব সেইসব প্রার্থীর জন্য জয়লাভ সুনিশ্চিত করা। কারণ বৈধতাকরণ বিল পাস না হলে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা সম্ভব ছিল না। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যদের সেই পার্টির পক্ষে পার্লামেন্টে ভোট দান বাধ্যতামূলক করা যাবে। কিন্তু বিভিন্ন দল বা জোটের সমন্বয়ে গঠিত ফ্রন্ট বা জোটের বেলায় এই বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে কিনা তা ৭০ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে একটি ফ্রন্ট বা জোটভিত্তিক নির্বাচনে অংশ নেয়া ছিল বিশাল ঝুঁকি। আমরা ভাল করেই জানতাম যে, আওয়ামী লীগ কখনো বৈধতাকরণ বিলে সমর্থন দেবে না এবং বিল পাস করানোর জন্য পার্লামেন্টের ৩৩০টি আসনের মধ্যে অন্তত ২২০টি ইতিবাচক ভোট সংগ্রহ করা বস্তুত অসম্ভব একটি ব্যাপার। কাজেই এরশাদ শুধু তাঁর নিজস্ব দল নয়, অন্যান্য ছোটখাটো রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদেরও সমর্থন সংগ্রহ করার জন্য তাঁদের অর্থ সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ব্যাপক সন্ত্রাস এবং ভোট কারচুপি'র অভিযোগের মধ্য দিয়ে ১৯৮৬ সালের ৭ মে দেশব্যাপী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষমতাসীন দল হিসেবে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্যদের চেয়ে স্পষ্টতই কিছু বাড়তি সুযোগ পায়। বহু সংখ্যক এলাকায় ভোটাররা হয় ভোটদানে নিরুৎসাহিত ছিলেন কিংবা তাঁদের পছন্দমত প্রার্থীকে ভোট দেয়ার জন্য নির্বাচনকেন্দ্রে যেতেই দেয়া হয়নি। সতর্ক প্রহরীর ভূমিকা পালন করার মত পর্যাপ্ত শক্তি নির্বাচন কমিশনের ছিল না এবং ফলে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার মত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের ছিল না। রেডিও ও টেলিভিশনে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার সময় বহুবার সেই প্রচারপ্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। অনেক কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণার অহেতুক ও অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ায় নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন দেখা দেয়। বেশ কয়েকদিন পরে ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী জাতীয় পার্টি ১৫৩টি এবং আওয়ামী লীগ ৭৬টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে গণরায় যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা এ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

নির্বাচনী প্রচারণাকালে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এরশাদ তাঁর প্রার্থীর পক্ষে প্রচার করা থেকে বিরত থাকেননি। কাজেই তিনি দাবি করতে সক্ষম হননি যে, তাঁর অফিস নির্বাচনে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছে।

শেখ হাসিনা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে দাবি করলেন যে, ব্যাপক ভোট কারচুপি, ফলাফল নিয়ে জোচ্চুরি এবং পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারমাধ্যমে ফলাফল ঘোষণার কারণে তাঁর দল মাত্র ৭৬টি আসনে জয়ী হয়েছে বলে প্রচার করা হচ্ছে। তিনি এরশাদকে নির্বাচন পূর্বকাল প্রদেয় প্রতিটি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার দায়ে অভিযুক্ত করেন। তাঁরা মাসের পর মাস পার্লামেন্ট অধিবেশন ভঙ্গ করেন, পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে বিকল্প পার্লামেন্ট আয়োজন করেন এবং বৈধতাকরণ বিলের (সপ্তম সংশোধনী) ওপরে আলোচনা থেকে বিরত থেকে তাঁদের বিনা উপস্থিতিতে বিল পাস হতে দেন। যাই হোক, একবার নির্বাচনে অংশ নেয়ার পর তাদের এসব অভিনয় ছিল জনসমর্থনের প্রতি অবমাননা মাত্র এবং সেই কারণে তাদের সরকারবিরোধী আন্দোলন কখনোই জোরদার হয়ে ওঠেনি।

এ সুযোগে বিএনপি তাদের নির্বাচনে অংশ না নেয়ার যথার্থতা প্রমাণ করে আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত করে এবং জনস্বার্থকে বলি দেয়ার অভিযোগ তুলে এরশাদ ও শেখ হাসিনার ওপর প্রবল আঘাতের সূত্রপাত ঘটায়। তাদের মতে এ নির্বাচনে কেউ ভোট দিতে যায়নি, কিন্তু সমঝোতার ভিত্তিতে জাতীয় পার্টি ও আটদলীয় জোট আসন ভাগাভাগি করে নিয়েছে। খালেদা জিয়া এরশাদকে নব জীবন দান করার অভিযোগে শেখ হাসিনাকে সরাসরি অভিযুক্ত করেন। আওয়ামী লীগ দাবি করে যে, এরশাদের সঙ্গে লেনদেন ব্যর্থ হওয়ায় বিএনপি নির্বাচন থেকে সরে এসেছে। অন্যদিকে বিএনপির মতে শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তের ফলেই এরশাদ তাঁর শাসনামলকে বৈধ প্রতিপন্ন করে পার্লামেন্টে তাঁদের বৈধকরণ বিল পাস করাতে সক্ষম হয়েছেন।

শেষাবধি শেখ হাসিনা পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় নেত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট পার্লামেন্ট অধিবেশনে যোগ দেয়। তিনি এটি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, আওয়ামী লীগ হলো দেশে একমাত্র বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি এবং তার পেছনে জনগণের কার্যকর সমর্থন রয়েছে। সরকারিভাবে স্বীকৃত বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে তিনি তখন থেকে পতাকাবাহী গাড়ি, অফিস এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে শুরু করেন। একই পদমর্যাদার তিনি ওয়াশিংটন সফরে গিয়ে তাঁর অবস্থানকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর এই উজ্জ্বলতর ভাবমূর্তি ও প্রচার সাময়িকভাবে খালেদা জিয়ার অবস্থানকে ম্লান করে দেয়। শেখ হাসিনা তাঁর বাবার মত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, কেবল নির্বাচনের মাধ্যমেই একটি গণতান্ত্রিক ও গণভিত্তিক রাজনৈতিক দল জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার অর্জন করতে পারে। শেখ মুজিব যদি ১৯৭০ সালে সামরিক আইনের অধীনে নির্বাচনে অংশ না নিতেন তাহলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটত না। ১৯৭১ সালে মুজিব নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নয়, গোটা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং সে

www.pathagar.com

কারণেই যুদ্ধকালীন সময় বাংলাদেশ এবং আওয়ামী লীগ গোটা বিশ্বের অকুণ্ঠ সমর্থন অর্জন করে। শেখ হাসিনাও একই পন্থা অনুসরণ করছিলেন। একদিকে তিনি তাঁর দলের গ্রহণযোগ্যতা এবং অন্যদিকে নেতা হিসেবে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করছিলেন। তবে, সার্বিক রাজনৈতিক মূল্যায়নে শেখ হাসিনার প্রকাশ্য ভাবমূর্তি দারুণ সমালোচনায় জর্জরিত হয় এবং পরবর্তীকালে তাঁকে তার জন্য চরম রাজনৈতিক মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে।

তবে এই নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদের উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে অর্জিত হয়। তিনি এমন একটি পার্লামেন্টের নাগাল পেলেন, যে পার্লামেন্ট তাঁর সামরিক শাসনের ওপর বৈধতার প্রলেপ এনে দেবে, সামরিক আইন প্রত্যাহার করে তাঁকে দেশের সাংবিধানিক সরকারের প্রধান হতে সাহায্য করবে। একইসঙ্গে তিনি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যকার ব্যবধান বাড়াতে সক্ষম হলেন, বিশেষ করে হাসিনা ও খালেদার মধ্যেকার দূরত্ব অনেক বাড়িয়ে দিলেন। সরকারের সক্রিয় সমর্থন থাকার পরেও জাতীয় পার্টি নামেমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মোট ১৫৩টি আসনে জয়লাভ করলেও পরবর্তীকালে দলটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসন পূর্ণ করে। অচিরেই বিপুল সংখ্যক নির্দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য এবং ছোটখাটো রাজনৈতিক দলের পার্লামেন্ট সদস্যরা 'গণতন্ত্র' রক্ষার জন্য সরকারের পতাকাতলে শামিল হতে শুরু করেন। এভাবে সরকার বৈধতাকরণ বিল অনুসমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় ২২০ জন পার্লামেন্ট সদস্যের ইতিবাচক ভোট অর্জনে সক্ষম হয়। আটদলীয় জোট একটি কার্যকর রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে সরকারের জন্য অস্বস্তি সৃষ্টি করলেও সরকার শেখ হাসিনাকে বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে দেশে ও বিদেশে সব রকমের সম্মান প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করে।

পার্লামেন্ট নির্বাচনের অব্যবহিত পরে এবং পার্লামেন্টের কোন অধিবেশন আহ্বান করার আগেই সরকার সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদবলে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে এরশাদের ক্ষমতারোহণের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে বিরোধী দলগুলোকে নির্বাচনে অংশ নিতে সম্মত করানো ছিল একটি কঠিন কাজ। শেখ হাসিনা ইতোমধ্যেই একদিকে নির্বাচনে ভোট কারচুপি করায় এবং অন্যদিকে নির্বাচনের আগে তাঁকে গোপনে দেয়া কোন প্রতিশ্রুতি পালন না করায় এরশাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে নিয়েছিলেন। উপরন্তু আওয়ামী লীগ কিংবা আটদলীয় জোট মোটেও প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকারের পক্ষপাতী ছিল না। খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার সমর্থক হলেও এরশাদের অধীনে যে কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার প্রশ্নে সম্পূর্ণ অটল থাকেন। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় সরকার এরশাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত যোগ্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পায়নি। বিরোধী দলগুলোর হরতালের কর্মসূচি ও নির্বাচন বর্জনের মুখে এবং যোগ্য কোন প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিতে জনগণ নির্বাচনে তেমন কোন উৎসাহ দেখায়নি। এভাবে বৃহৎ কোন রাজনৈতিক দলের বা ব্যক্তির অংশগ্রহণ ও প্রতিযোগিতা ছাড়াই সম্পূর্ণ প্রহসনের এক নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদ দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সঠিক না হলেও এবং গ্রহণযোগ্যতার যত প্রশ্নই থাকুক না কেন আইনগতভাবে এবং সাংবিধানিকভাবে তখন দেশ চালাবার জন্য একটি নির্বাচিত জাতীয় সংসদ এবং একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। কিন্তু তারপরও রাজনৈতিক, এবং সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিরোধী জোটগুলো পরবর্তীতে সরকারের বিরুদ্ধে একটি অভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে সরকার পতনের জন্য নিরলস ও অব্যাহতভাবে আন্দোলন শুরু করে দেয়।

এক বছরের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার লিয়াজোঁ কমিটি পুনর্গঠিত হয়ে কাজ শুরু করে দেয় এবং ১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি প্রধান প্রধান জোট মিলে একটি অভিন্ন চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হয়। পার্লামেন্টকে সরকারবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ এবার রাজপথেও সমানভাবে আন্দোলনে শরিক হয়। খালেদার আপোসহীন মনোভাব তাঁর জন্য একটি, বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে একটি ইতিবাচক রাজনৈতিক ভাবমূর্তি ও সমর্থন-ভিত্তি এনে দেয়। খালেদার নেতৃত্বে সাতদলীয় ঐক্যজোট একটি শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করছিল। জনগণের মধ্য থেকেও দুজোটকে একত্রে একই রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রতিদিন দাবি উত্থাপিত হচ্ছিল। সকলেই অনুভবন করতে পেরেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট দুটি সম্মিলিতভাবে কাজ করলে সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে পড়বে।

১৯৮৭ সালের অক্টোবর নাগাদ একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে। যুব ও ছাত্রসমাজের সক্রিয় সমর্থনে খালেদা জিয়া এরশাদ সরকার ও তথাকথিত পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে থাকেন। শেখ হাসিনা যখন দেখতে পেলেন যে, জাতীয় সংসদ এখন আর জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে না, বরং জাতির দৃষ্টিতে এরশাদই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইস্যু এবং তাঁর পদত্যাগ ও একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি খুব জোরদার হয়ে উঠেছে, তখন শেখ হাসিনা আন্দোলনের পথে আরো এগিয়ে আসেন। এমতাবস্থায় দুই প্রধান রাজনৈতিক জোট একটি যুক্ত ঘোষণার মাধ্যমে ১০ নভেম্বর রাজধানীতে ১০ লাখ লোকের এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ ঘটানোর ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এতে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং সকলেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকেন যে, সরকারের পতন এখন অত্যাসন্ন।

এরশাদ এবং তাঁর সরকার তখন এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়। বিরোধী দলসমূহের এই কর্মসূচিকে প্রতিহত করার জন্য সরকার দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে জনসমাবেশ ও মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের আটক করা হয়, গ্রামাঞ্চল থেকে লোকজন যাতে শহরের দিকে আসতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে লঞ্চ ও ট্রেনের চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য নিয়মিত আইন রক্ষাকারীবাহিনীর পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও বিডিআর মোতায়েন করা হয়। সরকারের গৃহীত এসব পদক্ষেপ বানচাল করার জন্য বিরোধী দলগুলো পর্যাপ্ত জনসমর্থন

সংগ্রহ করতে পারেনি। ফলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জনসভাটি অন্য জনসভার চেয়ে আকারে বড় হলেও তেমন কোন সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

এভাবে ১০ নভেম্বর সরকারবিরোধী আন্দোলন সরকারের দৃষ্টিতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের তীব্রতা কমেনি, বরং ক্রমশ তা ঘনীভূত হতে থাকে। পার্লামেন্ট বাতিল এবং ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর প্রতি তাদের পার্লামেন্ট সদস্যদের পদত্যাদের দাবি ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। বিভিন্ন দল, বিশেষ করে আটদলীয় জোটের শরিক দলগুলো এ নিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলে সরকার দারুণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সরকার বুঝতে পারে যে বিরোধী দলের সকল সদস্য একসাথে পদত্যাগ করলে পার্লামেন্ট অর্থহীন হয়ে পড়বে।

নিজের ক্ষমতা রক্ষার্থে বিরোধী দলে ভাঙন সৃষ্টির জন্য এক বেপরোয়া উদ্যোগ নিয়ে এরশাদ আমাদের অনেকের অজ্ঞাতে আবার শেখ হাসিনার সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার চেষ্টা করলেন, এমনকি তিনি সংবিধান সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার গঠনেও সম্মত হলেন। এটি ছিল বাংলাদেশের সাংবিধানিক ক্ষেত্রে একটি মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। জাতির প্রতি প্রদত্ত এক ভাষণে এই প্রস্তাব ঘোষণা করার জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ক্যান্টনমেন্টের জেনারেলদের, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ কিংবা জাতীয় পার্টির পার্লামেন্ট সদস্যবর্গ কাউকে কিছু না জানিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় অত্যন্ত গোপনে। আমি নিজেও কিছুই জানতাম না। মন্ত্রিপরিষদের দুয়েকজন সদস্য ঘটনাক্রমে এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করে। এই কথা দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে এরশাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয় পরিকল্পনাটি বাতিল করার জন্য। পরবর্তীকালে এই উদ্যোগকে পার্লামেন্টারি ক্যু বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু বিষয়টি জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর এরশাদ আওয়ামী লীগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে এই উদ্যোগের প্রণেতাদের উল্টো দারুণভাবে দোষারোপ করেন। আসলে কেবল নিজের আসন সামলাবার জন্য কোন রকম সাতপাঁচ চিন্তা না করেই এরশাদ সরকার পদ্ধতি পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্তের পথে নিজেই পা বাড়িয়েছিলেন। স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এই পরিকল্পনাটি পেশ করা হলে সর্বমহল থেকে এটি নিশ্চয়ই একটি সার্বজনীন সমর্থন অর্জন করত। কিন্তু লুকিয়ে আওয়ামী লীগের সাথে এ ধরনের একটি আপোসরফা করাটা কেউ পছন্দ করেনি।

এই পার্লামেন্টারি ক্যু'র উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর আওয়ামী লীগ তার চূড়ান্ত শক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা আরো গভীরভাবে অনুভব করতে থাকে। পার্লামেন্ট সদস্যরা ছিলেন এ সময়ে সংসদীয় পদ থেকে পদত্যাগ করার প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী জাতীয় সংসদে তাদের দলের দশজন সদস্যের একযোগে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করলে আন্দোলন সহসা প্রবল গতিবেগ অর্জন করে। এরপর অন্যান্য নির্দলীয় পার্লামেন্ট সদস্যরাও তাঁদের পদত্যাগের ঘোষণা দেন। শেখ হাসিনা তখন ছিলেন তাঁর ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে গৃহবন্দি। কিন্তু দলের প্রেসিডিয়াম সদস্যরাও একটি বৈঠকে তাদের সকল

www.pathagar.com

পার্লামেন্ট সদস্যের পদত্যাগের পক্ষে একটি প্রস্তাব পাস করেন। শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে অবহিত হওয়ার আগেই প্রচারমাধ্যমে প্রেসিডিয়ামের এই সিদ্ধান্ত প্রচারিত হলে সরকারের ভেতরে ও বাইরে এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। শেখ হাসিনা ঠিক এ সময়ে পার্লামেন্ট থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু ড. কামাল হোসেনসহ যেসব নেতা পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি, তাঁদের উদ্যোগেই এ সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছিল।

এতে করে আরেক দফা এরশাদ তাঁর নিজের, তাঁর সরকারের এবং দেশের সংবিধান রক্ষা করার জন্য বিরাট এক সঙ্কটের সম্মুখীন হন। এরশাদ আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য এবং রাজনৈতিক উদ্যোগ নিজের হাতে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালের ৮ ডিসেম্বর বিরোধীদলীয় পার্লামেন্ট সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করা আগেই পার্লামেন্ট বাতিল করে দেন।

সংবিধান অনুসারে পার্লামেন্ট বাতিলের নব্বই দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের নয়া নির্বাচন অনুষ্ঠান করা বাধ্যতামূলক। এরশাদের জন্য নতুন নির্বাচনের লক্ষ্য ছিল একদিকে সংবিধান রক্ষা করা এবং অন্যদিকে ঘনায়মান অনিশ্চয়তা থেকে দেশকে বের করে আনা। এমতাবস্থায় বিরোধী দলগুলোর সামনে একমাত্র বিকল্প ছিল হয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা আর না হয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না দিয়ে এরশাদকে একটি সাংবিধানিক শূন্যতার দিকে ঠেলে দেয়া যা তখনকার পরিস্থিতিতে ছিল অসম্ভব। এ লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত তারা নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। ইতোমধ্যে ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। শেখ হাসিনা নির্বাচন বর্জনের আন্দোলনের অংশ হিসেবে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গেলে আওয়ামী লীগের স্থানীয় দুই বিবদমান গ্রুপের সংঘর্ষকালে তাঁর মঞ্চ ভেঙে পড়ে। এ সময় পুলিশ গুলি ছুঁড়লে কমপক্ষে ১২ জন নিহত হন। আওয়ামী লীগ দাবি করে যে, শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য এ হামলা চালানো হয়েছে—তিনি অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা করতে পেরেছেন।

এ ঘটনার জনগণের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে ভীষণ এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সরকার সঙ্গে সঙ্গে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেও দেশব্যাপী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হতে থাকে। ফলে দেশব্যাপী হরতাল, মিছিল, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভের আয়োজন করা হতে থাকে। তবে শেষ পর্যন্ত তা স্তিমিত হয়ে আসে। নির্বাচন বর্জনের আন্দোলনও জনসমর্থনের অভাবে জোরদার হয়নি। নির্বাচনের দিনে দেশের কোন স্থানে সংগঠিত কোন প্রতিরোধ গড়ে উঠতে দেখা যায়নি, এমনকি রাজধানী ঢাকায় দিনটি শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়।

নির্বাচনে আ. স. ম. আব্দুর রব কয়েকটি স্বল্প পরিচিত এবং অপরিচিত দলের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত বিরোধী জোট থেকে অংশ নেন এবং ৩৫টি আসনে বিজয়ী হন। ফ্রিডম পার্টি চারটি, জাসদ (শাহ জাহান) তিনটি এবং ছয়জন নির্দলীয় ব্যক্তি পার্লামেন্টে আসন লাভ করেন। জাতীয় পার্টি বিজয়ী হয় বাকি ২৫২টি আসনে। সরকার এসব দল এবং ব্যক্তিকে অর্থ এবং অন্যান্য সব রকমের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সাহায্য করে।

www.pathagar.com

তবে নির্বাচনের দিনেই বিরোধী দলগুলোর নির্বাচন বর্জনের প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ে। কোন ধরনের প্রতিযোগিতা না থাকায় জনগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা তেমন ছিল না এবং সারা দেশে ভোটার উপস্থিতির সংখ্যা ছিল নগণ্য। বিদেশী সংবাদদাতা ও পর্যবেক্ষণকারীদের হিসেবে মোট ভোটের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ জমা পড়ে।

যেভাবেই হোক না কেন, নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধানের প্রয়োজনীয় শর্তের নিষ্পত্তি হয়। রাজপথে নিষ্ক্রিয় বিরোধী দলের উপস্থিতিতে এরশাদ পার্লামেন্টের সহায়তায় তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা অব্যাহত রাখার সুযোগ পান। যথারীতি আইন ও বাজেট প্রণয়ন এবং অনুমোদনের কাজ চলতে থাকে। এই পার্লামেন্টে অন্তত তিনটি সংবিধান সংশোধনী বিল গৃহীত হয় এবং পার্লামেন্ট প্রায় তিন বছর টিকে থাকে।

নির্বাচনের পর দুবছরের অধিককাল পার্লামেন্টের বাইরে বিরোধী ক্যাম্পে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে হাসিনা ও খালেদা ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করে চলেন। দুই জোটের লিয়াজোঁ কমিটি এক বছরের বেশি সময় ধরে কোন কর্মতৎপরতা দেখায়নি এবং এরশাদের সামনে সবকিছু শান্ত, স্বাভাবিক এবং জটিলতাবিহীন বলে প্রতিপন্ন হতে থাকে। এর ফলে এরশাদ বিরোধী দলগুলোর নীরবতাকে তাঁর নিজস্ব রাজনীতির বিজয় এবং একটি ব্যক্তিগত সাফল্য হিসেবে ধরে নেন। ১৯৮৮ সালে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সফলভাবে নিয়ন্ত্রণে আনার পর বহির্বিশ্বে এরশাদের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় এবং তিনি এখন আগের চেয়ে বেশি সংখ্যায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেয়া শুরু করেন। এ হিসেবে তিনি পরিবেশগত সমস্যা এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের সমস্যা নিয়ে অধিকতর ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। দেশের অভ্যন্তরে তিনি একদিকে রাজনীতি ও প্রশাসনে যেমন হয়ে ওঠেন আরো কর্তৃত্বপরায়ণ, অন্যদিকে তিনি নিজে শাসক হিসেবে দিনে দিনে আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

অনেক দিক দিয়ে এরশাদ ছিলেন সৌভাগ্যবান। তিনি যখন ক্ষমতা করায়ত্ব করেন, তখন তাঁর ছিল না বিন্দুমাত্র জনসমর্থন এবং তিনি চিহ্নিত হয়েছিলেন একজন বলপূর্বক অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। বিএনপি সরকারকে উৎখাত করায় তার পেছনে ছিল দেশের অভ্যন্তরস্থ বিশাল অন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠনের নীরব সমর্থন। আওয়ামী লীগ এবং ভারতের কাছে এরশাদ ছিলেন বিএনপির তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সম্ভবত এ পরিস্থিতি তাঁর উদ্দেশ্যের পরিপূরক হয়ে ওঠায় তিনি দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তিকে নিজের সুবিধার্থে ইচ্ছামত ব্যবহার করেছেন এবং নিজে সুস্পষ্ট কোন রাজনৈতিক দর্শনের উদ্যোক্তা বা অনুসারী না হয়ে প্রায় নয় বছর ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছেন।

১৯৮৬ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিএনপির অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করার পর তা এরশাদকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে সাহায্য করে। উপরন্তু ১৯৮৮ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলসমূহ অংশগ্রহণ না করলেও এরশাদ আরো পাঁচ বছর দেশ শাসনের আইনগত অনুমোদন পেয়ে যান। আসলে বিরোধী দল ও নেতৃবৃন্দের হঠকারী ভূমিকা, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এবং ঐক্যহীনতা এরশাদকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে সাহায্য করেছে।

www.pathagar.com

১৯৯০ সালের মে মাসে বরগুনায় এরশাদ পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ঘোষণা দেয়ার পর বিরোধী শক্তিগুলো উপলব্ধি করতে শুরু করে যে, সম্মিলিত একটি প্রচেষ্টা ছাড়া এরশাদের পতন ঘটানো সম্ভব হবে না। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ এবং দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত কারণে বিরোধী দলগুলো পরস্পরের আরো কাছাকাছি চলে আসে:

১. এরশাদ আরো একটি মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করাতে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ইস্যুতে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে দেনদরবারের সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

২. বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী দাতা সংস্থাসমূহ এবং তাদের প্রতিনিধিরা এই ঘোষণায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। তাঁরা ইতোমধ্যেই একক শক্তি সঞ্চয়কারী এরশাদের সঙ্গে আরো পাঁচ থেকে ছয় বছর লেনদেন করার ক্ষেত্রে উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে শুধু কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন নয়, প্রতিটি বিদেশী উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর হস্তক্ষেপে দাতা প্রতিনিধিরা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়। তাঁরা এই বলে এরশাদের সমালোচনা করতে শুরু করেন যে, এর ফলে একদিকে যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি সরকারের সর্বোচ্চ পদ থেকে দুর্নীতি বিস্তারের পথ সম্প্রসারিত হচ্ছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার সাথে সাক্ষাতের সময় তখন বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের দুজন প্রেসিডেন্টই তাঁদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা জানিয়ে গেছেন। তাঁরা এরশাদের আবার নির্বাচন করার ঘোষণা এবং দুর্নীতির সমালোচনা প্রকাশ্যে অকপটে করে গেছেন।

৩. বৃহৎ কোন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে এরশাদের আরেকটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত বিরাট সংখ্যক সামরিক অফিসারদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৪. বিরোধী শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ইতোমধ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। নাগরিক কমিটি, উন্মুক্ত ফোরাম, কতিপয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের মিলিত সংস্থা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং এ ধরনের আরো বেশ কিছু সংগঠন আরো সংগঠিত হয়ে সরকার উৎখাতে সম্মিলিত আন্দোলনের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

৫. ডাকসুসহ সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংগঠনগুলোর নির্বাচনে বিএনপির অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করে। বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ইতোমধ্যেই এরশাদের বিরুদ্ধে একটি আপোসহীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় ছাত্ররা আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করতে এগিয়ে

www.pathagar.com

আসে। পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সক্রিয় সমর্থনে ডাকসু'র নেতৃত্বে সবগুলো প্রধান ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে একটি সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠন করা হয়। বিগত বহু বছর যাবৎ দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সমন্বয়ে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠন এরশাদবিরোধী আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চারিত করে।

এভাবে নানা রকম ভিন্নতা ও বিরোধ থাকা সত্ত্বেও প্রধান দুটি জোট, বিশেষ করে দুই নেত্রীর ওপর সরকারবিরোধী একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার জন্য অব্যাহতভাবে চাপ আসতে থাকে। যার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাত্র এক দফা দাবি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেটি হলো নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক একটি সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন। খালেদা এবং হাসিনার ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত হলো যে এরশাদের অধীনে আর কোন নির্বাচনে তাঁরা অংশ নেবেন না এবং এরশাদকে এবার ক্ষমতা ছাড়তেই হবে।

আমাদের সরকার পতন এত আকস্মিকভাবে সূচিত হয় যে, এরশাদ নিজে কিংবা তাঁর প্রতিপক্ষরা কেউই তা অনুমান করতে পারেনি। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল শান্ত। এমনকি এরশাদ মন্তব্য করেছিলেন যে, বিরোধী দলগুলোর মধ্যেকার বিভেদ এবং দুর্বলতা দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয়। এ সময়ে এরশাদের প্রতিটি জনসভায় প্রচুর লোকসমাগম হচ্ছিল এবং বক্তৃতা দেয়ার সময় তাঁকে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি বলে মনে হতো।

কুয়েত সঙ্কটে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৌদি আরবে সৈন্য প্রেরণের পর এরশাদের আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। এই সৈন্য প্রেরণের জন্য দেশে তিনি বিরোধী দলগুলোর নিকট সমালোচিত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব তাঁর প্রশংসা করে এবং গোটা পশ্চিমা জগৎ বাংলাদেশের ভূমিকাকে স্বাগত জানায়।

এ সময়ে এরশাদ বিশ্বাস করতে থাকেন যে, তিনি এখন আন্তর্জাতিক বিশ্বেও একটি ভূমিকা রাখতে পারেন। এরপর থেকে তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন জনসমাবেশ ও ফোরামে ভাষণ দিয়ে বেড়াতে থাকেন। ফলে দেশের সমস্যা দূরীকরণের জন্য তাঁর হাতে খুব অল্পসময়ই অবশিষ্ট ছিল। দেশের ভেতরে তিনি কোন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন না এটি মনে করে তিনি ঘন ঘন বিদেশ সফর শুরু করেন। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর জাতিসংঘের এক বিশেষ অধিবেশনে যোগদানের জন্য প্যারিসে যান।

এর মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে তিনি ৭ জাতি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক উপলক্ষে আবার প্যারিস গিয়েছিলেন। ইরাক ও কুয়েতের যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশী সৈন্যদের দেশে ফেরার সময় হলে তাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য ১২ সেপ্টেম্বর তিনি তুরস্কে তাঁদের ক্যাম্প পরিদর্শনে যান। ফেরার পথে তিনি সৌদি আরব গেলে বাদশাহ ফাহাদের সঙ্গেও এরশাদ সাক্ষাৎ করেন। ২২ সেপ্টেম্বর দুদিনের সফরে আবার তিনি সংযুক্ত আরব আমীরাতে যান। এরপরই এই বাড়াবাড়ি রকমের আত্মবিশ্বাসবোধের কারণে তিনি টানা দুসপ্তাহ রাজনৈতিক

www.pathagar.com

তাৎপর্যবিহীন ব্রেকফাস্ট প্রেয়ার গ্রুপের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন এবং কলরাডোর ডেনভারে গল্ফ খেলে অতিবাহিত করেন।

৮ অক্টোবর এরশাদ যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে আসেন। এরপর ১০ অক্টোবর বিরোধী দলগুলো পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে সচিবালয় ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের আয়োজন করলে পুলিশ রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় আল্লাহওয়ালা বিল্ডিংস্থ জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে সম্মিলিত বিরোধী দল ১৬ অক্টোবর অর্ধ দিবস হরতাল এবং ১০ নভেম্বর পূর্ণ দিবস হরতালের ডাক দেয়। এরশাদ এ সমস্ত কর্মসূচিতে অবিচলিত থাকেন। ১০ অক্টোবর ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট আহ্বান করলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ও পুলিশের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। শহরের অসংখ্য স্থানে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে এবং তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের একজন ছাত্রসহ দুজন নিহত হন। ছাত্ররা আণবিক শক্তি কমিশনের ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর পরপরই ছাত্র ও যুবকেরা ধ্বংসলীলা চালিয়ে বিদেশী দূতাবাস, বিদেশী নাগরিক ও সংস্থাসমূহের গাড়িসহ অসংখ্য যানবাহন ভাঙচুর করে। তখন, ১৫ ও ১৬ অক্টোবর হরতালের আহ্বান জানানো হয় এবং সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী গ্রুপ ও সংগঠন এতে সমর্থন জানায়। বিক্ষোভ ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলসমূহের দুটি জোট ক্রমশ পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসতে থাকে। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া তাঁদের সব ধরনের ভিন্নতা সত্ত্বেও একটি কমন গ্রাউন্ড খুঁজে পান, এবং সেখান থেকে তাঁদের কারোরই আর পেছনে ফিরে তাকানোর সুযোগ ছিল না। তাঁরা দুজনেই সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং দুজনেই গোটা বিরোধী আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

এই নতুন করে জাগিয়ে ওঠা আন্দোলনের পেছনে মূল শক্তি ছিল ছাত্রসমাজ এবং এদের প্রধান নেতৃত্বে ছিল খালেদা জিয়ার অনুসারী বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। জুন থেকে অক্টোবর অবধি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতারা দেশের সরকারবিরোধী আন্দোলনের সূতিকাগার ডাকসুসহ দেশব্যাপী প্রায় ৩০০ কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে জয়লাভ করে। ডাকসু'র জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতারা ঢাকায় দেশব্যাপী কলেজসমূহে নির্বাচিত ছাত্রদল নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করে এবং ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে আগত প্রায় ২ হাজার ছাত্রনেতা এরশাদ সরকারের পতন ঘটানোর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অতীতে যেমনটি ঘটেছে ঠিক সেই ধারা অনুসরণ করে এবারও বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নেতারা কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি স্থির করার আগে সম্মিলিত ছাত্রগোষ্ঠী, আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনসহ, ২২টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে একটি সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য (APSU) গঠন করে।

১৬ অক্টোবর হরতালের দ্বিতীয় দিনে এরশাদ তিনদিনের এক সফরে সস্ত্রীক বেলজিয়াম চলে যান। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে আসার পর ব্রাসেলস যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে দেশের প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার মত পর্যাপ্ত সময় তাঁর হাতে ছিল না। আসলে

www.pathagar.com

এসব ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্নই হয়ে গিয়েছিল। গোয়েন্দাপ্রধানরাও ঘটনাপ্রবাহ চেপে রেখে তাঁর কাছে মামুলি ধরনের তথ্য পেশ করা শুরু করে। সহযোগীদের মধ্যে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন আন্দোলনের ভয়াবহতার দিকে নির্দেশ করে এরশাদকে সতর্ক করে দেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ একে ছোটখাটো ব্যাপার ও গুরুত্বহীন বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন। এতে করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব এরশাদের ওপরই ছেড়ে দেয়া হয়। এর আগেও তাঁকে এমন একটি ধারণা দেয়া হয়েছিল যে, বিক্ষোভ শুধু শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং এরশাদ এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে বিপুলভাবে জনপ্রিয়।

১৬ অক্টোবর হরতালের দিনে রাজনৈতিক জোটগুলো যার যার মঞ্চ থেকে অভিন্ন আন্দোলনের যুগপৎ কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক পৃথক কর্মসূচি নিয়ে রাজনৈতিক জোটগুলোর কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানায়। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে অব্যাহতভাবে বিক্ষোভ বিস্তৃত হওয়ার খবর আসতে থাকলেও ডেপুটি কমিশনার ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনে সেসব তথ্যের কোন প্রতিফলন ছিল না বরং অনেক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, সরকারের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন অব্যাহত রয়েছে এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়ায় জনগণ তাদের নিন্দা করেছে। ১৭ অক্টোবর সরকার ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করলে ছাত্ররা আরো সহিংস হয়ে ওঠে এবং বেসরকারি মালিকানাধীন যানবাহন, পেট্রোল পাম্প ও সরকারি সম্পত্তির বিপুল ক্ষতিসাধন করে। ঢাকা শহরে প্রতিদিন ৫০ থেকে ৬০টি যানবাহনে আগুন লাগিয়ে দিয়ে জনগণের, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বাইরে থেকে শহরে আসা লোকদের জীবনে অবর্ণনীয় দুর্ভোগের সৃষ্টি করা হয়। এ সময় বিরোধী দলগুলো ২১ অক্টোবর গণপ্রতিবাদ দিবস, ২৩ অক্টোবর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিক্ষোভ ও মিছিল, ২৭ অক্টোবর সড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি ও ১০ নভেম্বর দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেয়। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য, ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিক ইউনিয়নসমূহের জোট শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, বিভিন্ন পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক জোট ও সংগঠন এসব কর্মসূচির প্রতি তাদের পরিপূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার অধ্যাদেশের প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। ছাত্ররা তাঁদের নিজস্ব কর্মসূচি অনুযায়ী ১৭ অক্টোবর প্রতিবাদ সভা, ২২ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র-শিক্ষক যৌথ প্রতিবাদ সভা, ২৫ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ এবং ২৮ অক্টোবর দেশব্যাপী প্রতিরোধ দিবস পালনের আহ্বান জানায়।

২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সড়ক ও রেলপথ অবরোধ দিবসে বিরোধী দল বিপুল সংখ্যক যানবাহনের ক্ষতিসাধন করে আন্দোলনের ব্যাপকতা তুঙ্গে নিয়ে যায়। ছাত্ররা দুটি বাণিজ্যিক অফিস লণ্ডভণ্ড করে আসবাবপত্র ও কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিরোধী দলগুলোও এ সময় তাদের বিক্ষোভ ও আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর করতে থাকে। ইতোমধ্যে জামায়াতে

www.pathagar.com

ইসলামীসহ বিরোধী দল ও জোটগুলো ঐকমত্যে পৌঁছে যায় যে, একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। তাই এরশাদকে প্রথমে পদত্যাগ করে তারপর নির্বাচন হতে হবে। বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন মূলত রাজধানীভিত্তিক ছিল বলে ঢাকায় হরতাল চালাকালে এরশাদ গ্রামেগঞ্জে সফরে গিয়ে বিশাল বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দিতে থাকেন।

এরশাদ ধারণা করেছিলেন যে, তিনি যেহেতু ১৯৮৭ সালে এর চেয়ে ব্যাপকতর ও ভয়াবহ আন্দোলন ঠেকাতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেহেতু বর্তমান আন্দোলনে তেমন ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। বেলজিয়াম থেকে ফিরে এসে তিনি জনসংযোগ সফরে বেরিয়ে ঢাকা শহরসহ দেশব্যাপী জনসমাবেশে ভাষণ দিতে থাকেন। তিনি যেখানেই যাচ্ছিলেন, সেখানেই বিপুল সংখ্যক জনগণ তাঁকে দেখা বা শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছে। এসব দেখে এরশাদের মনে ধারণা জন্মেছিল যে, জনগণ তাঁর পক্ষেই রয়েছে।

১৯৯০ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) অনুপ্রেরণায় হিন্দু মৌলবাদীরা ভারতের একটি নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কয়েকশ মুসলমানকে হতাহত করলে মুসলিম সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তীব্র কণ্ঠে এর প্রতিবাদ জানায়। একটি স্বার্থান্বেষী শ্রেণী ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির এবং চট্টগ্রামের একটি মন্দিরে হামলা চালায়। রাজধানীর আরো কয়েটি মন্দিরের ক্ষতিসাধন করা হয়। এ সমস্ত ঘটনায় জনগণের দৃষ্টি রাজনীতি এবং বিগত তিন সপ্তাহ ধরে দেশ চলমান ঘটনাবলি থেকে সরে যায়। বিরোধী দলগুলো তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিবাদ জানিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর অভিযোগে এরশাদকে অভিযুক্ত করে, যদিও হিন্দু সংখ্যালঘুদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য এরশাদকে দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে একজন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নেয়। কয়েকজন সহযোগী তাঁকে ঘটনা থেকে রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের পরামর্শ দিলেও এরশাদ তা থেকে বিরত থাকেন।

১ নভেম্বর ঢাকায় আয়োজিত এক বিশাল জনসমাবেশে এরশাদ শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান এবং দলীয় নেতারা ঢাকায় বিরাট এক শান্তি মিছিলের আয়োজন করেন। আমার পরামর্শে এরশাদ সেনাবাহিনী তলব করে কারফিউ জারি করে দেন এবং যে কোন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নিবৃত করার জন্য জেলা সদরদপ্তরগুলোতে নির্দেশনামা পাঠিয়ে দেয়া হয়। এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হয় এবং সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যায়।

পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলগুলো আবার তাদের আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারিত করে। ৫ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমে নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচারের দাবিতে আয়োজিত রেডিও-টেলিভিশনকেন্দ্র ঘেরাও করা হয়। ১০ নভেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেয়া হয়। এরশাদ এবারও এসবকে উপেক্ষা করে সম্রাট আকিহিতোর অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদান

www.pathagar.com

করার জন্য জাপান চলে যান। ১২ নভেম্বর এক দিনের জন্য কর্মসূচি থাকলেও এরশাদ এর তিন দিন আগে সস্ত্রীক দেশের বাইরে চলে যান এবং পাঁচ দিন পর ১৪ নভেম্বর দেশে ফিরে আসেন। এ সময় বিরোধী দলের আন্দোলন আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে।

তাঁর জাপান যাওয়ার পথে ব্যাংকক অবস্থানকালে ১০ নভেম্বর দেশে চলছিল এক ব্যাপক হরতালের কর্মসূচি। এ সময় বিরোধী দলগুলো এক মাসব্যাপী বিক্ষোভের এক নয়া কর্মসূচি ঘোষণা করে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এবং অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠন আন্দোলনে সমর্থন দেয় এবং শহরের বহু স্থানে জনতা ও পুলিশের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে সংঘর্ষের সূচনা ঘটে। এ সমস্ত ঘটনায় সরকারি সম্পত্তির বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। সরকারের এক আদেশ অগ্রাহ্য করে শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রেখে ক্লাস দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সারা দেশে ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ১২ নভেম্বর দেশের প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে প্রতিবাদ সভার আয়োজন ও কালো ব্যাজ ধারণের আহ্বান জানায়। এছাড়া ১৩ নভেম্বর ঢাকার তেজগাঁওয়ে ছাত্র-শ্রমিকদের যৌথ মিছিল, ১৪ নভেম্বর দেশব্যাপী মিছিল ও উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিসসমূহে কালো পতাকা উত্তোলন, ১৫ নভেম্বর টঙ্গীতে ছাত্র-শ্রমিকের সমাবেশ, ১৬ নভেম্বর নরসিংদীতে ছাত্র কৃষকের সমাবেশ, ১৭ নভেম্বর মন্ত্রী ও পার্লামেন্ট সদস্যদের বাসভবন ঘেরাও, ১৮ নভেম্বর ছাত্র-শ্রমিক সংহতি দিবস পালনের ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষণা করে। তিন জোট ও জামায়াতে ইসলামী ২০ ও ২১ নভেম্বর ৪৮ ঘণ্টার অবিরাম হরতালের সিদ্ধান্ত নেয়। এসব কর্মসূচি চলাকালে সরকারের প্রতিক্রিয়া মাঝে মধ্যে প্রেসনোট ইস্যু করে জনগণকে সন্ত্রাস, ভাঙচুর ও ধ্বংসপ্রবণতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে বিরোধী দলসমূহ নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আরো জোরদার করে। এরশাদের জাতীয় পার্টি বিরোধী দলের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও সন্ত্রাসের নিন্দা জানিয়ে সরকারের পক্ষে শুধু কিছু পথসভার আয়োজন করার চেষ্টা করে।

এরশাদ জাপান যাওয়ার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ আমার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে যান। এরপর আমার কার্যালয়ে সিনিয়র সকল মন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, জাতীয় পার্টি ও সরকারের তরফ থেকে বিরোধী দলগুলোর উসকানিমূলক যে কোন ধরনের তৎপরতা এড়িয়ে যাওয়া হবে। এরশাদ জাপান থেকে টেলিফোন করে বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁকে পরামর্শ দেয়া হয় যে, শিথিল ধরনের একটি জরুরি অবস্থা জারি করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করাই ভাল হবে। তাঁকে আরো বলা হয়, সরকার কিংবা জাতীয় পার্টি কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি নিলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়বে এবং যে কোন শান্তি উদ্যোগ ব্যাহত হবে।

www.pathagar.com

এরশাদ তাৎক্ষণিকভাবে এই প্রস্তাবে সায় দেন এবং এ ব্যাপারে প্রস্তুতি নিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও জাতির প্রতি প্রদেয় ভাষণের খসড়া তৈরি করে রাখার পরামর্শ দেন।

পরদিন এরশাদ দেশে ফেরার পর দেখা গেল কাজী জাফর পূর্বোক্ত সেই সভায় সকলের সাথে একমত পোষণ করার পরও আমার অজ্ঞাতে টেলিফোনে তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বলেন যে, পরিস্থিতি ১৯৮৭ সালের পরিস্থিতির ন্যায় ভয়াবহ কিছু নয় এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দিয়েই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। উনি জাপান থেকে ফিরলে প্লেনের দোরগোড়ায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গেলে তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি রাজনৈতিকভাবে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে যাচ্ছেন। এর পরপরই ১৬ নভেম্বর সিনিয়র মন্ত্রীদের একটি ছোট্ট বৈঠকে জানানো হয় যে, জাতীয় পার্টির উদ্যোগে ১৭ নভেম্বর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ৭টি জনসমাবেশের আয়োজন করা হবে। প্রত্যেক কেবিনেট মন্ত্রীকে অন্ততপক্ষে দুটি সমাবেশে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। আমিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমাকেও এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাকরাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয় এবং ঢাকার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের এই সভায় আনা হয়। বস্ত্রমন্ত্রী মগবাজারে বস্ত্রকল শ্রমিকদের এক সমাবেশের আয়োজন করেন। সার্কিট হাউস রোডে আইনজীবীদের একটি সমাবেশ করা হয় এবং ঢাকা শেরাটন হোটেলের সম্মুখে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জামালউদ্দিনের নেতৃত্বে ব্যাংক কর্মচারীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যুব ফ্রন্ট ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে একটি সমাবেশের আয়োজন করে। শিল্পকলা একাডেমী, ধানমন্ডি শিশুপার্ক এবং সোবহানবাগে তিনটি শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়া হয়। এভাবে ১৭ নভেম্বর দলের শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রশাসনিকভাবে না এগিয়ে এরশাদ তাঁর প্রতি জনসমর্থন প্রমাণ করে রাজনৈতিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নেন। সমাবেশগুলোতে ছিল স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব, সাধারণ জনগণের তাতে অংশগ্রহণ ছিল নিতান্তই অল্প। দলের কর্মীদের দিয়ে রচিত মানববন্ধনের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত উল্টো ফল দেয়। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে আসা প্রতিপক্ষদের সঙ্গে মানববন্ধনকারীদের সংঘর্ষ বাধলে প্রেস ক্লাবের সামনে জাফর ইমামসহ কয়েকজন মন্ত্রীকে পিস্তল হাতে দেখা যায়। পরদিন সংবাদপত্রগুলোতে পিস্তল হাতে মন্ত্রীদের ছবি এবং সমাবেশে ব্যবহৃত সরকারি যানবাহনের নম্বর প্লেটসহ ছবি প্রকাশিত হয়।

১৯ নভেম্বর ৪৮ ঘণ্টা অবিরাম হরতাল কর্মসূচির আগে পান্থপথে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃত্বাধীন তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটির মাধ্যমে আনীত সমঝোতার ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি সুসংজ্ঞায়িত দিক্‌নির্দেশনা ঘোষণা করা হয়। জামায়াতে ইসলামীও তিন জোট প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফর্মুলার প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে।

ফর্মুলার সারমর্ম ছিল, প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ৫৮(৫) এবং ৭২(১) অনুচ্ছেদবলে মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্ট ভেঙে দেবেন। ৫১(ক)(৩) অনুচ্ছেদের অধীনে ভাইস প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

পদত্যাগ করবেন এবং প্রেসিডেন্ট বিরোধী দলের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তিকে সংবিধানের ৫৫(ক)(১) অনুচ্ছেদ বলে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করবেন। অতঃপর প্রেসিডেন্ট ৫১(৩) অনুচ্ছেদ বলে পদত্যাগ করবেন এবং নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ৫১(১) অনুচ্ছেদবলে তাৎক্ষণিকভাবে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তখন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদ বলে তাঁর নিজস্ব মন্ত্রিপরিষদ গঠন করবেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন সদস্য প্রেসিডেন্ট বা পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশ নেবেন না। সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদবলে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি পুনর্বিন্যস্ত করবেন এবং ১২৩(৩) অনুচ্ছেদবলে পার্লামেন্ট ভেঙে দেয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নয়া পার্লামেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

তিন জোটের ঘোষণায় নিম্নবর্ণিত দাবিগুলোও সন্নিবেশিত করা হয়: (১) রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত রেডিও ও টেলিভিশনসহ প্রচারমাধ্যম স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর জন্য প্রচারকার্যে সমান সুযোগ দেবে; (২) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সার্বভৌম একটি পার্লামেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং সরকার সেই পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকবেন; (৩) সাংবিধানিক সরকারের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানের এমন একটি বিধান সৃষ্টি করা হবে যে, কোন অবস্থাতেই একটি বৈধ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ছাড়া নির্বাচিত একটি সরকারকে অপসারিত করা যাবে না; (৪) জনগণের মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসনের গ্যারান্টি দেয়া হবে; এবং (৫) মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন যে কোন আইন বাতিল করা হবে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের এই ফর্মুলা ছিল সংবিধানের আওতার বাইরে। অষ্টম সংশোধনী পাস হওয়ার পর ভাইস প্রেসিডেন্টের নিয়োগ পার্লামেন্ট দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুসমর্থিত হওয়ার বিধান ছিল এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তরে তা অনুসমর্থিত না হলে সেই নিয়োগ বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা। এ ধরনের অনুসমর্থনের আগে পার্লামেন্ট বাতিল করে দেয়া হলে ভাইস প্রেসিডেন্টের নিযুক্তি হতো সংবিধান পরিপন্থী। এরপর ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হতে পারতেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর রানিংমেট হিসেবে। প্রেসিডেন্ট তাঁকে অপসারিত করতে পারবেন না এবং প্রেসিডেন্ট পদ শূন্য হলে তিনি প্রেসিডেন্ট মেয়াদের বাকি সময়ের জন্য প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন। কাজেই পার্লামেন্ট না থাকলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য কোন ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগের উপায় ছিল না। উপরন্তু প্রেসিডেন্টের হাতে মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দেয়ার ক্ষমতা থাকলেও তিনি ভাইস প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করতে পারতেন না। এরপর ভাইস প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানালে একটি চরম অচলবাস্থা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

বিরোধী দলগুলো দাবি করছিল যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি সার্বভৌম পার্লামেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন, যার অর্থ হলো এমন একটি পার্লামেন্ট যার কাছে সরকারের

www.pathagar.com

নির্বাহী বিভাগ দায়ী থাকবেন। বিদ্যমান সংবিধান অনুসারে পার্লামেন্ট ছিল কেবল আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সার্বভৌম। যথাযথ একটি সাংবিধানিক সংশোধনী ছাড়া এ ধরনের একটি সার্বভৌম পার্লামেন্ট গঠন করা সম্ভব ছিল না।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে অর্থাৎ যখন রাজনীতি রাজপথে চলে যায়, তখন সংবিধানের সৌন্দর্য ও ভাষাগত গূঢ়ার্থ স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে এবং গণদাবির কাছে সংবিধান গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এসব সাংবিধানিক প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার পর বিরোধী পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হয় যে, ঘটনাবলিই এসব টেকনিক্যাল বিষয় সুরাহার দায়িত্ব নেবে। জনগণের ক্ষমতাই চূড়ান্ত হিসেবে গৃহীতব্য বলে নতুন পার্লামেন্ট এসব ইস্যু সমাধান করতে পারবে। অন্যভাবে বলা যায়, সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য পার্লামেন্ট একটি সাংবিধানিক সংশোধনী এনে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে বৈধতা দান করে পেছনের তারিখ থেকে তা কার্যকর করতে পারে। এই প্রক্রিয়া হবে পঞ্চম এবং সপ্তম সংশোধনীরই অনুরূপ—কেবল ব্যতিক্রম হবে এই যে, আগের ন্যায় সামরিক শাসন বৈধ করার জন্য সেই সংশোধনী ব্যবহৃত হবে না। কিন্তু অনুসৃতব্য নীতি ছিল একই ধরনের, অর্থাৎ বিরোধী দলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সংবিধানের যেসব অংশ লঙ্ঘন করা হবে সংশোধনীর মাধ্যমে সেগুলো অনুসমর্থিত করে নিলেই চলবে।

যাই হোক, বিরোধী দলসমূহের প্রস্তাবিত ফর্মুলা সরকারবিরোধী আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করে তোলে। বিরোধী দলের ঘোষণায় এরশাদের অধীনে কোন নির্বাচনে অংশ না নেয়ার প্রত্যয় ঘোষিত হওয়ায় বিরোধী দলের আর ফিরে যাওয়ার কোন পথ ছিল না। এরপরও এরশাদ বাইরে সংঘটিত ঘটনাবলি সম্পর্কে নিস্পৃহভাব দেখাতে থাকেন।

বিরোধী দলে অনৈক্যের ফলে ভাঙনের সৃষ্টি হবে এবং তিনি এখনো জনগণের কাছে বিপুলভাবে জনপ্রিয়, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এরশাদ শান্তভাবে সময় কাটাতে থাকেন। তিনি ধারণা করতে থাকেন যে, কোন রকম সংঘর্ষে না গিয়েই তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবেন। বড়জোর তাঁকে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে আরেকটি নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে। তিনি মনে করেছিলেন যে, এমনটি হলেও তাঁর পর্যাপ্ত সংখ্যক আসনে জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কারণে জয়ী না হলেও তিনি আওয়ামী লীগকে সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তাঁকে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।

ইতোমধ্যে এরশাদ ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ না করে এবং মন্ত্রিপরিষদের সামনে পেশ না করেই জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করায় দেশের চিকিৎসকরা আন্দোলনে অংশ নিয়ে রাজপথে এসে দাঁড়ায়। স্বাস্থ্যনীতিতে বিশেষ জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমুখী পদক্ষেপ নেয়া হলেও তা মোটেও সময়ানুগ হয়নি। এই নীতি কায়েমী স্বার্থের বিরোধী হওয়ায় মূলত শহরভিত্তিক চিকিৎসক সমাজ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। আইনবিদরা যেমন ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগ গঠন করায় আন্দোলনে নেমেছিলেন, সেই একই কারণে এবার চিকিৎসকরাও আন্দোলনে শামিল হন। কারণ স্বাস্থ্যনীতিতে বলা হয়েছিল

www.pathagar.com

যে, কোন চিকিৎসক ফুলটাইম সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত থাকলে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। এভাবে সমাজের দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও সরব গোষ্ঠী চিকিৎসক ও আইনজ্ঞরা সরাসরি এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়েছিলেন।

পরিস্থিতি দমন করার জন্য সরকার তাড়াহুড়ো করে একটি অধ্যাদেশ জারি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার অধিকার নিজের হাতে তুলে নেন। ১৩ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। এর প্রতিক্রিয়া হয় সুদূরপ্রসারী। শিক্ষক ও ছাত্ররা এতে সরকারবিরোধী আন্দোলনে নতুন শক্তি খুঁজে পান। শিক্ষকরা দাবি করেছিলেন যে, সরকারের এ সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর একটি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। তাঁরা এ আদেশ অমান্য করে ক্লাস নেয়া অব্যাহত রাখেন। একই সময়ে আদমজীতে শ্রমিকদের এক দাঙ্গায় কয়েকজন নিহত হলে শ্রমিকরাও রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

এভাবে সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন এরশাদ মনে করলেন ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়বে। এর জন্য বিরোধী ছাত্রদলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিভক্তি সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ পর্যায়ে শুনতে পাই এরশাদের সঙ্গে গোপন আলোচনার ভিত্তিতে বিএনপির জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুজন জঙ্গি সদস্য, মস্তান ও সন্ত্রাসী বলে পরিচিত কারাবরণরত গোলাম ফারুক অভি ও সানাউল হক নীরুকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

এ খবর ছাত্রদল হাইকমান্ডের কর্নগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২৩ নভেম্বর নীরু এবং আরো পাঁচজনকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে বহিষ্কার করা হয়। ফলে দলের ছাত্র সংগঠনে এক দফা ভাঙনের সূত্রপাত ঘটে। অভির নেতৃত্বাধীন ছাত্রদলের একটি বিরাট অংশের ছাত্র সদস্যরা এক বিবৃতিতে এই বহিষ্কারাদেশের প্রতিবাদ জানায়। তারা যে সময়ে ঐক্যের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, ঠিক সে সময়ে ছাত্রদের বিভক্ত করায় দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে দোষারোপ করে। নীরু গ্রুপের নেতা ও কর্মীরা অভির নেতৃত্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা ডাকসু অফিসে হামলা চালিয়ে ডাকসু নেতাদের বাইরে বের করে দেয় এবং ছাত্রদের একটি মিছিলে গুলি বর্ষণ করে। পরের দিন বিএনপির দুই বিরোধী ছাত্রদলের সংঘর্ষে ক্যাম্পাস এক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির ধ্বংস সাধন করা হয় এবং কতিপয় ছাত্রাবাসে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ২৫ নভেম্বর অভি ও নীরু একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তাদের বন্দুকধারী সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের একটি সমাবেশের ওপর গুলি চালায়। দুই পক্ষে একটি সশস্ত্র সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। এর ফলে ছাত্র, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা সবাই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান। হাজার হাজার ছাত্র সর্বদলীয় ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিরোধে অংশ নেয় এবং কয়েক ঘণ্টা গোলাগুলির পর ছাত্ররা অভি ও নীরুকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। অভি ও নীরুর আশ্রয়স্থল সূর্যসেন হলের

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ সর্বদলীয় ছাত্রদের হাতে চলে আসে। সেখান থেকে ছাত্ররা এক বিজয় মিছিল বের করে। পরদিন ২৬ নভেম্বর অভি-নীরু গ্রুপ একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে আবার ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে এবং সর্বদলীয় ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। এই হামলায় একজন হকার নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। এই গ্রুপ শহীদুল্লাহ হল ও ফজলুল হক হল দখল করে নিয়ে বাংলা একাডেমী এবং ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যায়। এখানে দুই পক্ষের সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা আবার এক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। দুই পক্ষই সংঘর্ষকালে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে এবং উভয় পক্ষে বেশ কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হয়। এর পরে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের একটি মিছিল জিরো পয়েন্টে সমাবেশ শেষে ফেরার সময় বাংলা একাডেমী থেকে বের হয়ে আসা একটি মিনিবাস থেকে মিছিলের ওপর গুলি বর্ষণ করা হয়। এতে দুই পক্ষের মধ্যে আবার মুখোমুখি সংঘর্ষ বেধে যায়।

অভি-নীরু গ্রুপ সাময়িকভাবে প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুর মোড় ঘুরিয়ে দিতে এবং জনমনে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত এই শক্তির মহড়া সরকারের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্রদের বিভক্ত করার পরিবর্তে এদের উপস্থিতি বরং গোটা ছাত্রসমাজকে সরকারের বিরুদ্ধে আরো সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে এবং পরিস্থিতি আরো জঙ্গি আকার ধারণ করে। এ সময় একটি খবর রটে যায় যে, জনৈক মন্ত্রীর বাসভবনে একটি কন্ট্রোলরুম বসিয়ে সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এবং কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রী ছাত্রসমাজকে বিভক্ত করার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই গুজবের ফলে সরকারের প্রতি ছাত্রদের রোষ আরো বহু গুণে বেড়ে যায়।

এরই মধ্যে ২১ নভেম্বর বার্ষিক সশস্ত্রবাহিনী দিবস থাকায় বিরোধী দলগুলো পূর্বঘোষিত ৪৮ ঘণ্টার হরতাল কমিয়ে ২৪ ঘণ্টায় স্থির করে। ২০ নভেম্বর সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। একই দিনে এরশাদ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য মালদ্বীপের উদ্দেশে দেশত্যাগ করেন এবং ২৩ নভেম্বর দেশে ফিরে আসেন। মালদ্বীপ থেকে ফিরে এসে এরশাদ নিজের কাজ করে যেতে থাকেন। তবে কাজী জাফরকে সাথে নিয়ে তিনি রাজধানীর হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ এবং তিতুমীর কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন।

২৭ নভেম্বর বিরোধী পক্ষ সারা দেশের প্রায় সর্বত্র সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে। ফলে রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষ। আওয়ামী লীগের যুবনেতা মোস্তফা মহসীন মন্টুকে সেদিন সকালে গ্রেপ্তার করা হলে চারদিকে আবার সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অভি-নীরু গ্রুপ যখন সর্বদলীয় ছাত্রদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত তখন বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম-সচিব ডা. শামসুল আলম মিলন সে এলাকায় রিক্সাযোগে যাওয়ার সময় দুপক্ষের ক্রস ফায়ারিংয়ে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর ফলে জনমনে এমন ভাবাবেগের সৃষ্টি হয় যে, হাজার হাজার মানুষ রাজপথে নেমে আসে। তারা উচ্চকিত শ্লোগানে চারদিক প্রকম্পিত করে এরশাদের পদত্যাগের দাবি জানাতে থাকে।

এ সময় দ্রুত খবর ছড়িয়ে যায় যে, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রথমে বলেন যে, সরকারের একটি

www.pathagar.com

উচ্চপদস্থ নেতার আদেশে তা করা হয়েছে যদিও পরে তিনি তা অস্বীকার করেন। খালেদা জিয়া পুলিশ এড়িয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন, কিন্তু শেখ হাসিনাকে তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। ২৭ নভেম্বর ঢাকা যখন ছিল সংঘর্ষপূর্ণ, এরশাদ তখন চট্টগ্রামে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে শত কোটি টাকা মূল্যের একটি জাপানি শিল্পপ্রতিষ্ঠান উদ্বোধনে যান। তিনি রাজধানীতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ছয়জন সিনিয়র মন্ত্রীকে নিয়ে বৈঠকে বসেন, আমাকেও ডাকা হয় এবং বৈঠকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রস্তাব দেয়া হয়। অবশ্য বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত ছিল না। আমি এরশাদকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা না করার পরামর্শ দিয়ে বলেছিলাম যে, এই ঘোষণা বিদ্যমান উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বিপরীত ফল দেবে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, জরুরি আইন ঘোষণা করে সান্ধ্য আইন জারি করা হবে এবং একই রাতে এরশাদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। অনেক জায়গায় লোকজন সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। সান্ধ্য আইন ভঙ্গকারীদের দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দিয়ে সেনাবাহিনী নামিয়ে দেয়ার পরও এ অবস্থা অব্যাহত থাকে, বরং কয়েক জায়গায় সেনাবাহিনীর গাড়ির ওপরও হামলা চালানো হয়। এভাবে জরুরি অবস্থা ও সান্ধ্য আইন প্রকাশ্যে ভঙ্গ করায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে। ড. মিলন হত্যা এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও শহরের ডাক্তার এবং নার্সরা একযোগে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন।

এহেন পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়ে। নগরীর সমস্ত রাস্তাঘাট মিছিল, বিক্ষোভ ও জনসমাবেশে পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকলে একযোগে এরশাদের পদত্যাগের দাবি জানাতে থাকে। সান্ধ্য আইন জারি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিডিআর ও পুলিশের উদ্যোগ বরং আরো বেশি করে হত্যাকাণ্ড, সংঘর্ষ, হানাহানি ও প্রাণহানীর পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ভাবাবেগতাড়িত ক্ষোভ ক্রমশ বিস্ফোরিত হতে শুরু করে। সংবাদপত্রগুলো বন্ধ থাকায় প্রাণহানী, সন্ত্রাস, ধ্বংসযজ্ঞ ও নৈরাজ্যের খবরগুলো মানুষের গুজবে শাখা-প্রশাখা পল্লবিত করে বহুগুণ বেড়ে প্রচারিত হতে থাকে।

ধানমন্ডিস্থ জাতীয় পার্টির প্রধান কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে অফিস তছনছ করা হয়। অনুরূপ সন্ত্রাস ক্রমশ চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাসহ অন্যান্য জেলা সদরগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১ ডিসেম্বর মিরপুরে এক মিছিলের ওপর বিডিআর-এর গুলিতে পাঁচজন নিহত হয়। একই দিনে সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী ডা. এমএ মতিনের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির ১৯ জন পার্লামেন্ট সদস্য স্পিকারের কাছে তাঁদের পদত্যাগপত্র পেশ করেন। সচিবালয়ে সরকারি কর্মকর্তারা পদত্যাগের হুমকি দিতে থাকেন। ২ ডিসেম্বর দেশের বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রকার এবং সংবাদ পাঠকরা জাতীয় প্রেস ক্লাবে সমবেত হয়ে সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন।

এভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সমস্ত রাজনৈতিক উদ্যোগ বিরোধী দলগুলোর নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং এবার তাঁরা শর্ত প্রদানের ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হন।

www.pathagar.com

ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু করা ছাড়া এ সময় এরশাদের কাছে আর কোন বিকল্প ছিল না। কখন এবং কিভাবে তিনি ক্ষমতা ছাড়বেন সেটা মুখ্য প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। ২ ডিসেম্বর গভীর রাতে এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এরশাদ ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন, কিন্তু তা হতে হবে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় এবং বিরোধী দলের প্রস্তাবের ধারায়। জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের অধীনস্থ নিরপেক্ষ সরকারের আওতায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার তারিখের পনের দিন আগে এরশাদ পদত্যাগ করবেন। এ সময় তিনি ছিলেন শান্ত এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বহাল রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর নিজের জীবনের ও জাতির দুর্যোগতম সময়টিতেও তিনি শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে দায়িত্ব ছেড়ে চলে যেতে পারতেন, কিন্তু তাঁর পরিবর্তে তিনি সম্মানজনক বিদায়ের পথই বেছে নিলেন। এরশাদ যদি ইতিহাসে তাঁর ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকেন, তাহলে বিক্ষুব্ধ ও আপোসহীন বিরোধী দলগুলোর উত্তপ্ত আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা হস্তান্তরে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বহাল রাখার দৃঢ় মনোবলের জন্যও সমানভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর এই মনোভাবের জন্যই জাতি সংবিধান ও গণতন্ত্র—উভয়কে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

৩ ডিসেম্বর এরশাদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি এই সিদ্ধান্ত শুধু নিজের এবং তাঁর দুজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর কাছে সীমাবদ্ধ রাখেন। রেকর্ডিং শেষ হওয়ার পর প্রচারের আগে সকল মন্ত্রীকে তাঁর সচিবালয়ের অধিবেশনকক্ষে ডাকা হয় এবং তিনি সকলকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানান। সেখানে কোন আলোচনা হয়নি বললেই চলে এবং বৈঠক আধ ঘণ্টার বেশি চলেনি। ভাষণ প্রচারিত হওয়ার পর তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে, বিরোধী দল তাতে ইতিবাচক সাড়া দেবে এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসবে। এরশাদ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে এবং জাতীয় সম্মতি অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করেন:

১. নিরপেক্ষ পরিবেশে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তিনি নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখের পনের দিন আগে প্রেসিডেন্টের অবস্থান থেকে পদত্যাগ করবেন এবং একজন নিরপেক্ষ ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২. নবম সংশোধনীর অধীনে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়া হবে।

৩. রাজনৈতিক জোট ও দলগুলোর সঙ্গে আলোচনাক্রমে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্বিন্যস্ত করা হবে।

৪. প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন একই সময়ে হবে।

৫. রেডিও-টেলিভিশনসহ রাষ্ট্রায়ত্ত সকল প্রচারমাধ্যম সকল দলকে প্রচারণার সমান সুযোগ দেবে।

www.pathagar.com

৬. ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হবে।
৭. নির্বাচনে যে কোন সংখ্যক বিদেশী পর্যবেক্ষকদল পর্যবেক্ষণকার্য চালাতে পারবেন।
৮. ১৭ ডিসেম্বর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া হবে।
৯. সংবাদপত্রের ওপর আরোপিত সকল নিষেধাজ্ঞা তাৎক্ষণিকভিত্তিতে প্রত্যাহার করা হবে।

দেশের সকল সংবাদপত্র বয়কট অব্যাহত রাখায় জনগণকে এ সমস্ত প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো এবং জনগণ কর্তৃক ভাষণের বিষয়বস্তু মূল্যায়নের সুযোগ ছিল না। কেবল রেডিও ও টেলিভিশনই ছিল সকল তথ্যের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু বিবিসি এই খবর এইভাবে প্রচার করে যে, এরশাদ নির্বাচনের পনের দিন আগ পর্যন্ত ক্ষমতায় বহাল থাকবেন যা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। কারণ এরশাদের ঘোষণায় ছিল যে মনোনয়ন দাখিল করার তারিখের পনের দিন আগে অর্থাৎ নির্বাচনের প্রায় দুমাস আগে তিনি পদত্যাগ করবেন। বিবিসি'র ধারাভাষ্য শুনে ড. কামাল হোসেন ও খালেদা জিয়া সর্বাগ্রে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সরকারি প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। এরশাদের প্রস্তাব নিয়ে বিরোধী দলগুলো আলোচনায় বসার আগেই এই কাণ্ড ঘটে যায়। কাজেই এরপর অন্যান্য দল নেতাদের তাঁদের অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সকলেই তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

৪ ডিসেম্বর বেলা আনুমানিক তিনটার দিকে এরশাদ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আমাকেসহ সিনিয়র মন্ত্রীদের বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে মূল্যায়ন করা হয় যে, সংবাদপত্রসমূহ বন্ধ থাকায় প্রেসিডেন্টের পেশকৃত প্রস্তাবসমূহ জনগণ পর্যাপ্তভাবে বা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি। এর জন্য রাজনৈতিক দল ও নেতাদের আরো বেশি সময় দিতে হবে এবং সরকার পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য আরো তিন চার দিন অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে টেলিভিশনে এক অনুষ্ঠানে সরকারের দেয়া প্রস্তাবগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাকে বলা হলো। ধারণা করা হলো, এর ফলে বিবিসি'র ভুল বোঝাবুঝিমূলক প্রচার এবং সে কারণে জনমনে বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে। সাড়ে চারটার দিকে ঐ বৈঠক শেষ হয়ে যায়। তার এক ঘণ্টা পর আমি টেলিভিশন ভবনে গিয়ে সাড়ে আটটার বাংলা সংবাদের পর আমার ব্যাখ্যা প্রচারের জন্য বক্তব্য টেপবদ্ধ করে আসি।

প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ে উপরোক্ত বৈঠক চলাকালে সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরে সকল পার্সোনাল স্টাফ অফিসার (পিএসও), প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব এবং সিনিয়র সামরিক অফিসাররা মিলে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বৈঠকে বসেন। তাঁরা সেখানে বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন, কিন্তু এরশাদকে সাহায্য করার জন্য তাঁদের মধ্যে কোন প্রকাশ্য তৎপরতা দেখা গেল না। পক্ষান্তরে এরশাদের ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত হিসেবে সুবিদিত কমপক্ষে দুজন জেনারেল প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মত রাখেন, তাঁরা বলেন যে, একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনীকে টিকিয়ে রাখতে হবে। জেনারেলরা আর এরশাদকে

www.pathagar.com

সমর্থন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা তখন নিজেরা কলঙ্কমুক্ত হতে চাইলেন এবং টিকে থাকার জন্য জনগণের বিদ্যমান আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল মেলাতে সচেষ্ট হলেন।

এই সংবাদ এরশাদের কাছে পৌঁছা মাত্র এরশাদ তাৎক্ষণিকভাবে পদত্যাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। যে কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সেনাবাহিনীর ওপর বেশি নির্ভর করে তিনি এতদিন দেশ চালিয়েছিলেন। এই সমর্থন আদৃশ্য হওয়ায় এবং সামরিক ভাষা সম্পর্কে অন্য যে কারো চেয়ে বেশি জ্ঞান থাকায় এরশাদ সেই মুহূর্তেই বিদায়ের সিদ্ধান্ত নেন। এই ছিল তাঁর স্টাইল—অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ এবং ত্বরিত। অন্যান্য সময়ের মত এরশাদ নিজে নিজেই এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিলেন। ২ ডিসেম্বর মধ্যরাতে পদত্যাগ এবং ৩ ডিসেম্বর জাতির প্রতি ভাষণদানের সিদ্ধান্তও তিনি নিজে নিজেই নিয়েছিলেন।

আমি টেলিভিশন ভবন থেকে ফেরার পর এরশাদ আমাকে টেলিফোন করে বললেন যে, তিনি পার্লামেন্ট বাতিল করে বিরোধী দলগুলো একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট বাছাই করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে যাচ্ছেন। আমি যখন বললাম পার্লামেন্ট কর্তৃক ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে পার্লামেন্ট ভেঙে দেয়া হলে সাংবিধানিক জটিলতা দেখা দিতে পারে, এরশাদ তখন বলেন যে, বিরোধী দল এটিসহ অন্যান্য আইনগত বিচ্যুতিগুলো পিছনের তারিখ থেকে কার্যকর করে নয়া জাতীয় সংসদে অনুসমর্থিত করিয়ে নেবে এবং এ ব্যাপারে শেখ হাসিনার সাথে তাঁর টেলিফোন আলাপ হয়েছে। আমি সাথে সাথেই একমত হলাম এবং কোন রকমের সংঘর্ষ পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এরশাদকে আবারও উৎসাহিত করলাম।

৪ ডিসেম্বর রাত ৯টার দিকে আমার ব্যাখ্যা টেলিভিশনে প্রচার চলাকালেই এরশাদ সিনিয়র সহকর্মীদের কাছে তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানান। তিনি ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলায় তা নিয়ে আলোচনার আর কোন অবকাশ ছিল না। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করাসহ বিভিন্নজন বিভিন্ন মতামত জানালেও ঐসব মতামত তখন ছিল নিতান্তই তাৎপর্যহীন। তখন মূল কাজ ছিল ঘোষণার যথার্থ ভাষা ও শব্দ চয়ন নির্ধারণ করা। ঘোষণার খসড়া প্রস্তুত হওয়ার পর ইংরেজি সংবাদের শেষের দিকে সংযোজন হিসেবে তা টেলিফোনে সংবাদ পাঠকের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়। সংবাদ পাঠক তা পাওয়া মাত্র পার্লামেন্ট বাতিলের ঘোষণা জানিয়ে দেন এবং বলেন যে, ভাইস প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব নেয়ার পর মুহূর্ত থেকে এরশাদ পদত্যাগ করবেন।

৫ ডিসেম্বর বিরোধী দলগুলো সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পরিচালনার লক্ষ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করেন। পরের দিন ৬ ডিসেম্বর বেলা তিনটায় প্রেসিডেন্ট সচিবালয়ে গিয়ে আমি পদত্যাগ করি এবং এরশাদ বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদকে প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত রেখেই ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করেন। এর পরপরই এরশাদ প্রেসিডেন্টের অবস্থান থেকে পদত্যাগ করেন এবং নয়া ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট গণতন্ত্রের সন্ধানে তাঁর নতুন যাত্রায় জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ২৬

প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং জেনারেল এরশাদ

এরশাদ গণতন্ত্রায়নের জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়ার পথই অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু জিয়ার মত সফলতা অর্জন করতে পারেননি। তাঁরা দুজনই সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন এবং প্রথম প্রায় চার বছর দুজনকেই সামরিক আইনের অধীনে দেশ পরিচালনা করতে হয়েছে, তারপরও এই দুই সরকারের মধ্যে গুণগত, বৈশিষ্ট্যগত, পদ্ধতিগত এবং পারফরমেন্সগত বৈসাদৃশ্যও ছিল প্রচুর। জিয়ার ক্ষমতাগ্রহণের সাথে এরশাদের ক্ষমতাগ্রহণের কোন মিল ছিল না। এরশাদ ঠাণ্ডা মাথায়, হিসেব-নিকেশ করে ধীরস্থিরভাবে একটি প্রচলিত ধারায় রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসেন। অন্যদিকে জিয়া এক মহানায়কের পরিধানে ক্ষমতায় আসেন এবং সেনাবাহিনী ও জনগণ তাঁকে সাদরে ক্ষমতায় অভিষিক্ত করেন। সেনাবাহিনীর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও তিনি একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতার দিকে এগিয়ে যাননি কিংবা ক্ষমতা জোর করে দখল করতে গিয়ে নির্বাচিত কোন সরকারকে উৎখাত করেননি। জিয়া দেশের প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর কোন রাজনৈতিক ভূমিকার কথা প্রচার করেননি কিংবা তাঁকে দেশে কোন সামরিক আইন জারিও করতে হয়নি। শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারে হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জাতীয় রাজনীতির গোটা চেহারা বদলে যায় এবং সেই পরিবর্তনের পর এক যুগসন্ধিক্ষণেই জিয়া ক্ষমতায় আসেন। এ সময় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক শক্তি শেখ মুজিবের শূন্যস্থান পূরণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে শুরু করলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভয়াবহ এক জটিলতা সৃষ্টি হয়। অভ্যুত্থানকারী উচ্ছৃঙ্খল সামরিক কর্মকর্তাদের দমনে মোশতাকের ব্যর্থতা এবং খালেদ মোশাররফের অপরিপক্ব ও দুর্ভাগ্যজনক ব্যর্থ অভ্যুত্থান সেনাবাহিনীর স্তরীভূত সদস্যবর্গ এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে শামিল করে দেয়। রাজনৈতিক আবহমণ্ডলে এক বিশাল শূন্যতা ও পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিপুল খ্যাতির অধিকারী জিয়াকে সামনে এগিয়ে আনা হয়। এ সময় মুক্তিযোদ্ধা, মোশতাকের সমর্থক, ভারতের সম্প্রসারণবাদবিরোধী শক্তিসমূহ, এমনকি স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিসমূহের মিশ্রিত উপাদানে তৈরি বিবিধমুখী রাজনৈতিক শক্তি মিলে এক অদ্ভুত সমস্বত্ব বিশিষ্ট মিশ্রণ সৃষ্টি করে। এরশাদের ক্ষমতারোহণের প্রক্রিয়া যেখানে ছিল একটি সামরিক

www.pathagar.com

প্রক্রিয়া, সেখানে জিয়ার অভ্যুদয় ছিল বহুলাংশে রাজনৈতিক মতাদর্শিক সমর্থনে রাষ্ট্রক্ষমতায় অভিষেক।

উপরন্তু জিয়া সম্মিলিত শক্তিসমূহকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেন এবং তাঁর ক্ষমতার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত এই শক্তিগুলো তাঁর সঙ্গে ছিল। তাঁর জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জনগণের মনে প্রবলভাবে রেখাপাত করেছিল এবং দেশব্যাপী এক উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি একটি নতুন রাজনৈতিক ধারা অনুসরণে জিয়াকে সক্ষম করে তোলে এবং জনগণের কাছে তা বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। এরশাদ যেখানে ক্ষমতারোহণের প্রথম দিন থেকেই সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করেছিলেন সেখানে প্রথম থেকেই জনগণের মধ্যে জিয়ার আরেকটি সমর্থনভিত্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে জিয়ার এবং এরশাদের রাজনৈতিক ধারাপ্রবাহ এবং বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়াও ছিল মানগতভাবে ভিন্নতর। এরশাদ যেখানে তাঁর ক্ষমতাকে রাজনৈতিকভাবে বৈধ করার জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন, জিয়ার পক্ষে নিজের ক্ষমতারোহণকে বৈধকরণের প্রক্রিয়া ছিল সেই তুলনায় অনেক বেশি সহজ।

এরশাদের তুলনায় জিয়া অনেক সফলভাবে তাঁর গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এরশাদ যেখানে কোন নির্বাচনই সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে করতে পারেননি জিয়ার সময়ে জাতীয় সংসদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কেবল সবগুলো রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণই করেনি, বরং তারা প্রবল প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করেছে এবং নানা ইস্যুতে দরকষাকষি করেছে। দুটি নির্বাচনই সামরিক আইনের ছত্রছায়ার অনুষ্ঠিত হওয়ার পরেও ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কেউ অস্বীকার না করায় দুই শাসনামলের ভিন্নতা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। গ্রহণযোগ্যতা এবং যথার্থতার দিক দিয়ে এখানেই ছিল জিয়া এবং এরশাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী জেনারেল ওসমানী জিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং পার্লামেন্ট নির্বাচনের সময় সবগুলো রাজনৈতিক দল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। এসব নির্বাচনের সময় জিয়ার পদত্যাগ বা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন পরিচালনার কোন দাবি উত্থাপিত হয়নি। ১৯৭৯ সালে জিয়ার আমলে নির্বাচিত পার্লামেন্টে দেশের প্রায় প্রতিটি প্রধান রাজনৈতিক দলের বিপুল সংখ্যক স্বনামধন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমাবেশ ঘটেছিল। নির্বাচন সর্বক্ষেত্রে অবাধ ছিল বলে এতে জনগণের গ্রহণযোগ্য রায় প্রদানের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। জিয়ার আমলে অবাধ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে একটি জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্বশীল সরকারকে বৈধকরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং এইজন্য কোন পর্যায়ে জিয়াকে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি যা এরশাদের জন্য হয়েছিল খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। জিয়ার সামরিক শাসন বৈধকরণের জন্য আনীত পঞ্চম সংশোধনী বিল বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই জাতীয় সংসদের অনুমোদন লাভ করেছে। জিয়া নিজে ছিলেন যেমন জনপ্রিয়, তেমনি তাঁর

www.pathagar.com

জনপ্রিয়তাভিত্তিক রাজনীতি পৃথিবীর অন্য অনেক সামরিক নেতার চেয়ে অল্প সময়ে তাঁকে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে।

জিয়াই সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী রাজনীতির গোড়াপত্তন করেন এবং সমাজের সর্বস্তরের জনগণ তাতে যোগ দেন। তিনি ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রণীত সংবিধানে আরোপিত ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন এবং স্বাধীনতার পক্ষে-বিপক্ষের সকল শক্তিকে তাঁর নয়া দল জাগদলের পতাকাতলে আশ্রয় দেন। এই দলই পরবর্তীকালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের গোড়াপত্তন ঘটায়। আওয়ামী লীগের সঙ্কুচিত রাজনীতি এবং ভারতের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থনের বিপরীতে জিয়া জাতিকে অপেক্ষাকৃত একটি অবাধ ও উন্মুক্ত রাজনৈতিক অবস্থা উপহার দেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি ছিলেন নানামুখী ও মিশ্রিত উপাদানে তৈরি সমন্বিত রাজনৈতিক শক্তিসমূহের পরিচালনায় যোগ্যতর ব্যক্তি এবং তিনি তাদের মধ্যে নয়া একটি জাতীয়তাবাদী প্রেরণা সঞ্চারিত করতে সক্ষম হন। তাঁর রাজনৈতিক দল জনপ্রিয় একটি সংগঠন হিসেবে দেশব্যাপী সকল স্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন অর্জনে সক্ষম হয়। এভাবে জিয়া জনপ্রিয় ম্যান্ডেটের মাধ্যমে তাঁর বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করেন যা এরশাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এরশাদের মধ্যে একই ধরনের উচ্চাভিলাষ থাকলেও তিনি তা পূরণ করতে পারেননি। জাতির প্রতি তিনি সুস্পষ্ট কোন রাজনৈতিক আদর্শ তুলে ধরতে পারেননি। যখন তিনি জিয়ার অনুরূপ পথ অনুসরণ করেছেন, তখন ঘোষিত দলীয় আদর্শের সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের অথবা দলের পরিচিতি সম্পৃক্ত করে নিতে ব্যর্থ হন। আওয়ামী লীগকে তোষামোদ করে তিনি বিএনপি ধরনের রাজনীতি পরিচালনার চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে নিজের অনুকূলে ধাবমান জাতীয় একটি রাজনীতির দিক্‌নির্দেশনা দিতে তিনি পারেননি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও ভারতের প্রতি নমনীয়তা এবং বিএনপির প্রতি কঠোরতার কারণে তাঁর পক্ষে সুসংহত, সুস্পষ্ট ও সুচিহ্নিত কোন রাজনীতি জনগণকে উপহার দেয়া সম্ভব হয়নি। জিয়ার ন্যায় দল গঠনে তিনি বিপুল সময় ব্যয় করেননি। দলের নেতা, কর্মী, এমনকি এমপিগণও এরশাদের কাছে সহজে প্রবেশাধিকার অর্জন করেননি। জিয়া যেখানে দল গঠনে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করেছেন, এরশাদ সেখানে দলের প্রতি অধিকাংশ সময় অবহেলা প্রদর্শন করে গেছেন। ফলে জিয়া যেখানে রাজনৈতিক কাঠামোতে টিকে থাকার জন্য তাঁর রাজনৈতিক দলকে শক্তিশালী একটি ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, সেখানে এরশাদ কেবল নিজের প্রয়োজনে রাজনৈতিক দলকে ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

যাই হোক না কেন, জিয়ার জনপ্রিয়তা এবং অনন্য সাধারণ ভাবমূর্তি থাকলেও চরিত্রগতভাবে তিনি ছিলেন একজন আত্মমুখী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ঠাণ্ডা মেজাজের। কখনো ভাবাবেগ প্রকাশ করতেন না। এরশাদের জৌলুসপূর্ণ জীবনযাত্রার তুলনায় জিয়া ছিলেন মিতব্যয়ী। গোটা মেয়াদকালে জিয়া বাইরের রাজনৈতিক শক্তির চেয়ে ভেতরের ব্যারাকস্থ নিজের লোকদের কাছ থেকে অনেকগুণ বেশি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন।

www.pathagar.com

তাঁর আমলে সতের-আঠারটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, যার মধ্যে কয়েকটি ছিল মারাত্মক ধরনের। এসবের মধ্যে শেষেরটিতে তিনি নিহত হন। অভ্যুত্থান দমনে জিয়া ছিলেন সুকঠোর ক্ষমাহীন এবং নির্দয়।

অন্যদিকে এরশাদের পুরো শাসনামলে তিনি ব্যারাকের অভ্যন্তরে তেমন কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হননি। প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন নম্র, ভদ্র, মার্জিত এবং চতুর। তিনি ছিলেন ভাবাবেগাশ্রিত একজন ব্যক্তি যিনি রাজনীতি ও কাব্যকে একই আধারে ধারণ করতেন। তিনি যে কোন সিদ্ধান্ত এক লহমার মধ্যে পরিবর্তন করতে পারতেন। ব্যবস্থাপনায় তিনি ছিলেন খুব ভাল। প্রশাসনের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল বেশি এবং তাঁর শাসনামলে তিনি একবারও কোন অভ্যুত্থানের শিকার হননি।

এরশাদ যেখানে তাঁর কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনী এবং আমলাতন্ত্রের ওপর অধিক হারে নির্ভর করেছেন, জিয়া সেখানে তাঁর দল এবং জনপ্রিয়তাকে সেনাবাহিনীর বিকল্প শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। জিয়া তাঁর দলীয় কার্যালয়ে প্রায় প্রতিদিন একবার হলেও যেতেন, কিন্তু এরশাদ প্রতি মাসে একবার গেছেন কিনা বলা মুশকিল।

এরশাদ জনগণের মধ্যে গুটিকয়েক বিরূপ ধারণার জন্ম দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেন এবং কখনো তিনি ঐসব বিরূপ ধারণা মোচনে সক্ষম হননি। সময়ের সাথে সাথে অধিকতর ক্ষমতা করায়ত্ত করার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি বিরোধী পক্ষ ও প্রচারমাধ্যমে দুর্নীতিবাজ একজন শাসক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অর্থ ও নারীর প্রতি আসক্তির অভিযোগ ছিল প্রবল। নিজেকে এসব দোষারোপ থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি খুব বেশি চেষ্টা করেননি এবং ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ শোনা যেত। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং প্রকাশ্য নৈতিকতা নিয়ে সবসময় জনমনে সন্দেহ ছিল এবং দেশে ও বিদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এসব অনৈতিক কার্যকলাপের হাত থেকে তিনি নিজেকে কখনো মুক্ত করতে পারেননি বা তার চেষ্টাও করেননি। জিয়া যেখানে ছিলেন পরিবারিকভাবে রক্ষণশীল, এরশাদ সেখানে তাঁর স্ত্রীকে জনগণের মধ্যে ভূমিকা রাখা থেকে বিরত করেননি বরং স্ত্রীকে 'ফার্স্ট লেডী'র মর্যাদা দিয়ে একটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে উৎসাহ দেন। এরশাদ নিজে তাঁর ভীষণ জটিল ধরনের ব্যক্তিগত জীবন ও তাঁর কর্তব্যের মধ্যে সমন্বয় রাখতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেয়েছেন। নামাজের জন্য নিয়মিত মসজিদে হাজিরা দিলেও এবং তাঁর ধর্মীয় গুরু আটরশির পীরের দরবারে ঘন ঘন গেলেও, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা বা হজ্বব্রত পালন করার পরও, তিনি নিজেকে জিয়ার মত একজন সৎ মুসলমান হিসেবে জনগণের নিকট দাঁড় করাতে পারেননি। যদিও সংস্কার, আধুনিকায়ন এবং অবকাঠামোতগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে জিয়ার তুলনায় এরশাদের অবদান ছিল বিশালতর, কিন্তু জনগণের বিশ্বাস এবং আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই এরশাদ একজন নেতা হিসেবে বৈধতা অর্জনে সক্ষম হননি।

এরশাদের চরম ব্যর্থতা ছিল যে ক্ষমতায় আরোহণের সময় তিনি প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতি উন্নয়নে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে তিনি সক্ষম

www.pathagar.com

হননি এবং তাঁর শাসনামলের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কোন গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক বৈধতা (Legitimacy) অর্জন করতে পারেননি। ক্ষমতাগ্রহণের আগে প্রশাসনে সেনাবাহিনীর যে সাংবিধানিক ভূমিকার কথা বলেছিলেন সেটি যে শুধু সেনাবাহিনীর সমর্থন আদায়ের একটি কৌশল এবং ক্ষমতা দখলের একটি অজুহাত ছিল, এরশাদ শেষ পর্যন্ত সেটিও প্রমাণ করেছেন।

সে তুলনায় জিয়া ছিলেন একেবারে দুর্নীতিমুক্ত। এ বিষয়ে তার সুখ্যাতি ছিল প্রচুর। তাঁর ব্যক্তিগত নৈতিক অভ্যাস নিয়ে কখনো কোন প্রশ্ন উচ্চারিত হয়নি। নিজের সম্পত্তি বলতে তাঁর তেমন কিছুই ছিল না এবং সম্পত্তি বা অর্থ অর্জনের জন্য তিনি কোন চেষ্টাও করেননি। তিনি ছিলেন একজন ইসলামপন্থী হিসেবে সুপরিচিত এবং জনগণের ইসলামী চেতনার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের তিনি সম্পর্কোন্নয়ন ঘটিয়েছেন এবং ভারতবিরোধী ও জাতীয়তাবাদী হিসেবে তাঁর একটা পরিচিতি ছিল। একজন রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে তাঁর প্রকাশ্য ভাবমূর্তি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জিয়া একজন সৎ নেতা হিসেবে প্রচুর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন এবং জনগণের বিপুল বিশ্বাস ও আস্থা লাভে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ২৭

সরকার পরিচালনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরন ও প্রক্রিয়া

প্রশাসন এবং সরকার পরিচালনা একটি জটিল বিষয়। সরকারের অভ্যন্তরে নীতিনির্ধারণ এবং কোন বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রক্রিয়া এবং সেই নীতি বা সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রশাসনে কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামো রাখা একটি কঠিন কাজ, বিশেষ করে একটি অনুন্নত দরিদ্র দেশে যেখানে সত্যিকার অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক কোন কাঠামোর বিকাশ ঘটেনি। আরো কঠিন হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল বা সরকার বা প্রশাসনে। যদিও সরকারের একটি মন্ত্রিসভা থাকে, এবং সেই মন্ত্রিসভা তাদের ওপর অর্পিত সকল বিষয়ের ওপর আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশেই রাষ্ট্র পরিচালনায় সকল নীতি বা সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয় না। বরং বেশিরভাগ রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বাইরে গৃহীত হয়। অনেক দেশেই সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনার জন্য দায়িত্ব বণ্টন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিমালা তাদের Rules of Business-এ বিধৃত থাকে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল থেকে আমাদের দেশেও তাই আছে। আনুষ্ঠানিকতার বাইরে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় সরকারপ্রধান নির্ধারণ করেন তিনি সেই বিষয়ে কারো কোন পরামর্শ চান কিনা। সেখানে তিনি একা বা কোন এক বা একাধিক বা পুরো মন্ত্রিসভার মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে অনেক সরকারপ্রধান আবার সিনিয়র মন্ত্রীদের নিয়ে একটি kitchen cabinet রাখেন, সেখানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও রয়েছে দৈনন্দিন আরো অনেক সিদ্ধান্ত, যা প্রধানত সরকারপ্রধানকে একাই নিতে হয়। তবে সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সরকারপ্রধানের ব্যক্তিগত স্টাফরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তা সে পার্লামেন্ট শাসন বা প্রেসিডেন্ট শাসন যে ধরনেরই শাসন হোক না কেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল বা সরকারে, সরকারপ্রধানই হলেন মূল চালিকাশক্তি, বাকিরা প্রায় সকলেই গৌণ। সরকার গণতান্ত্রিক হলেও ক্ষমতার করিডোরে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা কাজ করে। প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থায় সেটা আরো প্রকট হওয়াই স্বাভাবিক।

সাধারণ মানুষ অতসব বুঝেও না, জানেও না। তাঁদের perception ভিন্ন। তাঁরা মনে করেন মন্ত্রিসভার সকলেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং সরকার বা সরকারপ্রধান যখন কোন

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বা কোন কাজ করেন তখন মন্ত্রিসভার সদস্যদের পরামর্শ নিয়েই করেন। যাঁরা একটু সচেতন তাঁরা মনে করেন অন্তত দলের বা সরকারের সিনিয়র সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মন্ত্রিসভার সিনিয়র সদস্যরা বোধহয় সরকারের সকল কাজেই জড়িত। অথচ এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সরকারের কর্মকাণ্ড, সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় অনেক জটিলতা এবং সমন্বয়হীনতা বিদ্যমান। অনেক সময় অনেক ঘটনা বা সিদ্ধান্তের সাথে সরকারপ্রধান এবং তাঁর স্টাফ ছাড়া অন্য কেউ জড়িত থাকে না। একজন মন্ত্রী আর একজন মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, কি হলো, কি হচ্ছে? সিনিয়র মন্ত্রীরা ভাব দেখান যে, তাঁরা সব জানেন, আসলে তাঁরাও অনেক কিছু জানেন না। আবার উল্টোটাও ঘটে, প্রশাসনের অভ্যন্তরে অনেক কিছু ঘটে যায় যা সরকারপ্রধান নিজেই জানেন না, অথচ সরকারের দায়িত্ব সবকিছু তাঁর ওপরই বর্তায়। অন্যদিকে একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে কোন মন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করুন আর না করুন বা তিনি কিছু জানুন বা না জানুন, সরকারের তিনি যেহেতু একজন মন্ত্রী, তাঁকে জনসমক্ষে সরকারের সকল সিদ্ধান্ত এবং কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব নিতে হয়। অন্যদিকে কোন সরকারপ্রধানের জন্য সকল সিদ্ধান্ত সকলের সাথে আলোচনা করে নেয়া সম্ভবপর নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়, যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় তিনি কেবলমাত্র তাঁদের সাথেই কথা বলবেন, যাঁদের সাথে তিনি মনে করেন, পরামর্শ করার প্রয়োজন। আর যদি মনে করেন পরামর্শের প্রয়োজন নেই তাহলে একাই সিদ্ধান্ত নেন। এইভাবে প্রায় সকল অনুন্নত দেশেই প্রশাসন চলে, সরকারপ্রধানরা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

তবে, কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কি কৌশল বা পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তা নির্ভর করে সরকারপ্রধানের নিজস্ব মনমানসিকতার এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। তাঁর নিজস্ব উপলব্ধিশক্তির ওপর, নিজের vision-এর ওপর। এইক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকতে বাধ্য। তবে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সরকার পরিচালনা, সরকারের সফলতা-ব্যর্থতা অনেকটা নির্ভর করে সরকারপ্রধানের এই বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ভূমিকার ওপর, সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়ায় তিনি কোন্ পথ অনুসরণ করেন, কোন্ mechanism adopt করেন। এই সবকিছু নির্ভর করে তাঁর নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা, দক্ষতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলির ওপর।

প্রেসিডেন্ট জিয়া প্রথম উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে, যাঁদের মধ্যে অনেকের বয়স তাঁর দ্বিগুণের কাছাকাছি ছিল। এঁদের কয়েকজনের পরামর্শের ওপর নির্ভর করে তিনি তাঁর যাত্রা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ড. এমএন হুদা, শফিউল আজম, কাজী আনোয়ারুল হক, আব্দুল মোমেন এবং পরে রাজনীতিবিদদের মধ্য থেকে আতাউর রহমান খান, মশিউর রহমান (যাদু মিয়া), শাহ আজিজ, কাজী জাফর এবং আরো কিছু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁদের সম্মান এবং সমীহ করে চলতেন। এই সময় তিনি সামরিক বাহিনীতে তাঁর ঘনিষ্ঠ অফিসারদের সাথেও নিয়মিত বৈঠক করতেন। জেনারেল শওকত, মঞ্জুর ও নূরুল ইসলাম তখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

www.pathagar.com

করতেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া যখন সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর উপদেষ্টা পরিষদে এবং পরে মন্ত্রিপরিষদে রাজনীতিবিদদের অন্তর্ভুক্ত করলেন, সেই থেকে তিনি একটি hard core inner group-এর ওপর নির্ভর করেছেন। প্রায় প্রতিদিন বৈঠক করতেন। সকল ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন এঁদের সাথে আলোচনা-পরামর্শ করে।

আমি ১৯৭৭ সালের ২৯ ডিসেম্বের প্রথমে তাঁর উপদেষ্টা নিযুক্ত হই এবং পরে মন্ত্রিসভার সদস্য হই। আমি জিয়ার একজন খুব ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসী সহকর্মী ছিলাম। আমার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সাথে আমি জড়িত ছিলাম। জাগদল থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট এবং বিএনপি গঠন করা পর্যন্ত এমন কোন রাত নেই যে, আমরা ক'জন প্রায় ভোরবেলা পর্যন্ত তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় আলোচনায় বসিনি। কোনদিন রাত ২টায় বাড়ি ফিরলে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করত, কি ব্যাপার আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কি করে? এটি একটি রুটিনের মত ছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়া বঙ্গভবন থেকে ধানমন্ডি পার্টি অফিসে আসতেন রাত ৯টার দিকে, বাড়ি ফিরতেন ১১টার দিকে, আর আমাদের ক'জনকে বলে যেতেন তাঁর বাসায় যেতে। যাদু মিয়া, বদরুদ্দোজা চৌধুরী, কাজী জাফর—এরা আসতেন, আর এক ব্যক্তি যিনি প্রথম থেকে জিয়ার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং আস্থাভাজন ছিলেন তিনি হলেন জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশু। ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আমি ছিলাম জিয়ার সারা বাংলাদেশের নির্বাচনী এজেন্ট এবং দেশব্যাপী নির্বাচনী তদারকীর সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপরই ছিল। বিএনপি সংগঠন হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলা থেকে থানা পর্যায় পর্যন্ত আমি আর প্রেসিডেন্ট জিয়া একসাথে ভ্রমণ করেছি। হাজারো ছোট ছোট স্মৃতিকথা মনে পড়ে। অসম্ভব পরিশ্রমী আর dedicated ছিলেন তিনি। তাঁর আচার-ব্যবহার এমন ছিল যে, অতি সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করতে পারতেন, মানুষের মন জয় করার একটি যাদু ছিল তাঁর মধ্যে। একই রকমের বয়স ও কর্মোদ্যমের কারণে আমাদের দুজনার মধ্যে একটি পারস্পরিক আস্থা এবং সম্মানের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু রাজনীতিতে শেষ বলতে কিছু নেই। আমাদের এই পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ককে বিনষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল নির্বাচনের পর থেকেই। শেষ পর্যন্ত দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র এবং কিউবা থেকে ফিরে আসার পর প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিপ্লবের ঘোষণাকে নিয়ে কিভাবে শাহ আজিজ এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো একসাথে আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে সফল হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ আগেই দিয়েছি। যাই হোক আমি সরকার থেকে বেরিয়ে আসার পরও আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্ট হয়নি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় বরাবরই তিনি সলাপরামর্শ করার নীতি অনুসরণ করেন।

সামরিক শাসনের ৩ বছর ৪ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর ৫ আগস্ট ১৯৮৫ সালে আমি এরশাদ সরকারে যোগদান করি এবং প্রথম থেকেই গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। জিয়ার মত কোন গণভিত্তিক শক্তি না থাকায় এরশাদের জন্য দল এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জনসমর্থনভিত্তিক কোন নীতি বা চর্চা অনুসরণ করা সম্ভব

www.pathagar.com

হয়নি। তারপরও রাষ্ট্র পরিচালনায় নীতিনির্ধারণী অল্প সংখ্যক একটি hard core সিনিয়র মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে তিনি কাজ করতেন। তাঁর style কিছুটা ভিন্ন ছিল। অনেকটা professional approach ছিল কাজকর্মে। তাঁর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে আমাকে জড়িত করতেন না। শুধু প্রয়োজন মনে করলে খবর দিতেন। তবুও মোটামুটিভাবে বলতে হয় ১৯৮৫-১৯৮৯ সালের আগস্ট—এই চার বছর মন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার পরিচালনায় নীতিনির্ধারণী রাজনীতির মূল স্রোতধারার সাথে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম। ১৯৮৯ সালের ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এবং সরকার পতন পর্যন্ত এই শেষের ১৫ মাস কর্মপরিধির বৈশিষ্ট্যের কারণে আমার জন্য মূল স্রোতধারায় কোন ভূমিকা রাখার তেমন কোন সুযোগ আর ছিল না। মন্ত্রিসভার সদস্য না থাকায় আগের মত ঘন ঘন বিভিন্ন ধরনের কাজ নিয়ে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ কমে যায়। এরশাদ কর্তৃক আমন্ত্রিত হলেই মাত্র উপস্থিত হতে পারতাম কোন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে।

যাই হোক প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং জেনারেল এরশাদের সরকারে যতদিন ছিলাম সেই সময়কালের সব সিদ্ধান্তের সাথে সম্পৃক্ততা না থাকলেও বা আমি দ্বিমত পোষণ করে থাকলেও, ভালমন্দ সকল কাজের দায়-দায়িত্ব আমাকে খানিকটা হলেও গ্রহণ করতে হবে। এই দায়িত্ব কোন অজুহাতেই এড়ানো উচিত হবে না বা যাবে না। তাই সরকার পরিচালনায় দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের যে perception তাকে মেনে নিতে হবে। যদিও তা অনেক সময় সঠিক নয়, ন্যায়বিচারের পরিপন্থী এবং কিছুটা নিষ্ঠুর, কিন্তু তারপরও কিছু করার নেই। অন্তত দুটো উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। প্রথমত, ঢাকার বাইরে স্থায়ী হাইকোর্ট ডিভিশন করার ব্যাপারে আমার দ্বিমত ছিল, কিন্তু অষ্টম সংশোধনীকে এরপরও সমর্থন দিতে হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, এরশাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং নারী আসক্তির যেসব অভিযোগ ছিল সেগুলো আমাদের অনেকেই গ্রহণ করতে পারেনি, কিন্তু সহ্য করে যেতে হয়েছে। এসব কারণে যেহেতু পদত্যাগ করিনি তাই সেসব অপরাধের দায়-দায়িত্বও গ্রহণ না করার কোন উপায় নেই।

প্রেসিডেন্ট জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালীন সময় তাঁর কোন আত্মীয়স্বজন, এমনকি আপন ভাই পর্যন্ত কোন আনুকূল্য ভোগ করার সুযোগ পাননি। বরং তিনি তাঁদের এতদূরে রেখেছিলেন যে, তাঁদের অস্তিত্ব সাধারণ মানুষের কাছে অজানা ছিল। বেগম জিয়ার আত্মীয়স্বজনদের বেলায়ও প্রেসিডেন্ট জিয়ার একই মনোভাব ছিল। কাউকে কাছে ভিড়তে দেননি। এরশাদের ক্ষমতা থাকাকালীন সময় নিজের পরিবার বা আত্মীয়স্বজনদের বেলাতে একথা বলা যেতে পারে যে, তাঁর নিকটআত্মীয় বা ভাইকে কখনো কাছাকাছি দেখা যায়নি, তবে বেগম রওশন এরশাদের আত্মীয়স্বজনদের তিনি ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। তাছাড়া এরশাদের নিজস্ব দুর্নীতি সম্পর্কে অজস্র অভিযোগ ছিল। অথচ জিয়ার ব্যক্তিগত চরিত্রে কোন ধরনের কালিমা ছিল না। এই সমস্ত কারণে সরকার পরিচালনায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাঁদের কিছুটা অভিন্নতা থাকলেও, ব্যক্তিগত style ও approach ছিল ভিন্ন।

www.pathagar.com

অধ্যায় ২৮

প্রধানমন্ত্রী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার নিয়োগ ছিল বেশ নাটকীয়। ১৯৮৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর এরশাদ আমাকে উপপ্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন। মিজান চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে টেলিযোগাযোগের দায়িত্ব দেন। বয়স এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে সেটিই সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিয়ে পার্লামেন্টে আসে কিন্তু বিএনপি বাইরে থেকে যায়। পার্লামেন্ট পরিচালনায় উপনেতা হিসেবে আমি সক্রিয় ভূমিকা পালন করি। কিন্তু সেই পার্লামেন্ট বেশিদিন টিকেনি। দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের আন্দোলনের মুখে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ নতুন করে আবার সাধারণ নির্বাচন হয়, যেই নির্বাচনে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলই অংশগ্রহণ করেনি। তাই সেই পার্লামেন্টের গুরুত্ব অনেক কমে যায়। আমি নিজেও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ি। আর তাছাড়া সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্ব থাকলেও রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থায় পদবি এবং প্রটোকল ছাড়া অন্যান্য মন্ত্রীর তুলনায় প্রধানমন্ত্রীর আলাদা বা অতিরিক্ত কোন ক্ষমতা ছিল না। সেইজন্য প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য আমি কোন লবি করিনি। মুখ খুলে একথা এরশাদ বা অন্য কাউকে কোনদিন বলিনি। মিজান চৌধুরী সনাতনী রাজনীতিবিদ ছিলেন; ভাল, উদার এবং আয়াসী মানুষ ছিলেন। তাঁর সাথে আমার কাজ করতে কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এরশাদের সামরিক শৃঙ্খলা এবং দক্ষ কাঠামোর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে মাঝে মাঝে তাঁর অসুবিধা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

ফিলিস্তিনী নেতা ইয়াসির আরাফাত নিরাপত্তার কারণে মাঝে মধ্যে ঢাকায় অবতরণ করতেন এবং তাঁকে একজন সরকারপ্রধানকে প্রদেয় সকল কূটনৈতিক সৌজন্য দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচনের পরপরই এ ধরনের একটি নিরাপত্তামূলক সফরে ইয়াসির আরাফাত ঘণ্টাখানেকের জন্য ঢাকায় অবতরণ করেন। আরাফাতকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমাকে বলা হলো জেনারেল এরশাদের সঙ্গে বিমানবন্দরে যেতে। ভিভিআইপি টার্মিনালে আরাফাতের বিমান পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আমাকে এরশাদ তাঁর গাড়িতে উঠতে বলেন। গাড়ি ছাড়ার সাথে সাথে আমাদের মধ্যে অন্য একটি বিষয়ে আলোচনার মাঝখানে এরশাদ অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বললেন "আপনাকে আমি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে যাচ্ছি।"

www.pathagar.com

আমিও তাঁকে স্বাভাবিক স্বরে ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের আলোচনায় ফিরে গেলাম। এমন একটা ভাব যেন কিছুই ঘটেনি। অথচ আমার জন্য বিষয়টি কত বিরাট এবং উত্তেজনাপূর্ণ ছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কথাটি আমি কাউকে বলিনি, নিজের স্ত্রীকেও নয়, যদি শেষ পর্যন্ত না হয় সেই ভয়ে। এর প্রায় দুসপ্তাহ পরে ২৭ মার্চ ১৯৮৮ সালে বঙ্গভবনে আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করি। মিজানুর রহমান চৌধুরীকে স্পিকার হওয়ার জন্য বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে রাজি হননি।

ভাইস প্রেসিডেন্ট

দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগদানের বিষয়টি আমার জন্য ছিল কষ্টকর, কিন্তু আরো অনেক বেশি নাটকীয় এবং ঘটনাবহুল। প্রধানমন্ত্রী, বিশেষ করে পার্লামেন্ট নেতা হিসেবে আমি বেশ সাফল্য অর্জন করেছিলাম। যদিও আ. স. ম. আব্দুর রবের নেতৃত্বে বিরোধী দল ছিল তুলনামূলকভাবে দুর্বল কিন্তু তারপরও আমি চেষ্টা করেছি পার্লামেন্টকে সচল রাখতে। সময়মত পার্লামেন্টের বৈঠক বসার সেই রেকর্ড কেউ এখনো ভাঙতে পারেনি। সংসদীয় সংস্কৃতির প্রতি আমার আবেগপূর্ণ আকর্ষণ ছিল চিরন্তন, ছোটবেলা থেকেই। পার্লামেন্টকে রীতিমত ভালবাসি এবং তাই পার্লামেন্ট নেতা হিসেবে আমার কাজকে আমি খুব উপভোগ করেছিলাম। ১৯৮৮ সালের বাজেট অধিবেশন প্রায় ৭০ দিন চালিয়েছিলাম। আই ওয়াজ রিয়্যালি এনজয়িং।

আমি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার এক বছর পার না হতেই তাঁর সাথে এক বৈঠকে এরশাদ আমাকে হঠাৎ প্রেসিডেন্ট করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বললেন আমাকে ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। তিনি আর নির্বাচন করবেন না। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে ওনার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার ছয় মাস আগে তিনি আমার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে অবসর নেবেন। বললেন "আমি গলফ খেলতে চাই। পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে চাই এবং জীবনের বাকি বছরগুলো এনজয় করতে চাই। ছয় মাসের মধ্যে আপনি ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের পদে কাজ করে প্রশাসন এবং দলের নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পাবেন। তারপর নির্বাচন করে জিতলে জাতীয় পার্টি আবার ক্ষমতায় আসবে এবং আমাদের উন্নয়ন এবং সংস্কারমূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে যার ফলে দেশের দ্রুত উন্নতি হবে।" কথাগুলো আমার বিশ্বাস হয়নি। একজন সামরিকপ্রধান এতদিন ক্ষমতা ভোগ করার পর স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবেন—এরকম নজির অন্য কোথাও নেই। অসম্ভব। তিনি চাইলেও বাস্তবে তা হবে না। পরিকল্পনাটি যে অবাস্তব এবং এটি যে হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই সেই বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। একজন সিভিলিয়ান এভাবে সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে যাবে, এটি অসম্ভব ব্যাপার। কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এতে একমত হবেন না। আমি বললাম আমি যা আছি খুব ভাল আছি। আমি প্রেসিডেন্ট হতে চাই না, তাই ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার দরকার নেই। আপনি অন্য কাউকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করুণ। উত্তরে বললেন, "you are the only competent person I have

www.pathagar.com

who can run the country, আপনি ছাড়া আমি অন্য কারো কথা চিন্তা করতে পারছি না।" এই কথাগুলো বলার পরও আমি অস্বীকৃতি জানিয়ে সেদিন চলে এলাম। ভাবলাম একি যন্ত্রণা, এ কোন্ ধরনের ষড়যন্ত্র। প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থার অধীনে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সীমিত হলেও সরকারের মূল স্রোতধারার একটি অংশ হিসেবে এই পদটির একটি গুরুত্ব রয়েছে। আর ভাইস প্রেসিডেন্টের না আছে কোন গুরুত্ব, না আছে কোন ভূমিকা। এই বয়সে ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে অবসর গ্রহণ করার চেয়ে কিছু না হওয়াই ভাল।

এর মধ্যে দেনদরবার শুরু হয়ে গেল। কাজী জাফরের নেতৃত্বে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, নাজিউর রহমান মঞ্জু আর আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বেশ কয়েকবার আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে আমিই হলাম তাদের ভবিষ্যতের নেতা, নেকস্ট প্রেসিডেন্ট। এরশাদ খুব সিরিয়াস সুতরাং আমার রাজি হয়ে যাওয়া উচিত। এর মধ্যে এরশাদ একদিন খুব উত্তেজিত হয়ে ওনার বাড়ির অফিস ঘরে পায়চারি করা শুরু করলেন, আর দুতিনবার বললেন "মওদুদ সাহেব, you do not trust me, আমার মনে আপনি খুব দুঃখ দিলেন।" বললেন "সংবিধান পরিবর্তন করে ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ স্থায়ী করে দিন যাতে প্রেসিডেন্ট তাকে অপসারণ করতে না পারে, আর প্রেসিডেন্ট সিস্টেমটিকে ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী করার প্রয়োজনে আমেরিকান সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের সময় প্রেসিডেন্ট-ভাইস প্রেসিডেন্ট একসাথে running-mate হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, সেই ব্যবস্থা করুণ। আর আগামী নির্বাচনে আপনার ভাইস প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ running-mate কে হবেন সেটা আপনি ঠিক করে নেবেন" আমি এতেও রাজি হলাম না। আমি বুঝতে পারলাম এই নতুন প্রস্তাবের পেছনে কাজ করছিল আর একটি incentive, আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট হলে কাজী জাফর হবেন প্রধানমন্ত্রী আর বাকি তিনজন হবেন উপপ্রধানমন্ত্রী। আমাকে হঠাৎ করে নেতা মানার আর অন্য কোন কারণ ছিল না।

এর মধ্যে এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কিছুদিন আগে কানাডার ভ্যানকুভার শহরে অনুষ্ঠিতব্য কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানদের সম্মেলনে হংকং থেকে ভ্যানকুভার যাওয়ার পথে ক্যথি প্যাসিফিক এয়ারলাইন্সের উড়োজাহাজের দোতলায় বেগম রওশন এরশাদ হঠাৎ আমার পাশে এসে বসলেন। তিনি বললেন আমাকে এখন দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সে অনেক কথা। মূল কথা হলো এরশাদ সরে যাবেন এবং দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে যেতে চান। তখন আমি এটিকে গুরুত্ব দেইনি। মনে হয়েছে এটি ছিল একটি কথার কথা।

এই অবস্থা চলতে থাকে বেশ কিছু দিন। একদিন, রওশন এরশাদ তখন বিদেশে, এরশাদ হঠাৎ করে স্ত্রীসহ আমাকে চা খেতে দাওয়াত দিলেন। সেদিনই প্রথম এরশাদের বাড়ির অন্দরমহলে যাওয়ার সুযোগ হলো আমাদের। ভেতরে গিয়ে দেখি সস্ত্রীক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু আর এরশাদের প্রিয়ভাজন শিল্প সচিব মোশাররফ হোসেনও সস্ত্রীক উপস্থিত। আলোচনার বিষয়বস্তু আমার ভবিষ্যৎ। সবাই প্রায় এক সুরে বোঝাতে চাইল যে, এরশাদ সাহেব যা চাইছেন সেটি আমার জন্য ভালই হবে।

www.pathagar.com

হাওয়ার্ড সেফার ছিলেন বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের একজন সফল রাষ্ট্রদূত। তাঁর স্ত্রী টেইজি সেফারও একজন পেশাদার কূটনীতিক। হাওয়ার্ড ফিরে গিয়ে অবসর নেন এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীলংকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে মেয়াদ সম্পন্ন করার পর দক্ষিণ এশিয়ার দায়িত্বে উপমন্ত্রী হন এবং বাংলাদেশে সফরে আসেন। এরা দুজনই আমাদের বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে টেইজি সেফারকে দাওয়াত দিলাম রাতে খাওয়ার জন্য। একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বন্ধু হিসেবে। প্রাইভেট ডিনার টেবিলে বিষয়টি তাঁকে বলার আগে তিনি নিজেই জানতে চাইলেন আমার ব্যাপারে তিনি যা শুনেছেন তা সত্য কি না। আমি এরশাদের প্রস্তাবটা বিস্তারিত জানালাম। আমার মত টেইজি সেফারও কিছুটা বিস্মিত হন। বললেন, ডিক্টেটররা কোনদিন স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছাড়ে না। "তুমি কি বিশ্বাস করো এরশাদ তাঁর কথা রাখবে"? আমি যে বিশ্বাস করি না, সেটাই তাকে বললাম। যাই হোক বিদায় নেয়ার আগে বলে গেল সাবধান থাকতে আর সিদ্ধান্ত নেয়াটা আমার ওপর ছেড়ে দিলেন। গাড়িতে ওঠার আগে বললেন, "আপনি প্রেসিডেন্ট হলে আমেরিকা খুশি হবে, তবে সম্ভাবনা খুবই কম।" এই ব্যাপারে আমি রাজি না হওয়াতে এরশাদ আমার ওপর মনক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। তাঁকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এটা বুঝে আরো রাগান্বিত হন। মনে মনে ক্ষুব্ধও, মাঝে মাঝে আবেগপ্রবণ হয়ে যান। একদিন হঠাৎ কক্সবাজার চলে গেলেন রাত কাটাতে, স্বল্প নোটিশে, ভাবটা এমন যেন আমার কারণেই যাচ্ছেন। যাওয়ার আগে টেলিফোনে বললেন, আর একবার ভাল করে ভেবে দেখতে এবং প্রস্তাবিত সাংবিধানিক খসড়াটা দেখে নিতে। খসড়া তৈরি করেছেন বিচারপতি কুদ্দুস চৌধুরী। সংবিধানের নবম সংশোধনী। প্রচণ্ড চাপ থাকা সত্ত্বেও আমি প্রায় দুমাস এই প্রক্রিয়াকে স্থগিত করে রাখি। অর্থাৎ সম্মতি দেইনি।

এরপর সে আর এক বিরাট নাটকীয় ঘটনা। একই ধরনের নিরাপত্তার কারণে ফিলিস্তিনী নেতা ইয়াসির আরাফাত ঢাকায় অবতরণ করার পর তাঁর সফরসঙ্গীরা জানালেন যে, তিনি ঢাকায় যাত্রাবিরতি করবেন। তাড়াতাড়ি করে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন করতোয়ায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হলো। রাতে সেখানেই একটি ছোট সঙ্গীতানুষ্ঠান আর ডিনারের ব্যবস্থা হলো। খাওয়ার টেবিলে আরাফাত বসেছেন এরশাদের ডানদিকে আর আমি বামদিকে। সামনে কাজী জাফর এবং অন্যান্য সিনিয়র দুতিনজন মন্ত্রী। খাওয়ার মাঝখানে এরশাদ বলে উঠলেন, আরাফাতকে উদ্দেশ করে, যার বাংলা অর্থ হলো যে, আমার প্রধানমন্ত্রী আমাকে বিশ্বাস করে না। আমি তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাই, কিন্তু সে আজকে কোন কথা পর্যন্ত বলছে না। সেদিন এসব কারণেই আমার মনটা খুব বিষণ্ন ছিল। আরাফাত আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, "ব্রাদার কি হয়েছে, কথাটি কি সত্যি? ব্রাদার, এরশাদ যা বলছে এটি তো ভাল খবর, তোমার এটি গ্রহণ করা উচিত।" আমি খুব বিব্রত বোধ করলাম। মনের কথাটা বলতে পারলাম না। অন্য একটি কথা বলে আলোচনার বিষয়টা আর একদিকে নেয়ার চেষ্টা করলাম। ডিনার শেষে আরাফাতের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর জেনারেল এরশাদ তাঁর বাসায় আমাদের ক'জনকে যেতে

www.pathagar.com

বললেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং অন্যরা পরামর্শ দিল সে রাতেই সব চূড়ান্ত করে ফেলতে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। এরশাদ সাহেব যখন এত সিরিয়াস তখন আর বিলম্বের প্রয়োজন নেই। এরশাদের বাসায় গিয়ে দেখি কুদ্দুস চৌধুরী সাহেব বসা। এবারও জেনারেল এরশাদ আবেগপ্রবণ হয়ে পায়চারি করলেন বাইরের ছোট বৈঠকখানায়, আর বললেন যে, তিনি এখনো বুঝতে পারছেন না আমি কেন তাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কথাগুলো বলে তিনি তাঁর অফিস ঘরে চলে গেলেন। আমার প্রথমবারের মত মনে হলো তিনি হয়তো sincerely কথাগুলো বলেছেন। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করলাম। তাঁর অফিস ঘরে গিয়ে দুঃখপ্রকাশ করলাম এবং আমার সম্মতির কথা জানালাম। রাত তখন প্রায় ১টা। সংবিধানের নবম সংশোধনীর খসড়া চূড়ান্ত করা হলো। মার্কিন সংবিধানের আদলে প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট, running-mate হিসেবে নির্বাচন করবে ক্ষমতার উত্তরণের জন্য। আর প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্টকে আর অপসারণ করতে পারবে না। এরশাদ বললেন, পরবর্তী নির্বাচনে running-mate অর্থাৎ ভাইস প্রেসিডেন্ট কে হবেন সেটা আপনি ঠিক করবেন। মনের মধ্যে একটাই সান্ত্বনা হলো যে, নবম সংশোধনী পাস হওয়ার পর আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট হলে জেনারেল এরশাদ আমাকে আর অপসারণ করতে পারবেন না। ১৯৮৯ সালের ১১ জুলাই সংবিধানের নবম সংশোধনী আইন পাস হয়। এরপরও আমি সময় নিলাম। শেষ পর্যন্ত ১২ আগস্ট ১৯৮৯ সালে আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করি।

কিন্তু বছরখানেক যেতে না যেতেই ২২ মে ১৯৯০ সালে পার্লামেন্ট সদস্য নূরুল ইসলাম মনির নির্বাচনী এলাকা বরগুনায় এক জনসভায় হঠাৎ এরশাদ ঘোষণা দিলেন যে, তিনি আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একজন প্রার্থী হবেন। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে নির্বাচন হওয়ার কথা, তখনও ১৬ মাস সময় বাকি। নির্বাচনের কোন কথাবার্তা নেই, কোন তারিখ ঠিক হয়নি, কোন তফসিল ঘোষণা হয়নি, অথচ তিনি নির্বাচনে প্রার্থী। সকলেই অবাক আর আমি তো হতবাক। কিন্তু এ ধরনের ঘোষণাটি শুধু বিশ্বাস ভঙ্গই ছিল না, অবাস্তবও ছিল। আমি তো প্রথম থেকেই বিশ্বাস করিনি যে এরশাদ যেভাবে বলেছিলেন সেভাবে ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবেন। টেইজি সেফারও তাই বলেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের প্রায় ১৬ মাস আগে এই ঘোষণা দেয়ার কি অর্থ ছিল, এই বিশ্বাস ভঙ্গেরই বা কি প্রয়োজন ছিল! শুধু তাই নয়, একটা কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সমন্বয় কমিটি করা হলো নাজিউর রহমান মঞ্জুকে প্রধান সমন্বয়কারী করে। আগস্ট মাসে আল্লাওয়ালা বিল্ডিংয়ে সারা দেশের নেতাদের ডেকে এনে সভা করা হলো নির্বাচনের সব আয়োজন করার জন্য। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং বিদেশী দাতাগোষ্ঠীদের মধ্যে এই ঘোষণার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আগেই বলেছি। যা ভেবেছিলাম তাই তো হয়েছে। কথা তুলে লাভ কি?

১৯৯০ সালের শেষের দিকে যখন আন্দোলন একটি চূড়ান্ত রূপ নেয়ার পথে, বিরোধী দলের একমাত্র টার্গেট হয়ে দাঁড়ালেন এরশাদ। তারা তাঁর পদত্যাগ চায় এবং তাঁর অধীনে আর কোন নির্বাচন করবে না বলে ঘোষণা দেয়। অক্টোবর মাসে অবস্থার

www.pathagar.com

অবনতি ঘটতে শুরু করে। তখনও রাজনৈতিক সমাধানের একটি পথ খোলা ছিল, যদি এরশাদ পদত্যাগ করে আমার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন। কিন্তু সেটা তিনি করেননি, একবার মুখ দিয়ে উচ্চারণও করেননি। মন্ত্রীদের সবাই যাঁরা আমাকে নেতা বানাতে চেয়েছিলেন তাঁরাও একটি কথা বলেননি। এই বিষয়টি সরকার পতনের শেষ দিন পর্যন্ত একবারও কোন আলোচনাতে আসেনি। অথচ এরশাদ এই ধরনের কোন পদক্ষেপ নিলে বিরোধী দলগুলোর কাছেও হয়তো গ্রহণযোগ্য হতো। A freak in history can never be a hero—কথাটা কত সত্য। তারপরও আমার মনে কোন দুঃখ নেই। সময়মত অর্থাৎ অক্টোবরের যে কোন সময় আমার কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিলে হয়তো দেশের জন্য ভালই হতো। আমি বিরোধী দলগুলোর সাথে বসে ক্ষমতা হস্তান্তর করার একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করতাম। প্রয়োজন হলে পার্লামেন্টে সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করার ব্যবস্থাও করা যেত এবং আমি দল থেকে পদত্যাগ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব না বলে ঘোষণা দিতাম। ৯০ দিনের মধ্যে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতাম। এইসব পদক্ষেপ নিলে দেশে শান্তি ফিরে আসত। মানুষ খুশি হতো। দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি সমাধান হতো। এরশাদের জন্যও সেটা ভাল হতো। কিন্তু আগেই বলেছি, সামরিক শাসকরা বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতা ছাড়ে না। টেইজি সেফারও বলেছিলেন ডিক্টেটররা উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকে। এরশাদ আমাকে যেকথা বলে ভাইস প্রেসিডেন্ট করেছিলেন, সেটা যে তিনি mean করেননি তা শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই প্রমাণ করেছেন। ক্ষতিটা তাঁর হয়েছে, আমার তেমন কোন ক্ষতি হয়নি।

www.pathagar.com

অধ্যায় ২৯

বিবাহ এবং নিজের কিছু পরিচয়

আমার প্রেমের জীবন অনেক ব্যাপক এবং বিস্তৃত। কিন্তু সেটা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে যে মানুষটাকে ভালবাসতাম নানা কারণে তাকে আর বিয়ে করা সম্ভব হয়নি। প্রবাসী জীবনেও তাই ঘটেছে। ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফিরে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই বিয়ের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। আমি গতানুগতিক পথে কোন ধনী ব্যক্তি বা বিচারপতির কন্যাকে বিয়ে করতে চাইনি। পেশায় কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছলতা অর্জন করার পর নিজের পছন্দ করা কাউকে বিয়ে করাই ছিল মনের ইচ্ছা। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার পর তখন নিজের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম যে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করব না, এবং যুদ্ধকালীন সময় গড়ে ওঠা দাড়িও আর কাটবো না। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দাড়ি কেটে ফেলা হলো কিন্তু পাত্রীর সন্ধান ছিল না। যুদ্ধের ৯ মাস ছাড়া ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বন্ধুরা আমাকে most eligible bachelor in Dhaka বলে আখ্যায়িত করত। ঢাকার আধুনিকা অবিবাহিত মেয়ে মহলে তখন তোলপাড় শুরু হয়। আমাকে নিয়ে অনেক ঔৎসুক্য। তখনকার অনেক সামাজিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও অনেকে এগিয়ে আসে, আবার আমিও এগিয়েছি, কিন্তু ইংরেজিতে বলে, কারো সাথে click করেনি। বড় সমস্যাটা ছিল intellectual adjustment-এর বিষয়টি। শুধু ফর্সা সুন্দরী বা কোন বংশগত ঐতিহ্য বা ধনী পিতার কন্যা আমার জন্য কোন মূল আকর্ষণ ছিল না।

ঢাকায় তখন অনেক পার্টি হতো। একজন যোগ্য কুমার হিসেবে তখন সব জায়গায় আমার বেশ চাহিদা। বন্ধু ক্যাপ্টেন হুদা-পপিদের ধানমন্ডির বাড়িতে পার্টি ছিল। সেই রাতে হাসনার সাথে আমার পরিচয়। কবি জসীমউদ্‌দীনের কন্যা। আমেরিকায় থাকে, বেড়াতে এসেছে। ডেইটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেছে, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়ে এক বছরের কোর্স শেষ করছে, তখন নিউ ইয়র্কে UNDP-র সদরদপ্তরে তথ্য বিভাগে কাজ করে ইত্যাদি। আমরা কায়েতটুলীতে আর কবি পরিবার থাকতেন সিদ্দিক বাজারে, তাই ছোটবেলায় পাড়ায় নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে, তবে মনে নেই। একটি সুন্দর ব্যক্তিত্ব যা খুব ভাল লাগল। প্রয়োজন ছাড়া নিজের কথা খুব বেশি কিছু বলে না,

www.pathagar.com

সবকিছুতে একটি sofistication আছে। বুদ্ধিমতী এবং মননশীল, intellectual, কথাবার্তায় পিছিয়ে থাকে না। ছিমছাম, লম্বা চুল পিঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। প্রায় সারা রাত কথা বললাম। হাসনার ভাই তাগাদা দিলে ভোরবেলার দিকে বিদায় নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসলাম। এরপর গভীর ভালবাসা, তারপর পারিবারিক সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করে বিয়ে হলো ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২। আমার সাথে বিয়ে হওয়াতে হাসনার কেরিয়ারে ব্যাঘাত ঘটল। বিয়ে না হলে হাসনা হয় জাতিসংঘে ফিরে যেত আর না হয় বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছায় বাংলাদেশের ফরেন সার্ভিসের সদস্য হতো। হাসনা লিখতে পারে, গান গাইতে পারে, শিক্ষিতা এবং কালচারড। বিয়ের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের লেকচারার। হুদা-পপিদের আজ স্মরণ করি সেই রাতে আমার আর হাসনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য। ক্যাপ্টেন হুদা খুব ভাল মানুষ ছিলেন, উদার এবং সংবেদনশীল। উড়োজাহাজ চালাতে ভালবাসত। আমাদের বিয়ের কয়েক বছর পর ফ্লাইং ক্লাবের একটি সেসনা উড়োজাহাজে কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতের কাছে গ্লাইডিং করতে গিয়ে হুদা দুর্ঘটনায় মারা যান। সেদিন ঢাকায় শোকের ছায়া নেমেছিল। হুদার ছোট ভাই কর্নেল নাজমুল হুদা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী, ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে খালেদ মোশাররফের ক্ষমতাগ্রহণের সহযোগী এবং শেরে বাংলা নগরে প্রতিপক্ষের গুলিতে একইসাথে মৃত্যুবরণকারী।

আমার বার বার কারাবরণ, নির্বাচনে জয়-পরাজয়, সরকারে যোগদান আবার সরকার ত্যাগ, আমার উত্থান-পতনের সাথে প্রথম পুত্রের অকাল মৃত্যু, সন্তানদের অসুস্থতা—সবকিছুর মধ্যেই হাসনার কষ্ট, ত্যাগ, আত্মবিশ্বাস এবং ধৈর্য আমাকে বিমোহিত করে। হাসনা আমাকে সাহস দিয়েছে। একজন জীবনসাথী হিসেবে তার গুণ এবং প্রতিভা আমার মধ্যে শক্তি যুগিয়েছে। এইভাবে সুখদুঃখ সবকিছু মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে আমার আর হাসনার বিবাহিত জীবন। আমান আর আনাকে ঘিরে। আসিফকে আমরা দুজনই হারিয়েছি।

নিজের কিছু পরিচয়

আমার কর্মবহুল ব্যস্ত জীবনে নিঃসঙ্গতা আমাকে আনন্দ দেয়। হৈ চৈ, আড্ডা দেয়া, তাস খেলা, জুয়া ধরা, গল্পগুজব, পরনিন্দা এবং অহেতুক সময় নষ্ট করা আমার সয় না। তার চেয়ে বই পড়া, গান শোনা বা কিছু লেখা আমাকে বেশি তৃপ্তি দেয়। আমি টেলিভিশন দেখি না বললেই চলে। এমনকি নিজের কোন অনুষ্ঠানও দেখি না। সব খবরের কাগজ পড়ি না। যে ক'টি সম্ভব, দুতিন খানা, তাও শুধু প্রথম আর শেষ পাতার মূল খবরগুলো, পড়ার সময় হলো গাড়িতে। তাই দিনের অনেক খবরই অজানা থেকে যায়, যদি না কেউ আমার দৃষ্টিতে আনে। হাতের কোন কাজ আমি ফেলে রাখতে পারি না। আমি কাজ ভালবাসি।

www.pathagar.com

তাই একাকী থাকাটা আমার জন্য কোন বিড়ম্বনা নয়, বরং শান্তিময় এবং আনন্দদায়ক। বাড়িতে হোক, জেলখানায় হোক আর বিদেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশীপে হোক, নিঃসঙ্গতা আমার জন্য কোন সমস্যা বয়ে আনেনি। আমি স্বাধীনচেতা, আত্মনির্ভর, মুক্তচিন্তার মানুষ। এসব আমার বৈশিষ্ট্য। এসব ব্যাপারে কোন বাধা বা হস্তক্ষেপ আমার পছন্দ হয় না। আমি আবেগপ্রবণ কিন্তু সেটা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করি। রাগ করার পর বা কাউকে বকা বা কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করলে পরে নিজেই কষ্ট পাই। অনুশোচনা করি।

একটি structured life আমার ভাল লাগে। সময় মেনে সবকিছু করা, খুব সকালে উঠে নামাজ পড়া, লেখাপড়ার কাজ করা, নিজের কাজ নিজে করা। নিজের কাপড় নিজে গুছিয়ে রাখা, ভ্রমণের জন্য নিজের সুটকেস নিজে প্রস্তুত করা, নিজের জুতা নিজে মোছা, নিজের টয়লেট নিজে পরিষ্কার করা। এসবের জন্য আমি আমার স্ত্রী বা বাড়ির পরিচারকদের হস্তক্ষেপ করতে দেই না এবং তারা তাই করেও না। অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনেও অনেকটা স্বাধীন মানুষ। সহজে মানুষকে বিশ্বাস করি, কাউকে শত্রু মনে হয় না। কেউ আমার প্রতি কোন অন্যায় বা ক্ষতি করলে সেটা আমি ভুলে যাই। আমার মনের মধ্যে কারো বিরুদ্ধে কোন malice বা বিদ্বেষ নেই। কেউ সাক্ষাৎ করতে চাইলে অপেক্ষায় রাখতে পারি না। যতটুকু সম্ভব সকলকে attend করার চেষ্টা করি। কোন কথা দিলে তা রাখার চেষ্টা করি।

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হলো আমার বড় পুত্র আসিফের অকাল মৃত্যু, আর আনন্দের সবচেয়ে বড় উৎস হলো আমার প্রতিবন্ধী পুত্র আমানের হাসিমাখা মুখ, তার অবুঝ কোমল মন আর তার সাথে কিছু সময় কাটানো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩০

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ: My Vision of Bangladesh

৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে মোটামুটিভাবে একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আমি এবং জেনারেল এরশাদ শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেই। প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান হিসেবে গণতন্ত্রের নতুন যাত্রায় নেতৃত্ব দেয়ার কাজ শুরু করেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি সরকারি বাড়িতে না থেকে নিজের বাড়িতেই থাকতাম, তাই পদত্যাগ করার পর প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে নিজের গাড়ি করে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে গুলশানের বাড়িতে ফিরে আসি। পরের দিন ছিল শুক্রবার। সকালে বিবিসির বিদেশী প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকারে বললাম যে, আমাদের পদত্যাগের ফলে দেশে এখন শান্তি ফিরে আসবে এবং একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করব কিনা, জানতে চাইলে বললাম অবশ্যই জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ নির্ধারণ করবে জাতীয় পার্টির জনপ্রিয়তা কতটুকু আছে। এরপর বিবিসির প্রতিনিধি জেনারেল এরশাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে আমি তাকে তাঁর টেলিফোন নম্বর দিয়ে যোগাযোগ করতে বললাম। পরে একই দিনে জেনারেল এরশাদও বিবিসিকে এক সাক্ষাৎকারে মোটামুটিভাবে একই কথা বলেছিলেন। বিবিসিকে সাক্ষাৎকার দেয়ার পর আমি শুক্রবার দিন ঢাকায় থাকলে পরিবাগের যেই মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়ি সেখানে অনেক মুসল্লি আলিঙ্গন করলেন, অনেকে দুঃখপ্রকাশ করলেন। তবে পরে শুনেছিলাম তরুণ বয়সের নামাজিরা জনসমক্ষে আমার এভাবে হাজির হওয়াকে ধৃষ্টতা মনে করেছে এবং আমাকে কেন্দ্র করে একটা বিব্রতকর কিছু করার কথা চিন্তা করেছিল। কিন্তু কোন ঘটনা আর ঘটেনি। তবে সেদিন বিবিসিতে আমাদের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে আন্দোলনরত দলসমূহের মধ্যে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ঘোষণাকে তারা প্রত্যাখ্যান করে এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং আমাদের শাস্তি দাবি করে।

www.pathagar.com

এর পরের দিন শনিবার, ৮ ডিসেম্বর, জেনারেল এরশাদের টেলিফোন সংযোগ কেটে দেয়া হয় এবং শুনলাম এরশাদের বাড়ি তল্লাশি চলছে এবং তাঁকে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়েছে। রাত্রে একবন্ধু এসে বলে গেল সাবধান থাকতে এবং বাড়িতে না থাকার জন্যও পরামর্শ দিল। খবর নিয়ে জানলাম আমার বাড়ির চারদিকে গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা ব্যক্তিরা পাহারায় বসেছে। বন্ধু আনসার রহমানের সাথে ফোনে যোগাযোগ করলাম লন্ডনে। তার বারিধারার বাড়ি খালি পড়ে আছে। পরের দিন সেখানে গিয়ে দোতলায় একটি শোয়ার ঘরে উঠলাম। বাড়িতে কাজ করার মানুষজন ছাড়া আর কেউ নেই। তারপরও গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য ঐ ঘরটার মধ্যেই নিজের সবকিছু গুছিয়ে নিলাম। সাথে করে আনা কাগজ-কলম আর কিছু বই দিয়ে টেবিল সাজালাম। শুধু খাওয়ার সময় ছাড়া ঐ ঘর থেকে আর বের হলাম না।

ডিসেম্বর ৯ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত আমি এই ঘরটিতেই নির্জন নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছি। এটি ছিল একটি ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা, স্বেচ্ছায় অন্তরীণ থাকা! সবকিছুই আছে, কিছু দূরেই হাসনা-আনা রয়েছে কিন্তু তারপরও একেবারেই একা। এর একদিন পরই অর্থাৎ ১০ তারিখ রাতে কয়েকটি মোটর সাইকেল আর দুটো মাক্রোবাসে চড়ে কিছু যুবক এসে আমাদের বাড়ি আক্রমণ করে। বোমা মেরে বিস্ফোরণ ঘটায়, টেলিফোন আর বিদ্যুতের লাইন কেটে দেয় এবং বৈঠকখানায় আগুন দেয়ার চেষ্টা করে। তারা আমার খোঁজ করে, আমি বাড়িতে থাকলে কি হতো জানি না। পেছনের বাড়িতে সুইজারল্যান্ডের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স অর্থাৎ বাংলাদেশে নিযুক্ত তাদের প্রধান কর্মকর্তার বাড়ি। দেয়ালের ওপার থেকে ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত বিল মাইলামও খবর পেয়ে আসেন এবং হাসনা আর আনাকে উদ্ধার করে অন্যত্র নিয়ে যান।

আমি কিছুই জানতাম না। টেলিফোন করে লাইন না পেয়ে সেদিন সন্ধ্যায় চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম। কিছুক্ষণ পর হাসনা টেলিফোন করে ঘটনার সব বৃত্তান্ত দিল এবং জানালো তারা এখন নিরাপদে আছে। আমি বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় আমি ভীষণ মর্মাহত হই। আমার মনের অবস্থা কি হয়েছিল সেটা সহজেই অনুমেয়। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মাধ্যমে অস্থায়ী সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে হাসনা তিনদিন পরে বাড়িতে ফিরে যায়। পরে শুনেছি আন্দোলনের কোন একটি রাজনৈতিক দলের কিছু ছাত্র এই ঘটনার জন্য দায়ী ছিল। কথাটা কতটুকু সত্য জানি না। ২০ ডিসেম্বর গোয়েন্দা পুলিশ আমার সন্ধান পায়, গ্রেপ্তার করে আরো দশ দিনের জন্য নিজ বাড়িতে অন্তরীণ অবস্থায় রেখে শেষে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করে। পুরোনো ২৬ নম্বর সেলে আবার কারাজীবন শুরু করলাম। আনার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। তার মনের মধ্যে নিশ্চয়ই এইসব ঘটনার একটি গভীর প্রতিক্রিয়া রেখাপাত করে।

গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বন্ধু আনসারের বারিধারার বাড়িতে যে দশ দিন ছিলাম সেদিনগুলোর মধ্যে লিপিবদ্ধ করলাম আমার চিন্তাচেতনার প্রতিফলনসমূহ। লিখলাম আমার Vision

www.pathagar.com

of Bangladesh। আমি মূলত যা লিখেছিলাম তা ছিল যে, আমি বাংলাদেশকে দেখতে চাই এমন একটি স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে যেখানে মানুষ সম্মান এবং মর্যাদার সাথে বসবাস করবে। ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্য সেবাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে, মানুষের জন্য থাকবে প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং শিশুদের জন্য বিরাজ করবে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়ার অনুকুল পরিবেশ। উন্নয়নের একটি বিশেষ কর্মসূচিও একটি Action Plan-এর অধীনে এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ শতাংশে নামিয়ে আনা, শিক্ষিত মানুষের হার ৯০ শতাংশে উন্নীত করা, জাতীয় সঞ্চয়ের হার ২৫ শতাংশ এবং জনগণের মাথাপিছু আয় ১৭০ ডলার থেকে ৭০০ ডলারে উন্নীত করা সম্ভব বলে ঐ রচনায় দাবি করেছিলাম। লিখেছিলাম এর জন্য প্রয়োজন হবে একটি vision, একটি আপোসহীন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার, একটি দুর্নীতিমুক্ত নেতৃত্ব, একটি নির্যাতন মুক্ত, সহনশীল, উন্মুক্তমনা, গতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার।*

আমার মৌলিক বিশ্বাস হলো জীবন খুব সুন্দর এবং মানুষের মধ্যে অফুরন্ত শক্তি রয়েছে নিজেদের জীবনের গতি নির্ধারণ করার, রয়েছে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য অর্জন করার একটি অন্তর্নিহিত চালিকাশক্তি। এইভাবেই আমি বাংলাদেশকে দেখতে চাই, যেখানে রয়েছে ১২ কোটি মানুষ আর সীমাহীন সম্পদের সমারোহ।

* আমি কারামুক্ত হওয়ার পর প্রায় ১০০ পাতার এই লেখাটি সাপ্তাহিক হলিডেতে "A discussion on the future of Bangladesh" শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে চার ইস্যুতে প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালের মার্চ ৬, ১৩, ২০ এবং ২৭ তারিখে। এই লেখার ওপর একই পত্রিকায় প্রকাশিত রিভিউ বা বিশ্লেষণ করেন তখনকার ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি জনাব ক্রিস্টফার উইলোবী "The Malaise of subordinate culture" শিরোনামে ১৯৯২ সালের ৩ এপ্রিল, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ "A moralistic fiction by a survivalist" শিরোনামে ১৭ এপ্রিল, ড. মিজানুর রহমান শেলী "Breaking away from fruitless past and impotent present" শিরোনামে ২৩ এপ্রিল আর নাজিম কামরান চৌধুরী "What did Moudud do while in power?" শিরোনামে ১ মে তারিখে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কতিপয় আলোকচিত্র

www.pathagar.com

www.pathagar.com

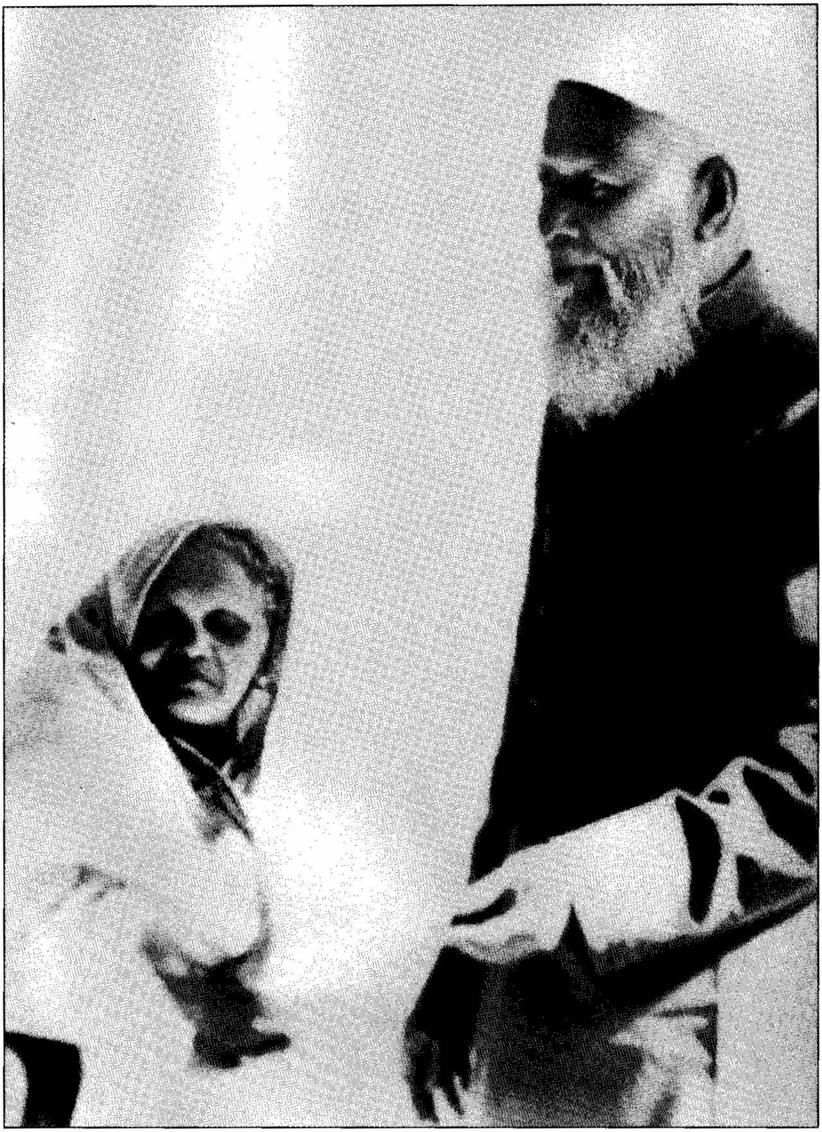

বাবা মরহুম মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদ এবং মা মরহুমা আম্বিয়া খাতুন।

www.pathagar.com

স্ত্রী হাসনা জসীমউদ্‌দীন, পুত্র আমান এবং কন্যা আনার সাথে।

www.pathagar.com

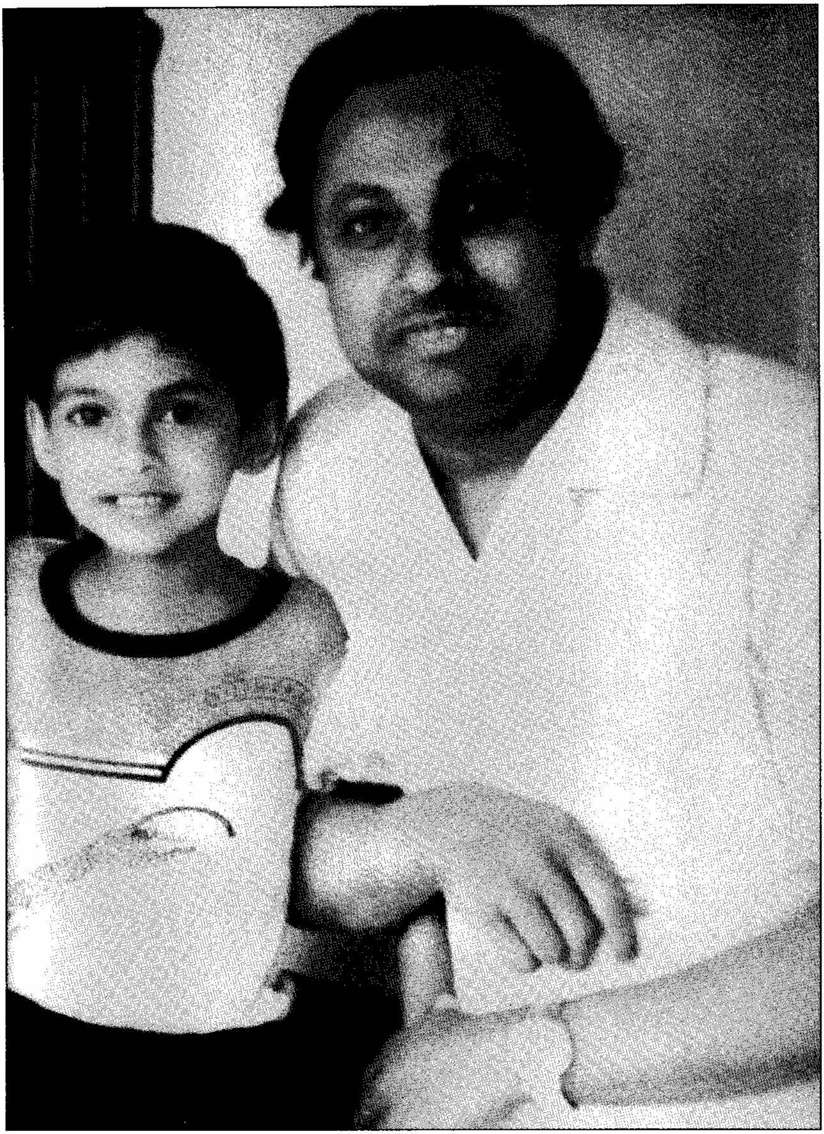

প্রয়াত জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিফের সাথে।

www.pathagar.com

খ্যাতনামা সাংবাদিক এবং বন্ধু এমিলি ম্যাকফারকারের সাথে হাসনা জসীমউদ্‌দীন। ১৯৯৬ সালে তোলা ছবি।

www.pathagar.com

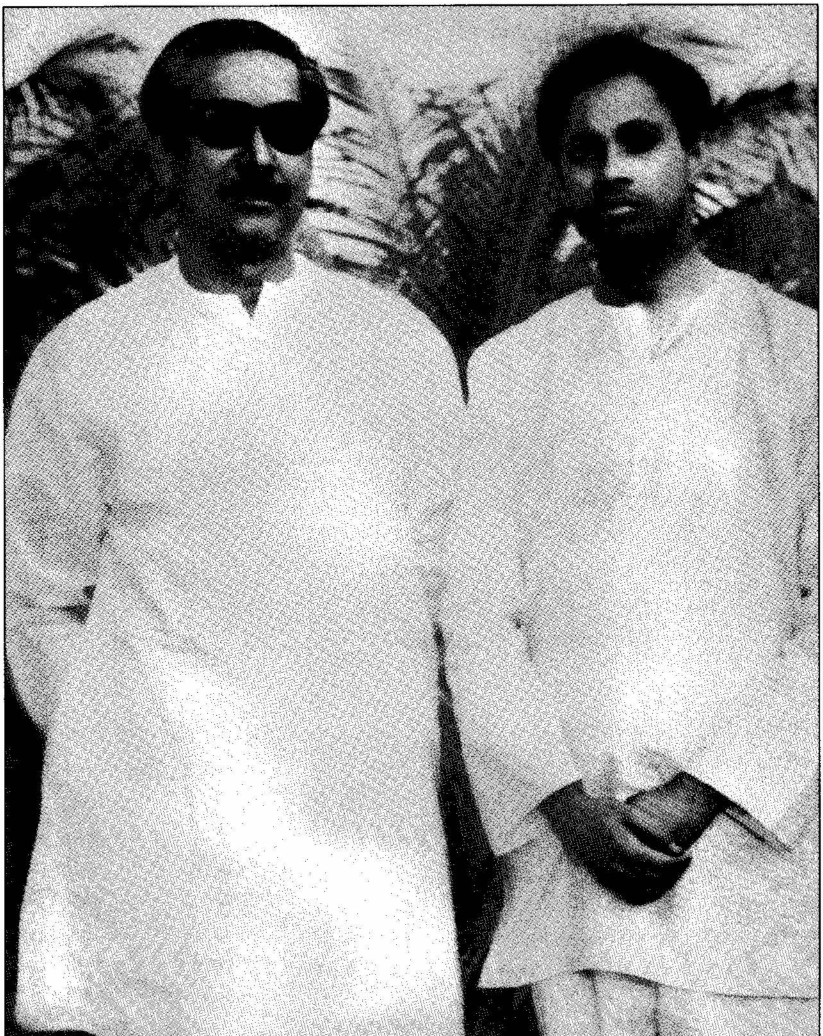

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় নিঃশর্ত মুক্তি লাভের পর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির লনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে তোলা ছবি।

www.pathagar.com

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী থাকাকালীন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে। সাথে আছেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, এনায়েতুল্লাহ খান, ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত এবং ক্যাপ্টেন নূরুল হক। ১৯৭৮ সালে তোলা ছবি।

www.pathagar.com

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে নয়াবাজার থেকে প্রেস ক্লাব পর্যন্ত গণমিছিলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে। ১৯৮৪ সালে তোলা ছবি।

www.pathagar.com

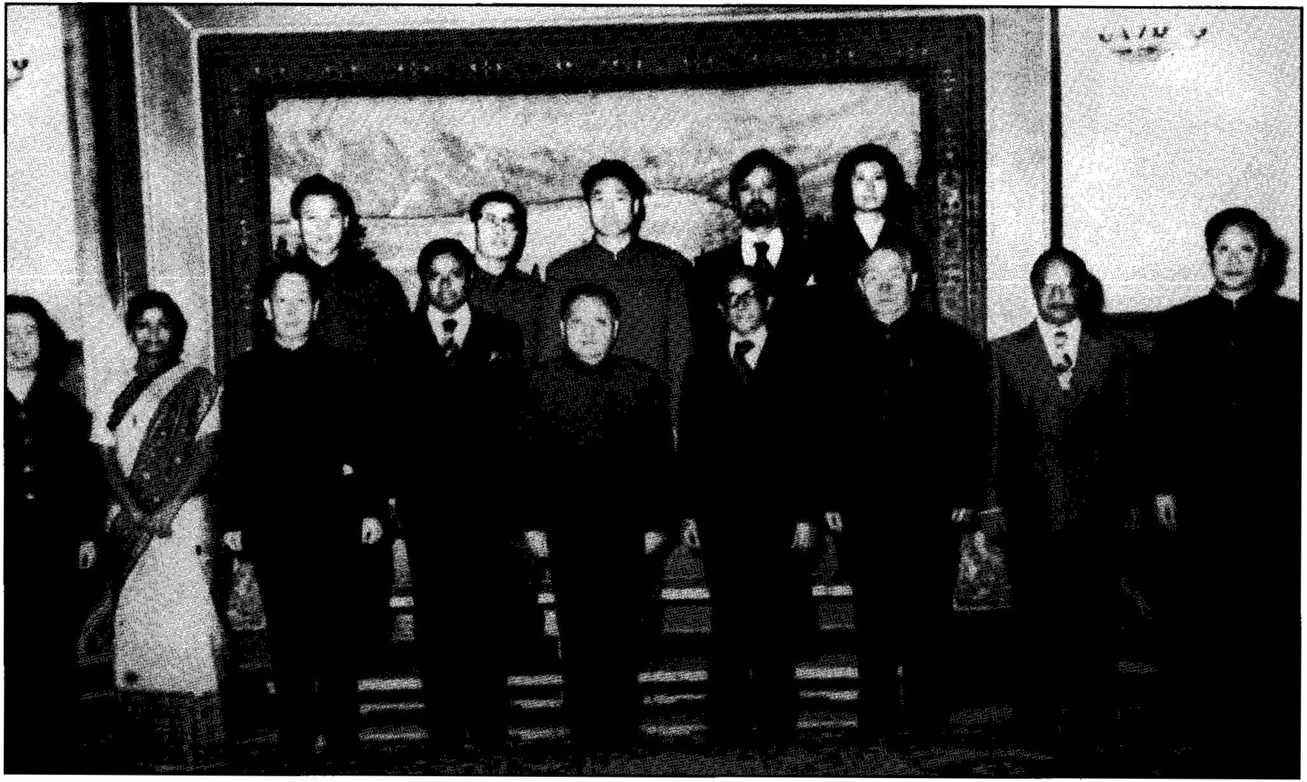

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী হিসেবে বেইজিংয়ের গ্রেট হলে আধুনিক চীনের মহানায়ক দেঙ জিয়াও পিঙয়ের সাথে স্ত্রী হাসনাসহ। ১৯৭৮ সালে তোলা ছবি।

www.pathagar.com

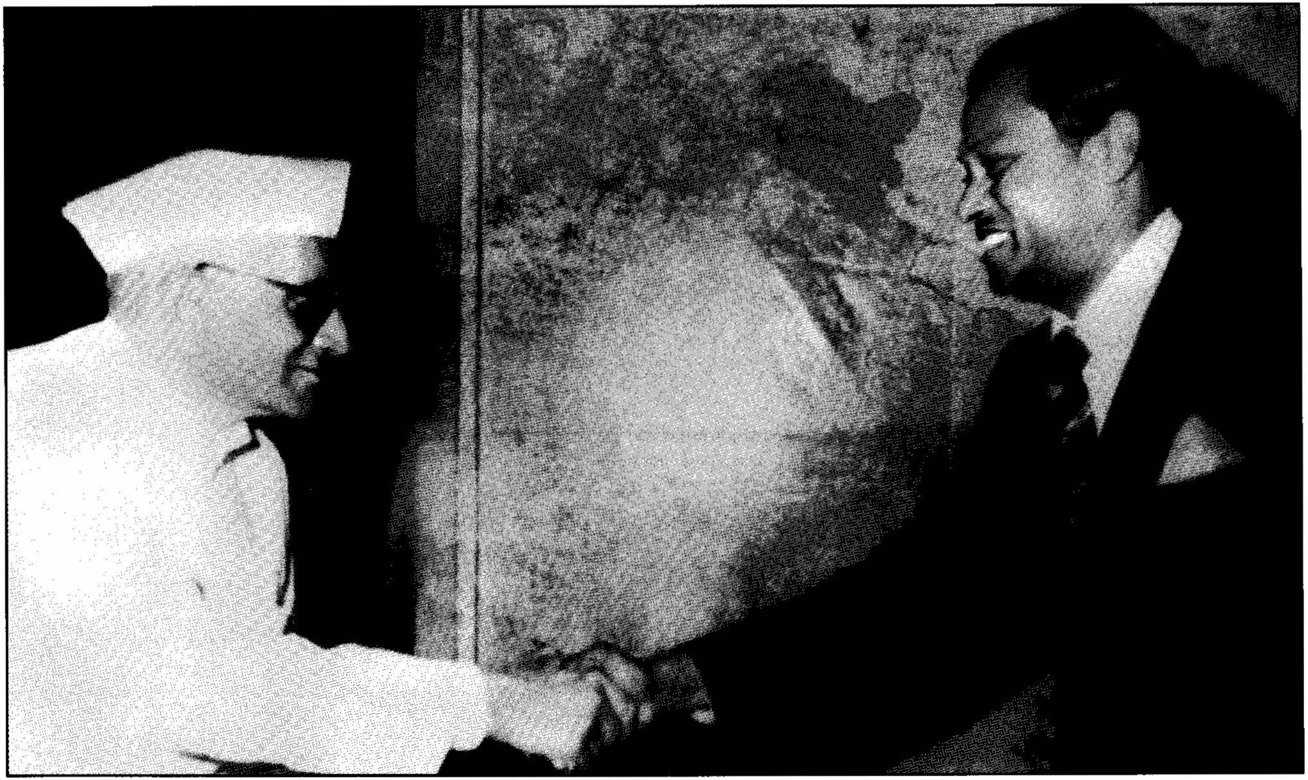

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবে যৌথ নদী কমিশনের সভায় যোগদানকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের সাথে। ১৯৭৯ সালে তোলা ছবি।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ব্রিটেন সফরকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
মিসেস মার্গারেট থ্যাচারের সাথে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে। ১৯৮৮ সালে তোলা ছবি।

www.pathagar.com

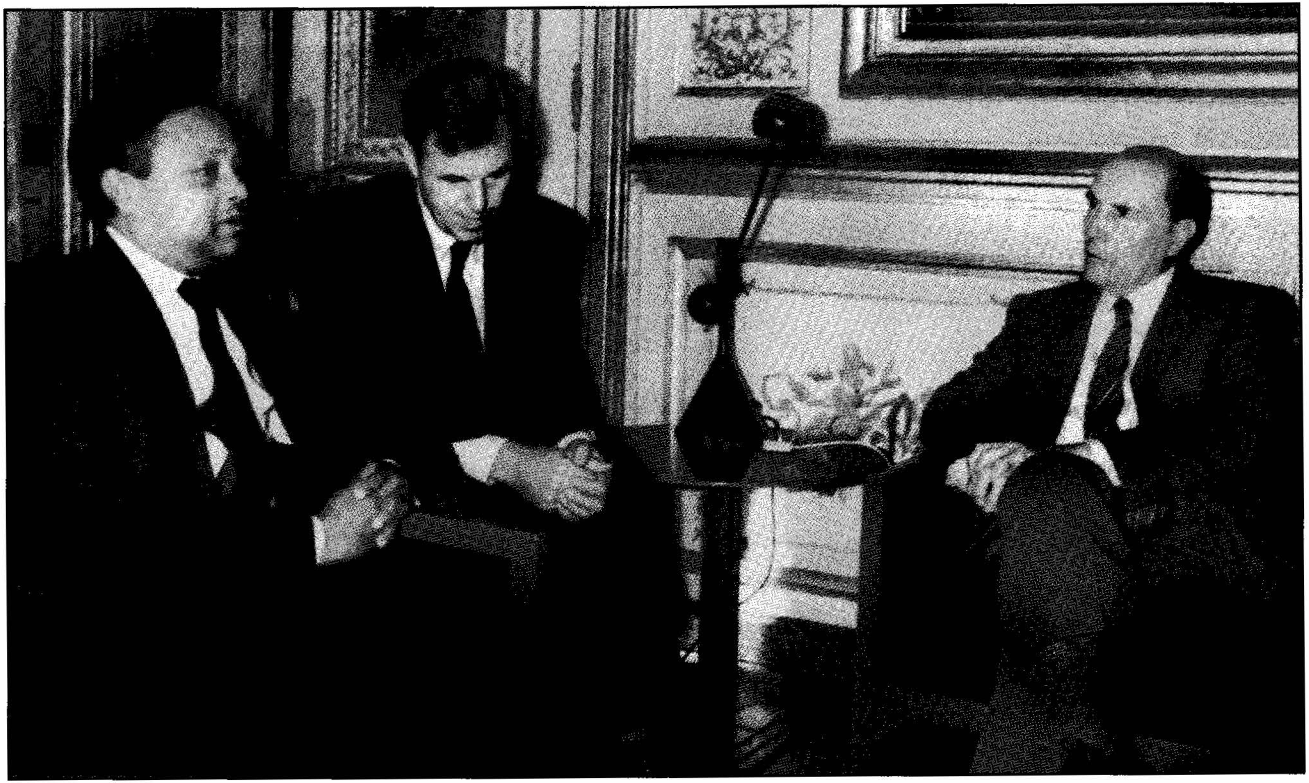

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফ্রান্স সফরকালে ফরাসি প্রেসিডেন্ট মিতেঁরার সাথে এলিসি প্রাসাদে। ১৯৮৮ সালে তোলা ছবি।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাপান সফরকালে জাপানের প্রধানমন্ত্রী নবরু টাকেসিতারের সাথে। ১৯৮৯ সালে তোলা ছবি।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেমস ড্যানফোর্থ কোয়েলের সাথে। ১৯৮৯ সালে তোলা ছবি।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সৌদি আরব সফরকালে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স বর্তমানে বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল সউদের সাথে।
১৯৮৯ সালে তোলা ছবি।

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

অবজারভার, ১৭১, ২৮০
অভি, ৪৭৬
অভ্যুত্থানদমন, ৪৮৬
অর্থনীতির চাকা, ৩৮৫
অষ্টম সংশোধনী, ৪৭৪
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ২৮০, ২৮৪, ৩১৪-৫, ৩৩৩-৪

আইএমএফ, ১২৬
আইডিএ, ১২৬
আওয়ামী যুগ, ১২৬
আওয়ামী লীগ, ১৩২, ১৩৬, ১৪০, ১৪৬, ১৫০-৩, ১৯৬, ৩৬৩, ৪৫৯, ৪৬৪
আওয়ামী লীগের শাসন, ৬৫, ৭৬, ৯৮, ২০০
আকবর হোসেন, ১৪৬, ২১২
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১০-১, ৫২-৩, ৫৫-৬, ৫৮-৬০, ২৮৪, ৩০৯, ৩৫৫, ৪০৫-৬, ৪০৯
আজমীর শরীফ, ১৮৮, ৩৬৫-৬
আটরশির পীরের দরবার, ৪৮৬
আদর্শ গ্রাম, ২০, ২২, ১৬৩
আত্রাই, ১২৭
আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, ১০, ২৯১, ২৯৩, ৩৭০, ৪৫৭, ৪৯৫
আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস, ৩৮০
আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনৈতিক কার্যক্রম, ৮৬
আত্মনির্ভর, ৪১৮
আপিল বিভাগ, ৪৩৫
আপ্যায়ন সম্পাদক, ৩৯
আবুল হাসনাত, ২১২, ২১৯, ২২৪, ২২৯, ২৫৩, ২৫৫
আব্দুর রব, আ. স. ম., ৬৮, ১৪৮, ৪৬৫
আব্দুর রাজ্জাক, ৬৮, ৮৫, ২৩৫, ২৫৩
আব্দুল মালেক উকিল, ৬৮, ৩৭৬
আবদুল মুহিত, আবুল মাল, ৪০, ১৭৪, ২৭৮, ২৮০, ২৮৪
আব্দুল আলীম, ২২৯
আবুল কাসেম, ৪২, ২০৯, ২১২, ২৪২, ৩৯৮
আবুল মোমেন, ৪৯০
আবুল হাসিম, ৪১
আমলা, ১২৯
আমলাতন্ত্র, ১২৫, ৪২০
আমান, ৫, ৭, ৯, ১২, ৬২, ১১৭, ১২০-২, ১৭৪, ১৮১-৩, ১৮৫-৮, ২৫১-২, ২৮৭, ২৯২-৩, ৩০২-৩, ৩১১, ৩১৪, ৩৬৪-৫, ৩৭২, ৫০০-১
আমিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ, ২৮৯

www.pathagar.com

আমেরিকা, ৯, ৪৪, ৪৭-৮, ৫০-১, ৭৭-৮, ১২১-২, ১৪৩, ১৮৬-৮, ১৯৫, ২৫৬, ২৭৯-৮০, ২৮৪, ২৮৯, ৩০৬-৭, ৩১১-২, ৩২১, ৩৩৮, ৩৫২, ৩৫৫, ৩৭১-২, ৩৯৫, ৩৯৮, ৪০০, ৪০২, ৪০৪, ৪০৮, ৪৯৫-৬, ৪৯৯

আরাফাত, ইয়াসির, ৪৯৩, ৪৯৬

আল খতীব, ১৫৮

আলট্রাভায়ার্স, ৪৩৫

আলবদর, ১৩৯

আলমাস সিনেমা হল, ১৬২, ২০২

আল শামস, ১৩৯

আলী, ইন্সপেক্টর রজব, ২৯৪, ৩০০

আলী, কোরবান, ৪৫৭

আলী, ক্যাপ্টেন মনসুর, ৬৮, ৮৪, ১১২

আলী, মোহাম্মদ ইউসুফ, ১৫৭

আসিফ, ৯-১০, ১২, ১১৭-২২, ১৭৪, ১৭৭, ১৭৯, ১৮১-৮, ২৭৬-৭, ২৮৬, ৩৬৫, ৫০০-১

আহমদ, তাজউদ্দিন, ৬০, ৬৮, ৭৩, ৯৬-৭, ১১২, ১২৪

আহমেদ, জামালউদ্দিন, ১৭৯, ২০১, ২১২, ২১৯, ২২৩-৪, ২২৯, ২৪২, ২৫৩, ২৫৫, ৪৭৩

আহমেদ, সাহাবুদ্দীন, ৫০৩-৪

ইউএনডিপি, ৪৯৯

ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, ১৪৪

ইউনূস, ৩৯৪

ইংরেজ সমাজ, ৪৪

ইকনমিস্ট, দি, ২৮০, ২৯৯, ৩০৯, ৩২৮, ৩৪৬, ৩৫৫

ইন্দোনেশিয়া, ১২৫, ১৫৬

ইমদাদুল হক ইমদু, ২২৪

ইরান-ইরাক যুদ্ধ, ১৫৭

ইলিয়াস, মুহম্মদ, ২৮৩

ইলেকট্রনিক্স সংযোজন শিল্প, ৩৮৯

ইসলাম, কে. এম., ১৩৮

ইসলাম, ব্যারিস্টার আমীরুল, ১০, ৫৬, ৬০-১, ৬৫, ৪০৭

ইসলাম, ব্যারিস্টার নজরুল, ২৯২

ইসলাম, সৈয়দ নজরুল, ৬৮, ১১২

ইসলাম, মইদুল, ২১২, ২১৯, ২২৯, ২৫৪-৫

উইলিয়ামস, টমাস, ১০-১১, ৫৮, ২৮০, ২৮২, ৩২১, ৩২৭, ৩৩৩-৪, ৩৪০-১, ৩৪৪

উইলিয়ামস, শার্লি, ২৩৪

উন্মুক্ত ফোরাম, ৪৬৭

উপকূল ট্রেন, ৩৮২

উপকূলীয় অঞ্চল, ৩৬৬

উপজাতি, ৪০৯-১০

উপজাতীয়দের পুনর্বাসন, ৪১৫

উপজেলা
আদালত, ৪৩৩, ৪৩৬-৭; চেয়ারম্যান, ৪২৪, ৪২৬, ৪৫৯; নির্বাচন, ৩৬৩, ৩৬৫, ৪২৬, ৪৫৫-৬; পদ্ধতি, ৪২৩, ৪২৬-৭, ৪২৯; পরিষদ, ৪১১, ৪২৪-৫, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৭২

ঋণ সালিশী বোর্ড, ৪৫২

"একক বাঙালি জাতি", ৪০৯-১০

একদলীয় শাসন, ১০, ৮৫, ৯০, ৯৩-৪, ১০৩, ১০৫-৬, ১০৯, ১৯৬-৭, ৩১০

www.pathagar.com

একদলীয় সরকার, ৮৪, ৮৯-৯০, ৯৪, ১০৪, ১৯৭
একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা, ১৪১
একনেক, ৩৭৮-৯, ৩৮২-৩, ৩৯৩-৫
এনালস, ডেভিড, ৪৭, ৩৪৪
এরশাদ, হুসেইন মুহম্মদ, ১, ২০, ৭১-২, ৮০, ১২৫, ১৩১, ১৫৬, ২০১, ২০৮-১৪, ২১৬-২১, ২২৩, ২২৭-৮, ২৩০, ২৩২, ২৩৯, ২৪৩-৭, ২৪৯-৫১, ২৫৪, ২৬৩, ২৬৬-৭০, ২৭২, ২৭৫, ২৭৮, ২৮০-২, ২৯৮, ৩০২-৫, ৩১১, ৩১৬, ৩২১, ৩৩০, ৩৩৪-৫, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৮-৫০, ৩৫৩, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৭-৭১, ৩৭৩, ৩৭৭-৮, ৩৮১, ৩৮৩, ৩৮৮, ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৭, ৪০২, ৪১১, ৪১৭-৮, ৪২৩, ৪২৬, ৪২৯-৩০, ৪৩৩-৭, ৪৩৯-৪০, ৪৪৭-৫০, ৪৫৩-৭৩, ৪৭৫-৮১, ৪৮৩-৭, ৪৯১-৮, ৫০৩-৪
এস. এ. বারী এ. টি., ৩, ৪০, ২০৯, ২১২, ২১৯, ২৪২, ২৫৩, ২৫৫

ঐক্য ও সংহতি, ৪৩২

ওবায়দুর রহমান, ৩০৩
ওয়ারান্ট অব প্রিসিডেন্স, ১৫৪
ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম, ৩৯৮
ওয়াহিদুল হক, ৩৮৩
ওলাকট, মার্টিন, ৩১০
ঔষুধ নীতি, ৪১৭, ৪৩৮
ওসমান গনি, ৪০
ওসমানী, জেনারেল এমএজি, ৬৮, ৭৯, ৮৫, ১১১, ১৪৫, ২১৩, ৪৮৪

ঔপনিবেশিক মনোভাব, ৬৮

কনডেম সেল, ৩০১
কনরাড, ডিইটার, ২৮১, ৩২১, ৩২৬-৮, ৩৩৩, ৩৩৯
কবিরহাট বাজার, ৩৭৫
কমিউনিজম, ৩৫৭
কমিউনিস্ট রাষ্ট্র, ৩৫৬
কমিটি ফর দি রেসটোরেশন অব ডেমোক্রেসি ইন পাকিস্তান, ৪৭
কয়েদি, ১
কর, ৪২৫
করতোয়া, ১২৭, ৪৯৬
কর্মসংস্থান, ৩৭৬
কাজী জাফর, ৪৭০, ৪৯১, ৪৯৫-৬
কাথেডেরাইজেশন, ১২১
কামরুজ্জামান, এএইচএম, ৬৪, ৬৮, ১১২
কারখানার শ্রমিক, ১৬৪
কারমাইকেল, স্টোকি, ৪৮
কারফিউ জারি, ৪৭১
কালুর ঘাটের বৈঠক, ১০২
কাসেম, ২২৪-৬
কাঁচা চামড়া, ৩৮৪
কুটির শিল্প, ৩৯১
কুমিল্লা, ৪৩৩
কুমিল্লার মাতৃভাণ্ডার, ১৮৩
কুমিল্লা হাসপাতাল, ৩৬৬
কুশিয়ারা, ১২৭
কূটনৈতিক শিষ্টাচার, ৪০০
কৃষক সমাজ, ১৬৪
কৃষি শ্রমিক, ৪৪০
কৃষাঙ্গ, ৪৫
কেডিসি, ২৭৯-৮০, ২৮৪

www.pathagar.com

কেনেডি, সিনেটর এডওয়ার্ড, ২৮০, ৩১১, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫৩
কেনেডি, জন এফ, ১৬৫, ৪০৪
কেস টেবিল, ১৭
কোম্পানীগঞ্জ, ৩৭৪
কোরআনের বিজয়, ৩৪
ক্রয়নীতি, ৩৮৯
ক্রুশ্চেভ, ৩৫৬-৭, ৩৫৮, ৩৬০-১
ক্লিফটন, টনি, ২৮১, ৩১০, ৩৪৪, ৩৪৭-৮
ক্ষমতার দ্বৈত ভিত্তি, ১১০
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ৪১৯
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, ৩৮৫

খন্দকার, এ. কে., ৭৯, ৪১১
খন্দকার মোশতাক, ৬৮, ৭১, ৮৬, ১০৯-১৩, ১২৪, ১২৯, ১৩৩, ১৩৫-৭, ১৪১, ২০০, ২৭৪, ২৮২, ৪৮৩; ক্ষমতা গ্রহণ, ২০০
খাজনা, ৪২৫
খাদীজা, হযরত, ৩৬
খান, আইয়ুব, ১২৯, ২৯৭
খান মজলিশ, দাউদ, ১৭৩-৫
খান, সিরাজুল আলম, ৬৫, ৬৮, ৮৩
খান, হাবিবুল্লাহ, ২৮৩
খালেদ মোশাররফ, ৭৯, ১১০-১৪, ১৯৫, ২৫৪, ২৭৪, ৪৮৩, ৫০০; অভ্যুত্থান, ২০০; ব্যর্থ অভ্যুত্থান, ১১০; সরকারের পতন, ১১৩
খালেদা জিয়া, ১৭৩, ২১০-২, ২২৩-৪, ২৩৬, ২৪১, ২৫২, ২৫৪-৫, ২৯৮, ৩০২, ৩৬৩, ৩৬৬-৮, ৩৭৭, ৪৫৪, ৪৫৮, ৪৬১-৩, ৪৬৬-৯, ৪৭৭-৮, ৪৮০, ৪৯২
খাস জমি, ৪৪৮-৫০; আবাদ, ৪৪১; পুনরুদ্ধার, ৪৫১; বরাদ্দ, ৪৪৭; বিতরণ, ৪৪২, ৪৪৮, ৪৫১

গঙ্গা নদী, ১৭০; পানি, ১২৭; পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি, ১৬৯
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ১৫৯; পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ১৪২
গণতন্ত্রায়ন, ৩৭৬
গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ৮৮; ধারা, ১৪১; প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি, ১৪৩; সরকার, ৫০৫; সাংবিধানিক ব্যবস্থা, ১৫৩
গণভোট, ১৪৫
গাঙ্গুলী বাবু, ৩৮
গান্ধী, ইন্দিরা, ১৫৭, ১৬০, ১৭২, ১৭৭
গার্ডিয়ান, দি, ৪৪, ২০৮, ২১৪, ২১৮-৯, ২২১, ২২৭, ২৪৭, ২৬৮, ২৮০, ৩১০, ৩২২-৩, ৩২৫, ৩২৭
গিয়াসউদ্দিন, ২০২
গিল, পিটার, ১০, ২৮১-২, ২৮৪, ৩১০, ৩১৩-৪, ৩৩৪, ৩৪২-৪
গোমতি, ১২৭
গোয়েন্দা পুলিশ, ৫০৪
গোলটেবিল বৈঠক, ৬০, ৬২
গোলাম আজম, ১৫৮
গোল্ডবার্গ, আর্থার, ৩১১-২
গোষ্ঠী স্বার্থ, ১৯৯
গ্রানওয়াল্ড, গান্টার, ৩৪০
গ্রাম সরকার, ৪২০
গ্রামীণ অর্থনীতি, ২১-২; উন্নয়ন, ৪২৩; জীবনের অবক্ষয়, ২০
গ্রেনেড, ২০২
গ্লাইসিন, ১২১-২, ৩৬৫
গ্লাইসিনিমিয়া, ১৮৭

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম, ২০১-২
চট্টগ্রাম বেতার, ২৭৪
চতুর্থ সংশোধনী বিল, ১৪১
চা, ৩৮৩
চাকমা, ৩০১
চামড়া শিল্প, ৪১১
চিনি, ৪১৮
চিনি শিল্প, ৪১৮
চীন, ১২৭, ৩৫৬
চীনপন্থী, ৩৫৭
চৌত্রনলাই, ৩৫৯
চৌধুরী, আব্দুল হালিম, ১৪৬, ৪৫৭
চৌধুরী, কুদ্দুস, ৪৯৭
চৌধুরী, তৌফিক এলাহী, ৩৩৮
চৌধুরী, বদরুদ্দোজা, ১৫৭, ১৬৭, ২১১-২
চৌধুরী, মহব্বতজান, ২০৪
চৌধুরী, মিজানুর রহমান, ৪৬৭, ৪৯৩-৪
চৌধুরী, শামসুল হুদা, ১৭৯, ২১২, ২২৯, ২৩০, ৪৫৭
চৌধুরীহাট, ৩৭৪

ছয় দফা কর্মসূচি, ৫৫, ৬১, ৬৪, ৬৬-৭
ছাত্র শক্তি, ৪১

জগলুল আলম, ৩০৬
জনকল্যাণ, ১২৬
জনদল, ৪৫৬
জনসমর্থন, ৩৭৮
জমির উৎপাদন শক্তি, ৪৪৩; মালিকানা, ৪৪৭
জরুরি অবস্থা ঘোষণা, ৪৭৮
জরুরি আইন ঘোষণা, ১০, ৮৪
জসিমউদ্‌দীন (কবি), ২৭৬
জসিমউদ্‌দীনের বাড়ি, ১৮২
জহুর আহমদ, ১৬২
জাইটলিন, আরনল্ড, ৩০৯-১০, ৩৭২
জাগদল, ১১৭-৮, ১৪৪-৫, ৩৭৫, ৪৫৬, ৪৮৫, ৪৯১
জাতির জনকের মৃত্যু, ২৭৪
জাতীয় উন্নতি, ২৩-৪
জাতীয় ঐক্য, ১০১, ১০৩, ৪৮৪
জাতীয় ঐতিহ্য, ১৯৩
জাতীয়করণ, ৪১৭
জাতীয়তাবাদ, ১৯৭
জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল), ১৩৯
জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট, ১৪৪, ৪৯১
জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, ৪৮৫
জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন, ২২৮
জাতীয় পার্টি, ৩৭০, ৪৬০-২, ৪৬৪-৫, ৪৬৯, ৪৭২-৩, ৪৭৮, ৪৯৪, ৫০৩
জাতীয় ফ্রন্ট, ৪৬০
জাতীয় মিলিশিয়া গঠন, ৭৩
জাতীয় রক্ষীবাহিনী, ৭৯
জাতীয় সংসদ, ২২৮, ২৪৩, ৪১৪, ৪৩৬, ৪৬০, ৪৬৩-৫, ৪৭৯, ৪৮১, ৪৮৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ৮৩
জাপানি কোম্পানি, ৪০৮
জাফর, কাজী, ১৪৪-৬, ৪৫৭, ৪৬০, ৪৭০, ৪৭৩, ৪৭৭, ৪৯০-১, ৪৯৫-৬
জামায়াতে ইসলামী, ২৩৬, ৪৬৪, ৪৭০-৩
জাল ভোট, ১৫৩
জাসদ, ১৩২, ১৩৬, ১৫৩

www.pathagar.com

জিঞ্জিরা, ৩৮৫
জিব্রাঈল (আ:)-এর আলিঙ্গন, ৩৫
জিয়াউর রহমান, ১, ৪, ২০, ৭১, ৭৭-৮০, ৯৮, ১১০-৪, ১১৭, ১১৮-২১, ১২৪-৬, ১২৯, ১৩১-৭, ১৩৯, ১৪১-২, ১৫০, ১৫৪-৬, ১৬১, ১৬৩-৪, ১৬৭-৮, ১৭২, ১৭৯, ১৮৯-৯০, ২০২-১২, ২১৬-৭, ২১৯, ২২৫-৭, ২৩০, ২৪৬-৭, ২৫৪, ২৬৩, ২৬৬-৭, ২৭৪-৮, ২৮১-২, ২৮৬-৭, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৭০, ৪০০, ৪৮০, ৪৮৩, ৪৯২
জিয়ার মৃত্যু, ১১০, ১৩৪, ১৪০, ১৫৭, ২০১, ২৩৮, ২৪০, ২৪৩, ২৪৫
জিয়া হত্যা, ১৯২, ২০০-১, ২০৫-৬, ২১৪-৫, ২৯৭-৮, ৩০১
জিল্লুর রহমান, ৮৫
জুম চাষ, ৪১০, ৪১৪-৬
জেল আপিল, ১৪
জেলখানা, ১৮
জেনকিন্স, ন্যান্সি, ৩১৪, ৩৪৭
জেনকিন্স, লরেন, ৩১০, ৩১৪

টাঙ্গাইল, ১৫০
টেকনাফ, ২০৩
টেলিফোন লাইন স্থাপন, ৩৭৫
টুল, পিটার ও', ৪৮

ডাকঘর স্থাপন, ৩৭৫
ডাকসু, ৪৬৭
ডাফি, অ্যালেক্স, ২৮১, ২৮৩, ৩২০, ৩২২-৩, ৩২৫-৬, ৩৩৩-৪, ৩৪০-১, ৩৪৩-৫, ৩৪৮, ৩৪৮
ডিক্টেটর, ১৯৭
ডেইলি টেলিগ্রাফ, ১০, ২৮১, ৩১০, ৩১৩, ৩৩৪
ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক), ৫৯, ৩১০
ডে স্কুল, ৪৪
ড্যাফোডিল হোটেল, ১৬১
ড্রিংগ, সাইমন, ৩১০

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, ৪, ১৩, ৪০, ৫৭, ১১২, ২৫৫, ৩০১-২, ৩৪৭, ৫০৪

তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), ৫৭, ৬১
তবলছড়ি, ২০৩
তমুদ্দুন মজলিস, ৪১-২
তাহের (কর্নেল), ১১২-৫, ১২৯, ১৩৩-৪
তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৪৬৯
তেভাগা আন্দোলন, ৪৪২
তোয়াব, এম.এ.জি., ১৩৫
তোয়াহা, মোহাম্মদ, ১৫৩

থাইল্যান্ড, ৭৭, ১২৫, ১৫৫, ১৯৫, ২৫৬-৭, ২৬১, ২৬৪-৫, ৩৮৫
থেমস টেলিভিশন, ২৮১, ৩৩৪, ৩৪২-৩
থ্যাচার, মার্গারেট, ২৮১, ৩১৯, ৩৩৪, ৩৯৮-৯

দক্ষিণ কোরিয়া, ১২৫
দক্ষিণপন্থী ধর্মভিত্তিক সংগঠন, ১২৯
দত্ত, সি. আর., ২৮৮
দারিদ্র্য বিমোচন, ৪২৩
দালাল আইন, ৭৬, ৮৩, ১০১-২, ১৩০, ১৯৬

www.pathagar.com

দিদারুল আলম (কর্নেল), ১৫৬
দিনমজুর, ১৬৪, ৩৭৮, ৪৪৬
দিনাজপুর রেলওয়ে স্টেশন, ৩০১
দুর্নীতিমুক্ত নেতৃত্ব, ৫০৫
দুর্ভিক্ষ, ৭৭
দেঙ জিয়াও পিঙ, ১১৮, ৩৫৯, ৩৬১, ৩৯৯
দ্বিজাতিতত্ত্ব, ১৪০
দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তি, ৭০
দ্বিপাক্ষিক, ১৭২

ধর্ম নিরপেক্ষতা, ১৯৭
ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল, ১০০
ধর্মান্ধতা, ২৯
ধর্মীয় বিশ্বাস, ১৩০
ধাত্রী, ২৮
ধোলাইখাল, ৩৮৫

নবকুমার স্কুল, ৪০
নবম সংশোধনী, ৪৯৭
নাগরিক কমিটি, ৪৬৭
নাজমুল হুদা (কর্নেল), ৫০০
নাজিউর রহমান মঞ্জু, ৪৯৫, ৪৯৭
নাটক 'চকলেট', ৪১
নাৎসি ইতিহাস, ৩২৬
নায়ার, কুলদীপ, ৩৩০, ৩৫২
নির্বাচন ওয়াক ওভার, ১৫২
নির্যাতন, ৫০০
নীরু, ৪৭৬
নীরু গ্রুপ, ৪৭৬
নীল চাষ, ৪৪২

নূরুল ইসলাম, ১৩১, ১৩৮, ১৪৪, ১৬২, ১৭৫, ২১২-৩, ৪৯১
নূরুল হক, ১৭৯
নেপাল, ১৬৮-৭৩, ১৭৫-৭, ২৯৮
"নোট ভারবাল", ২৯১
নোয়াখালী, ৬, ২৯, ৩৬-৭, ১৫২, ১৭৩, ২৯৮, ৩৬৬, ৩৭৬, ৩৭৮-৮০, ৩৮২, ৩৮৪-৫
নোয়াখালী খালের সংস্কার, ৩৭৯
ন্যাশনাল লেবার পার্টি, ১৪৪

পকেট ট্রানজিস্টার, ৩৯০
১৫ আগস্ট, ১৩৪-৫, ১৪৫
পঞ্চম সংশোধনী বিল, ৪৮৪
পররাষ্ট্র নীতি, ৩৬৯
পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইন, ৭৬
পড়ার অভ্যাস ৩৮
পশ্চিম বঙ্গ, ১৬৯-৭০
পশ্চিমা জগৎ, ৪৬৭
পশ্চিমা দেশ, ১২৭
পাকিস্তান, ১, ১০-১, ২৭, ৩৬, ৪৩, ৪৫-৭, ৪৯, ৫২, ৫৬, ৬০-১, ৬৪, ৬৯-৭০, ৭৩-৪, ৭৯-৮১, ৯৮, ১২৫, ১৩১, ১৪০-১, ১৯৫, ২১৫-৬, ২৩০, ২৫৬-৭, ২৬১, ২৬৪, ২৭৩, ২৮২, ২৯৬, ৩০৫, ৩৮১, ৪০৩, ৪০৮, ৪৮৯; প্রত্যাগত অফিসার, ১০০, ১৯৪; সেনাবাহিনী, ৬৬-৮, ৯৯-১০১, ১৯৪, ১৯৮, ২৫৮
পানি প্রত্যাহার, ১২৭
পানিসম্পদের ব্যবহার, ১৬৯
পার্কার, মিনিয়ার্ড, ৩১০
পাট, ৪১৮
পাটশিল্প, ৩৮৩

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১০৩, ৪০৯
পার্লামেন্ট নির্বাচন, ১৪৯
পালমুনারি হাইপারটেনশন, ১২২, ১৮৬-৭
পাহারা, ১৬
পিটার, হেজেল হার্স্ট, ৫৮, ৩১০
পিপলস্ আর্মি, ১৩৬
পিলজার, জন, ২৮১, ৩১০, ৩১৩, ৩২২, ৩৪৭-৮
পূর্ব পাকিস্তান, ১৫৩
পূর্ব বাংলা, ৪৯
পৃষ্ঠপোষকতার নীতি, ৭৩
পোরডেস, রিচার্ড, ৩১৬, ৩৩৮
পোশাকশিল্প, ৩৮৪, ৩৯৩, ৪১৯
প্রতিবন্ধী, ১২২, ১৮৮, ৫০১
প্রধান বিচারপতি, ৪৩৫
প্রধান সামরিক প্রশাসক, ১৬১
প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ, ৪১৭
প্রাদেশিক গভর্নর, ৩৯
প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স, ৮১
প্রেস ক্লাব, ৫৩, ৩৬৩, ৪৭৩, ৪৭৮
প্রেস নোট, ৪৭২
প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার, ১৪২

ফজলুল হক, এ. কে., ১১৯, ২২৬, ৪৫২
ফজলুল হক মণি, শেখ, ৬৫, ৬৮, ৮৫, ৯১
ফজলুল হক হল, ৩৯-৪০, ৪৭৭
ফাইনান্সিয়াল টাইমস, দি, ২৮০, ৩২৩-৫, ৩৪৫
ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, ২৮০, ৩৩৬
ফারুক, ১৯১
ফারাক্কার পানির হিস্যা, ১২৮
ফারাক্কার বাঁধ, ১৬৯
ফিলিপিনস, ১২৫
ফুট, মাইকেল, ২৮০, ৩৩৫, ৩৪৪, ৩৮৪
ফেনী, ৩৭৫
ফ্রেডরিক এবার্ট ফাউন্ডেশন, ৩১৭, ৩৩৯-৪০

বগুড়া, ১৩৫-৬
বঙ্গভবন, ২১০
বর্গাদার, ৪৪০, ৪৪৮
বরিশাল, ৪৩৩
বসুরহাট, ৩৭৪-৬, ৩৭৯
বস্ত্র, ৪১৮
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ (বাকশাল), ৮৫, ৮৮
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), ১৪৬, ১৫৬-৭, ১৬৩
বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, ৪৬৭, ৪৭৭
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ১৯৩, ৩৬৮, ৩৭০
বাঙালি, ১৩০, ৪০৯
বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ৬৯
বাজারজাত অর্থনীতি, ২৩
বারিধারার বাড়ি, ৫০৪
বিগহ্যাম উইমেন হসপিটাল, ৩৭১
বিজাতীয়করণ, ৪১৮
বিডিআর, ৯৭, ১১১, ১৩৮, ১৯৩, ৪৬৩, ৪৭৮
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ১৫৩, ২৭৫
বিদ্রোহী গ্রুপ, ২২৩

www.pathagar.com

বিনিয়োগ বোর্ড, ৩৯৬
বিপ্লবী সরকার, ২০২
বিবিসি, ২১৯, ২২৭, ২৭৫, ২৮০, ২৯৯, ৩১০, ৩৩৪, ৪৫৬, ৪৮০, ৫০৩
বিরাষ্ট্রীয়করণ, ৩৮২-৩
বিশেষ অপরাধ আইন, ৭৬
বিশেষ ক্ষমতা আইন, ৮১
বিশেষ সামরিক আদালত, ১৩৫
বিশ্বায়ন, ৩৬৯
বিসিক, ৩৮৬
বিসিক শিল্প মালিক সমিতি, ৩৮৮
বীরেন্দ্র (রাজা), ১৭১, ১৭৬
বুদ্ধিজীবী, ১৬৫
বেকারত্ব, ৩৮৫
বেচাকেনা, ১৭
বেসরকারিকরণ, ১২৮, ৪১৭
ব্রাসেলস, ৪৬৯

ভন মার্শাল, ব্যারন, ৩১৬-২০, ৩৩৯, ৩৪৮
ভারত, ৩৬, ৬৮-৭৩, ৭৭-৮, ৮০, ৯১, ৯৫, ৯৭, ১১২-৩, ১১৫, ১১৮, ১২৭-৯, ১৩৬, ১৩৯-৪০, ১৪৩-৪, ১৬৮-৭২, ১৭৭, ১৯৮-৯, ২১৩, ২৪৩, ২৭৪, ২৯৮, ৩৫২, ৩৫৮, ৩৬৯-৭০, ৩৯১, ৪০৭, ৪১০-১, ৪১৫, ৪৪১, ৪৭১, ৪৮৭; সাধারণ নির্বাচন, ১৭৫; সেনাবাহিনী, ১২৮
ভাসানী, মওলানা আবদুল হামিদ খান, ৫৯-৬০, ৭৭, ৯৫, ১১৯, ১৪৬
ভিনেল, ২৭৯
ভিশন অব বাংলাদেশ, ৫০৪-৫
ভূমি সংস্কার, ৪১৭, ৪৩৯, ৪৪৬; কাউন্সিল, ৪৪৯
ভূমিহীন, ৪৪৩, ৪৪৫; পরিবার, ৪৪০
ভূস্বামী, ৪৪৩

মঞ্জুর, জেনারেল, ১৩১-২, ১৩৮, ১৫৬-৭, ১৯২, ২০১-৫, ২৫৫, ৪১০, ৪৯০
মতিউর রহমান, ১৯২, ২০২-৩
মহাজনি ব্যবস্থা, ৪৫১
মাসকারেনহাস, এন্থনি, ৩১০, ৩৪১
মাহবুবুর রহমান, ১৯২, ২০২, ৩৯৮
মাহমুদ, আনিসুল ইসলাম, ৪৯৫-৬
মিলস, ফ্রাংক, ৩১১, ৩৪৯-৫০
মুজিবুর রহমান, শেখ, ৯-১১, ২০, ২৩, ৪৬, ৫২, ৫৫-৭, ৫৯-৬৫, ৭১, ৭৩-৪, ৮০, ৮৩-৯৫, ৯৭-৮, ১০৩-১০, ১১২, ১১৯, ১২৪, ১২৫, ১২৭-৯, ১৩৪, ১৪৫, ১৪৯, ১৫৩-৪, ১৫৬, ১৬০, ১৬৩-৫, ১৭২, ১৮৯-৯২, ১৯৬-৮, ২০০, ২১৬, ২২৬, ২৩৭, ২৫৩, ২৮১-২, ৩০০, ৩০৫-৬, ৩০৯-১১, ৩১৩, ৩২৬, ৩৫৫, ৪০৯, ৪২০-১, ৪৪২, ৪৫৮, ৪৬১, ৪৮৩
ম্যাকডোনাল্ড, জন, ২৮০, ২৮২, ৩২১, ৩২৪, ৩২৫-৬, ৩৩৪, ৩৪৪, ৩৪৭-৮
ম্যাকফারকার, এমিলি, ২৮০, ৩০৯-১০, ৩১৪-৫, ৩২৮, ৩৪৩-৪, ৩৫৫, ৩৭১-২

যশোর, ৪৩৩
যুক্তরাষ্ট্র, ৭৮, ১৪২, ৩৬১, ৩৭২, ৪০৩, ৪৬৮-৯, ৫০৪
যুক্তরাষ্ট্র সরকার, ৯, ৩৯
যুদ্ধের ভ্যানগার্ড, ৬৮
যুবদল, ১৬১

রংপুর, ৬-৭, ৪৩০, ৪৩৩
রকেট লাঞ্চার, ২০২
রক্ষীবাহিনী, ৭৬, ১২৬, ১৯৮, ৩৭৫

www.pathagar.com

রডারিক, ৩৫৫
রনো, হায়দার আকবর খান, ১৪৪
রপ্তানি আয়, ৩৮৪
রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ জোন, ৩৮৪
রশীদ (কর্নেল), ১০৭, ১৩৫
রাজনীতি ও গণতন্ত্রায়ন, ৩৭৩
রাজনৈতিক মেরুকরণ, ১২৯
রাজনৈতিক সংলাপ, ৪৫৪
রাজনৈতিক সদিচ্ছা, ৫০৫
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ২৭৫
রাজাকার, ৭৪, ১৩৯, ১৮০, ২৫১
রানিংমেট, ২১০, ৪০৩, ৪৭৪, ৪৯৫, ৪৯৭
রাসেল, বি., ৪৭
রুলস্ অব বিজনেস, ৪৮৯
রুহুল ইসলাম, ১৯২, ২০১, ২০৪
রেফারেন্ডাম, ১৩২
রোকেয়া কবির, ৩৬৪

শওকত, ১৩৮
শহীদুল্লাহ হল, ৪৭৭
শফিউল্লাহ, ১২৪
শাহ আজিজ, ১৪৪, ১৬২, ১৬৭, ১৭৭, ১৮০, ২০৯-১০, ২১২, ২৩০, ৩৬৭, ৪৯০
শিল্প ও সংস্কৃতি পরিষদ, ৪২
শিল্প বণিক সমিতি, ৩৮৮
শিল্প বিপ্লব, ৪২৭
শিল্পায়ন, ৩৮২-৩
শেখ হাসিনা, ২৩৫, ৪৫৮-৯, ৪৬১-৬, ৪৬৮-৯, ৪৭৭-৮, ৪৮১
শেতাঙ্গ, ৪৪
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ৮১, ১১৮, ১৫৩-৪, ১৯৫, ২০৪, ২৪৮, ২৫৭, ২৬৫-৬, ২৭২, ২৭৫
সংবিধান, ৪৩৬
সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী, ৮৫
সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৪৬৭
সংসদীয় গণতন্ত্র, ১৪১, ১৪৫, ১৬১, ৪২০, ৪৯৮; ব্যবস্থা, ১৪৩; সংস্কৃতি, ৪৯৪
সচিব কমিটি, ২৭৯
সমাজতন্ত্র, ১৬৪
সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, ২৩-৪, ১২৬; দল, ৯১; দেশ, ১৬০; নীতিমালা, ৪৪৫
সমাজ বিপ্লব, ৯২
সরকারি চাকুরেদের বরখাস্ত আইন, ৭৬
সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য, ৪৬৮-৭০, ৪৭২, ৪৭৬-৭
সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৫৯, ৪৭০
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ৩৯
সাংবিধানিক সরকার, ১১০, ১১৭-৮, ১৪২, ১৫৩, ১৬১, ২০৫-৬, ২১১, ২১৮, ২২০-১, ২৭৫, ৩৬৮, ৪৬২, ৪৭৪
সাংস্কৃতিক বিপ্লব, ৩৫৮-৬০
সার্টিফিকেট মামলা, ৪৪২
সাত (৭) নভেম্বর, ১২৩-৪, ১২৮-৯, ১৩২
সাত্তার, আব্দুস, ১১০, ২০১, ২০৫, ২০৮-৯, ২১১, ২১৩, ২১৮, ২২০, ২২৩, ২২৬
সামন্তবাদী মনোভাব, ১০৬

www.pathagar.com

সামরিক
অভ্যুত্থান, ১০৭, ১৯৫, ২১১, ২২০, ২২২, ২৪৩, ২৫৬, ২৫৮, ২৬২, ২৬৫-৬, ২৭৬, ২৯৭, ৩১১, ৪৮৩; আইন প্রত্যাহার, ১৫৩; আদালত, ১৩৩, ২৯৩, ৩৪২; ক্যু, ৩৭৩; জান্তার বিরুদ্ধে কবিতা, ৩৬৪-৫; ট্রাইব্যুনাল, ২৭৮, ৩১৭; বাহিনী, ১৩৪; বাহিনীর ক্ষমতা দখল, ১৩৪; শাসন তুলে নেয়া, ১৪৭; সরকার, ২৯৭
সার্ক, ১৫৭
সার্বভৌমত্ব রক্ষা, ২১৯
সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন, ১৪৪
সিদ্দিকী, তানভীর, ২২৯, ২৫৩, ৩০৩
সিপাহী-জনতার বিপ্লব, ১০৯, ১১৩
সিপাহী বিপ্লব (৭ নভেম্বর, ১৯৭৫), ৩৬২
সিলেট, ৪৩৩
সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন, ৪২৯-৩৬, ৪৬৭
সুরমা নদী, ১২৭
সুহার্তো, ১২৩, ১৩২
সূর্যসেন হল, ৪৭৬
সেচ ব্যবস্থা, ১৬৯
সেন্ট গ্রেগরী স্কুল, ৩৭-৯, ৩৮৬
সেঙ্গরশীপ, ১৭৩
সেফার, টেইজি, ৪৯৬-৮
সেফার, হাওয়ার্ড, ৪৯৬
সেশন বেঞ্চ, ৪৩০
সোভিয়েত ইউনিয়ন, ৯১-২, ৯৫, ১১৮, ৩৫৬-৮, ৩৬১, ৩৯০
সোভিয়েতপন্থী, ৩৫৭
সোভিয়েত ব্লক, ৯৩
সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ, ৩৮, ৪৬-৭, ১১৯
সৌদি আরব, ১২৭, ৩৯৫, ৪৬৮
স্বপ্নকল্প, ৪১৬
স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি, ২৩০
স্বাধীনতার ঘোষক, ১২৪
স্বাধীনতার পক্ষের লোক, ১০১
স্বাধীনতার বিপক্ষের লোক, ১০১
স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলন, ৪৬
স্থানীয় সরকার পরিষদ, ৪১২
স্বেচ্ছায় অন্তরীণ, ৫০৪
স্টালিন, ৩৫৬-৭, ৩৬১
স্যানবার্গ, সিডনি, ৩১০

হতদরিদ্র, ৪৪৯
হরতাল, ৩৮, ৫৯, ৩০৯, ৪৫৬-৭, ৪৬২, ৪৬৫, ৪৬৯-৭৩, ৪৭৭
হাইকোর্ট, ৪৩৫
হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১২, ১৭৩, ১৮৫-৬, ২৮১, ২৮৭, ২৮৯, ৩০৬-৭, ৩২৬, ৪০৪-৫
হাইম্যান, টনি, ৩১৫
হাওয়ার্ড, সিমেন্স, ২৭৯
হাজতি, ১-২, ৬, ৩০১
হাতকড়া, ৬-৭
হাফিজ, মির্জা গোলাম, ৩৬৭
হাসনা, ৭-৯, ১২, ১১৭-৮, ১২০-২, ১৭৩, ১৭৭, ১৮১, ১৮৩, ১৮৫-৬, ১৮৮, ২১২, ২১৯, ২২৪, ২২৯, ২৫১, ২৫৩, ২৫৫, ২৭৬-৭, ২৭৯, ২৯২-৪, ৩০২-৪, ৩১১-৪, ৩১৬, ৩১৮-২২, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪০,

www.pathagar.com

৩৪৩, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৬৪-৬, ৩৭১-২, ৪৫০, ৪৯৯-৫০০, ৫০৪
হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, ২৮
হুইটনি, রে, ৩১৪-৫, ৩৪৪
হুদা, এম. এন., ৪৯০
হেজেলহার্স্ট, পিটার, ৩০৯
হেরা পাহাড়ের গুহা, ৩৬
হেরিটেজ ফাউন্ডেশন, ৪০৩
হোয়াইট হাউস, ৪০৪, ৪১৮
হোসেন, আদিল, ১৮২
হোসেন, এ. কে. এম. মোশাররফ, ৪১৮
হোসেন, কামাল, ৬, ১০, ৬০-২, ৬৪-৫, ২১৩, ২৩৫, ২৭৫, ৪৬৫, ৪৮০
হোসেন, শাহ মোয়াজ্জেম, ৩৯, ৪৫৭, ৪৭০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইউপিএল প্রকাশনা

মওদুদ আহমদ

সংসদে যা বলেছি

•

বাংলাদেশঃ শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল

•

গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ

প্রেক্ষাপটঃ বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সামরিক শাসন

•

বাংলাদেশঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা

•

South Asia: Crisis of Development

The Case of Bangladesh

•

Democracy and the Challenge of Development

A Study of Politics and Military Interventions in Bangladesh

•

Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy

•

Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman

ISBN 984 70220 1031 7

9 847022 010317